মুনীর চৌধুরী
রচনাসমগ্র ১

মুনীর চৌধুরী রচনাসমগ্র ১

সম্পাদনা

আনিসুজ্জামান
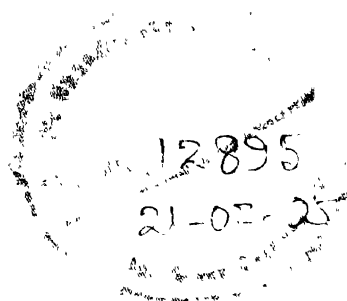
অন্যপ্রকাশ
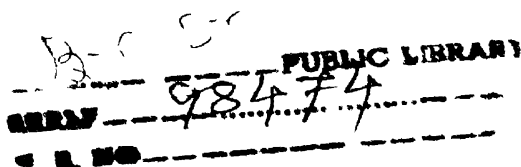
প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৬৬৪২৬০, ৯৬৬৪৬৮০
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯৬৬৪৬৮১

কম্পিউটার কম্পোজ | পজিট্রন কম্পিউটার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
ফোন: ৫০৪২২৬, ৯৬৬৪৬৮০

মূল্য | ৫০০ টাকা

Munir Choudhury Rachanasamagra 1 | Edited by Anisuzzaman
Published by Mazharul Islam, Anyaprokash
Cover Design : Dhruba Eash
Price . Tk 500 only
ISBN : 984 8160 164 X

সূচিপত্র

সমকালীন সাহিত্য

আত্মকথা

বিবিধ

রক্তাক্ত প্রান্তর

আমার প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ
লিলির নামে
উৎসর্গ করলাম

ভূমিকা

১.১ পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ এই নাটকের পটভূমি। এই যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৭৬১ সালে। মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করেন বালাজী রাও পেশোয়া; মুসলিম শক্তির পক্ষে আহমদ শাহ্ আবদালী। এই যুদ্ধের ইতিহাস যেমন শোকাবহ তেমনি ভয়াবহ। হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার সংকল্প নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধের স্থূল পরিণাম মারাঠাদের পরাজয় ও পতন, মুসলিম শক্তির জয় ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ। জয়পরাজয়ের এই বাহ্য ফলাফলের অপর পিঠে রয়েছে উভয় পক্ষের অপরিমেয় ক্ষয়-ক্ষতির রক্তাক্ত স্বাক্ষর। যত হিন্দু আর যত মুসলমান এই যুদ্ধে প্রাণ দেয় পাক-ভারতের ইতিহাসে তেমন আর কোনোদিন হয়নি। মারাঠারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হলো বটে কিন্তু মুসলিম শক্তিও কম ক্ষতিগ্রস্ত হলো না। অল্পকাল মধ্যেই বিপর্যস্ত ও হৃতবল মুসলিম শাসকবর্গকে পদানত করে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে তার শাসনব্যবস্থা কায়েম করতে উদ্যোগী হয়। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের অব্যবহিত ফলাফল যেমন মানবিক দৃষ্টিতে বিষাদপূর্ণ, তার পরবর্তীকালীন পরিণামও তেমনি জাতীয় জীবনের জন্য গ্লানিময়। এই রক্তরঞ্জিত পানিপথের প্রান্তরেই আমার নাটকের পট উন্মোচিত।

১.২ তবে যুদ্ধের ইতিহাস আমার নাটকের উপকরণ মাত্র, অনুপ্রেরণা নয়। ইতিহাসের এক বিশেষ উপলব্ধি মানব-ভাগ্যকে আমার কল্পনায় যে, বিশিষ্ট তাৎপর্যে উদ্ভাসিত করে তোলে নাটকে আমি তাকেই প্রাণদান করতে চেষ্টা করেছি। আমার নাটকের পাত্র-পাত্রীরা মহাযুদ্ধের এক বিষময় পরিবেশের শিকার। নিজেদের পরিণামের জন্য তারা সকলেই অংশত দায়ী হলেও তাদের বেশির ভাগের জীবনের রূঢ়তম আঘাত যুদ্ধের সূত্রেই প্রাপ্ত। রণক্ষেত্রের সর্বাঙ্গীন উত্তেজনা ও উন্মাদনা, এদের জীবনেও সঞ্চারিত করে এক দুঃসহ অনিশ্চিত অস্থিরতা। রণস্পর্শে অনুভূতি গভীরতা লাভ করে, আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হয়, হতাশা হৃদয় বিদীর্ণ করে। রক্তাক্ত হয় মানুষের মন। যুদ্ধাবসানে পানিপথের প্রান্তরে অবশিষ্ট যে কয়টি মানব-মানবীর হৃদয়ের স্পন্দন অনুভব করি তাদের সকলের অন্তর রণক্ষেত্রের চেয়ে ভয়াবহরূপে বিধ্বস্ত ও ক্ষতবিক্ষত। প্রান্তরের চেয়ে এই রক্তাক্ত অন্তরই বর্তমান নাটক রচনায় আমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে।

১.৩ এর সঙ্গে একটা তত্ত্বগত দৃষ্টিও এই নাটকে প্রশ্রয় লাভ করেছে। সে হলো এ যুগের অন্যতম যুদ্ধবিরোধী চেতনা। যুদ্ধবিগ্রহে পরিপূর্ণ ঐতিহাসিক পটভূমিতে প্রেমের নাটক রচনা করতে গিয়ে আমিও হয়ত, একালের আরও অনেক নাট্যকারের মতোই সংগ্রাম নয় শান্তির বাণী প্রচারে যত্ন নিয়েছি। এটা হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আমি নাটকের বশ, ইতিহাসের দাস নই। নাটকে ইতিহাস উপলক্ষ মাত্র। তাকে আমি নির্বাচন করি এই জন্য যে তার মধ্যে আমার আধুনিক জীবন-চেতনার কোনো রূপক আভাসে হলেও কল্পনীয় বিবেচনা করেছি। এবং যেখানে কল্পনা বিঘ্ন অলঙ্ঘ্যনীয় মনে করেনি সেখানে অসংকোচে পুরনো বোতলে নতুন সুরা সরবরাহ করেছি। এই অর্থে রক্তাক্ত-প্রান্তরকে ঐতিহাসিক নাটক

না বললেও ক্ষতি নেই।

১.৪ কাহিনীর সারাংশ আমি কায়কোবাদের *মহাশ্মশান* কাব্য থেকে সংগ্রহ করি। *মহাশ্মশান* কাব্য বিপুলায়তন মহাকাব্য। তাতে অনেক ঘটনা, অনেক চরিত্র। আমি তা থেকে কয়েকটি মাত্র বেছে নিয়েছি। তবে নাটকে স্বভাব ও অন্তরের, আচরণ ও উক্তির বিশিষ্ট রূপায়ণে আমি অন্যের নিকট ঋণী নই। আমার নাটকের চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনা-সংস্থাপন ও সংলাপ নির্মাণের কৌশল আমার নিজস্ব। যে জীবনোপলব্ধিকে যে প্রক্রিয়ায় রক্তাক্ত-প্রান্তরে উজ্জ্বলতা দান করা হয়েছে তার রূপ ও প্রকৃতিও সর্বাংশে আধুনিক।

১.৫ এই নাটক রচনার জন্য আমি ১৯৬২ সালে বাংলা একাডেমির সাহিত্য পুরস্কার লাভ করি।

২.১ রক্তাক্ত-প্রান্তরে নায়ক নয় নায়িকাই প্রধান। জোহরা বেগমের হৃদয়ের রক্তক্ষরণেই নাটকের ট্রাজিক আবেদন সর্বাধিক গাঢ়তা লাভ করে। এই রমণীর দুই রূপ। এক রূপে সে রূপবতী ও প্রেমময়ী; অন্যরূপে সে বীরাঙ্গনা ও স্বজাতিসেবিকা। প্রতিকূল পরিবেশের নিপীড়নে এই দুই প্রবণতা তার হৃদয়ে কোনো শান্তিময় সামঞ্জস্য বিধানে সমর্থ হয়নি। জোহরা বেগম একবার প্রণয়াবেগে দিশাহারা হয়ে শত্রু শিবিরে ছুটে যায় দয়িতের সান্নিধ্য লাভের জন্য কিন্তু নিকটে এসে প্রণয়াবেগ অবদমিত রেখে ক্ষমাহীন আদর্শের বাণীকেই ব্যক্ত করে বেশি। স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করে ক্ষতাক্ত হৃদয়ে পরম প্রিয়তমের বিরুদ্ধেই উত্তোলিত অসি হস্তে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তবে সম্ভবত জোহরা বেগমের বীরাঙ্গনা মূর্তির অনেকখানিই তার ছদ্মবেশ, তার বিবেক বুদ্ধি শাসিত সিদ্ধান্তের প্রতিফল। কিন্তু এই রূপসজ্জা অন্তরের রমণী প্রাণকে প্রস্তরে পরিণত করতে পারেনি। পরিণামে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, এবং তা থেকে সহস্র ধারায় রক্ত উৎসারিত হয়ে পরিবেশ প্লাবিত করে।

২.২ ইব্রাহিম কার্দির হৃদয়ের আত্মক্ষয়ী দ্বন্দ্বের স্বরূপও একই প্রকৃতির। কৃতজ্ঞতাবোধের বিবেক তাঁকে তার প্রগাঢ় প্রেমানুভূতির বিপরীত পথে পরিচালিত করে। প্রথম থেকেই সে অনুভব করে যে এক মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণামের সঙ্গে তার ভাগ্য অবিচ্ছেদ্য সূত্রে বিজড়িত। তবে এও সত্য যে যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের কোনো ফলাফলই তার বিধিলিপি পরিবর্তিত করতে পারত না। তার নিজের বুদ্ধি-বিবেক ও হৃদয়বৃত্তিই পরিবেশের বিরুদ্ধ শক্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে আত্মবিনাশের সংঘটন অপ্রতিরোধ্য করে তোলে। প্রতিকূল নিয়তির নির্মম নির্দেশে সে নিপীড়িত হয়, অনিবার্যভাবে মর্মান্তিক পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে যায়, মৃত্যুবরণ করে।

২.৩ ইব্রাহিম কার্দির চেয়ে নাটকে হয়ত নবাব নজীবদ্দৌলার চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বল ও প্রদীপ্ত। প্রবল আবেগ সম্পন্ন এই আদর্শবাদী বীর জোহরা বেগমের রূপ ও শৌর্যে মুগ্ধ হয়। যদি জরিনা বেগমের পতি-সান্নিধ্য লাভের কামনা এত উদ্‌গ্র না হতো, সংকটের দিনেও যদি স্বামীকে তার কর্মময় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল নিজের বাহুপাশে আবদ্ধ রাখার জন্য জরিনা ব্যাকুলতা প্রকাশ না করত, যদি জরিনার নারীসুলভ সন্দেহপরায়ণতা বিষময় তীব্রতা ধারণ না করত, তা'হলে নবাব নিজের অন্তরের প্রচ্ছন্ন বাসনার আগুনে আরও দীর্ঘকাল পুড়ে মরলেও হয়ত যা অনুচিত তা প্রকাশ করত না।

২.৪ সুজাউদ্দৌলা এই নাটকের পথনির্দেশকারী দার্শনিক। ধীর, স্থির ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সুজাউদ্দৌলা সব সময়ে প্রকাশ না করলেও চারপাশের মানুষের মর্মস্থল পর্যন্ত স্পষ্ট দেখতে পায়, তাদের মনের ক্ষোভ ও ক্ষতের জন্য গভীর সহানুভূতি অনুভব করে এবং নিজের বাণীকে সরস দরদে ভরে তুলতে জানে। সুজাউদ্দৌলা যুদ্ধে যোগদান করে নিজের দায়িত্ব পালনের জন্য। অন্তরে সে জানে যে যুদ্ধ কোনো সমস্যারই সমাধান করে না; জানে যে সংগ্রামের চেয়ে শান্তি, বন্দিত্বের চেয়ে মুক্তি অনেক বড়।

২.৫ আতা খাঁ, দিলীপ, বশীর খাঁ এবং রহিম শেখ এই নাটকের কয়েকটি সাধারণ চরিত্র। এদের মধ্যে আতা খাঁ প্রধানত, বশীর অংশত রক্তাক্ত-প্রান্তরের বিষাদভারাক্রান্ত পরিবেশের মধ্যে মৃদু কৌতুক ও হাস্যরসের খোরাক যোগায়। দিলীপ দুর্বৃত্ত হলেও রঙ্গরসের আধার। তবে এদের কৌতুকের মাত্রা কখনও সীমা অতিক্রম করে নাটকের মূল সুরের সঙ্গে অসঙ্গতি সৃষ্টি করবে না। আতা খাঁর আচরণ স্থল বিশেষে কমিক মনে হলেও তার গুপ্তচরবৃত্তির সঙ্গে এমন একটা জাজ্বল্যমান বেদনা বিজড়িত যে তা সহজেই জোহরা বেগমের ছদ্মবেশ ধারণের প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রহরীর কৌতুকজনক আচরণও ভয়াবহতামুক্ত নয়।

৩.০ রক্তাক্ত-প্রান্তরের শেষ দৃশ্য সম্বন্ধে একটি কথা। নাটকে এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই যে রক্ষী রহিম শেখই আহত কার্দিকে হত্যা করে। কার্দির মৃত্যুর কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। একজন সাধারণ সৈনিকের প্রতিহিংসার কবলে পড়ে কার্দির মৃত্যু হয়, একথা ধরে নেয়ার চেয়ে, আহত বীর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুবরণ করে—কল্পনা করা শ্রেয়।

৪.০ নাট্যকারের পরিচালনাধীনে ১৯৬২ সালের ১৯শে ও ২০শে এপ্রিল, ঢাকার ইন্‌জিনিয়ারিং ইন্‌স্টিটিউটে *রক্তাক্ত প্রান্তর* প্রথম মঞ্চস্থ হয়। প্রথম রজনীর শিল্পীদের নাম ও ভূমিকার পরিচয় নিচে দেওয়া হলো।

জোহরা বেগম	:	ফিরদৌস আরা বেগম
জরিনা বেগম	:	লিলি চৌধুরী
হিরণ বালা	:	নূরুন্নাহার বেগম
ইব্রাহিম কার্দি	:	রামেন্দু মজুমদার
নবাব নজীবদ্দৌলা	:	নূর মোহাম্মদ মিঞা
নবাব সুজাউদ্দৌলা	:	কাওসর
আহমদ শাহ্ আব্‌দালী	:	মুনীর চৌধুরী
আতা খাঁ	:	রফিকুল ইসলাম
দিলীপ	:	আসকার ইবনে শাইখ
রহীম শেখ	:	এনায়েত পীর
বশীর খাঁ	:	দীন মোহাম্মদ

মুনীর চৌধুরী

চরিত্র

ইব্রাহিম কার্দি	:	বর্তমানে পেশবার সৈন্যাধ্যক্ষ
নবাব নজীবদ্দৌলা	:	রোহিলার নবাব
নবাব সুজাউদ্দৌলা	:	অযোধ্যার নবাব
আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী	:	কাবুলের অধিপতি
আতা খাঁ	:	গুপ্তচর, ছদ্মনাম অমর
দিলীপ	:	মারাঠা যুবক
বশির খাঁ রহিম শেখ	:	আবদালীর দেহরক্ষী ও প্রহরী
জোহরা বেগম	:	কার্দি-পত্নী, ছদ্মনাম মুন্নু বেগ
জরিনা বেগম	:	নজীবদ্দৌলার বেগম
হিরণবালা	:	মারাঠা যুবতী
কতিপয় সৈনিক ও প্রহরী		

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(বাগপথের মুসলিম শিবির)

[চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এখানে ওখানে দু'একটা লণ্ঠন বাতাসের ঝাপটায় দুলতে থাকে, দু'একটা মশালের উদ্গত শিখা কেঁপে ওঠে। অস্থির আলোর আভায় ছায়াবাজির মতো নজরে পড়ে পশ্চাতের সারি সারি তাঁবু। সামনে দু'জন সঙ্গিনধারী সাধারণ সৈনিক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। একবার ডান প্রান্ত থেকে বাম প্রান্তে আবার বাম প্রান্ত থেকে ডান প্রান্তে। দু'জনের মুখ দু'দিকে ঘোরানো। মাঝে মাঝে থামে, এক-আধটা কথা বলে, আবার টহল দিতে থাকে। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার সময়েও ওরা পারতপক্ষে একে অন্যের দিকে তাকায় না!]

১ম সৈনিক : (বাম প্রান্তে পৌঁছে থামবে। সজোরে নিজ গালে চড় মেরে) খুন পিয়ে পিয়ে ঢোল হয়েছেন, শালা ডাকু, বাঘ, ডালকুত্তা।

২য় সৈনিক : (ডান প্রান্ত থেকে) ঝুট বাত' মানুষকে খুন করে মানুষ। মানুষের রক্তে পিয়াস মেটায় মানুষ। জানোয়াব চাটে জানোয়ারেব রক্ত।

১ম সৈনিক : (ভ্রূক্ষেপ না করে) খাচ্ছে, খাচ্ছে। রক্ত খেয়েই চলেছে। সকালে সন্ধ্যায় রাতে এক লহ্মা বিরাম নেই। শরীরের চামড়া ফুটো করে নল ঢুকিয়ে, চোঁ-চোঁ-চোঁ করে কেবল রক্ত টেনে চলেছে। কিছুতেই যেন পিয়াস মেটে না। পেট ভরে না।

২য় সৈনিক : ভরতো, যদি রক্ত হতো।

১ম সৈনিক : অত অহঙ্কারের কথা বলো না রহিম খান। তুমিও যেমন মানুষ, আমিও তেমনি মানুষ। কেবল তোমার শরীরের মধ্যে দিয়ে রক্তের নহর বইছে আর আমাদের শরীরে কেবল পানির নালি, এমন নাহক কথা বলা তোমার উচিত নয়।

রহিম : সারাক্ষণ শুনছি তোমার জান পানি করে দিয়েছে হিন্দুস্থানের বাধা মশা। এদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করে দেখো, তোমার শরীর ফুটো করে ওরা কী পায়, খুন না পানি।

১ম সৈনিক : আলবত খুন। (শরীরের অন্যত্র চপেটাঘাত করে সেই হাত নিজের চোখের সামনে মেলে ধরে।) এই যে আরেক দজ্জালকে বধ করেছি। পেট ফেটে রক্ত ছিটকে বেরিয়েছে। আমার রক্ত লাল কি-না দেখে যাও এসে।

রহিম : লাল না নীল, সাদা না কালো, এই অন্ধকারে তা কী করে মালুম করবো?

১ম সৈনিক : তুমি আমায় ক্ষেপিও না রহিম খান। আমিও আহমদ শাহ্ দুররানীর দেহরক্ষী। হিন্দুস্থানে এসেছি মারাঠার থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে। আর

তুমি কি না বলছো আমার রক্ত সাদা না কালো, ঠাহর করা যায় না।

(মাঝ রঙ্গ-মঞ্চে দু'জন দুজনকে পেরিয়ে যাবার মুহূর্তে ১ম সৈনিক রহিম খানের মুখের সামনে হাত ঠেলে দেয়। রহিম খান এক নজর দেখে এগিয়ে চলে যায়।)

রহিম : যদি লাল হয়ে থাকে তবে ওটুকু তোমার রক্ত নয়। অন্য কোনোখানে যা পান করেছিল তার উচ্ছিষ্ট তোমার হাতের ওপর গড়িয়ে পড়েছে। হয়তো মারাঠা শিবিরের কারো রক্ত। ধুয়ে ফেলো। ভাল করে ধুয়ে ফেল গে।

১ম সৈনিক : তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে! কুঞ্জরপুরের লড়াইয়ে হেরে গিয়ে তোমার বুদ্ধি-বিবেচনা বেবাক লোপ পেয়েছে। এতদিনের পুরনো সৈনিক তুমি আর এত সহজে আজ মুষড়ে পড়েছো ? মারাঠাদের কাছে কুঞ্জরপুরের দুর্গ হারিয়েছি, তাতেই কি হিন্দুস্থানে মুসলমানের নাম মিটে গেল ?

রহিম : তার আগে উদয়গড়ে জিতেছিলো কারা ?

১ম সৈনিক : মারাঠারা। তবু ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে হপ্তার পর হপ্তা আমরা এই বিরান পাথরে তাঁবু গেড়ে পড়ে আছি। কোনো একটা উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই আছে।

রহিম : উদ্দেশ্য মশার বংশের পোষ্টাই যোগানো। রক্ত দিয়ে। পানি দিয়ে।

(দু'জনে নীরবে টহল দেয়)

রহিম : বশির খাঁ।

১ম সৈনিক : শুনতে পাচ্ছি। বলো।

রহিম : কুঞ্জরপুর দুর্গের দ্বাররক্ষায় তুমিও নিযুক্ত ছিলে ?

বশির : ছিলাম।

রহিম : দুশমনের আক্রমণের বিরুদ্ধে শির উঁচিয়ে তোমার পাশে আরো একজন নৌজোয়ান এসে দাঁড়িয়েছিলো ?

বশির : দাঁড়িয়েছিলো।

রহিম : লাল টকটকে চেহারা বাচ্চা ছেলের মতো কচি মুখ। কিন্তু কী তেজ, কী সাহস!

বশির : আমার মনে আছে।

রহিম : এখন কোথায় সে ?

বশির : নেই।

রহিম : তার রক্ত লাল ছিলো।

বশির : আমি দেখেছি। বন্দুকের গুলিটা এসে বিঁধেছিলো ঠিক বুকের মাঝখানে।

রহিম : আমার ছোট ভাই। আমার দিলের টুকরা। ওরা ওকে খুন করেছে।

বশির : আমরা তার বদলা নেবোই। মারাঠাদের মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তবে ঘরে ফিরব।

রহিম : আমি আর একজনের জন্য অপেক্ষা করবো।

বশির : কার জন্য ?

রহিম : ইব্রাহিম কার্দির জন্য। বেঈমান। মুসলমান হয়ে গোলামি করছে দস্যু পেশবার। কুঞ্জরপুর দুর্গ ওরা জয় করেছে ইব্রাহিম কার্দির রণকৌশলের জোরে। মারাঠা সৈন্যদের কামান-বন্দুক চালাতে শিখিয়েছে ইব্রাহিম কার্দি। আমার সোনা ভাইয়ের জীবনের খোয়াব তোপ দেগে উড়িয়ে দিয়েছে কার্দি। যদি সুযোগ পাই এই নাঙ্গা হাত দিয়ে ওর বুকের পাঁজর উপড়ে ফেলবো। চুমুক দিয়ে ওর বুকের রক্ত পান করবো। তারপর শান্ত হবো। তারপর ঘুমুতে যাবো।

(পিছনের তাঁবু থেকে কে যেন নিঃশব্দে বেরিয়ে আসে এবং অন্ধকারের অলক্ষে প্রহরীদের পেরিয়ে চলে যেতে উদ্যত হয়।)

বশির : কে ? কে যায় ? খবরদার, এক পা-ও এগুবে না আর।

রহিম : কে তুমি ? আমাদের দিকে মুখ ঘোরাও।

(দর্শকদের দিকে পেছন দিয়ে লোকটা প্রহরীদের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়াবে। বশির মশালটা একটু তুলে ধরে।)

বশির : একী! মন্নু বেগ ? এত রাত্রে শিবিরের বাইরে ?

রহিম : নিশ্চয়ই বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে। কিন্তু ছাড়পত্র না দেখালে আপনাকে এক পা-ও এগুতে দেবো না।

(মন্নু বেগ বস্ত্রাবরণ থেকে কী একটা বার করে দেখায়। ধাতব বর্ম, তরবারি কোষ, শিরস্ত্রাণ মশালের কম্পিত আলোতে ঝলমল করে ওঠে। উভয় প্রহরী কুর্ণিশ করে পথ ছেড়ে দেয়। মন্নু বেগ চলে যাবে। রহিম ও বশির আবার টহল দিতে থাকে। তবে দু'জনেই একটা বিশেষ জায়গায় এসে থামবে, দেখতে চেষ্টা করবে মন্নু বেগ কোথায় যায়, কী করে।)

রহিম : একেবারে ছেলেমানুষের মতো মুখখানা। এত কচি কিন্তু কী তেজ, কী সাহস! দেখলেই আরেকজনের কথা মনে পড়ে।

বশির : একেবারে বেশি কচি। বেশি টুকটুকে। চোখ মুখ ভুরু ঠোঁট সব একেবারে আওরতের বাড়া। আমি তো একবার তাকালে আর নজর ফেরাতে পারি না। মশালের আলোতে মুখখানা দেখে আমারই দিল পুড়ে যাচ্ছিল।

রহিম : আর বিউলির প্রান্তরে যারা মন্নু বেগকে লড়াই করতে দেখেছে তারাও ভুলতে পারবে না। যেসব মারাঠাদের মাথা তলোয়ারের এক এক খোঁচায় মন্নু বেগ মাটিতে লুটিয়ে দিয়েছে, তাদের মরা চোখও মন্নু বেগের রূপকে ভুলবে না।

বশির : কিন্তু মন্নু বেগ ওদিকে কোথায় যাচ্ছে ? বুকের পাটা তো কম নয়।

রহিম : কোন দিকে যাচ্ছে ?

বশির : ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে কুঞ্জরপুরের দুর্গের দিকেই ঘোড়া ছুটিয়েছে।

রহিম : কুঞ্জরপুরের দুর্গের দিকে ?

বশির : অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেছে। কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। মরুক গে।

আমাদের কী ? সেনাপতির পাঞ্জা যখন দেখিয়েছে তখন যেদিকে খুশি ও যাক।

রহিম : কুঞ্জপুরের দুর্গে কতো আলো জ্বলছে দেখছো ?

বশিব : খুব জোর উৎসব চলছে।

রহিম : রক্ত। মানুষের রক্ত মানুষে খায়। খেয়ে মাতাল হয়। মাতাল হয়ে উৎসবে মেতে ওঠে। আমার ভাইয়েব রক্ত ঢেলে প্রদীপ জ্বেলেছে। নইলে ওর আলো এতো লাল হবে কেন ?

বশির : যাক, চলে এসো। ও-সব দেখে কাজ নেই। উহ্ কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! মশালগুলো আর একটু উস্কে দিলে হতো না ?

রহিম : না। হুকুম নেই।

বশির : তা থাকবে কেন ? আলো জ্বলবে কেবল কুঞ্জরপুরের দুর্গে। এখানে শুধু অন্ধকার। আঁধারের মধ্যে চুপ মেরে বসে থাকা আর ভালো লাগে না।

রহিম : আমি তো বরাবরই তাই চেয়েছি। হয় এস্পার না হয় ওস্পার। কিন্তু এই এন্তেজারী ভালো লাগে না।

বশির : আজকের অন্ধকারটা দেখেছো, কী মিশমিশে কালো! মশালের আলোতে নিজের ছায়াটা দাপাদাপি করে, দেখে বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। মনে হয় যেন ভোজালি হাতে কোনো মারাঠা ডাকাত সড়াৎ করে শিবিরেব মধ্যে ঢুকে পড়লো।

রহিম : বেটারা বজ্জাতের হাড়ি। ওদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। (হঠাৎ হাঁক দিয়ে ওঠে) হুঁশিয়ার! তুমি কে ?

বশিব : কে ? কোথায ? কাকে বলছো ?

রহিম : মনে হলো আমাদের পেছন দিক থেকে একটা লোক এগিয়ে আসছিলো। আমি ভালো করে দেখবার আগেই ঐ তাঁবুটার আড়ালে লুকিয়ে গেলো।

বশির : ওহ্। তাই বলো। নিশ্চয়ই আপ্না লোক হবে। কোনো কাজে এক তাঁবু থেকে বেরিয়ে অন্য তাঁবুতে ঢুকেছে।

রহিম : যেভাবে এগিয়ে আসছিলো তাতে সে-রকম মনে হয়নি।

বশিব : তুমিও যেমন! যা নয় তাই ভাবো।

রহিম : লোকটার পরনের পোশাক আমাদের মতো নয়।

বশির : কাদের মতো ?

রহিম : মারাঠা।

বশির : অসম্ভব। একলা আমাদের শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এত বড় বুকের পাটা! বিশ্বাস করি না!

রহিম : হয়তো একলা নয়।

বশির : মানে ?

রহিম : আমি দেখেছি শুধু একটাকে। হয়তো সঙ্গে আরো অনেক আছে, তাঁবুর আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ঘোরাফেরা করছে সুযোগের সন্ধানে। যতোবার

তোমার ছায়া দুলে উঠেছে হয়তো ততোবারই একজন করে কালো মারাঠা আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে শিবিরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

বশির : এখন কী করবো ?

রহিম : টহল দিতে থাকো। এক জায়গায় খুঁটি গেড়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। ভাব দেখিও যেন কিছুই লক্ষ করোনি। পিছনের দিকে বারবার তাকিও না। ডাইনে-বাঁয়ে সামনে দূরে চাবিদিকে নজর ছড়িয়ে দাও। যেন কিছু হয়নি।

বশির : হয়নি। কেন হবে। হতে পাবে না। কুছ পরোয়া নেই। নিশ্চয়ই কিছু হয়নি। (আচমকা প্রবলবেগে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েই লাফিয়ে পড়ে পেছনের অন্ধকারে গাপটি মেরে যে লোকটা সন্তর্পণে এগিয়ে আসছিল তাব ওপর।) পাকড়েছি বহিম ভাই। বল্, বল্ কে তুই ? (রহিম শেখ মশালের আলো উঁচু করে ধবে) তাই তো! এ দেখছি মারাঠা সৈনিক !

(রহিম খান অন্য হাতে তলোয়ারটা খুলে ধরে)

বহিম : তুমি ছেড়ে দাও আমি কথা বলছি।

মারাঠা : (বশিরকে) না ভাই। তুমি ছেড়ো না আমাকে। দোহাই তোমার ছেড়ে দিও না। জাপটে ধরে রাখো।

বহিম : একে ছেড়ে দাও, বশির।

বশিব : ছাড়তে পারছি না যে। আঁকড়ে ধবে রেখেছে।

মারাঠা : কিছুতেই ছাড়বে না আমাকে। তোমার সঙ্গীটি বড় সুবিধের লোক নয়। আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

বহিম : তুমি কে ?

মাবাঠা : আলাপ করতে চাও করো। কিন্তু তাব জন্যে নাঙ্গা তলোযার মুঠ করে ধরবে কেন ? গলাটা যদি কেটে ফেলো তাহলে স্বর বেরুবে কোথা দিয়ে ?

রহিম : তুমি বেশি কথা বলো।

মারাঠা : তুমি বলতে বললে, তাই বললাম। নইলে তো আমি কিছু না বলেই চলে যাচ্ছিলাম।

বশির : কোথায় যাচ্ছিলে ?

মারাঠা : কাজে।

বশির : কী কাজে ?

মারাঠা : গুপ্তচরের কাজে।

বশির : ফের মিছে কথা বলেছো তো এক কোপে দু' টুকবো করে ফেলবো।

মারাঠা : তাতে কী ফায়দা হবে ? আমাব মধ্যে যা গুপ্ত আছে সে কি আমাকে কেটে দুফাঁক করলেই বেরিয়ে পড়বে? তলোয়ারটা খাপের মধ্যে ভবে রাখো। যা বলতে হয় জিব নেড়ে বলো।

রহিম : এত রাতে কী করতে বেরিয়েছো ?

মারাঠা : গুপ্তচর কি দিনের বেলায় বেরুবে ?

রহিম : বজ্জাতি রাখো। তুমি গুপ্তচরের কাজে আমাদের শিবিরে ঢুকেছো মারাঠা

সৈনিকদের পোশাক পরে, ভাঁওতা দেয়ার আর জায়গা পেলে না!

মারাঠা : মিয়া সাহেবের মাথা একটু গরম হয়ে গেছে, তাই সোজা কথাটা বুঝতে পারছে না। আমি তোমাদের শিবিরে ঢুকিনি। তোমাদের শিবির থেকে বার হয়ে যাচ্ছিলাম।

বশির : সে গুড়ে বালি। সবুর কর। কী দশা করি দেখবে।

মারাঠা : আর আমার পরনে মারাঠা পোশাক, কারণ আমি মারাঠা শিবিরে ঢুকবো পণ করে বেরিয়েছি। আমি তোমাদের গুপ্তচর। চলেছি ওদের খোঁজ নিতে। তোমাব ঐ ঝোলা দাড়ি আর খাড়া পাগড়ি লাগিয়ে রওনা হলে মাঝ পথেই অক্কা পেতে হতো।

বশির : তুমি আমাদের গুপ্তচর?

মারাঠা : জি। আসল নাম আতা খাঁ। এখন অমরেন্দ্রনাথ বাপ্‌পাজী।

বহিম : প্রমাণ কী?

আতা খাঁ : একটু সরে দাঁড়াও। খুঁজে বার করছি।

(বস্ত্রাবরণ থেকে কী একটা বার করে দেখে, আবার তাড়াতাড়ি সবিয়ে রাখে।)

বশির : ওটা কি সরিয়ে রাখলে দেখতে দাও।

আতা খাঁ : গুপ্তচর তার সব কিছু দেখাতে বাধ্য নয়। তোমাদের যাতে প্রয়োজন শুধু তাই দেখতে পাবে। নাও, এই দেখো। ভালো করে দেখো। সেনাপতির নিজ হাতে স্বাক্ষরযুক্ত ছাড়পত্র। কি, কিছু বলবার আছে?

রহিম : (মশালের আঁলোতে উল্‌টে পাল্‌টে পাঞ্জাখানা দেখে) ঠিক আছে। আপনাকে খামাখা তকলিফ দিলাম। আপনি যে দিকে খুশি যেতে পারেন।

(বশিব ও রহিম আবার টহল দিতে শুরু করে।)

আতা খাঁ : যে দিকে খুশি। কিন্তু খুশি মতো চলে কি শেষে আরো কঠিন মুসিবতের মধ্যে পড়বো। দরকার নেই বাবা। তার চেয়ে যে পথে অন্যেবা চলে সে পথ দিয়ে এগুনোই ভাল। তা, সেপাই বাবাজিরা, একটু রাস্তা বাতলে দাও না। মানে মানে সরে পড়ি।

রহিম : আপনার কাজ, আপনার পথ। আমরা তার হদিস রাখি না।

আতা খাঁ : একদম না।

রহিম : না।

আতা খাঁ : বড় ঈমানদার সেপাই দেখছি। সেনাপতি আহ্‌মদ শাহ্ দুররানীর খোশ নসিবের অন্ত নেই।

বশির : নিজেদের শিবিরে সকল পথের সন্ধান ভাল করে রাখি। কিন্তু শিবিরের বাইরের অন্ধকারে কোন পথ কাকে কোথায় নিয়ে যায় তার ধার ধারি না।

আতা খাঁ : নিজে না রাখলে। কিন্তু অন্য, যারা সে পথে আনাগোনা করে তাদের সংবাদও কি রাখো না? চুপ করে রইলে যে?

বশির : একটু আগে আরেকজনকে দেখেছিলাম।

আতা খাঁ : কচি মুখ টুকটুকে চেহারা। বিউলীর বীর সৈনিক। মনু বেগ। কোন দিকে গেছে?

রহিম : ঐ দক্ষিণের প্রান্তরে পড়ে নদীর পাড় থেকে সরে গেছে। তারপর মনে হলো ঘোড়া ছুটিয়েছে ঐ উত্তর-পশ্চিম কোণে। তারপর তাকিয়ে থেকে কুঞ্জরপুরের প্রদীপগুলোকে জ্বলতে দেখেছি। কোনো মানুষের আকার আর দেখতে পাইনি।

আতা খাঁ : খোদা হাফেজ! আমি চললাম। ঐ পথেই, আমারও কিছু কাজ আছে।

[তড়িৎ গতিতে অদৃশ্য হয়ে যায়। প্রহরী দু'জন টহল দিতে থাকে]

রহিম : কেউ অপেক্ষা করে না। আসে আর চলে যায়। কোথায় যায়? কুঞ্জরপুর দুর্গে। কেন? জানবার জো নেই।

বশির : আমরা শুধু এন্তেজার করবো। শুধু টহল দিয়ে বেড়াবো ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। আমরা হচ্ছি পাহারাদার। ঠুলিপরা কলুর বলদ। ঘুরবো আর ঘুরবো। মাঝে মাঝে হেঁকে উঠবো—খবরদার! কোন হ্যায়? তারপর সালাম ঠুকে বলবো, ঠিক হ্যায়। আবার টহল দিয়ে বেড়াবো। ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডাইনে। বৃষ্টিতে ভিজবো, রোদে পুড়ে মরবো, অন্ধকারে ডুবে যাবো— তবু টহল দেবো, টহল দেবো—

(থমকে গালে ঠাস করে চাপড় মারে) শালা ডাকু, খুনেরা! খুন পিয়ে পিয়ে ঢোল হয়েছেন। এবার মজা বোঝ!

[আস্তে আস্তে পর্দা পড়বে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

(স্থান : কুঞ্জরপুর দুর্গ)

[নেপথ্যে উৎসবমুখর রাত্রির উতরোল কোলাহল, নানা গীত ও নৃত্যের আনুষঙ্গিক বিবিধ বাদ্য যন্ত্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাস। ইব্রাহিম কার্দির কক্ষ। ঝালর-কাটা মখমলের পশ্চাৎপটে একই মহিলার দুটো তৈলচিত্র। দু'টোরই পাদদেশে ফুলের স্তূপ এবং তার পাশে একটি করে প্রদীপ জ্বলছে। ইব্রাহিম প্রবেশ করতেই পেছনের কোলাহল ও নৃত্যগীত ধ্বনি মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে আসবে।]

কার্দি (চিত্রের দিকে তাকিয়ে) একী! তোমাকে অনাবৃত করেছে কে? জোহরা! জোহরা! এই প্রদীপ, এই ফুল, এ কাব দান? এ তুমি কোথায় পেলে? কেন এসেছো? কে তোমাকে আসতে বলেছে? দীপশিখায় রক্তাক্ত হয়ে সর্বাঙ্গে ফুলের সৌরভ মেখে তুমি বিজয়িনীর হাসি হাসছ। বীণার তারের ওপর তোমার নরম লকলকে আঙুলের নৃত্য, তোমায় বজ্রমুষ্টি-ধৃত নিষ্কোষিত তরবারি—ঐ মধুর হাসির অন্তরালে গর্বকে, দর্পকে আত্মবিকারকে একটুও আড়াল করে রাখতে পারোনি। কিন্তু ভুল করেছো

জোহবা বেগম। মর্মান্তিক ভুল করেছো। আজকের এই দশোরার উৎসবে প্রমত্ত উল্লাসে মেতে আমার এই নির্জন ঘরে তোমার ঐ ছবির আবরণকে যে উন্মোচিত করেছে সে আমি নই। দুর্বল আবেগের বিহ্বলতায় যে চঞ্চল-চিত্ত তোমার চিত্রের পাদমূলে ফুলের স্তূপ রচনা করে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বেলেছে তার নাম ইব্রাহিম কার্দি নয়। বড় ভুল করেছো জোহরা বেগম। বড় ভুল করেছো তুমি। যদি পারো তবে চিত্র থেকে ঐ হাসি উপড়ে ফেলো। আজকে আমি জয়ী, তুমি নও। দর্পের কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়বার অধিকার আজ আমার। তোমার নয়। তুমি আজ সত্যি পরাজিত, বিস্মৃত, বিসর্জিত। একবার সমস্ত দুর্গটা ঘুরে এসো। দেখবে সকল অন্ধকার বিদীর্ণ করে সহস্র আলোর রশ্মি শুধু একটা সত্যই ঘোষণা করছে—ইব্রাহিম কার্দি বেঈমান নয, অকৃতজ্ঞ নয়। ইব্রাহিম কার্দি অঙ্গনার কণ্ঠলগ্ন হয়ে কর্তব্যপরায়ণতাকে পরিহার করেনি। ইব্রাহিম কার্দি রণকুশলী সত্যনিষ্ঠ বীর সৈনিক। এক ফুৎকারে নিবিয়ে দেই তোমার এই প্রদীপের আলো? দু'হাতে কচলে তছনছ করে ছড়িয়ে দেই এই ফুলের স্তূপগুলো?

(হাতে একটি থালা, তাতে কিছু ফুল ও একটা প্রদীপ জ্বলছে, নিঃশব্দে ঘরে এসে ঢুকেছে এক মারাঠা তরুণী)

তরুণী : না, তা তুমি পারো না ভাই। এ প্রদীপ আমি জ্বেলেছি। ঐ ফুল আমি কুড়িয়ে এনেছি।

(কার্দি ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ হয়ে থাকে। দু'হাতে কপাল বগড়ায়।)

কার্দি : (তরুণীর দিকে চোখ না ঘুবিয়েই) এ-কাজ তুমি কেন করতে গেলে?

তরুণী : আমি তোমার বোন, সেই জন্যে।

কার্দি : কিন্তু তবু তুমি হিন্দু, মারাঠি মেয়ে। আমি মুসলমান, পাঠান। আমার বেদনা তুমি বুঝবে কী করে?

তরুণী : বোন বলে ডেকেছো, তাই কিছু বুঝি। বাকিটুকু বুঝতে পারি, কারণ আমি মেয়ে।

কার্দি : আজ এই ছবি কেন তুমি এমন করে অনাবৃত করলে?

তরুণী : যে থাকলে এই উৎসবের রাত তোমার জন্য মহোৎসবে পরিণত হতে পারতো, তাকে চুপে চুপে ডেকে আনতে চেয়েছিলাম।

কার্দি : যাকে আমি চাইনে, তাকে তুমি ডাকতে গেলে কেন? দেয়ালের গায়ে কালো পর্দা দিয়ে, এই ছবি আমি ঢেকে রেখে দিয়েছিলাম।

তরুণী : কালো পর্দা না ছাই। ঐ রূপের আগুন অত সহজে ঢাকা পড়ে?

কার্দি : তুমি সব কথা জানো না।

তরুণী : কী জানি না?

কার্দি : সাধারণ সৈনিকের কাজ করেছি ফরাসিদের সৈন্যবাহিনীতে। আধুনিক রণবিদ্যা তারাই আমাকে শিখিয়েছে। যৌবনে চাকরির সন্ধানে সকল

জাতের শিবিরেই হানা দিয়েছি। উপযুক্ত মর্যাদা দিয়ে কেউ নিযুক্ত করতে চায়নি। সেদিন সসম্মানে সৈন্যাধ্যক্ষের পদে যোগদান করবাব জন্য যিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানান, তিনি হলেন মারাঠিধিপতি পেশবা। তারপর এই পানিপথের প্রান্তরে শুরু হয়েছে হিন্দুস্থানের মুসলিম শক্তির সঙ্গে মারাঠার সংঘর্ষ। মুসলিম শক্তির জয় হোক আমিও মনেপ্রাণে কামনা কবি। কিন্তু যারা আমার আশ্রয়দাতা পালন-কর্তা, আমার রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত ঢেলে তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য লড়াই করে যাবো। জোহরা বেগম মানতে চায়নি।

তরুণী : কী বলেছে ?

কার্দি : বলেছে, মেহ্‌দী বেগ তাব কন্যার জন্য লাহোরে যে সম্পত্তি রেখে গেছে জামাতা হিসেবে তার উপর আমার অধিকার নাকি ষোল আনা। মারাঠাদের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে, নিজের পত্নীর সম্পত্তিকে নিজ সম্পদ বিবেচনা করে তার সাহায্যে কোনো স্বাধীন জীবন নির্বাহ করি।

তরুণী : কেন করলে না ?

কার্দি : তুমি মেয়ে, তাই সে কথা তোমাকে বোঝাতে পারবো না।

তরুণী : আমাকে না হয় না পারলে। কিন্তু যাকে ভালোবাসো, তাকেও বোঝাতে পারলে না? অমন ভালোবাসার নাম মুখে এনো না।

কার্দি : মেহ্‌দী বেগেব কন্যা ভালোবাসার মূল্য বোঝে না। আমাকে ধিক্কার দিয়ে বলে উঠেছে, আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক, স্বধর্মদ্রোহী, পরান্ন-ভোগী, হীনচেতা, কাপুরুষ।

তরুণী : অন্তরে অমৃত না থাকলে মুখ দিয়ে এত গরল উগরে দিতে পারতো না।

কার্দি : গৃহত্যাগ করে যাবাব সময় বলে গেছে, আমাব সান্নিধ্য তার কাছে অসহ্য। আমার পাপের কলঙ্ক সে স্বতন্ত্র জীবনে নিজের কর্মের দ্বারা ঢেকে রাখতে চেষ্টা করবে, তাকে মুছে ফেলতে উদ্যোগী হবে। উহ্ চোখে মুখে সে কী দুঃসহ ঘৃণাব বহ্নিশিখা! তাব তুলনায় আমার আজকের ক্ষোভ আর ঘৃণা নিতান্ত তুচ্ছ বস্তু। তুমি হাসছো ?

তরুণী : বাঃ, তুমি এত কাণ্ড করতে পারবে আর আমি হাসতে পারবো না ?

কার্দি : তোমার সব রহস্য আমি বুঝি না, হিরণ বালা। আমার কোন কাণ্ড দেখে হাসলে ?

হিরণ : তোমার ঘৃণার বহর দেখে। তোমরা পুরুষবা বড় প্রবঞ্চক, অন্যের সঙ্গে তো করোই, নিজেকেও প্রবঞ্চনা করো। যদি মনে এতই ঘৃণা জমে উঠেছিল তবে সেদিনই তুমি তাকে চিরতবে বিদায় করে দিলে না কেন ?

কার্দি : তাই দিয়েছি।

হিরণ : মিছে কথা। তাহলে মারাঠা শিবিরে অবাধে প্রবেশ করবার (থালার ওপরের পুষ্পগুচ্ছের নিচ থেকে বার করতে করতে) এই মহামূল্য ছাড়পত্র তাকে কেন দিয়েছিলে ? কীসের আশায় ?

কার্দি : একী ? (ছাড়পত্রটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে) এ ছাড়পত্র তুমি কোথায় পেলে ? কে ? কে এসেছে এই ছাড়পত্র নিয়ে ? কোথায় ? সে কোথায় ?

হিরণ : কী ঘৃণা!

কার্দি : এ ছাড়পত্র তুমি কোথায় পেলে ?

হিরণ : এক নওজোয়ান পাঠান সৈনিকের কাছে।

কার্দি : অসম্ভব। কোথায় সে ?

হিরণ : আমার ঘরে।

কার্দি : তোমার ঘরে ?

হিরণ : কেন নয় ? তোমার ঘরে গুপ্তচর এসেছে। আমি তাকে আশ্রয় না দিলে এই মারাঠা শিবিরে তাকে রক্ষা করবে কে ?

কার্দি : ওহ্! কী চায় সে ?

হিবণ : তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায় সে।

কার্দি : হুম। জোহরা বেগম দূত পাঠিয়েছে। স্বচক্ষে দেখে যেতে এসেছে, ইব্রাহিম কার্দির দ্বিখণ্ডিত হৃৎপিণ্ডে এখনও কোনো স্পন্দন আছে কিনা। পাঠিয়ে দাও তাকে। দেখে যাক কার্দির জয়, কার্দির উল্লাস।

হিরণ : যাচ্ছি। সে হয়তো এখনো ছদ্মবেশ পরিবর্তন করছে। শেষ হলেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেবো।

(প্রস্থান)

(কার্দি ধীরে ধীরে দেয়ালের তৈলচিত্রের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। হাত পেছনে মুঠ করা। চোখ চিত্রে স্থির নিবদ্ধ। পেছন থেকে সন্তর্পণে ঘরে প্রবেশ করে মারাঠা-বেশি অমরেন্দ্রনাথ। কার্দির কাছে এগিয়ে আসে। কার্দি টের পায় না। অমর চিত্র দেখে চমকে ওঠে। একবার একটা আরেকবার অন্যটা দেখে। ভাবে। কী যেন সিদ্ধান্ত করে। দূরে সরে দাঁড়ায়। গলা খাক্‌রী দিয়ে কার্দির মনোযোগ আকর্ষণ করে।)

কার্দি : কী চাও তুমি, আমার কাছে কেন এসেছো ?

অমর : জি ?

কার্দি : এটা শত্রু শিবির। বিলম্ব না করে তোমার বক্তব্য পেশ করো। (ঘুরে) একী! তুমি ? অমরেন্দ্র ? তুমি গুপ্তচর ?

অমর : এ্যাঁ ? গুপ্তচর, ছিঃ ছিঃ! এ আপনি কী বলছেন ? আমি অমরেন্দ্রনাথ বাপ্‌পাজী, মারাঠা সৈনিক। আপনার অনুগত দাস। গুপ্তচর হতে যাব কেন ?

কার্দি : তোমাকে কে পাঠিয়েছে ?

অমর : আমাকে ?

কার্দি : মুসলিম শিবির থেকে এইমাত্র যে এসেছে সে তুমি নও ?

অমর : মুসলিম শিবির থেকে কে, কে এসেছে ?

কার্দি : ওহ্। আমি ভুল করেছি। হিরণ তা হলে তোমার কথা বলেনি।

অমর : হিরণ ? কী বলেছে সে ? কিছু বলবার জন্য আমিও তো তাকে খুঁজছি।

কার্দি : আমারই ভুল হয়েছে।

অমর : এ ছবি দুটো কার ?

কার্দি : তুমি চিনবে না।

অমর : দু'টো ছবি একই মহিলার ?

কার্দি : হ্যাঁ।

অমর : এই ছবিটা এত কোমল, আর এটা এত কঠিন যে, না বলে দিলে কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে একই রমণীর চিত্র।

কার্দি : তোমার বোঝার কথা নয়।

অমর : এই শেষের ছবিটার কথা বলছি জনাব। অশ্বপৃষ্ঠে আসীন, কোষমুক্ত তরবারি হাতে রমণীরূপের এই বীরাঙ্গনা মূর্তি মারাঠা শিবিরে কখনো দেখিনি, জনাব।

কার্দি : তুমি বাচাল। হিরণবালাকে খুঁজছিলে, খোঁজ গিয়ে।

অমর : তার ঘর দেখলাম ভিতর থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি করলাম, কেউ সাড়া দিল না।

কার্দি : আবার ডাকো গিয়ে। যাও।

অমর : জি, জি।

(ছবি দুটো দেখতে দেখতে প্রস্থান)

(নির্জন ঘরে কার্দি আবার চিত্রের কাছে এগিয়ে যায়। হাতেব ধাক্কা দিয়ে ফুলগুলো ফেলে দেয়। ফুৎকারে প্রদীপ নিভিয়ে দেয়। তারপর ছবি দুটোর ওপর টেনে দেয় একটি কালো পর্দা। এমনি সময় ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করলো জোহরা বেগম।)

জোহরা : আমি এসেছি।

কার্দি : কে! জোহরা! তুমি, জোহরা, জোহরা!!

জোহরা : আমি ফিরে এসেছি।

কার্দি : তুমি এসেছো, জোহরা। আমি জানতাম তুমি আসবে। আমার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হতে পারে না।

জোহরা : আমিও জানতাম, আমি আসবো।

কার্দি : কতদিন তোমাকে দেখিনি। তৃষ্ণায় দু'চোখ আমাব পুড়ে খাক হয়ে গেছে। কতকাল তোমার এই রূপ আমি দেখিনি। অশ্বপৃষ্ঠে নয়, মাটির ওপরে দাঁড়িয়ে তুমি। রক্তাক্ত তরবারি নয়, হাতে তোমার মেহদি পাতার রং। ঐ আনত মুখ, ঐ নিমিলিত চোখ—এত রূপ তোমার, একবার মুখ তুলে তাকাও আমার দিকে।

জোহরা : তুমি এতো ভালোবাসো আমাকে!

কার্দি : আরো পরীক্ষা করে দেখতে চাও ?

জোহরা : আমি পরীক্ষা করতে আসিনি, গ্রহণ করতে এসেছি।

কার্দি : আমি তো কবে থেকেই দেউলিয়া। দান করবো কোত্থেকে ?

জোহরা : সে আমি শুনবো না। আমার পাওনা আমি আদায় করবোই।

কার্দি : যুদ্ধ-শিবিরের অনিয়ম এবং শ্রম তোমাকে এতটুকু স্পর্শ করতে পারেনি। তোমার চোখে সেই আগের জ্যোতি, গায়ের রঙে সেই আলোর ঝলকানি, সারা শরীরে তোমার রূপের সেই মাতামাতি। তোমার শরীর আগের চেয়ে ভালো হয়েছে, জোহরা।

জোহরা : পোড়া শরীর। মনের মানা মানে না।

কার্দি : পথে কোনো কষ্ট হয়নি তো।

জোহরা : মুসলিম শিবির থেকে বেরিয়েছি পাঠান সৈনিকের বেশে। এখানে এসে ভর করেছি হিরণবালার ওপর। বাকিটুকু তুমি জানো।

কার্দি : তোমার হাতে যেদিন প্রথম তলোয়ার তুলে দিয়ে বলেছিলাম, 'আঘাত করো' সেদিন কী কামনা করেছিলাম জানো ?

জোহরা : জানি। তুমি আমার নারীত্বকে পূর্ণতা দান করতে চেয়েছিলে। তুমি স্বামীর উপযুক্ত কাজ করেছিলে। আমি অযোগ্যা তাই তার মান রাখতে পারিনি।

কার্দি : ভেবেছিলাম তোমার রূপের ঐশ্বর্যের সঙ্গে যদি শক্তির সুশিক্ষা যুক্ত হয় তাহলে তুমি সত্যি বাদশার বাদশা বনে যাবে। ক্ষমতাও তোমার ছিল। মাস না পেরোতে অসি চালনায় ওস্তাদকে হার মানালে। অশ্বারোহণের কৌশলে আর ক্ষিপ্রতায় তুমি আমাকে স্তম্ভিত করে দিলে। তারপর একদিন এই নব সত্তার জয়ধ্বজা উড়িয়ে আমাকে সত্যি আঘাত করলে, আমাকে ত্যাগ করলে। আমার বুকে মুখে মাটি চাপা দিয়ে চলে গেলে।

জোহরা : এ অভিযোগ সত্য নয়। তুমি জানো আমাদের দু'টুকরো করে আলাদা করেছে কোন শক্তি। কেন তুমি মুসলিম শিবিরে নও, কেন মারাঠা শিবিরে ?

কার্দি : মিছে কথা। যদি সেটাই সবচেয়ে বড় সত্য হতো তাহলে আজ কী করে তা মিথ্যা হয়ে গেল ? আজ কী করে তুমি সকল দ্বন্দ্ব সংশয় চূর্ণ করে এই গভীর রাতে, মারাঠা শিবিরে আমার ঘরে ছুটে এলে ?

জোহরা : তোমাকে নিয়ে যেতে।

(কার্দি হেসে ওঠে)

কার্দি : তুমি উন্মাদিনী। তুমি রমণী এবং উন্মাদিনী। তোমার সঙ্গে সঙ্গত ও শোভন আচরণ করা নিরর্থক।

জোহরা : কী বলতে চাও তুমি ?

কার্দি : অপেক্ষা করো। পুরুষের পরাক্রম হৃদয়হীনা নারীর দম্ভকে কী করে পরাভূত করে এখনি প্রত্যক্ষ করবে। আমি জোর করে তোমাকে শিবিরে

আটকে রাখবো। (একটা ঘণ্টায় মৃদু আঘাত করে) একবার ভুল করেছি বলে কি বারবার সেই একই ভুল করতে হবে? রাত্রি শেষ হবার আগেই কুঞ্জরপুর দুর্গের এই দশোহারার উৎসব তোমার আমার পুনর্মিলনের সোহাগে কলকল করে হেসে উঠবে। কোনো পাঠান সৈনিক বা রমণী যেন আজ রাতে এই মারাঠা শিবির ত্যাগ করতে না পারে তার পাকা ব্যবস্থা করে রাখবো।

জোহরা : শক্তির যে সুশিক্ষা তোমার কাছ থেকে লাভ করেছি তার ক্ষমতাকে অত অবহেলা করো না। জোহরা বেগমকে জীবন্ত আটক রাখবে এমন শক্তি তোমার প্রহরীর নেই। রাত্রি শেষ হবার আগেই দেখবে হয় তোমার প্রহরী, নয় তোমার পত্নীর রক্তে তোমার মারাঠা শিবির রঞ্জিত।

কার্দি : জোহরা!

জোহরা : আড়াল থেকে তোমার প্রহরীকে চলে যেতে বলো।

(কার্দি ঘণ্টায মৃদুভাবে দুটো আঘাত করে।)

কার্দি : কেউ নেই।

জোহরা : তুমি জানো কুঞ্জরপুর দুর্গকে আমরা দিল্লি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। তোমাদেব শিবিরে রসদ প্রবেশের সকল রাস্তা আহমদ শাহ্ দুররানীর চরেরা পাহারা দিচ্ছে। কুঞ্জরপুর থেকে নড়ে বড়জোব তোমরা পানিপথ পর্যন্ত এগুতে পারবে। কিন্তু তারপর আর নয়। সমস্ত হিন্দুস্থানের মুসলমান বাগপথে সম্মিলিত হয়ে অপেক্ষা করছে। যমুনার পানি তাদের রক্তে লাল হয়ে যাবে, কিন্তু হিন্দু মারাঠাকে উচিত শিক্ষা না দিয়ে তারা কেউ জীবন্ত ফিরে যাবে না।

কার্দি : আমি জানি।

জোহরা : আর একদিন কি দু'দিন। তারপরই সে ঘোর সময় শুরু হবে। তুমি ফিরে এসো। আমার সঙ্গে ফিরে চলো।

কার্দি : যে ফিরে যাবে সে আমি হবো না। সে হবে বিশ্বাসঘাতক। সে হবে ইব্রাহিম কার্দির লাশ। তাকে দিয়ে তুমি কী করবে? তুমি কাঁদছো! ভারতে মুসলিম শক্তি জয়যুক্ত হোক, তার পূর্ব গৌরব সে ফিরে পাক—বিশ্বাস করো এ কামনা আমার মনে অহরহ জ্বলছে। কিন্তু ভাগ্য আমাকে প্রতারিত করেছে। সে গৌরবে অংশগ্রহণের অধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছে। আমার সংকটের দিনে যারা আমাকে আশ্রয় দিয়েছে, কর্মে নিযুক্ত করেছে, ঐশ্বর্য দান করেছে সে মারাঠাদের বিপদের দিনে আমি চুপ করে বসে থাকবো? পদত্যাগ করবো? দলত্যাগ করব? সে হয় না, জোহরা। আমি নিশ্চিত জানি, জয়-পরাজয় যাই আসুক, মৃত্যু ভিন্ন আমার মুক্তির অন্য কোনো পথ নেই। এ সময়ে তুমি আমার কাছ থেকে চলে যেও না, জোহরা। চারিদিক বড় অন্ধকার। মাঝে মাঝে রক্তের লাল ছোপ মাখানো। বাদবাকি সব কালো-কালো-ঘোর অন্ধকার! জোহরা, আমাকে শক্ত করে ধরে রাখো। যখন অন্ধকারে শ্বাসরোধ হয়ে আসবে তখন যেন

অনুভব করতে পারি তোমার মেহদিপরা হাত আমার রক্তহীন দেহ আঁকড়ে ধরে রেখেছে। জোহরা!

জোহরা : আমাকে ক্ষমা করো! ক্ষমা করো! এই মারাঠা শিবিরে তোমাকে আমি স্পর্শ করতে পারবো না। আমি মেহ্দী বেগের কন্যা। মারাঠা দস্যুরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে। এই শিবিরে তোমার আমার মাঝখানে আমার পিতার লাশ শুয়ে আছে। আমি তোমার কাছে এগুবো কী করে? তোমার হাতে হাত রাখবো কী করে? আমাকে ক্ষমা করো।

কার্দি : জোহরা!

জোহরা : আমাকে আর ডেকো না। আমি যাই।

(যাবার জন্যে পা বাড়ায়)

কার্দি : জোহরা। একটা কথা শুনে যাও।

জোহরা : বলো।

কার্দি : হয়তো ভুলে ফেলে যাচ্ছিলে।

(ঝুঁকে পড়ে মাটি থেকে মারাঠা শিবিরে প্রবেশ করার ছাড়পত্রটা হাতে তুলে নেয়।)

এটা তোমার জিনিস। নিয়ে যাও। যদি কোনোদিন কখনো হঠাৎ কারো জন্য কষ্ট হয়, ইচ্ছা হয় মারাঠা শিবিরে ছুটে আসতে—এই ছাড়পত্রটা তখন যদি খুঁজে না পাও—নিয়ে যাও।

জোহরা : (আবেগরুদ্ধ অশ্রুপ্লাবিত বিকৃত মুখে) না! না!! না!!!

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

[ধীরে ধীরে পর্দা পড়বে]

তৃতীয় দৃশ্য

[হিরণ বালার কক্ষ। খাটিয়ায় ও মেঝের ওপর কোনো সৈনিকের পরিত্যক্ত তলোয়ার, পাগড়ি, কোট, বুট সব ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। হিরণ বালা একটি একটি করে গুছিয়ে রাখছে, এমন সময় দরজায় ঘা পড়ে। হিরণ কান পেতে শোনে। মৃদু হাসে। এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চমকে সভয়ে পেছনে হটে আসে।]

হিরণ : এ-কী! দিলীপ! তুমি? এত রাতে তুমি এখানে কী চাও?

(গেরুয়া পোশাক পরা মারাঠা যুবক দিলীপ ঢুকবে)

দিলীপ : তোমার সর্বস্ব। ধনদৌলত যা আছে সব।

হিরণ : তুমি নেশা করেছো?

দিলীপ : সে কি আজ নাকি? যেদিন থেকে তোমার রূপ দেখে মজেছি, সেদিন থেকেই তো নেশায় চুরচুর। সে আজ কতো বছরের কথা মনে আছে? বিন্ধ্যগিরির গুরুদেবের আশ্রমে দশ বছর এক সঙ্গে বিদ্যাভ্যাস করেছি।

যবন বধের প্রতিজ্ঞা নিয়ে অস্ত্রশিক্ষা করেছি। কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেছি। তুমিও আমিও।

হিরণ : তুমি নরাধম। আশ্রমের শিক্ষা তোমার জন্য ব্যর্থ।

দিলীপ : আর তোমার বেলায় ? ব্রহ্মচারী অমরেন্দ্রনাথ যখন মাঝরাতে তোমাকে ডাকাডাকি করতো সে কি আশ্রমের প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করবার জন্য, না যুগলে দেবারাধনা করবে বলে ?

হিরণ : সে-সব কথা আলোচনা করবার জন্য এই দুপুর রাতে এখানে ছুটে এসেছো ?

দিলীপ : কেন, তাতে কি দোষ হয়েছে ? আলোচনা বলো, আরাধনা বলো, এ রকম নির্জন রাতের জন্য অতি প্রশস্ত।

হিরণ : আর কী বলতে চাও।

দিলীপ : এত তাড়াতাড়ি কীসের ? আস্তে আস্তে বলছি। এসেছি যখন তখন সব কথা না বলে চলে যাবো মনে করেছো ?

হিরণ : তাড়াতাড়ি করো।

দিলীপ : কেন আর কেউ আসবে নাকি ? আসুক। দোরটা ভালো করে দিয়ে বাখো, সে বাইরে অপেক্ষা করবে। আমি করিনি ? অপেক্ষা করতে করতে যখন একেবারে থ' হয়ে গেলাম তখনই না একবার ঘুরে একটু নেশা করে এসেছি। আর থাকতে না পেরে মরিয়া হয়ে, যা থাকে কপালে, ঝাঁপিয়ে পড়লাম তোমার ঘরের মধ্যে। এসে দেখি কেয়া মজা! মন্দির নির্জন, দেবী একা, বে-আক্কেল পূজারী বেটা বিদায় নিয়েছে।

হিরণ : তোমার বাক্য, তোমার চিন্তা, তোমাব আচরণ বরাবরের মতোই কুৎসিত, কদর্য।

দিলীপ : আর অমরেন্দ্রনাথ বাপ্পাজীর কণ্ঠ, স্পর্শ, ঘ্রাণ সবই বুঝি বিশুদ্ধ, পবিত্র ? কী করে স্থির করলে ? তুলনা করলে কী করে ? আমি তো বরাবরই বলেছি যে রায় একতরফা হওয়া উচিত নয়; সকল দিক জেনে বুঝে, চেয়ে, দেখে তারপর একদিক বেছে নেয়া উচিত। এখন আমি এসেছি আমাকে নাও। তারপর বিচার করে দেখো কে বেশি আরাধনার যোগ্য, আমি, না অমর।

হিরণ : তুমি পশু, সে দেবতা।

দিলীপ : আমি হিন্দু, সে যবন।

হিরণ : কী বললে ?

দিলীপ : আমি হিন্দু আর তোমার দেবতাটি যবন। যে দেবতাটি তোমার পতি, দেবতার বাড়া, সে আদ্যোপান্ত যবন। যদি ভুল দেখে না থাকি তবে তোমার উপ-পতিদেবতাও যবনাধম যবন। কেবল আমি, যে অদ্য রজনীতে অবশ্যই তোমার উপ-উপপতি দেবতা হবার অভিলাষী, কেবল সে-ই নির্ভেজাল হিন্দু।

হিরণ : কাল সকালে যখন তোমার নেশা ছুটে যাবে তখন এ-সব কথা উচ্চারণ করতেও ভুলে যাবে।

দিলীপ : তোমার অনুরোধে পড়ে সব করতে রাজি আছি। অমরেন্দ্রনাথ যে আসলে যবন, তোমাব খাতিরে কাল সকাল থেকে সে-কথা ভুলে যেতে আলবত রাজি আছি।

হিরণ : এ সব কথা কে বলেছে তোমাকে ?

দিলীপ : সে গোমর ফাঁক করবো না। তবে তোমার এতদিনের পেয়ারের আদমি, তার পুরো পরিচয়টা তোমার কাছে না বলে পারলাম না। ওর আসল নাম আতা খাঁ। ছোটকালে মারাঠা সৈন্যরা ওকে লুট করে নিয়ে এসে বিন্ধ্যগিরির আশ্রমে ফেলে রেখে যায়। বড় হয়ে ও সব জানতে পেরেছে। কিন্তু বজ্জাতের হাড়ি, জেনে শুনেও সব চেপে রেখেছে। তা বাখবে না কেন। শেষে কি যবন বলে তোমাকে খোয়াবে ?

হিরণ : তোমার সংবাদ পরিবেশন করা শেষ হয়েছে ?

(হিরণ মাটিতে পড়ে থাকা খাপে-ঢাকা তলোয়ারটার দিকে বারবার তাকায় এবং একটু একটু করে তার কাছে এগিয়ে যায়।)

দিলীপ : মনে হচ্ছে যেন আদৌ বিচলিত হলে না।

হিরণ : নিশ্চয়ই বিচলিত হয়েছি। এত বিচলিত হয়েছি যে, সমগ্র মন চাইছে যে এক্ষুণি এর একটা প্রতিকার করি। তুমি আমাব এত বড় উপকার কবেছো যে হাতে হাতে একটা প্রতিদান তোমার পাওয়া উচিত।

(হিরণ ক্ষিপ্রগতিতে ঝুঁকে পড়ে তলোয়ারটা ধরতে যাবে আর অমনি তার চেয়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লাফিয়ে পড়ে পা দিয়ে সেটা চেপে ধরে রাখে দিলীপ।)

দিলীপ : আহ্! কী ছেলেমানুষি করছো! আমি জানি যে তুমি অসি চালনায় সুপটু। কিন্তু তাই বলে এই অসময়ে তোমার তলোয়ারের খেলা কে দেখতে চেয়েছে ? আমি অল্পবিস্তর মাতাল হয়েছি বটে, কিন্তু মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। তাল-বেতাল জ্ঞান বিলকুল ঠিক আছে।

(বসে পড়ে দু'হাতে চেপে ধরে তলোয়ারেব খাপটা দেখতে থাকে)

বাঃ, বড় খাসা তলোয়ার দেখছি। এমন ব্যবহারের নক্সা করা অস্ত্র মারাঠা শিবিরে কোনো মর্দ ব্যবহার করে বলে মনে হয় না।

হিরণ : নেশার ঘোরে কী দেখছো আর কী বকছো তুমিই জানো।

দিলীপ : নেশার নিকুচি করি। আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করো না হিরণ। এ তলোয়ার এখানে কোত্থেকে এলো ? এ অস্ত্র দেখছি মুসলমানের, মারাঠা শিবিরে কী করে প্রবেশ করলো ? জবাব দাও!

হিরণ : প্রশ্ন তুমি করছো, জবাবও তুমিই দাও।

দিলীপ : দেবো, দেবো। অবশ্য দেবো। (উঠে দাঁড়িয়ে ক্ষিপ্তের মতো ঘরের চারধারে খোঁজে) এই যে পেয়েছি। উষ্ণীষ। মুসলমানের শিরস্ত্রাণ। (শুঁকে দেখে) কোনো মারাঠা পুরুষ মাথায় এত সুগন্ধি তেল মাখে না। এই যে, এই তার জুতো, এই বিনামা, এইতো,এইতো তার আংরাখা, ইজার। আমার একটুও

ভুল হয়নি। একটু আগে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যে যবন তোমার ঘরে ঢুকেছে আমি দূর থেকে তাকে ঠিকই দেখেছিলাম। এখন কোথায় সে ?

(দিলীপ ঘবের আনাচে-কানাচে দৃষ্টি ঘোরায়)

হিরণ : এখানে নেই।

দিলীপ : ঝুট। তাব অসি-উষ্ণীষ, ইজার-কোর্তা সব এখানে পড়ে রয়েছে কেবল আসল আদমিটাই অদৃশ্য!

হিরণ : এখানে ছিল। কিন্তু এখন নেই। তুমি আসার একটু আগে চলে গেছে।

দিলীপ : এইতো একটু একটু করে মুখ দিয়ে বুলি বেরুচ্ছে। এতদিন তোমার সন্ন্যেসীপনার ঘটা দেখে রাত-বিরাতে কখনও ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পাইনি। তখন কি জানতাম আমার সতী সীতা ভেতরে ভেতবে এত রসবতী।

হিরণ : এখন কী জেনেছো ?

দিলীপ : এইটুকু জেনেছি যে তোমার এই শয্যাগৃহে উপযুক্ত যবনও অসময়ে প্রবেশ কবতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে এই কক্ষেই পরিধেয় বস্ত্রাদি অসঙ্কোচে ত্যাগ করতে পারে।

হিরণ : এই জ্ঞানলাভে তোমার স্বার্থ ?

দিলীপ : বাঃ, জ্ঞানলাভ কি কখনো বিফলে যায়। এই যেমন ধরো বাহুল্য বোধে আমিও প্রথমে আমার এই মহামূল্যবান উত্তবীয় বর্জন কবলাম।

হিরণ : এত মূল্যবান উত্তরীয়খানা মাটিব ওপব ছুঁড়ে ফেলে দিলে ?

দিলীপ : কোলে তুলে নাও। তাবপব ধরো, সেই যবন সেনার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমিও আমার পাদুকা পরিত্যাগপূর্বক তোমার পালঙ্কে আসন গ্রহণ করলাম।

(দিলীপ খাটেব ওপব পা তুলে জাঁকিয়ে বসেছে। হিরণ চাদরটা তুলবার সময়ে সুকৌশলে তার আড়ালে তলোয়ারখানা হাতে তুলে নেয়)

তা বাবা মেঝেব ওপর যার পাগড়ি-পাজামা গড়াগড়ি খাচ্ছে সে বান্দা খাটের নিচে কোথাও লুকিয়ে নেই তো ?

হিরণ : না।

দিলীপ : বেশ বেশ। এই ঘবের মধ্যে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে উৎপাত শুরু না কবলেই হলো ? আজ রাতে ব্যাটা শিবিরের স্বাধীনতা ভোগ করুক, কাল সকালে টুটি চেপে ধরবো। গুপ্তচরবৃত্তি করার রঙ্গ জনমের মতো ঘুঁচিয়ে দেবো।

হিরণ : তাকে চিনবে কী করে ?

দিলীপ : সে আমি ঠিক চিনে নেবো। তোমার এ ঘরে বায়ু চলাচল এত কম যে ঘেমে নেয়ে উঠলাম। অতএব তোমার অনুমতি নিয়ে, আমার পূর্বগামী যবন সেনার মতো আমিও এবার গায়ের জামাটা খুলে ফেলতে চাই।

(মাথা নিচু করে দিলীপ জামা খুলতে উদ্যত, এমন সময় হিরণ এক

ঝটকায় তরবারি কোষমুক্ত করে নেয়।)

হিরণ : খবরদার! জামা গায়ে রাখো। আর একটি অসদাচরণ করেছ কি বিনা দ্বিধায় তোমাকে দু'টুকরো করে ফেলবো।

দিলীপ : তুমি সত্যি রহস্যময়ী, হিরণবালা। পতি, উপপতি সবই গোপনে যবনকুল থেকে নির্বাচন করতে তোমার কোনো দ্বিধাবোধ হয় না। রাগ কেবল স্বধর্মের একটি হৃদয়বান তরুণের প্রতি।

হিরণ : এই তোমার উত্তরীয়। যেমন করে পরে এসেছিলে তেমনি করে সর্বাঙ্গে পেঁচিয়ে নাও। কোনো কথা বলো না। তোমার কথা শুনলেই আমার ইচ্ছা হয় তোমার বুকের ওপর হাঁটু চেপে বসে গলায় চাপ দিয়ে জিহ্বাটা টেনে উপরে ফেলে দি'।

দিলীপ : আর মধ্যরাতে অপরিচিত যবন-সেনা ঘরে ঢুকে বস্ত্র পরিত্যাগ করতে চাইলেও মনে কোনো ক্ষোভ হয় না, না?

হিরণ : তিনি আমার অপরিচিত নন।

দিলীপ : চমৎকার! অমরও কি এই সংবাদ রাখে নাকি?

হিরণ : জানে।

দিলীপ : অমর তোমার এতই বশ?

হিরণ : না হবে কেন? এই মুহূর্তে তুমি আমার বশ নও? খাট থেকে নেমে পাদুকা পরো। আস্তে আস্তে দরজার দিকে এগোও। দশোহারার রাতে তোমার মতো দুরাচারের রক্তে আমার গৃহ রঞ্জিত হোক, এ আমি চাই না।

দিলীপ : না থাক, রক্তপাতের প্রয়োজন নেই। আমি স্বেচ্ছায় বিদায় নিচ্ছি। শুধু একটা কথা তোমার কাছ থেকে শুনে যেতে চাই। আজকের এই যবন সেনাটিকে তুমি কতদিন থেকে জানো?

হিরণ : যতদিন থেকে অমরকে জানি।

দিলীপ : বিশ্বাস করি না। খোঁজ করে দেখবো।

হিরণ : খোঁজ আমিই তোমাকে দিচ্ছি। আমার ঘরে এসে যে যবন-সেনা এই যবন বেশ বর্জন করেছে তাকে তুমি চেনো। তার আসল নাম আতা খাঁ। এই পোশাক-পরিচ্ছদ ত্যাগ করে সে যখন মারাঠা সৈনিকের পোশাক পরে বেরিয়ে যায় তখন তোমরা অমর বলে সম্ভাষণ জানাও।

দিলীপ : ওহ্ কী আশ্চর্য! আমার চোখে সবটা ধরা পড়লো না।

হিরণ : অমর বলো, আতা খাঁ বলো, মনে মনে তাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করেছি। তাকে আমি ভালোবাসি। এ ঘরে তার প্রবেশ অধিকার আছে। কিন্তু—তুমি—আর কোনোদিন যদি তুমি নেশার ঝোঁকেও অসময়ে এ ঘরে ঢুকে পড়ো, নিশ্চিত জেনো সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে না।

(দিলীপ বেরিয়ে যায়। হিরণ দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকে। আবার দরজার বার থেকে কয়েকটা আঘাত। হিরণ ভ্রূ কুঁচকে শোনে। অপরিসীম ঘৃণা ও রোষ নিয়ে হিরণ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দু'হাত কপালে

ঠেকিয়ে কুলদেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানায় এবং ঐ একই প্রণামবদ্ধ মুঠোর মধ্যে তলোয়ারটা খাড়া উঁচু করে চেপে ধরে রাখে। যে প্রবেশ করবে তার কাঁধে খড়্গাঘাতের মতো নেমে আসবে। উত্তেজনায় হিরণ কাঁপছে এবং চোখ বন্ধ হয়ে আসছে।)

হিরণ : এসো ঘরে এসো। (হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে অমর) অমর!

(হিরণবালার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে যায়। নিজেও পড়ে যাবার উপক্রম হতেই অমর ধরাধরি করে তাকে খাটে নিয়ে বসিয়ে দেয়।)

অমর : হিরণ! হিরণ! কী হয়েছে ?

হিরণ : কিছু হয়নি। তুমি অস্থির হয়ো না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু দেরি করলে চলবে না।

অমর : আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আমাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য তুমি তলোয়ার উঁচিয়ে অপেক্ষা করছিলে ?

হিরণ : আমি ভেবেছিলাম দিলীপই বুঝি আবার ফিরে এসেছে, তাই হাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছিলাম।

অমর : আবার ফিরে এসেছে মানে কি ? আরেকবার এসেছিল নাকি ? কেন এসেছিলো ? কতোক্ষণ ছিলো ? তোমার কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারেনি তো ? দোহাই তোমার একটু তাড়াতাড়ি জবাব দাও।

হিরণ : তুমি অস্থির হয়ো না। আমার কোনো ক্ষতি হয়নি। এই তলোয়ারটা হাতের কাছে পাওয়াতে বড় বেঁচে গেছি।

অমর : সে কী ! এ তলোয়ার তোমার ঘরে এলো কী করে ? এ তো মুসলিম শিবিরের অস্ত্র। আর এগুলো—এই পাগড়ি, পাজামা এসব তোমার ঘরে কোত্থেকে এলো ?

হিরণ : এগুলো মনু বেগের। এই ঘরে বেশ পরিবর্তন করেছে।

অমর : মনু বেগের! মনু বেগ তোমার ঘরে এসে বেশ পরিবর্তন করেছে! ওহ্ বুঝেছি।

হিরণ : দিলীপ ঘরে ঢুকেই এগুলো দেখে নানা রকম প্রশ্ন করতে শুরু করলো।

অমর : সর্বনাশ। কী জবাব দিলে ?

হিরণ : অনেকক্ষণ ধরে ভেবে কিছুই ঠিক করে উঠতে পারিনি। শেষে মরিয়া হয়ে বলে ফেললাম এগুলো তোমার।

অমর : দিলীপ বিশ্বাস করলো ?

হিরণ : তাকে বুঝিয়ে বললাম যে তুমি আসলে গুপ্তচর। সব সময়েই তোমার সঙ্গে দুটো পোশাক থাকে। একটা পরে তুমি অমর হও, অন্যটা পরে আতা খাঁ বনে যাও।

অমর : কী সর্বনাশ! তুমি তাকে এইসব কথা বললে ?

হিরণ : না বলে উপায় ছিল না। এর চেয়ে কম লোমহর্ষক কিছু বললে ও বিশ্বাস করতো না।

অমর : তুমি জানো না তুমি কী সর্বনাশ করেছো। তুমি দিলীপকে একথা বলতে গেলে কেন।

হিরণ : দিলীপ সবই জানতো। কেমন করে আতা খাঁ অমরেন্দ্রনাথের রূপ নেয়, নেশার ঘোরে সে গল্প শোনাতেই দিলীপ আমার ঘরে ছুটে এসেছিলো।

অমর : দিলীপ বললো আর অমনি তুমি বিশ্বাস করলে যে আমি হিন্দু অমর নই। আমি মুসলমান আতা খাঁ।

হিরণ : দিলীপের কাছ থেকে শোনার অনেক আগে থেকেই আমি সব জানতাম। সে-সব কথা এখন থাক। হাতে সময় খুব কম। তোমাকে অনেক কাজ করতে হবে।

অমর : তোমাকে ভালোবাসি হিরণ।

হিরণ : থাক। এখন যা বলি শোনো। দিলীপের নেশার ঘোর পুরোপুরি কাটবার আগেই মন্নু বেগকে মানে জোহরা বেগমকে এ শিবির থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

অমর : তার জন্য চিন্তা করো না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

হিরণ : আর—আর—আরেকটা কথা, বলতে কষ্ট হচ্ছে।

অমর : কী দরকার, নাই-বা বললে।

হিরণ : তোমাকে ভালোবাসি আতা খাঁ।

অমর : সব তো বলেই ফেলেছো। কিছু তো বাকি রাখলে না।

হিরণ : মন্নু বেগের সঙ্গে তুমিও শিবির পরিত্যাগ করে চলে যাও। রাত শেষ হলেই দিলীপ তোমাকে তন্নতন্ন করে সমস্ত মারাঠা শিবিরে খুঁজে বেড়াবে। দেরি করো না, চলে যাও।

অমর : আর তুমি ?

হিরণ : আমার জন্য চিন্তা করো না। ইব্রাহিম কার্দি যাকে বোন বলে ডেকেছে অন্তত এই যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত মারাঠা শিবিরের কেউ তাকে অপমান করতে সাহস করবে না।

অমর : এ তো হলো নিরাপদে থাকার কথা কিন্তু তোমাতে আমাতে কি এই শেষ দেখা ?

হিরণ : দুই শিবিরের মাঝখানে মস্ত বড় প্রান্তর। দু'দিন পর যুদ্ধ যখন শুরু হবে তখন রোজই সেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলিম লক্ষ লক্ষ হিন্দুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। মিলবে-লড়বে, মারবে-মরবে কেবল আমাদের দুজনেরই আর কখনো দেখা হবে না এও কি সম্ভব ? আর দেরি করো না। আমি ঘণ্টা শুনতে পেয়েছি। জোহরা বেগম হয়তো এক্ষুণি ফিরবে। সব ব্যবস্থা ঠিক করে রেখো।

অমর : আমি আসি হিরণ!

(প্রস্থান)

হিরণ : আতা খাঁ! আতা খাঁ! আতা খাঁ!

(পর্দা নেমে আসে)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান : মুসলিম শিবির

কাল : পরের দিন

[মঞ্চের একধারে টেবিলের ওপর দাবার ছক পেতে দু'জন খেলোয়াড় তন্ময় হয়ে চাল ভাবছে। প্রায় পুরোপুরি দর্শকদের দিকে মুখ দিয়ে যিনি খেলছেন তাঁর নাম সুজাউদ্দৌলা। অন্যজন মন্নু বেগ, দর্শকদের দিকে পিঠ দিয়ে খেলছেন, কেবল কখনো কখনো পাশ থেকে মুখের আদল দেখা যাবে। তৃতীয় ব্যক্তি নজীবদ্দৌলা পদচারণা করেন, এক-আধবার থেমে খেলা দেখেন। সকলেই পরিপূর্ণ সমরসাজে সজ্জিত।]

নজীব : (একদৃষ্টিতে কতোক্ষণ দুই স্তব্ধ খেলোয়াড়কে দেখে) অসহ্য! এই অর্থহীন প্রতীক্ষা, অসহ্য!

সুজা : কোনো কিছুই নিরর্থক নয়। আক্রমণ করার মধ্যে যদি মস্ত কোনো কারণ থাকতে পারে, তাহলে না করার মধ্যেও নিশ্চয়ই কোনো কাবণ লুকিয়ে রয়েছে। (মন্নু বেগকে) পিলটা বাগে পেয়েও খেলে না কেন তাই ভাবছি।

নজীব : অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠা শিবির আক্রমণ কবা নিরর্থক মনে করেন। অযোধ্যার লুণ্ঠনকারীদের উচ্ছেদ করার কোনো সার্থকতা অনুভব করেন না। নিষ্ক্রিয় ঘরে বসে বুদ্ধির রকমারি খেলা অভ্যাস করাটাকেই বড় কাজ বলে মনে করেন।

সুজা : করি। (মন্নু বেগকে) তোমার সঙ্গে হুঁশিয়ার হয়ে খেলতে হচ্ছে। তুমি সোজা লোক নও।

নজীব : আমার পক্ষে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত উদাসীন থাকা সম্ভব নয়।

সুজা : কেন ?

নজীব : কেন ? কারণ, আমি নজীবদ্দৌল্লা, রোহিলা পাঠান। হিন্দু মারাঠা দস্যুরা আমার দেশ লুট করেছে। আমাকে দেশচ্যুত করেছে। আমার কাছ থেকে দিল্লির সিংহাসন কেড়ে নিয়ে গেছে। পশু পেশবা আর তার ঘৃণ্য অনুচরদের সমুচিত শিক্ষা না দিয়ে ক্রীড়াকৌতুকে মন মজাবো না।

সুজা : শাবাশ! উত্তম! অতি উত্তম! আমি ধরতে পারিনি যে, তুমি আমার দুর্গের পাহারাদার ঘোড়াটাকে ঘায়েল করবার ফিকিরে ছিলে। শাবাশ (নজীবকে) মারাঠা শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার জন্যই যমুনা তীরে দেড়মাস ধরে প্রহর গুণছি। কিন্তু তাই বলে এক্ষুণি যখন সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ছি না তখন অল্প বিস্তর ক্রীড়াকৌতুকে মন দিতে দোষ কি ?

নজীব : অল্প থেকে বিস্তর হয়, দোষ সেই জন্য। একদিন নয়। প্রতীক্ষা করছি দেড় মাস ধরে। প্রতীক্ষা করতে করতে এখন এমন হয়েছে যে, ভুলে যেতে বসেছি যে শত্রুকে আক্রমণ করবার জন্য একত্রিত হয়েছিলাম।

সুজা : এবার তোমার পিলটাকে কাটাবোই। ছাড়বো না। (নজীবকে) কেবল আক্রমণের দ্বারা জয় পরাজয় সুসিদ্ধ হয়, বিশ্বাস করি না। মন্নু বেগ, কী বলো ?

মন্নু : জানি না।

নজীব : জানো না মানে কী ? বিউলীর প্রান্তরে তোমার যে মূর্তি দেখেছি, তার সঙ্গে তোমার আজকের এই উক্তির কোনো সঙ্গতি নেই। তোমার চোখে, চেতনায় সর্বাঙ্গে আজ যে শৈথিল্য, যে ঔদাসীন্য, যে নির্বিকারত্ব প্রত্যক্ষ করছি তা সত্যি অপ্রত্যাশিত। গতকাল বিকেলেও তুমি অন্য মানুষ ছিলে।

সুজা : নবাব নজীবদ্দৌলা, মানুষ মরে গেলে পচে যায়। বেঁচে থাকলে বদলায়। কারণে-অকারণে বদলায়। সকালে-বিকালে বদলায়। এতে অবাক হবো কেন ? (মন্নু বেগকে) তোমার দান চালো।

মন্নু : এবার ছাড়বো না। আপনার পিলটা নিলাম।

সুজা : কী সাংঘাতিক কথা! এত ঘনঘন গোটা খেলার নক্সা পালটাচ্ছে যে তোমার তল পাওয়া ভার।

নজীব : নবাব সুজাউদ্দৌলার বর্তমান তন্ময়তা দেখে মনে হচ্ছে তাঁর বিচারে রণক্ষেত্র আর দাবার ছক দুই-সমান।

সুজা : নবাব নজীবদ্দৌলার এ সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য!

নজীব : কেন ?

সুজা : রণে জয়ী হওয়ার চেয়ে দাবায় মাত করা দুরূহতর। মন্নু বেগকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

মন্নু : কোনো সন্দেহ নেই।

নজীব : গতকালও তোমার কাছ থেকে বিপরীত কথা শুনেছি।

মন্নু : জি!

সুজা : নবাব নজীবদ্দৌলা বলতে চাইছেন যে, গতকাল পর্যন্ত তুমি মারাঠাদের নিরতিশয় পাষণ্ড বলে জানতে। গতকালও তুমি চাইছিলে তাদের রক্ত দিয়ে হোলি খেলতে, পদতলে তাদের অস্থি চূর্ণ করতে, মাটির নিচে তাদের সব পুঁতে ফেলতে। অথচ দেখা যাচ্ছে যে, আজ সকাল থেকে তোমার চিত্ত কোনো অজ্ঞাত কারণে বিকল হয়েছে। পরিচিত অভ্যস্ত পথ বর্জন করে নানা অভাবিত আচরণে উদ্যোগী। (দাবার ছকটা ভালো করে দেখে) তোমার কোনো চালই আজ ধরতে পারছি না। বেড়ে খেলছো। কী লক্ষ্য করে এগুচ্ছো, কোন মতলবে ফাঁদ পেতেছো, কিছুরই কূল-কিনারা করতে পারছি না।

মন্নু : আমাকে মাফ করবেন। খেলার ঝোঁকে আপনার সব কথা শুনতে পাইনি।

নজীব : এ যুক্তিটা তবু মন্দের ভালো।

সুজা : তোমার নৌকা আটক করেছি মনু বেগ। দেখো কোনো হেকমতে বাঁচাতে পারো নাকি।

মনু : কী হবে বাঁচিয়ে ? তার চেয়ে মরণপণ লড়াই ভাল। আপনার বাকি পিলটাও তুলে নিলাম।

সুজা : মরলে। একেবারে নাহক মরলে। শা-আ-হ্।

মনু : শাহ্ ?

সুজা : শাহ্। একেবারে আষ্টেপিষ্ঠে বাঁধা পড়েছো। শাহ্! মুক্তির কোনো পথ খোলা নেই। শাহ্! হেরে গেলে। মনু বেগ এত করেও পারলে না, হেরে গেলে শেষটায়।

(মাথা নিচু করে মনু বেগ দেখে ও ভাবে)

নজীব : বেশি ভাবনার আমি ধার ধারি না। আমি জানি শত্রু কে। জানি শত্রু কোথায়। জানি তাকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার উপায়। আপনি আমাকে সাহায্য করুন।

সুজা : শত্রু কে, শত্রু কোথায়, কে জানে ?

নজীব : ভারতে মুসলমানের শত্রু মহারাষ্ট্র শক্তি। শত্রু পেশবা। পানিপথ পেরিয়ে আর একপাও অগ্রসর হবে এমন ক্ষমতা তাদের নেই।

মনু : মেনে নিলাম। হেরে গেছি।

(দাবার ছক ছেড়ে মঞ্চের পেছনে চলে যায়। সেখানে সাজিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করবে।)

নজীব : আঘাত করার এই হলো উপযুক্ত সময়। যমুনার পাড় ধরে কাতার ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সৈন্যবাহিনী। ঐ ব্যূহ ভেদ করে শত্রুসেনা কোনোদিন যমুনার পানি স্পর্শ করতে পারবে না।

মনু : (চিৎকার করে) আমরা অপেক্ষা করছি কেন ?

নজীব : নিজেকে জিজ্ঞেস করো। জবাব পাবে। নবাব সুজাউদ্দৌলাকে জিজ্ঞেস করো। অবশ্যই জবাব পাবে।

মনু : আমি জানি না।

সুজা : আমি জানি না। যা জানার সব আহ্মদ শাহ্ আবদালী জানেন। এই মহাযুদ্ধের আয়োজনে যে দিন থেকে অংশ নিতে শুরু করেছি সেদিন থেকেই আবদালীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছি।

নজীব : সে কি মুসলিম শক্তিকে হীনবল করে তুলবার জন্যে, না তার বাহুতে নতুন শক্তি সঞ্চার করবেন বলে ?

সুজা : আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য।

নজীব : সে জন্য সচেষ্ট নন কেন ? তাকে সফল করার জন্য একটু উৎসাহ, একটু উদ্যম, একটু আগ্রহ প্রকাশ করুন।

সুজা : প্রধান সেনাপতির নির্দেশ পেলেই করবো।

নজীব : সে নির্দেশকে ত্বরান্বিত করবার জন্যও আপনার কিছু দায়িত্ব রয়েছে।

সুজা : যেমন ?

নজীব : আমি রোহিলাখণ্ডের, আপনি অযোধ্যার প্রতিনিধি। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী হিন্দুস্থানের কেউ নন, তিনি কাবুলেশ্বর। আগামী দিনে হিন্দুস্থানের সমগ্র মুসলমানকে পরিচালনার ভার গ্রহণ করতে হবে আমাকে বা আপনাকে— আবদালীকে নয়।

সুজা : আগামী দিনের কথা কে বলতে পারে। একজন মানুষের জীবনেও কোনো দু'টো মুহূর্ত এক রকম নয়। এই মুহূর্তের নিশ্চিন্ত আশ্বাস পরের মুহূর্তের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। যা একেবারে চোখের সামনে অবধারিতরূপে বিদ্যমান সেটা পর্যন্ত সকল সময় দেখতে পাই না। যা দেখি তা হয়তো ভুল দেখি। কতো সময় মনে হয় ঠিকই দেখছি, কিন্তু আদৌ দেখতে পাইনি। (মন্নু বেগকে) তোমার চোখের সামনে সব ঘুটি সাজানো ছিলো। সব দেখেশুনে, নিশ্চিন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে আবার দ্বিতীয় পিলটাও গ্রাস করলে। সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজের বাদশার মরণও ঘনিয়ে এলো।

মন্নু : অন্ধ। একেবারে অন্ধের মতো খেলেছি। খেলে হেরে গেছি।

নজীব : আমি অন্ধ নই এবং পরাজয় বরণ করেও আমি স্বস্তি পাই না। নিজের নিয়তিকে আমি নিজ হাতে গ'ড়ে নেওয়ার পক্ষপাতী। আমার নিজের এবং সমগ্র হিন্দুস্থানের মুসলমানের গ্লানি মোচন না করে আমি ক্ষান্ত হবো না। যে আঘাত ওরা আমাকে হেনেছে ওদেরকে আমি শতগুণ ভয়ঙ্কর তেজে ফেরত দিতে চাই। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীকে এইজন্য সালাম করি যে তিনি হতভাগা বহু-বিভক্ত মুসলিম ভারতকে ঐক্য এবং শৃঙ্খলা দান করেছেন। তাঁর নেতৃত্বের প্রভাব ভিন্ন হয়তো আমি আপনার পাশে, আপনি আমার পাশে এসে এক কাতারে দাঁড়িয়ে মারাঠাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পারতাম না।

সুজা : আপনার পাশে আসন লাভ করাটাকে আমি চিরদিনই সৌভাগ্যের বিষয় বিবেচনা করেছি। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর নেতৃত্ব স্বীকার করেছি এই জন্য যে তাঁর মতো রণকুশলী বীর এদেশে নেই। যেমন সাহসী তেমনি বিচক্ষণ। পক্ষের বিপক্ষের প্রতিটি সৈনিকের প্রতি মুহূর্তের নড়া-চড়া সর্বক্ষণ এতো জাজ্বল্যমানরূপে প্রত্যক্ষ করেন যে মনে হয় যেন গোটা যুদ্ধটাই তাঁর একক রচনা। লড়াই করা স্থির করলে এমন লোকের হুকুম মেনে চলাই শ্রেয়।

নজীব : কিন্তু শ্রেষ্ঠ সেনাপতিও বিকলাঙ্গ হয়ে পড়েন, যদি তাঁর সাক্ষাৎ সাহায্যকারীরা ফলাফল সম্পর্কে উদাসীন হয়ে ওঠে।

সুজা : তৎপরতা প্রকাশ করবার জন্য কী করা উচিত ?

মনু : আমাদের উচিত অবিলম্বে, এক্ষুণি, এই মুহূর্তে মারাঠা শিবির আক্রমণ করা।

সুজা : এই প্রকাশ্য দিবালোকে ? আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর হুকুম ছাড়া ?

নজীব : সেই হুকুম যেন আসে তার জন্য তদবির করতে হবে।

সুজা : আমাকে ?

নজীব : হ্যাঁ আপনাকেও। আপনার বীরত্ব ও ধীরতার ওপর আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীব অপরিসীম শ্রদ্ধা।

সুজা : সে তার মেহেরবানি।

নজীব : আমরা আজ তাঁর সঙ্গে এই কক্ষে মিলিত হবার আয়োজন করেছি।

সুজা : উদ্দেশ্য ?

নজীব : তাঁকে আমরা সম্মিলিতভাবে জানাতে চাই যে, আমাদের মতে আর একদিনও বিলম্ব করা উচিত নয়। সম্ভব হলে আজ রাতেই আক্রমণ শুরু করা উচিত। আমাদের প্রার্থনা যে আপনিও যেন আমাদের এই অভিপ্রায়কে অনুমোদন করেন।

সুজা : অত্যাচারী , লুণ্ঠনকারী, উচ্ছৃঙ্খল মারাঠা বাহিনীকে আমিও ভালো রকম শিক্ষা দিতে চাই। বছরের পর বছর একটা উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনেছি। কিন্তু বলা নেই, কওয়া নেই ঠিক আজ রাতেই সে সুযোগ আমাদের জন্য প্রশস্ত হয়ে দেখা দেবে, এ সংবাদ আপনি কোত্থেকে পেলেন তা আমাকে এখনও জানাননি।

নজীব : আমরা জেনেছি। ঠিকই জেনেছি।

সুজা : কী করে ?

নজীব : মারাঠা শিবির তালাশ করে খবর এনেছি।

সুজা : কবে ?

নজীব : গত রাতে।

সুজা : গত রাতে?

নজীব : গত রাতেও মারাঠা শিবিরে আমাদের লোক গিয়েছে।

সুজা : কে ?

নজীব : সে আপনার চর নয়।

সুজা : গত রাতে আমি কোনো চর পাঠাইনি। আর, চরের কথায় বিশ্বাস কী ! ঘরে থেকে বলে দূরে গিয়েছিলাম। না গিয়ে বলে ঘুরে এলাম। দিনকে বলে রাত। আলোকে বলে অন্ধকার।

নজীব : এ লোক সে রকম নয়।

সুজা : কে ?

নজীব : আমাদের মধ্যেই একজন।

সুজা : নিজের কথা জানি। এ শিবির ত্যাগ করে গত রাতে আমি অন্য কোথাও যাইনি। নবাব নজীবদ্দৌলা কি গতরাতে মারাঠা শিবিরে বেড়াতে গিয়েছিলেন ?

নজীব : সে সুযোগ পাইনি।

সুজা : তাহলে কে! মন্নু বেগ।

মন্নু : আমি।

সুজা : মারাঠা শিবিরে গিয়েছিলে ?

মন্নু : আমি ?

সুজা : তাহলে, কে, কে গিয়েছিল ?

(মন্নু বেগের পিছন থেকে বেরিয়ে আসে অমর ওরফে আতা খাঁ।)

আতা খাঁ : জি আমি। আমি গিয়েছিলাম।

সুজা : তুমি।

নজীব : তুমি আবার কোত্থেকে এলে ?

মন্নু : এখানে এসেছো কতক্ষণ হলো?

আতা খাঁ : তা কিছুক্ষণ হবে।

নজীব : কেন এসেছো ?

আতা খাঁ : একটা সংবাদ ছিল।

সুজা : তুমি কে ?

আতা খাঁ : জি। চর। আমি গুপ্তচর।

সুজা : গত রাতে কোথায় ছিলে?

আতা খাঁ : মারাঠা শিবিরে।

সুজা : আর আগের রাতে কোথায় ছিলে ?

আতা খাঁ : আমাদের শিবিরে।

সুজা : তার আগের রাতে কোথায় ছিলে ?

আতা খাঁ : মারাঠা শিবিরে।

সুজা : তুমি কি আমাদের শিবির থেকে মারাঠা শিবিরে যাও, না মারাঠা শিবির থেকে আমাদেব শিবিরে আসো, তোমার গমনাগমন বিচার করে তা বোঝবার যো নেই। তুমি কাদের গুপ্তচর ?

আতা খাঁ : জি!

সুজা : সে-সব তল্লাশ চুলোয় যাক। তুমি কী সংবাদ এনেছো সেইটি আরেকবার সংক্ষেপে বলো।

আতা খাঁ : মারাঠা শিবির থেকে গতরাতে যে সংবাদ এনেছি সেই খবর ?

সুজা : আরো অন্য খবর আছে নাকি ?

আতা খাঁ : জি। আছে।

সুজা : আগে গত রাতেরটা বলো। পরে, পরেরটা শোনা যাবে।

আতা খাঁ : ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। বুঝতে পেরেছে যে একটা চূড়ান্ত লড়াই ছাড়া ওদের নিস্তার নেই। রসদের অভাব, যোগাযোগের অভাব, লোকজনের অভাব। বুঝতে পেরেছে যে চুপচাপ বসে থেকে ওরা দিন দিন আরো হতবল হচ্ছে। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওরাই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। দু'চার দিনের মধ্যেই হয়তো কামান গর্জে উঠবে। কে কোন সৈন্যবাহিনীকে কোন এলাকায় আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত করবে তা পর্যন্ত স্থির হয়ে গেছে।

নজীব : তোমার দ্বিতীয় সংবাদটা বলো।

আতা খাঁ : মানে, আমি খবর দিতে এসেছিলাম। তা এত দেরি হয়ে গেলো যে এখন সেটা দেয়ার হয়তো কোনো সার্থকতা নেই। বাদশাহ্ আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এক্ষুণি এই ঘরে আসবেন।

মন্নু : কে ? কে আসবেন এখানে ?

আতা খাঁ : এসে পড়েছেন। সসাগরা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীর, মর্তভূমির স্বর্গখণ্ড কাবুলের অধিপতি, ভারতে মুসলিম রাজশক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বাদশাহ্ আহ্‌মদ শাহ্ আবদালী দুররানি।

(সবাই সসম্ভ্রমে মঞ্চের একপাশে কাতার দিয়ে দাঁড়ায়। আবদালী প্রবেশ করেন।)

আবদালী : আল্লাহ্ আপনাদের আয়ু দীর্ঘ করুক, যুদ্ধে জয়ী করুক, জীবনে সুখী করুক।

মন্নু : আপনি রণে অপরাজেয়, দানে মুক্তহস্ত, দোয়ায় উদার।

নজীব : আপনার শুভেচ্ছা যেন আমাদের গাফিলতিতে বিফলে না যায় তার জন্য আমরা হুশিয়ার থাকবো।

সুজা : বাদশার শুভেচ্ছা, বান্দার চেষ্টা আর আল্লার মেহেরবানি এই তিন এক হলে কী না হয় ? না হলে বুঝতে হবে তা হওয়ার নয়। বাদশার দোয়ার জন্য বাদশাকে ধন্যবাদ।

আবদালী : মনে মনে স্থির করেছি যে আর আমরা প্রতীক্ষা করব না। এবার আক্রমণ শুরু করবো। প্রবল ভয়ঙ্কর প্রচণ্ড আক্রমণ! মায়ামমতাশূন্য কঠিন হিংস্র আঘাত হানবো। সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে চূড়ান্ত নির্দেশ দান করবার আগে আমি আপনাদের মতামত একবার জেনে নিতে চাই।

মন্নু : আমাকে জিজ্ঞেস করা বাদশার অপরিসীম বদান্যতা বা রহস্যপ্রিয়তার আর একটা প্রকাশ মাত্র। আমাদের কোনো নতুন বক্তব্য নেই। রাজনীতির জটিলতা সম্পর্কে আমি অজ্ঞ। তবে এটুকু জানি যে যতদিন মারাঠা শক্তির দম্ভ ধূলিস্যাত না হবে, ততদিন ভারতে মুসলমানগণ মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে না। সে নিগৃহীত হবে, নিপীড়িত হবে, নিশ্চিহ্ন হবে। ইসলামের জ্যোতি এদেশে নিভে যাবে। আমি অস্ত্রধারী সৈনিক। আক্রমণ

ভিন্ন অন্য ভাষা আমার কাছে দুর্বোধ্য। আমি বাদশার সঙ্গে একমত।

আবদালী : শাবাশ! সাবাস! মন্নু বেগ। তোমার তেজ, তোমার তারুণ্য, তোমার শক্তি পানিপথে আমাকে পদে পদে নতুন অনুপ্রেরণা যোগাবে।

মন্নু : আমাকে আর শর্মিন্দা করবেন না।

নজীব : আপনার হুকুমের জন্য আমরা অপেক্ষা করছিলাম। শত্রুসেনা নিধনের জন্য সকল সৈনিক অধীর। নানা সংবাদ বিচার করে আমাদেরও মনে হয়েছে আক্রমণের জন্য এইটেই সর্বোৎকৃষ্ট মুহূর্ত। আপনার নির্দেশসহ পূর্ণ পরিকল্পনা জানতে পারলে আমরা আজ রাতেই—একাধিক বাহিনীকে নিয়ে অতর্কিতে মারাঠা শিবির আক্রমণ করতে পারি।

আবদালী : নবাব সুজাউদ্দৌলাও কি আমাকে এই আশ্বাস দেন।

সুজা : সেনাপতি, সহ-সেনাপতি, অশ্বারোহী, পদাতিক—জয়-পরাজয় কারো ইচ্ছাধীন নয়। তবে রণনীতির নিয়মকানুনে আপনি যতো পারদর্শী ও বিচক্ষণ আমি ততোটা নই। আমি অবশ্যই আপনার সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য বলে মানি এবং রণক্ষেত্রে সে নির্দেশ শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও পালন করে যাবো।

আবদালী : শেষ সংবাদ অনুযায়ী ওরাও আক্রমণের তোড়জোড় করছে। আমাদের বুহ্য ভেদ করবার জন্য এক বিরাটকায় ত্রিশূল বাহিনী অন্ধকারে সরীসৃপের মতো ধীরে ধীরে বাহু বিস্তার করে এগুতে শুরু করেছে। অতর্কিতে হানা দাও তাদের ডেরায়। আঘাত করো। সরীসৃপ কেটে টুকরো টুকরো করে ফেল।

নজীব : বাজুক রণভেরী। জেগে উঠুক সবাই। আজ মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করে এমন শক্তি কার?

আবদালী : আজ রাত বিশ্রামের এবং পরামর্শের। কাল রাতে আমরা ঝাঁপ দেবো অন্ধকারে। প্রবল বেগে। কিন্তু সম্পূর্ণ শৃঙ্খলার সঙ্গে। আজকে শেষ রাতে আমরা আরেকবার এই ঘরে মিলিত হবো। কারো ঘুমের বিশেষ প্রয়োজন হলে নিকটেই শয্যা গ্রহণ করবেন।

মন্নু : আজ রাতে ঘুমুবে কে?

নজীব : আমি একবার আমার সৈন্যবাহিনীর তদারকে বেরুবো।

সুজা : কত রাত অকারণে না ঘুমিয়ে কাটিয়েছি আর আজ তো তবু মহৎ কর্মের আহ্বান এসেছে। নিশ্চয়ই ঘুম আসবে না।

আবদালী : যতটুকু আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তাতে মনে হয় মারাঠাদের ঐ ত্রিশূল বাহিনী পরিচালনার ভার নিয়েছে রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও এবং ইব্রাহিম কার্দি। ত্রিশূলের তিন শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে এরা সমগ্র রণক্ষেত্র নিয়ন্ত্রণ করবে। শৌর্যে বীর্যে কৌশলে এরা কেউ অবহেলা করবার মতো নয়।

নজীব : সে ভয়ে আমরা আতঙ্কিত নই।

আবদালী : আমাদের অগ্রগতির যে পরিকল্পনা আমি রচনা করেছি তা ঐ শত্রুর আক্রমণ রীতির বিপরীত প্রতিকৃতি মাত্র। আপনারা তিনজন ত্রিফলক বর্শার মতো শত্রু সৈন্যের শৃঙ্খলা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে সম্মুখে এগিয়ে যাবেন। আপনি, নজীবদ্দৌলা, আপনার দ্রুতগামী অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বেষ্টনী বিস্তার করবেন দক্ষিণ প্রান্ত থেকে। তুমি মন্নু বেগ ওদের আচ্ছন্ন করে ফেলবে উত্তর দিক থেকে। আর আপনি, সুজাউদ্দৌলা, মধ্যভাগে গজারোহী ও পদাতিক দলের অভেদ্য সচল দুর্গ নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, একেবারে সরাসরি ওদের বক্ষ ভেদ করে।

নজীব : দক্ষিণ প্রান্তে আমার মুখোমুখি যেন ইব্রাহিম থাকেন, এই কামনা করি।

মন্নু : কে? উত্তর প্রান্তে মারাঠা বাহিনীর নেতৃত্ব করবেন কে?

সুজা : ইব্রাহিম কার্দি, রঘুনাথ রাও, সদাশিব রাও—যেই হোক, কিছু এসে যায় না। সবাই সমান বস্তু।

আবদালী : শেষরাতে আবার বিস্তৃত আলোচনা হবে। ওদের ত্রিশূল বাহিনীর কোনো বিন্দুতে কে অবস্থিত থাকবেন, সংবাদ পুরোপুরি পাইনি। তবে নবাব সুজাদ্দৌলা যেমন বললেন, আমি তেমনি বলি, যেই-ই হোন তাঁর বাহিনী যেন নিশ্চিহ্ন হয়, তিনি নিজে যেন জীবিত রণক্ষেত্র ত্যাগ করতে না পারেন! খোদা হাফেজ!

(প্রস্থান)

নজীব : (আতা খাঁকে) তুমি জানো মারাঠা শিবির থেকে কোন সেনা· ·ান এলাকার ভার গ্রহণ করবেন। তুমি নিশ্চয়ই জানো ত্রিশূল বাহিনী· ান সন্ধিস্থলে ইব্রাহিম কার্দি আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

আতা খাঁ : আমি, দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে কে অগ্রসর হবেন, এখনও ঠিক স্পষ্ট ·ধার করতে পারিনি।

মন্নু : বঞ্চনা ছাড়ো। তোমার সঙ্গে কারুকার্য করে নানা ফিকিরের কথা বলার অবসর নেই। উত্তর প্রান্তে কে থাকবেন?

আতা খাঁ : উত্তর প্রান্তে, উত্তর প্রান্তে?... মানে... সে ঠিক এখনও বোধহয় স্থিরকৃত হয়নি।

সুজা : উত্তর-দক্ষিণ সম্পর্কেই যখন তোমার কোনো ধারণা নেই তখন তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা অর্থহীন।

আতা খাঁ : জি।

সুজা : তুমি যেতে পারো। হয়তো এই শেষ রজনীতে তোমাকেও অনেক কাজ সেরে নিতে হবে। সময় নষ্ট না করে কাজে নেমে পড়ো।

আতা খাঁ : জি, আপনার মেহেরবানি। খোদা হাফেজ।

(পর্দা নামবে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[জরিনা সেতার কোলে নিয়ে রঙ্গমঞ্চের এক পাশে বসে আছে। বিষণ্ন উদাসী। নজীব সৈনিকের সংক্ষিপ্ত ঘুম সেরে সদ্য উঠেছে, পোশাক সম্পূর্ণ অবিন্যস্ত। কথোপকথনের মাঝে পোশাক ঠিক করে নিচ্ছে।]

নজীব : এ-কী, তুমি শুতে যাওনি ?

জরিনা : না।

নজীব : রাত কতো হলো ?

জরিনা : সবে শুরু। এখনো সাঁঝের তারা নেভেনি। অযথা ব্যস্ত হচ্ছেন।

নজীব : বাইরে কী গাঢ় অন্ধকার!

জরিনা : নাইবা বেরুলেন।

নজীব : সে হয় না।

জরিনা : কেন ?

নজীব : তুমি বরাবরের মতোই অবুঝ। আর কি ফেরবার জো আছে, জরিনা ? ঘরে বসে থাকবো কী করে ? আমরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছি।

জরিনা : যুদ্ধ শুরু হবে কাল রাতে। আপনি আজ বেরুচ্ছেন কেন ?

নজীব : আমার নিজস্ব বাহিনীর একটু তদারক করা দরকার।

জরিনা : তারা ঘুমুচ্ছে ঘুমাক। কাল থেকে ঘুমের পালা কখন আসবে কে জানে। আজ ভালো করে ঘুমিয়ে নিতে দিন।

নজীব : এরা জাত সৈনিক। সহজে জেগে ওঠে সহজে ঘুমিয়ে পড়ে। একবার দেখে আসি।

জরিনা : অন্য কেউ যাক। আপনি আমার তদারক করুন। আমাকে জাগিয়ে রাখুন। আমাকে ঘুম পাড়িয়ে যান। আমি তো জাত সৈনিক নই। আমার জেগে থাকতে কষ্ট হয়। ঘুমিয়ে পড়তে আরো কষ্ট হয়।

নজীব : তুমি নিজে চেষ্টা না করলে আমি তোমাকে সাহায্য করবো কী করে ?

জরিনা : আমার উভয় দিকে বিপদ। আপনি এত অল্প সময় ঘরে থাকেন যে কখন চলে যান এই ভয়ে চোখের পাতা এক করতে পারি না। যখন চলে যান তখন সকল ঘুম কেড়ে নিয়ে চলে যান।

নজীব : কী করতে বলো ?

জরিনা : আমার কাছে থাকুন। আমার সামনে ঘুমোন। আমি বসে বসে দেখি।

নজীব : আর বাইরে যে কাজ আমার জন্য অপেক্ষা করছে তার ব্যবস্থা করবে কে ?

জরিনা : অন্য কেউ যাবে।

নজীব : আমি না গেলে নয়।

জরিনা : এতো বড় যুদ্ধ। লাখ লাখ লোক সেখানে উজাড় করে রক্ত ঢেলে দেবে। আপনি না গেলেও দেবে।

নজীব : সেজন্য আমি যাব না ? এ তোমার অদ্ভুত যুক্তি।

জরিনা : অদ্ভুত কেন হবে । আপনি যুদ্ধে জয়ী হতে চান। আপনি অপেক্ষা করুন। আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী সে জয়ের মুকুট আপনার মাথায় নিজ হাতে এসে পরিয়ে দিয়ে যাবেন। এ যুদ্ধের পরিকল্পনা তাঁর, নিয়ন্ত্রণাধিকার তাঁর, সাফল্যে তাঁর গর্ব সর্বাধিক, পরাজয়ে তাঁর গ্লানি সবচেয়ে মর্মান্তিক! জয়লাভের উদ্যোগে তাঁকে প্রধান হতে দিন। আপনি আমাকে জয় করুন, আমাকে অধিকার করুন। গ্রাস করুন। পিষ্ট চূর্ণ দলিত মথিত করুন।

নজীব : অনিদ্রায় তোমার স্নায়ু বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। তোমার কামনা, তোমার চিন্তা, তোমার ভাষা সব অসুস্থ বক্রপথে চালিত হয়ে তোমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আমাকেও আচ্ছন্ন করতে চাইছে। রাত আরো গভীর হবার আগেই বের হয়ে পড়তে চাই!

জরিনা : কোন মহৎকর্ম সাধনের জন্য ?

নজীব : যদি সে সত্য এখনও তোমার কাছে স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে আবার বলছি। রোহিলাখণ্ডের লুণ্ঠনকারী মারাঠাদের স্বহস্তে কণ্ঠরোধ করে হত্যা করতে চাই। একটি একটি করে উৎপাটিত করে ভারতের বুক থেকে মারাঠাদের নাম মুছে ফেলতে চাই।

জরিনা : শুনেছি আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালীর রোষ আরো প্রচণ্ড—আরো বহ্নিময়। আর এও শুনেছি একবার যে-কোনো রকমের হোক মারাঠাদের পদতলে পিষ্ট করতে পারলেই হয়। তাহলেই তাঁর চিত্তদাহ নিভবে। সেই আগুন নেভাতে গিয়ে মারাঠাদের সঙ্গে সঙ্গে যদি রোহিলাখণ্ড কি অযোধ্যা দিল্লি কি আগ্রা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায় যাক। তাতে তিনি বা তাঁর সৈন্যবাহিনী বিন্দুমাত্র বিচলিত হবেন না। আনন্দোৎসব করতে করতে কাবুল ফিরে যাবেন।

নজীব : এসব কথা তোমাকে কে শিখিয়েছে ?

জরিনা : সত্য কি মিথ্যা আগে তাই বলুন।

নজীব : এসব কথা যে বলেছে সে খুব পাকা লোক। বুঝতে পেরেছিলো যে একটি ব্যাকুল নারীহৃদয় তার ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার গণ্ডিবদ্ধ তীব্রতা নিয়ে কিছুই অবিশ্বাস করবে না। অন্য কারো সামনে এসব কথা বলতে সাহস করো না। কে বলেছে ?

জরিনা : আপনার আবদালীর মুসলিম শিবিরের সকলের বিশ্বাসভাজন সংবাদদাতা আতা খাঁ।

নজীব : আতা খাঁ ? আতা খাঁ এখানে এসেও হানা দেয় ? এখন সন্দেহ হচ্ছে নবাব সুজাউদ্দৌলা যখন প্রশ্ন করেছিলেন, আতা খাঁ, তুমি কার গুপ্তচর সে প্রশ্নের গুরুত্ব অবহেলা করে ভুল করেছি। তখনই তার একটা মীমাংসা করে নেয়া উচিত ছিলো।

জরিনা : আপনি অন্ধ। চরিতার্থতা লাভের একটা অলীক মোহে মত্ত আপনি আপনার

পৌরুষ, আপনার সাহস, আপনার শোভা, আপনার শক্তি, আপনার প্রাণ মাঠে-প্রান্তরে ছড়িয়ে ফেলে দিতে উদ্যত হয়েছেন। সেখানে শুধু লাশ, শুধু রক্ত। আপনার নামের কদর সেখানে কে করবে ? আমি উষ্ণ, আমি জীবন্ত। কেন আমাকে ত্যাগ করবেন ? আমাকে দান করুন। প্রতিকণা ভালোবাসা শতগুণ প্রাণবন্ত করে ফিরিয়ে দেবো। যুদ্ধ পড়ে থাক।

নজীব : আমি হয়তো সত্যি অন্ধ। কিন্তু তুমি আমার চেয়েও অন্ধ। এত অন্ধ যে তোমার চরাচর বিলুপ্তকারী ভালোবাসার প্রবলতায় তুমি যে কখন আমার সমগ্র জীবনকেও একটা ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আটক করে রাখতে চাইছো তা তুমি নিজেও জানো না। যদি জানতে তাহলে শিউরে উঠতে। আমার চেহারা চিনতে পারতে না। নবাব নজীবদ্দৌলার যে বিরাট প্রকাণ্ড মূর্তি তোমার ভালোবাসার স্পর্শে আরো বিস্তৃত স্ফীতকায় হয়ে ওঠে সেটাই কুঁকড়ে কুঁকড়ে এত নগণ্য বিবর্ণ হয়ে যেত যে তখন তুমি তাকে ছুঁতে চাইতে না।

জরিনা : আপনার যে বিস্তার ও দীপ্তি আমাকে অতিক্রম করে আপনাকে দূরে টেনে নিয়ে যায় আমি তাকে স্বীকার করি না। মানি না।

নজীব : মারাঠারা একজোট হয়ে মুসলিম রাজ্য আক্রমণ করেছে। মুসলমানদের পদানত করে তারা চায় গোটা হিন্দুস্থান একা শাসন করতে। অপমানিত ও লাঞ্ছিত ইসলামের মৃতদেহের ওপর ওরা ওড়াতে চায় ত্রিশূল আঁকা রক্ত পতাকা। আমি যদি এমন দিনে নির্বিকার হয়ে বসে থাকি, তুমি রোহিলা রাজপুরীর রমণীরত্ন তুমি কি আমাকে ঘৃণা করবে না ? তোমার কণ্ঠলগ্ন হয়ে এ নিশা যাপন করতে হলে আমি কি আমাকে ঘৃণা করবো না ? তুমি আমায় হৃষ্টচিত্তে বিদায় দাও, জরিনা!

জরিনা : আপনি ইসলামের জন্য প্রাণ দিতে চান, কারণ আপনি মহৎ, আপনি উদার, আপনি কর্তব্যপরায়ণ। আমি সামান্য নারী। ইসলামের সঙ্গে নিজের তুলনা করবো এমন দুঃসাহস আমার নেই। আল্লাহ্ আমার গুণাহ্ মাফ করুন। তবু একবার স্মরণ করে দেখুন—একদিন ছিল, যখন সমস্ত বিশ্ব লোপ পেলেও আমি কিছুতেই গৌণ বিবেচিত হতাম না। আমি ছিলাম অদ্বিতীয়। আজ আপনার সিংহাসন, আপনার সাম্রাজ্য, আপনার যশ, আপনার বিশ্বাস, আপনার হিংসা, লোভ, দর্প সব আমাকে অতিক্রম করে দশ দিকে বিক্ষিপ্ত। কিন্তু আপনি নির্দয়, আপনি অসরল, আপনি আত্মবঞ্চনাকারী।

নজীব : বিদায়ের পর্বটাকে আর কিছুতেই অমলিন থাকতে দিলে না। হয়তো এতটা আশা করা অনুচিত হয়েছে। হয়তো নারী মাত্রেই এই দুর্বলতার শিকার। স্নেহকে শৃঙ্খলে পরিণত করে, ভালোবাসাকে মোহে, বন্ধনকে বিকারে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো, জরিনা!

জরিনা : আপনাকে নয়, আবদালীকে নয়, সুজাউদ্দৌলাকে নয়। কাউকে কোনোদিন আমি ক্ষমা করবো না।

নজীব : হায় খোদা! জরিনা! তুমি অসুস্থ! তুমি অপ্রকৃতিস্থ।

জরিনা : আপনারা সব, স-ব আত্ম-সুখকাতর, সব আত্ম-বঞ্চনাকারী। কে আত্ম-স্বার্থ না খুঁজছে? কাবুল থেকে আবদালী ভারতে ছুটে এসেছে কেন? আপনার হৃত সিংহাসন উদ্ধার করে দেবার জন্য, হিন্দুস্থানে চন্দ্রতারকা খচিত পতাকা তুলে ধরবার জন্য? সে এসেছে তাঁর পিতৃহৃদয়ের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে। তাঁর সন্তান লাহোর অধিপতি তিমুর শাহ্‌কে যে মারাঠারা বিতাড়িত করেছে তাদের রক্ত শোষণ করতে চায় আবদালী। আবদালীর সৈন্যবাহিনীর স্বার্থ লুঠতরাজ, উৎসব উল্লাস। ভারত উদ্ধার, ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিতীয় চিন্তায় উদ্ভাসিত পোশাকি জৌলুস মাত্র। সুজাউদ্দৌলা উদ্বেগহীন, কারণ কোনো বিষধর সর্প তাকে এখনও পর্যন্ত ছোবল দেয়নি। দিলে সেও পাগল হয়ে উঠতো।

নজীব : হয়তো এ-সবই তোমার নিজের চিন্তার দ্বারা উদ্ভাসিত। হয়তো এর পেছনে অন্য কারো শিক্ষা তোমার ক্ষতাক্ত হৃদয়ের ওপর বিষ ঢেলে দিয়েছে। হয়তো এ কাজ আতা খাঁরই। কে জানে? আর দেরি করা সম্ভব নয় জরিনা। আমি চলি।

জরিনা : এক্ষুণি চলে যাবেন?

নজীব : কয়েক ঘণ্টা শিবিরের আশপাশ পরীক্ষা করে কাটাবো। সবার খোঁজ-খবর নেবো। তারপর হয়তো রাত অল্পই বাকি থাকবে। হয়তো এখানে ফেরার সময় আর পাব না। প্রধান সেনাপতির সঙ্গে মন্ত্রণায় যোগ দিতে হবে। চলি জরিনা।

জরিনা : আপনাকে রুখবে কে? যে পারতো সে নারী আমি নই। একদিন হয়তো আমি পারতাম। আজ সে ক্ষমতা অন্য কারো।

নজীব : এ কথার অর্থ?

জরিনা : যার সান্নিধ্য লাভ করে আমার শরীর তার চেতনাশক্তিকে আবিষ্কার করেছে, যার প্রতিকৃতি ধ্যান করে আমার দৃষ্টিশক্তিতে তীব্রতা এসেছে, সেই নবাব নজীবদ্দৌলা আমার চোখকে ফাঁকি দেবেন কী করে?

নজীব : কী বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো।

জরিনা : দেশ নয়, জাতি নয়, যশ নয়—যা আপনাকে এই অন্ধকার রাতে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সে অন্য কোনো নারী। অন্য কোনো নতুন জ্যোতির্ময়ী রমণী। হয়তো আমার মধ্যে আস্বাদিত পরিচিত রূপের সে সম্পূর্ণ বিপরীত। হয়তো সে কঠিন, প্রখর, বীর্যবতী। আমি যা নই হয়তো সে ঠিক তাই। অসিধৃতা, অশ্বারোহিনী, রণনিপুণা।

নজীব : জরিনা!

জরিনা : আপনার নিদ্রাহীন চোখে, অস্থির পদচারণায়, মুখের কঠিন তৃষাতুর রেখায় রেখায় আমি সে রমণীর ছায়ামূর্তি ভেসে বেড়াতে দেখেছি। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে চিৎকার করে তাকে ডাকি, তার নাম ঘোষণা করি।

সবাই তাকে দেখুক। তার ছদ্মবেশ ঘুচে যাক। সবাইকে আঙুল দিয়ে দেখাই যে সে পতি-বিদ্রোহী, পতি-ত্যাগিনী, পতি-বধে উদ্যোগী।

নজীব : তুমি এখন যে সব কথা বলছো তা কুৎসিত, অতি অলীক। এসব গর্হিত কথা কান পেতে শোনাও অপরাধ। যাঁর পুণ্য নামের প্রতি ইঙ্গিত করছো তাকে জানলে এ কথা তুমি উচ্চারণ করতে পারতে না।

জরিনা : আমারও সেই ক্ষোভ রয়ে গেল। অনেক অনুসন্ধান করেও তার নাগাল পাইনি। কেবল এইটুকু জেনেছি যে, সে এই শিবিরেই থাকে, আব নবাব নজীবদ্দৌলা তার আশ্রয়দাতা, তার ত্রাণকর্তা, তার দুঃখ-মোচনকারী।

নজীব : তুমি যার কথা বলছো তিনি আশ্রয়ের ভিখারি নন। কাজেই আমি তাঁর আশ্রয়দাতা নই। আত্মরক্ষায় তিনি অতিশয় সমর্থ। আমি কী করে তাঁব ত্রাণকর্তা হবো? তাঁর দুঃখ মোচন করা আমার সাধ্যাতীত, নইলে অবশ্যই তার কষ্ট হরণ করে নিতাম। তোমার আর কিছু বলবার আছে?

জরিনা : না।

নজীব : আমি তাহলে চলি। আবার কবে তোমাকে দেখতে পাবো—জানি না।

(দু'জন দু'জনকে অপলক চোখে দেখে। নজীব শেষ বাবের মতো নিজের যুদ্ধের পোশাক টেনে নেড়ে ঠিক করে নেয়। ধীর দৃঢ় পদক্ষেপে বেরিয়ে যায়। জরিনা নজীবের পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

[পর্দা পড়বে]

তৃতীয় দৃশ্য

[মধ্যরাত। উন্মুক্ত প্রান্তর। মন্নু বেগ একদৃষ্টিতে দূরে আঁধাব ভেদ করে কুঞ্জরপুর দুর্গ দেখছে। মারাঠা সৈনিকের পোশাক পরা অমররূপী আতা খাঁ এসে পেছনে দাঁড়ায়।]

মন্নু : তুমি আবার যাচ্ছো?

আতা খাঁ : জি।

মন্নু : এখন যাওয়াটা কি নিরাপদ মনে করো?

আতা খাঁ : না।

মন্নু : তাহলে যাচ্ছো কেন।

আতা খাঁ : যেতেই হবে। মারাঠা শিবির নড়তে শুরু করেছে। আলোগুলো দুলে দুলে লাফিয়ে লাফিয়ে অন্ধকারে এদিক-ওদিক হারিয়ে যাচ্ছে। একটু ভালো করে খোঁজ নিতে হবে।

মন্নু : যে আলো হারিয়ে গেছে তাকে খুঁজে বার করবে কী করে?

আতা খাঁ : আমি হয়তো পারবো। আমি অন্ধকারের জীব। অদৃশ্য আলোর হাতছানি আমি ঠিকই দেখতে পাবো।

মন্নু : আমি অন্ধকারে কিছুই দেখতে পাই না।

আতা খাঁ : অনেক আলো থেকে হঠাৎ অনেক অন্ধকারে এসে পড়েছেন তাই। সময়ে সয়ে যাবে।

মন্নু : সময় বড় কম। মাত্র বাকি রাতটুকু। তারপর সারাদিন নিষ্ক্রিয়তার ভান করে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবো। তারপর যেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, দীন দীন হুঙ্কার ছেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বো শত্রুসেনার মধ্যে। যতো অন্ধকার হয় ততোই ভালো।

আতা খাঁ : হাতে একদম সময় নেই। আমি যাই।

মন্নু : আল্লাহ্ তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন।

আতা খাঁ : কোনোক্রমে একবার দেখা পেলে হয়। আজ নির্ঘাত একটা এস্পার কি ওস্পার হয়ে যাবে। যদি কথার অবাধ্য হয় তাহলে হয় নিজের জান ঐখানে রেখে আসবো, না হয় ওর জান খতম করে দেবো।

মন্নু : মনের কথার ভাষা জনে জনে আলাদা। তার পরতে পরতে নানা রকম অর্থ-অনর্থ লুকিয়ে থাকে। অন্যের কথা দূরে থাক, যে বলে সে-ই কি সব সময় বুঝতে পারে কী বলছে ? তুমি যাও।

আতা খাঁ : বিনা ওজরে সঙ্গে আসে ভালো। নইলে সোজা হাত-পা বেঁধে কাঁধে ফেলে রওনা দেবো। কপালে যদি তাই লেখা থাকে খণ্ডাবে কে। আমার বোঝা আমাকেই বহন করতে হবে।

মন্নু : তার জন্য তাড়াতাড়ি করা দরকার, আতা খাঁ। এখানে আর সময় নষ্ট করা উচিত হচ্ছে না।

আতা খাঁ : ঠিক বলেছেন। তবে মানে, এই ভাবছিলাম। আরেকটু অপেক্ষা করে দেখবো কি-না ভাবছিলাম।

মন্নু : নিতান্ত এলোমেলো কথা বলছো। অপেক্ষা করবে কেন ? কার জন্য অপেক্ষা করবে ?

আতা খাঁ : মানে, আমি একাই যাবো ?

মন্নু : একা নয়তো দোসর পাবে কোথায় ? কে যাবে সঙ্গে ?

আতা খাঁ : এক সঙ্গে যেতাম। আপদে-বিপদে পরস্পরকে রক্ষা করতে পারতাম। কিছু ঝুঁকি কমতো।

মন্নু : এই পথে কেউ কাউকে রক্ষা করে না। তুমি একা যাও।

আতা খাঁ : আমি পথ চিনি। নিরাপদে পারাপার করতে পারি। ভোর হবার আগেই ফিরবো।

মন্নু : আমি অপারগ। তুমি যাও। এখন ইচ্ছে করলেও আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার পথ রুদ্ধ। মারাঠা শিবিরে প্রবেশের অধিকার হারিয়ে ফেলেছি।

আতা খাঁ : সে আমি বার করে দেবো।

মনু : তুমি বিদায় হও।

আতা খাঁ : আমার সঙ্গেই আছে। সেদিন আপনি ভুলে মারাঠা শিবিরে ফেলে এসেছিলেন, পাঞ্জাখানা আমি আসবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।

মনু : ফেলে দাও। ছিঁড়ে ফেলো। পুড়িয়ে ফেলো। তুমি দূর হও; দূর হও! (আতা খাঁ চলে যায়) আল্লাহ্ তোমার কল্যাণ করুন। তোমার মনস্কামনা সিদ্ধ হোক। আল্লাহ্ বিপদের হাত থেকে তুমি সকলকে রক্ষা করো! (আতা খাঁ কী মনে করে ফিরে এসেছে) আবার ফিরে এলে কেন ?

আতা খাঁ : পথে নেমে গা'টা কেমন ছমছম করতে লাগলো। আগে এ রকম কখনো হয়নি। পেছনে ফিরে মনে হলো আপনি যেন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে গেছেন।

মনু : আমার কিছু হয়নি।

আতা খাঁ : আপনি আরো কিছুক্ষণ এই দিকেই থাকবেন কি ?

মনু : শেষ রাত পর্যন্ত আছি।

আতা খাঁ : আমিও এই উত্তরাঞ্চলে থাকবো। কতোদূর যেতে পারবো জানি না। যদি বিপদে পড়ি সংকেত পাঠাবো।

মনু : যতোক্ষণ আছি লক্ষ রাখবো।

আতা খাঁ : আসি।

মনু : খোদা হাফেজ!

(চলে যাবে, মনু বেগ এক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। দূরে চলে গেলে কপালে হাত ঠেকিয়ে অন্ধকার ভেদ করে দেখতে চেষ্টা করে। নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়ান নবাব নজীবদ্দৌলা। মনু বেগের দৃষ্টি অনুসরণ করে তিনিও দেখতে চেষ্টা করেন কে যায়, কোথায় যায়।)

নজীব : কে গেল ?

মনু : আতা খাঁ।

নজীব : তুমি পাঠিয়েছো ?

মনু : না।

নজীব : কোথায় গেল ?

মনু : যেখানে ও যেতে চেয়েছে।

নজীব : তুমি যেতে চাওনি ?

মনু : এ-রকম করে নয়।

নজীব : কী রকম করে যেতে চাও ?

মনু : অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নয়। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আগে শত্রুকে শেষ করবো। তারপর শত্রু শিবিরে প্রবেশ করবো।

নজীব : শত্রু যদি অবধ্য হয়।

মন্নু : যে অবধ্য সে শত্রু নয়।

নজীব : কোনটা বেশি সত্য ? গত দেড়মাস ধরে নিশাচর পাখির মতো তোমার মনের চারধারে ডানা ঝটপট করে উড়ে মরেছি। এক মুহূর্তের জন্যও একটা নিশ্চিন্ত বিশ্বাস নিয়ে স্থির হতে পারিনি। শত্রু সৈন্যকে আঘাত করবার জন্য যখন উদ্যত অসি হাতে রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছো তখন কতোবার তোমার পৌরুষ, তোমার কাঠিন্য, তোমার হিংস্রতা দেখে মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু তার পরই চোখ মেলে অবাক বিস্ময়ে লক্ষ করেছি তুমি ভেতরে ভেতরে কতো শ্রান্ত, কতো অসহায়, কতো অশান্ত।

মন্নু এত সহজে ধরা পড়ে যাবো ভাবিনি। কী লজ্জা, কী দুঃসহ লজ্জা! আমার মতো সামান্য লোকের বুক চিরে কেউ আড়াল থেকে তার সত্যাসত্য পরীক্ষা করছে, কখনো ভাবিনি।

নজীব এ-সব কথা কখনো তোমার কাছে প্রকাশ করতে চাইনি। আমার কোনো আচরণে তোমার লজ্জা ও গ্লানি বাড়ুক এ আমি কোনো দিন চাইনি। আমার নিজের জীবনের গোপন অভিশাপ এই দুপুর রাতের অন্ধকার প্রান্তরে আমাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াচ্ছে। অতর্কিত আক্রমণ করে আমার বুদ্ধি-বিবেক সব হরণ করে নিয়েছে। আমার মুখে যে কথা অশোভন, তোমার কানে যে উক্তি অশ্রাব্য, বা সর্বকালের জন্য অপ্রকাশ্য ও অনুচ্চারণীয়, সে সব কথাই যেন আজ দুর্বার হয়ে উঠতে চাইছে।

মন্নু কেন ? যা কোনোদিন বলেননি আজ তা কেন বলবেন ? উপকার ছাড়া আপনার কাছ থেকে কোনো অপকার পাইনি। আজ কেন তার ব্যতিক্রম হবে ?

নজীব তোমাকে সব কথা খুলে বলা সম্ভব নয়। এক কাণ্ডজ্ঞানহীন মেয়ে কিছুক্ষণ আগে, আমার চেতনার শান্তি, শৃঙ্খলা, সংযম সব দলে তছনছ করে দিয়ে গেছে। তোমার কাছে ছুটে এসেছি আমার হৃদয়ের রক্তক্ষরণকে রুদ্ধ করবার আশা নিয়ে। কৃপা করো।

মন্নু এ আপনার অন্যায় প্রার্থনা! অন্যায়, অসঙ্গত এবং নির্মম। একটুখানি স্থিরতা, একটুখানি দৃঢ়তা, একটুখানি নিশ্চয়তার মোহে উন্মাদের মতো রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রকাশ করেছি। বীর পুরুষের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ফিরেছি। আমার কাছে কাতরতা প্রকাশ করা মানে আমাকে আঘাত করা। আচমকা ধাক্কা দিয়ে নিচে ফেলে দেয়া।

নজীব আমি অমানুষ নই। কিন্তু ভয় পেয়ে গেছি। কেমন যেন মনে হচ্ছে সময় আর বাকি নেই। শেষ হয়ে গেছে। কী হবে বাণী অব্যক্ত রেখে ? মাঝখানে মাত্র কয়েক ঘণ্টা স্তব্ধ কালো রাত। তারপরই আকাশ পাতাল পৃথিবী তোলপাড় করে ফেটে পড়বে প্রলয়। রণহুঙ্কার, বারুদ বিস্ফোরণ, অগ্নিশিখা আর রক্তস্রোতের লাল আভায় মন্নু বেগ, ইব্রাহিম কার্দি, নবাব নজীবদ্দৌলা কোথায় হারিয়ে যাবে কে জানে।

(এখান থেকে একটা বিপদ সংকেতের শিঙ্গা মাঝে মাঝে শোনা যাবে।)

মন্নু : আমি হারিয়ে যাবো না। আমি নিজেকে জয় করেছি। আজ আমি জয়ী। আপনি যদি সত্যই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হন তবে আমার এই প্রতিষ্ঠা থেকে আপনি আমায় আসনচ্যুত করতে চাইবেন না। আমাকে আমার স্বধর্ম থেকে বিচলিত করে আপনার কী লাভ?

নজীব : তুমি জয়ী। সত্যি জয়ী। তোমাকে শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি। হিংসা করি। ও কীসের সঙ্কেত?

মন্নু : হয়তো আতা খাঁ বিপদাপন্ন আমি যাই।

নজীব : আমি গেলে অপরাধ হবে?

মন্নু : না।

নজীব : শব্দটা দক্ষিণ প্রান্ত থেকে ভেসে এসেছে। যদি এখনো এদিকেই থাকে আমি খোঁজ নিয়ে বার করতে পারবো। তুমি এদিকে লক্ষ রাখো।

মন্নু : আপনি কি এদিকে আবার ফিরে আসবেন?

নজীব : নিতান্ত প্রয়োজন না হলে নয়।

মন্নু : খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

(নজীবের প্রস্থান)

(মন্নু বেগ এদিক ওদিক দেখতে চেষ্টা করে। চারিদিকে দেখার চেষ্টা করতে করতে মঞ্চে ঢোকে সুজাউদ্দৌলা।)

সুজা : কিছু বুঝতে পারলে?

মন্নু : জি।

সুজা : শব্দটা একবার মনে হয় উত্তর দিক থেকে আসছে; আবার মনে হয় দক্ষিণ দিক থেকে আসছে। কিছুতেই জায়গাটা ঠাহর করতে পারছি না। তবে কেউ যে একটা সংকেত পাঠাবার চেষ্টা করছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কোন পক্ষের লোক কাকে কী সংবাদ পাঠাচ্ছে, কে জানে?

মন্নু : খুব সম্ভব আতা খাঁ।

সুজা : ওহ্।

মন্নু : আমাকে সংকেত পাঠাতে চেষ্টা করছে হয়তো।

সুজা : ওহ্, আমি খামোখা উদ্বিগ্ন হচ্ছিলাম।

মন্নু : উদ্বেগের কারণ হয়তো মিথ্যে নয়। ঐ যে আবার বেজে উঠলো। আমাকে বলে গিয়েছিল যে বিপদে পড়লে সংকেত পাঠাবে।

সুজা : তা হলে তো আর কোনো কথাই নেই। বোঝা যাচ্ছে যে কেউ তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে বিপদে পড়েছে। এর মধ্যে আমি নেই।

মন্নু : একটু আগে নবাব নজীবদ্দৌলা ঐ সংকেতের ধ্বনি অনুসরণ করে ওর খোঁজে বেরিয়ে গেছেন।

সুজা : কোন দিকে গেলেন?

মন্নু : দক্ষিণ দিকে।

সুজা : তা উনি যেতে পারেন। ছদ্মবেশধারীদের সম্পর্কে নবাব নজীবদ্দৌলার কৌতূহল ও উৎকণ্ঠা অপরিসীম।

মন্নু : ছদ্মবেশধারীরা যতো কৌতুকের পাত্র তার চেয়ে বেশি করুণার যোগ্য।

সুজা : কিছুই অসম্ভব নয়। তবে এই যে তোমাদের আতা খাঁ রোজ কতোবার করে যে পোশাক বদলায় আর শিবির পাল্টায় তার কোনো ইয়ত্তা নেই। আমার তো সন্দেহ হয়, কেবলমাত্র মজা করবার জন্যেও মাঝে মাঝে ভোল বদলায়। ওর একটু শিক্ষা হওয়া মন্দ নয়।

মন্নু : আর আমার ?

সুজা : তোমাকে আমি কী বলবো। তোমার ত্রাণকর্তা তুমি নিজে। তুমিই তোমার বিবেককে জিজ্ঞেস করো।

মন্নু : আমার মনে আর কোনো সংশয় নেই। আমি মুক্ত। এই ছদ্মবেশ, এই অন্তরাল আমাকে সর্বক্ষণ অপমানের মতো বিঁধছে।

সুজা : নিজেকে বেশি শাস্তি দিও না। মুখোশ না পরে কে ? মন উদাম করে চলে এমন বীর দুনিয়ায় ক'জন আছে ? আমি তুমি কেউ তার ব্যতিক্রম নই। তবুও তুমি মহৎ এইজন্য যে তোমার আবরণ মনে নয়, পোশাকে। তোমার ছদ্মবেশ অন্তরে নয়, বহিরঙ্গে। তোমার রূপ, তোমার ভালোবাসা তোমার জ্বালা কিছুই তার আড়ালে ঢাকা পড়ে থাকে না।

মন্নু : ঐ যে আবার সংকেত বেজে উঠলো।

সুজা : সংকেত কাকে ডাকছে ? তোমাকে না আমাকে ?

মন্নু : আপনি যতো সন্দেহ করেছেন ততো পরামর্শ আমার সঙ্গে হয়নি।

সুজা : আমি কিছুই সন্দেহ করিনি। কেবল তোমার অনুমতি চাইছিলাম, আমি খোঁজ করবো কি না।

মন্নু : সে আপনার মেহেরবানি।

সুজা : একটু আগে শব্দটা দক্ষিণ কোণ থেকে আসছিল। এখন মনে হচ্ছে অনেক উত্তরে সরে এসে ডাকছে। কাকে কেন ডাকছে কে জানে। দেখি খোঁজ নিতে পারি কি না।

(প্রস্থান)

(মন্নু বেগও উদ্বেগের সঙ্গে অন্য দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যায়। উত্তেজিত ও উৎকণ্ঠিত চেহারা নিয়ে ঢোকে মারাঠাবেশী আতা খাঁ। কাউকে না দেখে আবার বেরিয়ে যেতে উদ্যত হয়। আতা খাঁ হঠাৎ লক্ষ করে মন্নু বেগ ফের মঞ্চে প্রবেশ করেছে। মন্নু বেগ আতা খাঁকে দেখে চমকে ওঠে।)

মন্নু : এ-কী! এরি মধ্যে তুমি ফিরে এসেছো ?

আতা খাঁ : না। এখন পর্যন্ত যেতে পারিনি। মাঝ পথে আটকা পড়ে গিয়েছিলাম।

মন্নু : বাঁশি বাজাচ্ছিল কে ?

আতা খাঁ : আমি।

মন্নু : ছিলে তো নিজেদের আঙ্গিনার মধ্যেই। বিপদ এলো কোত্থেকে ?

আতা খাঁ : আমি কোনো বিপদে পড়িনি।

মন্নু : বাঁশি বাজাচ্ছিলে কেন তাহলে ?

আতা খাঁ : আপনাকে ডাকছিলাম। কিন্তু যিনি এগিয়ে আসছিলেন তাকে এড়াতে আবার আমাকে সরে অন্যদিকে চলে যেতে হচ্ছিল।

মন্নু : এড়াতে চাইছিলে কেন ? আমায় ডাকছিলে কেন ? মাঝপথ থেকে ফিরে এলে কেন ? তোমার কোনো কথারই অর্থ স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না।

আতা খাঁ : আমি এড়াতে চাইবো কেন ? আমার সঙ্গে যিনি ছিলেন তিনি এড়াতে চাইছিলেন।

মন্নু : কেন ?

আতা খাঁ : তিনি আর কাউকে চাননি। শুধু আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চেয়েছেন।

মন্নু : কে ?

আতা খাঁ : এইখানেই তো দাঁড়িয়েছিলেন। ঐ যে। ঐ আসছেন। উনি নিজেই আসছেন। আমি আশে পাশেই থাকবো। আল্লাহ্ না করুন, যদি বিপদ বুঝি সংকেত জানাবো। খুব হুঁশিয়ার থাকবেন।

(প্রস্থান)

(মঞ্চে প্রবেশ করবে ইব্রাহিম কার্দি)

মন্নু : কে ?

কার্দি : আমি।

মন্নু : তুমি ? কী চাও ? কেন এসেছো ?

কার্দি : বলছি। আর কাছে এগুবো না। এখান থেকেই বলছি।

মন্নু : কাছে আসবে না কেন ? কে তোমাকে রুখতে পারে ?

কার্দি : জানি তুমি ভীরু নও। কিন্তু আমি ভীরু। আমি কাপুরুষ। নিজেকে এবার চিনে ফেলেছি। আর সাহসের বড়াই করি না। যা বলার এখান থেকেই বলছি।

মন্নু : বলা শেষ হলে চলে যাবে ?

কার্দি : যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব।

মন্নু : আর কিছু নয় ? শুধু এইটুকুর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে এখানে ছুটে এসেছো ?

কার্দি : এটুকুই এখন আমার কাছে অসীম অনন্ত। তোমার কোনো ভয় নেই। আজ তোমার কাছে আমি কিছুই চাইতে আসিনি।

মন্নু : কেন নয়? কেন চাইবে না?

কার্দি : সেদিন আমার অশান্ত অপূর্ণ হৃদয় নিজের মত্ততায় অস্থির হয়ে তোমাকে আক্রমণ করে ক্ষতবিক্ষত করেছে। আজ সে তোমার ধৈর্য, তোমার প্রশান্তি, তোমার সমগ্র সত্তার শক্তি ও সুষমা প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ।

মন্নু : ছদ্মবেশ। সব ছদ্মবেশ। বিশ্বাস করো, সব ছদ্মবেশ।

কার্দি : আজ তুমি আমায় ঠকাতে পারবে না। আজ আমি পরিপূর্ণ, আজ আমি সত্যি জয়ী। তোমাকে চিনেছি, নিজেকেও চিনেছি। তোমার সঙ্গে আমার আর কোনো বিরোধ নেই।

মন্নু : কী কঠিন! কী পাষাণ তুমি! তুমি আরো ভীরু, আরো দুর্বল, আরো সামান্য হলে না কেন? এতই যদি দিগ্বিজয়ী হয়ে থাকো তাহলে আজ এলে কেন, এখানে এলে কেন?

কার্দি : প্রথম ভেবেছিলাম আসবো না। রণক্ষেত্রে যতোটুকু দেখতে পাবো তা দিয়েই মনের তিয়াস মিটাবো। তারপর হঠাৎ এক সময়ে মনের মধ্যে একটা ভয় ঢুকে গেল। যদি সেখানে তোমার সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা না হয়। হয়তো এমন এক সময় এসে তুমি আমার সামনে দাঁড়াবে যখন রক্তের বন্যায় এক প্রান্তর ডুবে গেছে। ঢেউয়ের দোলায় আমি কেবলই নিচের দিকে তলিয়ে যাচ্ছি। তোমাকে দেখবো বলে যতোবার চোখ খুলতে চাইছি ততোবারই রক্তের ঝাপটায় সব গুলিয়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে।

(বাইরে বিপদ সংকেত ধ্বনিত হবে ও মাঝে মাঝে বাজবে)

মন্নু : তুমি মায়া-মমতাশূন্য! তুমি ভয়াবহ! তোমাকে আমি চিনি না।

কার্দি : তোমাকে নয়ন ভরে দেখে নিলাম। আসুক জরা, আসুক মৃত্যু, আর ভয় করি না। তুমি আমার জন্য মিছেমিছি উৎকণ্ঠিত হয়ো না। সকল জ্বালা আমি মন থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি। পেরেছি যে সেও তোমারি দান। আজকে তোমাব যে রূপ আম আমার মনের মধ্যে এঁকে নিয়ে গেলাম, রক্তের উচ্ছ্বাসে আমার চোখ যদি ঢেকেও যায়, তবু সে আলো নিভবে না, থাকবে। তুমি আমার শক্তি, আমার গর্ব, আমার রাণী।

[বাঁশি বেজে ওঠে জোরে। কার্দি বেরিয়ে যায়। অশ্রুবিকৃত মুখে মন্নু বেগ এদিক ওদিক দেখে।]

[পর্দা পড়বে]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[আবদালীর মন্ত্রণা-কক্ষ]

আবদালী : আজ আমরা জয়ী। সমগ্র পানিপথ মারাঠা সৈনিকের রক্ত আর লাশে ঢেকে দিয়েছি। আপনাদের সকলের সাহস ও সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

সুজা : সকল প্রশংসাই আল্লার প্রাপ্য। আমরা উপলক্ষ মাত্র। আর যদি এই রণে জয়ী হওয়ার কথা বলেন তবে তার যশ-গৌরব ষোল আনা আপনার প্রাপ্য। এত বড় একটা বাহিনীকে শৃঙ্খলার সঙ্গে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত করার ক্ষমতা আমাদের কারো ছিল না।

আবদালী : একটি একটি করে মারাঠা সেনাপতির পরাজয় বা মৃত্যুবরণ করার সংবাদ শুনেছি আর প্রবলতর উৎসাহে সেনা পরিচালনায় উদ্যোগী হয়েছি। পানিপথের প্রান্তরে মারাঠাদের গৌরব-রবি যত দ্রুত অস্তমিত হতে দেখেছি ততই নব উন্মাদনায় চিত্ত ভরে উঠেছে। নব শক্তিতে শিথিল বাহু কঠিন হয়ে ফুলে উঠেছে।

সুজা : বাদশার পরাক্রম জগতে সুবিদিত।

আবদালী : আমাদের নিজেদের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কি খুবই ভয়াবহ?

সুজা : জাঁহাপনা স্বচক্ষে দেখেছেন।

আবদালী : যা দেখেছি তা অবর্ণনীয়। লাশের উপর লাশ, তার পর লাশ। কেউ উপুড় হয়ে, কেউ চিৎ হয়ে, কেউ দলা পাকিয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরেছে, আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে ধরেছে। নানা জনের কাটা কাটা শরীরের নানা অংশ তালগোল পাকিয়ে এক জায়গায় পড়ে আছে। রক্তে রক্ত মিশেছে। কার সাধ্য এই রক্ত-মাংস-অস্থি হাতড়ে শত্রু-মিত্র বেছে বেছে আলাদা করে।

সুজা : তবু চেষ্টা করতে কেউ কসুর করে না। এখনও অনেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। লাশ উল্টে-পাল্টে মশালের আলোতে পরীক্ষা করে দেখছে প্রিয়জনের মুখের আদলের সঙ্গে কোনোরকম মিল অবশিষ্ট আছে কি-না।

আবদালী : আমি জানি।

সুজা : বিশ্বাস রাওয়ের লাশও আমাদের সৈনিকরা উদ্ধার করে এনেছে।

আবদালী : বিশ্বাস রাওয়ের লাশ চিনতে পারলে কী করে? সনাক্ত করেছে কে?

সুজা : আমি। চিনতে কোনো কষ্টই হয়নি। পেশবার এই সুন্দর সুকুমার কিশোর পুত্রকে যে একবার দেখেছে সেই মনে রেখেছে। মরণ সে মুখশ্রীকে নষ্ট

করতে পারেনি। এত কোমল, এত স্নিগ্ধ, এত উজ্জ্বল মনে হতে চায় না যে এ লাশ।

আবদালী : আমাদের হিন্দু রাজকর্মচারীদের নির্দেশ দিন যাতে উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে মৃতের সৎকার করা হয়। হতভাগ্য অদূরদর্শী কর্মফলভোগী পেশবা। নিজের ছেলেকে রণক্ষেত্রে অধিনায়ক করে পাঠিয়েছিল কুলগর্বের মোহে অন্ধ হয়ে। আর অক্ষম অবিবেচক রণোন্মাদ সেনাপতি রঘুনাথ সেই বালকের দুঃসাহসকে প্রশ্রয় দিয়ে নিজে মরেছে, একটি নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক মানব শিশুকে অকাল মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সুজা : রঘুনাথ সম্ভবত প্রাণ নিয়ে পানিপথ ত্যাগ করতে পারেননি।

আবদালী : ইব্রাহিম কার্দি ?

সুজা : আহত। বন্দি। স্বচক্ষে দেখিনি এখনও।

আবদালী : কতটা আহত ?

সুজা : শুনেছি আঘাতে আঘাতে সর্বাঙ্গ নাকি বিকৃত হয়ে গেছে। অজ্ঞান অবস্থায় বন্দি হয়েছেন।

আবদালী : চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ?

সুজা : কারাগারের ভেতরই সকল রকম শুশ্রূষার ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আবদালী : প্রহরীরা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য ?

সুজা : বাদশার নিজস্ব দেহরক্ষীদের মধ্যে থেকে বেছে নিয়ে দু'জন বিশ্বস্ত লোককে প্রহরী নিযুক্ত করা হয়েছে।

আবদালী : উত্তম। উত্তম। মন্নু বেগ কোথায় ?

সুজা : হয়তো বেশ পরিবর্তন করতে বিলম্ব হচ্ছে, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য এতক্ষণ এখানে এসে যাওয়া উচিত ছিল।

আবদালী : মন্নু বেগ কি সব শুনেছে ?

সুজা : শোনা অসম্ভব নয়।

আবদালী : নবাব সুজাউদ্দৌলা।

সুজা : জি।

আবদালী : মন্নু বেগ হয়তো এক্ষুণি এসে পড়বে। হয়তো অনেক কথা বলবে, অনেক কথা জানতে চাইবে—আমি, আমি তাকে কী জবাব দেবো ?

সুজা : যা জানেন তাই বলবেন। আপনি যা বলতে চাইবেন, তাই বলবেন। আপনার গৌরব তাতেই বৃদ্ধি পাবে।

আবদালী : নবাব নজীবদ্দৌলা কোথায় ?

সুজা : সামান্য আহত হয়েছেন। সম্ভবত তার যত্ন নিতে গিয়ে আটকে পড়েছেন। ঐ যে ওরা আসছেন।

আবদালী : ভালো। আপনি চলে যাবেন না। আমি আজ অন্য কারো সঙ্গে একা একা কথা বলতে চাই না।

সুজা : জি।

(নবাব নজীবদ্দৌলা বাহু ও মাথার ক্ষত পরিষ্কার কাপড়ে বেঁধে নিয়েছেন। মন্নু বেগ পুরুষ সৈনিকের বেশ বহুলাংশে ত্যাগ করেছেন। দু'জনে প্রায় এক সঙ্গেই ঢুকবেন। অভিবাদন বিনিময় হবে।)

আবদালী : খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন। (নজীবকে) আপনি আহত হয়েছেন শুনে আমরা দুঃখিত ও চিন্তিত হয়েছি।

নজীব : আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার আঘাত অতি সামান্য। এখন এক বকম নম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি।

আবদালী : আপনার সাহস ও রণকৌশলের যে সকল সংবাদ লাভ করেছি, তাতে আরেকবার প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতে মুসলিম শক্তি চিরকাল আপনার নেতৃত্ব লাভ করতে পারলে পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করবে।

নজীব : চিরকাল বড় দীর্ঘ সময় শাহেনশাহ্। আপাতত এই বর্তমান মুহূর্তে যে আপনার প্রশংসা লাভ করতে পারলাম সেটাই আমার পরম সৌভাগ্য।

আবদালী : মন্নু বেগের কী অভিমত ?

মন্নু : নবাব নজীবদ্দৌলা মুসলিম শিবিরে অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ। তিনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র।

আবদালী : যে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা মহাভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলাম তা হয়তো অনেকখানি চরিতার্থতা লাভ করেছে। এই যুদ্ধে যারা প্রাণদান করেছেন তাদের কথা স্মরণ করে আমাদের বিজয়োল্লাস কিছুদিন স্থগিত রাখা আমি সমীচীন মনে করি।

নজীব : বাদশা নিজের সুবিবেচনায় যা স্থির করেন তাই অনুসরণযোগ্য হবে। তবে আমার মত এই যে বিজয়ী সেনাবাহিনী হত এবং মৃতের জন্য শোক প্রকাশ করবে বলে জয়োল্লাসকে অবদমিত করে রাখে না। আনন্দোৎসব বাসী হলে তার নিজস্ব মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে যায়।

আবদালী : কিন্তু যেখানে বিজয়ীর ক্ষতি ও ক্ষয় বিজিতের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়, সেখানেও কি উৎসবের আলোকমালা সমান তেজে জ্বলে ?

নজীব : যতো বড় ক্ষতি ততো বড় লাভ—এই তো জগতের নিয়ম। এ নিয়ে আফসোস করবো কেন! আমি মনে করি আমার সৈন্যবাহিনী তাদের বিজয়োৎসবকে সার্থক করে তোলার জন্য যে বস্তু দাবি করেছে বাদশার তা দান করা উচিত।

মন্নু : তারা কী চাইছে ?

নজীব : নবাব সুজাউদ্দৌলা তা জানেন।

আবদালী : তারা কী চায় ?

নজীব : তুচ্ছ অচল মৃত বিশ্বাস রাওয়ের লাশ।

মন্নু : কেন ?

নজীব : মৃত হোক তবু সে পেশবার পুত্র। তাদের সকল ঘৃণা ও রোষের প্রতীক পেশবার সন্তানের লাশ। উৎসব মঞ্চের একটি প্রধান অলঙ্কাররূপে বিবেচিত হবে। উৎসবের পরিবেশকে একটা তীব্রতা, একটা গাঢ়তা দান করবে।

আবদালী : আমি অপারগ। রাজকীয় সম্মানের সঙ্গে যেন বিশ্বাস রাওয়ের মৃতদেহের সৎকার করা হয়, আমি ইতিমধ্যেই তার ব্যবস্থা করতে বলে দিয়েছি।

নজীব : আপনি মহানুভব।

আবদালী : সাধারণ সৈনিককে শান্ত করবার জন্য উপায় উদ্ভাবন করুন।

সুজা : মনে হচ্ছে তারা শান্ত হবে না বলে বদ্ধপরিকর। নবাব নজীবদ্দৌলা একা তাঁর নিজস্ব সৈন্যবাহিনীকে নিরস্ত্র করতে পারলেও সমগ্র সেনাবাহিনীকে নিয়ন্ত্রিত করবে কে ? তারা সব প্রতি মুহূর্তে আরোও বেশি অশান্ত, বেশি অবাধ্য, বেশি মত্ত হয়ে উঠেছে। সামনে শত্রু নেই। হয় নিহত, নয় পলাতক। কিন্তু আক্রমণের যে অগ্নিশিখা লক্ষ হৃদয় জুড়ে দাউদাউ করে জ্বলে উঠছে তা নিভতে চাইছে না। চারদিকে লকলক করে ছুটে যাচ্ছে। রোধ করতে না পারলে যা পাবে তাই গ্রাস করবে।

নজীব : কেবল আজ নয়, নবাব সুজাউদ্দৌলার উক্তি বরাবরই উদাস, উদ্দীপনাহীন, হতাশাব্যঞ্জক। আজকের জয়ের প্রদীপ্ত মুহূর্তেও তিনি নিজের ভাবলোকে সুপ্ত, কর্মলোকে নিস্তেজ। আমি এই যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য গর্বিত। জয় লাভের জন্য আনন্দিত। আমার সৈন্যবাহিনীর সকল আচরণে সন্তুষ্ট।

আবদালী : মন্নু বেগের কোনো অভিযোগ আছে ?

মন্নু : না।

আবদালী : কোনো দাবি, কোনো প্রার্থনা ?

মন্নু : নবাব নজীবদ্দৌলার লাশ প্রার্থনা আপনি মঞ্জুর করেননি। আমার প্রার্থনা যে করবেন তার কি নিশ্চয়তা আছে ?

আবদালী : করে দেখো। নবাব নজীবদ্দৌলা লাশ প্রার্থনা করেছিলেন। তুমি জীবন প্রার্থনা করো, অবশ্যই তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

মন্নু : বাদশা হয়তো আমাকে নিতান্ত শিশু বিবেচনা করেছেন। ভাবছেন, এর দাবি এত ক্ষুদ্র যে তা মেটান মোটেই দুঃসাধ্য হবে না। যদি হয় তাহলে ক্ষতি নেই। নানা রকম ছলনার দ্বারা মন ভুলিয়ে রাখা যাবে।

আবদালী : তুমি আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর অবিচার করছো, মন্নু বেগ।

মন্নু : না হলে হয়তো ভেবেছেন এখন এ আর সৈনিক নয়, সামান্য রমণী মাত্র। পুরস্কার লাভের সম্ভাবনায় আবেগে দিশাহারা হয়ে হয়তো এমন এক অসম্ভব বস্তু প্রার্থনা করে বসবে যে তা চরিতার্থ করার প্রশ্নই উঠবে না। অট্টহাসির ফুৎকারে তাকে উড়িয়ে দিলেও কেউ তার প্রতিবাদ করবে না, তাকে অসঙ্গত ভাববে না।

আবদালী : তুমি লক্ষ করোনি, আমি তোমাকে এখনো মন্নু বেগ বলেই সম্বোধন করেছি। বীরপনায় তুমি মুসলিম শিবিরে রত্নস্বরূপ। এই যুদ্ধে জয়লাভের তুমি অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ। তুমি বীর এবং মহান। তুমি তরুণ কিন্তু শক্তিমত্ত। তুমি কঠিন কিন্তু করুণাময়। তুমি জয়ী, তুমি তুষ্ট, তুমি ক্ষুব্ধ, তুমি দুঃখী। তোমার সঙ্গে আমি কৌতুক করতে যাবো কেন ?

মন্নু : আশা জাগিয়ে যদি বাদশা পরে তা কেড়ে নেন, সে আঘাত আমি সহ্য করতে পারবো না। সে নিষ্ঠুরতার তুলনা থাকবে না।

আবদালী : তোমাকে অদেয় কিছুই নেই।

মন্নু : ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্তি দিন।

নজীব : শুনেছিলাম ইব্রাহিম কার্দি গুরুতররূপে আহত হয়েছেন। তিনি কি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ ?

সুজা : আমি জানি না।

(ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করেছে অমরেন্দ্রনাথ-বেশী আতা খাঁ। পোশাকের সর্বত্র রক্তের বড় বড় ছোপ।)

অমর : আমি জানি।

মন্নু : একী আতা খাঁ ? কোথায় ছিলে এতদিন ? তোমার একী দশা হয়েছে ? কখন এলে ?

অমর : একটু আগে ফিরেছি।

আবদালী : তুমি কী জানো ?

অমর : ইব্রাহিম কার্দির জ্ঞান ফিরে এসেছে। এতদিন পর এই প্রথম স্বাভাবিক নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছেন। চিকিৎসক ও শুশ্রুষাকারীরা অল্পক্ষণ হলো তাঁকে নিরিবিলি ঘুমুতে দেবার জন্য নিজেরা কারাকক্ষ ত্যাগ করে চলে এসেছেন।

মন্নু : আমি এখনও বাদশার জবাব শুনতে পাইনি।

আবদালী : মঞ্জুর। এর চেয়ে বড় দাবি হলেও প্রত্যাখ্যান করতাম না।

অমর : (নজীবকে) বেগম সাহেবা আপনাকে সংবর্ধনা জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন। আপনাকে অনুসন্ধান করছেন।

নজীব : আমাকে মাফ করবেন। বাদশার সঙ্গে একটু পরে এসে আবার সাক্ষাত করবো।

(প্রস্থান)

মন্নু : আমি এখনি একবার কারাগারে যাবো। এখনি তাকে মুক্ত করে নিয়ে আসতে চাই। অপেক্ষা করতে পারবো না!

আবদালী : শান্ত হও। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই। একটু অপেক্ষা করো। মুক্তির ফরমান স্বাক্ষর করে এখনি তোমার হাতে দিয়ে দিচ্ছি।

(প্রস্থান)

মন্নু : হিরণবালা কোথায় ?

আতা খাঁ : হিরণবালা কোথায় !

মন্নু : সে কী! তুমি একলা ফিবে এসেছো ?

আতা খাঁ : না।

মন্নু : কোথায় রেখে এসেছো তাকে ?

আতা খাঁ : বাইরে।

মন্নু : বাইরে কেন ?

আতা খাঁ : মরে গেছে। আমি যখন তাকে খুঁজে পেলাম, তখন সে মরে পড়ে আছে। লাশটা কাঁধে ফেলে বয়ে নিয়ে এসেছি। আপনারা অপেক্ষা করুন, আমি গিয়ে মুক্তির ফরমানটি নিয়ে আসি।

(প্রস্থান)

সুজা : আপনাকে উপদেশ দিতে চেষ্টা করা আমাব পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবু আপনার চেয়ে বয়সে বড়, সম্ভবত বেশি অভিজ্ঞও বটে—এমন কোনো পুরুষের কাছ থেকে দুর্দিনে পরামর্শ গ্রহণ কবাকে যদি হেয়জ্ঞান না করেন তাহলে কিছু বলতে পারতাম।

মন্নু : দুর্দিন নয়, আজ আমার সুদিন। আমাব নব জীবনের স্বর্ণময়, রত্নময় উজ্জ্বল উষা।

সুজা : আপনাকে আরো শক্ত হতে হবে।

মন্নু : আমি কেন অযথা আতঙ্কিত হবো ? আতা খাঁ কী বলেছে আপনি শোনেন নি ? তার জ্ঞান ফিরেছে। তিনি এখন শান্তিতে ঘুমুচ্ছেন। আমি যাবো। আমি এক্ষুণি তার কাছে যাবো। কারো কোনো পরামর্শে আমি বিচলিত হতে চাই না।

সুজা : ইব্রাহিম কার্দির জ্ঞান যে ফিরে এসেছে এর মধ্যেও কি আতঙ্কের কিছু নেই ? জ্ঞান যদি আর কোনোদিন ফিরে না আসতো, তবে তার মধ্যেও কি কোনো মঙ্গল লুকানো থাকতো না ? আবদালীর কাছে হাত পেতে যে মুক্তি আপনি ভিক্ষা করে পেলেন, ইব্রাহিম কার্দি কি তা কখনো সজ্ঞানে গ্রহণ করতে পারবে ?

মন্নু : আপনি দার্শনিক। বুদ্ধি দিয়ে সব কিছু বিচার করতে অভ্যস্ত। আমি নারী। আমি হৃদয় দিয়ে বিশ্ব জয় করবো। ইব্রাহিম কার্দিকে মুক্ত করবো। তাকে এই হৃদয়ের রক্ততলে বন্দি করবো। আপনি কেন আমাকে সংকল্পচ্যুত করতে চেষ্টা করছেন ?

সুজা : প্রত্যাখ্যানের আঘাত যদি কখনও অভাবিতরূপে কঠিন হয়, তবু যেন তা সইতে পারেন তার জন্যে আপনাকে তৈরি থাকতে বলি। আমি যদি আপনি হতাম, তাহলে আজকে এই মুহূর্তে বাদশাকে দিয়ে বন্দিমুক্তির ফরমান সই করিয়ে নিতাম না। নিলেও তাকে মুখ্য কর্ম বলে গণ্য করতাম না। তার ওপর নির্ভর করে আশায় বুক বাঁধতাম না। মরণ যেখানে বাসা

বেঁধেছে তার নাম কারাগার নয়।

(আতা খাঁর প্রবেশ)

আতা খাঁ : ফরমান নিয়ে এসেছি।

মন্নু : আর দেরি করবো না। তাড়াতাড়ি চলো।

(দু'জনের প্রস্থান)

সুজা : আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।

(পর্দা পড়বে)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[কারাগারের সামনে। দুই প্রান্তে দু'জন রক্ষী। বশির খাঁ ও রহিম শেখ। বশির খাঁ টহল দিতে দিতে এক সময়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এইমাত্র ধড়ফড় করে জেগে উঠেছে। রহিম শেখ অন্য প্রান্তে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।]

বশির : আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, না ?

রহিম : জানি না।

বশির : লক্ষ করোনি ?

রহিম : না।

বশির : নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। নইলে মাথার পাগড়ি মাটিতে গড়াগড়ি যাবে কেন ? আমার ফুফা মস্ত বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি বলতেন, পুরুষ মর্দের পাগড়ি মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি যাবে শুধু একবারই, সে হলো যখন মাথা শরীর থেকে আলগা হয়ে মাটিতে পড়ে যাবে তখন, তার আগে নয়।

রহিম : তোমার ফুফা তোমাকে জানতো না।

বশির : আল্লাহ্ করেন, তোমার যেন তাই হয়। পাগড়িটা গড়িয়ে মাটিতে পড়বার আগে মুণ্ডুটা যেন খসে পড়ে।

রহিম : আল্লাহ্ যেন তাই করেন।

বশির : কেউ এসেছিল ?

রহিম : না।

বশির : চিকিৎসকদের কেউ ?

রহিম : না।

বশির : একবার মনে হলো ভেতর থেকে কে যেন ডেকে উঠলো।

রহিম : ভুল শুনেছো।

বশির : তুমি দেখছি সবই শুনেছো, সবই দেখেছো, কেবল আমার পাগড়িটা কখন গড়িয়ে পড়ে গেল তাই লক্ষ করোনি।

রহিম : করেছি।

বশির : তখন যে বললে করোনি ?

রহিম : বানিয়ে বলেছিলাম।

বশির : বানিয়ে বলেছিলে ?

রহিম : তোমার পাগড়ি আমিই খোঁচা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিলাম।

বশির : তবু ভালো, খোঁচা দিয়ে মণ্ডুটা ফেলে দিতে চাওনি। কিন্তু এই কৌতুকের কারণ ?

রহিম : পরীক্ষা করে দেখেছিলাম তুমি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছো কিনা।

বশির : কেন ?

রহিম : ভেতরে ঢুকে বন্দিকে একবার দেখে আসতে চেয়েছিলাম।

বশির : রহিম শেখ। এ সব তুমি কী বকছো ?

রহিম : খুব সাবধানে অগ্রসর হতে চেষ্টা করেছি, যাতে কেউ টের না পায়।

বশির : তুমি সত্যি ভেতরে গিয়েছিলে ?

রহিম : গিয়েছিলাম।

বশির : কী করেছো তুমি ?

রহিম : কিছু করিনি।

বশির : তুমি সর্বনাশ করেছো। তুমি জানো না তুমি কী সর্বনাশ করেছো!

রহিম : আমি কিছু করিনি। আমি শুধু কাছ থেকে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম কার্দির শায়িত দেহটা ভালো করে দেখেছিলাম।

বশির : অত কাছ থেকে কেন দেখতে গেলে ?

রহিম : দেখি বন্দি গভীর ঘুমে অচেতন। এত গাঢ় ঘুম, মনে হলো যেন এর কোনো শেষ নেই। এর জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। হঠাৎ বুঝতে পেরে আমি নিজে যেন চেতন-অচেতন জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

বশির : তুমি কী করেছো আল্লাহ্ জানেন। দোহাই তোমার সত্য কথা বলো।

রহিম : তুমি যা সন্দেহ করেছো আমি তা করিনি।

বশির : তোমার হাতে এ কীসের দাগ ?

রহিম : লাল রঙ জমাট বেঁধে কালচে হয়ে গেছে।

বশির : কোত্থেকে এলো ?

রহিম : ইব্রাহিম কার্দির বক্ষ থেকে।

বশির : এই বললে শুধু কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে। এখন বলছো তাঁর বুকের রক্ত তোমার হাতে লেগে রয়েছে। সব কথা স্পষ্ট করে স্মরণ করতে চেষ্টা করো।

রহিম : আরো ভালো দেখবার জন্যে একবার তার বুকের ওপর হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে দেখছিলাম।

বশির : তুমি তাঁর পাঁজরের ওপরে হাত রেখেছিলে ?

রহিম : রেখেছিলাম। অনেক রক্ত লেগেছিল সেখানে। কিন্তু সব এত নিষ্পন্দ আর ঠাণ্ডা মনে হলো যে, শিউরে উঠে হাত সরিয়ে নিয়েছি। কারা যেন এদিকে আসছে।

বশির : তোমার কোনো কথা আমি বিশ্বাস করি না। যা করেছো করেছো, এখন আর আবোল-তাবোল বকতে হবে না। প্রাণে বাঁচতে চাও তো মুছে ফেলো। আমার এই পাগড়ির ভাঁজের মধ্যে ভালো করে রগড়ে হাত দুটো মুছে ফেলো। (নিজেই সাহায্য করে) কেউ এলে যা বলতে হয় আমিই বলবো। তুমি কোনো কথা বলো না।

(দুই প্রহরী দুই প্রান্তে। মঞ্চে প্রবেশ করে নজীবদ্দৌলা ও জরিনা বেগম। প্রহরীদ্বয় অভিবাদন জানিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে।)

জরিনা : তবু বোধ হয় দেরি করে ফেলেছি। আপনার জন্যই বঞ্চিত হলাম।

নজীব : আমার দোষ কোথায় আমি এখনও বুঝতে পারছি না। তাড়া দিচ্ছিলে বটে, কিন্তু ধরেও রাখছিলে। দু'দিক সামাল দিয়ে যতো তাড়াতাড়ি পেরেছি ছুটে এসেছি।

জরিনা : দেখছেন না সব কী রকম চুপচাপ। ওরা হয়তো এসে ফিরে গেছে।

নজীব : আমার সে রকম মনে হয় না। হয়তো এখন পর্যন্ত কেউ এসে পৌঁছায়নি। জোহরা বেগম নিশ্চয়ই বাদশার স্বাক্ষরযুক্ত মুক্তির ফরমান না নিয়ে এখানে ছুটে আসবেন না। একটু দেরি হওয়া স্বাভাবিক।

জরিনা : এদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।

নজীব : (প্রহরীকে) বন্দির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কেউ এসেছিলেন কি ?

বশির : জি না ?

নজীব · দেখলে তো ? তুমি অযথা হয়রান হচ্ছিলে।

জরিনা : আমার ব্যগ্রতার কারণ আপনি বুঝবেন না। অনেক গুনাহ করেছি আজ তার কিছু স্খলন করতে চাই। জোহরা বেগম আর ইব্রাহিম কার্দির পুনর্মিলনের দুর্লভ মুহূর্তটি স্বচক্ষে দেখে জীবন সার্থক করতে চাই।

(প্রবেশ করবে আতা খাঁ, সুজা ও সম্পূর্ণ রমণীর রূপসজ্জায় মঞ্চ আলোকিত করে জোহরা বেগম। আতা খাঁ প্রহরীদ্বয়কে দেখেই চমকে ওঠে। একবার একে আরেকবার ওকে দেখে। তারপর এগিয়ে যায় রহিম শেখের দিকে। জরিনা গিয়ে জোহরা বেগমের বাহু স্পর্শ করে। অন্য পার্শ্বে সুজাউদ্দৌলা। রহিম শেখ বাদশার স্বাক্ষরযুক্ত মুক্তির ফরমান উদ্বেগহীন চোখে দেখে এবং দেখেও তেমনি একই অর্থশূন্য দৃষ্টি মেলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে। এগিয়ে এসে ফরমানটি হাতে তুলে নেয় বশির খাঁ। পড়ে। পড়ে কুর্নিশ করে সরে দাঁড়ায়। ভেতরে চলে যাবার জন্য ইঙ্গিত করে কারাদ্বারের দিকে হাত প্রসারিত করে দেয়।)

সুজা : নিশ্চয়ই ইব্রাহিম কার্দি এখনো খুব দুর্বল। প্রচুর রক্তপাতের ফলে হৃদয়যন্ত্রের ক্রিয়া অস্বাভাবিক রকম দ্রুত হয়ে পড়েছে। এ সময়ে অবাঞ্ছিত মুক্তির এই আকস্মিক সংবাদ কি না দিলেই নয় ?

জোহরা : আমি চিকিৎসককে আসতে খবর দিয়েছি। নিশ্চয়ই তিনি এর কোনো প্রতিকার জানেন।

সুজা : চিকিৎসকের কর্মও প্রকৃতির নিয়মের অধীন। তিনি রোগের কারণ বার করতে পারেন, তার প্রতিকারের জন্য ওষুধের ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, কিন্তু বিনা কালক্ষেপে নিরাময়ের নিশ্চয়তা দান করা তার সাধ্যাতীত। আপনি যদি ধৈর্যধারণ করতে সক্ষম হন তবে আমি এখনও বলি এ সাক্ষাৎ আরো কিছুদিন স্থগিত থাকুক। কারাগারের অন্ধকার কুঠুরির মধ্যে অবসাদগ্রস্ত যে সৈনিক তার আশাহীন জীবনের অন্তিম মুহূর্তকে প্রত্যক্ষ করে তার জ্যোতিহারা চোখের সামনে অকস্মাৎ জীবনের ও রূপের এই দৃষ্টিসম্মোহনকারী প্রদীপ্ত ঐশ্বর্য নিয়ে আবির্ভূত হওয়া সঙ্গত হবে না।

জোহরা : তাঁর জীবনে আমি আকস্মিক নই, আমি স্বাভাবিক। অন্ধকারটা স্বপ্ন, অলীক। আলোটাই সত্য, আলোটাই স্থায়ী। আমি ছাড়া ইব্রাহিম কার্দির জীবনে বাকি সব মিথ্যা মিথ্যা মিথ্যা!

সুজা : আমার একটা শেষ মিনতি রক্ষা করবেন ?

জোহরা : হয়তো করবো না, কিন্তু তবু বলুন।

সুজা : আপনার অনুমতি পেলে, প্রথমে আমরা কেউ কারাগারে প্রবেশ করি। আপনি এখানে বা অন্যত্র কোথাও অপেক্ষা করুন। আমরা ক্ষেত্র প্রস্তুত করি, হৃদয়ে আলো জ্বালি, শরীরে বল সঞ্চার করি—তারপর আপনাকে সংবাদ প্রেরণ করলে আপনিও আসবেন।

জোহরা : আমি এই মুহূর্তে একা সকলের আগে কারাগারে প্রবেশ করছি। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন, আমি আপনাদের ডেকে পাঠাবো।

সুজা : হঠাৎ যদি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হয়, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি যদি—

জোহরা : আমার সঙ্গে জরিনা বোন যাবে। আপনারা বাইরে অপেক্ষা করুন। আমি আর দেরি করতে রাজি নই। চলো।

(জোহরা ও জরিনার প্রস্থান)

(সব স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। তারপর অকস্মাৎ সেই স্তব্ধতা বিদীর্ণ করে ভেতর থেকে ধ্বনিত হয় জোহরার তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ— ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! ইব্রাহিম! সবাই দৌড়ে কারাগারের ভেতরে ছুটে যায়। বশির খাঁ ভয়ার্ত বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে থাকে রহিম শেখের দিকে। রহিম শেখের মুখ সামান্য বিকৃত হয়, স্পন্দিত হয়, তারপর নিশ্চল পাথরের মূর্তির ভ্রম সৃষ্টি করে। পেছন থেকে ধীরে ধীরে ধ্বনিত হতে থাকে—জরিনার কণ্ঠে শোনা যাবে : আল্লাহু লা ইলাহা

ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা খুযুহু সিনাতু ওয়ালা নাওম। লাহু মা ফিস্‌সামাওয়াতে ওয়াল আরদে...তারপর আবার—আফা হাসিবতুম আন্নামা খালাক্‌নাকুম আবাসাউ, ওয়া-আন্নাকুম, এলাইনা লা তুরজাউন—আবৃত্তির কণ্ঠ কিন্তু নিচু হবে যখন রোরুদ্যামানা উদ্‌ভ্রান্ত জোহরা বেগম আবার মঞ্চে প্রবেশ করবেন। পেছনে পেছনে আসবেন সুজাউদ্দৌলা।)

জোহরা : তুমি কেন সাড়া দিলে না? কেন জেগে উঠলে না? কেন ঘুমিয়ে পড়লে? আমি এত কষ্টের আগুনে পুড়ে, মনের বিষে জরজর হয়ে এত রক্তের তপ্তস্রোত সাঁতরে পার হয়ে তোমাকে পাবার জন্যে ছুটে এলাম—আর তুমি কিনা ঘুমিয়ে পড়লে। ঘুমের কোন অতল তলে ডুবে রইলে যে আমি এত চিৎকার করে ডাকলাম তবু তুমি একবারও শুনতে পেলে না। আহা! ঘুমোও। আমি তোমাকে জাগাবো না। তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি, অনেকদিন তুমি ঘুমোওনি। চোখের দু'পাতা মুদে মনের আগুনের লকলকে শিখাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও আড়ালে ঠেলে দিতে পারোনি। কষ্ট, ঘুমের বড় কষ্টে ভুগেছো তুমি। ঘুমোও! আরো ঘুমাও' প্রাণ ভবে ঘুমাও!

সুজা : আল্লাহ্ যা করেন মঙ্গলের জন্যই করেন। বাদশার যিনি বাদশা খোদ তিনি মুক্তির ফরমান জারি করেছেন। দুনিয়ার এক সামান্য বাদশাব ফরমানের চেয়ে তার দাম অনেক বেশি। যিনি প্রকৃত বীর ও মহান তিনি দুয়ের মধ্যে মেকিটা ঠেলে ফেলে দিয়ে সাচ্চাটা কুড়িয়ে নিয়েছেন। ছোট মুক্তিটাকে অবহেলা করে বড় মুক্তিটাকে আলিঙ্গন করেছেন। খোদা তাঁকে শান্তিতে রাখুন।

(সুজাউদ্দৌলা ও জোহরা বেগম দর্শকদের দিকে পেছন ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে। কারাগারের ভেতর থেকে তখন কারো গায়ের দামি কালো জরিপাড় শাল দিয়ে ঢেকে একটি খাটের ওপর শায়িত মৃত ইব্রাহিম কার্দিকে বহন করে বেরিয়ে আসে আতা খাঁ ও নজীবদ্দৌলা, আরো দুজন সাহায্যকারী। পেছনে তখনও শোনা যাবে : আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়ুম। লা তা খুযুহু সিনাতুঁওয়ালা নাওম...। আফা হাসিবতুম আন্নামা খালাক্‌নাকুম আবাসাউঁ, ওয়া-আন্নাকুম এলাইনা লা তুরজাউন...ইত্যাদি। ক্রমশ একাধিক কণ্ঠে সম্মিলিতভাবে আবৃত্তিও হতে থাকবে। লাশ বহনকারীরা ধীরে ধীরে মঞ্চ ত্যাগ করবেন।)

[যবনিকা]

চিঠি

চরিত্র

পুলিশ অফিসার	:	আসাদুজ্জামান, মীনার ভাই
অধ্যাপক	:	বদরুল হাসান
ছাত্র	:	সোহরাব
		খালেদ
		তারেক
		রমীজুদ্দিন
		আফতাব
		খয়ের
ছাত্রী	:	মিস মীনা মিনহাজ
		মিস রমা জোয়ারদার

এবং আরো কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(ছাত্রাবাসের একটি প্রায়ান্ধকার কক্ষ। তিন বান্দা হাজির। সোহরাব অতি উত্তেজিতভাবে পদচারণা করছে এবং ঘনঘন জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তারেককে লক্ষ করছে। তারেক পুতুলের মতো নিশ্চল হয়ে চৌকির কোণে বসে আছে। মাঝে মাঝে অর্থহীন দৃষ্টি মেলে ইতিউতি তাকাচ্ছে। খালেদ চৌকির ওপর ক্রীড়ানির্দেশক কেতাব মেলে রেখে অমানুষিক নিষ্ঠার সঙ্গে ফাঁকা বাতাসে ব্যাট সঞ্চালন করে কাল্পনিক বল দিয়ে ক্রিকেট খেলা অভ্যাস করছে। কসরতগুলো ঠিক হচ্ছে কি-না, মাঝে মাঝে খেলা থামিয়ে বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে সেটা পরীক্ষা করে এবং মিলিয়ে নিতে চেষ্টা করে। সোহরাব, তারেক কী বলাবলি করছে, তা সে শুনছে কি শুনছে না, বোঝা যায় না।

যখন পর্দা উঠছে তখন নেপথ্যে বেশ দূরে দূরে অবস্থিত দুটো ঘণ্টা ঢন্ ঢন্ করে বাজছে। প্রথমে ধ্বনি দূরাগত। ক্রমশ নিকটবর্তী হতে থাকে। মনে হবে যেন বাদক দু'জন চক্রাকারে ছুটতে ছুটতে পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে। একবার ঘন্টার দ্বৈত ধ্বনি প্রচণ্ড সংঘর্ষে ফেটে পড়ে। বাদক দু'জন ছুটতে ছুটতে আবার পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। ঘন্টা মৃদু থেকে মৃদুতর হয়।

রঙ্গমঞ্চে ছিটকে পড়ে এক চিল্‌তা আলো। সেই আলোতে উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে সোহরাব, তারেক, খালেদ।)

সোহরাব : তোমার এই হতভম্ব ভাব, এই সরলতা মাখা হকচকানো চাহনি, এই যুক্তিহীন রুদ্ধকণ্ঠ আমার মনে বিন্দুমাত্র সহানুভূতির উদ্রেক করে না।

খালেদ : ওকে এবার ছেড়ে দাও সোহরাব। আরম্ভ করেছ সেই বিকেল থেকে। এখন শেষ রাত। সেহেরির প্রথম ঘণ্টা পিটিয়ে দিয়েছে। এবার ওকে রেহাই দাও।

তারেক : আমি ইচ্ছে করে দিইনি। নিয়ে নিল।

সোহরাব : তুমি দুগ্ধপোষ্য শিশু। বাহু বলহীন। চরণ টলোমলো। তাই তোমার কাছ থেকে মিস মীনা মিনহাজ অবলীলাক্রমে খাতাটা কেড়ে নিয়ে গেল। অবুঝ তুমি, কিছুই করতে পারলে না। এসব কথা বলতে লজ্জা করে না তোমার ?

খালেদ : এ বেচারার ওপর কামান দাগা বৃথা। মিস মীনা মিনহাজকে তুমিও ভালো মতন চেন। জঙ্গি মেজাজের মেয়ে। তারেক তো তারেক, দরকার মনে করলে ও-মেয়ে তোমাকে সুদ্ধ চিবিয়ে খেতে পারে।

সোহরাব : মেয়েদের খাদ্য হিসেবে নিজেকে সুস্বাদু করে তোলার সাধনা আমি করি না। সে রাজ্যের বাদশা তুমি। আল্লাহ্ তোমাকে চেহারা সুরৎ-ও খুব দিয়েছে। তার ওপর সেটাকে মেজে ঘসে সব সময় এমন তরতাজা করে রাখ যে, সাধ্য কি রমণী-হৃদয় নির্লিপ্ত থাকে। খেলার মাঠে কারদানি দেখিয়ে অন্যের চোখে যতই ধুলো দাও না কেন, তোমার আসল নিশানা কি, সে আমি ভালো করে জানি।

খালেদ : কী জান ?

সোহরাব : তুমি কপট। তুমি নিপুণ। তুমি খোলা সড়কের পথচারী নও, তুমি সুড়ং পথের যাত্রী। কেবল আছ আনন্দ পানের ফিকিরে। নিজের জন্য উল্লাসময় মুহূর্ত নির্মাণের ব্যস্ততায় বিসর্জন দিয়েছ সর্বপ্রকার দায়িত্বশীলতাকে। তোমাকে চিনতে আর বাকি নেই।

খালেদ : তুমি সবাইকে চেন। কেবল নিজেকেই এখনো চিনে উঠতে পারলে না।

সোহরাব : বুজরুকি রাখ! মেয়েলি চিঠির হেঁয়ালিপনা আমার ওপর আরোপ করতে চেষ্টা করো না। অন্যের জীবনে যেমন রহস্যের অস্তিত্ব স্বীকাব করি না, তেমনি নিজের জীবনেও আমি কোনো রকম আলো-আঁধারী ভাব জমে উঠতে দিইনি। আমি প্রেমিক নই। আমি হিংসুক। উদারতাব ধার ধারি না। আমি লোভী এবং কঠিন। আমি অবিশ্বাসী এবং বিদ্বেষী। যা গ্রাস করতে না পারব, তা আমি ভেঙ্গে তছনছ করে ফেলে দেব।

খালেদ : দাও না কেন, নিষেধ করছে কে ?

সোহরাব : তার আগে তারেককে একবার ভালো করে দেখে নিতে চাই। আমার টিউটোরিয়াল খাতা আমি তোমাকে এক নজর দেখতে দিয়েছিলাম, মিস মীনা মিনহাজের কাছে সে খাতা কী করে গেল ?

তারেক : আমি দিই নি। উনি নিয়ে নিয়েছেন।

সোহরাব : সেই সন্ধেরাত থেকে এই একই বুলি তোমার মুখে শুনছি—'আমি দিইনি, উনি নিয়ে নিয়েছেন।' আমার জিনিস নেবেন কেন ? তুমি নিতে দেবে কেন ? তুমি ভালো করে জান যে আমার নাম সোহরাব, আমি খালেদ নই। ক্রীড়াশীলতা আমার স্বভাব নয়। আমি জঙ্গি মেজাজের ছেলে। রমণীর চিত্র ঘরে শোভা বর্ধন করে, এ আমি বিশ্বাস করি না। সে ছবি হৃদয়ে স্থাপন করলে চিত্ত মহানন্দে নৃত্য করতে থাকে, সে মুখ বক্ষে ধারণ করতে পারলে মর্তলোকেই জীবন অনন্ত সুখময় বলে অনুভূত হয়—এই সব আত্মবঞ্চনাকর প্রলাপ-বাণীতে আমার বিন্দুমাত্র আস্থা নেই। তুমি কি ভেবেছ মিস মীনা মিনহাজের পদ্মপলাশ নেত্র আমার হস্তাক্ষরের নাগপাশে বাঁধা পড়ে থাকবে, এই আশায় আমি আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে যাব ? আমার খাতা তুমি হাতছাড়া করলে কেন ?

তারেক : তোমার খাতাটা সামনে মেলে রেখে সেমিনারে চুপচাপ বসেছিলাম। অন্য টেবিলটার এক কোণে মাথা নিচু করে মীনা মিনহাজ পড়ছিলেন। এক পাশ থেকে তাঁর ঘাড়ের সবটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।

খালেদ : চোখ তো বললে মেলে রেখেছিলে সামনে খুলে রাখা সোহরাবের খাতার ওপর। একপাশ থেকে অন্য কোন্‌খানে তখন কী দেখা যাচ্ছিল বা যাচ্ছিল না, তা ঠাহর করলে কী করে ?

তারেক : আমি সোহরাবের নোট পড়ছিলাম না।

সোহরাব : অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছ। নিজের সম্পর্কে এত পরিপূর্ণ ধারণা রাখে এমন আদমি শতেকে একজন মেলে। যখন তুমি আমার খাতাটা চেয়ে নিলে, আমি তখনই তোমাকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম। আমার হস্তাক্ষর ছাড়া অন্য কিছুর মর্মোদ্ধার করতে তুমি সমর্থ হবে, এমন দুশ্চিন্তা কস্মিনকালেও আমার মনে উদিত হয়নি। কিন্তু পড়ে যদি নাই বুঝবে তবে খাতাটা চেয়ে নিলে কেন ?

তারেক : ভেবেছিলাম চেষ্টা করে দেখব। ভেবেছিলাম তোমার লেখা যদি তোমার কথার মতো না হয় তবে হয়তো বুঝেও ফেলতে পারি।

সোহরাব : সে চেষ্টা করলে না কেন ? সামনে খাতা খুলে রেখে অন্য পাশ দিয়ে আরেকজনের সবটা কাঁধ দেখতে গেলে কেন ?

তারেক : মিস মীনা মিনহাজ মাথা নিচু করে পড়ছিলেন। এক পাশ থেকে ঘাড়ের সবটা অংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। গলায় ভাঁজ পড়েছে—শঙ্খের মতো রেখা রেখা। সোনার সরু শিক্‌লিটা চিকচিক করছে। কিছু নরম গুঁড়ো চুল ফ্যানের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছিল।

খালেদ : খামোখা জেরা করছ। দেখতে পাচ্ছ না হুঁশ ফেরেনি। এখনও সেই সেমিনারের ঘোরের মধ্যে আটক হয়ে আছে।

সোহরাব : কিন্তু কেন ? আমিও সেই রহস্যই ভেদ করতে চাই। আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক এত ঘনিষ্ট নয় যে, আমার খাতা খোয়া গেছে বলে ও শোকে অসাড় হয়ে পড়বে। চৈতন্য হারাতে হলে আমাকে হারাতে হয়। কারণ আমার সন্তানকেই ডাইনি এসে তুলে নিয়ে গেছে। তোমরা মিস্‌ মীনা মিনহাজকে জান না, পরীক্ষার ব্যাপারে একেবারে রাক্ষসী! প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘায়েল করতে ওর কুহকের অন্ত নেই। আমার খাতাটা ও চিবিয়ে খাবে, নিজেরগুলো তার সঙ্গে মিশিয়ে চিবোবে। তারপর পরীক্ষার খাতায় সে সব জিনিস এমনভাবে উগরে দেবে যে, সাধ্য কি পরীক্ষকরা তাকে দ্বিতীয় স্থানে ফেলে রাখে। সেই শোকে আমি মুহ্যমান। কিন্তু এত বড় কাণ্ড হৃদয়ঙ্গম করার মতো কল্পনাশক্তি ওর নেই। তবু এই নবকুমার এত কাতরাচ্ছে কেন, সেইটাই এখনও বুঝে উঠতে পারছি না।

খালেদ : পারা উচিত। তোমার কথার তোড়ে আক্কেল গুড়ুম হবে না, এমন দৃঢ়চিত্ত তালেব-এলেম এখনও এই মহাবিদ্যালয়ে দাখেল হয়নি।

সোহরাব : আমার খাতা সামনে মেলে ধরে তুমি কী পড়ছিলে ?

তারেক : একটা চিঠি।

সোহরাব : চিঠি ? আমার খাতার মধ্যে ?

তারেক : মিস মীনা মিনহাজকে উদ্দেশ্য করে লেখা। লেখা আমার নয়, কিন্তু প্রতি ছত্রের ভাব যেন আমারই অন্তরের উত্তাপ মাখানো।

সোহরাব : এই চিঠির ভাব-ভাষা কী ছিল, তার রচয়িতা কে সে-সব কথা জানবার জন্য আমার মনের মধ্যে অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে। অবশ্যই তা তোমাকে নিবৃত্ত করতে হবে। কিন্তু তার আগে আরেকটা কথার জবাব দিয়ে নাও। জবাবের জন্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করব। প্রর্থনা করি তোমার সরলতা যেন মহা ভয়ানক কপটতা বলে প্রমাণিত না হয়, তোমাব মন্থর বুদ্ধি যেন বীভৎস ষড়যন্ত্রের উৎসস্থল হয়ে না দাঁড়ায়।

তারেক : তোমার সন্দেহ অমূলক। তুমি যা আশঙ্কা করছ তাই হয়েছে।

সোহরাব : অসম্ভব। মিস মীনা মিনহাজ তোমার কাছ থেকে আমার খাতাটা যখন ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তুমি বলতে চাও, ঐ কথিত প্রেমপত্রটি তখনও তার মধ্যে ছিল ?

তারেক : খাতা থেকে পত্র বিযুক্ত করার সময় পেলাম কোথায় ? ওনাকে আচমকা এগিয়ে আসতে দেখে খাতাটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। উনি বন্ধ খাতাটাই তুলে নিয়ে চলে গেলেন।

(একটা কাল্পনিক বলের আঘাতে খালেদ আউট হয়ে যায়। ব্যাট উঁচুতে তুলে হতাশা জ্ঞাপন করে। মাটিতে বসে পড়ে তারেকেব মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সোহরাব ক্ষণকালের জন্য বাকশক্তি হারিয়ে ফেলে। দরজায় কারা যেন টোকা দেয়। সাড়া না পেয়ে ঢুকে পড়ে। রমীজুদ্দিন, আফতাব, খয়ের প্রমুখ ডাইনিং হলে সেহরি খেতে যাবার পথে সোহরাবদের ঘরে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে। পোশাক-পরিচ্ছদ সেই অনুযায়ী।)

রমীজ : আপনারা সেহরি খেতে যাবেন না ? ধর্মকর্মের সঙ্গে যে বেশি যোগাযোগ রাখেন না তা সকলেই জানে। কিন্তু সেহরিতে শরিক হতে অবহেলা, এমন সচরাচর ঘটে না। বিশেষ করে যেদিন মেনু মুরগি আর দই। ব্যাপার কী, সব এ-রকম চুপ মেরে বসে রয়েছেন কেন ?

আফতাব : হয়তো আমরা হঠাৎ এসে পড়ে ওদের কোনো গোপন মন্ত্রণাসভায় বাধা দিলাম।

খয়ের : সবাইকে যেন কী রকম গমগিন দেখা যাচ্ছে।

রমীজ : কিছুই বিচিত্র নয়। এনারা সবাই হলেন আধুনিক দুনিয়ার বাসিন্দা। চলনে-বলনে সর্বপ্রকার ঐতিহ্যের বিরোধী। স্ত্রী-স্বাধীনতা খর্ব হতে দেখলে এদের মুখে অন্ন রোচে না। অবাধ মেলামেশায় এঁরা জবরদস্ত প্রচারক। অন্যায় বলেছি কিছু ?

খালেদ : বিলকুল না।

রমীজ : তবে সম্প্রতি তিনজনেই কোনো বিশেষ বিমারিতে আক্রান্ত হয়েছেন। খুব পেরেশান মালুম হচ্ছে। খোদা নাখাস্তা, একই প্রেমের পীড়নে তিনজনেই জমা'তে জ্বালা-যন্ত্রণা অনুভব করেছেন না তো!

সোহরাব : প্রেমের চতুর্দশ বংশ নিপাত যাক্।

রমীজ : তা যাক্। সে বিমারি না হইলেই ভালো। বিশেষ করে এ-রকম এজমালিভাবে। হলে এলাজ করানো মুশকিল হতো।

সোহরাব : আমাদের উন্নতি কামনা করা ছাড়াও আপনার মনে বোধহয় আরো কিছু গুরুতর উদ্দেশ্য রয়েছে। নইলে দল বেঁধে আসতেন না। বাইরেও মনে হচ্ছে অনেকে অপেক্ষা করছেন।

রমীজ : করছেন। তাহলে সরাসরি কাজের কথায় আসা যাক্।

সোহরাব : কথা হলেই আমার চলে। কাজের না অকাজের সে বিষয় বরাবর অন্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে রাখি।

রমীজ : ওহ্! বেশ! আপনি বোধহয় খবর পেয়ে থাকবেন যে, আজকে আমতলায় একটি বিরাট ছাত্রসভার আয়োজন করেছিলাম। তাতে আমরা সাধারণ ছাত্ররা, সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমরা আমাদের আগামী যাবতীয় পরীক্ষাসমূহের তারিখ পেছোবার জন্য জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলব। যদি কর্তৃপক্ষ তারিখ পিছিয়ে দিতে রাজি হন ভালো; না হলে আমরা পরীক্ষা বর্জন করতে বদ্ধপরিকর। আমরা ঘুরে ঘুরে সবার মতামত সংগ্রহ করেছি। আপনি কি পরীক্ষা দেয়ার পক্ষে, না বিরুদ্ধে ?

সোহরাব : বিরুদ্ধে। একশ'বার বিরুদ্ধে। আমি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সত্য-মিথ্যা সব কিছুর বিরুদ্ধে। আমি মন দেয়া-নেয়ার বিরুদ্ধে, তার জন্য নানারকম কলাকৌশল উদ্ভাবন করার বিরুদ্ধে। গুন গুন করে কথা বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলার বিরুদ্ধে। কথা না বলে চিঠি লেখালেখির বিরুদ্ধে। আমাকে আদৌ জানেন না বলে আমার ওপর অযথা দোষারোপ করছেন। আমি প্রেমের বিরুদ্ধে। মিলনের বিরুদ্ধে। বিরহের বিরুদ্ধে। আমি পরীক্ষার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষা দেয়ার বিরুদ্ধে। সংঘবদ্ধভাবে পরীক্ষা না দেয়ার বিরুদ্ধে। আপনাদের আর কিছু বলবার আছে ?

রমীজ : আছে। কিন্তু তার আগে আপনার কথাগুলো একবার ভালো করে ভেবে দেখি। আপনিও আমাদের কথাগুলো আরেকবার মনের মধ্যে নেড়েচেড়ে দেখবেন। আমরা ইতিমধ্যে আরো কয়েকটা ঘর ঘুরে আসি। ফেরার পথে আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আপনাকে জানিয়ে যাব।

খয়ের : ছা আ ত্র ঐক্ ক্য অ!

(ভেতরের তিনজন এবং বাইরের অনেকে সমস্বরে নারা লাগায় : জিন্দাবাদ! পরপর তিনবার, ক্রমোচ্চ কণ্ঠে। তারপর তিনজনই কাতার দিয়ে বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতা)

সোহরাব : পত্রে কী লেখা ছিল!

তারেক : স্বগত উক্তির মতো। এলোমেলো জিজ্ঞাসা। আত্মধিক্কার। না বলা কথার কোলাহল। অপ্রকাশের বোঝা সহ্য করতে না পেরে কেন কেউ কাণ্ডজ্ঞান

হারায়, দিশাহারা হয়ে, শত্রুতা করতে থাকে—ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এসব কথাই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে।

সোহরাব : এ সব কথা তুমি লিখেছ! তোমার চিন্তার জটিলতার এই নবতম পরিণতি লক্ষ করে আতঙ্কে আমার তালু পর্যন্ত শুকিয়ে যাচ্ছে। মিস মীনা মিনহাজ হয়তো এখন, এই মুহূর্তে, বদ্ধ নিঃশ্বাসে এই পত্র পাঠ করছেন। প্রতি শব্দের কন্দরে আমার কান্নাভরা কাতর মুখ কল্পনা করে অনুকম্পায় বিগলিত হয়ে যাচ্ছেন। হয়তো আমার স্বভাবের মধ্যে অকস্মাৎ এক গ্রাম্য গোপনীয়তা, এক অমার্জিত ঔদ্ধত্য আবিষ্কার করে রক্তরঞ্জিত মুখে রাগে গরগর করছেন। কাল বিশ্বাবিদ্যালয়ে দেখা হওয়া মাত্র অসম্বৃত উল্লাসে আমার দিকে ধেয়ে আসতে পারেন, প্রেমের বন্যায় আমাকে প্লাবিত করে দিতে পারেন, হয়তো তেড়ে আসবেন আমাকে প্রহার করবার জন্য, নাকচ করে দেবেন চিরকালের জন্য একটি মাত্র ভ্রুকুটির বিচ্ছুরিত ঘৃণায়! কে জানে তিনি কী করবেন। তোমরা এখন আমাকে বলে দাও আমার কী করা উচিত।

খালেদ : কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি তো আর চিঠি লেখোনি! তুমি খামোখা এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

সোহরাব : আমার খাতার পাতায় লেখা চিঠি আমি অস্বীকার করব কী করে! বাগে পেয়েও মিস মীনা মিনহাজ আমাকে ছেড়ে দেবেন ভেবেছ!

তারেক : তোমার খাতার মধ্যে ছিল বটে। কিন্তু চিঠিটা একটা আলাদা কাগজে লেখা হয়েছিল।

সোহরাব : নিজে যদি লিখতেই পারলে, নিজের খাতার মধ্যে গুঁজে রাখলে না কেন? সরাসরি মিস মীনা মিনহাজের করপদ্মে গুঁজে দিলে না কেন?

তারেক : চিঠির মুসাবিদা আমার নয়।

সোহরাব : দয়া করে বলবে কি, কোন্ অংশটা তোমার? হৃদয়টা মিস মীনা মিনহাজকে দিয়ে দিয়েছ, বুদ্ধি বাঁধা রেখেছ পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে, স্বাস্থ্য ডাক্তারের জিম্মায়! চিঠির মুসাবিদা কাকে দিয়ে করালে?

তারেক : খালেদ লিখে দিয়েছে।

সোহরাব : ওহ্। তুমি! তাই বলো। আমি আরও ভেবে ভেবে হয়রান এই প্রেম চট্‌কানো নাটুকে চিঠি লেখার মতো পরিপক্কতা তারেক কী করে অর্জন করল। এ তাহলে তোমার কারসাজি।

খালেদ : দেখ বাপু, তোমার কথাবার্তা শুনে আতংকিত হব না এমন বীরপুরুষ আমি নই। তবে বিশ্বেস করো আমি কোনো রকম দুরভিসন্ধি নিয়ে ওকে পত্র লিখে দেইনি।

সোহরাব : মিস মীনা মিনহাজ সম্পর্কে তোমার মনেও লালসার ভাব জেগেছে, আগে টের পাইনি।

খালেদ : কী যা তা বকছো! পুকুরপাড়ে বসে বসে তারেক নানারকম মেয়ে সম্পর্কে

ওর চিন্তাধারা আমাকে শোনাচ্ছিল। ওকে সাহায্য করবার জন্য একসময় প্রস্তাব করলাম যে যদি ও চায় তাহলে ওর মনের কথা আমি বাংলায় পত্রাকারে গুছিয়ে লিখে দিতে পারি। এসব কথা ইংরেজিতে পেশ করার রেওয়াজ থাকলে সে-কাজ ও নিজেই আমার চেয়ে শতগুণ ভালোভাবে করতে পারত।

সোহরাব : তুমি সাধু! পরোপকারী! কিন্তু অন্যের হয়ে নিজে পরনারীর হৃদয় লেহন করতে অস্বস্তি বোধ করলে না ?

খালেদ : রমীজুদ্দিনের দেয়া একটি প্রচারপত্র সামনে ছিল। অপর পৃষ্ঠায় তারেকের মনের কথা লিখে দিলাম।

সোহরাব : কাকে লিখলে। মনের মধ্যে যাকেই এঁকে থাক না কেন, পত্রে সম্বোধন করলে কাকে!

খালেদ : মীর মোশাররফ হোসেনের দুষ্প্রাপ্য উপন্যাসের একটা অংশ আগের দিন ক্লাশে অধ্যাপকের মুখে শুনে এসেছিলাম। তার নায়িকার নাম বসিয়ে দিলাম—'তাহমিনা'।

সোহরাব : বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে তুমি আর অন্য কারো নাম খুঁজে পেলে না? এ নাম যে কার, কত কাছাকাছি সে-কথা একবারও তোমার মনে উদয় হয়নি ?

খালেদ : পত্রের পূর্ণতার জন্য শেষে নাম সই করলাম 'রুস্তম'।

সোহরাব : তুমি সোহরাবকে বলছ যে তুমি রুস্তমের জবানীতে পত্র লিখে দিলে। তুমি শয়তানের শিরোমণি। ঠিক জেনো আমি তোমাকে নরকাগ্নিতে পুড়িয়ে মারব। কী সাংঘাতিক! হয়তো মিস মীনা মিনহাজ সে খাতা অসাবধানে ফেলে রেখেছে। খাতাটা গিয়ে পড়ল মিস রুমা জোয়ারদারের হাতে। ভাবতে পার সে মহিলা কি করবে ঐ চিঠি নিয়ে ? মীনার পুলিশ অফিসার বড় ভাইয়ের কাছে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠিয়ে দেবে। আমাকে অপদস্থ করবাব জন্য হয়তো গোটা পত্রটাই সাইক্লোস্টাইল করিয়ে মেয়েদের হোস্টেলের ঘরে ঘরে কপি পৌঁছে দেবে।

(বাইরে সমস্বরে আওয়াজ ওঠে : ছা আ ত্র ঐ ক্ ক অ! জিন্দাবাদ! আ মা দে এ র দাবি, মানতে হবে!! পরীক্ষার তারিখ, পেছাতে হবে !! ইত্যাদি। তারপর দরজায় কয়েকবার ঠক্ ঠক করে ঢুকে পড়ে রমীজ, আফতাব, খয়ের।)

রমীজ : আপনারা এখনো খেতে যাননি!

সোহরাব : এইবার যাব। সব শেষ হয়ে গেছে।

রমীজ : আমাদের কাজও আমরা অনেকদূর গুছিয়ে এনেছি।

সোহরাব : একটুখানি আবার ফেলে রাখলেন কেন ?

রমীজ : সে-কথাটাই আপনাকে জানিয়ে যেতে এসেছি। হিসাব করে দেখলাম যে শেষ পর্যন্ত তবু হয়তো সমান্য গুটিকতক ছেলেমেয়ে আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে গোঁয়ার্তুমি প্রকাশ করতে পারে।

সোহরাব : পারে।

রমীজ : ঠিক করেছি, তাদেরকে আমরা খতম করে দেব।

সোহরাব : তার অর্থ ?

রমীজ : প্রাণে নয়, শুধু পরীক্ষার্থী নাম ঘুচিয়ে দেব। গতকাল থেকে আমরা এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে শুরু করেছি। যারা আমাদের বিরোধিতা করবেন আমরা তাদের জরুরি বই-খাতা ইত্যাদি গায়েব করে দেব। আপনারা কি পরীক্ষার তারিখ পেছাবার পক্ষে না, বিপক্ষে!

সোহরাব : অসম্ভব! হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে দল ভারি করতে চান ?

রমীজ : অযথা ত্রাস সৃষ্টি করা আমাদের টেকনিক নয়। যা কবার তা আমরা সরাসরি করে ফেলি। শুনেছি কাল বিকেলের দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো কারো নাকি কিছু মূল্যবান নোটখাতা খোয়া গেছে।

সোহরাব : কার ?

রমীজ : খাতুনের নাম মিস মীনা মিনহাজ!

সোহরাব : মিস মীনা মিনহাজ ?

(সমস্বরে আওয়াজ তোলে আগুন্তুকের দল : ছা আ ত্র ঐক্ক্য ইত্যাদি। তারপর ধীরে ধীরে কাতার দিয়ে বার হয়ে যায়)

সোহরাব : (তারেককে) আগামি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে যদি আমার খাতা আমাকে ফেরত দিতে না পার, তোমার পরীক্ষার্থী নাম, ওরা নয়, আমি একা ঘুচিয়ে দেব।

তারেক : ও খাতা এখন কার হাতে গিয়ে পড়েছে তা আমি কী করে মালুম করব! তাছাড়া তোমার তো কোনো নালিশ এখন আর থাকা উচিত নয়। তোমার খাতা পড়ে বেশি নম্বর পাওয়ার পথ অন্যের কারসাজিতে বন্ধ হয়ে গেল। তুমি আনন্দ কর।

সোহরাব : আর তুমি ? তুমি শোক করতে বসবে, না ? পত্র পাঠ তোমাকে পত্র প্রেরক বলে সন্দেহ করে তিনি অবৈধ পুলকে শিউবে উঠতে পারতেন, সে মওকা বুঝি ফশকে গেল! কী আফসোস! (খালেদকে) সকল নষ্টের গোড়া তুমি। যদি কালকের মধ্যে পত্রোদ্ধার করতে না পার, কঠিন পরিণতির জন্য তৈরি থেকো।

খালেদ : যে-কোনো একটি পরিণতির জন্য আমাকে প্রস্তুত থাকতেই হবে। মনে করো মিস মীনা মিনহাজ পত্রটা ইতিমধ্যে পড়ে ফেলেছে। ভাষা এবং হাতের লেখা দেখে ধরে ফেলেছে আসল নিবেদনকারী কে ! তখন আমার দশা কী হবে ?

তারেক : কেবল যে যার নিজের কথা ভাবছ। খাতা আমার কাছ থেকে নিয়েছে। অবশ্যই সন্দেহ করবে যে আমিই পত্র নিবেদন করেছি। তখন আমার কী দশা হবে ? ভেবেছ সে-কথা কেউ ?

সোহরাব : তোমরা সব অকারণে বিপদ কল্পনা করে পুলকিত হচ্ছ। মিস্ মীনা মিনহাজকে তোমরা কেউ চেন না। আমার যে খাতা তিনি ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন তার মধ্যেই পত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আমি জানি আমার আর নিস্তার নেই।

(দৃশ্যের আরম্ভের ঘন্টাধ্বনি মৃদুভাবে শুরু হয়েছে। সোহরাবের উক্তির শেষাংশ নিমজ্জিত করে ঘন্টাধ্বনি আমাদের কর্ণপটহ ছিন্ন করে ফেলতে চায়।)

পরীক্ষায় আমাকে পদানত করে উনি উচ্চতর স্থান দখল করবেন। আমার সর্বপ্রকার প্রতিরোধের প্রাকার বিধ্বস্ত করে দিয়ে আমাকে অনুগত দাসে পরিণত করবেন। আমার সকল কর্মাদর্শ চৌচির করে দিয়ে আমাকে এক অতি সন্তুষ্ট গৃহপালিত কর্মচারিতে রূপান্তরিত করবেন। কিন্তু ক্ষমতা থাকতে এ আমি কিছুতেই বরদাশ্‌ত করব না। আমি প্রতিবাদ করব। আমি আওয়াজ তুলব। আমি পুলিশে খবর দেব। আমি থানায় গিয়ে ডাইরি করিয়ে আসব যে, আমার খাতা খোয়া গেছে। আমি তোমাদের কোনো বাধা মানব না। আমি এক্ষুণি থানায় যাব। আমার সর্বস্ব লুট হয়ে যাচ্ছে। আমি কিছুতেই খামোশ থাকব না। না না, আমি যাবই। যাব! পুলিশ! পুলিশ!পুলিশ!

(ঘন্টাধ্বনি প্রচণ্ডতম। তারেক, খালেদ সোহরাবকে একরকম চেপে ধরে রাখে। সোহরাবের কণ্ঠ শোনা যায় না, কিন্তু বোঝা যায় যে সে আর্তনাদ করছে। পর্দা পড়বে।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(সকালবেলা। মীনাদের বাড়ি। মীনার অভিভাবক ও বড় ভাই পুলিশ অফিসার আসাদুজ্জামান পরিপূর্ণ সরকারি পোশাকে কারো জন্য অপেক্ষা করছে। স্বাস্থ্যবান অপত্নীক মধ্যবয়সী সুপুরুষ। প্রবেশ করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান। দু'দিন হলো দাঁড়ি কামাননি, যে ফুলপ্যান্ট পরে শুয়েছিলেন সেটা পরে ছুটে এসেছেন)

আসাদ : এসো, অধ্যাপক এসো। বসো। তারপর খবর কী? কেমন আছ? তোমরা হলে পণ্ডিত মানুষ, তরুণের শিক্ষক। তোমরাই হলে জাতীয় উন্নতির আসল কারিগর। দু'দণ্ড বসে তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেও চরিত্রের উন্নতি ঘটে।

হাসান : বাজে বকো না। সারাটা ছাত্রজীবন এক সঙ্গে কাটিয়েছি। তোমার চরিত্রের এক চুল এদিক-ওদিক করতে পারিনি।

আসাদ : না পারলেও যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলে।

হাসান : সে চেষ্টা চিরকাল চালিয়ে যাবার মতো চরিত্রবল আমারও নেই। আমি অন্য একটা জরুরি কাজে এসেছি।

আসাদ : নিশ্চয়ই জরুরি। নইলে সাত সকালে টেলিফোন করে ছুটে আসবে কেন ? তবে কি না, তোমাদের জরুরি অবস্থার সঙ্গে আমাদের দুনিয়ার জরুরি অবস্থার আকাশ-পাতাল পার্থক্য। যে-সব কারণে তোমরা প্রবলভাবে উত্তেজিত হও, সেগুলোর সংসর্গে আমাদের নিদ্রাকর্ষণ ঘটে।

হাসান : সুখে আছ। অষ্টপ্রহর চোর-ডাকাতের সঙ্গে ওঠবস কর। ইচ্ছে হওয়া মাত্র ওদের এক প্রস্থ ডাণ্ডাপেটা করে নিলে। ওরাও কিছু ঠাণ্ডা হলো, তোমার চিত্তও কিছু সাফ্‌সুতরা হলো। আমাদের সংকট তোমরা বুঝবে কী করে?

আসাদ : তোমাদের আবার সংকট কী ? কাজ করো বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখন না হয় প্রক্টর হয়েছ, কিন্তু তাই বলে তো তুমি আর পুলিশ অফিসারের দায়িত্ব নাওনি! তুমি মূলত অধ্যাপক। দেশের সত্যিকারের কবি, নেতা, কারিগর সব তোমাদের পায়ে মাথা রেখে গড়াগড়ি যাচ্ছে। কী নোবেল প্রফেশন, আর তুমি কি না আমাদের চাকরির সঙ্গে তোমার মহান দায়িত্বের তুলনা করছ ?

হাসান : নোবেল প্রফেশনের নিকুচি করি। চোর-ডাকাতের সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিজে সুখে আছ। দিন দিন স্বাস্থ্য ভালো হচ্ছে; মনের ফূর্তি বাড়ছে। আর আমার দশা লক্ষ করেছ ?

আসাদ : সৎসঙ্গ তোমার সহ্য হচ্ছে না।

হাসান : রসিকতা ফেলে রাখ। তুমি জান না এই উনিশ-কুড়ি বছরের পড়ুয়া ছেলেমেয়েগুলো কী সাংঘাতিক জিনিস! সব ঘূর্ণমান আগুনের ডেলা। যাবতীয় উদ্ভট চিন্তার ডিপো। কোনো দু'জনের আচরণ এক রকম নয়। কোনো একজনের দুটো আচরণ এক রকম নয়। সাধ্য কী আগে থেকে তুমি কোনো কাণ্ড আঁচ করো। যে ছেলে বাড়িতে কাঁটা বেছে মাছ খেতে জানে না, রাস্তায় নেমে সে ছেলেই বেয়োনটের সামনে বুক পেতে দেয়। ক্লাসে মাস্টারের সামনে বসে থাকে ভীরু শশকের মতো, বাইরে সহপাঠিনীর সামনে নিজের বীর্যবান জাহির করতে গিয়ে কী যে বলে আর না বলে তার কোনো মা-বাপ নেই। যেমন হয়েছে ছেলেগুলো তেমনি মেয়েগুলো।

আসাদ : তোমার মতো পড়াশুনোয় মতিগতি থাকলে আমি এখনো ওদের মধ্যে গিয়ে বাস করতে চাইতাম।

হাসান : তোমার মন নিতান্ত অশিক্ষিত। স্কুলে যে পর্যন্ত শেখানো হয়েছিল তারপর আর এক পাও নিজ বুদ্ধিতে এগিয়ে যেতে পারনি। সম্ভবত খবরের কাগজ পর্যন্ত পড় না।

আসাদ : কিছু কিছু পড়ি। আইন-আদালত, খুন-খারাবি, ছেলেধরা এসব উল্টে পাল্টে দেখি বৈ কি।

হাসান : বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে মেম্বাররা এ্যাসেম্বলী ফাটিয়ে দিয়েছেন।

আসাদ : তোমরা ক্লাশে গর্জাও, ছাত্ররা আমতলায়, অফিসাররা অফিসে। বেচারা নেতাদের হুংকার ছাড়বার জন্য নাগরিকদের তরফ থেকে পরিষদ-ভবন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তোমার আপত্তি থাকা উচিত নয়।

হাসান : সে গর্জনে আমি ঘায়েল হতে বসেছি। টেলিফোনে টেলিফোনে ঝাঁঝরা হয়ে গেলাম। সবাই আমার কাছে জানতে চাইছে প্রকৃত অবস্থা কী ? কেউ শাসাচ্ছে, কেউ পরামর্শ দিচ্ছে। কেউ পিলে চম্‌কানো নতুন নতুন খবর সরবরাহ করছে। আমাকে সাহায্য না করলে আমি পাগল হয়ে যাব। শুনেছি সরকার নাকি তোমাকেই এ ব্যাপারে তদন্ত করবার ভার দিয়েছে।

আসাদ : বাজে কথা। তাছাড়া আমি কী করে তোমাকে সাহায্য করব ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ত্রিসীমানার মধ্যে খাকি সুতো ঢুকবার যো নেই। নজরে পড়লেই ভস্ম করে দেবে। তোমাদের কোনো কারবারের মধ্যে আমি থাকছি না। আমার চোর-ডাকাত বেঁচে থাকুক!

হাসান : কিন্তু তোমাদের থানা আমাদের ছাড়ছে না। সক্কাল বেলা আমাকে একজন টেলিফোন করে জানিয়েছে যে আমাদেব কোন্ ছাত্র নাকি থানায় গিয়ে এক অভিযোগ ডায়রি করিয়ে এসেছে।

আসাদ : কিসের অভিযোগ ?

হাসান : খাতা চুরির। কে বা কারা নাকি তার মূল্যবান নোটখাতা চুবি করেছে। এতে নাকি সে পরীক্ষায় বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, চোর বহুল পরিমাণে লাভবান হতে পারে। টাকার অঙ্কে এই লাভক্ষতি হিসাব করে ডায়রিতে লিখিয়ে এসেছে।

আসাদ : ডাকাত ছেলে। কী নাম ?

হাসান : সোহরাব।

আসাদ : আমাদের মীনার সহপাঠী ?

হাসান : এতক্ষণে কিছু কিছু তোমার মাথায় ঢুকেছে। আমি জানি তোমার বোন আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। ছেলেদের ভিড়ের মধ্যেও একটা সহজ মর্যাদাবোধ নিয়ে চলতে জানে। ওর স্বভাবের সূচিতা ও কাঠিন্যই ওকে যাবতীয় অন্তরঙ্গতার আবিলতা থেকে রক্ষা করবে। মিস্ মীনা মিনহাজ মিস্ রুমা জোয়ারদারের মতো নয়। কিন্তু তবু হুশিয়ার থাকতে হবে। এই সোহরাব-টোহরাব একেবারে বর্বর অসুর। আমি অনেকদিন থেকে লক্ষ্য করে আসছি ওর কথাবার্তা আদৌ ধারাবাহিক নয়। কাবো প্রতি ওর কোনো রকম শ্রদ্ধাবোধ নেই। স্ত্রী-পুরুষ, মিত্র-মুরুব্বি—ও কোনো রকম বাছবিচার করে চলে না। হয়তো মীনাকেই চোর বলে অভিযুক্ত করতে চাইবে।

আসাদ : আমাকে কী করতে হবে ?

হাসান : বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে তোমাকে তৎপর হতে হবে।

আসাদ : কভি নেহি।

হাসান : তোমার বোন বিপদাপন্ন হলে তুমি এগিয়ে আসবে না ?

আসাদ : না। তবে বোনের বান্ধবীদের কেউ হলে আসতেও পারি।

হাসান : তুমি জান না বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া বর্তমান হপ্তায় কী ভয়ঙ্কর রকম থম্‌থমে। ছাত্রদের এ-দলে ও-দলে যে-কোনো মুহূর্তে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। তার চাপে পড়ে আমি সুদ্ধ গুঁড়িয়ে যেতে পারি।

আসাদ : যাও। কার কী এসে যাবে। দুনিয়া একটা জ্ঞানী লোকের ভারমুক্ত হবে। মীনা লায়েক হয়েছে। যদি চুরি করে থাকে এবং ধরা পড়ে, তাহলে তার নিস্তার নেই। আমার হাতেই কঠিন সাজা পাবে। আর যদি না করে থাকে তবে সাধ্য কী কেউ তার ক্ষতি করে। আর তুমিও ঠিকই থাকবে। না থাকতে পারলে এত লেখাপড়া শিখেছ কেন ?

হাসান : তুমি আমাকে কোনো রকমেই সাহায্য করতে রাজি নও ?

আসাদ : না। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তাম তখনো বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বেশি ভাবতাম না। বিশ্বাবিদ্যালয় বিসর্জন দিয়ে এসে এতদিন পর আজ তার ভাবনা বয়ে বেড়াব, তেমন আহাম্মক আমি নই।

হাসান : বেশ। আমি চলি তা'হলে।

আসাদ : চা খেয়ে যেও। সবই এক্ষুণি উঠে পড়বে।

হাসান : থাক্, আরেক দিন আসব। (বেরিয়ে যায়)

(সঙ্গে সঙ্গে দরজায় টোকা পড়ে) কে ?

(ভঙ্গিমা সহকারে প্রবেশ করে মিস রুমা জোয়ারদার)

রুমা : আমি, মিস্ রুমা জোয়ারদার।

আসাদ : সে-কী! এত সক্কাল বেলা!

রুমা : আরো সকালে এসেছিলাম। দরজার কাছে এসে ফিরে গিয়েছি।

আসাদ : ঢুকলেন না কেন ?

রুমা : বাব্ বাঃ! গলার আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারলাম খোদ প্রক্টর সাহেব ঘরের মধ্যে বসে আছেন।

আসাদ : আপনি কাউকে ভয় পান, জানতাম না।

রুমা : ভয় ? পুরুষ মানুষ দেখে ভয় পেতে যাব কেন ?

আসাদ : পালিয়ে গেলেন কেন ?

রুমা : পালিয়ে যাইনি। একটা দুর্ঘটনা এড়াবার জন্য আড়ালে সরে গিয়েছিলাম।

আসাদ : দুর্ঘটনা ?

রুমা : আমার আবির্ভাব সব সময়েই ওর জন্য একটা দুর্ঘটনা। প্রক্টর সাহেব আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না।

আসাদ : আপনার অপরাধ ?

রুমা : আমি নাকি বেশি নড়াচড়া করি। চুপ করে বসে থাকলেও নাকি আমার

অঙ্গ নড়ে। মাথার ওপর থেকে কাপড় পড়ে যায়। কাঁধের ওপরেও থাকে কি থাকে না। তার ওপর যখন হাসি তখন জোরে শব্দ হয়। অনেক দূর থেকে শোনা যায়। আর আমার সব সময় খুব হাসিও পায়। শুনেছি এই সব কারণে প্রক্টর সাহেব আমাকে আদৌ সহ্য করতে পারেন না। আমার নৈকট্য অনুমান করতে পারলেই ওঁর দাঁতে কিড়মিড় লেগে যায়। চোখ দিয়ে আগুন ঝরে। মাথার চুল দাঁড়িয়ে যায়।

আসাদ : ঢুকে পড়লেন না কেন, দৃশ্যটা একটু দেখতাম।

রুমা : শত হলেও মেয়েমানুষ। গলা শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম উনি বড় রকমের বিপদে পড়েছেন। আরো বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়া অন্যায় হতো। মীনা কোথায় ?

আসাদ : এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি।

রুমা : আমি গিয়ে উঠিয়ে দিচ্ছি।

আসাদ : খবরদার, ও-কাজ করবেন না। রেগে গেলে ওর একদম কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। ওর ঘুম ভাঙ্গালে ও নিশ্চয়ই ক্ষেপে যাবে।

রুমা : কিন্তু আমার যে কিছুতেই তর সইছে না। যে কথাটা বলার জন্য ছুটে এসেছি সেটা ওকে তাড়াতাড়ি বলতে চাই।

আসাদ : আমাকে বলুন।

রুমা : বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপার, আপনি বুঝবেন না। আপনি আপনার কাজে যান। আমি একাই অপেক্ষা করব।

আসাদ : আপনি ভুল বুঝবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা কবতে আমি ভালোবাসি। সে-সব কথা আলোচনা করতে আমি খুবই ভালোবাসি। আপনার সঙ্গে যদি কোনো কোনো কথা পরিষ্কার করে নিতে পারি, তাহলে, মানে, ভালো হতো।

রুমা : কী জানতে চান আপনি ?

আসাদ : কোনো প্রশ্নের জানা না জানার কথা বলছি না। মানে, মীনা হলো আমার ছোট বোন, প্রক্টর হাসান আমার বাল্য বন্ধু। মীনাকে সব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। হাসান সব প্রশ্নকে আমল দিতে চায় না।

রুমা : আপনি জানেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে আজকাল চুরি হয় ?

আসাদ : হবে না কেন ? সেখানকার এক একটা আইডিয়ার দাম লক্ষ কোটি টাকা। এক একটা হৃদয় বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রসে পরিপুষ্ট। চুরি রাহাজানি এখানে হওয়াই তো স্বাভাবিক।

রুমা : আমার কপাল মন্দ, তাই সেখানে আমাকে কেউ এত মূল্যবান মনে করে না। নইলে কবে, আপনার ভাষায়, একটা না একটা খুন বা রাহাজানির মধ্যে পড়ে যেতাম!

আসাদ : ছেড়ে দিন। ও-রকম মহাবিদ্যালয় ত্যাগ করে চলে আসুন। যারা এত অন্ধ

এবং প্রাণহীন তাদের মধ্যে পড়ে রয়েছেন কেন?

(একটু দূরে ধ্বনি ওঠে : ছা আ ত্ র ঐ ক্ ক্য ইত্যাদি। আমাদের দাবি মানতে হবে, পরীক্ষার তারিখ পেছাতে হবে—এই দাবিও শোনা যাবে।)

ও কিসের শব্দ?

রুমা : মহাবিদ্যালয়ের যারা মহাপ্রাণ স্বরূপ তাঁরাই দল বেঁধে আপনার এখানে আসছেন।

আসাদ : আমার কাছে কেন?

রুমা : আপনার বোনের কাছে আসছে। আমার কাছে যখন আসছে না তখন আমিও ওদের সামনে পড়তে চাই না।

আসাদ : চলুন আমরা দুজনেই সরে পড়ি।

রুমা : পাগল হয়েছেন। ওদের বিদেয় করবে কে তাহলে? আপনি এখানে চুপ করে বসে থাকুন। বসে বসে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ভাবেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মাত্র। আমাকে অনেক দেখেছেন। ওদেরকেও দেখেন। আমি মীনার ঘরে বসি।

আসাদ : চুরির কথাটা শেষ করে গেলেন না?

রুমা : ওহ্। কে বা কারা গতকাল বিকেলে মীনার খাতা চুরি করে নিয়ে গেছে।

আসাদ : কার খাতা?

(নেপথ্যে উচ্চকণ্ঠের শ্লোগান : ছা আ ত্ র ঐ ক্য অ! ইত্যাদি। দরজায় কয়েকবার টোকা দিয়ে রমীজ, আফতাব, খয়ের প্রমুখ প্রবেশ করে। রুমা তার আগেই বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছে।)

রমীজ : আস্সালামো আলাইকুম। আমরা মিস্ মীনা মিনহাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।

আসাদ : মীনা এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। আপনাদের কি খুব জরুরি দরকার?

রমীজ : উনি এত বেলা পর্যন্ত ঘুমান নাকি?

আফতাব : আপনি তার অভিভাবক হয়ে এসব অভ্যেস অনুমোদন করেন?

আসাদ : বেশি রাত পর্যন্ত পড়াশুনা করলে অনেক সময় পরদিন সকালে বিছানা ছাড়তে দেরি হয়। আমার নিজেরও প্রায় এই রকম অভ্যাস। বুঝতেই পারেন, আমার যা পেশা তাতে অনেক সময়ই দিনের চেয়ে রাতে কাজের চাপ পড়ে বেশি।

রমীজ : আপনাকে দেখে সে-রকম মনে হয় না।

আসাদ : আজ সূর্য না উঠতেই যে একেবারে সাহেব সেজে বসে আছি তার আসল কারণ আপনাদের প্রক্টর অধ্যাপক বদরুল হাসান সাহেব। এক রকম উনিই জোর করে বিছানা থেকে টেনে তুলেছেন।

আফতাব : আমরা জানতাম তিনি এখানে আসবেন। কিন্তু এতে আমরা ভয় পাই না।

আমরা জানি যে গোপনে গোপনে কর্তৃপক্ষ আমাদের শায়েস্তা করবার জন্য পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। আমরাও তার জন্য প্রস্তুত। লাঠি, গুলি, বেয়নট সব আমরা বুক পেতে নেব। আমাদের ঐক্য অটুট। আপনাদের টিয়ার গ্যাস আমাদের সামনে পড়লে ফেটে লাফিং গ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে। ছা আ ত ত্র ঐ ক্ ক্য অ!

(বার থেকে বহুকণ্ঠে প্রতিধ্বনি : জিন্দাবাদ! ইত্যাদি)

খয়ের : বাড়ির ভেতর লোকজন ঘুমুচ্ছে। ঘরের মধ্যে ঢুকে আমাদের এ-রকম বিকট আওয়াজ তোলা হয়তো সঙ্গত হচ্ছে না।

রমীজ : বেলা দুপুর পর্যন্ত যিনি বিছানায় পড়ে ঘুমুতে পারেন তাঁর জন্য দরদে উথলে ওঠা তোমার পক্ষেও খুব শোভনীয় হচ্ছে না। আপনি একবার মিস্ মীনা মিনহাজকে ডেকে দেবেন কি ?

আসাদ : প্রক্টর হাসানের ওপর বেশি অবিচার করেছেন। দিন-রাত লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকেন বলেই যে তাঁর কোনো রকম কাণ্ডজ্ঞান অবশিষ্ট নেই এ কথা সত্য নয়। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন নিতান্তই এক প্রাচীন বন্ধু হিসেবে। আপনাদের বিরুদ্ধে আমার পুলিশ বাহিনী নিয়োগের প্রস্তাব একবারও করেননি।

আফতাব : এ কি বিয়ের প্রস্তাব নাকি যে মুখ খুলে বলতে হবে। সখ্যতা যেখানে প্রাচীন সেখানে কেবল ইশারায় দুনিয়া এসপার-ওসপার হয়। আমরা ছাত্র বটে, কিন্তু কিছুই শিখিনি এমন কথা ভুলেও ভাববেন না।

রমীজ : মিস্ মীনা মিনহাজকে কি আপনি ডেকে দেবেন, না আমরা ওকে স্লোগান তুলে আহ্বান জানাব ?

(হাতে একটা খাতা নিয়ে মিস্ রুমা জোয়ারদার ঢুকবে)

রুমা : যদি আমাকে দিয়ে চলে তবে আমি হাজির আছি।

(সবাই সোৎসাহে সম্ভাষণ জানায়)

রমীজ : আপনার সঙ্গেও এখানে দেখা হয়ে যাবে ভাবিনি।

রুমা : এখনো অন্য রকম ভাববেন না। আমাকে পথে পেয়ে কিছু বলে নেবেন, তা চলবে না। আমাকে কিছু বলতে হলে আমাদের বাড়ি যেতে হবে। এখানে যতজন এসেছেন সব্বাইকে দল বেঁধে যেতে হবে। একজন কম হয়েছে কি দেখা দেব না।

আফতাব : সে রকম আশঙ্কা করা বৃথা। পেছনে পড়ে থাকতে রাজি হবে কে ?

রমীজ : আমরা মিস্ মীনা মিনহাজের জন্য অপেক্ষা করছি।

রুমা : তাহলে আরো অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। উনি সবে ডান কাঁধ থেকে বাঁ কাঁধে প্রথম আড়মোড়া ভাঙ্গলেন।

খয়ের : ততক্ষণে অন্য কোনো জায়গা থেকে ঘুরে এলে হতো না ?

রমীজ : খামোশ! সফরে বেরুবার আর মওকা খুঁজে পেলে না ? না। আমরা অপেক্ষা করব।

রুমা : তা করতে পারেন। মীনাকে এক নজর দেখবার জন্য সকল জনতাই অপেক্ষা করতে রাজি হয়। এ ব্যাপারে পাস-কোর্স কি অনার্স-কোর্সের ছাত্রদের মধ্যে কোনো রকম পার্থক্য লক্ষ করিনি।

আফতাব : আমরা এম-এ ক্লাশের ছাত্র।

রুমা : মিস্ মীনা মিনহাজের মন জানাই যদি আপনাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তবে সে-কথা আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না কেন ? মিস্ মীনা মিনহাজ আমাকে সব কথা খুলে বলেছে। জিজ্ঞেস করুন, আমি সব কথার জবাব দিতে পারব।

রমীজ : মিস্ মীনা কি পরীক্ষা পেছাবার পক্ষে না বিপক্ষে ?

আসাদ : এক শ' বার বিপক্ষে।

আফতাব : মিস্ মীনা মিনহাজ স্বাধীন জেনানা। আমরা তাঁর মত শুনতে চাই।

রুমা : মিস্ মীনা মিনহাজেরও তাই মত। তবে মীনার তরফ থেকে এটুকু না বললে অন্যায় হবে যে, তাঁর এ সিদ্ধান্তের পেছনে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাব প্রভাব কোনো রকমে ক্রিয়াশীল ছিল না।

আফতাব : আমরাও তাঁর কাছ থেকে এ-রকমই আশা করেছি।

রমীজ : কার চক্রান্তে পড়ে তিনি এরকম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন জানতে পাবি কি ?

রুমা : সেটা আপনাদেরই কোনো ছাত্র-বন্ধুর দল। যাঁরা মিস্ মীনা মিনহাজের অকৃত্রিম স্তাবক, ভক্ত, উপাসক, চাবণ।

খয়ের : তাঁরা সংখ্যায় একজন নন ?

রমীজ : হয়তো শেষ পর্যন্ত একজন। কিন্তু এখনও ত্রয়ী। আমি এঁদের চিনেছি। কিন্তু আপনার তরফ থেকে এসব অভিযোগের কোনো প্রমাণ আছে ?

রুমা : অভিযোগ হতে যাবে কেন ? এত খোলাখুলি কারবার। ওদেব মধ্যে যিনি সেবা তিনি নানা রকম পাঠ নির্দেশসহ তাঁর নোটখাতা মীনার কাছে পাঠিয়েছেন। মীনা নিশ্চয়ই নিজেরটা ওঁর কাছে পাঠিয়েছে। পরীক্ষা দেবার জন্য কী রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে বুঝতে পারছেন তো ?

রমীজ : আপনার হাতে ওটা কার খাতা ।

রুমা : (খাতা খুলে নাম পড়ে) সোহরাব হোসেন।

রমীজ : আপনি কোথায় পেলেন ?

(রমীজ ও আফতাব ক্রমশ রুমাকে ঘিরে ধরবে)

রুমা : মিস্ মীনা মিনহাজের বিছানার ওপর। তাঁর বালিশের পাশে।

আফতাব : এ খাতা আপনি আমাদের হ্যান্ডওভার করে দিন।

আসাদ : আমি অনেকক্ষণ চুপ করে আপনাদের কাণ্ড কারখানা দেখেছি। আর দেখতে চাই না। আপনারা দু'জন আরো সরে দাঁড়ান। মিস্ রুমার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছেন কি, আমি সত্যি সত্যি আপনাদের হাজতে চালান দিয়ে দেব।

আফতাব : আপনি আমাদের হুমকি দিচ্ছেন ? দেশের গোটা ছাত্রশক্তি আমাদের পশ্চাতে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন আমরা তরুণরাই দেশের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, আমরাই হলাম আগামী দিনের পরিষদ সদস্য, জাতীয় মন্ত্রী, দেশের শাসনকর্তা!

রমীজ : আপনার কাছ থেকে এর চেয়ে বেশি সৌজন্য আমরা প্রত্যাশা করিনি। জানতাম যে এক সময় না এক সময় আপনার আসল রূপ প্রকাশ হয়ে পড়বেই। কিন্তু আমাদেরও আপনি সামান্য শক্তি বলে মনে কববেন না। আপনার বোন মিস্ মীনা মিনহাজ যে অন্যরকম হবেন আমাদের সে-রকম আশা করা উচিত হয়নি। আপনার উত্তেজিত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আমরা এক্ষুণি চলে যাচ্ছি। মিস রুমার সঙ্গে দু-একটা কথা শেষ করেই আমরা চলে যাব।

রুমা : তা হবে না। আমার সঙ্গে কথা বলতে হলে আমার বাড়ি যেতে হবে। আদাব।

রমীজ : বেশ। তাই হবে। আমরা আসি তাহলে।

('ছাত্র ঐক্য' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে সদলবলে প্রস্থান)

আসাদ : মীনার বিরুদ্ধে এসব কথা ওদের বলতে গেলেন কেন ?

রুমা : একশ' বার বলব। যতবার দেখা হবে ততবার বলব। আমার সঙ্গে ও ছলনা করল কেন ?

(ভেতর থেকে মীনা ও বার থেকে প্রক্টর ধীরে ধীবে ঢুকবেন। রুমা ও আসাদ মীনাকে দেখেনি।)

হাসান : যাক, সহিসালামতে আছ। যে-রকম বজ্রনিনাদে শ্লোগান তুলছিল তাতে রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ওরা কী করল ? কী বলছিল ?

আসাদ : মীনা আপনার সঙ্গে কী ছলনা করেছে ?

রুমা : সন্ধের সময় আমাকে চিঠি লিখে জানাল ওর নাকি কি একটা দামি নোটখাতা চুরি গেছে। এখানে এসে দেখি উনি নিজেই আরেক জনের খাতা চুরি করে সেটা বুকে নিয়ে ঘুমুচ্ছেন।

মীনা : আমি খাতা চুরি করিনি।

রুমা : এটা চুরি, না রাহাজানি, না অন্য কিছু তোমার বড় ভাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিও। ওঁর এসব ভালো করে জানা আছে।

হাসান : কী বললে ? সোহরাবের খাতা মীনা চুরি করেছে ?

আসাদ : আহ্, তুমি আবার মাঝখান থেকে উল্টোপাল্টা কথা বলে ব্যাপারটা আরো ঘোরালো করে তুলো না।

রুমা : সোহরাবের টিউটোরিয়াল খাতা একবার পড়ে দেখবার জন্য আমরাও কম সাধ্য-সাধনা করিনি। কখনো সোহরাবের কাছ থেকে আদায় কবতে পারলাম না। আর যে মীনা সোহরাবের সঙ্গে ভুলেও কোনো দিন হেসে

কথা কয়নি, সেই মীনাই কিনা পরীক্ষার আগে সোহরাবের খাতা পেয়ে গেল! পেয়ে গেল মানে সোহরাব মীনাকে তার খাতা চুরি করতে দিল। বিনিময়ে নিশ্চয়ই মীনাও তার খাতা সোহরাবকে চুরি করতে দিয়েছে। নইলে খাতার মধ্য দিয়ে এত রকম চিঠি পারাপার হবে কেন ? আর বিপদের ভান করে আমাকে চিঠি দেয়া হয়, 'তাড়াতাড়ি এসো সখি, আমার খাতা চুরি গেছে।' সোহরাব মীনাকে কী লেখে তার নমুনা দেখেছেন আপনারা ? আপনিই ওর প্রকৃত অভিভাবক, একবার ভালো করে পড়ে দেখুন।

(খাতার মধ্য থেকে পত্র বার করে আসাদের হাতে তুলে দেয়। একটা ছাপানো প্রচারপত্রের উল্টো পৃষ্ঠায় কলম দিয়ে লেখা একটি পত্র।)

মীনা : ভাইয়া, তোমার পায়ে পড়ি, এ চিঠি পড়ো না তুমি। এ পত্র আমাকে লেখা নয়, কে জানে কাকে লেখা, কে জানে কে লিখেছে—পড়ো না দোহাই তোমার, পড়ো না!

হাসান : (ছাপানো অংশ দেখে নিয়ে) আরে এ যে দেখছি আরেকটা লিফলেট! এটা কখন ছাপল ? এটা তোমরা কোত্থেকে পেলে ?

(থাবা দিয়ে নিয়ে নেয় ও ছাপানো দিক পড়তে থাকেন।)

রুমা : (থাবা দিয়ে নিয়ে নেয়) ছাত্রদের বিরুদ্ধে দালালি করবার জন্য আমি লিফলেট সংগ্রহ করি না। আপনাকে আমি ছাপানো দিক পড়তে দেব না।

আসাদ : আমি উল্টো দিকের হাতেলেখা অংশ পড়ব। আমাকে দিন।

(হাত বাড়িয়ে নিয়ে নিল)

মীনা : আমার খাতা ফিরিয়ে দাও।

রুমা : এতই আপন হয়ে গেছে নাকি ? পরের খাতা বলে বুঝি আর উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

(প্রক্টর হাসান তখন মাথা নিচু করে আসাদের হাতে ধরে রাখা লিফলেটটা পড়ে নিচ্ছেন। হাতের পোর্টফোলিও ব্যাগ খুলে তার মধ্য থেকে গাদা লিফলেট বার করে একটার সঙ্গে আর একটার তুলনা করে দেখছেন)

মীনা : খাতাটা ফিরিয়ে দাও।

রুমা : তোমার কাছ থেকে নিয়েছি প্রমাণ কী ? এ খাতা চুরির মাল। এ আমি থানায় জমা দেব।

হাসান : কার খাতা ? সোহরাবের খাতা পাওয়া গেছে ? এই খাতার জন্য সে ডায়রি করিয়ে এসেছে ?

(প্রক্টর হাসান এগিয়ে এসে খাতাটা হাত করতে চায়, মুঠ করে ধরেনও। মীনা ও রুমা এক সঙ্গে অন্য প্রান্ত চেপে ধরে খাতাটা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে।)

আসাদ : হাসান তুমি কি পাগল হয়ে গেলে নাকি ? ডিউটি করতে হবে বলে কি শেষে তুমি মেয়েদের সঙ্গে হাতাহাতি করবে ?

(আসাদ প্রক্টরকে টেনে সরিয়ে আনে, সেই অবসরে প্রক্টর প্রচারপত্রটা নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছেন। মীনা আর রুমা খাতার দু'প্রান্ত ধরে রেখে পরস্পরের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানতে থাকে।)

হাসান : (লিফলেট নিয়ে মেঝের ওপর ছড়ানো কাগজপত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েন) এ লিফলেটটা একটু নতুন ধরনের। তবে ভাষাটা একেবারে যে নতুন তাও মনে হচ্ছে না। আগেও এ রকম দু-একটা বেরিয়েছে। কোথায় যে গেল!

(লিফলেটের স্তূপ হাতড়ায়)

আসাদ : হাসান! ওটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

মীনা : কিছুতেই দেবেন না স্যার!

হাসান : এই যে পেয়েছি। একেবারে এক ঢং। বুঝলে আসাদ, এই যে শ'-শ' লিফলেট এখানে দেখছ, এগুলো সব পরীক্ষা পেছাবার মহা আন্দোলনের ঐতিহাসিক দলিল স্বরূপ। বছরের হিসেব ক্রমিক নম্বর দিয়ে সাজিয়ে রেখেছি। তোমরা পুলিশের লোক এর আসল মূল্য কোনো দিন বুঝবে না। আত্মত্যাগের মহাকীর্তি ঘোষণা করে যুগ যুগ ধরে এই মহান আন্দোলনের ধারা প্রত্যেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসছে। আন্তরিকতায়, সংঘবদ্ধতায়, উচ্চকণ্ঠিতায় আর সকল জাতীয় আন্দোলন এর কাছে তুচ্ছ। মিউজিয়ামের কিউরেটর ডক্টর দানী বলেছেন যে তিনি এগুলো ইস্পাতের মলাটে বাঁধাই করে এসিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত রাখবেন। তোমাদের কাছ থেকে এটা না পেলে আমার গোটা সংগ্রহটাই কানা থেকে যেত।

(মীনা চিৎকার করে ওঠে কারণ তার হাতের ওপর আচমকা কিল মেরে রুমা খাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। মীনা রাগে দিশেহারা হয়ে কোমরে আচল পেঁচিয়ে মারাত্মকভাবে রুমার দিকে এগোয়। রুমা খাতাটা নিজের শরীরের আড়ালে ধরে রেখে পাশে-পেছনে হটতে থাকে। খপ্ করে মীনা তার চুল চেপে ধরে। রুমাও মীনার চুল। ধস্তাধস্তি! চিৎকার! খাতাটা ছিটকে দূরে গিয়ে পড়ে।)

আসাদ : মীনা! মীনা! আশ্চর্য! মীনা থাম্ বলছি। ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওর চুল! তুই আমার সামনে কামড়া-কামড়ি করছিস ? মীনা!

হাসান : মিস রুমা, ছিঃ ! ছিঃ! এ-কী করছ ? তুমি আরেকটা মেয়েকে ঘুঁসি মারছ ? তোমরা ভালো চাও তো থাম বলছি। নইলে আমি সত্যি সত্যি রিপোর্ট করে দেব!

(আসাদ মীনাকে টেনে সরিয়ে নেয়। প্রক্টর রুমাকে)

তুমি আর এক মুহূর্তও এখানে থাকবে না। চল তোমাকে বাড়ি পৌছে

দিয়ে আসি।

(কাগজপত্র ঠেসেঠুসে ব্যাগের মধ্যে ভরেন)

আসাদ : (মীনাকে) তুমি এখন বাড়ির ভেতর যাও।

(মীনা পা দিয়ে ঠেলে খাতাটা অন্দর মহলে চালান করে দেয়, তারপর নিজে চলে যায়। প্রক্টর রুমাকে নিয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করেন।)

আসাদ : লিফলেটটা রেখে যাও।

হাসান : সব কাগজপত্রের সঙ্গে মিশে গেছে, এখন খুঁজে বার করা সম্ভব হবে না। এখানেও পড়ে থাকতে পারে, ভালো করে খুঁজে দেখ। আসি এখন। চল চল।

(রুমাকে নিয়ে চলে যাবেন)

তৃতীয় দৃশ্য

(ছাত্রাবাসের আরেকটি কক্ষ। রমীজুদ্দিন চেয়ারে বসে আছে। সামনে একটা মাঝারি রকমের বাল্‌তি। পাশেব টেবিলে একটা লুঙ্গি দিয়ে কী সব ঢাকা রয়েছে। সামনে দাঁড়িয়ে আফতাব একটা আশুকরণীয় কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃত নির্দেশ গ্রহণ করছে।)

রমীজ : আমাদের আন্দোলন এখন দিনে দিনে গুরুতর আকার ধারণ করছে। অবস্থা গতকাল যে স্তরে ছিল, আজ সেখানেই থেমে নেই। অনেক দূর এগিয়ে গেছে। সোহরাব থেকে প্রক্টর, প্রক্টর থেকে পুলিশ ক্রমে ক্রমে ওদের আঁতাত মজবুত হচ্ছে। স্বচক্ষে সব দেখেছ। আমাদের পেছনে পড়ে থাকলে চলবে না। আমাদের কর্মপন্থাও রোজ একটু একটু করে আরো বেশি আক্রমণাত্মক করে তুলতে হবে।

আফতাব : ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন! ডাইরেক্‌ট এ্যাকশন ছাড়া কখনো বড় কাজ সিদ্ধি লাভ করেনি। শুধু শ্লোগান দিয়ে কে কবে রাজ্য জয় করেছে!

রমীজ : আমরা শ্লোগান দিয়ে আরম্ভ করেছি বটে কিন্তু হপ্তা না ঘুরতেই খাতা গাপের এ্যাকশনে নেমে পড়েছি। ধারা ঠিকই আছে, তবে এখন একে আরো এক ধাপ উঁচুতে চড়াতে হবে।

আফতাব : আজ রাতেই এক রাউন্ড হয়ে যাক।

রমীজ : এই সব আয়োজন তো সে-জন্যই। (বাল্‌তি দেখায়) আধ বাল্‌তি হলেই চলবে। যদি মশারি টাংগানো থাকে তবে তার ওপর ঢেলে দিতে হবে। তিন জনের মধ্যে জানালার ধারের চৌকিতে যিনি শোবেন ধকলটা তার ওপর দিয়েই যাবে। কিছু করবার উপায় নেই।

আফতাব : যদি অত রাতেও তিন জন কন্‌ফারেন্‌সে বসে থাকে।

রমীজ : আমি সেটাও ভেবেছি। বাল্‌তিটা হাতে নিয়ে তুমি হামাগুড়ি দিয়ে জানালার নিচে উঁচু হয়ে বসে থাকবে। আলোচনার খুব একটা

উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে তুমি একটা বিকট হুংকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বাল্তির মাল ঘরের মধ্যে, ওদের গায়ে ছুঁড়ে মারবে।

আফতাব : তারপর ?

রমীজ : তোমার কোনো ভয় নেই, তোমার ঐ হুংকারই হবে আমাদের সিগনাল। মেইন সুইচবোর্ডে লোক মজুদ থাকবে। তোমার গর্জন শোনামাত্রই বিজলি বিকল হয়ে যাবে।

আফতাব : তার আগেই যদি চিনে ফেলে ?

রমীজ : তার জন্যও সাবধান হতে হবে। চোখের নিচে নাকের উপর দিয়ে একটা গামছা খুব করে পেঁচিয়ে বাঁধবে। চেহারাও কিছু ঢাকা পড়বে, গন্ধটাও নাকে কম যাবে।

আফতাব : জিনিসটা যোগাড় করবে কে ? তুমি কি জমাদারকে বলে রেখেছ ?

রমীজ : সে ব্যবস্থা আমি করব।

আফতাব : তুমি!

রমীজ : আমি আগেও করেছি। কোনো দোষত্রুটি খুঁজে পাবে না।

আফতাব : ওহ্! তা তুমি বললে আমি নিজেও চেষ্টা করে দেখতে পারি। আমাকেই যখন নিক্ষেপ করতে হবে তখন—

রমীজ : না। তুমি পারবে না। (টেবিল লুঙ্গিটা তুলে ফেলে। ডিম ও টোমাটোর স্তূপ দেখা যাবে।) টোমাটোগুলো ভালো করে কচ্লে তার সঙ্গে অনুপাত মতো পচা ডিম মিশিয়ে খুব কবে ফেটাতে হবে। গন্ধ পয়দা করবার জন্য পরে ওর মধ্যে এক দলা গোবর ফেলে ভালো করে ঘুটে দেবে। সাধ্য কী অন্য কিছু বলে সন্দেহ করে। তার ওপর যদি আলো নিভে যায় তাহলে তো কথাই নেই!

আফতাব : আমাকে আর কিছুই বলতে হবে না। তোমরা অন্যদিক সামলাও।

রমীজ : অতি উৎসাহে বাড়াবাড়ি করো না। আজ শুধু একটা ঘবে হানা দেবে। পরের দিনের টার্গেট পরে স্থির করব।

আফতাব : সোহরাব! আজ তোমার রুস্তম আমি। পরীক্ষায় ফার্স্ট হও, মেয়েদের সঙ্গে মাখামাখি কবো, সেই দর্পে আমাদের মানুষ বলে গণ্য করো না। আজ দেখো তোমার সোনামুখে কী কালি মাখাই!

রমীজ : একটা রিহার্সাল দাও। তোমার থ্রোটা ঠিক হয় কিনা দেখি। শেষে হয়তো কেবল হুংকার দেয়াই সার হবে, আসল জিনিসটা কারো গায়ে গিয়ে পড়বে না।

আফতাব : বেশ। একেবারে ড্রেস রিহার্সালই দিচ্ছি।

(নাকের ওপর দিয়ে গামছা পেঁচিয়ে নেয়। গেঞ্জিটা খুলে ফেলে। লুঙ্গিটা গোচ দিয়ে পরে।)

রমীজ : খাসা দেখাচ্ছে। (বাল্তিটা নিজে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারার টেকনিক

দেখায়) জানালার শিকের একেবারে বেশি গা ঘেঁসে দাঁড়াবে না। তাহলে হয়তো শিকে ধাক্কা লেগে সবটা মাল উল্টে তোমার গায়ে এসে পড়বে।

আফতাব : একটু দূর থেকে তাক্ করব।

রমীজ : এক ধাক্কায় ছুঁড়ে মারবে না। মাল থাকবে আধ্ বালতি। আধা কাত করে ধরে দু-একবার সামনে পেছনে দুলিয়ে হাতের ঝোঁক ঠিক করে নেবে। তারপর হুংকার দিয়ে ঝপাৎ করে সবটা ছুঁড়ে মারবে ঘরের মধ্যে।

(দরজায় টোকা পড়ে।) কে ?

(নেপথ্যে : আমি খয়ের। রমীজুদ্দিন ততক্ষণে লুঙ্গি দিয়ে টমাটো-ডিম ঢেকে দিয়েছে। আফতাব দরজা খোলে। ঘরের ভেতরে কাণ্ডকারখানা না বুঝতে পেরে খয়ের অবাক হয়ে সব কিছু দেখতে থাকবে। বিশেষ করে বাল্তি এবং আফতাবের পোশাক ও ভঙ্গি। আফতাব দরজা বন্ধ করে দেয় এবং বালতি হাতে তুলে নিয়ে রমীজুদ্দীনের নির্দেশ অনুযায়ী ছুঁড়ে মারার কায়দা অভ্যেস করতে থাকে। খায়ের ঝুঁকে পড়ে দেখে বাল্তি খালি, না ভরাট।)

খয়ের : আজ রাতেই হবে নাকি ?

রমীজ : আজ হবে না তো কবে ? সব শেষ হয়ে গেলে তারপর ছিটাতে চাও নাকি ?

খয়ের : মানে, সব যোগাড় হয়ে গেছে ?

রমীজ : হবে। ঠিক আছে আফতাব, তুমি পারবে।

খয়ের : যোগাড় করলে-কী করে ? আজকাল তো সব জায়গায় স্যানিটারি ব্যবস্থা।

রমীজ : সে দায়িত্ব তোমার ওপর দেইনি। চুপ করে বসে থাকো। তুমি তোমার কাজের হিসাব দাও।

আফতাব : মিস্ মীনা মিনহাজের যে খাতাগুলো সরিয়েছ সেগুলো এখনো তুমি আমাদের দেখাওনি। সকালবেলা যা দেখিয়েছ সে হচ্ছে মিস্ মীনা মিনহাজের জন্য বেসামাল দরদ।

রমীজ : খাতাগুলো কোথায় ?

খয়ের : আছে।

রমীজ : কোথায় আছে ?

খয়ের : আমার সঙ্গেই আছে।

আফতাব : বার কর।

খয়ের : টিনের সুটকেসে আছে।

আফতাব : বার কর। (চৌকির নিচ থেকে সুটকেস খুলে চারখানা খাতা বার করে দেয়। রমীজ ও আফতাব সেগুলো নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করে।) কাণ্ডটা দেখেছ রমীজ! মনে হয় যেন, এখানে এসে অধ্যাপকের এক A- হরফ ছাড়া বাদবাকি বর্ণপরিচয় বেবাক লোপ পেয়েছে। সবগুলো

টিউটোরিয়াল রিমার্কই AAA! একেই বলে মুখ দেখে নম্বর! আহা-হা কী আমার অধ্যাপক রে! লম্বাচওড়া কথার ঠেলায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত, ওদিকে নিজেরা সব এক পা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন, সুযোগ পেলেই বৃন্দাবনের বাঁশুরিয়া! কো-এডুকেশনের আদত মজা ওঁরাই লুটেছেন, আমরা কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে মরি।

রমীজ : খয়ের, খাতা চারটে কেন ? কাল না বললে যে পাঁচটা হাত করতে পেরেছ ?

খয়ের : পাঁচটার কথা বলেছিলাম নাকি ?

রমীজ : গোটা গোটা পাঁচটা। পাঁচটা আঙ্গুলের মতো পাঁচটা। একটাও কম বেশি নয়। এখন চারটে দেখাচ্ছ কাকে ?

খয়ের : ওহ্। মানে, খাতা বলতে চারটেই ছিল। আরেকটা খাতা মানে—মানে, সেটা কোনো খাতাই নয়।

আফতাব : বারে বা! তুমি দেখছি একেবারে অধ্যাপকের ঢঙে কথা কইছ। সোজা প্রশ্নের জবাব মারছ কঠিন কঠিন ডেফিনিশন দিয়ে! বলি কোনো মতলব টতলব নেই তো!

খয়ের : সত্যি ওটা কোনো কাজের খাতা নয়। যদি ওটা টিউটোরিয়াল খাতা হতো কি কোনো পেপারের ওপর করা নোট, এমনকি একটা সাজানো গুছানো ক্লাশনোটও হতো তাহলেও কখনো আমার এ-রকম ভুল হতো না। কোথায় যে রাখলাম কিছুতেই খেয়াল করতে পারছি না।

রমীজ : আন্দোলনের এই স্তরে পৌঁছে তুমি এখন হঠাৎ বেখেয়ালি হয়ে পড়বে, এ হয় না। আমরা হতে দেব না।

আফতাব : আমি সুটকেসটা আরেকবার ভালো করে দেখি।

রমীজ : খুব ভালো করে দেখ। খয়েরের খেয়াল ফিরিয়ে পাইয়ে দাও।

(আফতাব বিছানার নিচ থেকে পুরনো টিনের সুটকেসটা টেনে বার করে। উপুড় করে দুবার ঝাঁকুনি দেয়। খাতা বার হয় না। তবুও অদৃশ্য খাতা জবরদস্তি বার করবার হিংস্র চেষ্টায় আফতাব ডালা পাকড়ে মাথার ওপর তুলে ধরে প্রচণ্ডবেগে সুটকেসটা মেঝের ওপর আছাড় মারে। সুটকেসটা দুমড়ে দু'টুকরা হয়ে যায়। রমীজ ও আফতাবের মুখ আরো কঠিন হয়।)

মিস মীনা মিনহাজের বাড়িতে তুমি যে-রকম করছিলে তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে হাওয়া ভালো বইছে না। বোকার মতো চুপ করে বসে রয়েছ কেন ? ভালো চাও তো খাতাটা বার করে দাও।

খয়ের : এ তোমাদের অন্যায় সন্দেহ। অন্যায় রকমের জিদ। আমি বলছি মিস্ মিনহাজের এ খাতাটার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো পরীক্ষার কোনো রকম যোগাযোগ নেই। এ খাতা দিয়ে কী করবে ?

রমীজ : অন্যগুলোর সঙ্গে বান্ডিল বেঁধে পুড়িয়ে ফেলব। এ-রকমই সিদ্ধান্ত ছিল। তুমিও ভিন্নমত পোষণ করতে না।

আফতাব : পুড়িয়ে ফেলব না তো বাধিয়ে রাখব নাকি ? ওগুলো হেফজ করে পরীক্ষার পড়া তৈরি করতে চাও ?

(খাতার তল্লাশে আফতাব খয়েরের বিছানাপত্র তছনছ করে ফেলে।)

রমীজ : আমরা খাতা চুরি করিয়েছি বটে কিন্তু সে একটা আন্দোলনের জন্য, একটা আদর্শের জন্য। ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। আমাদের নিজেদের কেউ যদি আজ উল্টো কিছু ভাবতে চেষ্টা করে, তাকে আমবা ছেড়ে দেব ভেবেছ ? ভালো চাও তো মিস মীনা মিনহাজের পঞ্চম খাতাটা চট করে বের করে দাও।

খয়ের : মনে করতে পারছি না। কোথায় যে ফেলে এলাম, ঠিক মনে করতে পারছি না।

রমীজ : ওকে একটু মনে করিয়ে দাও।

আফতাব : দিচ্ছি।

(বাল্‌তি তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়।)

খয়ের : ও কোথায় গেল ? ও আমাকে কী করবে ?

রমীজ : খাতাটায় কী লেখা আছে ?

খয়ের : বিশ্বাস কর, কিছু না, কিছু না ওটা মিস মীনা মিনহাজের বাফখাতা মাত্র। ওতে কোনো কাজের কথা নেই। সব বাজে বাজে কথা। এক লাইন লিখেছে, তিন লাইন কেটেছে। এর ওর নাম লিখেছে, ছবি এঁকেছে, ছড়া কেটেছে। পাশের মেয়েব সঙ্গে লিখে লিখে যা তা কথা বলাবলি করেছে, পরে কাটতে ভুলে গেছে। এ খাতা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, পরীক্ষার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এ শুধু অসতর্ক উক্তির ঝাঁপি, ওব মধ্যে কোনো লজ্জা, কোনো ডর, কোনো আব্রু নেই। ওটা একটা—

(ঝপাৎ করে এক ঝাপটা পানি এসে ধাক্কা মাবে খয়েরেব মুখে। নিক্ষেপকারী বাল্‌তিধারী আফতাবকে ঘরের অপর পাশে দেখা যাবে। খয়ের স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বুঝতে পাবে যে তার চুল মুখ গড়িয়ে পানি ঝরছে। তবুও হাত-পা নাড়ে না, অচেতন পুতুলের মতো ঠায় বসে থাকে।)

রমীজ : এতে তোমার মাথা ঠাণ্ডা হবে। হয়তো স্মৃতিশক্তি ফিরে আসবে। খাতা বার করতে পারবে। আমরা ততক্ষণে চা খেয়ে আসি। কোনো রকম চালাকি করতে চেষ্টা করো না। আমরা বার থেকে তালা দিয়ে যাব। আর এ খাতাগুলো সঙ্গে নিয়ে গেলাম। ফিরে এসে বাকি খাতাটা পেতে চাই। আল্লা করে, ভালোয় ভালোয় যেন তোমার লুপ্ত স্মৃতি ফিরে আসে।

(আফতাব ততক্ষণে বাল্‌তি রেখে দিয়েছে। দু'জন বেরিয়ে যাবে। খয়ের অপলক চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারে যে

বার থেকে তালা বন্ধ করা হয়েছে এবং গৃহসঙ্গীরা চলে গেল। খয়ের উঠে দাঁড়ায়। তারপর তোয়ালে দিয়ে মাথা মোছে। চুল আঁচড়ায়। একটু ভাবে। এদিক-ওদিক দেখে। রমীজের টেবিলের কাছে এগিয়ে যায়। রমীজের বই খাতার স্তূপ থেকে একটা খাতা বার করে নেয়। হাসে। বসে খাতা খুলে পড়তে থাকে। হঠাৎ ঘরের বাইরে দড়াম করে একটা প্রচণ্ড শব্দ হয়। ঘরের মধ্যে আংটা সুদ্ধ একটা তালা ছিটকে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে ঘরে ঢুকে সোহরাব। হাতে ক্রিকেট ব্যাট, তার মাথার একটা টুকরো উড়ে গেছে। খয়ের এত হকচকিয়ে গেছে যে হাতের খাতাটা লুকাতে ভুলে যায়।)

সোহরাব : পেয়ে গেছ ? আমাকে দিয়ে দাও।

খয়ের : কী দিয়ে দেব ?

সোহরাব : খাতাটা।

খয়েব : তোমাকে ? কী বকছ ?

সোহবাব : ওটা কোনো খাতাই নয়। বাজে খাতা। তোমাদের কোনো কাজে আসবে না। ওর মধ্যে লেখা কম, কাটাকুটি বেশি। হরফ পরিণত হয়েছে ছবিতে, কথা ছড়ায়। সামান্য কথাটা লিখেছেন দশবার, অসামান্য কথাটা ঢাকবার বৃথা চেষ্টায় সারা পৃষ্ঠা কালিতে লেপটে দিয়েছেন, নখ দিয়ে খুঁটিয়ে উপড়ে ফেলে দিতে চেয়েছেন কারো নাম, কোনো একটা ডাক, একটা সাড়া! তোমাদের আন্দোলনের সঙ্গে এব কোনো যোগাযোগ নেই।

খয়ের : এত কথা তুমি জানলে কী করে ?

সোহরাব : চা খেয়ে ফিরছিলাম। হঠাৎ তোমাদেব ঘরের মধ্যে বাক্স ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালাম। ঘুরে গিয়ে তোমাদের ঘরের পেছনের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি সব শুনেছি। ওরা চলে গেলে, দৌড়ে গিয়ে অন্য কিছু পেলাম না। (হাতের ব্যাট দেখিয়ে) এইটা দিয়েই তালা ভাঙলাম।

খয়ের : এত কষ্ট কেন করলে ?

সোহরাব : খাতাটা আমার দরকার। অন্যের খাতা আগে কোনোদিন দেখিনি। দেখতে চাইনি। কিন্তু আজ চাই। আজ খাতা হাত করতে চাই। খাতার বদলে খাতা। উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব। তুমি আমাকে সাহায্য কর।

খয়ের : যদি সাহায্য না করি ?

সোহরাব : সেটা খুব দুঃখের কথা হবে। কথায় ছাড়া কাজে কোনোদিন আমি কারো সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করিনি। কিন্তু আজকে আমি অন্যের ক্রিকেট ব্যাট ভেঙেছি, ঘরের তালা উপড়ে ফেলে দিয়েছি। আজকে আমি আমার কোনো কাজের জন্যই দায়ী নই। বিনা ওজরে খাতাটা আমার হাতে তুলে দাও। আমাকে একটা কিছু করতে বাধ্য করো না। (খয়ের তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে খাতাটা সোহবাবের হাতে তুলে দেয়) আল্লাহ্ তোমার মঙ্গল

করুন। তোমার কোনো রকম অনিষ্ট হোক এ আমি চাই না! (মাটি থেকে কুঁড়িয়ে) ব্যাটের এই ভাঙা টুকরোটা আর এই ওপড়ানো তালা কড়া রইল। ওরা ফিরে এলে দেখিও। বলো তোমার কিছু করার উপায় ছিল না। যদি মনে কর তবু তোমাকে ওরা সন্দেহ করতে পারে, তাহলে—আমার একদম সে ইচ্ছে নেই, কিন্তু যদি তুমি তা চাও—এক বাড়ি মেরে তোমাকে মেঝের ওপর ফেলে রেখে যেতে পারি। (খয়েব প্রবল ভাবে আপত্তি জানায়) বেশ! বেশ! আমার কোনো ইচ্ছে নেই। ওরা তোমাকে অবিশ্বাস না করলেই হলো।

(দ্রুত বেবিয়ে যায়)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিভাগীয় সেমিনার। সরু টেবিল বা বেঞ্চিতে বই রেখে ছেলেমেয়েরা পড়ছে। মঞ্চের পেছনের দিকে পাতা টেবিলের ওপর বই রেখে দর্শকদের দিকে পেছন দিয়ে বসে একটি মেয়ে পড়ছে। ডান পাশের টেবিলের এক প্রান্তে, মঞ্চের একেবারে সম্মুখ ভাগের কোণের কাছে বসেছে তারেক। তার উত্তরে বসেছে জনৈক ছাত্র। মঞ্চের বাঁ কোণে একটি কাঠের পার্টিশন কোণাকুণিভাবে দাঁড় করানো রয়েছে। তার সামনে টেবিলে বসে পড়ছে খয়ের। মীনা প্রবেশ করে। সবটা ঘর এক নজর জরিপ করে নিয়ে গটগট করে গিয়ে অন্য মেয়েটির পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। হাতের খাতা বই সশব্দে টেবিলে রাখে। সকলেই টের পায়। মীনা বসে। তারেক অতি মনোযোগের সঙ্গে সামনে বই খুলে রেখে মাথা কাত করে মীনাকে দেখতে থাকে। মীনা আচমকা ঘাড় ঘুরিয়ে তারেককে দেখে। তারেক তাড়াতাড়ি বইয়ের মধ্যে ডুবে যায়। মীনা উঠে দাঁড়ায়। একটা খাতা হাতে তুলে নেয়। আস্তে আস্তে তারেকের দিকে এগিয়ে যায়। যত কাছে এগিয়ে আসছে তারেকের মাথা ততই নিচু হতে হতে একেবারে বইয়ের সঙ্গে নাক লেগে যাবে। তখন মীনা একেবারে তারেকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাতের খাতাটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখে।]

মীনা : এই নিন। আপনার খাতা ফেরত নিন। ধন্যবাদ!

তারেক : খাতা আমার নয়। আমাকে অযথা ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

মীনা : খাতা আপনার কাছ থেকে নিয়েছি, আপনাকেই ধন্যবাদ দেব। এখন আপনাকে হাতের কাছে পেয়েছি, যা বলবার আপনাকেই বলতে পারি।

তারেক : না না, তা বলবেন না যেন!

মীনা : যখন আপনার বন্ধুকে সামনে পাব তখন তাকেও কিছু শোনাবার ইচ্ছে রাখি।

(ঘুরে গিয়ে মীনা নিজের জায়গায় বসে। তারেক আস্তে আস্তে খাতাটা হাতে তুলে নেয়। আড়চোখে মীনার ওপর লক্ষ রাখে, এদিকে খাতার পাতা উল্‌টে-পাল্‌টে দেখে। যা খোঁজে, পায় না। আবার পাতা উল্‌টায়। আবার। বারবার পাগলের মতো খাতার পাতা উল্‌টে-পাল্‌টে খোঁজে। লক্ষও করে না যে ওর এই ব্যস্ততা দেখে মীনা উঠে এসেছে।)

মীনা : আপনার কি কিছু খোয়া গেছে?

তারেক : না না। ছি ছি! কী যে বলেন!

মীনা : মনে হচ্ছে খাতার মধ্যে মূল্যবান কিছু রেখেছিলেন, এখন খুঁজে পাচ্ছেন না।

তারেক : না না। খাতার মধ্যে মূল্যবান কিছু রাখতে যাব কেন?

মীনা : আমরা রাখি। টাকা-পয়সা আমরা হামেশা বই-খাতার মধ্যে গুঁজে রাখি। কিছু চুরি গেছে বলে সন্দেহ করেন না কি?

তারেক : তওবা, তওবা! আপনি এসব কী বলছেন! তা ছাড়া এ খাতা আমার নয়। এ খাতার মধ্যে আমি টাকা-পয়সা গুঁজে রাখতে যাব কেন?

মীনা : অন্য কিছু, আরো দামি অন্য কিছু?

তারেক : না না। আমি কিছু রাখিনি। এ খাতার কিছুই আমার নয়। এর বাইরের মলাট, ভেতরের কাগজ, হাতের লেখা, ভাষা কিছুই আমার নয়। আমার কিছু খোয়া যায়নি।

মীনা : শুনে অন্তত একটা দুশ্চিন্তা কাটল। কিন্তু আপনি যে আপনার বন্ধুব মতো নন তা কে জানে? সামনে বিনয় প্রকাশ করে পরে আদালতে গিয়ে নালিশ রুজু করবেন না তো?

তারেক : সোহ্‌রাব কী করেছে?

মীনা : নামটা পাল্টে রাখতে বলবেন। এত নীচ আর কুটিল যার স্বভাব, সোহ্‌রাব নাম তাকে মানায় না।

তারেক : কী করেছে? রুস্তম, মানে ইয়ে, সোহ্‌রাব কী করেছে?

মীনা : রুস্তম কে?

তারেক : কেউ নয়, কেউ নয়। মানে, আপনি নাম পাল্টাতে হুকুম করায়, সাদৃশ্যবশত ওটা বেফাশ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

মীনা : হুম্। আপনার বন্ধু ক্ষেপে গিয়েছেন। আপনার দৌলতে ওঁর খাতা আমার হাতে এসে পড়ায় উনি ক্ষেপে একেবারে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। সব জেনেশুনেও শুধু আমাকে অপদস্থ করবাব জন্য খাতা চুরি গেছে বলে থানায় ডায়রি করিয়ে এসেছেন। এতেও মনের ক্ষোভ মেটেনি। তক্কে তক্কে ফিরেছেন। প্রথম সুযোগেই আমার খাতাগুলো চুরি কবেছেন। মেহেরবানি করে ওকে একবার বলবেন, আমার সঙ্গে যেন দেখা করে যায়।

তারেক : ও আপনার খাতা চুরি করেছে?

মীনা : চুরি করেছেন না তো আমি ওনাকে উপহার দিয়েছি? আপনি কোথায় চল্‌লেন?

তারেক : আমি সোহ্‌রাবকে ডেকে নিয়ে আসি।

মীনা : বেশ যান। আমি এখানে অপেক্ষা করছি। যদি না আসতে চায়, আমাকে এসে বলে যাবেন কোথায় গেলে ওকে পাওয়া যাবে। আমি নিজেই যাব।

(তারেক মাথা নিচু করে বেরিয়ে যায়। মীনা নিকটতম চেয়ারে বসে পড়ে। ভাবে। ধীরে ধীরে কাছে এসে দাঁড়ায় খয়ের।)

খয়ের : আমি একটা কথা বলব ?

মীনা : আপনি ?

খয়ের : মানে আপনার খাতাগুলো সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারতাম।

মীনা : কী বলতে পারতেন ? এ বিষয়ে আমার কিছু জানতে বাকি আছে বলে আমি মনে করি না।

খয়ের : মানে, আপনার খাতা যে সত্যি সত্যি চুরি গেছে, সে বিষয়ে আমি কোনো সন্দেহ প্রকাশ করছি না।

মীনা : আপনি সন্দেহ প্রকাশ করবার কে ? আমি বলছি চুরি গেছে, এটাই কি যথেষ্ট নয় ? আপনি কি মনে করেন যে আমি খাতা আঁচলের নিচে লুকিয়ে রেখে মুখে রটিয়ে বেড়াচ্ছি যে আমার খাতা চুরি গেছে ?

খয়ের : কিন্তু খাতা সত্যি সত্যি সোহরাব চুরি করেছে কি না সে বিষয়ে আমার কিছু বলবার ছিল।

মীনা : যে চুরি করেছে তার নিশ্চয়ই বলবারও কিছু রয়েছে। কিন্তু আপনি তার হয়ে জবানবন্দি দাখিল করতে চাইছেন কেন ? আপনিও তার বন্ধু নাকি ?

খয়ের : জি না।

মীনা : কেন ? এক হোস্টেলে থাকেন না ? পুরুষ মানুষ নন ?

খয়ের : এক ঘরে থাকলেও সবাই বন্ধু হয় না। সবাই মেয়ে হলেও হয় না, ছেলে হলেও হয় না। মিশাল হলেই যে হয়, তাও নয়।

মীনা : কী বলতে চাইছিলেন, বলেন।

খয়ের : ধরুন, এখন একদিন, দৈবাৎ আপনি সোহরাবের হাতে আপনার একটা হারিয়ে যাওয়া খাতা দেখতে পেলেন—

মীনা : একটা নয় পাঁচটা। মাছ নয়, পুকুর চুরি করেছে। ওকে আমি পুলিশে ধরিয়ে দেব।

খয়ের : সেটা যে অন্যায় হবে আমি সে-কথাই বলতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আপনি আমাকে কোনো কথা শেষ করতে দিচ্ছেন না।

মীনা : বেশ।

খয়ের : ধরুন, একটা খাতা ওর হাতে এসে পড়েছে। হয়তো তার কাছে সেটা গচ্ছিত রেখেছে। হয়তো সেটা অন্য কোনো জায়গা থেকে সোহরাব উদ্ধার করে এনেছে। হয়তো নিজে সে খাতাটা এখনো খুলে দেখেনি। একটা অতি-নৈতিকতার মোহবশে হয়তো কোনোদিনই খাতাটা খুলে দেখবে না।

মীনা : কোন খাতাটা ?

খয়ের : যে-কোনো খাতা। ধরুন সবচেয়ে অপরিষ্কার অগোছাল, অকাজের একটা খাতা। যার মধ্যে লেখা কম, কাটাকুটি বেশি।

মীনা : আমার রাফ্‌খাতাটা। পশু, পশু! অনুভূতিহীন বর্বর চোয়াড়ে চাষা! কেবল

চুরি করে আশ মেটেনি। দশজনকে ডেকে দেখিয়েছে, নিজে বাহাদুরি নিয়েছে, একটা মেয়ে সম্পর্কে কুৎসিত কথা রটিয়েছে। সামনে পেলে ওকে আমি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলব!

(হন্তদন্ত হয়ে প্রবেশ করে রুমা। মুখে চোখে গভীর উদ্বেগের ছাপ। ছুটে মীনার কাছে যায়।)

রুমা : মীনা, পালাও! ভালো চাও তো এখান থেকে এক্ষুণি পালাও।

মীনা : আমি পালাব ? কী হয়েছে, পরিষ্কার করে বল।

রুমা : এ পরিষ্কার করে বলার সময় নেই। দেরি হলে এক্ষুণি মহাকেলেঙ্কারি বেধে যাবে।

মীনা : তোমাকে এতবার এত অকারণে উদ্বেলিত হতে দেখেছি যে এখন কারণ না বললে আমি বিচলিত হতে পারছি না।

রুমা : সোহরাব তোমার খোঁজে এদিকে আসছে।

মীনা : সোহরাব ?

রুমা : সোহরাব এমনভাবে আমাকে জেরা শুরু করল যে আমার হুঁশ বলতে কিছু বাকি ছিল না। কী বলতে কী বলেছি আল্লাই জানেন।

মীনা : কী নিয়ে জেরা করছিলেন ?

রুমা : ওর চিঠিটা নিয়ে। মানে, যে চিঠিটা ওর খাতার মধ্যে ছিল। ওই যে, যে খাতাটা শেষ পর্যন্ত তোমার হাতে এসে পৌঁছল। তা আমি বললাম, সেটা মানে চিঠিটা, এখন তোমার কাছে নেই। মনে নেই, হট্টগোলের মধ্যে প্রোক্টর সাহেব সেটা ব্যাগে পুরে নিয়ে উধাও হলেন।

মীনা : সে-ও তোমার দৌলতে।

রুমা : শুনেই সোহরাব রেগে আগুন, তেলে বেগুনে। ফোঁস ফোঁস করে বলে উঠল যে তুমি নাকি ওর জীবন নষ্ট করবার জন্য পত্রসহ প্রোক্টরের কাছে নালিশ করেছ। তোমাকেও সে একবার দেখে নিতে চায়। ওই যে আসছে। আমার কথা তো শুনলে না, এখন ঠ্যালা সামলাও।

(রুমা একটা চেয়ার টেনে মনোযোগ দিয়ে পড়তে বসে যায়। খয়েরও। একমাত্র মীনা চুপ করে দাঁড়িয়ে। বেগে প্রবেশ করে সোহরাব। পেছনে তারেক। সোহরাব সারা ঘর দেখে মীনার ওপর চোখ পড়তেই থমকে দাড়ায়। এগিয়ে যায়। মীনা এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

সোহরাব : আপনার সঙ্গে কিছু গুরুতর কথা ছিল। মেহেরবানি করে একটু বাইরে আসবেন কি ?

মীনা : না। আপনি মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি চলে যাবেন না। আপনার সঙ্গেও আমার কিছু গুরুতর কথাবার্তা আছে।

সোহরাব : বেশ। তাই হোক।

মীনা : বেশ!

সোহরাব : আমি আপনাকে বলতে এসেছিলাম যে আপনার আধুনিকতাটা একটা ভঙ্গি মাত্র। আসলে তার গভীরতা আপনার প্রসাধনের প্রলেপের চেয়ে বেশি নয়।

মীনা : আপনি যে মুক্তবুদ্ধির বড়াই করেন সেটাও একটা ভণ্ডামি। আদর্শের যে বুলি প্রচার করেন তা আগাগোড়া মেকি। রুচি, শিক্ষা ভদ্রতার যে মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ান, সেটা খুলে ফেললে ভেতর থেকে যা বেরিয়ে পড়বে তা ইতর, গ্রাম্য, নোংরা!

সোহরাব : এসব কথা আপনি বলছেন আমাকে ? আপনাকে আমি চিনি না ? স্বাধীনা রমণীর ঢং কেবল বাইরে, ভেতরে সেই মধ্যযুগীয় অন্ধতা, মধ্যযুগীয় ভীরুতা, মধ্যযুগীয় সন্দিগ্ধতা!

মীনা : কেবল বাক্য, বাক্য, বাক্য! অন্যকে দিয়ে নিজের গরজ মেটাতে লজ্জা করেনি আপনার ? খাতা পাঠাবার বেলায় নিজের বীরত্ব উবে গেল কেন ?

সোহবাব : আমি আপনাকে খাতা পাঠিয়েছি ?

মীনা : এক শ'বার পাঠিয়েছেন। আপনি ছাড়া তার মধ্যে অকথা-কুকথায় ভরা পত্র ঢুকিয়ে রাখবে কে ? পাঠিয়েছিলেন পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তারপর আবার নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্য পুলিশের কাছে ছুটে গেলেন কোন লজ্জায় ? আপনি আসলেই বঞ্চক, নীচ, খল!

সোহরাব : সে চিঠি পড়ে আপনার বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয়নি যে ওই হাতের লেখা আমার নয়। ওই বাংলা ভাষা আমার নয়। পায়ের নিচে লুটোপুটি খাওয়া ওই প্রেমাবেগ আমার হতে পারে না। তবু কেন সে চিঠি প্রোক্টবের হাতে তুলে দিলেন ? নালিশ করতে গেলেন কেন ?

মীনা : এক শ' বার করব। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েদের খাতা চুরি করতে লজ্জা করে না আপনার ?

সোহরাব : আমি খাতা চুরি করেছি ? আমি চোর ?

মীনা : আপনি চোর। আপনি অসংযমী। আপনি অসাধু। মিথ্যেবাদী, ষড়যন্ত্রকারী, প্রতিহিংসাপরায়ণ!

সোহরাব : আর আপনি ? আপনি কী ? রঙ্গ করার বেলায় ঝুনো, কিন্তু নালিশ করার বেলায় কচি খুকি। কেউ পত্র লিখেছে তো হয়েছে কী ? কপালে কলঙ্কের সীলমোহর এঁকে দিয়েছে ? বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ করেছে ? আপনাকে হরণ করেছে ? কেঁদে কেঁদে নালিশ করতে গেলেন কেন ?

মীনা : ষণ্ড! হস্তী! বর্বর! চণ্ডাল!

সোহরাব : আর কী ওই একটাই তো অস্ত্র! কাঁদুন। কেঁদে কেঁদে জিততে চেষ্টা করুন।

(দুজন মেয়ে এসে মীনাকে এক রকম জোর করে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যায়। ছেলেরা সোহরাবকে। পরবর্তী তিন চার জোড়া সংলাপ এক সঙ্গে চলবে।)

খয়ের : সোহরাব! সোহরাব! এ তুমি কী করছ? আহ্ থাম না! থাম! এ তুমি কী করছ?

তারেক : সোহরাব! সোহরাব! পাগল হয়ে গেলে নাকি? কাকে কী বলছ না বলছ একেবারে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছ না কি?

সোহরাব : ওঁর মতো মহিলার সঙ্গে সংযত ব্যবহার করার কোনো সঙ্গত কারণ আমি স্বীকার করি না। উনি কোমল নন, নম্র নন, লাজুক নন। উনি রীতি মতো মার-মুখো, দাংগাকাংক্ষী, ঘাতকী!

তারেক : আহ্ কী করছ। রাগলে তোমার কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

খয়ের : মিস্ মীনা মিনহাজকে ও এসব কথা বলতে পারছে?

সোহরাব : কে? কে বলেছে মেয়ে। ইনি নিশ্চয়ই দেবতা। দেখ, দেখ, তাকিয়ে দেখ একবার! চোখ মুখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বেরুচ্ছে। মেয়ে নয়, অগ্নিগিরি! অগ্নিগিরি।

রুমা : মীনা! মীনা! এত বেসামাল হোসনে! এত চিৎকার করছিস কেন?

মেয়ে : বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত ছেলে কোনো মেয়েকে প্রকাশ্য স্থানে এসব কথা বলতে পারে, কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।

মীনা : কৃষক! কৃষক! শেখেনি, এখনও শেখেনি মেয়েদের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়। ভাষার ওপর লাগাম নেই। শরীরের ঝোঁক সামলাতে জানে না। মনে হয় যেন সত্যি সত্যি গায়ে হাত ওঠাবে। পশু! পশু!

রুমা : আহ্ তুই থাম না। তুই কি ওকে মারতে চাস না কি?

মেয়ে : একবার সোহরাবের কথাগুলো শোনেন। গায়ে ফোস্কা পড়ে যেতে চায়।

মীনা : থাকবে না। থাকবে না। এত দর্প থাকবে না। সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। হাঁটু গেড়ে বসে কাঁদতে হবে। কববে করবে। বিলাপ করবে। দেরি নেই। দু'হাত তুলে ইনিয়ে বিনিয়ে বিলাপ করবে। দেখব। সেও আমি দেখব। সবাই দেখবে!

(সোরগোল বেশ জমকালো আকার ধারণ করে। এমন সময় সাদা প্যান্ট-সার্ট জুতো পরে, হাতে ভাঙ্গা ব্যাট নিয়ে ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢোকে খালেদ। চিৎকার করে বলে—)

খালেদ : চুপ। চুপ। সবাই চুপ কর। একেবারে বাজার বসিয়ে ফেলেছ! চুপচাপ পড়তে বসে যাও। প্রোক্টর আসছেন।

(সবাই তাড়াতাড়ি চেয়ার টেনে পড়তে বসে যায়। বই খাতা সামনে মেলে ধরে। প্রোক্টর প্রবেশ করে চারদিক দেখেন। সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে। নিরবতা।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[অনেক রাত। সোহরাবদের ঘর। টেবিল ল্যাম্পের আলোতে গভীর মনোযোগ দিয়ে সোহরাব একটা খাতা পরীক্ষা করছে। হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাস, পাশে স্পন্‌জ ও এক গ্লাস পানি। পাঠোদ্ধারের সাধনায় এমন গভীবভাবে নিমগ্ন যে সব সময়ে সকলের কথা পুরোপুরি বুঝে উঠবার অবসর পায় না। তারেক সোহরাবের তন্ময়তার সুযোগ নিয়ে এদিক-ওদিক থেকে উঁকি মেরে খাতাটা পড়তে চাইছে। খালেদ ভাঙা ব্যাট আন্দোলিত করে ঘনঘন উত্তেজনা প্রকাশ করছে এবং সোহরাবকে প্রদক্ষিণ করতে করতে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করছে।]

খালেদ : কে ? আমার ব্যাট এ রকম করছে কে ? দুপুরবেলা থেকে জিজ্ঞেস করছি, কিন্তু এখন অবধি কোনো সদুত্তর পাইনি। আমার ব্যাট কে ধরেছিল ?

সোহরাব : আমি।

খালেদ : তুমি ? কেন ? তুমি ক্রিকেট-ব্যাট ধরতে গিয়েছিলে কেন ?

সোহরাব : জরুরি প্রয়োজন পড়েছিল।

খালেদ : তোমার জরুরি প্রয়োজনে তুমি আমার ক্রিকেট ব্যাট ধরতে গেলে কোন্ আক্কেলে। জীবনে কখনো এর আগে ক্রিকেট-ব্যাট ধরেছিলে ? এ তোমার মশারির ডাণ্ডা না নৌকার বৈঠা যে জরুরি অবস্থায় যেমন কবে পার ধরে মাথার ওপর ঘোরাতে পারলেই কেল্লা ফতে। দেখ তো কী করেছ ?

(ব্যাটটা সোহরাবের মুখের সামনে ঠেলে দেয়। সোহরাব ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হাতের খাতার ওপর থেকে সরিয়ে ব্যাটের ভাঙা মাথাব ওপর তুলে ধরে।)

সোহরাব : ভেঙে গেছে।

খালেদ : এতক্ষণ পর তা উপলব্ধি করেছ ? এ-রকমভাবে তুমি ব্যাট ভাঙতে পারলে কী করে ?

সোহরাব : খেলতে খেলতে। কেন খেলতে খেলতে ব্যাট ভাঙে না ? কত নম্বর টেস্ট ম্যাচে কোন্ মাঠে কোন্ বোলার কার ব্যাটের কোণা উড়িয়ে দিল মুখস্থ করে রাখনি ?

খালেদ : এ্যাঁ! এ অশিক্ষিত ছেলে বলে কী ? বল মারতে গিয়ে ব্যাট এই রকমভাবে ভাঙে ? ক্রিকেট-ব্যাট চালাচ্ছিলে, না গদা ঘোরাচ্ছিলে ? বল তো বল, মানুষের মাথা ফাটালেও ব্যাটের দশা এ-রকম হয় না।

সোহরাব : তাও চেয়েছিলাম। কিন্তু দরকার হয়নি।

খালেদ : তোমার আজকাল কী হয়েছে বল তো ? বরাবর থাকতে পড়াশুনা নিয়ে, এক রকম ভালোই ছিলে। বই-পুস্তকের চারকোণা ছোট ছোট দুনিয়া, তার মধ্যে নড়াচড়া করতে। বড়জোর বেরিয়ে এসে নিজের মাথার গোলাকার জমিতে চরে বেড়িয়েছ। সুখে ছিলে। মাঝখানে হঠাৎ আবার ক্রিকেট অভ্যেস করার খেয়াল মাথায় চাপল কেন ? জান, তোমার হাতে ক্রিকেট ব্যাট একটা আত্মঘাতী অস্ত্রের সমান ? এ বস্তু হাতে পেয়ে তুমি যে ক্ষেপে যাবে সে তো স্বাভাবিক! নিজ মুখেই বলছ মাথা ফাটাতে চেয়েছিলে।

সোহরাব : প্রথমে এক বাড়িতে তালাটা ভেঙে ফেললাম। ভেবেছিলাম দরকার হলে আর এক বাড়িতে মাথাটা ভেঙে ফেলব।

খালেদ : এ দেখছি একেবারে ক্ষেপে গেছে। সেমিনারেও তোমার কাণ্ড দেখে আমি একেবারে হতভম্ব। আরেকটু হলে তো তুমি মেয়েটাকে এক রকম ধরে ফেলেছিলে!

সোহরাব : কাকে ধরতে চেয়েছিলাম ? মিস্ মীনা মিনহাজকে ? আমি ? আমি মিস্ মীনা মিনহাজকে ধরতে চাইছি ?

খালেদ : আরে সে ধরার কথা বলছি না। তুমি আরেকটু হলে একটা হাতাহাতি বাধিয়ে দিয়েছিলে।

তারেক : তুমি সত্যি সত্যি মিস্ মীনা মিনহাজের খাতা চুরি করেছ ? এটা কার খাতা ? এ খাতা তুমি কোথায় পেলে ? এটা কোন্ বিষয়ের খাতা ? এব মধ্যে এত কাটাকাটি কেন ? পাতা ওল্টালে কী বুঝে ? কী পড়তে পেরেছ ?

খালেদ : কার খাতা এটা ? মিস মীনা মিনহাজের ? তুমি কোথায় পেলে ?

সোহরাব : তোমার ব্যাটটা হাতের কাছে না পেলে উদ্ধার করতে পারতাম না।

খালেদ : কোনো বিষয়ের খাতা ? কী লিখেছে, পড় তো! লেখে কেমন ?

সোহরাব : তোমার চিঠির জবাব পাঠিয়েছে। লিখেছে : সকল ক্রীড়ার শিরোমণি, আপনাব নিপুণ পত্রাঘাতের মর্মপীড়ায় নির্যাতিত হয়ে এখন বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছি। তারেক-সোহরাব নিপাত যাক্! আপনি ছাড়া অন্য পুরুষকে মনুষ্য জ্ঞান করি না। ঘবের অভিভাবক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোক্টর, এই দুই দানব বধ করে বন্দিনী রাজকন্যার প্রাণোদ্ধার করুন!

খালেদ : কোথায় লিখেছে দেখি ?

সোহরাব : প্যাঁচানো লেখা। তুমি দেখে সবটা বুঝতে পারবে না।

তারেক : আমি সেই কখন থেকে দেখছি, এক বর্ণও উদ্ধার করতে পারিনি। আর তুমি এক নজর দেখেই সব ধরে ফেলবে ?

(নেপথ্যে স্লোগান শুরু হয়ে গেছে : ছাত্র ঐক্য ইত্যাদি)

খালেদ : এ দেখছি সবই কাটাকুটি। বুজরুকি ছাড়। সামনে আরো গুরুতর সংকট আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার জন্য তৈরি হওয়া দরকার।

তারেক : তুমি সত্যি পড়তে পারছ ? এই জায়গাটায় কী লিখেছে পড় তো!

সোহরাব : ওটা অশ্লীল কথা, তোমাকে অন্য কোনো জায়গা পড়ে শোনাব।

তারেক : যে-সব জায়গা পড়া যাচ্ছে, সেগুলো তো একটাও এমন কিছু উত্তেজনাপূর্ণ নয়।

সোহরাব : তাতো হবেই।

খালেদ : ওরা ঠিক করেছে আজ রাত থেকেই ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু করবে। রাত কম হয়নি। যে-কোনো মুহূর্তে শুরু করে দিতে পারে।

তারেক : কী শুরু করবে ?

খালেদ : হয়তো মশাবীর ডাণ্ডা খুলে মাথার ওপর ঘোরাবে। হয়তো কেরোসিন ঢেলে বই খাতা পুড়িয়ে দিতে চাইবে।

সোহরাব : অসম্ভব। এ খাতা আমি পোড়াতে দেব না।

খালেদ : কী আছে এই খাতার মধ্যে ?

তারেক : আমি কিছুই পড়তে পারিনি। মানে, যে-সব জায়গা পড়তে পেরেছি তার মধ্যে কিছুই নেই।

খালেদ : এটা কোনো কাজের খাতা নয়। কোনো বিষয়ের খাতা নয়। নোট নয়। টিউটোরিয়াল নয়। এ-রকম খাতা নিয়ে ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে আসার কোনো মানে হয় না।

সোহবাব : এমনিতে না দিলে সত্যি সত্যি মাথা ফাটিয়ে দিতাম!

খালেদ : সে খুব বাহাদুরির কাজ হতো না। তোমার এই একটা হঠকারিতার জন্য আমাদেব সবাইকে পস্তাতে হবে। নিজেদের মক্‌সুদ হাসেল করবার জন্য ওবা খাতা চুরি করে। আর তুমি ? তুমি ডাকাতি কর ওদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে। যেভাবে মেরেছ তাতে অস্ত্রটাকে আর ক্রিকেট-ব্যাট বলাব মানে হয় না। ওদের মাথায় ডাণ্ডা মেরে চুরি করা মাল লুট করে নিয়ে এসেছ। এইটে একটা আদর্শের জন্য আন্দোলন করা হলো ?

সোহরাব : আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। যা পেয়েছি তার জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে রাজি আছি।

খালেদ : তুমি কিছু পেয়েছ, তাই কিছু দিতে রাজি আছ। কিন্তু আমরা খেসারত দিতে যাব কেন ? এই একটা খাতাকে উপলক্ষ করে ওরা মরিয়া হয়ে উঠতে পারে। হয়তো হয়েছে। হয়তো এই মুহূর্তেই ওরা লাঠিসোটা নিয়ে অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

সোহরাব : পরোয়া করি না।

তারেক : কী পেয়েছ বলতে পার ? খাতা না হয় না দেখালে, কিন্তু বিষয়বস্তুটা কী বলতে পার ?

সোহ্‌রাব : এখন বুঝতে পারছি মিস মীনা মিনহাজ খাতা চুরি যাওয়ার শোকে এ-রকম দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন কেন ? আমি তখনো এটা পড়িনি। পরীক্ষার নোট কিংবা টিউটোরিয়াল খাতা খোয়া গেলে বাহ্যজ্ঞানহারা হবেন এমন মেয়ে উনি নন। এখন বুঝেছি। এ খাতাটা আমার কাছে এসে পড়েছে আশঙ্কা করেই ক্ষেপে গিয়েছেন।

তারেক : তুমিও ক্ষেপে গিয়েছ।

সোহ্‌রাব : না। শুধু আস্বস্তি অনুভব করছি। নিজের নিরাপত্তার হাতিয়ার আবিষ্কার করতে পেরে আমার উল্লাসের অন্ত নেই। এই খাতা মিস্ মীনা মিনহাজের অরক্ষিত, অসতর্ক, অসহায় অন্তর্লোকের প্রতিচ্ছবি। তোমার সম্পর্কে, আমার সম্পর্কে, প্রোক্টর সম্পর্কে অগণ্তি গোপন চিন্তা এর মধ্যে প্রকাশ করেছেন। মিস্ মীনা মিনহাজ এখন আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।

তারেক : তুমি তাঁকে ব্ল্যাকমেল করতে চাও ?

সোহ্‌রাব : দর্প চূর্ণ করতে চাই। সাপের ফণা ঝাঁপির নিচে চেপে ধরে রাখব। খসে পড়া ঘোমটা তুলে কালো মুখ ঢেকে দেব। উদ্ধত উন্নত চিবুক কদমবুসির তাগিদে যেন আভূমি নত হয়ে আসে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করব।

(বাইরে শ্লোগান চড়তে থাকে)

খালেদ : আমি অন্য রকম প্রস্তাব করি।

সোহ্‌রাব : যেমন ?

খালেদ : আমরা এখানে এক রকম আটক অবস্থায় আছি বলতে পার। ওরা দলে ভারি। তার ওপর সোহ্‌রাবের কাণ্ডকারখানায় নিশ্চয়ই খুব উত্তেজিতও বটে। আমি প্রস্তাব করি যে, অকারণে আমরা ওদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হব না।

তারেক : আমি তোমাকে সমর্থন করি।

খালেদ : তার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে আমাদের উচিত রমীজদের ঘরে গিয়ে একবার ক্ষমা প্রার্থনা করা, সোহ্‌রাবের কৃতকর্মের জন্য।

সোহ্‌রাব : রাজি আছি।

খালেদ : বেশ। তাহলে চল। যত দেরি হচ্ছে ততই অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমরা গিয়ে ওদেরকে বলব যে, মতবাদের জন্য আমরা পরস্পরের বিরোধিতা করছি, কোনো আত্মস্বার্থ সিদ্ধির জন্য নয়।

সোহরাব : চল। তবে তোমার ক্রিকেট-ব্যাটটা সঙ্গে নিয়ে যাব।

খালেদ : না। তুমি খাতাটা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

সোহরাব : খাতা! খাতা আমি অন্য কোনোখানে রেখে যাব।

তারেক : তার মানে ?

সোহরাব : ব্যাট ভেঙেছি, তালা উপড়েছি, মাথা ফাটিয়েছি, এসব অপরাধের জন্য মাফ চাইতে এক শ' বার রাজি আছি। কিন্তু খাতা ফেরত দেব কেন ?

খালেদ : চালাকি রাখ। খাতা তোমাকে দিতে হবে।

(বাইরে শ্লোগান)

তারেক : খাতা ওদের কাছে থাকতে পারে, কারণ ওরা খাতা চুরি করেছে। তা যদি না হয় তাহলে খাতা মিস্ মীনা মিনহাজকে ফিরিয়ে দিতে হবে। খাতা তোমার কাছে থাকবে কেন ?

সোহরাব : তোমরা জোর করে আমার কাছ থেকে খাতা ছিনিয়ে নিতে চাও ? আমি তোমাদের ভালো রকম চিনি। আন্দোলনের আদর্শের কথা ভুয়া, মালিকানা স্বত্বের আইনবাজি ভুয়া। তোমরা চাইছ, খাতাটা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেরা ভোগ করবে। মিস্ মীনা মিনহাজকে নিজেদের কব্জার মধ্যে আনবে। (সোহরাব লাফ দিয়ে ক্রিকেট-ব্যাটটা মুঠ করে ধরে ঘরের এক কোণে সরে দাঁড়াল) খবরদার! গায়ের দিকে এগিয়ে এসেছ কি ক্রিকেট ব্যাট দিয়েই মুগুর ভাঁজব। আমি সব লণ্ডভণ্ড করে দেব। টেবিল, চেয়ার, মাথা, বালব সব ফাটিয়ে চৌচিব করে দেব। এ খাতা আমি কাউকে দেব না। খবরদার!

খালেদ : সোহরাব!

তারেক : খালেদ, খুলতে পারছি না। মশারির ডাণ্ডাটা খুলতে পারছি না।

সোহবাব : তোমরা বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে। আমার সংগ্রাম আমি একা করব। তোমাদের কোনো সাহায্য চাই না। বেরিয়ে যাও। খবরদার আর এক পা এগিয়ে এসেছ কি, আমি সত্যি বলছি, যা থাকে কপালে, চোখ কান বন্ধ কবে দড়াম করে লাগিয়ে দেব একটা!

(সোহরাব ব্যাট দিয়ে মারাত্মকভাবে বাতাস কাটে)

খালেদ ও তারেক : সোহরাব! সোহরাব!

(বাইরে প্রচণ্ড বেগে নতুন শ্লোগান ফেটে পড়ে : 'গুপ্তচর! নিপাত যাক!' এবং 'প্রোক্টর! ধর ধর!' ঘরের তিনজন চমকে ওঠে নতুন শ্লোগান শুনে। শ্লোগান থামতে না থামতেই দরজ.য় টোকা পড়ে। তিন বন্ধু এক কাতাবে এসে দাঁড়ায়। তারেক মশারির রড উপড়ে ফেলেছে। দরজায় আবার টোকা পড়ে। সোহরাব ইশারা করে। তারেক দরজার ছিটকিনি খুলে দেয়। ঢুকে পড়েন প্রোক্টর বদরুল হাসান। আরেকবার বাইরে শ্লোগান শোনা যাবে।)

হাসান : সারা হোস্টেল জেগে আছে। ব্যাপার কী ? রাত বারটা বাজে। তোমরা শুতে যাবে না ?

তারেক : আপনি এখানে এত বাতে কী করছেন স্যার ?

হাসান : আমার আবার রাত-বিরাত। যেদিন থেকে তোমাদের দেখভাল করার দযিত্ব নিয়েছি, সেদিন থেকে ঘুমের পাট চুকিয়ে দিয়েছি। দিনে ঘুমালেও ঘুমাতে পারি কিন্তু রাতে ঘুমানো অসম্ভব। তোমরা সবাই যখন গভীর ঘুমে অচেতন, আমি তখনও জেগে জেগে ফিরি।

সোহরাব : এসব করেন কেন ? শুতে যাননি কেন ? এই রকম অসময়ে হলে ঢুকতে গেলেন কেন ? জানেন, ছেলেরা যদি টের পায় তাহলে যে-কোনো রকম একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে দিতে পারে।

হাসান : ছেলেরা ঠিকই টের পেয়েছে। শ্লোগানের গর্জন শুনলে না ? কিন্তু ওরা টের পায়নি যে আমিও টের পেয়ে গেছি।

তারেক : আপনি কি টের পেয়েছেন ?

হাসান : যে আসলে ওরা রত্ন, রত্ন। যাকে বলে জুয়েল। গবর্নরের বক্তৃতা শুনে তোমরা হয়তো হেসেছ। কিন্তু আমি ঠিকই উপলব্ধি করেছি যে তোমরা সবাই আসলে এক একটা রত্নখনি। মণিমুক্তার স্বভাবই ঝকমক করা। প্রাণবন্ত তরুণ একটু চিল্লাচিল্লি করবেই। তাই বলে এরা আমাকে শারীরিকভাবে বিপন্ন করতে চাইবে, এ আমি বিশ্বাস করিনে।

খালেদ : করেন না ভালো। কিছু না হলে আরো ভালো। সব জুয়েল সমান নয়। তেজীগুলো জ্বলতে জ্বলতে ঠিকরে একটা আরেকটার গায়ের ওপর এসে পড়ে। আমরা সেই রকম আশঙ্কা করছি। আপনি তাড়াতাড়ি আমাদের ঘর থেকে চলে যান।

হাসান : তোমাদের সম্পর্কে যে ওরা বলে, মিছে বলে না। তোমাদের কথাবার্তা সত্যি তেড়িয়া রকমের। তাহলেও, তোমরাও জ্বলন্ত জুয়েলস্বরূপ, এ আমি অস্বীকার করিনে।

সোহরাব : আমাদের ঘরে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢুকেছেন, না কেবল আত্মরক্ষার তাগাদায় দরজায় ঘা দিয়েছিলেন ?

হাসান : তোমরা পাগলও বটে, উদ্ধতও বটে! বিপদে পড়লাম কখন যে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত হব! এমনি হোস্টেলটা একবার টহল দিয়ে দেখে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তোমাদের ঘরের সামনে এসে মনে হলো ভেতরে কে যেন বিপদে পড়েছে। ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করছিল।

সোহরাব : আমি চিৎকার করছিলাম। কিন্তু সেটা ভয়ে নয় স্যার, ভয় দেখাবার জন্য।

হাসান : ওই একই কথা। ভাবলাম বিপত্তিটা মিটিয়ে দিয়ে যাই আর সেই সঙ্গে আমারও কিছু তদন্ত করার ছিল সেটাও না হয় চুকিয়ে যাব।

খালেদ : এত রাতে তদন্তে বেরিয়েছেন ? আমাদের ঘরে ?

সোহরাব : ভালো সময় নির্বাচন করেননি। তাড়াতাড়ি করুন। চারদিক অস্বাভাবিক রকম থমথমে মনে হচ্ছে।

(প্রোক্টর টেবিল ল্যাম্পের সামনে বসেন। পোর্টফোলিও ব্যাগটা খুলে একটা লিফলেট বের করে তার ভাঁজ খুলতে থাকেন।)

হাসান : তোমরা কেউ একজন স্বীকার করলেই আমি সঙ্গে সঙ্গে চলে যাব। কথাটা এই লিফলেট নিয়ে।

সোহরাব : আপনি একেবারেই কোনো খোঁজ রাখেন না। কেন অনর্থক রাত জাগেন আল্লা জানেন। আপনি পড়ে বুঝতে পারেননি যে এ লিফলেট আমাদের নয়, ওদের। ওসব কথা কোনো দিন আমরা লিখি না, লিখতে পারি না লিখব না। আপনি যদি এখন সারারাত বসে বসে জেরা করেন তাহলেও আমরা বলতে পারব না—এ লিফলেট কে লিখেছে, কোত্থেকে ছেপেছে, কারা বিলি করেছে। আপনি ভুল ঘরে এসেছেন। আমরা কাউকে ধরিয়ে দিতে পারব না। আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান। নিজের চেষ্টায় খুঁজে বার করুন।

হাসান : তোমার বলা শেষ হয়েছে? (ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নাড়েন) আমি সে-সব কথা জানতে আসিনি। আমি জানতে এসেছি এই লিফলেটের উল্টোপিঠে বাংলা হস্তাক্ষরে যে পত্রটি লেখা আছে সেটা কার রচনা?

(সোহরাব টেবিলের অপর পাশে বসে হাতের খাতায় মনোনিবেশ করে)

সোহরাব : আপনি এ চিঠি কোথায় পেলেন?

হাসান : যাঁর কাছে পঠিয়েছিলে, তিনি আমাকে দিয়েছেন প্রেরকের নাম-ঠিকানা অনুসন্ধান করার জন্য।

সোহরাব : যদি তার হদিস পান?

হাসান : মিস্ মীনা মিনহাজ তাঁর সঙ্গে দেখা করবে বলেছে।

সোহবাব : আপনি তাঁকে এতটা সাহায্য করছেন কেন?

হাসান : তোমাদের সম্পর্কে যাতে জ্ঞানবুদ্ধি বৃদ্ধি পায় তার জন্য। আমি ভাবতে পারিনি যে তোমরাও এতদূর অধঃপতনে যাবে। কেবল বড় বড় বুলি কপচাও আর ভেতরে ভেতবে শয়তানিব ডিপো। বুকে যদি এত ভাব উথ্‌লে উঠেছিল তাহলে ওঁর মুরুব্বির কাছে পয়গাম পাঠালে না কেন? সাহস কবে মেয়ের কাছেই হাঁটু গেড়ে প্রস্তাব করলে না কেন?

তারেক : এসব কথা উনি বলেছেন?

হাসান : এক শ' বার বলেছেন। তা না করে কিনা চিঠি পাঠালে! তাও একজন বহন করলে, আরেকজনের খাতার মধ্যে ভরে। ভাষাটা আরো অচেনা। কার চিঠি, সে মেয়ে বুঝবে কী করে? সে চিত্ত স্থির করবে কী করে? হৃদয়ের মুখ কোন্ দিকে ফিরিয়ে রাখবে? একবার তার দশাটা ভেবে দেখেছ?

(পানির গ্লাস ও স্পঞ্জ নাড়েন)

তারেক : আর সহ্য হচ্ছে না স্যার। আপনি যা হয় একটি স্থির করে ওকে জানিয়ে দিন।

হাসান : কী করে স্থির করব? যে-সব কথা তোমরা ওই পত্রে লিখেছ, সাহস করে তার সবটা আমি এখনো পড়তে পারিনি। যে মেয়েকে কেবলমাত্র দেখেছ,

কিন্তু চেন না, কাছে এসেছ কিন্তু স্পর্শ করনি, যার অভিভাবকের সঙ্গে তোমার কোনো রকম কথাবার্তা হয়নি, যার সঙ্গে তোমার রূসমত হয়নি, আখ্‌ত হয়নি—সেই রকম জ্বলজ্যান্ত মেয়েকে এসব কথা তোমরা লিখলে কী করে ? পত্রের ছত্রে এত গনগনে কামনার শিখা, এত কাঁদা কাঁদা আবেশের ইংগিত, আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না যে তোমাদের মধ্যে কেউ এ কাণ্ড করতে পারে।

তারেক : মিস্ মীনা মিনহাজ যদি ভাবতে পারেন যে, এই পত্র আমার রচনা, আমি অস্বীকার করব না।

সোহরাব : তুমি ? মিস্ মীনা মিনহাজ বিশ্বেস করবে যে ওসব কথা তোমাব রচনা ? ওই পত্র তোমার নিবেদন ?

তারেক : আমাকে মনে করতে না পারলে তোমাকেও পারবে না। তোমাকে কী মনে করে, দুপুরবেলা সেমিনারে তার কিছু নমুনা আমরা দেখিনি ?

সোহরাব : তুমি কিছু জান না বলে এত কথা বলতে সাহস করলে ?

(সোহরাব আলোর সামনে ঝুঁকে পড়ে খাতা দেখে। প্রোক্‌টর ঘরের এদিক সেদিক থেকে এক একটা খাতা তুলে দেখেন, পাতা উল্টে ফেলে রাখেন।)

খালেদ : ও চিঠি আমার হাতের লেখা স্যার। হাতের লেখা আমার। মিস্ মীনা মিনহাজকে আপনি নিশ্চিন্ত মনে জানাতে পারেন যে ওই পত্রের প্রকৃত লেখক আমি। আমি আপনার সামনে পরীক্ষা দিতে রাজি আছি। আপনি আমার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

হাসান : সেই প্রমাণই খুঁজছি। সব ইংরেজি, ইংরেজি। (দু'তিনটে খাতা তুলে সরিয়ে রাখেন।) একটা খাতা পেলাম না যার মধ্যে বাংলা লেখা খুঁজে পাই। দেখি এটা! (এক হ্যাঁচকা টানে সোহরাবের হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নেন।) এই তো বাংলা হাতের লেখা রয়েছে। ভাষার অন্তরঙ্গ রূপটাও ধরতে পারব। বেশ বেশ।

সোহরাব : ওই খাতাটা আপনি আমাকে ফিরিয়ে দিন স্যার!

হাসান : ফিরিয়ে তো দেবই। কিন্তু আপাতত নিয়ে যাচ্ছি।

(ব্যাগ খোলেন। সোহরাব এগিয়ে আসে।)

খালেদ : সোহরাব, বাড়াবাড়ি করো না!

তারেক : তুমি কি স্যারের কাছ থেকে জোর করে রেখে দিতে চাও নাকি ?

সোহরাব : ও খাতা আমার নয় স্যার। ও হাতের লেখা স্টাডি কবার কোনো দরকার নেই। আমাব খাতা আমাকে দিয়ে দিন স্যার।

হাসান : আবোল-তাবোল বকছ। একবার বলছ এ খাতা তোমার নয়, তাই তোমাকে ওটা দিয়ে দিতে হবে। আবার বলছ ও খাতা তোমার, তাই আমি এ খাতা নিয়ে যেতে পারব না।

(খাতা এবং লিফলেট ভরে ব্যাগের মুখ বন্ধ করেন। সোহরাব মরিয়া

হয়ে ছুটে সামনে গিয়ে পথ আগলে দাঁড়ায়। তারেক এবং খালেদ তাকে নিরস্ত করতে পারে না।)

হাসান : সোহবার! ভালো চাও তো সরে দাঁড়াও!

(ঠিক সেই মুহূর্তে 'চুপ রও' বলে একটা প্রচণ্ড চিৎকার করে ঘরের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এক বান্দা। লুঙ্গি গোঁচ করে পরা খালি গা। চোখ খোলা রেখে নাকে মাথায় মুখে আচ্ছা করে গামছা পেঁচিয়েছে। হাতে বাল্‌তি। চিৎকার শুনে ভয়ে সোহরাব, তারেক, খালেদ দৌড়ে ঘরের পেছনে চলে যায়। আগন্তুক 'বাতি নেবাও' বলে আরেক হুংকার ছেড়ে বাল্‌তির মাল সামনে ছুঁড়ে মারে। বাতি নিভে যায়। অন্ধকার।)

তারেক : স্যার, স্যার ! আপনার কিছু হয়নি তো স্যার ?

হাসান : কিছু হয়নি। তবে সারা গা কিৎ কিৎ করছে। মেথর ছোকরা এগুলো কী ঢেলে দিয়ে গেল ?

খালেদ : ও মেথর নয়। নিশ্চয়ই কোনো ছদ্মবেশী ছাত্র হবে স্যার! আমার মনে হয় না আপনাকে চিনতে পেরেছে। নিশ্চয়ই আমাদের টার্গেট করেছিল।

হাসান : হয়তো তাই হবে। কিন্তু বড় দুর্গন্ধ! সত্যি, ঢেলে দিয়ে গেল নাকি ?

সোহরাব : আমাদের গায়ে পড়েনি। ঠিক বুঝতে পারছি না।

হাসান : ওহ্!

(দু'হাতে আশপাশ চাপড়ে পরীক্ষা করেন।)

সোহরাব : আপনি পড়ে গেছেন নাকি স্যার ?

হাসান : হ্যাঁ। ভয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম বোধহয়। কেউ ধাক্কা দেয়নি, কিন্তু চিৎ হয়ে পড়ে গেলাম!

সোহরাব : তুলে ধরব, স্যার ?

হাসান : না না, থাক থাক। তার কোনো দরকার নেই। রত্নের গায়ে ময়লা লেগে যাবে।

সোহবাব : আপনার ব্যাগ ঠিক আছে ?

হাসান : সেইটেই যেন কোন্ দিকে ছিট্‌কে পড়ে গেল। একটু খুঁজে দেখ তো বাপুরা।

(তিন বন্ধু অন্ধকারে ধাক্কাধাক্কি করে খোঁজে। অতি উৎসাহের বশে জিনিসপত্র সশব্দে উল্‌টে-পাল্‌টে একাকার করে। একবার ভালো মতোন জট পাকায়। তিনজনই একসঙ্গে ও ওর অঙ্গে পেঁচিয়ে টেবিলের নিচে আটকা পড়ে। সেই সময় হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে ও বাইরে প্রচণ্ড হল্লা শোনা যায়। শ্লোগান শোনা যায়। দেখা গেল মঞ্চে প্রোক্‌টর নেই। তাঁর ব্যাগও নেই। তিনজনই টেবিলের নিচ থেকে বেরিয়ে এসে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে। তারেক ও খালেদ নাকে রুমাল চেপে ধরে।)

সোহরাব : খুব ঘোল খাইয়েছেন আমাদের! খাতা সহ ব্যাগ নিয়ে চম্পট দিয়েছেন।

তারেক : অত স্বার্থপরের মতো কথা বলো না। উনি যা খেয়েছেন সেটাও খুব সুস্বাদু নয়!

সোহরাব : হুঁ।

(খালেদ সন্তর্পণে তার ব্যাটটা নোংরা বাঁচিয়ে তুলে ধরতে চেষ্টা করে।)

তৃতীয় দৃশ্য

[ছাত্রাবাসের সভাকক্ষ। রঙ্গমঞ্চই বক্তৃতামঞ্চ এবং দর্শকমন্ডলী শ্রোতাবৃন্দ। দর্শকের মধ্যে প্রথম সারিতে মেয়েদের দিকে রুমা, মীনা। ছেলেদের দিকে সোহরাব, খালেদ। এদিকে ওদিকে খয়ের, আফতাব। যখন পর্দা উঠবে তখন সভায় যোগদানের আহ্বান জানিয়ে একটানা ঘণ্টা বেজে চলেছে। মঞ্চে সভাপতি হলেন রমীজুদ্দীন। দু'পাশে দুটো বক্তার খুঁটি। শ্রোতামণ্ডলী স্তব্ধ হলে ঘন্টা থামে। রমীজুদ্দিন গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ায়।]

রমীজ : বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী ভাইবোনেরা! আজ আমরা কেন এখানে সমবেত হয়েছি তা কারো অজানা নয়। পরীক্ষা আসন্ন। সময়ের বাতি নিবু নিবু। সিদ্ধান্ত নিতে যদি আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করি তবে আমরা মেছমার হয়ে যাব। কর্তৃপক্ষকে পর্যুদস্ত করতে হলে, সিদ্ধান্ত যেন ঐক্যবদ্ধ হয়, সেদিকে আমাদের শ্যেনদৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। কেউ যদি গোপনে আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরাতে চায় তবে আজকেই তাকে কব্জের মধ্যে আনার কোশেশ করতে হবে। (শ্লোগান) আমরা চাই না যে ছাত্র-ঐক্যেব তলদেশ দিয়ে ছাত্রদেরই একজন সুড়ং কাটুক। আন্ধারের মধ্যে সলাপরামর্শ কেবল গান্দাকাজের জন্যই হয়। যার যা বলতে হয় প্রকাশ্য সভায় বলুন। বিরুদ্ধমত যদি পোষণ করেন তবে হিম্মতের সঙ্গে তা সর্বসমক্ষে জোর গলায় জাহির করুন। সহি-গলদ বিচারের ভার ছেড়ে দিন দশজনের ওপর। সম্মিলিত সাধারণ ছাত্রের কী রায় সেটাও জানুন। আমি বলি আমাদের সবকিছু ডেমোক্রেটিক হোক! (শ্লোগান) সাধারণ ছাত্রের কী মত তা অনেক দিনে আগেই আমরা বুলন্দ আওয়াজে ঘোষণা করেছি। যদি অন্য আওয়াজ থাকে, এখনই তা জাহির করুন। এখনই তার ফয়সালা হয়ে যাক। এখনই সবাই জানুক ছাত্রসাধারণ কত ঐক্যবদ্ধ। বিরুদ্ধমত ক্ষীণ বা অস্তিত্বহীন, ফাটল কত কাল্পনিক বা মিথ্যা। (দর্শকের মধ্যে থেকে সোহরাব হাত তুলে দাঁড়ায়) কে ? সোহরাব সাহেব ? আপনি কিছু বলতে চান ?

সোহবাব : (চিৎকার করে) আমার মত জাহির করতে চাই।

রমীজ : অবশ্যই! অবশ্যই! আপনি মঞ্চে আসুন। সবাই আপনাকে দেখতে পাচ্ছে

না, পাওয়া দরকার। ভাইসব, সোহরাব সাহেব এবার আপনাদের কিছু নতুন কথা শোনাতে চান। এই আন্দোলনের উনি পক্ষে না বিপক্ষে, সে সংবাদ ওনার মুখে শুনে, আপনারাই তার মীমাংসা করুন। আপনাদের ইচ্ছানুযায়ী ব্যবস্থা করুন। বলুন।

(শ্লোগান)

সোহরাব : (উঠে এসে মঞ্চে দাঁড়ায়) আমি সভাপতিকে জিজ্ঞেস করতে চাই এই আন্দোলনের সংঘবদ্ধতা সম্পর্কে ওঁর দাবির প্রমাণ কী ? (সোরগোল) আমি জিজ্ঞেস করতে চাই, আপনারা আন্দোলনের সাফল্যের জন্য মৃদু বল প্রয়োগ আরম্ভ করেছেন কি ? সকল সাধারণ ছাত্রকে কি জানিয়েছেন যে হোস্টেলে ঘনঘন বাতি নেভে কেন ? নেভায় কারা ? (গোলমাল) আপনারা কি মেয়েদের খাতা অপহরণ এবং ছেলেদের ঘরে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করা আরম্ভ করেননি ? এটা কি বলপ্রয়োগ নয় ? এটা ঠাণ্ডা যুদ্ধের নমুনা ? আপনারা কাদের প্রতিনিধি ? বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাপেক্ষা একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী হলো মৃদুকণ্ঠী সুবেশি অবলা মহিলারা। আপনারা একবারও তাঁদেব মতামত যাচাই কবেছেন ? সেই মতের গুরুত্বপূর্ণ ঐশ্বর্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখুন। তাঁবা জাত হিসেবে সংখ্যালঘু হতে পারেন, তাঁরাই হলেন এই শ্রীহীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত শোভা, আমাদেব প্রাণহীন জীবনের একমাত্র চাঞ্চল্য, আমাদের অসাড় চিন্তাজগতের দুর্লভ জীয়নকাঠি—

মীনা : (দর্শকেব মধ্য থেকে চিৎকার কবে ওঠে) জনাব সভাপতি, আমি কিছু বলতে চাই। আমার কিছু বক্তব্য আছে।

(মৃদু সোরগোল)

বমীজ : অবশ্যই, অবশ্যই। সোহরাব সাহেব আপনি খামোশ হন। ভাইসব, মিস মীনা মিনহাজ, ছাত্রী বোনদের তরফ থেকে কিছু বলবেন। আপনারা বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শুনবেন। ওঁনার বক্তব্য শেষ হলে আমরা সোহরাব সাহেবের কথার জবাব দেব। আসুন মীনা মিনহাজ।

মীনা : (মঞ্চে আরোহণ করে বক্তৃতার ঢংগে) এই মাত্র যে ভদ্রলোক এক গাদা স্বাধীন মত প্রকাশ করে গেলেন আমি তার প্রত্যেকটির প্রতিবাদ করি। (করতালি) মেয়েদের সম্বন্ধে উনি যে সব বক্রোক্তি করলেন আমি তাব তীব্র প্রতিবাদ করি। (শেম, শেম) পরীক্ষায় যোগদান করা সম্পর্কে যে সকল গর্হিত ধারণা প্রচার করতে চেয়েছেন, আমি তার কঠিন প্রতিবাদ করি। আমি ওঁর প্রতি উক্তি, প্রতি ভাব, প্রতি ইঙ্গিতের প্রতিবাদ করি। আমি অবশ্যই নির্ধারিত দিনে পরীক্ষা দেয়ার বিরুদ্ধে। সব মেয়েই বিরুদ্ধে। তারিখ না পেছালে মেয়েরা পরীক্ষা বর্জন করবেই করবে।

(প্রচণ্ড করতালি ও শ্লোগানের মধ্য দিয়ে মিস মীনা মিনহাজ গটমট করে নেমে আসেন। মুখ লাল, তাতে বিন্দু বিন্দু ঘাম। থর থর করে কাঁপছেন। গোলমালের মধ্যে মিস্ মীনা মিনহাজের নামেও জয়ধ্বনি

শোনা যাবে। ইতিমধ্যে মঞ্চে লাফিয়ে পড়েছে আফতাব। একটা খুঁটি আঁকড়ে ধরে, সকল গোলমালের ওপর গলা চড়িয়ে বক্তৃতা শুরু করে দিয়েছে।)

আফতাব : ভাইসব! বেরিয়ে গেছে। সত্য বেরিয়ে গেছে। আজ হোক কাল হোক সত্য প্রকাশ পাবেই। সত্য কখনো চিরকাল গোপন থাকে না। জাগ্রত পরিবেশ চুম্বকের মতো তাকে বাইরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসে। মিস্ মীনা মিনহাজ তাঁর অন্তরের অন্তস্থল থেকে যে বাণী ব্যক্ত করেছেন তা আমাদের ছাত্রী বোনদের সকলেরই অন্তরের কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর অন্তরের কথা। প্রতিবাদের এই বাণীতে রচিত হবে দেশব্যাপী ছাত্রসমাজের অগ্রগতির ইস্তাহার। (করতালি ও শ্লোগান) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জবরদস্তি করে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা চালু করে দিতে চান। তাতে আমরা কতল হই, তলিয়ে যাই, হারিয়ে যাই তাতে তাঁদের কিচ্ছু এসে যায় না। তাঁরা কেবল চান আইন রক্ষা করতে, নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা আরম্ভ করে দিতে। আমরা জানি না, এদেশের আইনের অর্থ কী ? নির্দিষ্ট অর্থ কী ? নির্দিষ্ট তারিখের অর্থ কী ? পরীক্ষার অর্থ কী ? অন্যের দফারফা করার জন্য এদেশে আইনের নামে উত্তেজিত নয় কে ? আবার প্রয়োজন পড়লে এই আইনের ঘাড় মটকায়নি কে ? বারোটা বাজায়নি কে ? তাকে কাঁচকলা দেখায়নি কে ? আইন কি কেবল আমাদের বেলাতেই অনড় ? পূর্বনির্দিষ্ট বস্তু ক্ষমতাশালীর কলেবলে অনির্দিষ্ট কালের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হয়নি কখনো ? শুধু আমাদের পরীক্ষাই এক জায়গায় আটক পড়ে থাকবে ? এটা কি মহাবিদ্যালয়ের আখেরী পরীক্ষা ? এরপরে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না, বিশ্ববিদ্যালয় কী এই আশাই পোষণ করে ? তবে আমরাও বলে রাখি আমরা কী আশা পোষণ করি। কর্তৃপক্ষের গোঁয়ার্তুমির গোড়া আমরা উপড়ে ফেলব। টিম্বাক্টুর এই পরদেশী ভাইস-চ্যান্সেলরকে আমরা মোম্বাসা চালান করে দেব। (প্রচণ্ড করতালি ও শ্লোগান) ভাইসব ! নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা নেয়ার এই জিদ্ একটা গভীর ষড়যন্ত্রের অংশ মাত্র! অপ্রস্তুত ছাত্রসাধারণকে নির্দিষ্ট তারিখে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা, মানে তাদের কাতারে কাতারে ফেল করানো। ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারছেন আপনারা ? একটু সুক্ষ্ম কিন্তু সামান্য চেষ্টা করলেই বুঝতে পারবেন। বুঝতে পারবেন ভেতরে ভেতরে কী ভয়ানক ষড়যন্ত্র চলছে। এই ভাইস-চ্যান্সেলরের নিজের দেশে, টিম্বাক্টুতেও পরীক্ষা হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট তারিখ নিয়ে কর্তৃপক্ষ কখনোই মারামারি করেন না। ছাত্রদের দাবি অনুযায়ী পরীক্ষার তারিখ নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। পাশের হারও সেখানে খুব সন্তোষজনক। সেই টিম্বাক্টুর লোক এখানে এসে নির্দিষ্ট তারিখের পবিত্রতা রক্ষার জন্য আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। কেন ? যাতে আমরা কেউ পাশ করতে না পারি আর টিম্বাক্টুর সবাই পাশ করে আরো সামনে এগিয়ে যাক। এ আমরা সহ্য করব না।

তার আগে আমরা টিম্বাক্টুর ভাইস-চ্যান্সেলরকে মোম্বাসা চালান করে দেব। (করতালি ও শ্লোগান) আর সভা-সমিতি নয়। শ্লোগান-বক্তৃতার আর দরকার নেই। মিছিল-ইস্তাহার বন্ধ করুন। এবার ঝাঁপিয়ে পড়ুন ডাইরেক্ট এ্যাকশনে। আমাদের ঐক্যে যারা ফাটল ধরাতে সাহস পায় ফাটিয়ে ফেলুন তাদের। আর অপেক্ষা করছেন কিসের জন্য ? ছাত্রী বোনদের কাছে আমি করজোড়ে নিবেদন করছি তাঁরা যেন এখন এ সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। এখন ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু হবে। এমন ডাইরেক্ট এ্যাকশন শুরু হবে যে, তার কাছে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ কিছু নয়। (মেয়েরা চলে যেতে শুরু করবে) ভাইসব। আর আমরা বিলম্ব করছি কেন ? সব বাতি নিভিয়ে দাও। চিঠি এসে গেছে সংগ্রামের। আপোষহীন সংগ্রামের। সর্বশেষ সংগ্রামের। চিঠি এসেছে প্রতি সংগ্রামী ছাত্রের হৃদয়ে হৃদয়ে। চিঠি এসেছে আগামী দিনেব ছাত্রশক্তির বিজয়বার্তা বহন করে। বাতি নিভিয়ে দাও। ডাইরেক্ট এ্যাকশনে ঝাঁপিয়ে পড়। চিঠিকে মান! চিঠির জবাব দাও! চিঠি এসে গেছে, চিঠি! চিঠি! ছা আ ত ত্র ঐ ক্ ক্য অ!!

(প্রচণ্ড শ্লোগান। করতালি। হট্টগোল। বাতি নিভে যায়। ভয়াবহ চিৎকার, গোলমাল।)

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[সকালবেলা। মীনাদের বাড়ি। খয়ের মাথা নিচু করে একা একা বসে আছে। ভেতর থেকে প্রবেশ করে মীনা। অভিবাদন বিনিময় হয়।]

খয়ের : আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন ?

মীনা : হ্যাঁ। আপনি বোধহয় জানেন যে আমার কয়েকটা খাতা খোয়া যায়।

খয়ের : জানি।

মীনা : আমার খাতাগুলো কেউ চুরি করেছে।

খয়ের : আপনার পক্ষে সে-রকম মনে করা খুবই সংগত।

মীনা : আপনি অন্যরকম কিছু মনে করতে বলেন নাকি ?

খয়ের : না।

মীনা : সেদিন আপনি বলেছিলেন যে আমার একটা খাতা আপনি সোহ্‌রাবের হাতে দেখেছেন।

খয়ের : একটা খাতা সোহরাব সাহেবের হাতে গিয়ে পড়লেও তা থেকে এই অনুমান করা ঠিক হবে না যে তিনি খাতা চোর।

মীনা : একথাটা আপনি সেদিনও বারবার বলেছিলেন। তখনো অর্থ ভালো করে বুঝতে পারিনি। পরে গোলমালে পড়ে আপনাকে কিছু জিজ্ঞেস করবার সুযোগ পেলাম না। কথাটা আরেকটু ভালো করে আমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য আপনাকে ডেকেছি।

খয়েব : পাঁচটা খাতা সরিয়েছিল অন্য লোক। এখনো তাদের হাতে চারটে খাতা মজুদ রয়েছে। পঞ্চম খাতাটা ঘটনাচক্রে ওদের হাত থেকে সোহ্‌রাবের হাতে চলে যায়।

মীনা : এটা কিসের খাতা ছিল ? আপনি ভালো করে লক্ষ করেছিলেন ?

খয়ের : আপনার রাফ্‌ খাতাটা।

মীনা : আমার রাফ্‌খাতা। আপনি জানেন, ওর মধ্যে কি ছিল ?

খয়ের : একান্তভাবে যে খাতা নিজের, কখনোই যা অন্যকে দেখাবার নয়, এমন খাতায় আমরা সবাই অনেক কথা লিখে থাকি যা মুখে কোনোদিন প্রকাশ করি না। নিজে লিখে গোপনে গোপনে নিজকে সেগুলো শোনাতে ভালো লাগে। আপনার রাফ্‌খাতায় আপনিও হয়তো সে-রকম কিছু করে থাকবেন।

মীনা : আপনি আর কী কী দেখেছেন ?

খয়ের : সোহরাব সম্পর্কে এমন কিছু কথা ওর মধ্যে থেকে বার করা যায় যা সাধারণভাবে ধারণাতীত ছিল। আমি মনে করি সোহবাব সেগুলো পাঠ করে বিহ্বল হয়ে পড়বে।

মীনা : ছি ছি ! কী লজ্জাব কথা। আপনি কেন সে খাতা আপনার কাছে রেখে দিলেন না ? আপনাদের কাছ থেকে খাতা সোহবাব কী করে কেড়ে নিল ?

খয়েব : সেও একটা এ্যাকসিডেন্ট। সব কথা আপনাকে বলা যাবে না। তবে বিশ্বাস করুন, আমি একেবারে অনুভূতিহীন যুবক নই। আপনার ওই খাতা পড়ে আমার নিজেব জীবনচেতনাব রূপও বদলেছে। যদি বন্ধুদের দ্বাবা প্রহারিত না হতাম, সোহবাব যদি অতর্কিতে কঠিন অস্ত্র হাতে দরজা ভেঙে মাথার ওপব লাফিয়ে না পড়ত, আমি কিছুতেই এ খাতা আমার হাত থেকে বেরিয়ে যেতে দিতাম না। লোকচক্ষুব লেলিহান শিখা থেকে একে রক্ষা করে শেষে একদিন আপনার হাতেই পৌঁছে দিতাম।

মীনা : কেন তা কবলেন না ? কেন নিজেব কাছে বেখে দিলেন না ? আমার কোনো দুঃখ ছিল না তাতে।

খয়েব : জানি। আপনি না বললেও একথা আমি জানতাম।

মীনা : যা খুশি তাই কবতেন। কিন্তু সোহবাবকে কেন খাতাটা পড়তে দিলেন ? দুনিয়ার আর যে খুশি সে দেখত, কিন্তু ওকে দেখতে দিলেন কেন ?

খয়েব : দিইনি, নিয়ে গেছে।

মীনা : নিজেবা দেখতেন। দেখে বেখে দিতেন। ইচ্ছে হলে পুড়িয়ে ফেলতেন। পুলিশকে দিয়ে দিতেন। প্রোকটবকে দিয়ে দিতেন। যা খুশি করতেন। সোহবাবকে দিলেন কেন ? আমাব কী হবে ? আমি কী করব! আপনি ভাবতে পারেন না, আমার কত বড় সর্বনাশ হয়েছে।

খয়ের : আমাকে মাফ কববেন।

মীনা : ওই খাতা পড়াব পরও হয়তো সে আগেব মতোই অবজব মেশানো বাঁকা বাঁকা কথা শোনাবে। কিম্বা তার চেয়েও ভয়ানক লজ্জার কথা হবে যদি ও অতর্কিতে ওর ব্যবহার পাল্টে দেয়, হেসে কথা কয়, কথার মধ্যে ভাব মেশায়, করুণা প্রকাশ করে, ভালোবাসতে চেষ্টা কবে। আমি কী লজ্জায় মুখ দেখাব!

(চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ভেঙে পড়ে। টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে পড়ে থাকে। খয়ের তাকিয়ে দেখে। ব্যাগ হাতে প্রবেশ করেন প্রোক্টর বদরুল হাসান। খয়ের দাঁড়িয়ে পড়ে।)

হাসান : এ মেয়ে কাঁদছে কেন ? তুমি কিছু করেছ ?

খয়ের : জি ? না না স্যার, আমি কী, আমি কী, কী, কী, আমি, আমার জন্য নয়, স্যার!

হাসান : তুমি জান কিসের জন্য কাঁদছে ?

খয়েব : ওঁর যে খাতাটা সোহরাবের হাতে গিয়ে পড়েছে তার শোকে কাঁদছেন।

হাসান : মিস মীনা মিনহাজ! কান্না থামিয়ে মুখ তোল। যে মহামূল্যবান খাতার জন্য শোক করছ, সেটা নিয়ে এসেছি। (মীনা মুখ তোলে। প্রোক্টর চেয়ারে বসেন। খয়েরও। প্রোকটর পোর্টফোলিও ব্যাগ খোলেন। খাতা বার করেন। খুলে দু'এক পৃষ্ঠা কী দেখেন। খাতা সজোরে ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন।) ধর, এই তোমার খাতা!

মীনা : আপনি কোথায় পেলেন ?

হাসান : পরীক্ষা করে দেখব বলে সোহরাবের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি।

মীনা : সোহরাব সব দেখেছে ?

হাসান : মনে কোনো দুঃখ রেখো না! তন্ন তন্ন করে খুঁটিয়ে দেখেছে। যা খালি চোখে দেখা যায়নি তা ম্যাগনিফাইং গ্লাস লাগিয়ে দেখেছে। কোনো কথা কাটাকুটিতে ঢাকা পড়ে গিয়ে থাকলে ভিজে স্পঞ্জ দিয়ে ঘষে ঘষে সাফ করে দেখেছে।

মীনা : এখন এ খাতা নিয়ে আমি কী করব !

হাসান : তবে কি আমি ঘরে তুলে নিয়ে বাঁধিয়ে রাখব ? তোমাদের কাণ্ড দিনদিন যত দেখছি তত হতবাক হয়ে যাচ্ছি। ভেবেছিলাম, তুমি রুমার মতো নও, তুমি আলাদা। তোমার একটা মর্যাদাবোধ আছে, আছে শুচিতা, সততা! এখন দেখছি তোমরা সব এক পাকালের মাছ!

খয়ের : এসব আপনি কী বলছেন স্যার ?

হাসান : তুমি চুপ কর ছোকরা। (মীনাকে) কী সব কদর্য কথাই না খাতা ভরে লিখে রেখেছ! ভেবেছিলাম, কেবল ছেলেগুলোই বদমায়েশের হদ্দ। তক্কে থাকে সুযোগ বুঝে মেয়েদের কাছে চিঠি চালান দেয়। তুমি কম নির্লজ্জ নও। সোহরাব তোমাকে চিঠি পাঠায় খাতার মধ্যে ভরে। চিঠির মধ্যে যে-সব কথা লিখেছে সে-সব পড়ে তুমি ঘুমুতে পারলে কী করে, আমি অবাক হয়ে যাই! আর তুমি! তুমি কি না সরাসরি খাতাকে খাতা লিখে তার কাছে চালান পাঠাচ্ছ। বাকি চারখণ্ডে কী লিখেছিলে, আল্লা জানেন, আমি সেগুলো এখনো উদ্ধার করতে পারিনি।

মীনা : আপনি এগুলো পড়তে গেলেন কেন ?

হাসান : পড়েছি নিজের জ্ঞানচক্ষু ফোটাবার জন্য। সেটা ফুটে উল্টে বেরিয়ে পড়েছে এখন। তুমি আমাকে নিয়ে কার্টুন আঁক। আমি তোমার ইয়ার্কির পাত্র ? একটা নয় একেবারে পুরো সিরিজ চিত্রিত করেছ। আমার যত রকম বেইজ্জতি কল্পনা করতে পার প্রাণভরে সেগুলো এঁকেছ। মেয়েমানুষ বলে যে তোমার কোনো লজ্জাশরম আছে তার কোনো ছাপ ওই ছবিগুলোর মধ্যে নেই। কেউ বুঝতে না পারে এই আশঙ্কায় আবার প্রতি ছবির নিচে ছড়া কেটেছ। (খয়ের অসাবধানে হেসে ফেলে) কে ? হাসল কে ? তুমি। ছোকরা তুমি হেসেছ ?

খয়ের : আমি হা হা হা হে হে হেসেছি ? না না, স্যার আমি হে হে হে হা হা হা সি নি।

হাসান : বেরিয়ে যাও। বেরিয়ে যাও এ ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও বলছি।

খয়ের : আমাকে উনি ডাকিয়ে এনেছেন। উনি বললেই চলে যাব।

হাসান : মীনা, ওকে এঘর থেকে এই মুহূর্তে বেরিয়ে যেতে বল।

মীনা : আমি কাউকে চাই না। আমি কারো কথা শুনতে চাই না। চলে যান, আপনারা দু'জনেই চলে যান, আমি কারো কথা শুনতে চাই না।

(আসাদ ঘরে ঢুকেছে)

আসাদ : কারো কথা শোনার মতো নম্রতা, ধৈর্য, সাহস সবই যে তুমি জলাঞ্জলি দিয়েছ সে-কথা আর চিৎকার করে জাহির করো না। দিনে দিনে নতুন নতুন গুণপনার পরিচয় দিচ্ছ। গতকালের ছাত্রসভায় তুমি যে কীর্তি করে এসেছ, অনেক রাতে রুমা আমায় টেলিফোন করে তার সব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে শুনিয়েছে। তখনই তোমাকে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে বলে আর ওঠাইনি। সকালবেলা যখন কাজে বেরোই তখনও তুমি বিছানায়। তুমি কোন লজ্জায় ছাত্র সভায় ঘোষণা করে এলে যে পরীক্ষা দেবে না ? পরীক্ষার তারিখ না পেছালে তুমি পরীক্ষা বর্জন করার মতলব আঁটবে, এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আস্কারা পেয়ে পেয়ে বেহায়াপনার চূড়ান্ত করছ। খাতা পারাপার কর, কদর্য চিঠিপত্র গ্রহণ কর, গুরুজনদের মস্করা করে ছবি আঁক! আর পরীক্ষার সময় এলে বল, এখন নয়, পরে। লজ্জা করে না তোমার ? একেবারে বয়ে গেছ! মর না কেন, মর!

মীনা : ভাইয়া! তুমি, তুমি এসব কথা আমাকে বলতে পারলে ? ভাইয়া! মরব! সত্যি মরব! এ মুখ আর তোমাদের দেখাতে চাই না!

(অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উঠে দাঁড়ায়। পায়ের ডগা দিয়ে লাথি মেরে মেঝের ওপর পড়ে থাকা খাতাটা অন্দর মহলের দিকে ঠেলে দেয়। বেরিয়ে যাবার আগে ঝুঁকে পড়ে তুলে নেয়। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে। খয়েরের দিকে আসাদ চোখ তুলে তাকাবামাত্র খয়ের তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়। স্তব্ধতা।)

হাসান : তোমার বোনের কাণ্ডটা দেখলে ?

আসাদ : তুমি আর কথা বলো না। আমি সবই শুনেছি। তুমি যা বল, আর যা কর, তার সবটাই ক্যারিক্যাচার। তোমার পোর্ট্রেট হয় না। তোমাকে অবিকল বানালেও তা কার্টুনই হবে। মিছেমিছি আমাকে দিয়ে মেয়েটাকে শক্ত করে বকালে !

(প্রোক্টর এক দৃষ্টিতে আসাদকে দেখেন। পোর্টফোলিও ব্যাগ তুলে নেবার আগে এদিক-ওদিক খাতাটা খোঁজেন। না পেয়ে রেগে ব্যাগ বন্ধ করেন। আরেকবার আসাদকে দেখে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান। চিন্তিত আসাদ সিগারেট ধরায়।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[সন্ধে রাত। সোহরাবদের ঘর। তিন বন্ধুই উপস্থিত। তিন জনেরই গালে, কপালে বা বাহুর কোনো কোনো স্থানে মোটা করে ব্যান্ডেজ লাগানো। সবাই যে একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত ছিল তা বলে দিতে হয় না। বাইরে মুহূর্মূহু শ্লোগানের হুঙ্কার। তিনটে বিকট বোমা বিস্ফোরণ শব্দ। সোহরাব, তারেক, খালেদ ভয়ার্ত চোখে পরস্পরের দিকে তাকায়। দরজার দিকেই তাকায়। দরজায় টোকা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ে রমীজ, আফতাব প্রমুখ। বাইবে আবো অনেকে। খয়ের অনুপস্থিত। আফতাবও অঙ্গে আহতযোদ্ধার চিহ্ন ধাবণ করেছে। সবাই নিরব হলে—]

রমীজ : আমরা আপনাদের কাছে বকায়দা মাফ চাইতে এসেছি।

খালেদ : কেন?

রমীজ : গতরাতে সভার শেষে সাধারণ ছাত্রবা উত্তেজনার বশে আপনাদের কিছু প্রহার করে থাকবে।

খালেদ : শুনেছি আপনাদেরও কেউ কেউ কবেছে।

রমীজ : উত্তেজনা নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে এই রকমই হয়। আন্দোলন কোন্দলনে পরিণত হয়, দলাদলি দলাই-মলাইতে গিয়ে ঠেকে। এটা ছাত্র আন্দোলনের জন্য গৌরবজনক নয়। সে-জন্যই আমবা মাফ চাইতে এসেছি।

সোহরাব : যা চাইতে এসেছেন তা বুঝতে পেরেছি। যা দিতে এসেছেন এবার সেটা পেশ করেন।

রমীজ : মাঝখানে আর মাত্র একদিন বাকি আছে। আপনারা কি আপনাদের মত পরিবর্তন করেছেন?

সোহরাব : আপনারা করেছেন নাকি?

রমীজ : এটা খুবই দুঃখজনক। পরে এ নিয়ে আক্ষেপ করা নিরর্থক হবে। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করে গেলাম। ভেবেছিলাম পারস্পরিক সমঝোতাব মধ্য দিয়ে আমরা একটা পরিপূর্ণ একতা অর্জন করতে পারব।

সোহরাব : পারবেন না।

রমীজ : বেশ। আপনারা কতদূর এগুতে পারবেন তা কি এখনো বুঝে উঠতে পারেননি? আমরা আরো কতদূর এগুতে পারব তার কিছু আভাস দিয়ে যাচ্ছি। হাতে সময় নেই। আমাদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এখন থেকে প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যক্ষতর হবে। চূড়ান্ত মীমাংসা হবে আগামীকাল, বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে, আমতলায়। বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসবেন।

সোহরাব : আসব।

রমীজ : সঙ্গে পুলিশ নিয়ে আসেবেন না যেন।

সোহরাব : আমরা পুলিশ ডাকব ?

(বাইরে শ্লোগান : 'পুলিশ জুলুম ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। তারপর তিনটে বোমা ফাটবে। তারপর রমীজুদ্দিনের দল বেরিয়ে যাবে। স্তব্ধতা।)

তারেক : আর কী করবে ? কী করতে চায় ? দূর থেকে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ করেছে। কাছ থেকে হস্তপদাদি চালনা করেছে। ওরা আর কী করবে ? কী করতে চায় ? বলেছে, প্রতি ঘণ্টায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রত্যক্ষতর হবে।

(চারদিকে তাকায়)

খালেদ : (সোহরাবকে) আমাদের এই দুরবস্থার জন্য তুমি একা দায়ী! তোমার জন্যই আমাদের আজ এত রকম হেনস্তা।

সোহরাব : আমার জন্য ?

খালেদ : তোমার হঠকারিতার জন্য। তোমার গলাবাজির জন্য। তোমার ডাণ্ডাবাজির জন্য। তুমি কেন ভীমরুলের চাকে খোঁচা দিতে গেলে। আমরা পড়াশুনা করে যেতাম, পরীক্ষার দিন এলে দেখা যেত কে কী করে। না, তুমি কিনা প্রথমে ওদের খ্যাপালে। তাতেও আশ মিটল না, গেলে ওদের একজনের মাথা ফাটাতে। ভাবলে খুব বাহাদুরির কাজ করে এলে। এখন মজা বোঝ। আমার অমন দামি ক্রিকেট-ব্যাটটার দফারফা করলে. এখন নিজেদেরও জান নিয়ে টানাটানি।

সোহরাব : বক্তৃতায় বলছে বটে যে ওরা খয়েরকে মারার প্রতিশোধ নিচ্ছে মাত্র, কিন্তু ভেতরে ভেতরে ওরাও জানে যে আমাদের শায়েস্তা করতে না পারলে ওরা কোনোদিনই কোনো ব্যাপারে সুবিধা করতে পারবে না। আমি কিছু না করলেও ওরা আমাদের ছেড়ে দিত না। হামলা করতই। ওসব কথা রেখে দাও। এখন সামনে কী করলে পার পাওয়া যাবে, তাড়াতাড়ি তার একটা যুতসই মতলব বার কর।

তারেক : আমি একটা কথা বলব ?

সোহরাব : বল।

তারেক : তুমি যদি মিস্ মীনা মিনহাজকে ও-রকমভাবে না চটাতে তাহলে আজ আমাদের এরকম দুর্দশা হতো না।

সোহরাব : মানে ?

তারেক : ছাত্রদের ওপর মিস্ মীনা মিনহাজের একটা অদৃশ্য কিন্তু অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা ছিল। তুমি যে তা না জানতে তা নয়। কিন্তু তোমার সকল জানার মধ্যেই এমন একটা ঔদ্ধত্য মেশানো থাকে যে সেও এক রকম অজ্ঞতা এবং অন্ধতার শামিল। সব জেনে শুনেও তুমি মিস্ মীনা মিনহাজের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে।

সোহরাব : কী করতে পারতাম ? ও যে আচরণ করেছিল, করছিল, করত—তার সঙ্গে মিল রেখে আমার তরফ থেকে যা যা করা সঙ্গত হতো আমি তার বেশি

কিছুই করিনি। দশ হাত দূর থেকে হামাগুড়ি মেরে ওর ফর্সা পায়ের কাছে পৌঁছে আঙ্গুলগুলো কামড়ে পড়ে থাকলে সেটা স্বাভাবিক হতো!

খালেদ : তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি। তোমাকে পা কামড়াতে বলছে কে? কিন্তু তাই বলে তুমি গালিগালাজ করবে? মেয়েটাকে মারবার জন্য ছুটে যাবে?

সোহরাব : ও আমাকে গালিগালাজ করেনি? আমাকে মারবার জন্য ছুটে আসেনি?

তারেক : কী হতো তোমাকে মারলে? তোমার হাত-পা ভেঙে যেত? তুমি মরে যেতে?

সোহরাব : না। কিন্তু তুমি যে মরেছ তা আগেও জানতাম।

খালেদ : সবটাতেই তোমার বাড়াবাড়ি। গতরাতে বক্তৃতা দিতে উঠে দাঁড়ালে। আশা করেছিলাম চোয়ালের জোরে এসপার-ওসপার করে ছাড়বে।

তারেক : মিস্ মীনা মিনহাজ এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল। শুধু যদি ও কথাগুলো একটু লাইন মতো বলত। মেয়েদের প্রতি একটু আবেগপূর্ণ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করত। মিস্ মীনা মিনহাজের মনমেজাজের সামান্য স্তবস্তুতি যদি করত! যদি—

সোহরাব : করিনি? বানিয়ে বানিয়ে বলতে চেষ্টা করেছি যে—

খালেদ : হ্যাঁ বলছিলে। এত বেশি বেশি বলছিলে যে বাচ্চা খুকিও বুঝতে পারত যে বানিয়ে বলেছিলে। সব, সব পণ্ড হয়ে গেল! একা মিস্ মীনা মিনহাজকে পক্ষে পেলে দেখতে আন্দোলনের নক্‌শা পাল্টে দিতাম!

তারেক : হয়তো চেষ্টা করলে এখনো তা হতে পারে।

সোহরাব : মানে?

তারেক : রক্ষা পাওয়ার অন্য কোনো উপায় দেখি না। মানে, সোহরাব চেষ্টা করলে হয়তো এখনো চাকা ঘুরে যেতে পারে।

খালেদ : কথাটা আরো পরিষ্কার করে বল। আমার মাথায়ও কথাটা একবার এক ঝলকে এসেছিল। গোলমালের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ঠিক! সোহরাবকে চেষ্টা করতে হবে।

সোহরাব : আমাকে? এ্যাঁ! আমাকে?

তারেক : সোহরাবকে মিস মীনা মিনহাজের কাছে যেতে হবে।

খালেদ : এক্ষুণি যেতে হবে। এই মুহূর্তে ওকে যেতে হবে। নষ্ট করবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।

তারেক : সোহরাব যাবে। যেমন করে কোনো পুরুষ মানুষ, কোনো রমণীর কাছে যায়। সকল দর্প দম্ভ সমূলে বিসর্জন দিয়ে। বিনম্র বিশুদ্ধ চিত্তে। করুণায় ভালোবাসায় বিগলিত হয়ে।

সোহরাব : কভি নেহি। জ্যান্ত পুঁতে ফেল, তাও সই! কিন্তু আমি এই দাসখতে কিছুতেই দস্তখত করব না। কোনো মেয়ের জন্য আমি নির্মোক হব না, হব না। কোনো মেয়ের পদপ্রান্তে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আমি হাত

কচলাতে কচলাতে কারো হৃদয় কচলাতে পারব না।

খালেদ : তোমাকে পারতে হবে। তোমার জন্য অপদস্থ হয়েছি। ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। আর আমাদের জন্য তুমি একটা হীরের টুকরো মেয়েকে গ্রহণ করতে পারবে না ?

(খালেদ ভাঙা ব্যাট হাতে তুলে নেয়। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ে। সবাই চমকে ওঠে। তারেক দরজা খুলে দেয়। খয়ের প্রবেশ করে।)

খালেদ : আপনি কী চান এখানে ?

খয়ের : অনেকক্ষণ ধরে অন্ধকারে দরজার আড়ালে বসে আপনাদের পরামর্শ শুনছিলাম। ওরা বিশ্বাস করে আমাকে পাঠিয়েছিল গুপ্তচর হিসেবে।

খালেদ : ঘরের ভেতরে ঢুকলেন কেন ?

তারেক : প্রত্যক্ষতর কিছু করবেন নাকি ?

সোহরাব : ওর সঙ্গে অন্য ভাবে কথা বলো। ও আমাদেব পক্ষে। আমাকে অনেক রকমে সাহায্য করেছে।

খালেদ : ওহ্।

তারেক : আপনি বসুন।

খয়ের : না, বসবার সময় নেই। (তারেক ও খালেদকে) সোহবাবকে পাঠান। জোর কবে পাঠান। কাজ হবে। দুনিয়া ওলট পালট হয়ে যাবে।

তাবেক : আপনি এত কথা কী করে বুঝতে পারলেন ?

খয়ের : মিস্ মীনা মিনহাজ আমাকে সকালবেলা ডেকে পাঠিযেছিলেন।

সোহরাব : তোমাকে ? উদ্দেশ্য ?

খয়ের : একটা খাতার খোঁজ করতে। আমি সব দেখে এসেছি। উনি খুব কাতর। আঘাত করতে হয় এখনই করা দরকার।

সোহরাব : কে কাতর ? কে কাকে আঘাত করবে ? এ আরেক উন্মাদ। একে বার করে দাও এখান থেকে। তোমরা সবাই উন্মাদ। যে জগতে ভ্রমেও পদার্পণ করনি তারই মানচিত্র রচনা কবে সব পথ-প্রদর্শক সেজে বসেছ! বেবিয়ে যাও। সব বেরিয়ে যাও এখান থেকে। আমি কারো মুখ দেখতে চাই না। এ সংগ্রাম একা আমার। আমাকে এর রক্তাক্ত শিকারে পরিণত হতে দাও। জয়ী হতে হয় আমি একা জয়ী হব। কে চেয়েছে তোমাদের সাহায্য ? কে চেয়েছে তোমাদের পরামর্শ শুনতে ?

তারেক : পাগলামি করো না সোহরাব। আমরা সবাই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী। কেবল এইটুকুই তোমার কাছে মিনতি, আমাদেরও একটু উপকার কর। মিস্ মীনা মিনহাজের কাছে যাও। ভেঙে পড়। ধরা দাও।

সোহরাব : চুপ কর। চুপ কর। দোহাই তোমাদের, তোমরা একটু কথা বন্ধ কর। তোমরা আমাকে পাগল করে দিতে চাও নাকি ? তোমরা সত্যি সত্যি বিশ্বাস কর নাকি যে আমি যেতে চাই না। কে তোমাদের বলেছে যে আমি

যাওয়ার জন্য ব্যগ্র নই, উৎকণ্ঠিত নই, তৃষিত নই ? আমার আর কটা তীর্থস্থান আছে যে আমি মিস্ মীনা মিনহাজ সম্পর্কে নিরুৎসাহ থাকব ? আমি যেতে চাই না কারণ আমার যেতে দেরি হয়ে গেছে। যাবার এখন কোনো উপায় নেই, যেতে এখন আমার ভীষণ ভয়।

তারেক : তবু যাও, আমরা বাঁচব।

খালেদ : আমরা কোনো কথা শুনতে চাই না। তোমাকে যেতে হবে।

সোহরাব : দুদিন আগে তোমরা কেন একথা বললে না ? দু'দিন আগে কেন তোমরা আমাকে জোর করে পাঠালে না ? আমার সকল অস্ত্র কেড়ে নিয়ে আমাকে তখন কেন পঙ্গু করে দিলে না ? কত সহজে জয়ী হয়ে ফিরতে পারতাম! এখন যখন আমার সর্বস্ব লুণ্ঠিত তখন তোমরা এসেছ পথ দেখাতে! মিস্ মীনা মিনহাজ এখন জানে যে আমি তার রাফখাতা আদ্যোপান্ত পড়েছি। জানে যে তার হৃদয়ের গোপন নিবেদন চোরের মতো বেআব্রু করে দেখে নিয়েছি। এখন আমি যতই আমার হৃদয়ের গোপন নিবেদনকে চিৎকার করে ব্যক্ত করি না কেন, সে মনে করবে সব মিথ্যা, সব কৃত্রিম, সব কেবল দয়া দেখানো আর করুণা প্রকাশ করা! আমাকে সে সহ্য করতে পারবে না। যত কাছে ছুটে যাব তত বেশি আমাকে অপমান করবে, আমাকে তিরস্কার করবে। আঘাত করবে, তাড়িয়ে দেবে। হয়তো ভাইয়ের কোমর থেকে পিস্তল খুলে নিয়ে আমাকে গুলি করে বসবে। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর! আমি যাব না, যাব না, যাব না!

(বাইরে একটা বড় রকমের কোলাহল। শ্লোগান! বিশেষ করে 'পুলিশ জুলুম ধ্বংস হোক, স্বৈরাচারী পুলিশ-রাজ ধ্বংস হোক' ইত্যাদি। খয়ের দরজা খুলে বেরিয়ে যায়। বাকি সবাই রুদ্ধ নিঃশ্বাসে অপেক্ষা করে। খালেদ ব্যাটটা মুঠ করে ধরে। তারেক মশারির ডাণ্ডা। খয়ের হন্তদন্ত হয়ে আবার ঢোকে। বাইরে স্তব্ধতা।)

খয়ের : হলে পুলিশ ঢুকেছে। হয়তো দু'পক্ষেরই কিছু নেতৃস্থানীয় ছেলেকে গ্রেফতার করতে চায়। একটা ছেলে বলে গেল যে, সে স্বচক্ষে একজন অফিসারকে গেট দিয়ে ঢুকতে দেখেছে। অফিসারটি দারওয়ানের কাছে সোহরাবের নাম করে ঘর চিনিয়ে দিতে বলেছিল। আমার মনে হয় আপনাদের আর বেশিক্ষণ এ ঘরে থাকা উচিত হবে না। অন্তত সোহরাবের। আমি চলি।

(খয়ের ছুটে বেরিয়ে যায়। তিন বন্ধু হতবাক হয়ে বসে থাকে। বাইরে এক দমকা প্রচণ্ড শ্লোগান ওঠে। থামে। স্তব্ধতা। দরজায় টোকা পড়ে সোহরাব ইশারা করে। তারেক ধীরে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরো পুলিশী পোশাকে ঘরে ঢুকে আসাদুজ্জামান। পেছনে ভিড় করে মাথা গলায় কৌতূহলী ছাত্রদল। তাদের মধ্যে রমীজ, আফতাবও রয়েছে।)

আসাদ : সোহরাব কার নাম ?

(স্তব্ধতা)

তারেক : (এগিয়ে এসে) কোথায় যেতে হবে বলুন।

আসাদ : আপনার নাম সোহরাব ?

খালেদ : আমার নাম সোহরাব।

আসাদ : আমি দেরি করতে পারছি না। আমাকে বিভ্রান্ত করবেন না। সত্যি বলুন কাব নাম সোহরাব ?

বমীজ : (এগিয়ে এসে) কী হয়েছে ? আপনি সোহরাব, সোহবাব হোসেনকে চাইছেন ? এর নাম সোহরাব।

(সোহরাবকে দেখিয়ে দেয়)

আসাদ : উহ্ বাঁচলাম। কেবল ভয় হচ্ছিল বুঝি আপনাকে ধরতে না পারি। দোহাই আপনার। আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। আপনি শিগ্‌গির আমার সঙ্গে চলুন। আমি মীনার ভাই। আমাকে বাঁচান।

সোহরাব : সে-কী, মীনাব কিছু হয়েছে নাকি ?

আসাদ : মিস্ রুমা জোয়ারদার বলে দিয়েছেন, আপনাকে যেন যে করে হোক সঙ্গে করে নিয়ে যাই।

সোহবাব : কী হয়েছে, তাড়াতাড়ি বলুন।

আসাদ : মীনা আত্মহত্যা করছে।

সোহরাব : আত্মহত্যা করছে, মানে কী ? আত্মহত্যা করে ফেলেছে, না করতে চাইছে না করতে চেষ্টা করছে—কী হয়েছে স্পষ্ট করে বলুন।

আসাদ : আজ সকালবেলা রাগের মাথায় একটু বেশি বকে ফেলেছিলাম। মা-মরা মেয়ে, কোনোদিন ওকে এত শক্ত করে—

সোহবাব : আপনি ও-রকম করে বকতে গেলেন কেন ? এখন কী হয়েছে তাই বলুন।

আসাদ : আমার শোবার ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। আমি দরজা ভাঙতে চেষ্টা করেছিলাম। ভেতর থেকে আমাকে জানিয়ে দিয়েছে যে দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ও নিজের বুকে গুলি চালিয়ে দেবে।

সোহরাব : গুলি পেল কোথায় ?

আসাদ : আলনায় আমার পিস্তল জোড়া ঝুলান ছিল।

সোহরাব : উনি আগে কখনো পিস্তল নিয়ে নাড়াচাড়া করেছেন ?

আসাদ : সেদিক থেকে ভয় বেশি। ওকে পিস্তল ছুঁড়তে আমিই শিখিয়েছি। হাতের টিপ খুবই ভালো। তাড়াতাড়ি চলুন।

সোহরাব : চলুন। সঙ্গে গাড়ি আছে ?

আসাদ : আছে, চলুন।

(তাড়াতাড়ি করে খালেদ আর তারেক সুটকেস থেকে কয়েকটা

কাপড় বার করে নিয়েছে।)

তারেক : এই সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে নে।

(পরাতে থাকে)

রমীজ : আমরা আসব স্যার? যদি কোনো সাহায্য করতে পারি।

আসাদ : আসুন, আসুন। অবশ্য আসুন। আপনাদেরই তো সহপাঠিনী। তবে গাড়িতে সবার জায়গা হবে কিনা—

রমীজ : সেজন্য ভাববেন না। আপনারা রওনা হয়ে যান।

খালেদ : স্লিপিং পাজামাটা বদলে নিলে হতো না? এই সাদা পাজামাটা পরে নে।

সোহরাব : গাড়ির মধ্যে দিয়ে দে। এখন দেরি করিস না।

তারেক : পাঞ্জাবির মধ্যে চিরুনী দিয়ে দিয়েছি।

আসাদ : চলুন।

[সবাই বেরিয়ে যাবে]

তৃতীয় দৃশ্য

[মীনাদের বাড়ি। রুদ্ধ দুয়ার। মঞ্চে প্রতীক্ষারত প্রোক্টর ও রুমা।]

হাসান মীনা! আমি প্রোক্টর বদরুল হাসান বলছি। যা বলি একটু মন দিয়ে শোন। তুমি আমাদের সকলের মাথা হেট করে দিয়েছ। বিদ্যা-বুদ্ধিতে রূপে-গুণে, ব্যবহারে-আচরণে তোমার মতো দ্বিতীয় মেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল না। তুমি কোনোদিন কোনো আইন অমান্য করনি, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করনি, কোনো রকম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে প্রয়াস পাওনি। মিস রুমা জোয়ারদারের মতো পরিবেশে বিভ্রম উৎপাদনের জন্য পোশাক বা প্রসাধনের কোনো রকম উগ্রতার প্রশ্রয় দাওনি। তোমাকে ভালো না বেসেছে কে? শ্রদ্ধা না করেছে কে? সেই তুমি আজ এ কী করতে যাচ্ছ? বেরিয়ে এসো, লক্ষ্মী মেয়ে! বেরিয়ে এসো। যদি আমার কোনো কথায় আহত হয়ে থাক তবে আমি তা প্রত্যাহার করছি। যদি ইচ্ছে হয় তুমি সব কার্টুন কাগজে ছেপে দিও। আমি চিত্ত সংযত রাখব। যে বেআইনি লিফলেটের অপর দিকে তোমাকে কেউ কিছু বিশেষ অন্তরঙ্গ কথা লিখে পাঠিয়েছিল, সেটা এখনো আমার কাছে আছে! তুমি যদি তোমার সংগ্রহে সেটা রাখতে চাও, বল, আমার সংগ্রহ থেকে উপড়ে এনে আমি সেটা তোমাকে দিয়ে যাব। এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণাগারের মর্যাদা তোমার জীবনের চেয়ে বেশি নয়। মীনা, দরজা খুলে দাও। কোনো ছাত্রীর সঙ্গে কোনোদিন আমি এ-রকম করে কথা বলিনি। আজ বলছি অনেক দুঃখে। প্রোক্টরের চাকরি বড় দুঃখের। সরকারি পুলিশ আমাদের জব্দ করতে চেষ্টা করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে অষ্টপ্রহর হুকুমের ওপর রেখেছে। ছাত্ররা আমার গায়ে বিষাক্ত বস্তু নিক্ষেপ

করেছে। আর আমার সহ্য হয় না। আমি এমনিতেও স্থির করেছি পদত্যাগ করব। আমার এই শেষ অবস্থায়, তুমি আত্মহত্যা করে আমাকে আবার জীবননাশ কবতে বাধ্য করো না। মীনা! দরজা খোল, দরজা খোল!

(ঘরের ভেতবে একটা পিস্তলের গুলির শব্দ ফেটে পড়ে। প্রোক্টর সভয়ে ছিটকে সবে আসেন। 'মীনা। মীনা!' চিৎকার করে মঞ্চে ঝাঁপিয়ে পড়ে সোহরাব। ছুটে ওকে ধরে আসাদ। চারদিক থেকে ভিড় করে দাঁড়ায় রমীজ, আফতাব প্রমুখ।)

আসাদ : (সোহরাবকে সামলাবার চেষ্টায়) এত বিচলিত হবেন না। ওটা কিছু নয়। যে গুলি নিজের গায়ে লাগবে তার সঙ্গে আর্তনাদও শোনা যাবে।

সোহরাব : ওহ্।

আসাদ · ওই ঘরেব মধ্যে একটা কুলুঙ্গিতে টার্গেট প্র্যাক্টিসের নিরাপদ ব্যবস্থা কবে রেখেছিলাম। মীনাও মাঝে মাঝে ওটা ব্যবহার করে। এখন থেকে থেকে তাব মধ্যে গুলি ছুঁড়ছে।

সোহবাব : একটা পিস্তলে কতগুলো গুলি থাকে ?

আসাদ : বেশি নয়। কিন্তু বাড়তি গুলি আমি কোথায় রাখি মীনা তা জানে। ঐ ঘবেব মধ্যে দু'তিন শ' রাউন্ড বারুদ আছে।

বমীজ : (দরজার দিকে এগিয়ে এসে) মিস্ মীনা মিনহাজ। আমি বমীজুদ্দীন, প্রেসিডেন্ট বমীর্জুদ্দিন বলছি। (ভেতবে কযেক রাউন্ড গুলি চলে যায়) আপনি কি আমাদেব প্রতি কোনো কারণে রুষ্ট হয়েছেন ? যদি আন্দোলনের কোনো কর্মী আপনার প্রতি কোনো অসদাচরণ করে থাকে, শুধু আপনি তার নাম উল্লেখ করুন। আমরা তার চরিত্র সংশোধনের উপযুক্ত ব্যবস্থা কবে দেব।

আফতাব : কেবল কোনো ব্যক্তি নয়, সমগ্র আন্দোলনের তরফ থেকে নতজানু হয়ে আমরা বশ্যতা ঘোষণা করছি। দর্শন দিন, আন্দোলনকে ধন্য করুন। যদি আপনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান, আন্দোলনে জয়ী হয়েও আমরা চিরবঞ্চিতের দলে পরিণত হব। যে শ্লোগান আপনার কণ্ঠে নন্দিত নয়, যে মিছিলে আপনার স্যান্ডেল মাটি ঘষবে না, যাব বিজয়োৎসবে আপনার আঁচল উড়বে না—সেরকম আন্দোলনে আমরাও শরীক হতে চাই না। রুদ্ধ দুয়ার লঙ্ঘন করে আপনি বেরিয়ে আসুন। হুকুম করুন। আপনার অঙ্গুলি হেলনে আন্দোলনের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করুন। যদি আমাদের পরখ করে দেখতে চান, হুকুম করুন। তবু একবার বেরিয়ে আসুন। হুকুম করুন। বেরিয়ে আসুন।

(ভেতরে কয়েক রাউন্ড গুলি চলে যায়। সোহরাব দু'হাতে কান চেপে ধরে।)

সোহবাব : চুপ করুন। আপনারা সব চুপ করুন। সবাই এখান থেকে চলে যান।

বেরিয়ে যান এখান থেকে। আর এক মুহূর্তও এখানে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। গাদাগাদা অপবাধ করে এখন সবাই দরদে বেসামাল হয়ে উঠেছেন। আমার কাছে পর্যন্ত অসহ্য ঠেকছে। আপনারা দূর হন।

হাসান : তোমাকে একমাত্র এই কারণে ক্ষমা করা যায় যে কাকে কী বলছ এখন তা বোঝবার মতো তোমার মনের অবস্থা নয়। বলতে পার আমাদের কারোরই নয়।

সোহরাব : (প্রোক্টরকে) আপনি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? কি ডিউটি দেবার জন্য অপেক্ষা করছেন ? দরজার ওপাশে এক ভদ্রমহিলা পিস্তল ধারণ করে আছেন। এপাশে কৌতূহলী জনতা। আপনি এখনো আশঙ্কা করেন নাকি যে এখানেও একটা নৈতিক অধঃপতনের সিচুয়েশন তৈবি হতে পাবে ? নিজের কাজের সুবিধার জন্য খাতা-চিঠি হাত কবে একটা অমূল্য জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছেন। এখন কি শেষটুকু দেখে যাবাব জন্য অপেক্ষা করছেন ? (প্রোক্টর রেগে সরে যায়। রমীজ ও আফতাবকে) আপনারা দু'জন অন্যত্র গিয়ে আন্দোলনেব মহড়া দিন। আর আল্লার কাছে প্রার্থনা করুন, যে খাতা রচনা করার ক্ষমতা নিজেব নেই, সে খাতা অপহরণ করে অন্যের এতবড় সর্বনাশ যেন আর কোনোদিন ডেকে আনতে না হয়। (রমীজের দল চলে যায়। আসাদকে) হ্যাঁ, আপনিও চলে যান। যে মুখে একবার মরতে বলেছেন, সে মুখেই আবার বাঁচতে বলবেন কী করে। চলে যান এখান থেকে।

(আসাদ চলে যায়। সোহরাব রুমার দিকে এগুতে থাকে।)

রুমা : থাক ! আমাকে কিছু বলতে হবে না। আপনার সঙ্গে একা একা দাঁড়িয়ে থাকবার মতো প্রবৃত্তি আমারও নেই। চলি।

(প্রস্থান)

সোহরাব : (সামান্য স্তব্ধতার পর) শান্তি, শান্তি! এক কোলাহল থেকে আবেক কোলাহলের মধ্যে পড়ে নিজেকে একেবারে হারিয়ে ফেলেছিলাম। আপনাকেও হারিয়ে ফেলেছিলাম। কিছুতেই মনে হচ্ছিল না আপনার সঙ্গে এ জীবনে সহজভাবে কথা বলতে পারব। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন তো ? না, আরো জোরে বলব ? অনেক লোকের মধ্যে কথা বলার অসুবিধা কি জানেন ? নিজের মতো করে কথা বলা যায় না। নানা রকম অন্তরায় এসে আসল কথাগুলো আড়াল করে দেয়। নিজের ভূমিকায় বহাল থাকবার জন্য, অন্যকে ধোকা দেবার জন্য যা না বলবার তাও বলে ফেলি। খুব ভয় হচ্ছিল বুঝি আজও তাই হয়ে যায়! হয়তো যা বলব তাই উল্টা বুঝবেন! ভাগ্যিস বেটাদের ভাগাতে পেরেছি! মিস্ মীনা মিনহাজ! একটা সত্য কথা বলব ? চটে গেলে আপনার একেবারে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। আমারও থাকে না। কিন্তু সে কথা আলাদা। গত রাতে ছেলেদের সভায় আপনি যে কীর্তি করে এলেন তার মতো এমন নীচ আর হাস্যকর

কাজ আর হয় না। আপনি চলে আসার পর ছেলেরা মিটিং-এ আমাকে মেরেছে। আমার এখন ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে ধরে প্রহার করি। কিছু মনে করবেন না। যা বলার খোলাখুলি বললাম। অবশ্য এসব কথা বলার জন্য এখন আসিনি। বেঁচে থাকলে মারামারি করার অনেক সুযোগ পাব। আমি যা বলতে এসেছিলাম সে অন্য কথা। মীনা! মীনা! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? আমি সোহরাব, সোহরাব তোমাকে ডাকছি। মীনা! মীনা! আমি লিফলেটের রুস্তম নই, জ্বলজ্যান্ত সোহরাব! তোমাকে ডাকছি, মীনা! মীনা! দরজা খোল! মীনা, দয়া করে আমার সব কথা শোন। আজ মিথ্যে কথা বলতে পারব না। হ্যাঁ, আমি তোমার খাতা পড়েছি। না পড়লে জীবনের একটা মহত্তম সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থাকতাম। ভাগ্যিস পড়েছিলাম! অন্ধকার দুর্গের মধ্যে নিজেকে আটক করে রেখেছিলাম। আত্মস্তুতির কারুকাজ করা বর্ম পরে সেই অন্ধকারে মহানন্দে ডুবতে বসেছিলাম। হঠাৎ সামনে তোমার খাতার পাতা খুলে গেল। কী আনন্দ, দুর্গের পর পরিখাপ্রাকার শূন্যে মিলিয়ে গেল! যেই শুনলাম তুমি বিপন্ন, কঠিন বর্ম গলে অঙ্গে মিশে গেল। রুদ্ধ দুয়ার খুলে মুক্ত আমি বেরিয়ে এসে পাগলের মতো চিৎকার করে তোমাকে ডাকছি। মীনা! মীনা! সাড়া দাও। বেরিয়ে এসো। রুদ্ধ দুয়ার খুলে বেরিয়ে এসো। মুক্ত, জীয়ন্ত সোনার তুমি, বেরিয়ে এসো। শাস্তি দাও, অপমান কর, উপহার দাও, প্রহার কর— তবু বেরিয়ে এসো। যদি স্বেচ্ছায় না আস, আমি সবলে তোমাকে মুক্ত করে নিয়ে আসব! এই রুদ্ধ দুয়ার আমি ভেঙ্গে ফেলব। ঘরে প্রবেশ করে যদি দেখি তোমার অঙ্গ প্রাণহীন, তাকেই গ্রহণ করব। একই অস্ত্রে নিজের দেহ তোমার পাশে স্থাপন করব। কিন্তু তবু তোমার কাছে আসব। আসবই আসব। আসব।

(পেছনে খট্ করে একটা শব্দ হয়। রুদ্ধ দুয়ার খুলে যায়। ভেতর থেকে কেউ একটা পিস্তল বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। পর্দা ঠেলে বেরিয়ে আসে মীনা। মুখ লাল, চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। আস্তে আস্তে সোহরাবের দিকে এগুতে থাকে। সোহরাব দর্শকদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে মীনার দিকে তাকায়। স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। বোধহয় মুখে বিড় বিড় করে বলে— মীনা! মীনা! মীনা!)

[যবনিকা]

কবর

উৎসর্গ

নাদেরা বেগমকে

ভূমিকা

এই নাটিকাত্রয়ের মধ্যে আমার এবং এদেশের জীবন-চেতনা ও অভিজ্ঞতা-অনুভূতির এবং বিশেষ গর্বের জ্বলন্ত ছাপ পড়েছে, কেবলমাত্র এই কারণেও এই পুরনো রচনাগুলো সংগ্রহযোগ্য বিবেচনা করেছি। গ্রন্থপ্রকাশের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন কবিবন্ধু হাবিবুর রহমান। তবে সকল পরিকল্পনা অবিশ্বাস্য দ্রুততা, দক্ষতা ও রুচিশীলতার সংঙ্গে কার্যে পরিণত করেন আর্ট প্রেসের সৈয়দ মোহাম্মদ শফি। এঁদের প্রীতি, কৃতি ও সহৃদযতার ঋণ সহজে পরিশোধ্য নয়।

৩২/সি, স্যাভেজ রোড
নীলক্ষেত, ঢাকা

মুনীর চৌধুরী

মানুষ

চরিত্র

আব্বা
আম্মা
ফরিদ
জুলেখা
শিশু
লোকটা
এবং লোকজন

বড় শোবার ঘর। ডান দিকে একটা খাট একটু কোণাকুণি করে রাখা। মশারি ওঠানো। বামে মাঝারি রকমের টেবিল, তাতে শেড দেয়া ল্যাম্প, পাশে টেলিফোন। দু-একটা অতিরিক্ত বসবাব জায়গা। একদিকে গোসলখানার দরজা, অন্যপাশে গরাদহীন কাঁচেব বড় জানালা।

পর্দা ওঠাব সঙ্গে সঙ্গে শোনা যাবে, দূবে, বহু কণ্ঠের মিলিত ধ্বনি বন্দেমাতরম। এবং একটু কাছে প্রচণ্ড আল্লাহু আকবব বব' এই দুই চিৎকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাঝে মাঝে দেখা দেবে, বন্ধ জানালাব কাঁচের মধ্য দিযে, দূরে লকলকে আগুনেব শিখা, নীল আকাশকে রক্তিমাভ করে কাঁপছে।

ঘবের মধ্যে চাবজন লোক ও একজন অসুস্থ শিশু। খাটের ওপব বর্ষীয়সী আম্মাজান আধশোয়া অবস্থায় শিশুকে আস্তে আস্তে বাতাস কবছেন। আবছা আলোতে আম্মাজানেব ক্লান্ত উদ্বিগ্ন মুখ এক অদ্ভুত বিষাদভরা গাম্ভীর্যে স্তব্ধ। শিশুব অন্য পাশে পানির গ্লাস হাতে নিয়ে কিশোরী জুলেখা। মাথার ওড়নাব এক অংশ ঝুলে মাটিতে পড়ে গেছে, লক্ষ্য নেই। ঘামে কপালেব গুঁড়ো চুল গালে গলায় লেপ্টে আছে। অসহনীয় আতংকে কাঠ হয়ে দাঁড়িযে আছে। চোখে ভয়ার্ত অর্থহীন চাহনি। টেবিলেব সামনে খাটের দিক পেছন ফিবে, কোমবের পেছনে দুহাত মুঠ করে দাঁড়িয়ে আছেন আব্বাজান। নিশ্চল নীরব। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টেবিলেব ল্যাম্পেব সহস্র আলোবশ্মির কেন্দ্রস্থলে। যেন ভেতরের কোনো অশান্তি বিক্ষুব্ধ হিংস্র অন্তর্দ্বন্দ্বকে নিষ্পেশিত কবে তবে তিনি সুস্থরূপ ধাবণ কববেন। টেবিল ল্যাম্পেব সংকীর্ণ আলো-পরিসীমার মধ্যে ফাঁপানো সাদা দাড়ি আর কপালেব গভীর বেখা জ্বলজ্বল করছে। দ্বিতীয় ছেলে ফরিদ নিশাচব কোনো পশুর মতো সন্তর্পণে সামনে পায়চাবি কবছে। থমকে দাঁড়াচ্ছে। চোখেমুখে প্রতিহিংসাব ছায়াবাজি।

দূরে ধ্বনি উঠল বন্দেমাতরম, তিনবাব। হাজার কণ্ঠের আকাশ কাঁপানো হুংকাব। তারপবই, তীব্র অন্ধকার ছিন্নভিন্ন কবে পাল্টা আহ্বান, আল্লাহু আকবব!

কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।

আব্বা : আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবর! আল্লাহু আকবব!

জুলেখা : আব্বাজান! আব্বাজান!

আব্বা : কী! ভয় পেয়েছিস, না! ভীরু কোথাকার! ইমানের ডাক শুনে আঁৎকে উঠেছিস? চুপ। কাঁদিস না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে শোন আবাব! আল্লাহু আকবর, আল্লাহু আকবর। বল্, ভয় লাগে এখনো!

জুলেখা : না।

আব্বা : ভেবেছিলি আমি পাগল হয়ে গেছি, না ? কেন ? জীবনে অনেক লোককে মরতে দেখেছি, চোখের সামনে। শ্বাস বন্ধ হয়ে, চোখ উল্টে দিয়ে, জিব বার করে, গলগল করে রক্ত বমি করে কত সুস্থ মানুষকে মরতে দেখেছি। কৈ কোনোদিন তো উন্মাদ হয়ে যাইনি।

আম্মা : (ফরিদকে) হাসপাতালে আরেকবার ফোন করে দেখবি ?

ফরিদ : লাভ নেই। ওরা মোর্শেদ ভাইয়ের বর্ণনা টুকে রেখেছে। কোনো সংবাদ পেলে আমাদের ফোন করে জানাবে বলেছে।

জুলেখা : মোর্শেদ ভাই আমার জন্য বই কিনতে বেরিয়েছিল। মোর্শেদ ভাইকে আমি কেন যেতে বললাম।

আব্বা : চুপ, চুপ নালায়েক মেয়ে! আদরের দেমাক করিস না অত। তুই, তুই কে ? মোর্শেদকে বাইরে পাঠাবার না পাঠাবার তুই কে ? যিনি পাঠাবাব তিনিই পাঠিয়েছেন। মালাউনের ছুরির খোঁচায় মরণ, ওর তকদিরে লেখা ছিল এমনি মওত! আজ রায়ওট হবে জানলেই যেন তুই সব রাখতে পারতি'

ফরিদ : আব্বা.

আব্বা : কি তোমারও ভয় হচ্ছে আমি উন্মাদ হয়ে গেছি! আমি ভুলে গেছি বাপ হয়ে মেয়ের সঙ্গে কী করে কথা বলতে হয়!

ফরিদ : হাসপাতাল থেকে ওরা এখনো কোনো খবব দেয়নি, আপনি মিছেমিছি ওসব কথা কেন ভাবছেন ?

আব্বা : হাসপাতাল'´ওরা তোমার ভাইকে ছুরি মেরে কোলে তুলে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে গেছে, না ? ওগো শুনেছ তোমার ছেলের কথা ? আমি জানি মোর্শেদকে এতক্ষণে ওরা কী করেছে। আমি জানি।

ফরিদ : আব্বাজান, আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করে শুয়ে পড়ুন।

আব্বা : চুপ করে শুয়ে থাকব ? কেন ? ওরা আমার ছেলেকে কেটে, আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, শরীর থেকে গলা কেটে মাথাটা আলাদা করে ফেলেছে। মোর্শেদের কালো কোঁকড়া চুল চাকবাঁধা রক্তের দলার সঙ্গে লেপ্টে ওর গাঢ় মরা চোখ ঢেকে রেখেছে।

জুলেখা : ভাইয়া, আব্বাকে চুপ করতে বল।

আব্বা : কে, কে আমাকে চুপ করাবে ? তোরা মরে গেছিস।'তোরা চুপ কবে থাক। তোরা ওব ভাই নয়, বোন নয়। তোরা ওর কেউ নস। তাই তোরা চুপ করে আছিস। আমি ওর বাপ—

আম্মা : জুলেখা!

জুলেখা : আম্মা।

আব্বা : আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, ওরা ওর কাটা মুণ্ডুকে কাঁসার থালায়

সাজিয়ে ফেরি করে বেড়াচ্ছে, ওরা সবাই তাই দেখে বাহবা দিচ্ছে, ফুর্তির খাতিরে মুঠো মুঠো টাকা-পয়সা ছড়িয়ে দিচ্ছে আমার ছেলের নরম সাদা গলাকাটা লাশের—

আম্মা : খো দা আ!

আব্বা : কে, কে খোদাকে ডাকল ?

ফরিদ : আম্মা, আম্মা কথা বলছ না কেন ? খোকার দিকে আংগুল দিয়ে কী দেখাচ্ছ ?

জুলেখা : ভাইয়া, খোকা যেন কেমন হযে গেছে। নড়ছে না। মুখের শিরাগুলো কী রকম নীল হয়ে ফুলে উঠেছে।

আব্বা : দেখি, দেখি। আমায় দেখতে দাও। জুলি অমন ঝুঁকে পড়ে রইলি কেন! পানি, একটু পানি নিয়ে আয়।

(জুলি গ্লাস থেকে চামচে পানি ঢালে)

ফরিদ, তুমি একবার হাসপাতালে, ডাক্তার, যে-কোনো ডাক্তারকে একবার খবর দাও। যত টাকা লাগে দেব, সে যেন দেরি না কবে সোজা এখানে চলে আসে।

ফরিদ : তাতে কোনো ফল হবে না আব্বা। আরো দুবার ফোন করেছি, এই দাংগার ভেতর জীবন বিপন্ন কবে কোনো ডাক্তার আসতে রাজি নয়।

আব্বা · কেউ আসবে না ? কেউ নয় ? সবাব জীবনের মূল্য আছে. শুধু আমার ছেলেটার নেই ?

জুলেখা : আব্বা, খোকা পানি খাচ্ছে না। ঠোঁটের দুপাশ দিয়ে সব গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে।

ফরিদ : আব্বা আমি যাই।

আব্বা : কোথায় ?

ফরিদ : ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি।

আব্বা : না না। তুই যেতে পারবি না। তুই আমার চোখের সামনে থাকবি। কোথ্থাও যাবি না। আমি বুঝেছি, ওরা আমার সব কিছু ছিনিয়ে নিতে চায়। আমার পাঁজরের হাড় একটা একটা করে খুলে নিয়ে আমাকে যন্ত্রণায় উন্মাদ করে মেবে ফেলতে চায়। আমি দেব না। আমি তোমাদেব কাউকে হারাব না। বুনো চিতাব মতো ওরা নিঃশব্দে ওত পেতে ছিল। আমার মোর্শেদ, অসহায়, নির্দোষ, শক্তিহীন—

(নিচের দরজায় ঘা পড়ে)

কে, কে ? দরজা কে ধাক্কা দিচ্ছে ? তাহলে মোর্শেদকে ওরা মেরে ফেলতে পারেনি! মোর্শেদ ফিরে এসেছে, আমার মোর্শেদ বেঁচে আছে, সে আমায় ডাকছে। তোমরা কেউ ওকে, মোর্শেদ, মোর্শেদ—

(দরজায় আবো জোরে আঘাত)

ফরিদ : আপনি অত উত্তেজিত হবেন না। স্থির হয়ে বসুন। আমি দরজা খুলে দেখছি কে এসেছে। জুলেখা তুই আব্বার কাছে এসে বোস। আমি এক্ষুণি দেখে আসছি।

(প্রস্থান)

আব্বা : জানিস জুলি, খোদার রহমত আছে আমার ওপর। এখনই দেখবি মোর্শেদ ছুটে ওপরে আসবে। ওর হাসির শব্দে এ ঘর কলকল করে উঠবে। খোকার অসুখ ভালো হয়ে যাবে, সমস্ত পৃথিবী শান্ত সুন্দর হয়ে চারদিক আলোকিত করে রাখবে।

(ফরিদের প্রবেশ)

ও-কী, তুই একলা কেন ? মোর্শেদ, মোর্শেদ কোথায় ?

ফরিদ : মোর্শেদ ভাই নয়, পাড়ারই একটি লোক এসেছিল খবর দেয়ার জন্য। আমাদের এলাকায় একটা হিন্দু গুণ্ডা নাকি ঢুকেছে, সাবধানে থাকতে বলল। একটু আগে বশির উকিলের ছাদে কে ওকে দেখেছে। অন্ধকারে ছাদ টপকে কোথায় পালাল কেউ ঠিক ঠাহর করতে পারল না।

আব্বা : বশির উকিলের বাড়ির ছাদে ?

ফরিদ : হ্যাঁ। আমি বাইরে যাচ্ছি। দলবল নিয়ে সবাই খুঁজতে বার হবে। আমিও যাচ্ছি।

আব্বা : তুই যাবি ?

ফরিদ : চুপ করে বসে থাকব ? আমি যাচ্ছি। (ড্রয়ারে হাত দেয়) পিস্তলটা রইল। হাতের কাছে রাখবেন। আমি এই ছোরাটা সঙ্গে নিয়ে গেলাম।

জুলেখা . ভাইয়া, তুমি যেও না।

আব্বা : ছোরা ? ছোরা কেন ? ছোরা দিয়ে তুই কী করবি ?

ফরিদ : আমার ভাইয়ের কাটা মাথা যারা ফেরি করে বেড়াতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ছোরা তুলতে আপনি আমায় নিষেধ করেন আব্বাজান ? দুধের কচি শিশুকে যারা হত্যা করতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে, সে সমাজের সঙ্গে লড়াই করতে ছোরা হাতে নিয়েছি বলে আপনি শিউরে উঠলেন ? আপনার সম্ভ্রান্ত বনেদি রুচিকে কদমবুছি। আমি যাই, দোয়া করবেন।

(প্রস্থান)

(আব্বাজান নিশ্চল। জুলেখা আব্বাজানকে আঁকড়ে ধরে থাকে। আম্মা, খোকাকে বাতাস করছেন ? হঠাৎ যন্ত্রণাকাতর শিশুর কণ্ঠরুদ্ধ আর্তনাদ।)

জুলেখা : আম্মা, আম্মা খোকা অমন ছটফট করছে কেন ? খোকার কী হয়েছে আম্মাজান ?

আব্বা : আমি অনেক গুণাহ্ করেছি খোদা, আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও। যত খুশি যন্ত্রণা আমায় দাও, আমি কোনো নালিশ জানাব না। মোর্শেদ যদি

তোমার কাছে কোনো দোষ করে থাকে, তাকে শাস্তি দাও, আমি মাথা পেতে নেব, একটুও প্রতিবাদ জানাব না। কিন্তু ঐ কচি শিশু, নিষ্পাপ, নিষ্কলংক, মায়ের কোল থেকে এখনো পৃথিবীতে নামেনি, ও তো কোনো অপরাধ করেনি, তুমি কোন ইনসাফে ওকে শ্বাস বন্ধ করে মারতে চাও! ওকে মুক্তি দাও, শান্তি দাও, রেহাই দাও— বাঁচাও, বাঁচাও, ওকে তুমি বাঁচাও খোদা!

(দুহাতে মুখ গুঁজে টেবিলে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। আম্মাজান নিশ্চল। জুলেখা ফুঁপিয়ে কাঁদে)।

(হঠাৎ পেছনের কাঁচের জানালার ওপর, বার থেকে, কোনো ভারি জিনিসের কয়েকটা আঘাত পড়ে। একটা কাঁচ ঝনঝন শব্দে ভেঙ্গে পড়ল।)

আব্বা : কে?

(হাত দিয়ে পিস্তল চেপে ধরেন)

(ভাঙ্গা কাঁচের ভেতর দিয়ে হাত গলিয়ে ক্ষিপ্রহস্তে ছিটকিনি খুলে, জানালা টপকে ঘরে প্রবেশ করে এক যুবক। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের স্বল্পালোকে দেখা গেল লোকটার হাতে একটা কালো চামড়ার ব্যাগ, গায়ে ঢোলা পাঞ্জাবি, পরনে ধুতি।)

আব্বা : (কাঁপা হাতে পিস্তল তুলে) কে, কে তুমি?

লোকটা : আমি— মানুষ।

আব্বা : মানুষ?

লোকটা : মানুষ, হিন্দু।

আব্বা : বশির উকিলের বাড়ির ছাদে ওরা, তাহলে তোমাকেই দেখেছিল?

লোকটা : হয়তো। হঠাৎ দাঙ্গা শুরু হয়ে যাবে ভাবিনি। বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলাম, প্রয়োজনে। গিয়ে আর বেরুতে পারিনি।

আব্বা : এখন বেরুলে কোন সাহসে?

লোকটা : আপনি আমায় বিশ্বাস করতে পারছেন না। বেরিয়েছি বাধ্য হয়ে। বন্ধুর সাহসে কুলালো না, আমায় জায়গা দেয়। বন্ধুকে ছেড়ে তাই ছাদ টপকে বেরিয়ে পড়লাম, নিরাপদ জায়গার খোঁজে।

আব্বা : বন্ধুর বাড়ির চেয়ে এটা বেশি নিরাপদ এ আশ্বাস তোমায় কে দিয়েছে!

লোকটা : আমি আশ্রয় দাবি করছি না, প্রার্থনা করছি। অন্য উপায় নেই।

আব্বা : বাইরে দাঁড়িয়ে আরো কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলে, এ ভুল তুমি করতে না।

জুলেখা : আব্বা, আব্বা, তোমার হাত কাঁপছে। গুলি ছুটে যেতে পারে!

আব্বা : (একটু একটু করে এগুতে থাকে) যখন তুমি হয়তো জানালা ভেঙ্গে প্রাণ বাঁচাতে আমার ঘরে ঢুকেছ, ঠিক তখনই হয়তো তোমার কোনো পরম

আত্মীয় আমার বড় আদরের ছেলে মোর্শেদকে ছুরির মাথায় গেঁথে নাচাচ্ছে, বিলাসী বেড়াল যেমন অসহায় ইঁদুরকে নখের আঁচড়ে একটু একটু করে কুরে কুরে মারে। আর আমার খোকা—

(খোকা ও মায়ের আর্তনাদ। বেদনাযুক্ত, ভয়ার্ত)

লোকটা : ও-কী ? উনি ও-রকম করে বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়লেন কেন ?

জুলেখা : আব্বা, আব্বা, খোকা জানি কেমন করছে ?

লোকটা : খোকার কী হয়েছে ? অসুখ ?

আব্বা : হ্যাঁ, অসুখ। মরণ-অসুখ! গত আধঘন্টা থেকে ছটফট করছিল, এখন হয়তো শান্তি লাভ করল।

লোকটা : কী কবছেন আপনি ? দেখি, জায়গা ছাড়ুন, পিস্তলটা সবিয়ে একটু পথ দিন। আমি দেখছি।

আব্বা : তুমি, তুমি ? তুমি কী দেখবে ? ওহ্ বুঝেছি, তোমাদের এখনো আশ মেটেনি। আমার খোকাকে বুঝি নিজ হাতে নিয়ে যেতে ওরা তোমাকে পাঠিয়েছে।

লোকটা : আপনি অপ্রকৃতিস্থ। সরে দাঁড়ান।

(সকলের স্তম্ভিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে নীরবে এগিয়ে গিয়ে লোকটা খোকার পাশে বসে। হাতে কালো ব্যাগটা খুলে ডাক্তারি সরঞ্জাম বাব কবে পরীক্ষা করতে থাকে।)

ভয়ের কোনো কারণ নেই মা। খুব সময়মতো এসে পড়েছি। কণ্ঠনালীব উদ্বৃত্ত মাংসপিণ্ড হঠাৎ ফুলে গিয়ে মাঝে মাঝে শ্বাস বন্ধ করে দিতে চাইছে। আমি একটা উত্তেজক ওষুধ দিচ্ছি। আর একটা ইনজেকশন দেব। সব এক্ষুণি ভালো হয়ে যাবে। কিছু ভাববেন না।

আব্বা : ইন্‌জেকশান ?

(লোকটা চামচ দিয়ে ঔষধ খাওযাবে। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভিজিয়ে সুঁচ সেঁকে নেয়। সংলাপ চলতে থাকে। কখনো জুলেখা, কখনো আব্বা, কখনো আম্মা লোকটাকে টুকটাক সাহায্য করে)

লোকটা : এই যন্ত্রগুলো দেখে অন্তত আমায় বিশ্বাস করতে পারেন। আমি এখনো পুরোদস্তুর পেশাদার ডাক্তার হইনি। সবেমাত্র পাশ কবেছি। বন্ধুর বাড়ি এসেছিলাম, রোগী দেখতে। আশা করিনি এক রাতের মধ্যেই দু-দুজন রোগীর চিকিৎসা করতে হবে। (ইনজেকশন ঠিক করে নেয়) এখন আর কোনো ভয় নেই মা। দেখবেন ভাইটি আমার এখনই খলখল কবে হেসে উঠবে।

আব্বা : বাঁচবে, না ? কোনো ভয় নেই, না ? খোদা, অপরিসীম তোমাব করুণা, তুমি এ গুণাহ্গারের ডাক শুনেছ! অবুঝ শিশুর ওপর কি আর তুমি ইনসাফ না করে পার ! তোমার শোকর গুজারী করি!

লোকটা : আমায় একটু হাতধোয়ার সাবানজল দিতে হবে।

আব্বা : এসো, আমার সঙ্গে এসো। এই দিকে বাথরুমে চল।

(আব্বা ও লোকটার প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে বাইরের দরজায় দ্রুত করাঘাত ও ফরিদের চিৎকার : জুলেখা, জুলেখা!)

জুলেখা : আস্‌ছি ভাইয়া।

ফরিদ : (নেপথ্যে) শিগ্‌গির, দরজা খোল শিগ্‌গিব।

জুলেখা : আম্মা, ভাইয়া যদি—

আম্মা : কোনো ভয় নেই। তুই দরজা খুলে দে।

(জুলেখা বেরিয়ে যায়। ও একটু পবেই উত্তেজিত ফরিদকে নিয়ে প্রবেশ করে)

ফরিদ : আম্মা, আব্বাজান কোথায় গেলেন ?

আম্মা : গোসলখানায়। কেন, কী হয়েছে ?

ফরিদ : সে হিন্দুটাকে নাকি, আমাদের বাড়িব ছাদের খুব কাছেই কোথাও একবাব দেখা গিয়েছিল। সবাই সন্দেহ কবছে, ও নিশ্চয়ই আমাদেব বাড়িতেই কোথাও লুকিয়ে আছে।

আম্মা : বলে দাও, নেই।

ফরিদ : ওরা বিশ্বাস করতে চায না। একেবারে ক্ষেপে উঠেছে। আমার হাতের ছুরি ওদের দেখিয়েছি— কসম কেটে বলেছি, আমি মোর্শেদ ভাইয়ের ছোট ভাই। তার রক্তক্ষরণের জবাব দিতে আমি কসুর কবব না।

আম্মা : আমার ঘরের জিনিস লণ্ডভণ্ড করে বাইরের লোককে এখানে থানাতল্লাসী চালাতে আমি কখনো অনুমতি দেব না। বলে দাও, আমরা পাহারা দিচ্ছি, এ বাড়িতে কেউ ঢোকেনি।

ফরিদ : ওরা নিজেরা না দেখে কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। ভদ্রলোকের কথায় ওরা বিশ্বাস করতে বাজি নয়। ওদের বাড়ি তল্লাস করতে না দিলে ওরা গোলমাল বাঁধাবে। বিপদ ঘটবে। সব বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

আম্মা : বেশ। ওদের ডেকে নিয়ে এসো। খুঁজে দেখে যাক কাউকে বাব কবতে পারে কি না!

ফরিদ : আপনি তাহলে একবার অন্য ঘরে—

আম্মা : না, পর্দা করার জন্য আমি অন্য ঘরে যেতে পারব না। এখানেই থাকব। মশারিটা ফেলে দাও। আমি ভেতরে থাকব। আমি ছোট খোকার কাছে থাকব।

ফরিদ : (গোসলখানার পথে পা বাড়িয়ে) আমি তাহলে আব্বাকে ডেকে নিয়ে আসি।

আম্মা : না, না। তুমি বাইরে যাও। একটু পর ওদের ভেতরে নিয়ে আসবে। আমরা ততক্ষণে ঘরটা গুছিয়ে নিচ্ছি। যত খুশি এসে দেখে যাক, হিন্দু

খুঁজে পায় কিনা। জুলেখা তোমার আব্বাকে ডেকে দেবে। তুমি বাইরে যাও।

(বলতে বলতে আম্মা নিরুদ্বেগ চিত্তে মশারি ফেলছেন। গোসলখানার দরজা দিয়ে, লোকটার হাত ধরে, উত্তেজিত ভয়ার্ত আব্বাজানের প্রবেশ)

আব্বা : আমরা সব শুনেছি। এ তুমি কী করলে? কেটে কুচি-কুচি করে ফেলবে। এঁকে আমি এখন কোথায় লুকিয়ে রাখি! কিন্তু, কিন্তু—এঁকে আমি রক্ষা করবই। এঁকে আমি মরতে দেব না। এঁকে বাঁচাব। বাঁচাব হ্যাঁ। এই ধর আমাব পিস্তলটা মুঠ করে ধর। যে তোমাকে মারতে চাইবে তাকে মারবাব অধিকার তোমারও আছে। না লড়ে মরবে কেন!

আম্মা : (ভালো করে চাবপাশে মশারি গুঁজে দেয়) অত উত্তেজিত হয়ো না তুমি। আমি যা কবেছি, ঠিকই করেছি। (হাত দিয়ে নেড়ে টেবিল ল্যাম্পটার শেডটা ঠিক করে নেয়।) ডাক্তার, তুমি আমার সঙ্গে এসো। এই মশারির মধ্যে আমাব সঙ্গে থাকবে। শেড দেয়া টেবিল ল্যাম্পের এই আলোর জন্য বার থেকে মশারির ভেতরেব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাবে না। ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দাও। তোমার কোনো ভয় নেই। শরীফ খান্দানের পর্দানশীন মহিলা আমি, মশারিব ভেতব থেকে একবার কথা বললেই যথেষ্ট, কেউ মশারি তুলে উঁকি দিযে দেখার প্রস্তাব কবতে সাহস করবে না।

লোকটা : মা!

আম্মা : দেবি কবো না। ওদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। উঠে এসো শিগগির!

(প্রথমে আম্মাজান, পরে লোকটা, মশাবির ভেতব অদৃশ্য হয়ে যাবে। আব্বা ও জুলেখা বাকহীন। ঘরে প্রবেশ করল ফরিদ, অনুসবণ কবে আরো কয়েকজন লোক। ঘরে ঢুকেই তারা বিনা ভূমিকায় এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ে। এ দরজা দিয়ে যায়, ও দরজা দিয়ে আসে। হঠাৎ টেলিফোন বেজে ওঠে। কিন্তু সেই শব্দ এই অদ্ভুত পবিস্থিতির মানুষগুলোকে যেন একটু সচকিত কবে তুলছে না।)

আম্মা : (মশারির ভেতর থেকে) তোমরা কেউ ফোনটা ধরছ না কেন? দেখ কে ডাকছে? কী বলছে? তোমরা কেউ ফোনটা ধর, হয়তো কেউ মোর্শেদের কোনো খবব জানাতে চাইছে।

আব্বা : ধবছি, আমি ধরছি। হ্যালো, ইয়েস, হ্যাঁ, বলুন। হ্যাঁ আমি মোর্শেদের বাবা।

(কী যেন শুনলেন। চোখমুখ হঠাৎ শিটিয়ে পাথরের মূর্তির মতো নিথর হয়ে গেল। ফোনটা নামিয়ে রেখে তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। ততক্ষণে পাড়ার লোকেরা গৃহতল্লাস শেষ কবে একে একে বেরিয়ে যাচ্ছে। যাবার সময়—)

একজন : সব ঠিক আছে। কেউ নেই। সালাম সাহেব।

(সকলের প্রস্থান)

জুলেখা : আব্বা! তুমি অমন করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন ? আব্বা, কিছু বল। অমন করে চেয়ে থেকো না, আমার ভয় করছে। আব্বাজান, ফোনে কে ডেকেছিল ? কী বলল ?

আব্বা : হাসপাতাল থেকে ফোন করেছিল।

ফরিদ : জুলি, আমার কাছে আয়। ভয় পাস নে, আব্বাজানকে অমনি থাকতে দে।

(আম্মাজান বেরিয়ে আসেন। মশারি তুলতে থাকেন)

ফরিদ : আম্মা ! এ কে ?

লোকটা : আমায় বলছ ভাই ? আমি মানুষ। (আম্মাকে) ছোট খোকার আর কোনো ভয় নেই মা। দেখুন খেলতে শুরু করেছে। খোকাকে আমি দেখছি। আপনি (আব্বার দিকে ইঙ্গিত করে) ওঁকে দেখুন।

(জুলেখা তখন ফরিদের বুকে মাথা রেখে ডুকরে কাঁদছে। আব্বাজান তেমনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, চোখে উন্মাদের দৃষ্টি! আম্মাজানের শান্ত কালো চোখ আব্বার মুখের ওপর ন্যস্ত, একটু একটু করে তা পানিতে ভরে উঠছে। লোকটা ছোটখোকার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে ওর কপালে হাত রাখে।

(মঞ্চ আস্তে আস্তে অন্ধকার হতে থাকে ও ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে)

[যবনিকা]

নষ্ট ছেলে

চরিত্র

এরতাজুল করিম
জাহাংগীর
এম্রাণ
আমিন
খোকা
বুবি
পুলিশ কয়েকজন
মা
আপা

প্রথম দৃশ্য

কাল : ১৯৫০ ইং

স্থান : রাজধানী

দৃশ্য : (বেশি পাকা কম কাঁচা বড় এলোমেলো চুল। লম্বা সাধারণ শরীর। দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এম্রাণ, আমিনের চাচা, বিছানায় আধশোয়া অবস্থায় মোটা একটা বইয়ের খোলা পাতায় ডুবে আছেন। কোমর অবধি একটা পুরু শালে ঢাকা রয়েছে। মেঝের ওপর উপুড় হয়ে বসে ইংরেজি খবরের কাগজের ছবি দেখছে হাফপ্যান্ট পরা আমিন, বয়স বার/তের। রোগা ঢ্যাংগা। চোখে চশমা। বয়সের তুলনায় ওর চোখ মুখের রেখা পেশি অদ্ভুত রকম অচঞ্চল স্থির গাঢ়)

আমিন : চাচা!

এম্রাণ : উঁ।

আমিন : মা'র জন্য আমাব কষ্ট হচ্ছে চাচা।

এম্রাণ : হুঁ।

আমিন : আচ্ছা চাচা, মাকে বলে বুঝিয়ে কিছুতেই থামানো যায় না ?

এম্রাণ : না।

আমিন : মা সেই সকাল থেকে কেবল কাঁদছে কাঁদছে! ঈদের চাঁদ দেখে সন্ধেবেলা মা যখন মোনাজাত করছিল, আমি দেখেছি, মা'র চোখের পানি কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে নামছে। কাঁদছে আর কেবল আল্লাহকে ডাকছে!

এম্রাণ : (একটু বিরক্ত) আল্লাকে ডাকবে না তো কাকে ডাকবে ? কাউকে ডাকতে হবে তো! আল্লাকে ডাকে বেশ করে! পুলিশ সাহেবকে ডাকলে তিনি কি তোমার বুনো আপাকে তোমার মায়ের কোলে তুলে দিয়ে যাবেন।

তারা তো খবরের কাগজে ইস্তাহার দিয়েছে, তোমার আপার ফাপানো কালো চুলের ঝুঁটি ধরে যে ওকে কয়েদখানার দুয়োরে পৌছে দেবে তার এনাম মিলবে দু হাজার টাকা। তোমার মা'র বন্দুক আছে, যে আল্লাকে ডাকবে না ?

আমিন : মা'র কান্না দেখলে যে আমারও কান্না পায়।

এম্রাণ : কাঁদতে তোমাকে বারণ করেছে কে ?

আমিন : আপা। বলেছে, কাঁদলে মানুষ বোকা হয়ে যায়। না বুঝলেই কান্না পায়। বুঝলে চোখের পানি না কি শুকিয়ে যায়। চোখের ভেতর আগুন জ্বলে ওঠে, দাউ দাউ করে।

এম্রাণ : আপার কথা দেখছি সব একেবারে হেফ্‌জ করে মুখস্থ করে রেখেছ। তা

আমাকে কেন, মাকে শোনাতে পার না এগুলো, থামাতে পার না মা'র কান্না!

আমিন : মা বোঝে না, বুঝতে চায় না।

এম্রাণ : হুঁ। কেউ কিচ্ছু বোঝে না। শুধু বোঝ তোমরা আর তোমাদের আপা' এই রাত শেষ হলে কাল সকালে ঈদ। তোমার আপা তোমার মায়ের বড় মেয়ে, প্রথম সন্তান। পুলিশের তাড়া খেয়ে হয়তো কোনো জোলো জংলা ডোবার পাশে বসে শীতে কাঁপছে, মাথায় তেল পড়েনি তিন দিন, হাত খালি, হয়তো দুপুরের খাওয়াই হয়নি, হয়তো এতক্ষণে ধরা পড়ে মার খাচ্ছে, কত কিছুই হতে পারে। ঈদের দিনেও তোমার মা সে মেয়ের মুখ দেখতে পাবে না—

আমিন : পাবে না যে তার কি মানে আছে ? আগে থেকে কাঁদবে কেন ?

এম্রাণ : কী বললি ?

আমিন : কিছু না।

এম্রাণ : হুঁ। শয়তান কোথাকার! কোথ্থেকে, মানে কখন আসবে—তুই কী করে—থাক থাক। দরকার নেই এসব কথা শুনে। আহাম্মক কোথাকার, ঢ্যাডড়া পিটিয়ে এগুলো আবার রাজ্য-সুদ্ধ লোক ডেকে শোনানো হচ্ছে। কে শুনতে চাইছে এগুলো তোর কাছে ? চলে যা, চলে যা এখান থেকে।

আমিন : আচ্ছা!

এম্রাণ : আর শোন, যদি অনেক রাতে আসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিস। একটু দেখব। থাক থাক দরকার নেই। তুলতে হবে না আমাকে। ঘুম কি ছাই আসবে ?

(জাহাংগীরের প্রবেশ। স্বাস্থ্যবান বেঁটে যুবক। পরনে কাবুলি পায়জামা, গরম শেরওয়ানী। মাথায় পশমের টুপি।)

জাহাং : আস্সালামো আলাইকুম, খালুজান কোথায় ?

এম্রাণ : আরে জাহাংগীর যে! গত সাত আট দিন একেবারে দেখাই নেই, ছিলে কোথায় ?

জাহাং : একটা জরুরি কাজে কয়েকদিনের জন্য গ্রামে গিয়েছিলাম।

এম্রাণ : কেন ওয়াজ করতে না কি ? দেখো তোমাদের কিন্তু আমি বড্ড ভয় করি। মোল্লারা দেশসুদ্ধ চ্যাচামেচি করেও আজকাল আর আমাদের বেশি ক্ষতি করতে পারবে না। সব্বাই ওদের আলখাল্লা আল্লা করে ভেতরের ন্যাংটা চেহারাটা দেখে নিয়েছে। কিন্তু তোমাদের এই নতুন আক্রমণ, বি এ; এম.এ শানানো নতুন কলাকৌশল, দেশটাকে ঘায়েল না করে ছাড়বে না।

জাহাং : ছেলেপুলের সামনে আপনি এগুলো কী বলছেন ?

এম্রাণ : কাকে ছেলেমানুষ বলছ ? আমাকে না নিজেকে ? আমিনকে ছেলেমানুষ বলো না। ওর বয়স কত জান ? আমার বাহান্ন বৎসর এটা ওর, তোমার

আটাশ সেটাও ওর, নতুন পৃথিবীর কয়েক হাজার বছরের অতীত তাও ওর, সেই সঙ্গে ওর নিজের বার বছর। সব যোগ করে তবে ওর বয়স! ছেলে মানুষ কি আর এ দুনিয়াতে আছে ? সব বুড়ো, বুড়ো হয়ে গেছে। ছোটবেলায় আমরা শেখানো বুলি গলা ফাটিয়ে কেরাত করে পড়তাম। এরা আজকাল সব এত লায়েক হয়ে গেছে যে শব্দ করতে লজ্জা পায়। মনে মনে পড়ে, মনে মনে ভাবে, মনে মনে বোঝে। সব্বাইকে সব কথা বলে না। চুপিচুপি নিজের পৃথিবী তৈরি করে তাতে নিঃশব্দে ঘোরা ফেরা করে। বড় সাংঘাতিক এরা।

(এরতাজুল করিম সাহেব, আমিনের বাবা, প্রবেশ করেন। বয়স পঞ্চাশের ওপর। শক্ত শীর্ণ শরীর। দাড়ি ও গোঁফ পরিচ্ছন্ন করে ছাঁটা। পরনে পাঞ্জাবি ও পায়জামা। গায়ে শাল। হাতে একটা প্যাকেট, টেবিলের ওপব রাখেন)

এরতাজ : ওপর থেকে দেখলাম বাইরে কতগুলো খাকি পোশাকপরা লোক ঘোরাফেরা করছে। ওরা কারা জাহাংগীর ? তোমার পেছন পেছন এল মনে হলো।

জাহাং : ঠিক আমার সঙ্গে আসেনি। তবে গোঁড়াতে ওদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। গোয়েন্দা-পুলিশেব লোক। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

এম্রাণ : গুপ্তাপুলিশ ?

জাহাং : রাশেদার কোনো ব্যাপারে হয়তো ?

এরতাজ : সে খোঁজে আমার কাছে কেন ?

জাহাং : আপনি তাব বাবা।

এরতাজ : ছিলাম। এখন নেই। আল্লা রসুলের রাহে নয়, বাপ-মায়ের কল্যাণের জন্য নয়, যে মেয়ে কতগুলো বে-শরিয়তী স্বদেশী বুলির মোহে বেহায়া বে-আব্রু হয়ে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়ায়—এরতাজুল করিম তেমন মেয়েকে কন্যা বলে স্বীকার করে না।

জাহাং : ওরা এ বাড়িখানা তল্লাশ করতে চায়। ওরা সন্দেহ কবছে এই মুহূর্তে হয়তো এই বাড়িরই কোনো আনাচে-কানাচে ও লুকিয়ে আছে।

(স্তব্ধতা)

এরতাজ : ওদের আসতে বলে দাও গে।

এম্রাণ : হুকুমপত্রটা একবার দেখবে না ?

এরতাজ : দরকার নেই। আমিন তুই গিয়ে ওদের আসতে বল্। আর অমনি তোর মাকে বলিস বোরখাটা নিয়ে এ-ঘরে চলে আসে যেন।

(আমিন বেরিয়ে যায়)

আমার সারা জীবনের গড়া স্বপ্ন, চৌদ্দ পুরুষের রক্তে তাজা খান্দান—সব এ বাড়ির প্রতি ইটের সঙ্গে গাঁথা হয়ে আছে। পুলিশ লাঠি দিয়ে গুঁতিয়ে

গুঁতিয়ে আজ সেগুলো ঘাটবে। এত বড় বেইজ্জতির আগে আমার মৃত্যু হয়নি কেন ? বিষ জহর খেয়ে মরে যেতে পারল না মেয়েটা!

এম্রাণ : আবোল-তাবোল বোকো না। চালের গুদাম থেকে রোজ তোমার আজকাল যা আয় হচ্ছে তাতে খান্দানের সোনার পাহাড় গড়ে উঠতে আর বেশি দেরি নেই। পুলিশের থানাতল্লাশী হাজার বার ঘুরে ফিরে গেলেও ওব চূড়া ছুঁতে পারবে না। তার জন্য ভয় পেয়ো না।

জাহাং : রাশেদা কি সত্যি বাড়ির মধ্যে রয়েছে নাকি ?

(মা'র প্রবেশ, বোরখা পরা, মুখ খোলা। বয়স, তার চেয়ে বেশি চিন্তাব রেখায় রেখায় ক্ষতবিক্ষত বিক্ষুব্ধ মুখাবয়ব)

মা : কোথায় ? রাশি এসেছে ? কোথায় ?

আমিন : চুপ কর মা, চুপ কর! আপা এ তল্লাটেও নেই! চিৎকার করে বিপদ ডেকে এনো না!

এরতাজ : কী করবে সে মেয়েকে দিয়ে ? আমার টাকা চুরি করে তুমি তাকে পাঠাও সে আমি জানি। আমাকে লুকিয়ে তুমি আজ রাতেও যে খাবার তৈরি করে ওর কাছে পাঠাতে চেষ্টা করবে, সে তোমার চলাফেরা চাহনি দেখে আমার বুঝতে বাকি নেই।

এম্রাণ : আস্তে! আস্তে কথা বল! দস্যুগুলো সব যে এখন বাড়ির ভেতবে ঘোরাফেরা করছে।

এরতাজ : আমি ফিস ফিস করে কথা বললেও আগামীকাল খবরের কাগজে খবর বন্ধ হয়ে থাকবে না.। আমার বাড়িতে পুলিশ। আর এখনো রাশেদাব মা—

মা : আমি মা!

এরতাজ : কিন্তু, কিন্তু সে কি আজ মা বলে তোমাব গলা জড়িয়ে তোমাকে চুমু খায় ? না, আর কোনোদিন সে তোমাকে আদর করবে ? পনের বছর আগে কবে একটু আধআধ বুলিতে মা বলে ডেকে তোমার মুখ খামচে ধবেছিল সেই স্মৃতিতে এখনো অন্ধ হয়ে আছ, কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে যাচ্ছ!

মা : আমি মা !

এরতাজ : ভুলে যাচ্ছ যে রাশেদা তোমার বড় মেয়ে হলেও আমিন তোমার বড় ছেলে। তুমি ওকেও লেলিয়ে দিচ্ছ বড়বোনের জাহান্নামের পথে!

জাহাং : আমিনের এত গুণ তা তো জানতাম না।

এম্রাণ : এরতাজ! মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার! চুপ করে থাকতে পারছ না ?

এরতাজ : পাগল হইনি এখনো কিন্তু পাগল হয়ে যাব আমি! হীরের টুকরো ছেলে আমার আমিন। মার খেয়েছে তবু কোনো দিন মিথ্যে কথা বলেনি। অন্ধকারকে কোনো দিন ভালোবাসেনি। এক রত্তি শিশু তবুও বিশ্বাসের মর্যাদা দান করতে জানে ঋষির মতো। গুদামের টাকা যে রাতে আমাব

সিন্দুকে তুলে রাখতে ভয় পেয়েছি সে রাতে ওর কাছে টাকা রেখে আমি নিশ্চিত মনে ঘুমুতে যেতাম। জানতাম ভুলেও চোর ডাকাত ওর ঘরে ঢুকবে না, ঢুকলেও ওর কাছ থেকে টাকা নেওয়া সোজা ব্যাপার হবে না।

(আমিনের প্রবেশ। মুখচোখ চঞ্চল)

মা : কী হয়েছে ? কী করছে ওরা ? খোকা বুবি কোথায় ?

আমিন : সব ঘর ওলটপালট করে দেখছে ওরা। খোকা বুবি ওদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে। আমি কাঁদতে বারণ করেছি ওদের।

এম্রাণ : ভালো করেছ।

(মা নিচু গলায় আমিনকে কী যেন বলে।)

এরতাজ : আবার নতুন কী শেখাচ্ছ ওকে ? মায়ে ঝিয়ে মিলে ছেলেটাকে একেবারে চোর ডাকাত না বানিয়ে এখনই কবর খুঁড়ে পুঁতে ফেল না কেন ? আমার আড়ালে অন্ধকারে সুড়ংপথে চলতে ফিরতে শিখেছে। দু দিন পরে মিছে কথা বলতে আটকাবে না। ধোঁকা দেবে, ফাঁকি দেবে, চুরি করবে— যেমনটি ঠিক চাইছ সবই হবে। কী নতুন পরামর্শ দিচ্ছিলে ?

মা : ক্ষিদে লাগলে রান্নাঘরে গিয়ে যেন খেয়ে নেয়।

(আমিন মা'র মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বাবা এবং চাচাও।)

(হঠাৎ বাড়ির অন্যপ্রান্ত থেকে একটা কোলাহল। 'ধর ধব' চিৎকার করতে করতে দুটো লোক ছুটে আসছে। আমিনের মুখ বেদনায় কুঞ্চিত। খোকা, আমিনের ছোট ভাই, ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকেই মাকে জড়িয়ে ধরে। মা মুখের পর্দা টেনে দেয়। পুলিশের পোশাকে একজন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রবেশ করে।)

পুলিশ : এদিকে এসো। হাতে কী তোমার ? কী নিয়ে পালাচ্ছিলে ? দেখি। এসো বলছি এদিকে।

এরতাজ : চমৎকার! বড় বোন দুশ্চরিত্রা! ছোটটা চোর! মা বলে তোমার গর্ব হচ্ছে না ওদের জন্য ? আব কাঁদবে না ওদের জন্য ? (গর্জন করে) খোকা' বেরিয়ে আয় এদিকে!

(বুবিও ঘরে ঢুকেছে। ছ-সাত বছর। ফর্সা মোটা আদুরে মিষ্টি মুখ। ঝাকড়া কোঁকড়ানো চুল। কপালের ওপর পেঁচিয়ে পড়ে থাকে। একটা চোখ প্রায় তার আড়ালে লুকানো থাকে। কাজলকালো বড় বড় টলটলে চোখে সব দেখছে। একহাতে মায়ের বোরখাব প্রান্ত মুঠ করে ধরে রাখে।)

পুলিশ : (আমিনকে দেখিয়ে) ঐ খোকাবাবুর বালিশের নিচ থেকে কী যেন নিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছিল।

এরতাজ : হাত দেখি তোমার। দু হাত দেখাও।

(খোকা মুঠ খুলে সামনের দিকে বাড়িয়ে দেয়। হাত খালি।)

পুলিশ : কোথাও লুকিয়ে ফেলেছে নিশ্চয়ই।

এরতাজ : ইনস্পেক্টর সাহেব কোথায় ?

পুলিশ : সব তল্লাশী হয়ে গেছে। কিছু নেই হুজুর। উনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন।

এরতাজ : (পুলিশের হাত থেকে বেতের ছড়িটা তুলে নিয়ে) এদিকে এসো খোকা! আমার বাড়ির ওপর শয়তানের আছর পড়েছে। দুধের ছেলেও রেহাই পায় নি। দেখি চাবুকে শায়েস্তা হয় কি না। বাইরের ঘরে চল। ইনস্পেক্টর সাহেবের সামনেই তোমাব বিচার হবে। জাহাঙ্গীর তুমি তোমার খালাম্মাকে ওপরে নিয়ে যাও।

(জাহাঙ্গীর ও বুবি সহ আম্মার প্রস্থান। অন্যদিক দিয়ে এরতাজুল করীম সাহেব, খোকা ও পুলিশ অন্য দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।)

এম্রাণ : খোকা কী জিনিস চুরি করে পালাচ্ছিল ?

আমিন : খোকা চুরি করেনি।

এম্রাণ : ওর হাতে কী ছিল ?

(নেপথ্যে খোকার পিঠে চাবুক পড়তে শুরু করেছে। দম্‌কা দম্‌কা এক একটা চিৎকার কান্নায় ভারি হয়ে উঠে তীক্ষ্ণ রেখায় চাবদিকে গড়িয়ে পড়ছে। ঘরে স্তব্ধতা। প্রতি চিৎকারে আমিন আর তাব চাচা যেন শিটিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।)

আহাম্মকটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাচ্ছে কেবল! এত চিৎকারই যদি করবি তবে সত্য কথা বলে গায়ের চামড়া বাঁচাস না কেন ?

আমিন : তবু কি চামড়া বাঁচত ? ওর বাঁচলেও সকলের বাঁচত না। আর সেটা সত্য কথাও হতো না। কেউ না শিখিয়ে দিলে এত বড় মিথ্যা কথা খোকা কোনোদিন বলতে পারবে না।

এম্রাণ : চুপ কর। দর্শনতত্ত্ব শেখাসনে আমাকে। এইটুকুন ছোঁড়ার কাছ থেকে আমাকে শিখতে হবে, সত্য কী, কোন্‌টা বড় আর কোন্‌টা ছোট সত্য! মেলা বকেছিস, এখন থাম।

(উত্তেজিত ও ক্লান্ত বাবার প্রবেশ।)

এম্রাণ : কী চুরি করে পালাচ্ছিল ?

এরতাজ : আমিনের বালিশের নিচ থেকে পয়সা চুরি করে ধরা পড়ে যাবার ভয়ে এতক্ষণ রা করেনি। ভালো শিক্ষা দিয়েছি। পিঠের এক আধ জায়গা হয়তো একটু কেটে গিয়ে থাকবে। কাটুক। একটু শিক্ষা হওয়া দরকার।

এম্রাণ : (আমিনকে) ডেটল দিয়ে মুছে পরে সারা গায়ে আয়োডেক্স মালিশ করে দিস।

এরতাজ : এই টাকার প্যাকেটটা তোমার কাছেই রেখো আজ রাত্রে। সিন্দুকের ডালাটা কেমন যেন জাম হয়ে আটকে গেছে। কিছুতেই খুলতে পারলাম

না। তা কাল দিনে দেখা যাবে।

(টাকার প্যাকেটটা আমিনকে দিয়ে বাবার প্রস্থান)

আমিন : আপনি বিশ্বাস করেন যে খোকা চুরি করেছিল?

এম্রাণ : অন্যের শ্রম চুরি করলেই মুনাফা হয়। এটা হলো অর্থনীতির মূল কথা। আর তোমার বাবার ঐ থলিটার মধ্যে শুধু মুনাফার টাকা, একদিনের মুনাফা, হয়তো কয়েক হাজার! এছাড়া অন্যান্য চুরির যে-সব রকমফের আছে তার কোন্‌টায় খোকা পড়ে বা পড়ে না তা তুমি সত্য কথা না বললে আমি বুঝতে পারব কী করে?

আমিন : এগুলো হলো মোটা মোটা বইয়ের কথা চাচা, বড় হলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারব। আচ্ছা সত্য কথা না বললে সত্যি মানুষ ছোট হয়ে যায়?

এম্রাণ : (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমিনকে দেখে) তোমার জন্য জবাব— না। শুতে যাও এবার। খোকার পিঠে ওষুধ লাগাতে হবে আবার।

আমিন : কাল সকালে উঠেই আমাব ঈদের উপহার চাই কিন্তু। আর যাই দেন খেলনা দেবেন না যেন!

(বলতে বলতে চলে যায়)

এম্রাণ : (প্রস্থানরত আমিনকে লক্ষ্য করে) এই ক্ষুদে মানুষগুলোর সত্যি বয়স কত? মাত্র সাত পাঁচ বার? না সাত পাঁচ বার হাজার হাজাব!

(বইটা বন্ধ করে ঘরের বড় আলোটা নিভিয়ে দেন। টেবিল ল্যাম্পেব আলোব নিচে, বইপত্র গুছিয়ে নিয়ে, কাত হয়ে শুয়ে পড়েন।)

পর্দা

দ্বিতীয় দৃশ্য

[আমিনের পড়ার ঘর। শোবার ঘবও। টেবিলে বই সাজানো। পাশে দুটো চৌকি। একটা আমিনের অন্যটা খোকার। খোকা টেবিলের ওপর বসে আছে, পিঠের কাপড় তোলা। আমিন তাতে আস্তে আস্তে আয়োডেক্‌স মাখাচ্ছে। কথাবার্তার ফাঁকে ফাঁকে কখনো কখনো বেদনায় মুখ কুঁচকে এক আধটা শব্দও কবছে। বুবি আয়োডেক্‌সের কৌটাটা খুলে ধরে আছে। কখনো কখনো আলগোছে খোকাব পিঠে আংগুল বুলিয়ে নিচ্ছে।)

বুবি : খুব লেগেছে খুকু ভাই, না?

খোকা : একটু।

আমিন : কাগজের টুকরোটা লুকোলি কী করে?

খোকা : মা'র হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম। তুমি বলে দেয়ার পরই আমি ঘুরতে ঘুরতে তোমার ঘরে ঢুকি। ওরা যখন তোমার বই ঘাটছিল আমি তখন তোমার

বালিশ উল্টে কাগজের টুকরোটা তুলেই বেরিয়ে পড়ি। কী কাগজ ছিল ওটা ?

আমিন : আপার চিঠি। আজ রাতে আপা একবার আসবে। পুলিশ হয়তো কিছু একটা গন্ধ পেয়েছে।

বুবি : আপা আসবে আজ ?

আমিন : আর কেউ জানে না! শুধু আমরা তিনজন। কাল যে ঈদ। আপাকে তো আর গুণ্ডাপুলিশ দিনের বেলায় আসতে দেবে না, আপা তাই রাতে আসবে আমাদের দেখতে।

বুবি : যদি গুণ্ডাপুলিশ কেউ দেখে ফেলে ?

আমিন : আমরা পাল্টা পাহারা দেব। হয়তো এতক্ষণে আপা টের পেয়ে গেছে যে গুণ্ডাপুলিশ আশেপাশে মাটি শুঁকে বেড়াচ্ছে।

বুবি : আমিও পাহারা দেব।

খোকা : হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে। অন্ধকারে কিছু নড়তে দেখলেই চিৎকার করে কেঁদে পাড়া মাথায় তুলবে, খুব পাহারা দেয়া হবে তখন'

বুবি : আমি ভয় পাব ভাইয়া ? আমি পুলিশ দেখে ভয় পেয়েছিলাম' একবাব কেঁদেছিও তখন ? আমিও পাহারা দেব।

আমিন : বেশ। শোন্ খোকা। তুই চুপিচুপি গিয়ে ভেতর থেকে সদব দবজাটা খুলে রাখ্, কোনো শব্দ হয় না যেন; তারপর চাচার ঘরে ঢুকে জানালার কাছে গিয়ে বসে থাক।

খোকা : যদি চাচা কিছু বলেন ?

আমিন : কোনো শব্দ করবি না। চাচা কিছু বলবেন না। পাশের গলিব মুখে গুণ্ডা পুলিশ কাউকে দেখলে ছুটে এসে আমাকে বলবি।

খোকা : (গায়ে গরম কাপড় চড়িয়ে লাফিয়ে টেবিল থেকে নামে। স্যালুট করে) যো হুকুম! উঃ! পিঠ কী রকম চড়চড় করছে এখনো!

(প্রস্থান)

আমিন : (বুবিকে) এই কম্বলটা ধর্। এই দরজা দিয়ে গিয়ে আমার পেছনের ঘরের জানালার ওপর কম্বল বিছিয়ে বসে থাক্। দরজার শেকল নামিয়ে রাখবি। ঠাণ্ডা লাগাসনে গায়ে। বেশি ভয় করলে আমাকে ডাকিস, আমি এখান থেকেই চারদিকে নজর রাখব।

বুবি : আমি জানালার শিক ধরে বসে থাকব। আমি জানি লোহা ধরে থাকলে ভূত-জীন কেউ কিচ্ছু করতে পারে না। দেখো আমি একটুও ভয় পাব না। (প্রস্থান)

আমিন : (একা, জানালার কাছে, আপন মনে) রাত তো কম হয়নি। এখনো এলো না ? এরপর রাস্তায় বেরুলে আরো বেশি সন্দেহ হবে লোকের। নাঃ, আমার ঘরের আলোটা একেবারে রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। আলোটা নিভিয়ে

দেয়াই ভালো।

(আলো নিভে যায়। একেবারে অন্ধকার। কিছু বিরতি। অন্ধকার ধীরে ধীরে একটু হালকা হবে একটা মৃদু আলোর আভায়। ছায়াছবির মতো দেখা যাবে আমিনের দেহ সীমারেখা, জানালার কাছে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিঃশব্দে ছুটে ঘরে ঢোকে খোকা।)

খোকা : আমি খোকা। উল্টো দিকের পানের দোকানের বন্ধ ডালাটা হঠাৎ খুলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে ভেতর থেকে ছায়ার মতো কী একটা যেন লাফিয়ে বেবিয়ে পড়ল। তারপর আর কিছুই দেখতে পেলাম না! অন্ধকার আর কুয়াশায় কিচ্ছু দেখা গেল না।

(দুজনেই জানালার ওপর ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে! নিঃশব্দে প্রবেশ করে একটি ছায়ামূর্তি।)

ছায়ামূর্তি : আলোটা জ্বাল, ওকে শুইয়ে দিই।

খোকা : কে?

(আমিন সুইচ টিপতেই ঘরময় আলো ছড়িয়ে পড়ে। দেখা গেল দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে এক দীর্ঘাঙ্গি তন্বী, কালো সিলকের বোরখায় শরীব ঢাকা, মুখেব কাপড় ওঠানো, কোলে গভীর ঘুমে অচেতন বুবি।)

খোকা : আপা! আপা! আপা!

আপা : দুর্গেব দরজায় দেখি বাহাদুব পাহারাদার নিজেই ঘুমে অচেতন। কী আর করা, অগত্যা পাহারাদারকেই কোলে তুলে চুরি করে নিয়ে এলাম। বিছানাটা ঠিক করে দে, শুইয়ে দিই।

(দু'ভাই এগিয়ে যায়, বিছানা ঠিক করতে থাকে)

এই বিছানাটাও ঠিক করে দে। ঠাণ্ডায় হাত পা জমাট বেঁধে গেল। আমিও একটু লেপ মুড়ে না বসলে জমে ববফ হয়ে যাব।

(বিছানা কবা হলে আপা বুবিকে শুইয়ে দেয়। বোরখাটা খুলে পাশের টেবিলের ওপর রাখে। কাঁধের ঝোলাটাও। তারপর চৌকিতে উঠে লেপ টেনে নিয়ে হাত পা ছড়িয়ে বসে গল্প শুরু করে। কথার ফাঁকে কোনো এক সময় খোকা আপার কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়বে।)

খোকা : আজ সন্ধ্যার সময় পুলিশ এসেছিল।

আপা : জানি! আমি সব দেখেছি। খোকাকে মারছিল কে? এত চিৎকার করে কাঁদছিল ও!

আমিন : বাবা।

আপা : কেন?

আমিন : সত্য কথা বলেনি বলে। চুরি কবেছিল বলে।

আপা : খুব লেগেছিল তোর, না?

খোকা : (আপার কোলে মাথা রেখে) একটু।

আপা : (আমিনকে) আমার ঝোলাটা দে তো। (হাতে নিয়ে) খোকা তোর জন্য ঈদের উপহার এনেছি একটা। এই বড় প্যাকেটটার মধ্যে আছে। ঘুম থেকে উঠে কাল দেখিস।

খোকা : উঁ।

(আপাকে জড়িয়ে ধরে চোখ বোজে)

আপা : আর এই লাল পুলোভারটা। বুবি উঠলে কাল সকালে পরিয়ে দিস।

আমিন : কাল সকাল অবধি তুমি থাকবে না?

আপা : পাগল! এত গুণ্ডাপুলিশ দেখেও বাড়িতে ঢুকেছি। সে তো কেবল ওদের ঈদের উপহার দিয়ে যেতে। আর, আরেকটা জরুরি কাজও বটে।

আমিন : আমার জন্য কোনো উপহার আননি?

আপা : না। তুই এত বড় হয়ে গেছিস যে তোর জন্য উপহার আর খুঁজেই পেলাম না। ভাবতে ভাবতে এক সময় মনে হলো আমি যেন তোব চেয়ে ছোট। তুই আমায় একটা উপহার দিবি? ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি, দিবি? আমি তোর কাছে দাবি করছি, ভিক্ষা চাইছি, দিবি? দিবি যা চাইব, দিবি?

আমিন : এসব কী বকছ আপা? আমি দিতে পাবি, আমার আছে, এমন জিনিস তুমি চাইলে আমি দেব না?

আপা : আমার জন্য মিথ্যে কথা বলতে পারবি?

আমিন : সেটা মিথ্যে কথা নয়।

আপা : আমার জন্য ফাঁকি দিতে গিয়ে অন্যের সামনে ছোট হয়ে যেতে পারবি?

আমিন : সেটা ছোট হওয়া নয়।

আপা : আমাকে তাহলে তোর ঈদের সেরা উপহার দে। এই হাত পাতলাম, দে!

আমিন : এই হাত তুললাম বল কী চাই?

আপা : আগামীকাল ঈদ, হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কালও রোজা রাখবে কারণ তাদের ঘরে খাবার নেই। নামায পড়তে যেতে পারবে না, কারণ কাপড় নেই। ঘর থেকে বেরুতে পারবে না, ক্ষুধায়, লজ্জায়। তাদের জন্য লড়াই করবি তুই?

আমিন : করব। কী চাও তুমি?

আপা : দানছদকা নয়। তোর ঐ ছোট্ট মুঠ দিয়ে কজনের ক্ষিদে মেটাবি?

আমিন : তুমি কী চাও?

আপা : শীতের মধ্যে পালিয়ে বেড়াচ্ছি। পেছনে গুণ্ডাপুলিশ। একলা আমার পেছনে নয়। আমার মতো আরো অনেকের পেছনে। ছাপাখানায় গুণ্ডাপুলিশ, রেডিওতে গুণ্ডাপুলিশ— আমাদের কথাকে পর্যন্ত গলাটিপে মেরে ফেলতে চাইছে। তুই সাহায্য করবি কিছু? দেখ, তোর আপার হাতটা তুলে ধরে রাখতে রাখতে কী রকম কাঁপছে।

অনেক অনেক টাকা চাই আমাদের। চুরি করে, লুট করে, মিথ্যে কথা বলে, যে করে হোক, যে করে পারিস, দে, এক্ষুণি আমার হাতে দে, দে, দে!

(বার থেকে দরজায় ঠক ঠক শব্দ হয় এবং শান্ত কণ্ঠে বার থেকে বলতে থাকে)

জাহাং : আমি জাহাঙ্গীর। পালাবার কোনো চেষ্টা করো না রাশেদা। কোনো ভয় নেই। আমার সঙ্গে অন্য কেউ নেই। দরজা খুলে দাও।

আমিন : এই রাতে! জাহাঙ্গীব ভাই! কী চাই আপনার?

জাহাং : (বার থেকে) কথা বলে দেরি করে ফেলছ। দূবের লোকজনও সন্দেহ করে ফেলতে পারে। তাড়াতাড়ি দরজাটা খুলে দাও, আমাকে ভেতরে আসতে দাও।

আপা : দরজা খুলে দে আমিন!

(দরজা খুলে দেয়)

(ঘরে প্রবেশ করে জাহাঙ্গীর। মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে মোটা গ্রেট কোট, ভেতরে গরম স্যুট।)

জাহাং : উঃ, কী শীত বাইরে! এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে একেবারে হাড়ে হাড়ে ঠোকাঠুকি লেগে গেছে!

(দরজা বন্ধ করে চেয়ার টেনে বসে)

আপা : এত শীতে ঘর থেকে না বার হলেই হতো।

জাহাং : কাজ, কাজ! জরুরি কাজ, না বেরিয়ে কি উপায় আছে? লোকজন টেনে বার করে নিয়ে আসে। তারপর কেমন আছ রাশেদা? শরীর তো তোমার তেমন কিছু খারাপ হয়নি?

আপা : আমার হাতে সময় খুব কম। যা কিছু বলার তাড়াতাড়ি শেষ করে চলে যান।

জাহাং : (হ্যাট খোলে) আমারও বেশি সময় নেই। যদি কাজ শেষ হয়ে যায় তবে নিঃশব্দে পনের মিনিটের মধ্যেই যে পথে এসেছিলাম সে পথে চলে যাব। তবে কাজের কথা ছেলেপুলের সামনে আমি সাধারণত ওঠাই না। তোমার চ্যালাটিকে ঘরে চলে যেতে বল।

আপা : ও ছেলেমানুষ নয়! আপনার আমার মধ্যে কথা শোনার মতো বয়স পেরিয়ে এসেছে অনেক দিন!

জাহাং : তবুও!

আপা : আমিন তুমি ও ঘরে চলে যাও।

জাহাং : আড়িটাড়ি দিও না যেন।

আমিন : না, দেব না।

(চলে যায়। জাহাঙ্গীর সেদিকে তাকিয়ে থাকে)

আপা : ভয় নেই। ও যখন বলেছে তখন কথার নড়চড় হবে না।

জাহাং : সে আমি জানি। অবশ্য আড়ি পেতেও যে খুব বদমায়েশী করতে পারবে তা নয়। আমি যদি পনের মিনিটের মধ্যে এ ঘর থেকে বেরিয়ে না যাই তাহলে বাইরে যারা লুকিয়ে আছে তারা ধরে নেবে যে তুমি বাড়ির ভেতরেই আছ এবং মুহূর্তের মধ্যে এ বাড়ি এমন ভাবে ঘেরাও করে রাখা হবে যে, একটা মশাও বার হবার পথ খুঁজে পাবে না।

আপা : সময় তাহলে সত্যি খুব কম। তাড়াতাড়ি কথা শেষ করুন।

জাহাং : শান্ত হয়ে শোন। বেশি তাড়াহুড়ো করলে আবার সব কথা বোঝা যাবে না। আর যদি কথাই না বুঝতে পার তা হলে পনের মিনিট কেন পনের দিনেও আমি এখান থেকে চলে যেতে পারব না। একবাব তুমি আমাকে বড় অপমান করেছিলে, ভুলে যাওনি নিশ্চয়ই।

আপা : না ভুলিনি এবং দেখছি সে শিক্ষায় কোনো ফল হয়নি।

জাহাং : সে কথা থাক। সেটা আলোচনা করতে গেলে আবার দেরি হয়ে যাবে। কথাটা হচ্ছে এই যে, পনের মিনিটের মধ্যেই চুপচাপ আমি এ ঘর ছেড়ে আমার বাড়ির পথে পা বাড়াতে পারি। একটা ইঁদুরও কোনোখানে নড়বে না। তবে সে কেবল একটি মাত্র শর্তে।

আপা : কী শর্তে ?

জাহাং : সেই অপমানের ওজনে কিছু টাকা—এই সামান্য হাজাব কয়েক হলেই চলবে। এই মুহূর্তে হাতে তুলে দাও (হাত বাড়িয়ে দেয়) বেবিয়ে চলে যাই। আমাকে চলে যেতে দেখলে এ বাড়ির আশপাশে অন্যলোক কেউ আর থাকবে না।

আপা : এত টাকা আমি কোথায় পাব ?

(জাহাঙ্গীরের অলক্ষ্যে বোকার মতো ঝাপ্‌সা চোখে নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ করেছে আমিন। হাতে ভারী কাঁচের একটা বড় পেপার ওয়েট।)

জাহাং : তুমি সত্যি জান না ? আমি বলে দিচ্ছি। আমিনের বালিশের নিচে টাকা রয়েছে। বুবির ঘুম না ভেঙ্গে যায় এমন ভাবে বার করে নেয়া কিছু কষ্টকর নয়।

আপা : কাল সকালে আমিন যখন বাবাকে বলে দেবে তখন ?

জাহাং : সে-কী, টাকার প্যাকেট যে আমি নিচ্ছি আমিন তা জানবে কী করে ? আমিন ঘরে ঢুকলে তাকে বলবে যে টাকা তুমি নিয়েছ। বাবাকে কাল কী বলতে হবে সে তুমি সারারাত ভেবে একটা কিছু বার করে নাও, ওকে শিখিয়ে দিও!

(আপা বোরখাটা আঁকড়ে ধরে)

দেরি করো না। পাঁচ সাত মিনিট মাত্র সময় আছে। দেখছ না (হাত

বাড়িয়ে দেখায়) সেকেন্ডের লাল কাঁটাটা কী রকম লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে!

(বাক্য সম্পূর্ণ হবার আগেই আমিনের হাত শূন্যে লাফিয়ে ওঠে এবং পাথুরে পেপার ওয়েট দিয়ে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করে জাহাঙ্গীরের মাথায় ঠিক মাঝখানে। ক্ষিপ্রহস্তে রাশেদা তার বোরখা দিয়ে জাহাঙ্গীরের মুখ চেপে ধরে। আমিন বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতের পেপারওয়েটটাও ধরে রেখেছে।)

আপা : তাড়াতাড়ির কর। তাড়াতাড়ি! দু-তিন মিনিটের বেশি সময় নেই। আমার সঙ্গে ধর ওকে পাশের গুদাম ঘরে টেনে নিয়ে যেতে হবে! সাবধান কোনো শব্দ হয় না যেন!

(দুজনে ধরাধরি করে জাহাঙ্গীরের অচেতন দেহটাকে ঘর থেকে বাব করে নিয়ে যায়। এক মিনিট মঞ্চ খালি। শান্ত ধীর পদক্ষেপে আমিন আবার ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে ঢুকে চারদিক ভালো করে দেখে। আপার ঝোলা বোরখা, জাহাঙ্গীরের হ্যাট, নিজের বালিশের নিচ থেকে টাকার প্যাকেট নিয়ে আবার চলে যায়। আরো আধমিনিটের স্তব্ধতা।

আকস্মাৎ রাতের স্তব্ধতা বিদীর্ণ পুলিশের তীক্ষ্ণ প্রলম্বিত হুইসিল বেজে ওঠে। কয়েকজন বার থেকে দরজায় জোরে ধাক্কা দেয়। বাড়ির অন্যান্য দিকেও অনেক পদশব্দ শোনা যায়।

বুবি খোকা চম্‌কে জেগে ওঠে, চোখ কচলাতে থাকে। চিৎকার করে। দরজায় জোরে আঘাত পড়তে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে আসে এক যুবক, মাথায় ফেল্ট হ্যাট, গায়ে গ্রেট কোট, পরণে স্যুট। এসে দরজাটা খুলে দিতেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে পুলিশ। যুবক ঘরের বাইরে কাকে দেখে এগিয়ে চলে যায়।

অন্য দরজা দিয়েও বাড়িতে পুলিশ ঢুকছে। শব্দ টর্চলাইট। হুংকার চিৎকার। গুদাম ঘরের পাশ থেকে হঠাৎ চিৎকার :

পাকড়ো, পাকড়ো, খবরদার!

দৌড়ে ঘরে ঢোকে ত্রস্তচকিত পলায়নরতা বোরখামণ্ডিত তন্বী। বিপদ নিশ্চিত জেনেও দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে পেছনের দরজা দিয়ে। পুলিশ ইনসপেক্টর পিস্তলের ঘোড়ায় হাত দিয়ে একবার চিৎকার করে হুসিয়ারী জানায়। পলায়নরতা পরোয়া করে না। একটা গুলির শব্দ। হয়তো পলায়নরতার পায়ে লেগেছে। তালগোল পাকিয়ে বোরখাটা হুড়মুড় খেয়ে পড়ে যায় চৌকাঠের ওপর। আর বোরখাব ভেতর থেকে দূরে ছিটকে পড়ে একটা চশমা, গোল কাঁচের।)

১ম পুলিশ : এ-কী, এ চশমা কার?

২য় পুলিশ : দেখি, দেখি। একটু আলোর সামনে তুলে ধর দেখি।

৩য় পুলিশ : (বোরখা সরিয়ে) অরে ইয়ে আওরত কাঁহা ?

১ম পুলিশ : বাইরে কে গেল তবে ? জাহাঙ্গীর সাহেব নয় ? এ্যাঁ!

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

(বাবা মা চাচা সবাই ততক্ষণে ঘরে প্রবেশ করে অজ্ঞান এবং আহত খোকার বোরখাবৃত দেহ কোলে নিয়ে ঘিরে বসেছে।

সবার পেছনে টলতে টলতে প্রবেশ করে জাহাঙ্গীর। গায়ে শুধু গেঞ্জি, পরণে ঢোলা জাংগীয়া, পা খালি। দুহাতে শক্ত করে নিজের মাথা টিপে ধরে আছে।)

জাহাং : শয়তান দুটো আমার কোট নিয়ে গেছে, হ্যাট নিয়ে গেছে, প্যান্ট নিয়ে গেছে, আমায় নাংগা করে— এ্যাঁ ? (বোরখাবৃতকে দেখে) ধরেছ ? ধরতে পেরেছ ? বেশ, বেশ করেছ।

(তারপর একটু ঝুঁকে পড়ে বোরখায় ঢাকা আমিনকে চিনতে পেরে চমকে ওঠে। থ' মেরে দাড়িয়ে থাকে।

আমিনের মাথা চাচার কোলে। বাবার মুখে রা নেই। বে-বোরখা মা এক দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

পর্দা

কবর

চরিত্র

নেতা
হাফিজ
ফকির
গার্ড
ছায়ামূর্তি কয়েকটি

(মঞ্চে কোনোরূপ উজ্জ্বল আলো ব্যবহৃত হইবে না। হারিকেন, প্রদীপ ও দিয়াশলাইয়ের কারসাজিতে নাটকের প্রয়োজনীয় ভয়াবহ, রহস্যময়, অশরীরী পরিবেশকে সৃষ্টি করিতে হইবে।)

দৃশ্য : গোবস্তান।

সময় · শেষ বাত্রি।

(তিন চার ফুট উঁচু একটি পুরু কালো কাপড়েব মজবুত পর্দাব দ্বারা মঞ্চটি দুই অংশে বিভক্ত, লম্বালম্বিভাবে নয়, পাশাপাশি। সামনেব অংশে কী ঘটিতেছে সবই দেখা যাইবে; কিন্তু বিভক্ত মঞ্চেব পশ্চাৎ অংশে কেহ দাঁড়াইলে দর্শকেব চোখে পড়িবে না।

পর্দা উঠিলে দেখা যাইবে খালি মঞ্চেব ডান কোণে একটি লণ্ঠন টিম টিম করিয়া জ্বলিতেছে। সামনে একটি মোটা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ, মুখ খোলা। পাশে একটি ছোট গ্লাস, খালি। একটি রুমাল মাটিতে পাতা রহিয়াছে। মনে হয়, এইমাত্র তাহাব উপব কেহ বসিয়াছিল। সেই লোকটিই মঞ্চের ভিতরে আবাব ঢুকিল। হৃষ্টপুষ্ট বড়-সড় শরীর। চালচলন গণ্যমান্য নেতার মতো। ভারিক্কী উপযুক্ত সাজগোজ। ভিতবে ঢুকিয়াই আবার ডাকিল— ।)

নেতা : গার্ড! গার্ড!

(নীল কোর্তা পাজামা পবা গার্ডের প্রবেশ। পাযে খযেরি ক্যাম্বিসেব জুতা। পাজামাব প্রান্তদেশ মোজাব মধ্যে গোঁজা। হাবভাবে প্রভু ভক্তির ঝলক; কিন্তু আপাতত একটু হতবুদ্ধি ও ভয়ার্ত ভাব! হাতে নিভন্ত লণ্ঠন। ছুটিযা প্রবেশ)

(দ্রুত নিঃশ্বাস)

গার্ড : জি হুজুব!

নেতা : কী বকম গার্ড দিচ্ছ? তোমাদের পাহারা দেবার এই নাকি নমুনা? ছিলে কোথায় এতক্ষণ? কতক্ষণ ধরে ডাকছি কোনো সাড়া নেই।

গার্ড : পবথম পবথম ঠাওর কবতে পারি নাই হুজুব। এমন ঠাণ্ডা আব আন্ধাব হুজুর যে, কানের মধ্যে খামুখাই কেবল ঝাঁ ঝাঁ কবে।

নেতা : তোমাব পোস্টিং কোথায় ছিল?

গার্ড : ঐ পশ্চিম কোণে। ঐ কিনাবেব শেষ লাল বান্ধানো কববের পাড়।

নেতা : ওখান থেকে এখানে আসতেই একেবাবে হাঁপিয়ে পড়েছ? বাহাদুব গার্ড দেখছি! বাতি নিভিয়ে বেখেছ কেন?

গার্ড : (চমকাইয়া হাতেব লণ্ঠন দেখে) ওহ। এ্যা পইড়া গ্যাছলাম। তাড়াতাড়ি কইবা আইতে গিয়া পইড়া গ্যাছলাম গর্তের মধ্যে।

নেতা : গর্তে ?

গার্ড : কবর। পুরান কবর হইব! একদম ঠোসা আছিল। না বুইঝা পা দিতেই ভস্ কইবা ভিতবে ঢুইকা গেছি।

নেতা : Idiot! চোখ মেলে পথ চল না ? খেলার মাঠ পেয়েছ নাকি ? এটা গোরস্থান! সাবধানে পা ফেলতে পার না ? যাও। ডিউটিতে যাও।

(অন্যদিক হইতে নিঃশব্দে প্যান্ট-কোর্ট মাফলার চাদরে জড়ানো কিম্ভুতকিমাকাব এক ব্যক্তির প্রবেশ। নেতা তাহাকে লক্ষ করে নাই।)

(স্যালুট)

গার্ড : জি হুজুর।

নেতা : যাওয়ার পথে আবাব আরেকটার মধ্যে পড়ো না। কাতাব দেখে আল দিয়ে চলবে। যাও। কোনো কাজ নেই। এমনি ডেকেছিলাম' বাতিটা জ্বালিয়ে দিও।

গার্ড : জি হুজুর।

(স্যালুট। প্রস্থান)

ব্যক্তি : (নেতাব পেছন হইতে) তখনই বলেছিলাম স্যাব এসব আজেবাজে লোক—

নেতা : (চমকাইয়া) কে ? তুমি কে ?

ব্যক্তি : আমি স্যাব, ইন্সপেক্টব হাফিজ।

নেতা : ওহ! আপনি! এমন করে নাকে-মুখে কাপড় জড়িয়েছেন যে, অন্ধকারে চমকে উঠেছিলাম। ভবিষ্যতে এ-বকম আব কববেন না। না, ভয় পাইনি। গত চাব-পাঁচ বছবের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি। তবু ডাক্তাব বলেছে আমাব নাকি হার্ট উইক। সাবধানে থাকতে বলেছে। কী বলছিলেন বলুন—

(বসিয়া গ্লাসটা হাতে লইবে এবং অন্যমনস্কভাবে পোর্ট-ফোলিও ব্যাগটাব মুখ খুলিবে। ইন্সপেক্টব হাফিজ খুব স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে চেষ্টা কবিবে। কিন্তু নজর পুরোপুরি নেতাব হাতেব দিকে।)

হাফিজ : এই বলছিলাম, এ সব হাবা-গোবা লোক সঙ্গে না আনলেই পাবতেন। কাজ বানাবাব চেয়ে পণ্ড কবাতেই বেটাবা বেশি পটু।

নেতা : তা হোক। ওবা আমাব বিশ্বাসী লোক। আপনাব সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটত না।

হাফিজ : এটা স্যাব ঠিকই বলেছেন। সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবি হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না। এজন্যেই তো আজকাল কোনো অফিসেই ফেইথ-ডিসিপ্লিন এগুলো খুঁজে পাবেন না স্যার!

নেতা : হুম্ (ব্যাগটা আবার দেখেন। চাবিদিকে কী যেন খুঁজিতেছেন।)

হাফিজ : তবু কিছু কাজ আছে স্যাব, যা বিবিব সামনেও বেপর্দা করতে নেই। তাছাড়া শহরে কারফিউ লাগানো থাকতে এখানে গার্ডেব কোনো দরকাব ছিল না। কটাইবা লাশ আর। গোর-খুড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম। তাব ওপব শীতের মধ্যে আপনি কষ্ট কবে—

নেতা : কিছু কাজ আছে যা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না, তা সে যতই পটু হোক না কেন! (দাঁড়াইয়া পড়িয়া খুঁজিতে থাকে)

হাফিজ : কিছু খুঁজছেন স্যার ?

নেতা : হ্যাঁ। একটা বোতল, ঐ গ্লাসটাব পাশেই ছিল। ভূত-জ্বিনে আমি বিশ্বাস করলেও তাবা কেউ এসে একেবাবে বোতল সমেত আমার হুইস্কি শেষ কবে যাবে— মনে হয় না। একটু আশেপাশে খুঁজে দেখুন তো, আমি ভুলে কোথাও ফেলে গেছি নাকি!

হাফিজ : ব্যাগের ভিতব পুবে রাখেননি তো ?

নেতা : না। ওগুলো ভরা বোতল। এটা কিছু খালি হয়েছিল।

হাফিজ : ওহ্! তাইতো! এ তো বড় সাংঘাতিক কথা! না না। ভালো কবে খুঁজে দেখা দরকাব। বোতলটা কী রকম স্যাব ?

নেতা : না খেয়ে থাকলে বোঝানো যাবে না।

হাফিজ : না স্যার, মানে স্যাব আমি, বোতলটার শেপ্-গড়নেব কথা বলছিলাম।

নেতা ওহ খুঁজে দেখুন। আমি নতুন একটা খুলছি, আপনি ওটার খোঁজ করুন।

হাফিজ (দর্শকেব দিকে পিছন দিয়া, মঞ্চেব অন্য কোণে উপুড় হইযা কী খোঁজে। তারপব মাটিতে হাত ঠেকাইয়াই চিৎকাব কবিযা উঠে।) পেয়েছি! পেযেছি ! স্যার। এই যে! এইটে না স্যাব ?

(একটি খালি মদেব বোতল তুলিয়া দেখায়)

নেতা : অত জোবে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠবেন না। গত চাব-পাঁচ বছবেব মধ্যে কোনো দিন ভয় পাইনি, এটা ঠিক। তাহলেও এটা গোরস্থান। খেলাব মাঠ নয়। হঠাৎ চেঁচালে বুকে লাগে আপনাকেও বলেছি একবার। দেখি। হ্যাঁ। বোতল এটাই।

হাফিজ : কিন্তু, মানে, একদম খালি যে স্যাব!

নেতা : তাতে ক্ষতি নেই। যে খেয়েছে সে যে বোতল সুদ্ধ সাবাড় কবতে সক্ষম নয়, বর্তমানে সেটাই আমাদেব জন্য— এবকম জায়গায় সুখেব কথা। অন্তত ভয়ের কথা নয়।

হাফিজ : ভয় ? কী যে বলেন স্যার! মানে আমি ভেবেছিলাম হযতো এমনিতেই কাবো পায়েব ধাক্কা লেগেই ছিটকে পড়ে গিযে থাকবে। সব হয়তো মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বরবাদ হযে গেছে। নিশ্চযই ঐ গার্ড ব্যাটার কাণ্ড। কবরের গর্ত থেকে উঠে এসে সোজা আপনার বোতলের ওপরই হয়তো আবার হোঁচট খেয়েছে। অমন দামি জিনিসটা নষ্ট করে দিল স্যাব!

নেতা : আপনাকে প্রথম ভেবেছিলাম নেহায়েত সরকারি কর্মচারি। এত দরদি লোক বুঝিনি।

হাফিজ : সব মাটিতেই পড়েছে স্যার। হাত দিয়ে দেখলাম। জায়গাটা ভিজে একেবারে কাদা কাদা হয়ে গেছে।

নেতা : আপনার এ চাকরি নেয়া সার্থক হয়েছে। এবার একটু বসে আরাম করুন। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। আপনার পা সুদ্ধ কাঁপছে।

হাফিজ : অ্যাঁ! পা ? টলছে— মানে, কাঁপছে ? ওহ! হ্যাঁ তাইতো ইস্ কী বেজায় শীত। একটু বসি তাহলে স্যার, এ্যা ?

(নেতা তখন হোৎকা পোর্ট-ফোলিও ব্যাগ হইতে নতুন বোতল খুলিয়া ক্রমাগত ঢালিতেছেন।)

নেতা : ওদিককার কাজ কতদূর এগুলো ? আর কতক্ষণ দেরি হবে ?

হাফিজ : প্রায় হয়ে এল বলে। এতক্ষণে সব চুকে-বুকে যেত! গোলমালে কাজে বাধা না পড়লে— কখন সব শেষ করে ফেলতাম!

নেতা : গোলমাল! এখানেও গোলমাল ? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি ?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার ! ঐ গোর-খুঁড়েগুলো দু-একটা আপত্তি তুলেছিল, সেটা মেটাতে একটু দেরি হয়ে গেল।

নেতা : আপত্তি ? টাকা-পয়সা নিয়ে আপনি কোনো গোলমাল করেননি তো ? আপনাকেও বলেছি যে, টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়ে বেশি-ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেব। টাকা ঢালতে আপনার কষ্ট হবে কেন ? কমতি পড়লে আপনি আমার কাছে চেয়ে নিতেন।

হাফিজ : সে কি স্যার আমি বুঝিনি। সরকারের কাজে সরকার টাকা খরচ করতে পেছ-পা হব কেন। তবে ঐ ছোটলোকগুলোর আবার অদ্ভুত সব ধর্মীয় কুসংস্কার রয়েছে কিনা— তাইতেই তো যত ফ্যাঁকড়া বাধে। মজুরি তো ষোল আনা আদায় করবেই, তার ওপর ধর্মের নাম করে সাতরকম ফষ্টি-নষ্টি! কুসংস্কারই দেশটাকে খেল স্যার!

নেতা : আমার বক্তৃতা আমাকে শোনাবেন না। আসলে কী ঘটেছে তাই বলুন।

হাফিজ : হাসপাতাল থেকে লাশগুলো তাড়াহুড়ো করে টেনে হেঁচড়ে গাড়িতে তুলতে হয়েছে। তার ওপর এতখানি পথ ট্রাকে আনা, ঝাঁকুনি কিছু কম খায়নি। আর ডাক্তারগুলোও যেমন পশু, মড়াগুলোকে কেটে-কুটে একেবারে নাশ করে রেখেছিল।

নেতা : এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না। তবু আপনাকে বলেছি আমার হার্ট একটু উইক। বেশি স্ট্রেইন সহ্য হয় না। বাজে কথা না ঘেটে আসল কথাটা বলুন।

হাফিজ : যা হবার তাই হয়েছে। টানা-হেঁচড়ায় আর ট্রাকের ঝাঁকুনিতে গাড়ির মধ্যেই লাশগুলো একেবারে তালগোল পাকিয়ে গিয়েছিল। কাটা টুকরাগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়ায় এখন আব বোঝবার উপায় নেই, কোন্‌টার সঙ্গে কোন্‌টা যাবে।

নেতা : তাতে কী হয়েছে ?

(নতুন বোতল খুলিবে)

হাফিজ : আরেকটা খাচ্ছেন স্যার ? মানে, তাই দেখে আমি গোব-খুঁড়েগুলোকে বল্লাম আলাদা আলাদা করে অতগুলো কবর বানিয়ে কী দরকার। একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিযে দিলেই হয়।

নেতা : Resourceful officer! আপনার নামটা মনে রাখতে হবে! সকাল বেলাই একবার পার্টি হাউজে আসবেন, রিকমেন্ডেশন লিখে দেব।

হাফিজ : মেহেববানি স্যাব! পাকিস্তান হবার পর আমরা পেটি-অফিসারবই কেবল কিছু পেলাম না। বৃটিশ আমলেও সমাজে মিশতে পারিনি। পাকিস্তানের জন্য এত ফাইট করে, আমাদের এখনো সেই দশা। যদি আপনাবাও আমাদের দিকে ফিরে না তাকান বাঁচব কী কবে ? আমাদের তো কোনো বাজনীতি নেই স্যার! সরকাবই মা-বাপ! যখন যে দল হুকুমত চালায তার হুকুমই তামিল কবি।

নেতা : এর মধ্যে গোলমালটা কিসের ? আপত্তি উঠল কোথায় ?

হাফিজ : এ্যা ? ওহ। ইয়ে— মানে, ঐ গোড়খুঁড়ে। বজ্জাত ব্যাটাবা বলে কিনা 'কভি নেহি'। বলে কিনা মুসলমানেব মুর্দা, দাফন নেই, কাফন নেই, জানাজা নেই— তাব ওপব একটা আলাদা কবব পর্যন্ত পাবে না ? এ হতে পাবে না 'কহি নেহি!' গো ধরে বসে রইল। কত বোঝালাম।

নেতা : আহাম্মকি করেছেন। সরকারি কাজ কবেন কি-না! পাবলিক সেন্টিমেন্ট বোঝেন না। বুঝতে গিয়ে সময় নষ্ট না করে ওদের খুশিমতো কাজ কবতে দিলে আপনাব ইজ্জত ডুবত ? কাজ আদায় করা নিয়ে আপনাব কারবাব। সমাজ সংস্কাবেব বক্তৃতা দেবার জন্য আপনাকে বেতন দেয না। আব ঘন্টাখানেকেব মধ্যে আকাশ ফর্সা হয়ে যাবে— আজান পড়বে— কাবফিউ শেষ হবে। লাশগুলো নিয়ে আপনি এখনো মিটিং কবছেন ?

হাফিজ : আমি সঙ্গে সঙ্গে ওদেব কথায রাজি হযে গিয়েছিলাম।

নেতা : তাহলে এতক্ষণ দেরি হচ্ছে কেন ?

হাফিজ : ঐ তখনই স্যার আরেকটা নতুন ফ্যাকড়া বাঁধল। কোথেকে ছুটে এসে ঐ মুর্দা ফকির চ্যাচামেচি শুরু কবে দিল।

নেতা : কে ? আপনাকে এতবাব কবে বলেছি, দমকা দমকা একেকটা উদ্ভট কথা আমাকে বলবেন না। ধড়াক কবে বুকে লাগে! যা বলবার তা অত নাটক কবে টিপে টিপে না বলে খোলাখুলি প্রথমেই সবটা বলে ফেলতে পাবেন

না! (বুকে হাত বুলাইয়া) এই মুর্দা ফকিরটি কে আবার ? কবর ফুঁড়ে বেরিয়েছে নাকি ? কারফিউর মধ্যে এখানে ঢুকল কী করে ? গার্ডগুলো কী করছিল ?

হাফিজ : এখানেই থাকে স্যার। গোরস্থানের বাইরে কখনো যায় না বলেই তো ওই নাম। দিনরাত এখানেই পড়ে থাকে! মাঝে মাঝে কবরের সঙ্গে আলাপ করে। পাগল! বদ্ধ পাগল!

নেতা : হুম।

হাফিজ : লোকটা এমনিতে ভালো লেখাপড়া জানে। ভালো আলেম। গ্রামের স্কুলে মাস্টারি করত। তেতাল্লিশে দুর্ভিক্ষে চোখের সামনে ছেলেমেয়ে মা-বৌকে মরতে দেখেছে। কিন্তু কাউকে কবরে যেতে দেখেনি। মুর্দাগুলো পচেছে। শকুনে খুবলে দিয়েছে। রাতেরবেলায় শেয়াল এসে টেনে নিয়ে গেছে। সেই থেকে পাগল। গোরস্থান থেকে কিছুতেই নড়তে চায় না। বলে— মরে গেলে কেউ যদি কবর না দেয়। মরার সময় হলে, কাছাকাছি থাকব, চট করে যাতে কবরে ঢুকে পড়তে পারি। বড় ট্রাজিক স্যার।

নেতা : অনেক খবর রাখেন দেখছি।

হাফিজ : চাকরি, চাকরি স্যার! চারদিকের হরেক রকমের খোঁজ আমাদের রাখতে হয় স্যার।

নেতা : বেশি খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে নিজের বুদ্ধিটাই কোথায় যেন খুঁইয়ে এসেছেন। মেহেরবানি করে তাড়াতাড়ি বলবেন কি গোলমালটা কিসের! লাশগুলো মাটি চাপা দিতে এত দেরি হচ্ছে কেন ? ঠাণ্ডায় আপনার মগজ জমে গেছে। কেবল এলোমেলো বকছেন। নিন। (বোতলটা আগাইয়া দিয়া) এক চুমুক টেনে নিন। শরীর গরম হবে। বুকে সাহস পাবেন। কথা গুছিয়ে বলতে পারবেন। নিন।

হাফিজ : আপনার সামনে স্যার ? তার ওপর স্যার এখন অন ডিউটি—

নেতা : তাকাল্লুকের সময় নেই। লাশগুলো মাটি চাপা দিয়ে কারফিউ শেষ হবার আগে আমাদের এখান থেকে সরে পড়তে হবে। ঢিলেমির এটা সময় নয়। ধরুন। এক চুমুক টেনে চটপট্ কাজটা শেষ করে ফেলুন।

হাফিজ : বোতলে মুখ লাগিয়ে খাব স্যার ?

নেতা : কেন চুসনি লাগিয়ে দিতে হবে নাকি ?

(হাফিজ বোতলটা মুখে লাগাইয়া চোঁ চোঁ করিয়া টানে টানে একদম খালি করিয়া ফেলিল। ঠক্ করিয়া বোতলটা মাটিতে রাখিয়া চোখ বড় করিয়া এক মুহূর্ত থম্ ধরিয়া থাকে। তারপর আকর্ণ বিস্তৃত হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া—)

হাফিজ : এ মালটা স্যার আরো ভালো। একেবারে কলজেয় গিয়ে ঘা মারে।

নেতা : মুর্দা-ফকির লাশগুলো দেখেছে ?

হাফিজ : এ্যা! ওহ্ হ্যা, মানে না। বোধহয় দেখেনি। ও ব্যাটার চলা ফেরা কিছু ঠাওর করা যায় না। কোত্থেকে হঠাৎ হুস করে একেবারে সামনে এসে পড়ে। বোধহয়, আড়াল থেকে গোর খুঁড়েদের সঙ্গে আমার কথাবার্তা শুনে থাকবে। আচমকা পেছন থেকে লাফিয়ে পড়ল। ঠিক আমাদের মাঝখানে। তারপব কী তুখোড় বক্তৃতা। আমি তো গোরখুঁড়েদের কথা মেনেই নিয়েছিলাম। এ ব্যাটাই না কোত্থেকে উড়ে এসে ওদের বোঝাতে শুরু করল— কিছুতেই না, একটা কবরেই কাজ সারতে হবে। যে হাবে মানুষ মবছে তাতে নাকি শেষটায় ওর কবরের বাজারে ঘাটতি পড়ে যেতে পাবে। দেখুন তো কী সব বিদঘুটে কথা!

নেতা : ওকে সুদ্ধ পুঁতে ফেললেন না কেন ?

হাফিজ : কী যে বলেন স্যার! মন ভুলিয়ে কাজ আদায় হলে জানে মেবে ফযদা কী ? পাগলা আদমি, একটু তাল দিয়ে কথা বলতেই শুড় শুড় করে আমার সঙ্গে চলে এলো। ওকে এই দিকে পার করে দিয়ে আমি পাহারা দিচ্ছিলাম যেন আবার হামলা না করে। আর এই শালাবাও সেই কখন থেকে শাবল চালাচ্ছে, এখনো নাকি খোঁড়াই শেষ হলো না। (ঘড়ি দেখিযা) এতক্ষণে নিশ্চযই প্রায় হয়ে এসেছে।

নেতা : (গ্লাসে চুমুক দিযা) না। কাজটা ঠিক হয়নি। এ-সব ফকিব দরবেশ বড় ধড়িবাজ লোক হয়। কোত্থেকে কী উৎপাত সৃষ্টি করবে কে জানে!

হাফিজ : লাশ ও ব্যাটা দেখেনি। দেখলেও কিছু বুঝতে পারত না! রক্ত-মাংসেব স্তূপ। দেখে ও কী বুঝবে ? এ-বকম লাশ তো ট্রেন চাপা মড়াবও হতে পারে।

নেতা : গুলি চলেছে দুপুবেলা। খবব দেশময় ছড়িয়ে পড়েছে সঙ্গে সঙ্গে, এফোঁড়-ওফোঁড়। ফকির হোক পাগল হোক, শহরে থেকেও এ খবর ওব কানে পৌছেনি তা ভাবতে আমি রাজি নই। এসব খবর ঝড়ো হাওয়ার মুখে আগুনের ফুলকির মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হাফিজ : মুর্দা ফকির ঝড়ও বোঝে না, আগুনও বোঝে না। ও তো এক বকম কববেব বাসিন্দা। ভাষাব দাবিতে মিছিল বেরিয়েছিল বলেই পুলিশ গুলি করে কয়েকটাকে খতম করে দিয়েছে— এত কথা বোঝবার মতো জ্ঞান-বুদ্ধি ওব নেই। লাশ দেখলেই ও মুখের মধ্যে ভাত গুজে দিতে চায়— কারণ ওর ধারণা মানুষ শুধু এক রকমেই মরতে পারে— খেতে না পেয়ে। পাগল, বদ্ধ পাগল!

নেতা : কিন্তু লাশগুলো কোথায় কবর দেয়া হচ্ছে তা তো ও দেখেছে। সকালবেলা যদি কাউকে আঙ্গুল দিয়ে জায়গাটা দেখিয়ে দেয় ? লাশ নিয়ে মিছিল কবতে না পেরে ক্ষেপে গিয়ে যদি ছাত্রবা এখানেও খোঁজ কবতে আসে ?

হাফিজ : আপনি লিডার। অনেক দূর ভাবেন। আমরা পেটি-অফিসাব হুকুম তামিল কবেই খালাস। কী করতে হবে ?

(স্তব্ধতা)

নেতা : ওটাকে সুদ্ধ পুঁতে দাও।

হাফিজ : এ্যা ? কী বলছেন স্যাব ? আপনি এক্‌সাইটেড হযে গেছেন স্যার! আর খাবেন না এখন।

নেতা : আমাব মাত্রা আমি জানি। পুঁতে ফেল। দশ-পনেব বিশ-পঁচিশ হাত, যত নিচে পার। একেবারে পাতাল পর্যন্ত খুঁড়তে বলে দাও। পাথর দিয়ে মাটি দিয়ে, ভবাট করে গেথে ফেলো। কোনোদিন যেন আর ওপবে উঠতে না পারে। কেউ যেন টেনে ওপরে তুলতে না পাবে। যেন মিছিল কবতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায।

হাফিজ : আপনি বড় এক্‌সাইটেড স্যার! এ-সব কাজ বড় সূক্ষ্ম স্যার! এক্‌সাইটমেন্ট সব পণ্ড করে দিতে পারে। আমাদের ট্রেনিংই এজন্য অন্যরকম। কোনো সময়ই আমাদেব উত্তেজিত হতে নেই। ভান কবতে পারি কিন্তু আসলে উত্তেজিত নই।

নেতা : পুঁতে ফেলে।

হাফিজ : ভুল, খুব ভুল হবে। যাই করতে হয় স্যাব খুব কুললী কবতে হবে। এসব আমাদের রীতিমতো প্র্যাকটিস করে আয়ত্ত কবতে হয়েছে। এতে কাজ হয়। আমি একবার ঐ দিকটা দেখে আসি। এত দেবি হচ্ছে কেন বুঝতে পাচ্ছি না।

নেতা : যান তাড়াতাড়ি যান! আপনাব কথা শুনতে শুনতে কানে তালা লেগে গেছে। নেশাটা পর্যন্ত জমতে পারছে না। আব বেশিক্ষণ আপনাকে দেখলে, আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলতে ইচ্ছে হবে।

হাফিজ : এ্যা। ওহ্‌-হে হে হে! আপনার কথা শুনলে হাসি পায ঠিক—কিন্তু, মানে পিলে পর্যন্ত চমকে ওঠে স্যার। বুকটা ধড়ফড় করে উঠেছে। উঠতে গিয়ে মনে হলো যেন পড়ে যাব। বড়ো ভয পেয়ে গেছি স্যাব। আবেকটু দেবেন স্যার ? খেলে একটু মনে সাহস আসবে। তাড়াতাড়ি গুছিযে কাজ কবতে পারব। এই নতুন বোতলটা কেমন স্যাব ?

নেতা : (চোখ তুলিয়া) আপনার মাত্রা আমার জানা নেই। এই দফায় একটু কমিযে দিলাম। (গ্লাসে কিছুটা ঢালিযা বোতলটা তুলিয়া দিলেন।)

(নিঃশব্দে পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে মুর্দা ফকির। কেহ তাহাকে দেখে নাই। সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢাকা। রুক্ষ মযলা চুল। তীক্ষ্ণ কোটরাগত চক্ষু জ্বলিতেছে। হাফিজ ও নেতা বোতল ও গ্লাস চুমুকে শেষ করিয়াছে।)

ফকির : (হাফিজের কাঁধে হাত দিয়া) ঝুঁটা ।

(হাফিজ ও নেতা সভয়ে চিৎকার কবিয়া উঠে। নেতা দুর্বল হৃৎপিণ্ড চাপিয়া ধরে।)

নেতা : কে ?

হাফিজ : এ্যাঁ! ওহ! আপনি ? হঠাৎ অন্ধকারে চিনতে পারিনি হুজুর!

ফকির : ঝুঁটা, মিথ্যাবাদী। আমাকে চিনতে পারে না এ-গোরস্থানে এমন কেউ নেই। জিন্দা-মুর্দা কেউ না। জিন্দা আর মুর্দার পার্থক্য বোঝ ? দেখলেই চিনতে পারবে ?

হাফিজ : সে হুজুর আপনার দোয়ায়।

ফকিব : ঝুঁটা' তুমি কোনো পার্থক্য বোঝ না, কিচ্ছু চেন না। তুমি বাঁচার না-লায়েক। তোমাব মতো জিন্দা আদমিকে কেউ দোয়া করে না। পাগলেও না! তুমি আমাকে ধোঁকা দিয়েছ। আমি ওদের ভালো করে দেখেছি, ওরা মুর্দ' নয়। মর্বেনি। মরবে না। ওরা কখনো কববে যাবে না। কবরের নিচে ওরা কেউ থাকবে না। উঠে চলে আসবে।

হাফিজ : আপনি তো এইদিকে ছিলেন। ওদিকে গেলেন কখন ?

ফকির : বাবা! তোমবা শহরেব অলি-গলি যেমন চেন, এ গোরস্থান আমার তেমনি চেনা। এখানে কবরের নিচ দিয়ে সুড়ং আছে। আমি তৈরি করেছি। নইলে তোমাদের সঙ্গে পারব কেন ?

হাফিজ : হো হো হো। আপনি বড় মজার কথা বলছেন হুজুর।

ফকিব : এই তো ঠিক বুঝতে পেবেছ বাবা' তুমি আমায় ফাঁকি দিতে চেয়েছিলে। ভেবেছিলে পাসপোর্ট না কবিয়েই ওপাব চালান করে দেবে! পরীক্ষা না কবে কি আব আমি এমনি যেতে দি।

হাফিজ : সালাম হুজুব' আপনি বুঝি এখানকার পাসপোর্ট অফিসার ? মাফ করে দিন হুজুর, এতক্ষণ চিনতে পাবিনি।

ফকিব · সাবাস বেটা' তোব নজর খুলছে।

হাফিজ : তা হুজুব এখন অনুমতি দিন ওদেব পার কবে দি।

ফকিব : না' আমি প্রথমেই সন্দেহ কবেছিলাম একটা কিছু গোলমাল নিশ্চয়ই আছে। তাইনা চুপে চুপে সুড়ং দিয়ে ঢুকে একেবারে তোদের ঢাকা মোটর গাড়িব ভেতব গিযে উঠলাম!

নেতা : ইন্সপেক্টব!

ফকিব : প্রথমে দেখে মনে হলো ঠিকই আছে। উল্টেপাল্টে দেখি, কোনোটার বুকের কাছে এক খাবলা গোশ্‌ত নেই, কোনোটার ফাটা খুলি দিয়ে কী সব গড়িয়ে পড়ছে, ভাবলাম ঠিকই আছে। কববেব কাবেল। কিছু নয়, শেয়াল শকুনে খামছে কামড়ে একটু খারাপ কবে গেছে। তারপব হঠাৎ খেয়াল করে দেখি— নাতো ঠিক তো নাই' উহুম'

হাফিজ : সে-কী হুজুর ' ঠিক! সব তো ঠিকই আছে!

ফকির : চোপ রও। ঠিক নেই। গন্ধ ঠিক নেই' তোমবা চোরাকারবারী। আমি শুঁকে দেখেছি গন্ধ ঠিক নেই।

হাফিজ · গন্ধ ?

ফকিব : বাসি মরাব গন্ধ আমি চিনি না ? এ লাশের গন্ধ অন্য রকম। ওষুধেব,

গ্যাসের, বারুদের গন্ধ। এ-মুর্দা কবরে থাকবে না। বিশ-পঁচিশ-ত্রিশ হাত যত নিচেই চাপা দাও না কেন এ মুর্দা থাকবে না। কবর ভেঙ্গে বেরিয়ে চলে আসবে। উঠে আসবে।

হাফিজ : ওহ! তাহলে বলুন কবর দেয়া হয়ে গেছে। থাক। গন্ধ থাকুক। মাটিব নিচ থেকে নাকে লাগবে না।

ফকির : ওরা জোর করে কবর দিয়ে দিল। আমাযও বলল না। আমি তোমাদেব কথা মানব না। ও মুর্দা কববের নয়। আমি ওদেব ডেকে তুলে নিয়ে চললাম।

হাফিজ : খোদা হাফিজ!

(ফকিব কিছুদূর যাইযা আবার ফিরিয়া আসে। টানিয়া টানিয়া চাবদিক হইতে কী শুঁকিতে চেষ্টা কবে। নিজের শরীরও শুঁকে দেখে)

ফকির : নাঃ আমার গায়ের গন্ধ নয়। দেখি—

(আগাইয়া আসিযা একবার হাফিজেব গা শুঁকিবে। তাবপব ঝুঁকিযা হাফিজের মুখের ঘ্রাণ নিয়াই জ্বলজ্বলে চোখ বিস্ফোরিত কবিয়া দেয। ছুটিয়া নেতার মুখের ঘ্রাণ নেয। মুখ-চোখ অধিকতর উজ্জ্বল করিযা)

উহ! তাই বল! এইবাব পেয়েছি! ব্যাটারা কি ভুলই না কবেছে!

নেতা : ইন্সপেক্টর, লোকটাকে দূর করে দাও এখান থেকে।

ফকিব : গন্ধ! তোমাদেব গায়ে মবা মানুষের গন্ধ! তোমবা এখানে কী কবছ ? যাও, তাড়াতাড়ি কবরে যাও। ফাঁকি দিয়ে ওদের পাঠিয়ে দিযে নিজেবা বাইবে থেকে মজা লুটতে চাও, না ? না, না। আমার বাজ্যে এসব চলবে না (গন্ধ শুঁকে) তোমাদের গায়ে মুখে পাই মরার গন্ধ! তোমাদেব সময হয়ে গেছে। ছিঃ, এ-রকম ফাঁকি দেয় না! আমি ওদেব তুলে নিয়ে আসছি, তোমবা তৈরি হয়ে নাও। ইস! গোব-খুঁড়েরা কী ভুলই না করেছে! না, না, এ তো হতে পারে না—

(বিড়বিড় করিতে করিতে ফকিরেব প্রস্থান। মঞ্চে বিমূঢ় নেতা। হাফিজ হাসিতেছে। প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া লইতেছে। সাফল্যের হাসি। পানাধিক্য হেতু কিঞ্চিত বেসামাল।)

হাফিজ : হে হে হে হে স্যার! সব খতম স্যার! আমরা এখন ফ্রি! দেখলেন তো, পাগলটাকে কী বকম পোষ মানালাম। পাগলটাকে অত হুজুর হুজুব না বললে হয়তো গায়ের দিকেই ছুটত। আর শবীরটা অনেকক্ষণ থেকেই এমন নড়বড়ে মনে হচ্ছে যে, এব ওপর এখন কিছু এসে পড়লে পাত্তা পাওয়া যেত না।

নেতা : ভালো হতো। তুলে নিয়ে আপনাকে সুদ্ধ পুঁতে ফেলার ব্যবস্থা কবতাম।

হাফিজ : ঐ একটা নোংরা কথা বাববার বলবেন না, স্যার। তাহলে আমিও আপনার সম্পর্কে দুএকটা হক কথা বলে ফেলব কিন্তু।

নেতা : যেমন ?

হাফিজ : যেমন ? বেশ। একটা বলছি। আমাকে তুলে নিয়ে যাবার মতো ক্ষমতা বা অবস্থা আপনার এখন নেই। আপনি এখন নিজেকে নিজে খাড়া রাখতে পারলেই প্রচুর হাততালি পাবেন। বক্তৃতা না করলেও হাততালি দেব।

নেতা : মারহাবা! সাবাস! খুব ধরেছেন। ডিপার্টমেন্টের মুখ উজ্জ্বল করবেন একদিন। একবারও তো ঠিক মতো উঠে দাঁড়াইনি, ধরে ফেললেন কী করে ?

হাফিজ : অনেক দিন হলো এই লাইনে আছি স্যার, এতটুকু বুঝব না ?

নেতা : সবটা ঠিক ধরতে পারেননি। উঠতে হয়তো কষ্ট হবে, কিন্তু বক্তৃতা আমি ঠিকই দিতে পারব। কি, বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

হাফিজ : বিশ্বাস ? হ্যাঁ ! পারবেন! তা পারবেন। আমি, আমি মানে আমার ব্রেনটাও ঠিক আছে। যে-কোনো পরিস্থিতিতে এখনো আমার ডিউটি ঠিক করে যেতে পারব তবে, তবে মানে এই চোখ, আর কান খামুকাই একটু বেশি কাজ করছে বলে ভয় হচ্ছে।

নেতা : ভয় ? ভয় কিসের ? তুমি মনে করেছ ঐ মুর্দা ফকিরের কথায় আমি ডরাই ? এখান থেকে যাওয়ার আগে ওটাকে মুর্দা বানিয়ে যাব! কোথাকার আমার জিন্দা পীর এসেছেন— ওর কথায় গোর থেকে লাশ উঠে আসবে!

হাফিজ : কিছু মনে করবেন না স্যার। একটা সওয়াল পুছ করছি আপনাকে। মনে করেন, সত্যি যদি ঐ মুর্দা ফকির লাশগুলোর একটা মিছিল নিয়ে এসে দাঁড়ায় কী করবেন তখন আপনি ?

নেতা : সব্বাইকে, আপনাকে সুদ্ধ, এক সঙ্গে পুঁতে ফেলতাম।

হাফিজ : আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে রসিকতা করিনি। ঐ মুর্দা ফকির শুনেছি অনেক কিছু জানে। কিন্তু যদি আসেও আমি ভয় পাই না। একটুও না। প্রথমে হাসব। দেখবেন এগিয়ে যাব। হাত মেলাব। ভয় কিছুতেই পাব না। (নিজের গলা দুই হাতে সজোরে টিপিয়ে ধরিয়া) গ...লা টিপে ধরে রাখব। যাতে বুকের মধ্যে ভ...য় কিছুতেই ঢুকতে না পাবে। আরেকটু দেবেন স্যার ? বুকে সাহস আসবে। কেমন জানি ইয়ে করছে।

(ততক্ষণে পার্টিশনের ঐ পাশ দিয়ে সকলের অলক্ষ্যে ক্রমোজ্জ্বলিত আলোকশিখার কম্পিত গোলকের মধ্যে একটি ভয়াবহ মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে। সমস্ত বদনমণ্ডল পরিবেষ্টিত করিয়া রক্তাক্ত ব্যান্ডেজ। মূর্তি নিশ্চল। নেতা যখন শেষবারের মতো ইন্সপেক্টরকে পানীয় দেবার জন্য গ্লাসে বোতল উপুড় করিয়া ধরিয়াছেন তখন ঐ স্তব্ধ মূর্তির একটি প্রায় অদৃশ্য হাত অন্ধকার হইতে কী যেন ছুঁড়িয়া মারিল। কাঁচের গ্লাসের ঝন্ ঝন্ শব্দ। নেতা ও হাফিজের ভয়ার্ত অস্ফুট চিৎকার!)

হাফিজ : গুলি! গুলি স্যার! শুয়ে পড়ুন শিগগির! গুলি!

(দুইজনে উপুড় হইয়া শুইয়া পড়ে। পশ্চাতে কম্পিত শিখায় নিষ্পন্দ

মুখ! কয়েক মুহূর্তের সুতীব্র স্তব্ধতা।)

নেতা : (চাপা স্বরে) গুলি যে বুঝলে কী করে ?

হাফিজ : দেখেছি!

নেতা : কে ছুঁড়েছে তুমি দেখেছ ?

হাফিজ : না। তবে কী ছুঁড়েছে দেখেছি।

নেতা : কোথায় ?

হাফিজ : বেশি নড়বেন না। খুঁজে দেখছি পাই কিনা ? (উপুড় হইয়া একটু চারদিকে হাতড়ায়। হঠাৎ কী তুলিয়া দেখে) ধরুন, পেয়েছি।

নেতা : (হাতে লইয়া) এ কী ? এ যে বুলেট! রক্তমাখা!

হাফিজ : কুল্‌লি! কুল্‌লি! ভয় পাবেন না স্যার! ভয় পেলেই সব গেল। এ নিশ্চয়ই ঐ মুর্দা ফকিরের কাণ্ড! ট্রাকের ভিতর ঢুকে লাশের গা থেকে হয়তো খুলে নিয়ে এসেছে। সেগুলোই ছুঁড়ে মেরে এখন আমাদের ভয় দেখাচ্ছে।

নেতা : ও! তাহলে বলো কিছু না ! মুর্দা ফকির— সে তো জ্যান্ত আদমি। বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।

হাফিজ : এখন উঠে পড়ে যাক স্যার! মিছেমিছি ভয় পেয়ে লাভ কী !

নেতা : ইন্সপেক্টর!

হাফিজ : জি!

নেতা : আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে— যে মেরেছে, সে এখনও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

হাফিজ : এ্যাঁ!

নেতা : তুমি একটু ঘুরে একবার দেখ তো। আমিও তাকাচ্ছি।

হাফিজ : (ধীরে মাথা ঘুরাইয়া দেখে, সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে! আপ্রাণ চেষ্টায় অস্বাভাবিক স্থিরকণ্ঠে) উঠে এসেছে।

নেতা : কে ?

হাফিজ : সেই লাশটা।

নেতা : লাশ ? কোন লাশটা ?

হাফিজ : বুলেট খাওয়া। ছাত্র। খুলি নাই!

নেতা : ওহ্‌! কী চায় ?

হাফিজ : চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞেস করে দেখব ?

নেতা : কী জিজ্ঞেস করবে ?

হাফিজ : এই, কী চায়, কেন উঠে এসেছে, ঠাণ্ডা লাগছে নাকি— এই সব ?

নেতা : আমাদের কথা বুঝবে ?

হাফিজ : ট্রাই করতে হবে। সব লাইনেই ট্রাই করতে হবে। এটা একটা নতুন সিচুয়েশান স্যার। কুল্‌লি অগ্রসর হতে হবে। ঘটনা হিসেবে এটা অবাস্তব

হতে বাধ্য। কিন্তু অন্য রকম হলেও আমাদের ভয় পে । চলবে না। ফেইস করতেই হবে।

(উঠিয়া দাঁড়াইবে। বেশ কষ্ট। নাটুকে মাতা .র টলায়মান অবস্থা নয়, তবে নেশা যে উভয়েরই খুব গাঢ় হই ছে তাহা স্পষ্ট।)

নেতা : আপনি কিছু ভয় পাবেন না। আমি পেছনে রয়েছি। পিস্তলের টিপ আমার পাক্কা।

হাফিজ : খবরদার, অমন কাজও করবেন না। (ফিস ফিস করিয়া) পিস্তলের কেস এটা নয় স্যার! বুঝতে পারছেন না—এটা—ঠিক মানে, অন্য জিনিস, মানুষ নয়। পিস্তল রেখে দিন। লক্ষ্য করুন আমি কী রকম সামলে নিচ্ছি। একটু আলাপ করতে পারলেই পোষ মানিয়ে নেব। (ধীরে ধীরে আগাইয়া মূর্তির নিকট আসে! বাতাসে টানিয়া টানিয়া স্পর্শ করিতে চেষ্টা করে।) এই!-এই! আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? এই! হেই! (মূর্তি নিরব। নিশ্চল) (ঘুরিয়া) স্যার, কোনো সাড়া দিচ্ছে না যে?

নেতা : বোধহয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। আমাদের সঙ্গে হয়তো কোনো কাজ নেই। ভালো। তা ভালো। ও থাকুক। আমরা চল আমাদের কাজে যাই।

হাফিজ : তা হয় না স্যার। ওকে এখানে দাঁড় করিয়ে আমরা চলে যাব? তা হয় না স্যার। আমার ডিউটি আমাকে করতেই হবে। ওকে ফেরত না পাঠিয়ে আমরা চলে যেতে পরি না, স্যার!

মূর্তি : আমি যাব না। আমি থাকব।

(দুজনে হতবাক! ধীরে ধীরে হাফিজ আগাইয়া যায়)

হাফিজ : কোথায় যাবে না? কোথায় থাকবে?

মূর্তি : কবরে যাব না। এখানে থাকব।

হাফিজ : অবুঝের মতো কথা বলো না। তোমাদের এখন এখানে আর থাকতে নেই। তোমরা মরে গেছ। অন্যখানে তোমাদের জন্য নতুন জায়গা ঠিক হয়ে গেছে। সেখানেই এখন তোমাদের চলে যাওয়া উচিত।

মূর্তি : মিথ্যে কথা। আমরা মরিনি। আমরা মরতে চাইনি। আমরা মরব না।

হাফিজ : (নেতার কাছে আসিয়া) বড় একগুয়ে স্যার। আলাপ করে সুবিধে হবে, মনে হচ্ছে না। একটা বক্তৃতা দিয়ে দেখবেন স্যার? যদি কিছু আছর হয়! পারবেন না স্যার? আপনি তো বলেছিলেন, যাই হোক, বক্তৃতা দিতে আপনার কোনো কষ্ট হবে না। একবার ট্রাই করুন না!

নেতা : (ভালো করিয়া শুনিয়া) দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে—

মূর্তি : কবরে যাব না।

নেতা : আগে কথাটা ভালো করে শোন। তুমি বুদ্ধিমান ছেলে শিক্ষিত ছেলে। চেষ্টা করলেই আমার কথা বুঝতে পারবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসে উঠেছ। অনেক কেতাব পড়েছ। তোমার মাথা আছে।

মূর্তি : ছিল। এখন নেই। খুলিই নেই। উড়ে গেছে। ভেতরে যা ছিল রাস্তায় ছিটকে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।

নেতা : জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও! কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না। তোমার মতো ছেলেরা দেশের মরণ ডেকে আনবে। সকল সর্বনাশ না দেখে বুঝি কবরে গিয়েও শান্ত থাকতে পারছ না। তোমাকে দেশের নামে, কওমের নামে, দীনের নামে, যারা এখনো মরেনি তাদের নামে— মিনতি করছি— তুমি যাও, যাও, যাও'

মূর্তি : আমি বাঁচব।

নেতা : কী লাভ তোমার বেঁচে ? অশান্তি ডেকে আনা ছাড়া তোমার বেঁচে কী লাভ ? তুমি বেঁচে থাকলে বারবার দেশে আগুন জ্বলে উঠবে, সব কিছু পুড়িয়ে ছারখার না করে সে আগুন নিভবে না। তার চেয়ে তুমি লক্ষ্মী ছেলের মতো কবরে চলে যাও। দেখবে দুদিনে সব শান্ত হয়ে যাবে। দেশে সুখ ফিরে আসবে। (মূর্তি মাথা নাড়ে) আমি ওয়াদা করছি তোমাদের দাবি অক্ষরে অক্ষরে আমরা মিটিয়ে দেব। তোমার নামে মনুমেন্ট গড়ে দেব। তোমার দাবি এ্যাসেম্বলিতে পাশ করিয়ে নেব। দেশজোড়া তোমার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করব। যা বলবে তাই করব। দোহাই তোমার তবু অমন স্তব্ধ পাথরের মূর্তির মতো আকাশ ছোঁয়া পাহাড়ের মতো নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকো না। সরে যাও, চলে যাও, অদৃশ্য হয়ে যাও।

(সর্বাঙ্গে কাফনের কাপড় জড়াইয়া আর একটি মূর্তি নিঃশব্দে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। চুলে রক্ত মাখা। মুখে আঘাতের চিহ্ন। ঠোঁটের দুই পাশে বিশুষ্ক রক্ত-রেখা।)

কে ? তুমি কে ?

মূর্তি (২) : নাম বললে চিনতে পারবেন না। হাইকোর্টের কেরানি ছিলাম। তখন টের পাইনি। ফুসফুসের ভেতর দিয়ে চলে গিয়েছিল। এপিঠ-ওপিঠ। বোকা ডাক্তার খামোকা কেটেকুটে গুলিটা খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়েছে। জমাট রক্তের মধ্যে ফুটো নজরেই পড়েনি প্রথমে!

নেতা : তুমিও এই দলে এসে জুটেছ নাকি ?

মূর্তি (২) : গুলি দিয়ে গেঁথে দিয়েছেন। ইচ্ছে করলেও আলগা হতে পারব না।

নেতা : তুমি আমাকে চেন ?

মূর্তি (২) : চশমাটা আজ খুঁজে পাইনি। অন্ধকারে আপনাকে চেনা যাচ্ছে না। তবে

আপনার গলা চিনি।

নেতা : আমার কথা শুনেছ? এই মাত্র যা বলছিলাম?

মূর্তি (২) : আপনি মিথ্যেবাদী। কথা দিয়ে আপনি কথা রাখেন না। আপনি অনেক ওয়াদা করে সেবার আমাদের দেড়মাস লম্বা ধর্মঘট ভেঙ্গে দিয়েছেন। আমার ছোট ছেলেটা তখন মারা যায়। আপনার কথা শুনেছি। আপনার কথা ভুলিনি। আপনি মিথ্যেবাদী।

মূর্তি : আমরা কবরে যাব না।

মর্তি (২) : আমরা বাঁচব।

(বিড়বিড় করিতে কবিতে পশ্চাতে গিয়া উপুড় হইয়া বসিবে। আর দেখা যাইবে না।)

(নেতা মাথা নিচু করিয়া সরিয়া আসে। হাফিজ অগ্রসর হইয়া কানের কাছে বেশ জোরে ফিস্ ফিস করিয়া।)

হাফিজ : হবে না। এই লাইনে ঠিক কাজ হবে না স্যার। অন্য রাস্তা ধবতে হবে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। দেখবেন ঠিক কাবু কবে ফেলব। একটু ভোল বদলাতে হবে। সবই আমাদের করতে হয স্যাব। আপনি চুপ করে বসে দেখুন।

(হাফিজ চাদরটা খুলিয়া এক প্যাঁচ গায়ের উপর জড়াইয়া বাকি অংশ ঘোমটাব মতো মাথার উপর তুলিয়া দিল।)

নেতা : ঢং ছাড়ো। মেয়েলোকেব মতো ঘোমটা দিয়েছ কেন?

হাফিজ : (ফিস্ ফিস্ করিয়া) চুপ! আমি এখন স্ত্রী লোক। ঐ ছোকরার মা। কথা বলবেন না। দেখে যান। বুঝতে পারছেন না সবাই একটু ঘোরের মধ্যে আছি, কিছু ধরতে পারবে না। খোকা! খোকা!

(আঁচল টানিয়া, ঘোমটা উঠাইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়ায়। কণ্ঠস্বরকে অনাবশ্যকভাবে স্ত্রী লোকের মতো করিয়া তুলিবার চেষ্টা নাই। তবে যথোপযুক্ত আবেগে ভরপুর।)

মূর্তি : (চঞ্চল বেদনাহত।) কে? কে ডাকে?

হাফিজ : খোকা কোথায় গেলি তুই? খো-কা!

মূর্তি : ...কে? মা? মা! তুই কোথায় মা! (শূন্যে হাতড়ায়)

হাফিজ : এই যে যাদু, আমি এইখানে।

মূর্তি : তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে না মা? তুমি বাবণ করলে, তবু আমি শুনলাম না। রাস্তা থেকে ওরা ডাকল। আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম। তোমার কাছে বলতে গেলে পাছে তুমি বাধা দাও, সেই জন্যে তোমাকে কিছু না বলেই চুপে চুপে চলে গেছি। আজ যে ও-রকম গোলমাল হবে তুমি আগে থেকেই কী করে জানলে মা?

হাফিজ : মা হলে সব জানতে হয়। মা হলে জানতি, মা'র কষ্ট কী' মা'র বুক খালি

হলে, মা'র কেমন লাগে, তুই দস্যু ছেলে বুঝবি না।

মূর্তি : তোমার সব কষ্ট বুঝি মা। নাক-মুখ বেয়ে আমার কেবল রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল। সমস্ত দুনিয়াটা ঝাপসা হয়ে এল। আমার তখন খালি কি মনে হচ্ছিল জান মা ? মনে হচ্ছিল তুমি বুঝি আমাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছ। সেই সেবার টাইফয়েড জ্বরের ঘোরে যখন খালি প্রলাপ বকতাম তখন যেমন আমায় জড়িয়ে ধরে কাঁদতে, ঠিক তেমনি। আর আমার নাক-মুখ গড়িয়ে তোমার চোখের গরম নোনা পানি কেবল ঝরছে। ঝরছে।

হাফিজ : তবু তো কোনো কথা শুনিস না। তোরা কেবল মা'র দুঃখ বাড়াতেই জন্মেছিস! এ তোদের কী নতুন নেশা! এত মরণ-পাগল কেন তোরা ?

মূর্তি : মিছে কথা মা! আমরা কেউ মরতে চাইনি মা। তোমার কাছে থাকতে কি আমার ইচ্ছে করে না ? হারিকেনের লণ্ঠন জ্বেলে অনেক রাত পর্যন্ত পড়ব পড়ব পড়ব। তেল কমে এলে সলতে উস্কে দিয়ে পড়ব, আর তুমি বার বার এসে বকবে—কেবল বকবে। তারপর লণ্ঠন জোর করে কেড়ে নিয়ে যাবে। টেনে বিছানায় শুইয়ে দেবে। অন্ধকারে মশারির ফাঁক দিয়ে ছায়া-মূর্তির মতো ঘুমে জড়ানো তোমার ছোট্ট এলোমেলো শরীরটা দেখব—দেখব মা, চলে যেও না— মা! তোমায় আমি দেখব— তোমায় আমি আদর করব মা— তুমি কোথায় মা ? ...মা!

হাফিজ : ঘুমের ঘোরে কী বকছিস ? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি ? অনেক রাত হয়েছে লক্ষ্মী বাবা, আর রাত জেগে পড়ে কাজ নেই। বিছানা করে রেখেছি। যাদু আমার শুতে যা!

মূর্তি : আমাকে শুতে যেতে বলছ মা ? না। না। আমি শোব না। আমি এখন শোব না মা। আমি আর কোনোদিন শোব না। একবার ঘুমিয়ে পড়লে ওরা আমাকে আর জাগতে দেবে না। তুমি বুঝতে পারছ না মা— না, না আমি শোব না। আমি যাব না। আমি থাকব। আমি উঠে আসব।

নেতা : ইন্সপেক্টর! তোমার এ ভূতুড়ে নাটক আর কতক্ষণ চলবে।

হাফিজ : ছিঃ বাবা! জিদ করো না। লক্ষ্মীটি শুতে যাও। মা'র কথা শোন।

(দ্বিতীয় মূর্তি আচমকা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায়)

মূর্তি (২) : (অস্পষ্টভাবে হাফিজের দিকে হাত বাড়াইয়া) মিন্টু! মিন্টু! মিন্টু ঘুমায়নি এখনো।

হাফিজ : (সুর পাল্টাইয়া) তোমার কোলে আসার জন্য কাঁদছে।

মূর্তি (২) : দাও, আমার কোলে দাও। (বাচ্চা কোলে লইবার ভঙ্গি করে) ইস! জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে গো!

নেতা : খবরদার! ফেলে দাও। ওটাকে ফেলে দাও কোল থেকে। এই শেষবারের মতো বলছি। এখনো ভালো চাও তো সরে পড়। চলে যাও সব।

মূর্তি : আমি যাব না। আমি বাঁচব মা! বৃষ্টিতে ভেজা নরম ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে আমি আরো হাঁটব মা! ঠাণ্ডা রূপোর মতো পানি চিরে হাত-

পা ছুঁড়ে সাঁতার কাটব মা!

মূর্তি (২) : কাঁদিসনে মিন্টু! তোর বাপ কি কম চেষ্টা করেছে ? দুষ্টু মুদি কিছুতেই মাসের শেষ বলে এক রত্তি বার্লি বাকি দিল না। বেতন নেই দেড় মাস, দেবে কেন ? তুই কাঁদিসনে মিন্টু। তুই কাঁদলে তোর মা-ও কেবল কাঁদবে। এখন চুপ করে ঘুমিয়ে থাক। দেখবি, কাল ভোরে সব জ্বর কোথায় চলে গেছে!

নেতা : সকাল পর্যন্ত তোমাদের নিয়ে এখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে নাকি ? না আমি তা পারব না। এতসব আবদার আমার সঙ্গে চলবে না। গেট আউট। ডেভিল্‌স্! যাও বলছি।

হাফিজ : উত্তেজিত হবেন না স্যার! কুল্‌লি! কুউল্‌লি!

মূর্তি : তুমি একটুও ভয় পেয়ো না। কিচ্ছু ভেব না মা। আমি কিছুতেই মরব না। ছায়া মূর্তির মতো বার বার আসব। তুমি যদি আমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়, দরজায় এসে টোকা দেব। চৌমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাতছানি দিয়ে তোমায় ইশারা করব। তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ব মা!

মূর্তি (২) : (কোলের কল্পিত সন্তানকে) দূর বোকা' তুই স্বপ্ন দেখছিস। ভয়ের কী আছে' তুই তো আমার কোলে' আমি থাকতে তোকে মারে এমন দৈত্য দুনিয়ায় নেই। (সামনের দিকে ইশারা করিয়া) ওগুলো কিছু না। সব সং সেজে তোকে ভয় দেখাতে চায়। তুই ঘুমো। ঘুমো।

নেতা : ইন্সপেক্টর! আমি এসব মানি না। আমি স-ব পুঁতে ফেলব। একটা একটা করে গুলি কবে আমি সব মাটিব সঙ্গে মিশিযে দেব। হাজার হাজার হাত মাটির নিচে সব পুঁতে ফেলব। যাতে কোনোদিন আর উঠতে না পারে। ভয় দেখাতে না পারে। গুলি, সবগুলোকে আবার গুলি কর। গার্ড! গার্ড'

(হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করে মুর্দা ফকির।)

ফকির : জি হুজুর।

নেতা : (লক্ষ না করিয়া) গুলি কর।

ফকির : গুলি ? ওহ্! হ্যাঁ! আছে! আমার কাছে আরো কয়েকটা আছে। এই নিন বুলেট। খুব তাজা। টাট্‌কা। এখনো খুন লেগে রয়েছে। হাত পাতুন। ধরুন!

(স্তম্ভিত ভয়ার্ত বিমূঢ় নেতা হাত বাড়াইয়া গ্রহণ করিবে)

লোড আপনি করুন! আমি ওদেরকে ডেকে নিয়ে আসি। যাই। আমি মিছিলটা এইদিকে ডেকে নিয়ে আসি।

(হন্তদন্ত হইয়া ফকিরের প্রস্থান। সেই গমন পথের দিকে তাকাইয়া নেতা একবার নিজের বুক চাপিয়া ধরে। হাফিজ পিছন হইতে আগাইয়া তাহাকে ধরে।)

(নেপথ্যে মুর্দা ফকির চিৎকাব করিতেছে : তোরা কোথায় গেলি ? সব ঘুমিয়ে নাকি ? উঠে আয়। তাড়াতাড়ি উঠে আয়। সব মিছিল

করে উঠে আয়। গুলি গুলি হবে। স্ফূর্তি করে উঠে আয় সব! কোথায় গেলি? সব উঠে আয়। মিছিল করে আয় এদিকে। আজ গুলি—গুলি হবে আজ! কবর খালি করে সব উঠে আয়!)

(মঞ্চের উপরের লাল মূর্তিদ্বয় মুর্দা ফকিরের ডাক কান পাতিয়া শুনিতেছিল। ক্রমে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর ধীরে ধীরে একজনের পিছনে আরেকজন—ক্রমে আরও অনেকে—সারি দিয়া চলিয়া যাইবে এবং তাহাদের উপর প্রতিফলিত আলোর রেখাও ক্রমে বিলীন হইয়া যাইবে।)

(হাফিজ ও নেতা লক্ষ করে নাই যে মঞ্চ খালি হইয়া গিয়াছে।)

নেতা : (বিবর্ণ মুখে) ইন্সপেক্টর! হার্টটা জানি কেমন করছে। বড় ভয় পেয়ে গেছি! একটু ধরে রেখো আমাকে! আর আর একটু ঢেলে দিতে পারবে?

হাফিজ : না! আপনার এখন হুঁশ নেই! আমার নিজেরও হয়তো নেই! ঠিক বুঝতে পারছি না।

(পিছন হইতে গার্ড হঠাৎ লণ্ঠন হাতে ঢুকিয়া পড়িয়া প্রচণ্ড শব্দে বুট ঠুকিয়া স্যালুট করে!)

নেতা : (চমকাইয়া) কে? এটা কী আবার?

হাফিজ : (দেখিয়া) ইডিয়ট! এটা কি তোমার প্যারেড গ্রাউন্ড নাকি? বন্দুকের গুলির মতো স্যালুট করতে শিখেছ দেখছি! কী চাও?

গার্ড : গাড়িতে উইঠ্যা হগলে আপনাগো লাইগা এন্তেজার করতাছে' সব কাম খতম! কারফিউ-শেষ হইতেও আর দেরি নেই'

হাফিজ : (প্রথম লক্ষ করিল যে, মঞ্চ খালি! ভালো করে কয়েকবার চোখ কচলায়) গুড্! সব কাজ খতম তো? গুড্! সব কাজ খতম স্যার! নিট জব' বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি স্যার? ভালো করে দেখুন না নিজেই।

নেতা : (ধীরে ধীরে চোখ ঘুরাইয়া দেখে, তারপর সামনের দিকে অর্থহীন বিষণ্ন দৃষ্টি মেলিয়া চুপ করিয়া থাকে) হুম!

গার্ড : কিছু তালাশ করতেছেন হুজুর? খুঁইজা দেখুম?

নেতা : না চল!

হাফিজ : কিছু না স্যার! এসব কিছু না। গোরস্থানে এ রকম কত কিছু হয়। তার ওপর আবার স্যার—মানে—

নেতা : হুম! চল! আর দ্যাখ মুর্দা ফকিরটাকে সঙ্গে নিতে হবে। কিছুদিন থাকুক! (বুকে হাত চাপিয়া ধরে)

হাফিজ : এ্যাঁ? মুর্দা ফকির? ওহ্! নিশ্চয়! নিশ্চয়! ইয়েস স্যার!

(সকলে ধীরে ধীরে চলিয়া যাইবে। গার্ড গ্লাস বোতল ইত্যাদি গুছাইয়া লইবে।)

[যবনিকা]

দণ্ডকারণ্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ছাত্র-ছাত্রীদের
কোমল-কঠিন করে

ভূমিকা

যদিও 'কবর' ও 'দণ্ডকারণ্য' আমার নাটকীয় প্রয়াসের দুই বিপরীত প্রকৃতির প্রয়াস, উভয়ের মধ্যে আমার স্বভাব ও দৃষ্টির ঐক্যও বিদ্যমান। তবে, 'কবর' ক্ষোভপূর্ণ, অভিযোগাশ্রয়ী এবং রক্তাক্ত। 'দণ্ডকারণ্য' কৌতুকাবহ, অন্তরাশ্রয়ী এবং অদ্ভুত রসাত্মক। 'কবরে'র রচনাকাল উনিশশ' সাতচল্লিশের সংলগ্ন পাঁচ-সাত বছর। দণ্ডকারণ্যের, উনিশশ' ষাট-পঁয়ষট্টি। মূল্যায়নের প্রয়োজনে উভয় গ্রন্থ একত্রে গ্রহণ করলেই আমার প্রতি সদ্বিচার করা হবে।

নীলক্ষেত, ঢাকা

মুনীর চৌধুরী

দণ্ড

চরিত্র

মা

স্ত্রী

চোর, নেপথ্যে

(রাত। শোবার ঘর। বুক পর্যন্ত লেপ টেনে রাখা, টেবিল ল্যাম্পের আলোতে, স্বামী কিছু কাগজপত্র নেড়ে চেড়ে দেখছেন। পাশে মুখ খোলা পোর্টফোলিও ব্যাগ। হয়তো এখনই স্ত্রী শুতে এলে কাগজপত্র ঠেলে রেখে আলো নিবিয়ে সরাসরি ঘুমের চেষ্টায় আগাগোড়া লেপ মুড়ি দেবেন। চুল বাঁধা শেষ করে স্ত্রী ঘরে ঢুকেছেন। শেষবারের মতো ঘরের এটা ওটা সরিয়ে গুছিয়ে রাখেন। স্বামী আড়চোখে দেখেন। হাতের কিছু কাগজ তাড়াতাড়ি উল্টে যান।)

স্ত্রী : শোবে এখন?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : বাতি নেবাব?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : খুব জটিল কেস নাকি?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : কেস্‌টা যখন প্রথম হাতে নাও তখন এ-রকম মনে হয়নি না?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : কারো সাহায্য না নিয়ে যে-রকম আহ্লাদেব সঙ্গে একাই খেটে খুটে সব তৈরি করছিলে তা দেখে আমিও ভাবিনি যে কেসটা শেষে তোমার জন্য এত জটিল হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্বামী : শোবে এখন?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : আলো নেবাব?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : তোমার গলার ব্যথাটা কি আজ বেড়ে গেল না কি?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : সামান্য একটা মাছের কাঁটা তোমাকে এতদিন ধরে ভোগাবে কে ভেবেছিল?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : ডাক্তার অবশ্য আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল যে, আর দু'চার দিন মাত্র! তারপর সবই আরাম হয়ে যাবে। এমন বেঁধাই নাকি বিঁধেছে যে ওটাকে একেবারে গলিয়ে ফেলতে হবে।

স্ত্রী : তোমার কাগজপত্রেব সঙ্গে কিছু ফটো দেখলাম মনে হলো।

স্বামী : হুঁ।
স্ত্রী : সবগুলোই কি একজনের ?
স্বামী : না।
স্ত্রী : সবকটাই মেয়েমানুষের ফটো মনে হলো।
স্বামী : একজনের নয়।
স্ত্রী : ও। জজ সাহেবকে উপহার দেবে বলে যোগাড় করেছ না কি ?
স্বামী : হুঁ।
স্ত্রী : সেটা কী রকম ?
স্বামী : আদালতে এগুলো ব্যবহার করতে চাই।
স্ত্রী : ওগুলো বুকে নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ধ্যানে মগ্ন ছিলে, এই বলতে চাও ? ওকালতিতে তোমার পসার না হলে আর কার হবে!
স্বামী : আলোটা নিবিয়ে দিতে পার।
স্ত্রী : ওঁর মধ্যে তোমার মক্কেলের ছবি কোন্টা ?
স্বামী : ওর ছবি এখানে নেই।
স্ত্রী : বল কী, এত ঘাঁটাঘাঁটি করছিলে কোন্ সুখে ?
স্বামী : বিপক্ষ দলের বানানো সাক্ষীটাকে ঘায়েল করব বলে। আমার মক্কেল সুরাইয়া খানমকে ও কতটা চেনে তা একবার ভালো করে পরীক্ষা করতে চাই। এগুলো সেজন্য যোগাড় করেছি।
স্ত্রী : দেখি আমি চিনতে পারি কি না!
স্বামী : শখ মিটিয়ে দেখ।
স্ত্রী : অনেকগুলো ঢং। কিন্তু আমার তো মনে হয় সবকটাই একজনের ছবি। কৈ বেশি বয়স হয়েছে বলে তো মোটেই ধরা যায় না।
স্বামী : তুমি তাকে কখনো দেখনি। অত কথা বলছ কী করে ?
স্ত্রী : তোমাকে দেখে।
স্বামী : এর একটাও সুরাইয়া খানমের ছবি নয়।
স্ত্রী : বাজে কথা। এতক্ষণ এগুলো কচলাচ্ছিলে কেন তাহলে ?
স্বামী : তোমার মাথা খারাপ হয়েছে।
স্ত্রী : আমার গলায় কাঁটা ফুটেছে। মাথা ঠিক আছে। চোখও কানা হয়নি।
স্বামী : গলার কাঁটা ভালো করতে এতদিন লাগে জানতাম না। তোমার সদালাপী ডাক্তার আজ কতক্ষণ ছিলেন ?
স্ত্রী : হঠাৎ আমার ডাক্তার বনে গেলেন কী করে ? ছিলেন তো তোমার বন্ধু।
স্বামী : কিন্তু এখন চিকিৎসক তোমার রোগের। নিজের ডায়রি ভুলে ফেলে যান যাতে তুমি অবসর মতো সেটা পড়ে দেখতে পার।
স্ত্রী : তুমি পড়ে দেখেছ না কি ?

স্বামী : আমি উকিল, নথিপত্র পড়া মানুষ, অন্যের মনের কথার ফিরিস্তি ঘেঁটে আমার কী লাভ ?

স্ত্রী : শুধুই কি নথিপত্রের কারবার কর ? আজ যে ব্যাগের মধ্যে করে অতগুলো টাকা সুরাইয়া খানমের কাছে ফেরত দেবে বলে নিয়ে গেলে সেটাও কি তোমার নিছক আদালতি মেজাজের ফল ?

স্বামী : ভদ্রমহিলা সদ্য বিধবা। তাঁর স্বামীর সঙ্গে আমার জানাশুনো ছিল। পারিবারিক দলাদলির কবলে পড়ে সম্পত্তি খোয়াবেন এ আমি চাইনি। তাছাড়া এ সামান্য মামলার জন্য পুরোপুরি তিনশ টাকা দাবি না করলেও আমার চলত।

স্ত্রী : কী করতে চেয়েছিলে ?

স্বামী : টাকাটা ফেরত দিতে চেয়েছিলাম।

স্ত্রী : ভদ্রমহিলা বিধবা হলেও তুমি হাজি নও। তোমার মহসিন বনে যাবার আমি কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না।

স্বামী : টাকা উনি ফেরত নেননি।

স্ত্রী : বাজে কথা। আমি বিশ্বাস করি না।

স্বামী : নিজে একবার হাত ঢুকিয়ে দেখ না কেন ?

স্ত্রী : পারব না। দলিলপত্রেব সঙ্গে ফুল ফটো কত কিছুই তো তোমার ব্যাগের মধ্যে থাকতে পারে। শেষকালে টাকা খুঁজতে গিয়ে যদি সত্যি সত্যি কেউটে বেরিয়ে পড়ে!

স্বামী : ভয় কী, জাত কেউটের ফণাও তোমার তেজের সামনে নেতিয়ে পড়তে বাধ্য।

স্ত্রী : এখন আর সে গর্ব কবিনে। যখন তোমার পসার কম ছিল, তখন হয়তো সত্যি সত্যি কিছু ক্ষমতা হাতে ছিল। এখন কত বাদশা-বেগম তোমার ওকালতির বশ। ক্ষমতা সব তোমার হাতে। ক্ষমতা তোমার হাতে বলেই না এত সহজে, ন্যায্য পাওনা টাকাব এতবড় একটা বান্ডিল কোথাকার কোন্ দুঃখিনীর করকমলে গুঁজে দিয়ে এসেও খোসমেজাজে চলে ফিরে বেড়াচ্ছ।

স্বামী : তুমি কি শোবার যোগাড় করছ না কি ?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : আরেকবার আলমারিটা খোল।

স্ত্রী : আবার কেন ? সবই তো উঠিয়ে রেখেছি।

স্বামী : আমার পোর্টফোলিও ব্যাগটা তুলে রাখ।

স্ত্রী : কেন ?

স্বামী : ওর মধ্যে টাকা আছে।

স্ত্রী : কোত্থেকে এলো ?

স্বামী : মক্কেলের কাছ থেকে।

স্ত্রী : মক্কেল বলছ কাকে ?

স্বামী : সুরাইয়া খানমকে। টাকা সে ফেরত নেয়নি।

স্ত্রী : আশ্চর্য, সে শেলাঘাত সহ্য করলে কী করে ?

স্বামী : টাকা আমি ফেরত নিতে চাইনি, একথা সত্য।

স্ত্রী : আমি আলো নিবিয়ে দিলাম। আর বকতে পারি না। এখন ঘুমোব।

স্বামী : এতগুলো টাকা তোমার কাছে মূল্যবান মনে হলো না! আলমারিতে তুলে রাখা প্রয়োজন মনে করলে না! অথচ কার না কার ফেলে যাওয়া পড়ে থাকা ডায়রি মহামূল্য গুপ্তধনের মতো সন্তর্পণে আগলে বেড়াচ্ছ!

স্ত্রী : গুপ্ত কি আর থেকেছে ? এতক্ষণ এখানেই পড়েছিল। তোমার সন্ধানী চোখ, মনের কথা না-ই বা বল্লাম, ইতিমধ্যে ক'বার ওটাকে এফোঁড় ওফোঁড় করতে চেষ্টা করেছে, কে বলবে ?

স্বামী : তুমি তোমার নীচ মন নিয়ে অন্যকে যাচাই করছ। সে-রকম সাহস থাকলে তুমি শোবার আগে ডাক্তারের ডায়রিটা আলমারিতে চাবি বন্ধ করে আটকে রাখতে না !

স্ত্রী : আলমারি খুলেছিলাম অন্য কাজে। ডায়রি তুলে রাখার জন্যে নয়।

স্বামী : ডায়রিটা তাহলে কোথায় আড়াল করে রাখলে ?

স্ত্রী : আলমারির ভেতর নয়।

স্বামী : কোথায় রেখেছ ?

স্ত্রী : আহ্, এত চিৎকার করছ কেন ? যেখানেই রাখি না কেন তোমার নজর এড়াতে পারবে না। আমি তা চাইও না। আমার ইচ্ছে কাল সকালে কোর্টে যাবার পথে আগে তুমি সেটা ডাক্তারের হাতে পৌঁছে দিয়ে আস। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও। আলো নেবালাম।

স্বামী : বেশ।

(আলো নেবে। কয়েক ঘণ্টার বিরতিসূচক আলোহীন স্তব্ধতা। কেবল মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে নিক্ষিপ্ত টর্চের এক ফালি তীব্র আলো ঘরের যাবতীয় আসবাবপত্র স্পর্শ করে যাবে। প্রথমে রাত বারোটা, তারপর একটা, তারপর দুটো, তারপর ঢনঢন করে রাত তিনটে বাজবে। অকস্মাৎ স্তব্ধ অন্ধকার বিদীর্ণ করে স্ত্রীর এক সুউচ্চ ভয়ার্ত চিৎকার এবং সঙ্গে সঙ্গে—)

স্বামী : (প্রবলভাবে) না না না! না, আমি ছাড়ব না। ধরেছি যখন ছাড়ব না। কিছুতেই ছাড়ব না।

কণ্ঠ : (জানালার বার থেকে) ছাড়, ছাড়্। ছাইড়া দে। আমার এতদিনের পুরানা

লাঠি তোরে দিয়া যামু! তোর চোদ্দগুষ্ঠির খাতা পুড়ি। ভালা চাস্ তো ছাইড়া দে। ছা ই ড়া দে এ এ!

(খুট করে স্ত্রী বিছানার পাশের আচ্ছাদিত আলোটি জ্বালিয়ে দেন। মৃদু আলোতে দেখা গেল দীর্ঘ সরু অথচ মজবুত এক গাছা বংশদণ্ড জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে প্রসারিত হয়ে বিছানার একেবারে শেষপ্রান্তে স্পর্শ করেছে। সেই বংশদণ্ডের গোড়া ধরে যে ব্যক্তি প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে, সে আছে জানালার বাইরে। তাকে দেখা যাচ্ছে না। বংশদণ্ডের অগ্রভাগ বিছানার ওপর প্রাণপণে চেপে ধরে রেখে স্বামী গোঁ গোঁ শব্দ করছেন।)

স্ত্রী · মাগো মা, মা, ওটা কী ? কী হবে আমাদের ? এ যে চোরেব দণ্ড। তুমি কি পাগল হযে গেলে না কি ? কী করতে চাও তুমি ?

স্বামী : আমি ছাড়ব না। ওর চুরি করা আমি আজ ছুটিয়ে দেব। ব্যাটা ভেবেছে কী ?

চোব : (নেপথ্যে) ছাড়ু। ছাইড়া দে। কার ডাণ্ডা ধরছস আন্দাজ পাস নাই অখনও। ভালা চাস তো ছাইড়া দে। একদম জানে খতম কইরা ফালামু।

স্ত্রী : দোহাই তোমার ছেড়ে দাও। শেষে, কী থেকে কী হয়ে যাবে কে জানে। ওর লাঠি ছেড়ে দাও।

স্বামী : তুমি চুপ কর। ওকে আমি ছাড়ব না। ও আমাব সর্বনাশ করেছে। আমাব সর্বস্ব চুরি করেছে। আমাব জীবনের সকল শান্তি লাঠির ডগায় কবে তুলে বাইবে ফেলে দিয়েছে।

চোব : (নেপথ্যে) ঝুট! সব ঝুট বাত। সারা রাইত বরবাদ করছি। যা কামাইছি দুই দিনেব খোরাকও হইব না। ডাণ্ডা ছাইড়া দে।

স্বামী : পাষণ্ডের সাহস দেখেছ ? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হুমকি দিচ্ছে।

স্ত্রী : তুমিও তো কম যাও না। যা করবাব করেছে। চুকে গেছে। এখন ওকে তুমি কোথায় জলদি জলদি বিদায় করে দেবে, না, লাঠি চেপে ধরে ওকে আটকে রেখেছ। আজ আমাদের কপালে আরো কী দুর্ভোগ আছে কে জানে ?

স্বামী . দুর্ভোগের আর কিছু বাকি নেই। যতদূব হবার হযেছে। আমার কপাল ভেঙ্গেছে। তোমার কপাল ভেঙ্গেছে। এই লাঠিই তাব একশেষ করেছে। আমি ছাড়ব না এটাকে।

স্ত্রী : পাগলামো করো না। ছেড়ে দাও। আমার হাত-পা কাঁপছে।

স্বামী : না, আমি কিছুতেই ছাড়ব না। ব্যাটা চোর নয়, ডাকাত। ওকে আমি ফাঁসিতে লটকাব। পাষণ্ডটা আমার পোর্টফোলিও ব্যাগ লাঠির ডগায় আটকে বার করে নিয়ে গেছে। তুমি, তুমিই এ সবের জন্য দায়ী! কেন তখন পোর্টফোলিও ব্যাগটা আলমারিতে তুলে রাখলে না ?

স্ত্রী : তা তো বলবেই। তোমার শোকের কারণ বুঝতে পারছি। তোমার মিনতি রক্ষা করে তখন যদি ব্যাগটা আলমারিতে তুলে রাখতাম এখন তাহলে সুরাইয়া খানমের এতগুলো উমদা ছবি খোয়া যেত না।

স্বামী : ছবির নিকুচি করি। তোমাকে আবার বলছি। ওগুলোর একটাও সুরাইয়া খানমের ছবি নয়।

স্ত্রী : তাহলে এত বিলাপ জুড়েছ কিসের জন্যে? লাঠি ছেড়ে দাও।

স্বামী : টাকা, টাকা, টাকা। ওর মধ্যে টাকা ছিল। আমার টাকা, তোমার টাকা, সুরাইয়া খানমের টাকা ছিল ওর মধ্যে।

স্ত্রী : ছিল না। সে টাকা তুমি সুরাইয়া খানমের কবকমলে গুঁজে দিয়ে চলে এসেছিলে।

স্বামী : হায় খোদা!

স্ত্রী : মাত্র দু'তিন শ' টাকার জন্য তোমার শোক এ-রকম উথলে উঠতে আগে কখনো দেখিনি।

স্বামী : টাকা জাহান্নামে যাক! কিন্তু টাকা যে সত্যি ওই ব্যাগের মধ্যে ছিল, তা তোমাকে এখন কী করে বোঝাব?

স্ত্রী : কী বোঝাবে?

স্বামী : না, না। এ আমি হতে দেব না। কিছুতেই না। লক্ষ্মীটি তুমি একটু সাহায্য কর।

স্ত্রী : কী করব?

স্বামী : লাঠির এই মাথাটা এমনি করে বিছানার সঙ্গে ঠেসে চেপে ধবে হাতে পায়ে পেঁচিয়ে আটকে রাখ। যেন কোনোমতেই ছোটাতে না পারে।

স্ত্রী : অসম্ভব। কী করতে চাও তুমি?

স্বামী : তুমি লাঠিটা ধরে থাকবে। আমি এই ফাঁকে এক লাফে দরজাটা খুলে নরাধমকে বমাল গ্রেপ্তার করতে চাই। এ ছাড়া আমার মুক্তি নেই।

স্ত্রী : না। সে তুমি করতে পার না। তোমাকে কিছুতেই আমি ও-রকম কাজ করতে দেব না। যদি ওর সঙ্গে ছোরাছুরি কিছু থাকে?

স্বামী : তোমার তাতে কী এসে যায়? আমাকে ছেড়ে দাও তুমি।

স্ত্রী : না। তোমাকে এই অন্ধকারের মধ্যে আমি কিছুতেই বাইরে যেতে দেব না।

চোর : (নেপথ্যে) চুপ! চিল্লামিল্লি বার কইরা রাইতেরে দিন বানাইয়া ফালাইল। আরেকবার সোরগোল মচাইলে ডাহা পাত্থর মাইরা ঠাণ্ডা কইরা দিমু।

স্ত্রী : ওগো তোমার পায়ে পড়ি। ছেড়ে দাও। লাঠি ছেড়ে দাও। আমি সব বিশ্বাস করব। যা বলবে সব একিন যাব। টাকা খোয়া যায়, যাক। লাঠি ছেড়ে দাও। ডাকাতটাকে যেতে দাও।

চোর : (নেপথ্যে) ধর, ধর! এই ল তোব প্যাটফোলা ব্যাগ। লইয়া কলিজা ঠাণ্ডা কর। হল্লা কবিস না। লাঠি ছাইড়া দে।

(অদৃশ্য চোর জানালার শিকেব ফাঁক দিয়ে পোর্টফোলিও ব্যগটা ঘরেব মধ্যে ছুঁড়ে মারে। স্তম্ভিত স্বামী-স্ত্রীব হাতেব মুঠো মুহূর্তের জন্য শিথিল হতেই নেপথ্যের চোর একটানে সড়াৎ কবে বংশদণ্ডটি বার কবে নিযে যায়।)

স্ত্রী : ওহ এ যাত্রা আল্লাহ্ খুব বাঁচিয়েছেন। কী সাংঘাতিক চোরের বাবা! যাক, আপদ যে গেছে এ মস্ত সৌভাগ্য। কী বল ?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : তুমি যে একেবারে ভালো করে গুছিয়ে বসলে, শোবে না আব ?

স্বামী : হুঁ।

স্ত্রী : দেখ, কী রকম হুকুম তামিল করছি। আব তোমাব কথাব অমর্যাদা করব না! পোর্টফোলিও ব্যগটা আগে আলমাবিতে তুলে বাখি, তাবপর শোব।

স্বামী : তাব কোনো দবকার নেই।

স্ত্রী : তাব মানে ?

স্বামী : তুমি কি ভেবেছ বদমায়েশটা টাকাসুদ্ধ ব্যাগ ফেবত পাঠিয়ে দিল ? নিশ্চয়ই আগে টাকা সবিয়ে বেখে পবে খালি ব্যাগটা আমাদেব নাকেব ডগার ওপব ছুঁড়ে মেবেছে।

স্ত্রী : ওহ! ও..! (কী যেন ভাবেন) তা হোক। তবু আমি তুলে রাখি। টাকা না থাক। তোমাব দবকাবি কত নথিপত্র ওব মধ্যে রয়েছে। সেগুলোও তো কম মূল্যবান নয়!

(আলমাবি খুলে ব্যগটা ভেতবে তুলে বাখলেন।)

স্বামী : আরো কী কী খোয়া গেছে একবাব ভালো করে দেখে নিয়েছ ?

স্ত্রী : আবে তাই তো। কী সর্বনাশ!

স্বামী : কেন, কী হয়েছে ? কী চুরি গেছে ?

স্ত্রী : ছি ছি কী কেলেঙ্কাবি! ব্যাটা নচ্ছার পাজি আহাম্মক ছিঁচকে চোব, তুই শেষে কি না আমার এত বড় সর্বনাশ কবলি ?

স্বামী : কী, কী নিয়েছে ?

স্ত্রী : আলনায় ঝোলানো তোমাব শার্টটা।

স্বামী : ওহ্। তা যাক। আব কিছু যায়নি তো ? আমি তো বলি খুব অল্পেব ওপব দিয়ে গেছে। ও-কী, তুমি ও-রকম থম ধবে বসে বয়েছ কেন ? আমার জামার শোকে মুষড়ে পড়লে ?

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী : আচ্ছা পাগলী মেয়ে তো!

স্ত্রী : হুঁ।

স্বামী . ওর পকেটে কিছু রেখেছিলে নাকি ?

স্ত্রী : হুঁ। কিন্তু সে কথা এখন তোমার কাছে প্রমাণ কবব কী কবে ?

স্বামী : তোমার মুখের কথাতেই একিন যাব।

স্ত্রী : ডায়রিটা তোমাব ঐ শার্টেব পকেটে রেখে দিয়েছিলাম।

স্বামী : ওহ' ও-' (কী ভেবে নিয়ে) তা হোক। বেশ করেছিলে। আপদ চুকে গেছে। ভালোই হয়েছে।

স্ত্রী মনে করেছিলাম শার্টের পকেটে বাখলে, তোমার কিছুতেই আর ভুল হবে না। কোর্টে যাবাব পথে অবশ্যই মনে কবে ডাক্তারকে ফেরত দিযে দিতে পাবরে।

স্বামী : না পাবলাম। কী এসে যায় তাতে ?

স্ত্রী : এটাও ভেবেছিলাম যে পকেটে যখন থাকবে তখন এক সুযোগে নিশ্চয়ই তুমিও সবটা ডায়বি তন্নতন্ন কবে কেটেচিবে পড়ে নিতে পাবরে। এখন তাব কী উপায় হবে ?

স্বামী পা গ ল' কী আব থাকবে ওসব ডাক্তাবেব ডাযবিতে। বোগীব কথায় ভব' অসুখ আব ঘা আব প্রলাপেব ফিবিস্তি কে পড়তে চেয়েছে ওসব কেতাব। পবেব ডাযবি আমি কেন পড়তে যাব ? পাগল হয়েছ তুমি ? চুবি গেছে, বেশ হয়েছে। এখন শোবে না কি বল, বাতিটা নিভিয়ে দি।

স্ত্রী হুঁ।

[আলো নির্বাপিত]

যবনিকা

দণ্ডধর

চরিত্র

অধ্যাপক হোসেন আমিন

আমিন

সেলিম

প্রম্পটার

জাহানারা

রোকেয়া

(একটা টেবিলের ওপব ঝুঁকে পড়ে জাহানারা কিছু লিখছে বা দেখছে। পাশে বই খাতা রুমাল থলি ইত্যাদি। প্রবেশ করবে আমিন।)

আমিন : কেউ আসেনি এখনো ?

জাহান : আমাকে কি আদৌ দেখতে পাচ্ছেন না নাকি ?

আমিন : আর সবাই কোথায় ?

জাহান : কাব চোখে ধূলো দিতে চেষ্টা কবছেন ?

আমিন : আপনাব হচ্ছে পাখিব চোখ। গায়ের জোবে ছুঁড়ে মারলেও অত উঁচুতে উঠে ধুলো আপনাব চোখ ঢেকে দিতে পাববে না।

জাহান : আপনাব আজকালকাব কাণ্ডকারখানা বুঝে উঠবার জন্য শ্যেনদৃষ্টিব প্রয়োজন হয় না।

আমিন : আমাকে মাফ কববেন। আমি অত রূঢ় হতে চাইনি। আপনাব চোখ সত্যি সুন্দর। আলমাস, সেলিম, স্যার-- এঁরা কেউ আসেননি এখনো ?

জাহান : ফিকিবে আছেন একজনেব, খামোখা দশজনের খোঁজ করছেন কেন ?

আমিন : হাব মানলাম। রোকেয়া কোথায ?

জাহান : আমরা নাটকেব মহড়া দিতে এসেছি! আপনিও জানেন যে এই নাটকে রোকেয়াই একমাত্র চবিত্র নয়। অথচ এমন ভান করছেন যে সে না এলে এক্ষুণি গ্রহ-নক্ষত্র সব চ্যুত হয়ে পড়বে।

আমিন : বোকেয়া দেরি কবছে কেন ?

জাহান : সে তো শুধু নাটকেব মহড়া দিতে আসে না, কিছু জীবনেব কাজও গুছিয়ে নিতে চায়। ক্লাস কবে হস্টেলে ফিবে গেছে। গা ধোবে, চুল বাঁধবে, গয়না পরবে, রং মাখবে, তবে না তার আসবার অবকাশ হবে। ফার্স্ট ইয়ারের একবত্তি কচি মেয়ে, সবাই মিলে অতিরিক্ত মনোযোগ দিয়ে মেয়েটাকে নষ্ট কবে ফেললেন!

আমিন : বোকেয়া এখনো নিতান্ত সাদাসিধা মেয়ে। আজকাল ও কাব ইচ্ছেয় সাজগোজের দিকে এতটা ঝুকেছে সে আপনি ভালো করে জানেন।

জাহান : কাব ইচ্ছেয় ?

আমিন : পবিচালকের।

জাহান : এই সরলা অবলাকে কে চালাচ্ছে ?

আমিন : যিনি আমাকে আপনাকে চালাচ্ছেন, বোকেয়াকেও তিনি চালাচ্ছেন। আমি নই, প্রফেসর হোসেন নাটক পবিচালনা করছেন। তিনি ববাবর বলেছেন

যে আমাদের নাটকের নায়িকা হলো বিদ্যুৎময়ী প্রখরা রমণী। চলতে ফিরতে তড়িৎপ্রবাহ বিকীরণ করে। প্রসাধনে দৃষ্টিশোষণকারী, কথনে মর্মভেদী।

জাহান : আপনি কাকে বর্ণনা করছেন ? ইউনিভার্সিটির রোকেয়াকে না নাটকের নায়িকাকে ? আপনার আবেগের প্রবলতায় আমি খেই হারিয়ে ফেলেছি।

আমিন : অবশ্যই নাটকের নায়িকাকে। রোকেয়ার স্বভাব ও শোভা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। বিপরীত বলেই প্রফেসর ওকে এই ভূমিকার জন্য বেছে নিয়েছেন এবং এই উপদেশ দিয়েছেন যে ও যেন নাটক শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ নিজেকে একটা মহড়ার মধ্যে চালু রাখে। প্রসাধনে অতিযত্ন এই সাধনারই অঙ্গ, অভিনয়ে সাফল্য লাভ করবার জন্য একটা কৌশলের চর্চা মাত্র।

জাহান : আপনি প্রকারান্তরে আমার রূপ ও ব্যক্তিত্বের এতটা প্রশংসা করে ফেলেছেন যে অনেকদিন পর আবার আপনার ওপর মনটা প্রসন্ন হয়ে উঠতে শুরু করেছে।

আমিন : রক্ষা করুন। আজকাল আপনার বিরূপতার চেয়ে আপনার প্রসন্নতাকে বেশি ভয় করি। কিন্তু সে যাই হোক অজ্ঞাতসারে এমন কী অপরাধ করেছি বলুন, যার জন্য হঠাৎ আমার প্রতি আপনার দৃষ্টিকে এত প্রসন্ন করে তুলেছেন

জাহান : আপনি ভীত চাটুকার। এত অলক্ষ্যে স্তবস্তুতি করেন যে খুব সতর্ক না থাকলে কখন কী হারাব নিজেই টের পাব না।

আমিন : আপনার কী স্তবস্তুতি করেছি, মেহেরবানি করে, সে কথাটা অন্য কারো কাছে রটাবার আগে আমাকে জানতে দিন।

জাহান : প্রফেসর হোসেনের শিল্পী নির্বাচনের রীতি হলো সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের মানুষকে বেছে নেয়া। রোকেয়ার নজির দেখিয়ে কথাটা আপনি আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন।

আমিন : তাতে কী অপরাধ হয়েছে ?

জাহান : অনিবার্যভাবে মনের মধ্যে আরেকটা তুলনা এর পাশাপাশি মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমাকে নির্বাচন করা হয়েছে মায়ের ভূমিকার জন্য। যিনি নাটকে মিতবাক, অনস্থির এবং প্রৌঢ়া। কারণ জীবনে আমি মুখরা চঞ্চলা খরযৌবনা। আরো কাব্য করে আপনার মনের কথায় গেঁথে গেঁথে [illegible] পারি · বিদ্যুৎময়ী প্রখরা রমণী। চলতে ফিরতে তড়িৎ-প্রবাহ [illegible] করি। প্রসাধনে দৃষ্টি শোষণকারী, কথনে মর্মভেদী।

আমিন : আমার আপনার মধ্যে এখন আর এ ধরনের সংলাপ প্রশ্রয় [illegible] উচিত নয়।

জাহান : এর চেয়ে শতগুণ গর্হিত কথা অবলীলাক্রমে দীর্ঘকাল [illegible] আউড়ে এসে এখন আচমকা বিশুদ্ধবাদী সাজলে চলবে কেন।

আমিন : সে অনেক দিন আগের কথা।

জাহান : ছমাস একবছরের বেশি আগের কথা নয়।

আমিন : তাকে আমরা অতিক্রম করে এসেছি। দু'জনেই তাকে পেছনে ফেলে অনেক দূর সামনে এগিয়ে গেছি। এখন শুধু স্মৃতির বোঝা বয়ে আরো সামনে এগুবার পথকে ভারাক্রান্ত করে তোলা কেন?

জাহান : কিছু স্মৃতি ভারী পাজি। ভারী একরোখা। কিছুতেই পোষ মানে না। মনের এক প্রান্ত থেকে তাড়িয়ে দিলে অন্য প্রান্তে গিয়ে হানা দেয়। ঝেড়ে ফেলে দি। উঠে আঁকড়ে ধরে। জ্বালা সুখ দুইই বাড়ে

আমিন : আজ আমি তোমার কেউ নই। তোমার জন্য আমি আজ অতি সাধারণ, অতি সামান্য, অতি ক্ষুদ্র। আমার সঙ্গে জড়িত স্মৃতিকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ কর।

জাহান : করব। তার খুব বেশি দেরি নেই।

আমিন : তাড়াতাড়ি কর।

জাহান : কেন রোকেয়ার মনে বাধো বাধো ঠেকছে?

আমিন : ও সব জানে।

জাহান : এই গুণেইতো মন ভোলাও। তুমি যদি আরেকটু স্থূল আরেকটু ইতর এবং কদর্য হতে তাহলে দেখতে কত অসংকোচে তোমাকে পথের ধুলোয় ফেলে রেখে সামনে এগিয়ে চলে যেতাম

আমিন : এখন থেকে তাই হব

জাহান : ভাব হব, কিন্তু পার না। চলে যাবার সময়েও ছলনার আশ্রয় নাও। মৃদু কণ্ঠে কথা বল, অন্তরাল থেকে বন্দনা কর, পেছন থেকে টেনে রাখ

আমিন : সে আমি নই, অন্য কেউ।

জাহান : তখন সব মিথ্যা জেনেও কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়ি। নিজের অজান্তে মোহ বিস্তারে উদ্যোগী হই। একটা প্রচ্ছন্ন আশায় শত কলায় লীলায়িত হয়ে উঠি। লজ্জায় মরে যাই

আমিন : এবার থেকে আমার নির্লজ্জতা ও নৃশংসতার দ্বারা তোমার লজ্জা হরণ করে নেব। তুমি সেলিমকে গ্রহণ কর।

জাহান : তার হয়ে উমেদারি করবার তুমি কে?

আমিন : সেলিম সুপুরুষ। বড়লোক বাপ-মা'র একমাত্র ছেলে। তোমাকে ছাড়া অন্য মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায় না।

জাহান : তাতে তোমার স্বার্থ কী?

আমিন : সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে এই সেকেন্ড ইয়ার এম.এ. ক্লাস পর্যন্ত চার বছর ধরে সে কেবলমাত্র তোমাকে পাবার জন্যই তপস্যা করে আসছে। তোমার উপেক্ষা সে গায়ে মাখেনি, করুণায় অপমানিত বোধ

করেনি, প্রত্যাখ্যানে দমে যায়নি। ওর সৌরজগতে তুমিই একমাত্র জ্যোতিষ্ক। ওকে আর দগ্ধে মেরো না। ধরা দাও। সুখী হও।

জাহান : তোমার মতলব আমি বুঝি। তুমি চাও অবাধ হতে। চাও রোকেয়ার দ্বিধাকে নিষ্কন্টক করতে। চাও যে করে হোক আমাকে পার করে দিতে।

আমিন : আমি জানি তুমি সেলিমকে অপছন্দ কর না। তোমাকে দর্শন করা মাত্র ওর চোখে যে আলো নেচে ওঠে তা তুমি লক্ষ করতে ভুলে যাও না। তুমি যখন ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াও তখন ওর নিঃশ্বাসের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অনুভব করে তুমি পুলকিত হও। ওর সুকুমার চিত্ত থেকে ঝরে পড়া স্তুতি-বন্দনার প্রতি কণা তুমি গোপনে গোপনে কৃপণের মতো সঞ্চয় করে রাখ। আমার চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করো না। ওকে গ্রহণ কর।

জাহান : তুমি ভেবেছ কী ? তোমাকে আমি কিছুতেই এত সহজে নিষ্কৃতি দেব না। তোমার গা ঘেঁষে বসব। তোমাকে কটাক্ষে দেখব। প্রতি বাক্যে ও আচরণে অন্তরঙ্গতার এমন একটা কলঙ্কবর্জিত পশ্চাৎপট উন্মোচিত করব যে তার স্বাদ পেয়ে তুমি স্তব্ধ হয়ে যাবে, রোকেয়ার সর্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠবে।

আমিন : আসুন, এবার মহড়া শুরু করা যাক।

জাহান : সবাই এসে গেছে নাকি ?

আমিন : জানি না।

জাহান : পরিচালক নেই, কার নির্দেশ অনুযায়ী অভিনয় করব ?

আমিন : অভিনেতাদের জন্য ওঁর নির্দেশতো একটাই। নাটক নাকি জীবন নয়। যার যার জীবনকে বর্জন করে নাটকে প্রবেশ করতে হবে। ওঁর মতে মঞ্চে কখনো বাঁচতে চেষ্টা করা উচিত নয়। তাহলেই নাকি মরণ ঘনিয়ে আসে। মঞ্চে কেবল অভিনয় করে যেতে হবে। তাই নির্দেশ দিয়েছেন যে আমরা যেন কখনোই কোনো রকম মেক-আপ ছাড়া অভিনয় না করি। এমনকি মহড়ার সময়েও নয়।

জাহান : জানি।

আমিন : আমি পরচুলা লাগিয়ে নিচ্ছি। আর দেরি করতে চাই না।

জাহান : প্রম্পটার কোথায় ?

আমিন : আজ বাদে কাল নাটক, এখনো প্রম্পটারের প্রয়োজন হবে ? আমার অংশ আমার মুখস্থ হয়ে গেছে। আরম্ভ করুন, দেখবেন আপনারটাও শেখা হয়ে গেছে।

(আমিন ঘুরে দাঁড়িয়ে থলি থেকে বৃদ্ধ পিতার উপযুক্ত পরচুলের দাঁড়িগোফ লাগিয়ে নেয়। লাঠিটা হাতে বাগিয়ে ধরে। তারপর গর্জন করে ওঠে।)

"তুমি কী ? বলতে পার তুমি কী ? আজ পঁচিশ বছর ধরে ঘরসংসার করছ

তবু আজও না পেলে নিজের মনের দিশা, না পারলে নিজের মেয়ের মনের রাশ টেনে রাখতে! একবার বললে জামাই যেন অধ্যাপক হয়, আহা মেয়ের আমার যা লেখাপড়ার নেশা! আবার বললে, না জামাই হবে সি-এস-পি, কত আর্দালি পিওন নাতি-নাতনীর খবরদারি করবে। আবার বললে, জামাই যেন শিল্পপতি হয়, মেয়ের আমার সোনাদানার বাসনা কিছুই অপূর্ণ থাকবে না। ম্যাট্রিকের বছর তুমি বললে, এখন থাক, পরীক্ষা শেষ হবার পর কথাবার্তা চালানো যাবে। আই.এ পাশ করার পর মেয়ে নিজেই বেঁকে বসল। বলল, গ্রাজুয়েট না হয়ে শ্বশুর-শ্বাশুড়ির পদসেবায় নিযুক্ত হতে পারবে না। তুমি এদিকেও চোখ টিপলে, ওদিকেও ঘাড় নাড়ালে। এখন জান সে মেয়ে কী করতে চায়? জান, লোকজন তার সম্বন্ধে কী কথা রটাচ্ছে? জান, তোমার কথা লোকে কী বলছে? চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও, জবাব দাও।"

জাহান : (অনেকক্ষণ বিস্ফারিত চোখে মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিল। তারপর কলকল করে হেসে ওঠে।) অসম্ভব! আমার বর্তমান মানসিক অবস্থায় আপনাকে আমার প্রবীণ স্বামী বলে কল্পনা করা কঠিন। অভিনয়ের খাতিরেও এতটা সহ্য করতে পারব না। আপনি অনবদ্য অভিনয় করছেন। আরো কিছুক্ষণ একলাই মহড়া দিন। আমি ইতিমধ্যে হাতমুখ ধুয়ে শাড়িটা পাল্টে আসি। আপনার দাঁড়ি-গোঁফের সঙ্গে মানানো চাই তো!

(জাহানারা উঠে চলে যাবে। বই খাতাগুলো পড়ে থাকবে। আমিন লাঠিতে থুতনি ভর করে বসে থাকে। ভাবে। ধীরে ধীরে মাথা নিচু করে মঞ্চে প্রবেশ করে রোকেয়া। সে মনে করে মহড়া চলছে।)

রোকেয়া : "তুমি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছ বাবা?"

(আমিন চমকে ওঠে। আনন্দিত হয়। তারপর বুঝতে পারে যে রোকেয়া নাটকের মহড়া দিচ্ছে।)

আমিন : "হ্যাঁ, তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে। বস ঢাকা থেকে তোমাকে কেন টেলিগ্রাম করিয়ে এনেছি তা তুমি জান?"

রোকেয়া : "না।"

আমিন "তোমার মা তোমাকে কিছু বলেননি?"

রোকেয়া : "আসার পর মা আমার সঙ্গে একটা কথাও বলেননি। মনে হলো সবাই যেন অপেক্ষা করছে আপনি কী বলেন শোনার জন্য।"

আমিন : "দু'দিন হোস্টেলে থেকে তোমার মেরুদাঁড়া বেশি খাড়া হয়ে গেছে। গলার স্বর চড়ে গেছে। তোমার বিয়ে সম্পর্কে দু'একটা কথা বলবার জন্য তোমাকে ঢাকা থেকে ডাকিয়ে এনেছি।"

রোকেয়া : "জি।"

আমিন : "গত দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে তোমার বিয়ের একাধিক ভালো ভালো প্রস্তাব

এসেছে। প্রতি বছরই তোমার মা বা তুমি একটা না একটা ছুতোনাতো করে সেটা ঠেকিয়ে রেখেছ। যৌবনে স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলাম। তোমরা মায়ে-ঝিয়ে মিলে আমার সে বিমূঢ়তার পরিণামকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ কিন্তু আর নয়। নিজেকে আমি পাহাড়ের মতো কঠিন আর ঠাণ্ডা করে নিয়েছি। তোমাকে কয়েকটা সোজা কথা জিজ্ঞাসা করব সোজাসুজি জবাব দেবে।"

রোকেয়া : "জ্বি "

আমিন : "সমাজের আরো পাঁচজন অবসরপ্রাপ্ত মান্যব্যক্তির সঙ্গে আমাকে ওঠবস করতে হয়। সন্ধের সময় কোনো মজলিসে একত্রিত হলে কে কার মেয়েকে কোথায় বিয়ে দেবে স্থির করেছেন তাই নিয়ে আলোচনা করেন। নানা রকম দোষগুণ বিচার করে ভালো সম্বন্ধটি বেছে নেন। সহায়-সম্বলহীন আতুরের মতো আমি এক কোণে মাথা নিচু করে পড়ে থাকি। আমার মেয়ে সম্পর্কে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে নানা হেকমতে কথা ঘোরাতে চেষ্টা করি। যারা জানে তারা আধা ঠাট্টা আধা করুণা মিশিয়ে বলে : 'আপনার কী! মেয়ে আপনার লেখাপড়া জানা আলো পাওয়া মেয়ে। তাঁর ভবিষ্যতের জন্য বুড়ো বাপকে ভেবে মরতে হবে কেন ?' লজ্জায় অপমানে আমার মাথা মাটিতে মিশে যেতে চায়।"

রোকেয়া : "আমাকে কী করতে বলেন ?"

আমিন : "এবার ঢাকা যাবার আগে তুমি আমাকে স্পষ্ট বলে দিয়ে যাবে যে তোমার বিয়ের কথাবার্তা এখন থেকে আমি চালাতে পারি কি না ?"

রোকেয়া : "না।"

আমিন : "না ? না মানে কী ? এখন নয়, এই তোমার ইচ্ছে ? তাহলে তোমাকে বলে যেতে হবে কখন থেকে ? আজ না হয় কাল, না হয় পরশু, বল, বলে দাও, আমি-- তোমার পিতা, কোন দিন থেকে তোমার বিয়ের কথাবার্তায় অগ্রসর হতে পারি ? বল, কথা বল। চুপ করে রইলে কেন ? জবাব দাও।"

রোকেয়া : "না।"

আমিন : "না! মানে কী ?"

রোকেয়া : "কোনো দিন নয়। কোনো দিন নয়। আমার বিয়ে আমি করব। দিন আমি ঠিক করব মানুষ আমি বেছে নেব। আব্বা! আব্বা!"

(উপুড় হয়ে টেবিলে মাথা গুঁজে রোকেয়া প্রবল বেগে কাঁদতে থাকে। রোকেয়া বেসামাল হয়ে কাঁদে। আমিন একটু বিব্রত বোধ করে। উইংসের আড়াল থেকে নাটকের কপি হাতে নিয়ে অবাক দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে প্রম্পটার। একবার রোকেয়ার ক্রন্দনোচ্ছ্বাস দেখে, আর একবার হাতের পাণ্ডুলিপি উল্টেপাল্টে হয়রান হয়ে যায়। ইশারায় আমিনকে যেন জিজ্ঞেস করতে চায় ; এ কান্নার কথা কোথায় লেখা আছে, কোত্থেকে এলো ইত্যাদি। আমিন তৎক্ষণাৎ তার দাড়ি গোঁফ

খুলে ফেলেছে। হাতের ইশারায় প্রম্পটারকে মঞ্চের আড়ালে ফেরত পাঠিয়ে দেয়)।

আমিন : রোকেয়া! রোকেয়া! আমি আমিন কথা বলছি। এত কাঁদছ কেন?

রোকেয়া : পারব না। পারব না। এসব কথা আমি কখনোই বলতে পারব না।

আমিন : কে বললে পারবে না। অতি চমৎকার করে বলেছ। প্রফেসর হোসেন শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতেন।

রোকেয়া : অভিনয়ে হয়তো পারব। কিন্তু জীবনে পারব না। কোনোদিন পারব না। আমি আমার বাবাকে এসব কুৎসিত কথা কোনোদিন বলতে পারব না।

আমিন : তোমার বাবা কি তোমাকে কিছু বলেছেন?

রোকেয়া : যে-রকম করে এইমাত্র তুমি বললে, এত কঠিন করে আমার বাবা আমাকে কোনোদিন বকেননি।

আমিন : সে তো খুব আনন্দের কথা। তাহলে কাঁদছ কেন?

রোকেয়া : সে-জন্যই কাঁদছি। যদি বাবা আমার নির্মম হতেন, অবুঝ হতেন, রূঢ় হতেন তাহলে কাঁদতাম না। নির্বিকার চিত্তে যা করবার করে যেতাম। কার কী হলো না হলো তার জন্য ভ্রূক্ষেপ করতাম না।

আমিন : একটা বিরোধ দেখা দেবেই এমন কথা ভাবছ কেন?

রোকেয়া : আজ সকালবেলা বাবা হঠাৎ ঢাকা এসেছেন। খালার ওখানে উঠেছেন রিহার্সেল শেষ করে আমাকেও ওখানে যেতে হবে।

আমিন : কী জন্য এসেছেন জানতে পেরেছ কিছু?

রোকেয়া : বড় আপা আমাকে চিঠি লিখে সব জানিয়েছেন। আমার বিয়ের একটা ভালো প্রস্তাব এসেছে। সেটা খুব পছন্দ হওয়াতে বাবা ঢাকা ছুটে এসেছেন আমার মন বুঝে দেখবার জন্য।

আমিন : ভালো করে বুঝিয়ে দাও

রোকেয়া : পারতাম, যদি উনি নাটকে তোমার মতো চিৎকার করে কথা বলতেন, রাগে গরগর করে উঠতেন— তাহলে সহজেই পারতাম।

আমিন : উনি কী করবেন?

রোকেয়া : আমাকে কাছে টেনে নিয়ে হয়তো খুব আদর করে বলবেন : 'মা একটা ভালো জায়গায় তোমার বিয়ে ঠিক করতে আমার খুব সাধ জেগেছে। তুমি যদি অমত না কর তাহলে আমি কথাবার্তায় এগুই আর যদি তুমি ইতিমধ্যে অন্য কিছু স্থির করে থাক, আমাকে বল। লজ্জা কী মা, বল।'

আমিন : লজ্জা করবে কেন? অকপটে সব বলবে। তোমার বাবা অতি চমৎকার মানুষ।

রোকেয়া : কী বলব?

আমিন : কেন, মনে মনে যা স্থির করেছ তাই বলবে।

রোকেয়া : আমি মনে মনে কী স্থির করেছি ?

আমিন : আমাব কথা বলবে।

রোকেযা : কেন ?

আমিন : কারণ, আমার চিত্তও কেবল তোমাতেই স্থির!

রোকেয়া . এই অমূল্য চিত্ত কিছুদিন আগে জাহানাবা আপাকে অর্পণ করেছিলে। ফেবত আনলে কখন ?

আমিন : কেন বাববাব এই একটি প্রশ্ন তুলছ ? তোমার কাছ থেকে আমি কিছুই লুকিযে বাখিনি। আমার সে স্বভাব নয়। সকল অতীত চিরকাল সত্য হযে টিকে থাকে না।

বোকেয়া তোমার দিক থেকে হযতো সে সম্পর্ক টুটে গেছে। কিম্বা টুটে যাক এই তুমি চাও। কিন্তু জাহানারা আপা যদি সেটা টিকিয়ে রাখতে চান, তার কী উপায় হবে ? আমি যা চাই তা আমি অন্যের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেব কেন ? আমি এমনি পেতে চাই।

আমিন : কে বলেছে যে তুমি আমাকে কেড়ে নিতে চাইছ। আমাকে কেউ অধিকার করে নেই। আমি কারো সঙ্গে গ্রথিত নই। আমি ছিন্নমূল, আমি উদ্বাস্তু। এই বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডে কেবল তোমাকেই পেতে চাই, একান্ত কবে তোমারই হতে চাই।

বোকেয়া · জাহানাবা আপা কোথায় ?

আমিন . জাহান্নামে!

বোকেয়া : তুমি চটে যাচ্ছ কেন ? হঠাৎ জাহানারা আপাব বইখাতাগুলো হাতে ঠেকে যাওয়াতে আনমনে প্রশ্নটা করে ফেলেছি।

আমিন : আনমনে তুমি অন্য কোনো প্রশ্ন খুঁজে বার করতে পারলে না ? তুমি সন্দেহ কব যে তোমাব জাহানারা আপা আমার সারা হৃদয়ে এমন স্থায়ীভাবে চাবিযে গেছেন যে, কোনো সময়েই তিনি আমার মন থেকে বেশি দূবে অবস্থিত নন।

রোকেয়া : ঘুণাক্ষরেও এসব কথা আমার মনে আসেনি।

আমিন : একশ'বার এসেছে। এবং যখন এসেছে তখন আরো কিছু কথা শুনে রাখ : তোমাকে ভালোবাসি বলে এই মর্ত্যভূমির বাদবাকি সকল ভদ্র মহিলারা আমাব চোখে নিতান্ত হিড়িম্বা শূর্পনখা সদৃশ মনে হচ্ছে এমন কথা স্বপ্নেও ভেব না। তোমার জাহানারা আপা আজ আমার সঙ্গে যত নিঃসম্পর্কিতই হন না কেন, আমি তাকে রূপবতী গুণবতী বলে শ্রদ্ধা জানাতে কোনো সময় কার্পণ্য করব না।

রোকেয়া : সে-রকম অনুরোধ আমি তোমাকে কখনো করিনি। তুমি আমাকে অযথা অপমান করতে চেষ্টা করছ।

আমিন : একশ' বার করব। কোথাকার কোন জাহানারা আপার সঙ্গে একজোট হয়ে তুমি আমাকে দগ্ধে মারবে আর আমি তোমাকে একটু অপমানও করতে পারব না ?

রোকেয়া : আমাকে তুমি কী করতে বল ?

আমিন : একটু আগে অভিনয়ের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে যে প্রদীপ্ত বাক্যগুলো উচ্চারণ করেছিলে বাড়ি গিয়ে চোখ বন্ধ করে সেগুলোই আরেকবার আউড়ে দিও। কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

রোকেয়া : অসম্ভব। সে আমি পারব না।

আমিন : তাহলে আর মিছেমিছি নাকি কান্না জুড়ে দিয়েছ কেন ? মাথায় পাগড়ি এঁটে নিজেই কাজি সাহেব বনে যাও। তোমার জাহানারা আপার হাতের মধ্যে আমার হাত গুঁজে দিয়ে কলমা পড়ে দেবে, সব ল্যাঠ্যা চুকে যাবে। তোমার চিন্তা স্থির হবে, তুমি শান্ত হতে পারবে।

রোকেয়া : (কাঁদতে কাঁদতে) পারব না। পারব না। যা স্থির করিনি ছল করে সে কথা আমি বাবাকে কিছুতেই বলতে পারব না।

আমিন : কেন স্থির করনি ? কে তোমাকে ধরে রেখেছে ? তুমি কি লক্ষ করনি যে সেলিম আজকাল জাহানারার একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেও থরথর করে কাঁপতে থাকে না, ওর চোখের জ্যোতি কমে যায় না, বেবাক বুদ্ধি একসঙ্গে লোপ পায় না। আশ্বাসের একটা পারস্পরিক বিনিময় না ঘটে থাকলে, চার বছর পর হঠাৎ সেলিমের এই আত্মপ্রত্যয় এই সপ্রতিভ ডগমগ ভাব কোথ্থেকে এলো।

রোকেয়া : এ তোমার অনুমান। কিছু স্থির হয়ে থাকলে জাহানারা আপা অবশ্যই আমাকে বলতেন।

আমিন : তোমাকে বলেননি, আমাকে বলেছেন।

রোকেয়া : মিছে কথা। আমাকে কচি খুকি পেয়েছ ? স্থির যে হয়ে গেছে তার প্রমাণ কী ?

আমিন : ঠিক কোন্ বিশেষ মুহূর্তে সব কিছু স্থির হয়ে যায় কে হলপ করে বলতে পারে ? যারা স্থির করে তারাও টের পায় না কখন সে লগ্ন এলো আর কখন কোথায় চলে গেল। কেবল তার চিহ্ন পড়ে থাকে কোনো কম্পনে, কোনো উষ্ণতায়, কোনো সৌরভে। তুমি যদি দেখতে না চাও আমি তোমাকে সে বস্তু দেখাব কী করে!

রোকেয়া : আমি মেয়ে। প্রমাণ আরো স্থূল, আরো প্রত্যক্ষ, আরো চাক্ষুষ না হলে আমার মন তুষ্ট হবে না।

আমিন : বেশ তাই হবে।

রোকেয়া : কী হবে ?

আমিন : আমি যে মুক্ত, নিঃসম্পর্কিত এবং তোমার জাহানারা আপা যে অন্যত্র বদ্ধ

ও শৃংখলিত তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ তোমার সামনে হাজির করব।

রোকেয়া : কখন ?

আমিন : আজকে রাতের মধ্যেই। মহড়া শেষ হবার আগে। যাতে তোমাকে তোমার বাবার সামনে মিথ্যা মিথ্যাচারের দোষে কলংকিত হতে না হয়।

রোকেয়া : তোমার কথা শুনে আমার কেমন যেন ভয় করছে

আমিন : তোমার ভয় পাওয়া উচিত।

রোকেয়া : কী করে করবে ?

আমিন : এখনো জানি না।

রোকেয়া : তার মানে ?

আমিন : শুধু জানি করব। খুন রাহাজানি ষড়যন্ত্র নরহত্যা কোনো কর্মে পিছপা হব না। যে-কোনো উপায়ে হোক কার্যোদ্ধার করবই। তোমার সংশয় দূর করব। তোমার অতিনীতি-পরায়ণতাকে তুষ্ট করব তোমার পিতৃভক্তি জাহির করবার মিনার রচনা করে দেব।

(পেছন থেকে প্রম্পটার বেরিয়ে এসে আমিনকে ইশারা করে মঞ্চের বাইরের দিকে আঙুল তুলে কী দেখায় এবং উপযুক্ত অঙ্গভঙ্গি দ্বারা বোঝাতে চেষ্টা করে যে চশমাধারী পাইপধরা হোমরা চোমরা কোনো ব্যক্তি বিশেষ আসছেন। আমিন ক্ষিপ্র গতিতে আবার দাড়ি গোঁফ লাগিয়ে লাঠি বাগিয়ে গর্জন করে ওঠে।)

"না ? না মানে কী ? এখন নয়, এই তোমার ইচ্ছে ? তাহলে তোমাকে স্পষ্ট করে বলতে হবে কখন থেকে ?'

(ধীরে ধীরে মঞ্চে প্রবেশ করেছে পরিচালক অধ্যাপক হোসেন মোটাসোটা ভদ্রলোক, পুরু চশমা চোখে, মুখে পাইপ। পরনে আদ্দির কাজ করা পাঞ্জাবি। পায়ে কাজ করা নাগরা। রোকেয়া টেবিলের ওপর উপুড় হয়ে কাদছে।)

"আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু। তবু বল, বলে দাও, আমি তোমার পিতা—করে, কোন দিন থেকে তোমার বিয়ের কথাবার্তায় অগ্রসর হতে পারি। বল। কথা বল চুপ করে রইলে কেন ? জবাব দাও।"

অধ্যাপক : বেশ বেশ হয়েছে। (রোকেয়াকে তখনও কাদতে দেখে প্রম্পটারের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে আরেকবার ভালো করে দেখে) তুমি কি একটু বেশি কাদছ না রোকেয়া ? এ জায়গাটা অবশ্য দু'রকমেই করা যায়। কেঁদে এবং না কেঁদে। আমি না কেঁদে করারই পক্ষপাতী। তোমার বলার ভঙ্গিটা হবে দৃপ্ত কণ্ঠ সুউচ্চ। অন্তরের তত্ত্বে দাহ, প্রথার বিরুদ্ধে একটা জ্বলন্ত বিদ্রোহ—তোমার চোখের পানিকে বাষ্পীভূত করে দেবে। কাদতেও পার। এইজন্য যে শত হলেও যার সঙ্গে তোমাকে রূঢ় হতে হচ্ছে তিনি তোমার জন্মদাতা এবং নিঃসন্দেহে তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কিন্তু তাহলেও

এতটা নয়। তুমি একটু বেশি কাঁদছ।

(রোকেয়া ডুকরে কেঁদে ওঠে)।

আমিন : (দাড়ি-গোঁফ খুলে ফেলে দিয়ে) এটুকু বাব থেকে এসেছে স্যাব। নাটকেব নয়, বাইবেব জিনিস স্যার। পাবিবারিক।

অধ্যাপক : ওহ।

আমিন : বোকেয়াব বাবা আজ হঠাৎ ঢাকা এসেছেন। বিশেষ কবে বোকেয়ার সঙ্গে দেখা কববাব জন্যই নাকি এসেছেন। বিহার্সেল শেষ করেই আজ রাতেই ওকে গিয়ে দেখা করতে হবে। বাবা কী বলবেন না বলবেন ভেবে ভেবে ও এত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে যে এখন আব কিছুতেই কান্না বোধ কবতে পাবছে না। (রোকেয়া মুখ তুলে আমিনের দিকে তাকিয়ে থাকে।)

অধ্যাপক : হুম। তুমি মনে করো না, বোকেয়া, আমিন যা যা বলল আমি তার সবটা বিশ্বাস কবলাম। তোমার কিছু বলার থাকলে বলো, পবে শুনব। কিন্তু আপাতত মুখচোখের কিছু সংস্কাব করা দবকার। এই বকম একটা ক্ষতবিক্ষত চেহারা নিয়ে সামনে দাঁড়ালে অন্যান্য শিল্পীবা পার্ট ভুলে যাবে। বাইবে গিয়ে মুখচোখে একটু পানিব ঝাপটা দিয়ে এসো। এখানে এসে আমাদেব সামনে বসে প্রসাধন সেবে নাও। তোমাব পার্টেব একটা কবণীয় কর্মেরও কিছু অভ্যাস রপ্ত হবে।

(প্রম্পটাব এক গ্লাস পানি নিয়ে আসে। আমিন ওব থলি থেকে তোয়ালে বাব করে দেয়। সেগুলো নিয়ে বোকেয়া বাইবে চলে যায়)।

তোমাদেব নিয়ে নাটক করা বড় কঠিন। তোমবা একে অন্যকে বেশি চেন। নানাবকম ব্যক্তিগত সম্পর্কেব টানাপোড়েনে অষ্টপ্রহব একটা অনুভূতিব ঘূর্ণিবাত্যাব মধ্যে জীবন-যাপন করছ। নাটক কবতে এসেও সেটা বর্জন কবতে পাব না। নাটকও করছ আবাব আড়াল-আবডাল থেকে এ ওকে গালাগালি কবছ, ভালোবাসছ, ধাক্কা দিযে ফেলে দিচ্ছ। কী কব না কর পবিচালকেব পক্ষে তার হদিস মেলা ভার। মাঝখান থেকে নাটকটার ভোল বদলে যায়। এদিক থেকে পেশাদারদেব নিয়ে কাজ কবা অনেক সুবিধে। সবাই পরস্পরকে হেয় জ্ঞান কবে, ছোট বলে জানে, মৃদুভাবে ঘৃণা কবে। একটা পবিচিত প্রত্যাশিত ধাবাবাহিকতা রক্ষা কবে একে অন্যেব কাছে এগিয়ে আসে, দূরে সরে যায়। জীবনেব কোনো তীব্রতা নাটকের আবেদনের শৃঙ্খলাকে নষ্ট কবে দিতে উদ্যত হয় না। তোমরা কোনো কাজের নও।

(রোকেয়া তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘষতে ঘষতে প্রবেশ করবে। সঙ্গে সঙ্গে ঢুকবে সেলিম)।

আমিন : (সেলিমকে দেখে) তুমি কখন এলে ?

অধ্যাপক : বেশ কিছুক্ষণ হলো। আমি তো ওব গাড়িতেই এলাম।

রোকেয়া : অন্য কোথাও গিয়েছিলেন নাকি ?

অধ্যাপক : থানায়। সেজন্যই তো তোমাদের এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল।

আমিন : থানায় ? কিছু ঘটেছে নাকি স্যাব ?

অধ্যাপক : আর বলো কেন। বাসায় একটা চুরি হয়ে গেছে।

রোকেয়া : কী সাংঘাতিক!

অধ্যাপক : দু'দিন হলো আমার স্ত্রী তার বাপেব বাড়ি বেড়াতে গেছেন। ছেলেপুলেব তদারক কববার জন্য ছোঁড়াটাকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন স্ত্রীব নির্দেশ অনুযায়ী একলা বাড়িতে খুবই সতর্কতা অবলম্বন কবে চলছিলাম। কিন্তু কিছু লাভ হলো না।

আমিন : কী হয়েছে ?

অধ্যাপক : দুপুরবেলা খববের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘবেব দরজা বন্ধ ছিল। ঘুম থেকে উঠে দেখি অবাক কাণ্ড। ঘবেব দবজা তেমনি বন্ধ আছে, কিন্তু আলনা থেকে দামি কোট-পেন্ট, বেডিওব ওপব সাজিয়ে রাখা টাইমপিসটা, টেবিলের উপর ঘড়ি, আমাব কলম সুদ্ধ একগাদা খুঁটিনাটি জিনিস বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রোকেয়া : কী সর্বনাশ!

অধ্যাপক : পাড়ার সবাইকে দেখলাম এ বিষয়ে বেশ ওয়াকেবহাল। দেখে শুনে সঙ্গে সঙ্গে বললে কী করে চুবি হয়েছে।

রোকেয়া : কী কবে ?

অধ্যাপক : সামান্য একটা বংশদণ্ডের সাহায্যে।

আমিন : কলম পর্যন্ত বাঁশের ডগায় আটকে জানলা দিয়ে বাব কবে নিয়ে গেল। কাবদানিটা অবিশ্বাস্য মনে হয়।

অধ্যাপক : একেবাবে নিজেব ঘরে না ঘটলে বংশদণ্ডের এমন নিপুণ কার্যকারিতা সম্বন্ধে আমিও অবিশ্বাসী থেকে যেতাম।

সেলিম : গত হপ্তায় জাহানারাদেব পাড়াতেও এমনি একটা দুঃসাহসিক চুরি হয়ে গেছে। সে ব্যাটা আরও বাহাদুর। ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে ছিলেন। কী কৌশলে জানি বাঁশের ডগায় লাগানো কোনো আংটায় চোব ভদ্রমহিলাব হাতেব চুড়িটা আটকে নিয়ে এক হেঁচকা টানে গয়নাটা পাব করে নেয় ভদ্রমহিলা চিৎকাব কবে জেগে উঠে কেবল দেখতে পেলেন যে তাঁব হাতেব চুড়িগাছ একটা বাঁশেব ডগায় সংযুক্ত হয়ে জানালা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রোকেয়া : মা-গো!

প্রস্টাব : আমি নিজের চোখে দেখিনি। শুনেছি। এই বংশদণ্ডধারীবা আজকাল হাতের যাবতীয় কাজই নাকি বাঁশের ডগা দিয়ে নিষ্পন্ন করতে সক্ষম। সেদিন কোন গৃহস্থের হাতের আংটি জানালা দিয়ে বাঁশ বাড়িয়ে খুলে নিতে চেষ্টা করেছে।

রোকেয়া : তোমরা এসব গল্প বন্ধ করবে! ভয়ে রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। এরপর আর মহড়া দেবার মতো বলও গায়ে থাকবে না।

(ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকেছে জাহানারা। মাথার চুল খুলে দিয়েছে। ডবল মটরদানার একটা অতিদীর্ঘ হার অনেকগুলো পেঁচ দিয়ে গলায় জড়ানো।)

জাহান : এই হারটা চলবে স্যার?

আমিন : ওটাকে আর হার বলছেন কেন! বলেন শেকল। ওতে নোঙর বেঁধে জাহাজ আটকানো যাবে।

অধ্যাপক : সুন্দর! খুব সুন্দর মানাবে। একটু জমকালো। সেকেলে। বেশ ওজনদার। চমৎকার। মায়ের গলায় চমৎকার মানাবে। দেখি হারটা।

(জাহানারা হার খুলে দেয়। সবাই মুগ্ধ চোখে ঝুঁকে পড়ে দেখতে থাকে।)

জাহান : সেলিম এনেছে। ওর মায়ের জিনিস।

আমিন : ভরির কোনো আন্দাজ নেই আমার। তবে এটা যে পাথরের মতো ভারী তাতে আমার কোনো সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক : এসো এবার মহড়া শুরু করা যাক। অনেক গল্প করা গেছে। জাহানারা তুমি ভিতরে যাও। হারগাছ যেমন করে পরেছিলে তেমনি করে পরো, গরদের শাড়িটা এক পেঁচ দিয়ে পরে নাও। চুল আজ যেমন আছে তেমনি থাক। কিন্তু কিছু সাদাটে করে নিতে হবে। মুখে কিছু বয়সের রেখাও টেনে দিতে হবে। আজ যা আছে তাতেই চলবে। সবাই ভেতরে যাও। মঞ্চে শুধু সেলিম আব রোকেয়া। বাকি সবাই চলে যাবে। মনে থাকে যেন, সেলিম, তুমি হলে নাটকের নায়ক। অকুতোভয়, বীর্যবান, বিশ্বজয়ী প্রেমিক। (সেলিম পকেট থেকে এক জোড়া খাটো গোঁফ বার করে নাগের ডগায় সেঁটে নেয়। রোকেয়া এক হাতে একটা রঙিন প্যারাসল, অন্য হাতে বই-খাতা নিয়ে উঠে দাঁড়ায়।) আরম্ভ কর।

সেলিম : "আপনার এটা ছাতা নয়, ছাতার মুখবন্ধ মাত্র। এই রঙিন ফুল দিয়ে শিশির ঠেকানো যেতে পারে, কিন্তু ঝোড়ো হাওয়ার এই ঘন বর্ষণেব মধ্যে ওটাকে নিয়ে টানাটানি করা অহেতুক।"

রোকেয়া : "আপনি কোত্থেকে এলেন?"

সেলিম : "কেন, যে নরককুণ্ড থেকে আপনার অভ্যুদয় আমিও এতক্ষণ তার মধ্যেই ছিলাম।"

রোকেয়া : "রাত আটটা পর্যন্ত লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনো করবার প্রবৃত্তি আপনার কাছে প্রশ্রয় পাবে আশা করিনি।"

সেলিম : "লাইব্রেরিতে বসেছিলাম বিদ্যাভ্যাস করবার জন্য নয়। আড়াল-আবডাল থেকে আপনাকে যতটা দেখা যায় তার সুযোগ গ্রহণ করবার জন্য।"

রোকেয়া : "রোজ তিন চার ঘন্টা করে যে ক্লাশে হাঁ করে দেখেন, তাতেও আশা মেটে না।"

সেলিম : "যত বৈচিত্র, তত মহিমা। ক্লাশে এক রকম; পাঠাগারে অন্য রকম।"

রোকেয়া : "কিছুক্ষণ আগে মনে হলো ঘন ঘন বাইরে যাচ্ছিলেন আর ভেতরে আসছিলেন। সেটা কী মতলবে।"

সেলিম : "আপনার অখণ্ড মনোযোগের তারিফ করি। বারবার বাইরে আসছিলাম ঝড়ের দাপট ভালো রকম আন্দাজ করে দেখবার জন্য।"

রোকেয়া : "সে তো ভেতরে বসেও আঁচ করা যাচ্ছিল।"

সেলিম : "বারবার এসে দেখে যাচ্ছিলাম গাড়িবারান্দায় কোনো রিক্শা অপেক্ষা করছে কি না।"

রোকেয়া : "কোথাও যাবার তাড়া ছিল না কি ?"

সেলিম : "পাগল! এক আধটা রিক্শা ছিল। খেদিয়ে দিয়েছি। আপনাকে একটু বেশিক্ষণ আটকে রাখবার অন্য উপায় ভেবে বার করতে পারিনি।"

রোকেয়া : "ছি ছি। আমি এখন বাড়ি ফিরব কী করে !"

সেলিম : "কোনো উপায় নেই। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। পানি এবং কাদায় রাস্তা অত্যন্ত পিছল। সন্দেহ সেই যে মুহূর্মুহূ বজ্রবিদ্যুতের কবলে পড়ে বহু প্রাণী পথে-প্রান্তরে আচম্বিৎ মৃত্যুবরণ করছে।"

(মঞ্চে দপ্ করে কয়েকটা আলো নিভে যায়।)

রোকেয়া : "ও-কী, একাজ কে করলে ?"

সেলিম : "আমাকে অযথা সম্মানিত করবেন না। এ নিতান্তই প্রাকৃতিক গোলোযোগের ফল। এর চেয়ে সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেও এ অঞ্চলে বিজলী বিকল হয়ে যায়।"

রোকেয়া : "কতক্ষণ এ-রকম থাকবে বলতে পারেন ?"

সেলিম : "যতক্ষণ থাকে ততক্ষণই মঙ্গল। অনেক সময় দু'এক রাত্রেও ওরা লাইন ঠিক করে উঠতে পারে না।"

রোকেয়া : "মা-গো! কী ঘুটঘুটে অন্ধকার! একটু সরে এদিক-ওদিক যাওয়া যায় না।"

সেলিম : "যায়। চেষ্টা করলে আরো গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে গিয়ে গাঢ়তর আতঙ্কের রোমাঞ্চ অনুভব করা যায়।"

রোকেয়া : "দোহাই আপনি চুপ করুন। আমার রীতিমতো ভয় করছে।"

সেলিম : "একবার গিয়ে দেখে আসব মেইন সুইচ নিয়ে কেউ শয়তানি করছে কি না ?"

রোকেয়া : "না না। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। উহ্! পরিচিত জায়গার মধ্যে অন্ধকার এত ভয়াবহ হতে পারে কল্পনাও করিনি।"

সেলিম : "ভালো বলছেন। জনরব-অনুযায়ী আমি নানা কারণে ভয়াবহ পুরুষ হলেও, ভয় কী, চেনা মানুষ তো!"

(অকস্মাৎ রঙ্গমঞ্চের পেছনে থেকে জাহানারার কণ্ঠনিঃসৃত এক ভয়ার্ত তীক্ষ্ম আর্তনাদ। তারপরই জাহানারা প্রাণপণে চিৎকার করছে; চোর, চোর, চোর)

অধ্যাপক : সবগুলো আলো জ্বেলে দাও। সেলিম, তুমি দৌড়ে মেয়েদের গ্রিনরুমেব পেছনে চলে যাও। বাকি সবাই আমার সঙ্গে এসো।

(সবাই হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণ রঙ্গমঞ্চ খালি। সবার আগে অধ্যাপক ফিরে আসে। পায়চারি করে। রোকেয়া আর জাহানারা ঢুকবে।)

অধ্যাপক : কী হয়েছিল একটু পরিষ্কার কবে বল।

জাহান : আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গরদের শাড়িটা গায়ে জড়াবাব জন্য সবে তৈরি হয়েছি। হঠাৎ আয়নার দিকে চোখ পড়তেই বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। দেখি বাইরে অন্ধকারের মধ্যে একটা লোক জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চোখে কালো চশমা। নাকের নিচে ইয়া পুরু দুই গোঁফ ঝুলছে। শিকেব ফাঁক দিয়ে লোকটা আস্তে আস্তে লাঠির মাথা গলিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।

রোকেয়া : মা-গো!

জাহান : ভয়ে লজ্জায় আর্তনাদ কবে আমি আলোটা নিভিয়ে দিলাম!

অধ্যাপক : ভালো করনি। আলো থাকলে হয়তো চোরটার চেহাবা আবো ভালো করে দেখে নিতে পারতে।

জাহান : শাড়িটা কোনোমতে গায়ে পেঁচিযে নেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আলোটা আবার জ্বাললাম। কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ হয়ে গেছে।

অধ্যাপক : কী হয়েছে ?

জাহান : টেবিলের ওপর ছিল সেলিমের মায়ের হার ছড়া; তাকিয়ে দেখি সেটা নেই। জানালার ধারের সেই মাথাটাও অদৃশ্য হয়ে গেছে' এখন কী হবে ? ছি ছি লজ্জা! কী লজ্জা! আমার কাছ থেকে সেলিমেব মায়ের অমন দামি হারটা খোয়া গেল!

রোকেয়া : এর তুমি কী করবে আপা ? চোর ডাকাতের খপ্‌পরে যে কেউ পড়তে পারতো।

অধ্যাপক : শান্ত হও। দেখা যাক কী করা যায়। চোবের তুমি যে বর্ণনা দিলে তার সঙ্গে কোনো কোনো পাড়ায় চকিতে দেখা দণ্ডধাবীর কিছু মিল রয়েছে। পুলিশের এতে সাহায্য হতে পারে। সে যাক্, কী করা যায় আমি দেখছি। রোকেয়া তুমি জাহানারাকে নিয়ে ভেতরে গিয়ে বসো। চোখে মুখে পানি দিয়ে বিশ্রাম নিক। এমনিতেও আজ বোধহয় আর রিহার্সাল হচ্ছে না।

তোমরা সব বাড়ি ফেরার জন্য তৈরি হয়ে নাও।

(ক্রন্দনবতা জাহানারাকে নিয়ে রোকেয়ার প্রস্থান। অন্য দ্বার দিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করবে আমিন ও সেলিম। সেলিমের হাতে আমিনের লাঠি।)

সেলিম : আমি লাফ দিয়ে বার হয়ে দৌড়ে মেয়েদের গ্রিনরুমের পেছনে গিয়ে দেখি আমিন আমার আগেই ওখানে পৌঁছে গেছে। ও তখন ছুটোছুটি করে চারদিকে খুঁজছে কাউকে দেখা যায় কি না।

আমিন : হাতে লাঠিটা থাকায় মনে বেশ সাহস অনুভব করছিলাম। ধরতে পারলে এক বাড়িতে আজ দণ্ডধরের পরাণ ঠাণ্ডা করে দিতাম।

অধ্যাপক : শুনেছ বোধহয়, চোর বাঁশের ডগায় করে জাহানাবার সামনে থেকে সেলিমের মায়ের মহামূল্য সোনার হারটি তুলে নিয়ে উধাও হয়েছে।

আমিন : ইন্নালিল্লাহ! সে যে সাংঘাতিক দামি হার। জাহানারা কি চোরেব চেহারাটা ভালো করে দেখতে পেরেছে ?

অধ্যাপক : এক ঝলক দেখেছে। চোখে কালো চশমা। ডাকসাঁইটে ঝোলা গোঁফ।

আমিন : আবো দু'এক পাড়াতেও অনেকে নাকি এই রকমই দেখেছে।

অধ্যাপক : সেলিম, তুমি কিছু বলছ না যে ?

সেলিম : কী বলব স্যার ? চোর চুরি করেছে এর মধ্যে আর বলাবলির কী আছে'

(মঞ্চে ঢুকবে রোকেয়া।)

বোকেয়া : জাহানারা আপা কিছুতেই মানছেন না। কেঁদে কেঁদে খুন হয়ে গেলেন।

আমিন : সে-কী!

রোকেয়া : কেবল বলছেন, কী লজ্জা! অন্যের দামি গয়না আমার কাছ থেকে খোয়া গেল! বলছেন আর ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন। আমার মনে হয় সেলিম ভাইয়ের কাছে গিয়ে কিছু বলা উচিত।

সেলিম : আমি যাব স্যার ?

অধ্যাপক : যাও।

(সেলিম যাবার সময় লাঠিটা আমিনের হাতে গুঁজে দিয়ে যায়। রোকেয়া আমিনকে নিবিষ্ট চিত্তে দেখে। আমিন হাতের লাঠিটা পাশে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।)

রোকেয়া : (আমিনকে) আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?

অধ্যাপক : আমিন খুব করিৎকর্মা লোক। জাহানারার চিৎকার শুনে, আমাদের সকলের আগে ও লাঠি হাতে নিয়ে ছুটে গেছে ধরতে। সেলিম বেরিয়ে গিয়ে দেখে আমিন মেয়েদের গ্রিনরুমের পেছনে চোরের সন্ধানে মহাবেগে ছুটোছুটি করছে।

রোকেয়া : আমার মনে হয় আমাদের কারো একবার থানায় যাওয়া উচিত।

অধ্যাপক : অবশ্যই। ভাবছি নিজেই যাব কি না। এক দিনে দু'বার থানায় প্রবেশ লাভের সুযোগ সচরাচর আসে না।

আমিন : আপনি কেন কষ্ট করবেন স্যার ? থানার সামনে দিয়ে আমাকে যেতে হবে। যাবার সময় আমি ডায়রি করিয়ে যাব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস হারটা পাওয়া যাবে। আমাদের বেশি চিন্তিত হওয়া উচিত নয়।

রোকেয়া : আপনার এ-রকম মনে হওয়ার কারণ কী ?

আমিন : মানে, মনে হচ্ছে জাহানারা চোরের চেহারা ঠিকই দেখেছে। এক ঝলক আমিও দেখেছি মনে হলো। পুলিশ কিছু সাহায্য করলে অবশ্যই চোর ধরা পড়বে। মালও উদ্ধার হবে। আপনি কিছু ভাববেন না স্যার। আমি যাবার সময় থানায় ডায়রি করিয়ে যাব।

(সেলিম ঢুকবে)

কী খবর ?

সেলিম : সব ঠিক হয়ে গেছে। জাহানারা আসছে। সব স্থির হয়ে গেছে।

রোকেয়া : সব ঠিক হয়ে গেছে, সব স্থির হয়ে গেছে— তার মানে কী ?

সেলিম : মানে, ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, ঐ সোনার হারটা— ওটা আমার মায়ের বটে আবার আমারও বটে। আর ভাগ্য অনুকূল হলে আরো একজনেব হতে পারত !

অধ্যাপক : আরো খোলাসা করে বল।

সেলিম : হাবটা মা অনেকদিন আগেই আমাকে দিয়ে দেন। আমি কখনো বিয়ে না করতে পারি এই আশঙ্কায় মা সব সময় পীড়িত। এই হার ছড়া আমাকে দিয়ে বলেছিলেন যাকে তোব মনে ধরবে তাকেই দিস।

অধ্যাপক : তারপর ?

সেলিম : লজ্জার মাথা খেয়ে জাহানারাকে সব কথা বলে ফেললাম।

রোকেয়া : খুব সাহস করেছেন।

সেলিম : একবারও থামিনি। গড়গড় করে বলে গেছি। বললাম তুমি কিসের জন্য শোক করছ ? এ হার আমি তোমাকে দিয়ে দিয়েছি। তোমার হার তুমি হারিয়েছ, তার জন্য এত কাঁদতে হবে ?

রোকেয়া : এত কথা আপনি বলতে পারলেন ? জাহানারা আপা এখন কী করছেন ?

সেলিম : আর কাঁদছেন না। এক্ষুণি তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবেন।

(সলজ্জ মধুর হাসি মুখে নিয়ে জাহানারা প্রবেশ করে। সেলিম পাশে গিয়ে দাঁড়ায়।)

সেলিম : লজ্জা পাবার কী আছে। আমি সবাইকে বলে দিয়েছি।

অধ্যাপক : মোবাবক হো।

(সবাই সমস্বরে মোবারকবাদ জানায়)

আজ আর মহড়া দিয়ে কাজ নেই। তোমাদের সকলের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা ঠিক আছে তো ?

জাহান : আমি আগে একবার সেলিমদের বাসায় যাব। ওর মা'র সঙ্গে দেখা না করে ঘুমুতে পারব না! সেলিমই বাড়ি পৌঁছে দেবে। পারবে না ?

সেলিম : পারব।

রোকেয়া : আমি হোস্টেলে ফিরব না। খালার ওখানে যাব। আমিন ভাই তো ওদিকেই থাকেন। আমাকে খালার ওখানে দিয়ে আসবেন। কোনোরকম অসুবিধে হবে না তো ?

আমিন : না না। অসুবিধার কী আছে ? যাবার পথে থানায় একবার খবরটা দিয়ে যেতে হবে, এই যা। তা সে আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে তাবপর করে নেব।

অধ্যাপক : তোমাদের সকলেরই দেখছি সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। তাহলে আর দেরি করো না। রাত বেড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমি একবাব ক্লাবটা ঘুরে আসি।

(সবাই যাব যার জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ে)

প্রম্পটার : শেষ পর্যন্ত নাটকটা কেমন হবে মনে করছেন স্যার ?

অধ্যাপক : শেষ পর্যন্ত না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না। আচ্ছা চলি এখন।

(ধীরে পর্দা নেমে আসবে)

দণ্ডকারণ্য

চরিত্র

মনোয়ার	:	মনোয়ারই রাম
কায়সর	:	কায়সরই লক্ষণ
দারওয়ান	:	দারওয়ানই তপস্বী
লায়লী	:	লায়লীই সীতা
ওয়াফা	:	ওয়াফাই শূর্পনখা

[মঞ্চের দুটো স্পষ্ট ভাগ আছে। সম্মুখ ও পেছন। পেছনের অংশ সবটাই একটা উচ্চতব পাটাতনে তৈবি। এই পশ্চাৎমঞ্চে অরণ্যের সম্মোহন। সারি সারি পুরাতন গাছের দীর্ঘ কাণ্ড মাটি থেকে উঠে গেছে ওপরের দিকে, অনেক ওপর থেকে নেমে এসেছে পল্লবিত ছায়ায়, ঝুলন্ত শেকড়ের ঝুড়ি আঁকড়ে ধরতে চাইছে মাটিকে। যখন দৃশ্য পশ্চাৎমঞ্চে নয় তখন অবণ্য অন্ধকারে প্রায় অদৃশ্যই থাকে। আলোকিত থাকে শুধু সম্মুখ মঞ্চেব ক্রিয়াময় অংশ।

সম্মুখ মঞ্চের দুটো ভাগ। দর্শকের দৃষ্টিতে ডান ও বাম। বাম ভাগ চতুর্ভুজাকার, ডান ভাগ অষ্টভুজাকার। এ আকৃতিও উঁচু-নিচু পাটাতনের উপস্থাপনার দ্বারা নির্মিত।

প্রথম দৃশ্য সম্মুখ মঞ্চে, বাম ভাগে। মঞ্চে লাইলী শুয়ে আছে। ঘুমিয়েও থাকতে পারে। চিবুক পর্যন্ত চাদর টেনে রাখা। ক্রমশ স্পষ্ট করে দেখা যাবে যে লাইলী বঙ্গমঞ্চীয় প্রসাধন সম্পূর্ণ করে সাবধানে শুয়েছে। চুল ভালো করে বাঁধা, খোঁপায় ফুল গোঁজা, হাতে গলায় ফুলের মালা। লাইলীর ঘুমন্ত মুখ একটু একটু করে আলোকিত হতে থাকবে। হঠাৎ ছায়া পড়ে এক তরুণেব। আলো তাকে গ্রহণ কবলে দেখা যাবে তরুণ ডিগ্রি গ্রহণের ঝকমকে লাল-কালো গাউন পরিহিত। পাশ্চাত্য দস্যুব অনুকরণে চোখের ওপর দিয়ে কালো কাপড়ের ঝরোকা বাঁধা। কণ্ঠস্বরের অবদমিত নিম্নতায় এবং আকস্মিক বিস্ফোরণে, আচরণে অবরুদ্ধ মসৃণতায় এবং অনিয়ন্ত্রিত রূঢ়তায় বিক্ষুব্ধ এবং ক্ষতবিক্ষত অন্তরের ছাপ স্পষ্ট। তরুণের নাম কায়সর]

লায়লী : কে ? অন্ধকারে ওখানে কে দাঁড়িয়ে ?

কায়সর : ভয় নেই। অপরিচিত কেউ নয়।

লায়লী : কে ? কে তুমি ?

কায়সর : চিৎকার করো না।

লায়লী : আলো জ্বেলে দাও।

কায়সর : দিচ্ছি।

লায়লী : ওহ্, তুমি! কী ভয়ানক ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম!

কায়সর : ভয় ভাঙল কী করে ?

লায়লী : কী যে বলো। তোমাকে দেখে ভয় পাব কেন ?

কায়সর : কেন ভয় পাবে না ? এখন অনেক বাত। এটা মেয়েদের হস্টেল। তোমার ঘবের মধ্যে মুখোশপরা এক পুরুষ। ভয় পাবে না কেন ?

লায়লী : ভয় পাই না।

কায়সর : পাবে। একটু পরে পাবে। সব জানলেই পাবে।

লায়লী : কী জানতে পারলে ?

কায়সর : এত রাতে তোমার শোবার ঘরে ঢুকলাম কী করে ?

লায়লী : জানি।

কায়সর : কী জান ?

লায়লী : গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছিলাম। চোখ মেলে দেখি তুমি। আমার ঘুমের সিঁড়ি বেয়ে একতালা দোতালা তেতালা চারতালা পাঁচতালা পর্যন্ত ওপরে উঠে এসে সোজা এ ঘরে ঢুকে পড়েছ। আমার মনের মধ্যে এসে হাজির হয়েছ। না হয়ে উপায় কী ? ভয় পাব কেন ?

কায়সর : কেন এসেছি ?

লায়লী : ভয় পাওয়াতে নয়। না, না। অত কাছে এসো না। আর খবরদার বেশি জোরে কথা বলো না। সব ভেঙে যাবে। হারিয়ে যাবে।

কায়সর : আমি শুধু দেখতে এসেছি।

লায়লী : অকারণে। জানি।

কায়সর : তোমার ঘর।

লায়লী : জানি।

কায়সর : তোমার ঘর, দুয়ার, আলনা, বিছানা।

লায়লী : জানি।

কায়সর : তোমার চিরুনি, চুলের ফিতা, জুতোর সারি, তেলের শিশি। দেখতে চাই।

লায়লী : জানি।

কায়সর : পড়ার টেবিল, বইখাতা, ড্রয়ারের ভেতরের ছেঁড়া খাম, পুরনো চিঠি, মাথার কাঁটা, সেফটিপিন, ফটো-স-ব স-ব!

লায়লী : সব, সব তোমার। তোমার চিঠি, তোমার ফটো, তোমার উপহার।

কায়সর : অন্যদেরগুলো কী করেছ ?

লায়লী : কথার কী ছিরি!

কায়সর : কী করেছ ?

লায়লী : বলব না। অত চিৎকার করে কথা বলতে বারণ করিনি ?

কায়সর : কেন ?

লায়লী : আমাদের দুজনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। অন্য মেয়েরাও রয়েছে। ওরা জেগে উঠতে পারে।

কায়সর : মেয়ে ? মেয়ে কোথায় ? সব চেড়ী, চেড়ীর দল। উঠুক জেগে। কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলব।

লায়লী : কী জংলি কথা বলছ ?

কায়সর : এই বাক্সটার ভেতরে কী আছে দেখব।

লায়লী : দেখ।

কায়সর : এগুলো কী ?

লায়লী : ঢং করো না। চিঠি, ফটো। তোমার। তোমার।

কায়সর : এই রুমাল কার ? ভেজা, ময়লা, দুর্গন্ধময়।

লায়লী : তোমার চোখের পানিতে ভেজা। আমার জন্য ফেলনি, টিয়ার গ্যাস চোখে গিয়েছিল। তারই গন্ধ হয়তো। তা হোক। তবু তোমার চোখের পানি তাই তুলে রেখেছি।

কায়সর : (কুটিকুটি করে রুমালটা ছিঁড়ে ফেলতে থাকে) বুঝতে পারছি। এখন বুঝতে পারছি। এ চিঠি কার। এ ভাষা কার। এ নাম কার।

(চিঠিগুলো হিংস্রভাবে মুচড়ে নষ্ট করতে থাকে)

লায়লী : পাগল হয়ে গেলে না কি ? হয়তো সব কিছু ভালো করে দেখতে পাচ্ছ না। চোখের কালো পট্টিটা খুলে ফেলছ না কেন ?

কায়সর : এই তো পেয়েছি। ফটো। চিনতে একটুও কষ্ট হচ্ছে না। সবই বুঝতে পারছি। (টুকরো টুকরো করে ফটো ছেঁড়ে) এ আমি সহ্য করব না। সহ্য করব না। আমার চোখের দিকে ভালো করে তাকাও লায়লী।

লায়লী : চোখের পট্টিটা খুলে ফেলো। বেশি কাছে এসো না। খুলে ফেলো। (কায়সর খুলে ফেলে) এ কী ? তুমি কে ? তুমি কী চাও ? তুমি কে, এখানে কেন ? তুমি মনোয়ার নও, তুমি কায়সর বনে গেলে কী করে ?

কায়সর : আমি মনোয়ার নই। তুমি ভেবেছিলে মনোয়ার।

লায়লী : তুমি কায়সর। তুমি কায়সর! কাছে এসো না!

কায়সর : আমি মনোয়াব নই। তুমি ভেবেছিলে মনোয়ার। আমি কায়সর। কায়সর। কি ভয় পেলে না কি ?

লায়লী : (ভয়ার্ত চিৎকার) মনোয়ার! মনোয়ার!

কায়সর : চুপ, অত চিৎকার কোরো না। এখন দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে বুঝি চিৎকার করে সব খানখান করে ভেঙে ফেলতে চাও ? সে আমি তোমায় দেব না !

লায়লী : মনোয়ার! মনোয়ার!

কায়সর : বল কায়সর! জপো কায়সর কায়সর! যদি অবাধ্য হও, বাধ্য হব আরো কাছে এগিয়ে আসতে। হাত বাখব তোমার মুখের ওপর। গলার ওপর। চেপে ধরে রাখব।

লায়লী : কায়সর! কায়সর! কায়সর!

কাযসর : এই তো শান্ত হয়েছ। কত সহজে শান্ত হতে পারো। লক্ষ্মী মেয়ে। শান্ত হলে তোমাকে কত সুন্দর দেখায়। ফুলের মতো মুখ তোমার। ফুলের মালার মতো গলা।

লায়লী : কাছে এসো, স্পর্শ করে দেখ। শক্ত করে ধরে রাখ।

কায়সর : এত ফুল কেন ?

লায়লী : ভীরু কোথাকার! এখন বুঝি সাহস হচ্ছে না ?

কায়সর : এত ফুল কীসের জন্য? খোঁপায় ফুল, গলায় ফুলের মালা, হাতে ফুলের কাঁকন। শুতে যাবে, তা অত সাজ কীসের ? কীসের আশায় ? কার আশায় ? কাব প্রতীক্ষায় ?

লায়লী : যদি না বলি ?

কায়সর : বলতে হবে তোমাকে। তুমি এখনও চিনতে পারনি আমাকে।

লায়লী : চিনেছি। তুমি মনোযার নও। তুমি কায়সর। কায়সর।

কায়সব : এত বড় উঁচু পাঁচিল। এত কঠিন নিয়ম। এত কড়া পাহারা। সে আসত কী করে! বল, সত্য কথা বল।

লায়লী : বোকা! জংলি!

কায়সব : জংলি হতে পারি, কিন্তু জেনে রাখ, আমি বোকা নই।

লায়লী : হতে পারি কি ? নিশ্চয়ই তাই। কোন অরণ্য থেকে এসেছ ভাই ?

কায়সব : যে অরণ্যে কোনো ফুল নাই। শুধু কাঁটা আব অন্ধকার আব বিষাক্ত গ্যাস আর বন্য জন্তু। এত ফুলের ঘটা কেন ?

লায়লী : পুবনো মেয়েরা সব এসেছিল, কনভোকেশনে ডিগ্রি নিতে। কথা ছিল সন্ধের সময় প্রাঙ্গণে উৎসব বসবে। আমি তাতে নাচব। ফুলেব গহনা পরে। হতে পারল কই ? এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। বোকা, জংলি।

কায়সব : হাসি বন্ধ কর।

লাযলী : পারছি না। ভয় কেটে গেছে। ভয় কেটে গেলে হাসি বাঁধ মানে না। ঘুমেব মধ্যে তো নয়ই।

কায়সর : লায়লী! আমি মনোয়ার নই, কায়সর। ভয় তোমাকে পেতে হবে। ভয় তুমি পাবে, পাবে, পাবে।

লায়লী : তোমাকে দেখে ? তুমি সে-রকম লোকই নও। সেই কবে থেকে অনুসরণ করছ, কোনোদিনই কি ভয় পাইয়ে দেবার মতো কিছু করতে পারলে ? না, চাইলে ?

কায়সব : আজ অন্য দিন। আমি আসলে জংলি। পাঁচতলার ওপরের এই নিরালা ঘবে, বাইরের ঘুটঘুটে অন্ধকারে, অরণ্য, অরণ্য, অরণ্যের ডাক! তুমি সাবধান হও।

লায়লী : তবুও নয়। আমি কি জানি না আমি তোমার কে! আমি ভয় পাব এমন কাজ করবার দুঃসাহস তোমার কোত্থেকে হবে!

কায়সর : তাকিয়ে দেখ।

লায়লী : ওকী ? চোখের ওপর ওই কালো পট্টিটা আবার বাঁধলে কেন ?

কায়সর : যাতে তোমার মনে ভ্রম জন্মে। আমি কায়সর নই। মনোয়ার। যার সাহসের অন্ত নেই। যে ভয় পাইয়ে দিতে জানে। যার সন্ত্রাসের প্রতীক্ষায় তুমি প্রহর গোণো।

লায়লী   না। না। আর এগিয়ে এসো না। আমি চিৎকার করবো। (দু'হাতে নিজের চোখ ঢেকে ফেলে।)

(কায়সর এগিয়ে এসে সামনে ঝুঁকে পড়ে। ক্ষিপ্র হস্তে বালিশের নিচ থেকে বেরিয়ে পড়া নীল চিঠিটা হ্যাঁচকা টানে তুলে নেয়)

কায়সব : এই বুঝি শেষ চিঠিটা। অরণ্যচারীর কৌশল দেখ। মোটেই বোকা নই। তোমাকে স্পর্শ না করে চিঠিটা হস্তগত কবলাম।

লায়লী : চিঠিটা নষ্ট করো না। মাত্র একবার পড়েছি।

কায়সর : না পড়ে নষ্ট করব না।

লায়লী : দোহাই তোমার ও চিঠি তুমি পড়ো না।

কায়সর : সম্ভাষণ থেকে নিবেদন পর্যন্ত, প্রতি বাক্য পঙ্‌ক্তি ধ্বনি সবই এত অপাঠ্য ?

লায়লী : পড়ো। পড়ো। বারবার পড়ো। সবগুলো আলো জ্বেলে পড়ো। আবৃত্তি করে পড়ো। নাও, নাও যত খুশি সময় নাও। শেষ করে বিদায় হও, বিদায় হও, আর সহ্য হয় না।

কায়সব : ও কীসের শব্দ ? হাসছো কেন ? সিঁড়িতে কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে ? কে, কে আসছে ?

লায়লী : মনোয়ার নয়, মনোয়ার নয়, মনোয়ার নয়।

কাযসর : কোন দরজায় যেন ঠকঠক শব্দ কবছে।

লায়লী : এখনও আমাকে খুঁজছে না। তবে খুঁজবে। নিশ্চয়ই খুঁজবে।

কায়সর : তাড়াতাড়ি করে বল কে আসছে।

লায়লী : বোধ হয় হাউস টিউটর আপা। নাম ডাকছে।

কাযসর : আমি বাতি নিভিয়ে দিচ্ছি।

লায়লী : অন্ধকার ঘর থেকে কেউ সাড়া না দিলে, আলো জ্বেলে দেখবে কে আছে, কে নেই। কে জেগে আছে, কে ঘুমিযে পড়েছে।

কায়সব : তুমি ঘুমিয়ে পড়ো। সাড়া দিও না। আমি এই কালো গাউনে গা ঢাকা দিয়ে ওপাশে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকব। তোমার কোনো ভয় নেই। ঘুমিয়ে পড়। বাতি নিভিয়ে দিলাম।

(মঞ্চে অন্ধকার। জোড়ায় জোড়ায় নাম ডাকাডাকির শব্দ ভেসে আসে। প্রথমে দুয়ারে মৃদু করাঘাতের শব্দ, তারপর একটা করে সংখ্যার উচ্চারণ। একশ এক, একশ দুই, একশ তিন, একশ চার ইত্যাদি। দরজায় টোকা পড়ে খোলা দরজা দিয়ে একফালি আলো এসে বিছানায় পড়ে। ফুলসাজে সজ্জিতা লায়লীর ঘুমন্ত মুখ আলোকিত হয়। আলো সরে যায়। ঘর অন্ধকার। অন্যান্য দরজায় টোকা দেয়ার শব্দ ভেসে আসে। বিভিন্ন নারী কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে একশ আট, একশ নয়, একশ দশ, একশ এগার ইত্যাদি।

অন্ধকারেই মঞ্চ থেকে এই দৃশ্যে ব্যবহৃত সামগ্রী প্রয়োজন অনুযায়ী অপসারিত হয়। লায়লী ও কায়সর অন্ধকাবে অদৃশ্য হয়ে যায়। ক্রমশ

আলো ফুটে উঠতে থাকে পশ্চাৎমঞ্চের অরণ্যে।

দৃশ্য : দণ্ডকারণ্য। বৃক্ষনিম্নে বেদিতে উপবিষ্ট কৌপীন পরিহিত ভস্মাচ্ছাদিত ধ্যানমগ্ন বিরাগী পুরুষ। নির্বাসিত রাম অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরহীন পোশাকে ধনুক হস্তে পার্শ্বে দণ্ডায়মান। সাধুর নেত্র উন্মীলিত হয়।)

সাধু : স্বাগতম, সুস্বাগতম! দণ্ডকারণ্যে স্বাগতম! রাজপুত্র দীর্ঘজীবী হও।

রাম : প্রভুর অপার করুণা।

সাধু : তোমার নির্বাসিত জীবন নির্বিঘ্ন হোক। চিত্ত আনন্দ ও শান্তি খুঁজে পাক।

রাম : সে অসাধ্য সাধনেই ব্রতী হব।

সাধু : রাজা দশরথের প্রতি মনে কোনো ক্ষোভ রেখো না। তিনি তোমাব পিতা এবং বৃদ্ধ। সর্বাবস্থায় পরম শ্রদ্ধার পাত্র।

রাম : আপনি এই সুপরিপক্ক ফলটি ভক্ষণ করুন। সর্বোচ্চ বৃক্ষচূড়া থেকে শরাঘাতে নিপাতিত করেছি।

সাধু : যুবরাজ বাম, আমি পরমানন্দে আশীর্বাদ কবি তোমার লক্ষ্য যেন কখনও ব্যর্থ না হয়।

বাম : কিন্তু প্রভু এ অবণ্য জনমানবহীন, এর বন্য পশু নিরীহ, নিম্ন বৃক্ষচূড়েও পর্যাপ্ত পরিপক্ক ফল, শরসন্ধান কবব কীসে ?

সাধু : না যদি কবতে হয সে তো আবও উত্তম।

বাম : কৈশোরে যৌবনে যত বিদ্যা আয়ত্ত করেছি, চতুর্দশবর্ষব্যাপী যদি তার অনুশীলনে উদাসী থাকি তবে অবশ্যই সকল জ্ঞান বিস্মৃত হবো। নির্বাসনকাল যখন শেষ হবে তখন রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করবো কোন ভরসায় ?

সাধু · অধৈর্য হয়ো না। অরণ্য কাউকে নিরাশ করে না।

রাম : অসহ্য এই অবণ্যের স্তব্ধতা, উদ্ভিদের এই অপ্রতিরোধ্য বিস্তার। শুধু ফুল আর ফল, বৃক্ষ আর মৃত্তিকা, বনভূমি আর লতাগুল্ম! গাছেব মাথায় পাখি, মধ্যে বানর, পাদমূলে তপস্বী— ক্ষমা করবেন— নাগরিক রসনার পাপপূর্ণ তাড়নায় কি অসঙ্গত কথা বলে ফেললাম ?

সাধু : আমি তোমার বাক্যে কর্ণপাত করিনি। তোমার অন্তরের যন্ত্রণাকে লক্ষ করছিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত হও বৎস। আর এ-ও জেনে রাখ, নগরে আর অরণ্যে ভেদ অতি সূক্ষ্ম তোমার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ রবে না। অরণ্যও কম বিঘ্নসঙ্কুল নয়।

রাম : কোথায় তার অনুসন্ধান কবব ?

সাধু : তুমি নিতান্তই অধৈর্য।

রাম : যখন রাজ্য থেকে নির্বাসিত হই, ভেবেছিলাম এ একটা অবসর বিনোদনের উপায় হলো। রাজকার্যেব দায়িত্ব নেই, যখন-তখন মন্ত্রণাসভায় যোগদানের ডাক পড়বে না, রাজনৈতিক আন্দোলনের মোকাবেলা করতে

হবে না, অমাত্যবর্গের তোষণের বালাই নেই, হুকুমনামায় স্বাক্ষর, সাক্ষাৎকারে প্রশ্নোত্তর, চক্রান্তে নেতৃত্ব কিছুই করতে হবে না। মনে হয়েছিল, এর চেয়ে সুখকর আর কী হতে পারে!

সাধু : তুমি সংসারী। স্ত্রীরত্ন সকল সংসারের সার। আমি অর্ধনিমীলিত নেত্রে তোমার পত্নীর রূপের যে জ্যোতি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ করেছি তা বড় সামান্য নয়। সেই পত্নী এই অরণ্যে তোমার অনুগামী হয়েছে। তুমি অসুখী কেন ?

রাম : কর্মহীন জীবনে অষ্টপ্রহর কেবল মাত্র এক পতিব্রতার সান্নিধ্য সম্বল করে চতুর্দশ বর্ষ অরণ্যে অতিবাহিত কবতে হবে ভাবলে অন্তবাত্মা শিউবে ওঠে। কোনো রাক্ষস নেই অরণ্যে ? অতর্কিতে প্রবেশ করে যে সীতাকে হরণ কবে নিয়ে যেতে পারে ? এই উপদ্রবহীন ক্লান্তিকর পবিবেশে তবু তাহলে একটা কিছু ঘটত!

সাধু : কেবল বাক্ষস নয়, এই অরণ্যে রাক্ষসীও আছে। নৃত্যগীত পটিয়সী, কামকলায় সিদ্ধ, চিত্তবিভ্রম উৎপাদনকারী। আমি সর্বদাই তাদের ভয়ে সন্ত্রস্ত। ধ্যানমগ্ন অবস্থাতেও স্বস্তি পাই না।

রাম : কোথায় ?

সাধু : কে কোথায় ?

রাম : রাক্ষসীরা!

সাধু : সেই তো যন্ত্রণা। ওবা সব কুহকিনী। হঠাৎ আবির্ভূত হয় মুহূর্তে শূন্যে মিলিয়ে যায়।

বাম : ত্বক স্পর্শ করে ? শ্বাস কি সুরভিত ? কোথায় ?

সাধু : বৎস, অত উতলা হয়ো না। আমি লক্ষ কবেছি দুর্বল চিত্তই ওদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় শিকার। শান্তি নেই, শান্তি নেই এই অবণ্যে! দু'দণ্ড নির্বিকার হবো তার কোনো পথই এবা খোলা রাখতে চায় না। যোগাসন ত্যাগ করে কাষ্ঠপাদুকায় পদস্থাপনের উপক্রম কবেছি, অনুভব করলাম কোন কৌতুকময়ীর মঞ্জিরবেষ্টিত চরণে তা অধিকৃত।

রাম : চর্মপাদুকা অতি ঘৃণ্যবস্তু। আজ হতে তা বর্জন করলাম।

সাধু : সারা নিশি জপমালা গণনা করে ঊষাকালে করতলে উষ্ণতা অনুভব করে তাকিয়ে দেখি এ কার কণ্ঠহার প্রদক্ষিণে ব্যাপৃত ছিলাম!

বাম : প্রভু, আমার এ সামান্য মণিমাণিক্যের বত্নহার গ্রহণ করুন। আপনার হরতকির মালা আমাকে দিন।

সাধু : যুববাজ, তোমাকে এখনও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি। বড় ভয়ানক এই অরণ্য। চতুর্দিকে শুধু দাবানল, অদৃশ্য দাবানল! হয়তো এই সুদীর্ঘ বৃক্ষকাণ্ড কোনো কুহকিনীর দেহবল্লরী, এই কদম্ব কোরক-পাপিয়সীর হৃদয়। এই দোলায়িত লতাজাল তার কেশপাশ, এই মৃত্তিকা তার শায়িত দেহ। শান্তি নেই এই অরণ্যে, শান্তি নেই। এই উদ্ভিদ, এই মানবীয়। ক্ষণে ক্ষণে ভোল

বদলায়। এর ভূগোলের কোনো স্থিরতা নেই।

রাম : এ দণ্ডকারণ্য নয় প্রভু, এ অযোধ্যা। আপনার এ অরণ্য প্রভু অযোধ্যার চেয়ে মোহনীয়! কী সুদৃঢ় সমুন্নত বৃক্ষকাণ্ড!

সাধু : (ত্রিশূল বিদ্ধ করে) ওটা প্রকৃতই গাছ। তিন্তিলি। অতিশয় প্রাচীন।

রাম : সীতা কদিন ধরে অনবরতই বলছে যে এই অরণ্যের বৃক্ষলতারা যেন সব তার প্রাণের সহচরী। আমি দৃষ্টিহীন, তাই বিশ্বাস করিনি।

সাধু : কেবল উদ্ভিদ নয়। এই যে কঠিন পাথরের বেদি—কতদিন ধ্যানস্থ এর ওপর উপবিষ্ট থেকে মনে হয়েছে, ধীরে ধীরে পাষাণ বেদি স্ফীত হয়ে পেলব কোমল এক-

রাম : সে-রকম যে মনে হবে তা আর বিচিত্র কী! চেয়ে দেখুন এ তো আপনার কণ্টকিত কুশাসন নয়। এ দেখছি কারুকার্যময় মহামূল্য মখমলের বালিশ!

সাধু : সর্বনাশ! এ কোত্থেকে এলো? সাবধান স্পর্শ কোরো না, স্পর্শ করো না। নিশ্চয়ই সে এসেছে।

রাম : কে?

সাধু : শূর্পনখা।

রাম : শূর্পনখা কে প্রভু?

সাধু : খর দূষণ বিভীষণ এদের বিধবা ভগিনী। পরিপূর্ণ যৌবনা। যেমন লজ্জাহীন তেমনি রমণীয়। আমার সাধনার শত্রু। আমি ধ্যানস্থ হয়েছি জানতে পারলেই পাপীয়সীর কৌতুক প্রবৃত্তি লকলক করে জেগে ওঠে। আজ সন্ধ্যায় আমি স্নানে যাব না।

রাম : কীসের জন্য যাবেন না প্রভু?

সাধু : নাভি পর্যন্ত জলবেষ্টিত হয়ে আমি যখন মন্ত্রোচ্চারণের জন্য চোখ বন্ধ করবো, আমি জানি, ও তখন সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মিশে নদীকূলে এসে দাঁড়াবে। সহচরীদের ডাকাডাকি করবে। মৎসকন্যাদের মতো পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গাঘাতে আমায় শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করতে সচেষ্ট হবে।

রাম : আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি আপনার সহচর হবো। সন্তরণে আমিও কম নিপুণ নই। কে কাকে উৎক্ষিপ্ত করে, দেখে নেবো।

সাধু : রাম!

রাম : জি।

সাধু : বোধহয় সে এখানেই আসছে।

রাম : সত্যি?

সাধু : আমি ঘ্রাণে ফুলের সৌরভ অনুভব করছি।

রাম : দিক নির্ণয় করতে পারছেন?

সাধু : সতর্ক হও বীর। বোধ হয় সর্বাঙ্গে ফুলাবৃতা হয়ে আসছে। সৌরভ ভেসে আসছে নৈঋত কোণ থেকে। বেশির ভাগ সময় চক্ষু নিমিলিত রাখি বলে দৃষ্টি আমার ক্ষীণ। তুমি অনুসন্ধান করো তো।

বাম : স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। বৃক্ষান্তরালে সরে গেছেন। হ্যাঁ। এইবার দেখতে পাচ্ছি। তাইতো, ফুলাবৃতাই তো! সঙ্গে একজন ধর্নুধরও রয়েছেন, মন্ত্রমুগ্ধের মতো পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসছেন।

সাধু : বিদ্ধ করেছে। হয়তো কোনো নিষ্পাপ তাপস কুমারকে বিদ্ধ করেছে।

রাম : হা হতোস্মি!

সাধু : কী হলো ?

রাম : এ যে সীতা! সঙ্গে লক্ষণ। প্রভু, আপনার স্নানেব বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। চলুন. নদীতীরে যাই।

সাধু : সীতা, সীতা আসছে! অগ্রে প্রতিমা দর্শন করি পরে স্নানে যাব।

(সীতার প্রবেশ। ফুলসাজে সজ্জিতা। লায়লীই সীতা। অনুসরণকারী লক্ষণ। ধর্নুধর। কায়সরই লক্ষণ।)

সীতা : আর্যপুত্র!

রাম : সীতা! আজ কি অপরূপই না তোমাকে দেখাচ্ছে। ফুলসাজে বনদেবী বলে ভ্রম হয়।

সীতা : এ সবই লক্ষণের কীর্তি। আমি যত বলি যে নির্বাসিতার রূপসজ্জার কি আবশ্যক, লক্ষণ কিছুতেই নিষেধ মানবে না। আমি যে ফুলকেই বলবো সুন্দর, তা আহরণ করা যত দুঃসাধ্যই হোক না কেন, জীবন বিপন্ন করে হলেও সে তা সংগ্রহ করে আনবেই।

রাম : এই অরণ্যের ফুল কী পরিপূর্ণ, কী সুরভিত!

সীতা : ইনি কে ?

বাম : ওহ্ তোমাদের পরিচয় কবিয়ে দিইনি। ইনি এই অরণ্যের এক মহাজ্ঞানী মহাতপস্বী।

সাধু : দীর্ঘজীবী হও, দীর্ঘজীবী হও রাজেশ্বরী!

সীতা : প্রভুর অপার করুণা।

বাম : দেখ প্রিয়ে, আমাকে এক্ষুণি একবাব এঁর সঙ্গে গভীরতম অরণ্যে প্রবেশ করতে হবে।

সীতা : এক্ষুণি ?

(রাম সীতার কথোপকথন-কালে তপস্বী-লক্ষ্মণের নীরব সংলাপ চলে। তপস্বী সম্ভবত সবিস্তারে শূর্পনখা ও তার সহচরীদের কাণ্ড-কারখানার কথা লক্ষণকেও শোনায়। লক্ষণ বৃক্ষকাণ্ড, ঝুলন্ত লতা, পাষাণ বেদি সবই ঘুরে ফিরে হাত বুলিয়ে পরীক্ষা করে।)

রাম : অরণ্যচররা তপস্বীর সাধনার পথে বিশেষ বিঘ্ন সৃষ্টি করছে।

সীতা : উনি সাধনার দ্বারাই সে উৎপাত দমন করবেন। তোমাকে যেতে হবে কেন ?

রাম : উনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। দুষ্ট অরণ্যচররা বিশেষ ক্ষমতাশালী।

সীতা : লক্ষণ যাক। সেও সামান্য বীর নয়।

রাম : এটা লক্ষণের কাজ নয়।

লক্ষণ : আমাকে কিছু বললেন ?

রাম : না। বলছিলাম স্নানকালে মহর্ষির প্রহরায় নিযুক্ত থাকবো বলে প্রতিশ্রুতি দান করেছিলাম। তোমার যদি সন্তরণে অভ্যেস থাকতো তাহলে না হয় তোমাকে প্রেরণ করে আমি সীতার চিত্তবিনোদনে নিযুক্ত থাকতে পারতাম।

লক্ষণ : নদী কি মকরাদিতে পরিপূর্ণ না কি ?

সাধু : বৎস, যদি কোনো অন্তরায় থাকে তা হলে আমি না হয় অদ্য সন্ধ্যায় গাত্রপ্রাক্ষালন স্থগিত রাখি।

বাম : সে হয় না প্রভু। বিশেষ করে অদ্যকার যোগাসনে এত দীর্ঘকাল আসীন থাকার পর।

সাধু : সেও সত্য !

সীতা : বিনোদনে আমার আবশ্যক নেই। কিন্তু সন্ধ্যা আসন্ন। আমাকে কি একা পরিত্যাগ করে যাবে ?

রাম : লক্ষণ রইল। আপনি অযথা বিব্রত হবেন না, প্রভু। সীতা জানে যে আমার চেয়ে কত বেশি উৎকণ্ঠা ও তৎপরতার সঙ্গে লক্ষণ ওর আদেশ পালন করে। আপনার লগ্ন পেরিয়ে যাচ্ছে, দ্রুত চলুন। শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করবো। প্রিয়ে তুমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ো না। (তপস্বীসহ রামের প্রস্থান)

সীতা : তোমার ভ্রাতৃভক্তির ঠ্যালায় আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। এত অনুগত হতে তোমাকে কে বলেছে? দাস্যভাবে যদি তোমার এতই আনন্দ, তা সরাসরি বড়ভাইয়ের ওপর আরোপ করো না কেন ? আমার পুচ্ছলগ্ন হয়ে রয়েছ কেন ?

লক্ষণ : সন্ধ্যা সমাগত। অরণ্য অন্ধকার হয়ে আসছে। মশাল জ্বালাবার আয়োজন করব কি ?

সীতা : করবে না তো কি, শুধু আমার রূপের আলোতেই সকল অন্ধকাব দূর করতে চাও নাকি ?

লক্ষণ : (মশাল জ্বালায়) আমার সান্নিধ্য আপনার মোটেই প্রীতিকর মনে হচ্ছে না। অনুমতি দিন, বৃক্ষান্তরালে গিয়ে অপেক্ষা করি।

সীতা : তা তো যাবেই। তুমি আমাকে এখানে একা ফেলে রেখে যাও, আব অমনি কোনো রাক্ষস এসে আমাকে তুলে নিয়ে যাক!

লক্ষণ : কত কাছে এসে থাকব তা চিহ্নিত করে দিন। যাতে আপনার ভয় দূব হয়, মর্যাদা অটুট থাকে।

সীতা : থাক, আর রহস্য করতে হবে না। আচ্ছা লক্ষণ, তোমার বড় ভাই সত্যিই কোথায় গেলেন, তা তুমি জান ?

লক্ষণ : নদীতীরে। তপস্বীর স্নানের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত থাকবেন। এই নদীর

ডাংগায় বাঘ, জলে কুমির। বাঘ কাবু করতে পারলেও, সাঁতার জানি না বলে মকরের সঙ্গে লড়াই করার উপযুক্ত নই।

সীতা : তোতা পাখি। বুঝেছি। রাত্রিবেলা, অরণ্যে, ভক্তি প্রদর্শনের জন্য আর করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কাছে এসো, এই বেদির ওপর আমার পাশে এসে বসো।

লক্ষণ : আপনার দেহসংযুক্ত ফুলের গন্ধ অত্যন্ত মাদকতাপূর্ণ।

সীতা : যে সন্তরণে পটু, সে শুঁকেও দেখলো না। আর্যপুত্র সত্যি সন্তরণে গেছে? নদীতীর এখান থেকে কতদূর? আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে? আমি দেখতে চাই।

লক্ষণ : নদী অতি নিকটে। কিন্তু হয়তো রামের সঙ্গে তপস্বীও স্নানে রত। সেদিকে দৃষ্টিপাত করা আপনার জন্য বাঞ্ছনীয় নয়।

সীতা : আমি রামের ভাই নই। শোভন-অশোভনের অত বাছবিচার আমি মানি না। তুমি আমাকে নিয়ে চলো।

লক্ষণ : আমি রামের ভাই। ভাইয়ের হুকুম না পেলে নতুন কাজ করতে পারব না।

সীতা : নদী কত দূরে? কোন দিকে?

লক্ষণ : একটা মশাল তো নিভে এলো বলে। অন্যটাও হয়ত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। এই অন্ধকারে এক পা ভুল পথে গিয়েছেন কি বন্যজন্তুর গ্রাসে পতিত হবেন।

সীতা : আর সব বাতি যখন নিভে যাবে, একা অন্ধকারে বসে থাকবো, দেবর লক্ষণ ছাড়া পাশে অন্য কেউ থাকবে না, তখন বক্ষা কববে কে? আমাকে নিয়ে চলো নদী তীবে।

লক্ষণ : আপনি দৃষ্টিপাত করতে না পারলেও কর্ণপাত করতে পারেন। একটু চেষ্টা কবলেই সব শুনতে পাবেন।

সীতা : আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।

লক্ষণ : চোখ বন্ধ করে উৎকর্ণ হোন। শুনতে পাচ্ছেন?

সীতা : খুব সামান্য।

লক্ষণ : মহর্ষি মন্ত্রোচ্চারণ করছেন। তাঁর নাভিকে কেন্দ্রবিন্দু করে পানি চক্রাকাবে ঘুরছে, তারই শব্দ।

সীতা : ও কীসের শব্দ? জলোচ্ছ্বাসের প্রবল উত্থান পতনের মতো ধ্বনিত হচ্ছে। লক্ষণ, আমাকে ওখানে নিয়ে চল ।

লক্ষণ : অবশ্যই দাশরথী। স্বয়ং সন্তরণে মত্ত হয়েছেন।

সীতা : একজনের সাঁতারে এত জলকল্লোল? বিশ্বাস করি না। আমি আরও কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছি। লক্ষণ, এরা কারা?

লক্ষণ : হয়তো মকরাদি হবে। মকরের লেজের বাড়িতে পানি তোলপাড় হবার কথা পূর্বে কখনো শোনেননি?

সীতা : মকর কি মানুষের মতো কোলাহল করে ? নিশ্চয়ই রাম বিপন্ন। তোমার কোনো অজুহাত শুনব না। আমি যাবই। ও কী ?

লক্ষশ : মশালের তেল শেষ হয়ে গেছে।

সীতা : এ তোমার কারসাজি। তুমি, তুমি ইচ্ছে করে মশাল নিভিয়ে দিয়েছ।

লক্ষণ : অযথা উতলা হবেন না। ঋষি-প্রদত্ত এই উপাধান গ্রহণ করুন। এতে মাথা রেখে নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান, আমি শিয়রে পাহারা খাড়া থাকবো।

সীতা : ঋষি-প্রদত্ত উপাধান! এই মখমলের মহামূল্য বালিশ ঋষির ? প্রবঞ্চনার আর জায়গা পেলে না ? পাপিষ্ঠ, মনে করেছো তোমার দুরভিসন্ধি আমি এখনও বুঝতে পারিনি! রামের বিপদ নিশ্চিত জেনেও তুমি কেবলমাত্র আমার প্রহরায় নিযুক্ত থাকতে চাও কেন ? অরণ্য অন্ধকার জন্তু কিছুই আমাকে আর আটকে রাখতে পারবে না। আমি চললাম রামের সন্ধানে।

লক্ষণ : অমন কাজও করবেন না। এ কী ? কোনদিকে গেলেন ? সাড়া দিন। ভালো চান তো এখনও ফিরে আসুন। রাম ফিরে এসে আমাকে প্রশ্ন করলে কী জবাব দেবো ? সীতা! সী-তা! উহ্, কী অন্ধকার! কোন দিকে যাবো ? সীতা, সী-তা, সী-তা!

(পেছনের আরণ্য কোলাহল গভীরতর হয়। লক্ষণের কণ্ঠস্বর বিলীন হয়ে যায়। ক্রমে অন্ধকারে কাউকে আর দেখা যাবে না। প্রভাতী সূর্যের রশ্মিতে মঞ্চ পুনর্বার আলোকিত হলে দেখা যায় বৃক্ষমূলের বেদিতে, তপস্বীর স্থলে এক ভুবনমোহিনী হাঁটু ভাজ করে বসে আছে। প্রসাধনে ঐশ্বর্যের ছটা, অঙ্গে রূপের । নাম শূর্পনখা। সামনে, মাটিতে বসে, বেদিতে হেলান দিয়ে রাম ঘুমিয়ে পড়েছিল। রামের মাথা মখমলের বালিশে, বালিশ রমণীর কোলের কাছে। চোখে আলো পড়লে রাম হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙে।)

রাম : তুমি কে ?

শূর্প : তুমি যার প্রাণ রক্ষা করেছ।

রাম : সে দেখতে অন্যরকম ছিল।

শূর্প : তখন বিপন্ন ছিল, আর্ত ছিল, তাই অন্য রকম ছিল। এখন বিপদমুক্ত, পরিতৃপ্ত, তাই আরেক রকম।

রাম : তুমি সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছিলে ?

শূর্প : বাঃ, তা না হলে আর্তনাদ করলাম কেন ?

রাম : কেবল তোমার একার নয়, আমি তো আরও অনেক লোকের কোলাহল শুনে ছুটে গিয়েছিলাম। কিন্তু ওখানে গিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। তারা সব উবে গেল কী করে ?

শূর্প : দস্যু। দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করেছিল। জঙ্গল ওদের এত ভালো করে চেনা যে ওরা কোত্থেকে বেরিয়ে আসে এবং কীসের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়, কেউ তা বলতে পারে না।

রাম : একজনকে তুমি চিনতে পেরেছিলে বললে।

শূর্প : হ্যাঁ। সে সর্দার হবে হয়তো। দৌড়ে পালিয়ে গেল। খড়ম পায়ে, কৌপীন পরা।

রাম : তুমি রহস্য করছ। সে যাক। আমি এখানে এলাম কী করে?

শূর্প : তুমি সামান্য আহত হয়েছিলে। দস্যুরা পলাতক হলে আমি তোমাকে বহন করে এই স্থানে এনেছি।

রাম : তুমি?

শূর্প : আমি।

রাম : যাকে আমি উদ্ধার করেছিলাম সে ছিল কোমল, করুণ, লঘু, অশক্ত বিপর্যস্ত।

শূর্প : তাই বলে তুমি আহত হলে সে শক্তিময়ী হতে পারবে না? তুমি যদি না চাও তবে এখন থেকে হবে না।

রাম : সীতা কোথায়?

শূর্প : সীতা কে?

রাম : তুমি চিনতে পারবে না।

শূর্প : তুমি চিনিয়ে দাও। আমার কোন রূপের মতো দেখতে?

রাম : সে রূপ তোমার নেই। সে কোথায়? তুমি এখানে এসে কাউকে দেখতে পাওনি?

শূর্প : কেউ ছিল না। ঘুটঘুটে অন্ধকার।

রাম : মশাল দুটোর কী হয়েছিল?

শূর্প : দেখে বুঝতে পারছ না, কেউ ঘষে নিভিয়ে দিয়েছে। তোমার সীতা কি মশালের আলো নেভাতে জানে?

রাম : এ নিশ্চয়ই কোনো দুর্বৃত্তের কাজ। কিন্তু লক্ষণ! লক্ষণ কোথায় গেল?

শূর্প : লক্ষণ কে?

রাম : আমার ছোট ভাই। মহাশক্তিশালী পুরুষ। তাকে সীতার প্রহরায় নিযুক্ত রেখে গিয়েছিলাম।

শূর্প : এতক্ষণ বলনি কেন? মশাল সেই নিভিয়েছে।

রাম : কী বলতে চাও তুমি।

শূর্প : তুমিই তো বললে সে মহাশক্তিশালী পুরুষ। যদি আর কোনো দিন তার সাক্ষাৎ লাভ করো আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিও। খুব খুশি হবো।

রাম : লক্ষণ-সীতা, সীতা-লক্ষণ, লক্ষণ-সীতা!!

শূর্প : খুব সম্ভব। খুব সম্ভব। খুবই সম্ভব। ভুলে যাও ওসব কথা। চুলটা নতুন রকমে ফিরিয়ে বেঁধেছি। দেখতো, যাকে খুঁজে পেয়েছিলে এখন দেখতে তার মতো হয়েছি কিনা!

রাম : এক একবার মনে হয় তুমিই সে। মুখ ঘুরিয়ে আবার ফিরে তাকাতেই দেখি, তুমি সে নও—অন্য কেউ। যাকে হারিয়েছি, মনে হয় যেন চিরকাল তাকেই খুঁজছি। সীতা, সীতা, সীতা। আমি তাকে এই বেদির ওপর বসিয়ে রেখে গিয়েছিলাম। এইখানে লক্ষ্মণ দাঁড়িয়েছিল। এই দু'পাশে মশাল গনগন করে জ্বলছিল।

শূর্প : আলো নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে। যদি আবার মশাল জ্বালতে চায় তবে অবশ্যই ফিরে আসবে। নইলে নয়। (শূর্পনখা গাছের আড়ালে চলে যায়।)

রাম : সীতা! সীতা! সীতা! (অন্যদিক থেকে শূর্পনখা প্রবেশ করে। মহারাষ্ট্রীয় দুধওয়ালীর ভঙ্গিমায়, ঈষৎ নৃত্যের তালে, মাথার ওপর ঝকঝকে পেতলের দুধের কলস স্থির করে রাখা।) তুমি কে?

শূর্প : যাকে তুমি উদ্ধার করেছিলে।

রাম : সে তুমি নও, অন্য কেউ ছিল।

শূর্প : ভালো করে দেখ। আমি বিচিত্ররূপিনী। তুমি আমারই কোনো রূপ খুঁজেছ। চেয়ে দেখ। আমি গৃহকর্মে নিপুণা। শান্ত। সুশীলা। রাজার মেয়ে কিন্তু গৃহস্থের বধূ। দেখ, চেয়ে দেখ!

রাম : সীতা! সীতা! সীতা! (শূর্পনখা আবার আড়াল হয়ে গেছে। বৃক্ষান্তরালে চকিতে একবার তপস্বীর মুখ দেখা যাবে) কে? ওখানে কে? সীতা! সীতা! সীতা! (নৃত্যের সঙ্গীত ক্রমশ স্পষ্টতর হয়। অঙ্গের ঘাগরা ফুলের মতো চক্রাকারে বিস্তৃত করে নূপুর পায়ে নাচের তালে তালে প্রবেশ করে শূর্পনখা) তুমি কে? তুমি কে?

শূর্প : যাকে তুমি উদ্ধার করেছ।

(বৃক্ষান্তরাল থেকে অপেক্ষমাণ তপস্বী, লক্ষ্মণ, সীতার স্তম্ভিত ও উত্তেজিত মুখ দেখা যাবে।)

রাম : তুমি সে নও। তুমি অন্য কেউ, অন্য কেউ।

শূর্প : ভালো কবে দেখ। তুমি কেবল আমাকেই খুঁজেছ। রূপে রাজেন্দ্রাণী। কলায় উর্বশী। আমি রাজনর্তকী। জীবনের সুরা। গ্লানিহর। ক্লান্তিহর!

(রাম সীতাকে দেখেছে।)

রাম : সীতা! সীতা! সীতা!

(সীতা, লক্ষ্মণ, তপস্বী প্রবেশ করে)

শূর্প : এই-ই সীতা! কৃষ্ণবর্ণ, স্বাস্থ্যহীন, কৃশকায়! তুমি এঁকেই খুঁজেছ?

রাম : সীতা! সীতা! কোথায় অন্তর্হিত হয়েছিলে?

সীতা : আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। এই কামুকি রাক্ষসী কে?

রাম : তুমি ওর প্রতি অযথা রূঢ় হচ্ছ। ওর পুরোপুরি পরিচয় আমিও এখনও পাইনি।

সীতা : নিরিবিলি এতক্ষণ বুঝি তারই গবেষণা চলছিল? একটু লজ্জা হলো না

তোমার ? তুমি না ধর্মপুত্রের ধর্মপুত্র ?

শূর্প : এই রক্তচক্ষু, কর্কশকণ্ঠ রমণীকেই তুমি খুঁজছিলে ? এই বুঝি লক্ষ্মণ ? দিব্যসুন্দরকান্তি, সুগঠিত দেহ, স্বচ্ছ দৃষ্টি!

সীতা : লক্ষ্মণ, চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা পালন কর।

লক্ষ্মণ : প্রভু, প্রথমে আপনি আপনার কার্যে অগ্রসর হোন।

(কৌপীন পরিহিত তপস্বী ত্রিশূল হস্তে লম্ফ দিয়ে শূর্পনখার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। শূর্পনখা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে।)

শূর্প : দূর করো। দূর করো একে, সামনে থেকে। স্নান করেনি, নগ্ন উরু! কী বীভৎস! দূর করো, দূর করো! তুমি আমাকে স্পর্শ কোরো না। ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও।

(তপস্বী তস্করের তৎপরতার সঙ্গে কমণ্ডলু থেকে দড়ি বার করে শূর্পনখার দু'হাত পেঁচিয়ে বাঁধতে থাকে।)

সীতা : ভালো করে বাঁধ। আষ্টেপৃষ্ঠে পেঁচিয়ে বাঁধ। যাতে কোনোরকমেই পালাতে না পারে।

শূর্প : এ অন্যায়। এ অন্যায়। তোমরা এর জন্য কঠিন শাস্তি পাবে। সব্বাই পাবে।

সীতা : (রামকে) তুমি নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছো কেন ? হাত লাগাতে পারছো না ? কোনোরকম সাহায্য করছো না কেন ? তুমি কি চাও ও পালিয়ে যাক ? থাক, থাক, তোমাকে ও-রকম করে সাহায্য করতে হবে না। শূর্পনখাকে তুমি স্পর্শ করতে পারবে না। দূরে সরে দাঁড়াও। শূর্পনখাকে জাপটে ধরার দরকার হলে আমিই ধরব। আমি কৃষকের কন্যা, ক্ষীণস্বাস্থ্যের রাজকুমারী নই। শারীরিক কাজটুকু আমাকেই করতে দাও। তুমি নাংগা তলোয়ার হাতে নিয়ে পালাবার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাক।

রাম : আমি বলি কি, যাক না ও পালিয়ে। চিরকালের জন্য ও যদি আমাদের জীবন থেকে দূর হয়ে যায়, মন্দ কি ?

সীতা : সে তো তুমি বলবেই। তুমি দয়ালু রাম। তোমার দয়ার উৎস কোথায়, সে আমার জানা নেই ? কীসের আশায় শূর্পনখাকে ছেড়ে দিতে চাও সে আমি বুঝি না ? কিন্তু তা হবে না। লক্ষ্মণ!

লক্ষ্মণ : জি!

সীতা : তুমি আমার কথার অবাধ্য হবে ?

লক্ষ্মণ : প্রাণান্তেও নয়।

সীতা : পরীক্ষা দাও, প্রমাণ কর।

লক্ষ্মণ : আমি প্রস্তুত।

সীতা : কৃপাণ উন্মোচিত কর।

লক্ষ্মণ : উজ্জ্বল, তীক্ষ্ণ, শাণিত!

সীতা : বন্যকুক্কুটের শিরচ্ছেদনের মতো শূর্পনখার নাসিকা কর্তন কর।

রাম : প্রিয় ভার্যা, অন্যতর কোনো শাস্তির ব্যবস্থা কি কল্পনীয় নয়?

সীতা : তোমার কল্যাণের জন্যই আর্যপুত্র এই নাসিকার উৎসর্গ। তুমি রাজপুত্র, যশের এবং রূপের তুমি বড় ভিখারি। রূপের মোহে তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হও, সে কি আর আমি জানি না?

রাম : মিছে তোমার আশঙ্কা। তোমার রূপকে অতিক্রম করবে কে?

সীতা : তুমি বিদগ্ধচিত্ত নিপুণ পুরুষ। শুধু রূপে তোমার মন ভোলে না। তার সঙ্গে চাই রাক্ষসীর ছলাকলা।

রাম : তুমি আমাকে সম্পূর্ণ উল্টো বুঝেছ।

সীতা : তাহলেও ভিখারি রাঘব, আমি কোনোরকম আশঙ্কার পথ খোলা রাখতে চাই না। লক্ষ্মণ!

(লক্ষ্মণ সুতীক্ষ্ণ তরবারি উত্তোলিত করে।)

রাম : অন্তত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে চোখের আড়াল করো। চোখের আড়াল করো।

(সীতা শূর্পনখাকে বেদির সম্মুখে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেয় যাতে দর্শক শূর্পনখার মুখ দেখতে না পারে। যেন নড়তে না পারে সেই ভাবে সীতা দু'হাতে কবজা করে পেছন থেকে শূর্পনখাকে সাপটে ধরে আছে। তপস্বী গম্ভীর কণ্ঠে শ্লোক উচ্চারণ করে। সীতা তার ওপর দিয়ে চিৎকার করে।)

সীতা : লক্ষ্মণ! লক্ষ্মণ! কর্তন কর, কর্তন কর, কর্তন কর!

(লক্ষ্মণের তলোয়ার চালনা। শূর্পনখার ভয়াবহ চিৎকার। তপস্বীর অট্টহাসি। লক্ষ্মণ তলোয়ার মোছে। শূর্পনখা রজ্জুবদ্ধ হাত দিয়ে কোনো রকমে নাক ঢেকে চিৎকার করতে করতে ছুটে বেরিয়ে যায়। তপস্বী অনুগমন করে।)

রাম : সব তো হলো। আমিও না হয় একটু ঘুরে আসি। কিছু মুক্ত বায়ু সেবন করতে পারলে হয়তো মনটা আবার সহজে উৎফুল্ল হয়ে উঠতে পারে।

সীতা : স্বচ্ছন্দে যেতে পার। এইখানে যে নাকের টুকরোটা পড়ে রয়েছে সেটাই আমার রক্ষাকবচ। (রামের প্রস্থান। সীতা বেদির ওপর বসে। হাই তোলে) আমিও বড় ক্লান্ত, লক্ষ্মণ।

লক্ষ্মণ : সারা রাত্রির অনিদ্রা। তার ওপর এত শ্রম!

সীতা : আমি একটু বিশ্রাম নিতে চাই। যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তুমি তো রইলেই, দেখো।

লক্ষ্মণ : আপনি নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যান। আমি শিয়রে দণ্ডায়মান আছি।

(সীতা বেদিতে কাৎ হয়। লক্ষ্মণ মখমলের বালিশ মাথার নিচে পেতে দেয়। সীতার চোখে ঘুম নেমে আসে। লক্ষ্মণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে। ঝুঁকে পড়ে দেখে। আরও ঝুঁকে পড়ে মাটির ওপর পড়ে থাকা

শূর্পনখার কাটা নাকের অংশটুকু হাতের তেলোয় তুলে নেয়। সীতার অক্ষত নাকের ডগার কাছে এছে চোখের দৃষ্টি দিয়ে কী যেন তুলনা করে। মনে মনে ভাবে, হাসে। আস্তে আস্তে মঞ্চ অন্ধকারে ঢাকা পড়ে।

আলোকিত হয় সম্মুখ মঞ্চের ডান অর্ধাংশ। সম্ভবত কোনো কাফেটেরিয়ার একটি টেবিল। দু'পেয়ালা চা রাখা আছে। এক যুবক, চোখ সানগ্লাসে ঢাকা, গায়ে কনভোকেশনের গাউন, টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে চায়ে চুমুক দেয়। যুবকের নাম মনোয়ার। একে দণ্ডকারণ্যে রাম-রূপে প্রত্যক্ষ করেছি। টেবিলের অন্য পার্শ্বে, দর্শক ও মনোয়ারের দিকে পেছন ফিরে, গভীর চিন্তায় মগ্ন এক রমণী দাঁড়িয়ে রয়েছে। পরনে পি.এইচ.ডি ডিগ্রি গ্রহণকারীর লাল টকটকে গাউন। চোখে কালো চশমা। নাম ওয়াফা, যাকে শূর্পনখা বলে চিনে নিতে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়। একটু দূরে বাঁয়ে, উঁচুতে হাঁটু ভাঁজ করে আবছা আলোতে একটা লোক বসে আছে। পরনে আধময়লা খাকি কোর্তা ও পাৎলুন। পায়ে কাপড়ের জুতো, হাতে ছোট একটা লাঠির টুকরো। হয়তো দারওয়ান। চেহারা অবিকল তপস্বীর মতো। মাথা নিচু করে বসে রয়েছে।)

মনোয়ার : আমার কাগজগুলো দিন।

ওয়াফা : তুমি কে ?

মনোয়ার : আপনি আমাকে চেনেন।

ওয়াফা : তুমি লাইলীর তল্লাশে থাকো। তোমার নাম মনোয়ার।

মনোয়ার : আপনি মেয়েদের হোস্টেলের হাউস টিউটর। আমার নাম জানা আপনার পক্ষে স্বাভাবিক।

ওয়াফা : আমি কে ?

মনোয়ার : ডঃ ওয়াফা।

ওয়াফা : ডঃ ওয়াফা! ডঃ ওয়াফা! এখনো হইনি। আজ তো শুধু মহড়া শুরু হলো। কাল হবে আসল। হয়ত তখন আরো দিশাহারা হয়ে যাব। কী কবছি আর না করছি এখন থেকেই বারবার তার খেই হারিয়ে ফেলছি।

মনোয়ার : আমার কাগজগুলো কোথায় রেখেছেন ?

ওয়াফা : তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কোন সাহসে ?

মনোয়ার : আমি তার জন্য মাফ চাইছি। হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে যাই। মনে হলো যেন ধরা পড়ে যাব। আমার হাতের কাগজগুলো ওদের কেউ হয়তো দেখে ফেলেছে। ভিড়ের মধ্যে অন্য উপায় ছিল না।

ওয়াফা : আমারও বোধহয় মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। কনভোকেশনের মহড়ায় এত হট্টগোল হতে পারে কল্পনাও করিনি। কেবল গাউন আর গাউন আর গাউনের সারি। সাপের মতো এঁকেবেঁকে সব যেন চারপাশ থেকে পেঁচিয়ে ধরতে চাইছে। তার ওপর মাইক্রোফোনে একটানা ডাকাডাকি নামের,

বিষয়ের, বিভাগের, রোল নম্বরের। তারপর ঘোষণা, তারপর আহ্বান, তারপর নির্দেশ, তারপর অনুমোদন, তারপর শপথ গ্রহণ! তারপর তোমাদের ঐ কাণ্ডকারখানা। পাগল হয়ে যাবার জোগাড়।

মনোয়ার : আমার কাগজগুলো কোথায় ? (ওয়াফা বার করে দেয়) রাতারাতি সব বিলি করে দিতে হবে। সাধ্যমতো ছাপার ভুলগুলো শুদ্ধ করে দি'। (মনোয়ার লিফলেটের গোছা টেবিলে রেখে ঝুঁকে পড়ে তাড়াতাড়ি ছাপার ভুল শুদ্ধ করতে থাকে। ওয়াফা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে) উঃ ওয়াফা! ডঃ ওয়াফা!

ওয়াফা : ওয়াফা বলো। কাল যা হবার হবে।

মনোয়ার : আপনি যে উপকার করলেন তার জন্য চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।

ওয়াফা : ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ মনে হলো একটা বিশ্রী রকম গোলমাল শুরু হয়েছে। এদিক-ওদিক সবাই এলোমেলো ছুটোছুটি করছে। কারো ধাক্কা লেগে তুমি একেবারে আমার গায়ের ওপর এসে ছিটকে পড়লে। তুমি পড়ে গিয়েছিলে। তোমাকে তুলতে গিয়ে মনে হলো তুমি যেন আমাকে জড়িয়ে ধরতে চেষ্টা করছো।

মনোয়ার : আপনার হাতে গাউনের আড়ালে গোপনে লিফলেটের তাড়া গুঁজে দিতে চেষ্টা করছিলাম।

ওয়াফা : সাহস করলে কী করে ?

মনোয়ার : হয়তো প্রাণের দায়ে। আপনার থিসিসের প্রশংসা লোকমুখে অনেক শুনেছি। কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলবো এমন সাহসও কোনোদিন হয়নি।

ওয়াফা : যখন এলে তখন একেবারে গায়ের ওপব এসে পড়লে।

মনোয়ার : আমাকে মাফ করবেন।

ওয়াফা : পাগল!

মনোয়াব : আপনি অনেক পড়াশুনা করেছেন না ?

ওয়াফা : অনেক। অনর্থক। আমার মনে হলো তুমি যেন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে যাচ্ছিলে। অজান্তে আমিও তোমাকে জড়িয়ে ধরেছিলাম।

মনোয়ার : সে আমি বুঝতে পেরেছি।

ওয়াফা : লাইলীকে তোমার খুব রূপবতী মনে হয়, না ?

মনোয়ার : হয়।

ওয়াফা : পরিমিত অঙ্গে অপরিমিত রূপ ?

মনোয়াব : আপনি কার কাছে শুনেছেন ?

ওয়াফা : শুনিনি। দেখেছি। পড়েছি।

মনোয়ার : ভুলে গিয়েছিলাম। আপনি হাউস টিউটর আপাও বটে।

ওয়াফা : ডঃ ওয়াফা! হাউস টিউটর আপা! এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছো না, না ? আমি এতই কুরূপা ?

মনোয়ার : আপনি রূপে কম নন, গুণে আরও বড়।

ওয়াফা : আজকে মনে হচ্ছে ডিগ্রির কাগজটা হাতের মুঠোয় পেলে ছিঁড়ে কুটিকুটি করে ফেলে দিতাম। এক দুই তিন চার বছর ধরে কেবল পড়েছি, পড়েছি পড়েছি। পড়েছি আর লিখেছি। ইঁটের নিচে চাপা পড়ে থাকা ঘাসের মতো বিবর্ণ হয়ে গেছি। আলোহীন, প্রাণহীন, রক্তহীন জীবন। এ আমি চাই না ?

মনোয়ার : কখন থেকে ?

ওয়াফা : বোকার মতো যখন তুমি হঠাৎ আমায় জড়িয়ে দিলে। কিছু না বুঝে যখন আমার হাতে একগাদা গোপনীয় ইস্তাহার গুঁজে দিলে। মনে হলো সে তুমি নও। অন্য কেউ, অন্য কেউ। যে নেই। যে চলে গেছে। যে ভুলে গেছে। যে আর কোনো দিন আসতে পারবে না। মনোয়ার! মনোয়ার!

মনোয়ার : কী হলো ?

ওয়াফা : ঐ লোকটা কে ? আমার দিকে ও-রকম করে ঘুরে ঘুরে দেখছিল কেন ?

মনোয়ার : ওহ্, যা ঘাবড়ে দিয়েছিলেন। ওকে সবাই তপস্বী বলে ডাকে।

ওয়াফা : তপস্বী ? ভণ্ড! ভণ্ড! ভণ্ড!

মনোয়ার : এখানকার পুরনো দারোয়ান। হয়ত অপেক্ষা করছে। আমরা বেরিয়ে গেলেই ক্যাফেটেরিয়ার দরজা বন্ধ করে দেবে।

ওয়াফা : কী করে জানলে ? যদি অন্যরকম লোক হয় ? হয়তো এখনই এগিয়ে আসবে। তোমাকে জাপ্‌টে ধরবে। তোমার কাগজের তাড়া থাবা দিয়ে কেড়ে নিয়ে যাবে।

মনোয়ার : এসব আপনি কী বলছেন ?

ওয়াফা : বোকা! তুমি একটা আস্ত বোকা। তোমারও আজ মাথার ঠিক নেই। একেক বার একেক রকম কর। দিশাহারা হয়ে তখন অত লোকের মধ্যে পেয়েছিলে, কিন্তু এখন একা পেয়েও, তেমন করে নিজেকে আমার হাতে সঁপে দিতে পারলে না।

মনোয়ার : আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ওয়াফা : ভয় পেয়ে গেছ। স্থির হয়ে বস। কাগজের তাড়া আমার হাতে দাও। যেগুলো বাকি আছে আমি শুদ্ধ করে দিচ্ছি। তোমার চেয়ে আমার হাতের লেখা বেশি সুন্দর। ভয় নেই কি লেখা আছে পড়ব না। তোমারটা দেখে দেখে শুধু ছাপার ভুলগুলো শুধরে দেব।

মনোয়ার : আপনার কাছে ঋণ শুধু বেড়ে চলেছে।

ওয়াফা : কিন্তু উঠে গেলে কেন ? পাশে বসে থাকলে তোমাকে খেয়ে ফেলবো মনে করেছ ?

মনোয়ার : ছি, ছি! কী যে বলেন ?

ওয়াফা : তুমি কি মনে কর আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি ?

মনোয়ার : না।

ওয়াফা : সে অন্য কেউ, অন্য কেউ। তুমি কি মনে কর তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে ?

মনোয়ার : না না। সে অন্য কেউ, অন্য কেউ। সে কিন্তু মহড়ার সময় সারাক্ষণ আপনাকে লক্ষ করেছে। গোটা কনভোকেশনের মধ্যমণি আপনি। সবার আগে আপনার নামে আহ্বান এলো। মঞ্চ থেকে অবতরণ করে আপনাকে এগিয়ে নিয়ে গেল। এই রক্তবর্ণ সিল্কে পরিবৃতা হয়ে আপনি মঞ্চে আরোহণ করলেন, সম্রাজ্ঞীর মতো।

ওয়াফা : বলো শুধু গুণ নয়। বলো রূপ, রূপ! বারবার বলো রূপ রূপ! অপূর্ণ নয়, অপরিণত নয়, সরল নয়, কলাহীন নয়। সম্রাজ্ঞী, সম্রাজ্ঞী! পরিণত, পরিপূর্ণ কলামণ্ডিত! তুমি লক্ষ করেছ তাকে ?

মনোয়ার : আমি নয়, অন্য কেউ।

ওয়াফা : তুমি তার বাণী শুনেছ ?

মনোয়ার : কান পেতে আছি।

ওয়াফা : লক্ষণের প্রতি শূর্পনখার পত্র পড়েছ ?

মনোয়ার : আপনার কণ্ঠে শুনিনি!

(ওয়াফা আস্তে আস্তে মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আলো ক্রমশ ওয়াফাকে উজ্জ্বলতর করে তুলবে। অন্ধকার এসে ঘিরে ফেলবে মনোয়ারকে।)

ওয়াফা : তোমার মনের কথা কহ আসি মোরে।
যদি পরাভূত তুমি রিপুর বিক্রমে,
কহ শীঘ্র, দিব সেনা ভব-বিজয়িনী,
রথ, গজ, অশ্ব, রথী-অতুল জগতে!
যদি অর্থ চাহ,
কহ শীঘ্র,—অলঙ্কার ভাণ্ডার খুলিব
তুষিতে তোমার মন, নতুবা কুহকে
শুষি রত্নাকরে, লুটি দিব রত্নজালে
মনিযোনি খনি যত, দিব হে তোমারে।

মনোয়ার : (অন্ধকার থেকে) ডঃ ওয়াফা! ডঃ ওয়াফা! আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? আমি সত্যি দুঃখিত। কাল হয়তো উৎসব হবে না। আপনাকে হয়তো দেখতে পাব না। অথচ আজ আপনাকে সম্রাজ্ঞীর মতো মনে হয়েছিল। আমি দুঃখিত। আপনি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন ? উঃ ওয়াফা! ডঃ ওয়াফা! (স্তব্ধতা) এ অন্য কেউ, অন্য কেউ। আমাকে নয় অন্য কাউকে বলছে।

ওয়াফা : প্রেম-উদাসীন যদি তুমি গুণমণি,
কহ, কোন যুবতীর (আহা ভাগ্যবতী

বামাকুলে সে রমণী)—কহ শীঘ্র করি,
কোন যুবতীর নবযৌবনের মধু
বাঞ্ছা তব ? অনিমিষে রূপ তার ধরি
(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে।
আনি পরিজাত ফুল, নিত্য সাজাইব
শয্যা তব! সঙ্গে মোর সহস্র সঙ্গিনী
নৃত্যগীত রঙ্গে রত।
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে,
নহে কহ প্রাণেশ্বর, অম্লান বদনে
এ বেশভূষণ তাজি উদাসীন বেশে
সাজি, পূজি, উদাসীন পাদপদ্ম তব।
রতন কাঁচলি খুলি, ফেলি তারে দূরে,
আবরি বাকলে স্তন, ঘুচাইয়া বেণি,
মণ্ডি জটুজুটে শির, ভুলি রত্নরাজি,
বিপিনজনিত ফুলে বাঁধি হে কবরী!
মুছিয়া চন্দন, লেপি ভস্ম কলেবরে।
পরি রুদ্রাক্ষের মালা, মুক্তামালা ছিঁড়ি
গলদেশে। প্রেমমন্ত্র দিও কর্ণমূলে,
গুরুর দক্ষিণারূপে, প্রেম-গুরুপদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে।

(অন্ধকারে মনোয়ার তার কাগজপত্রসহ ততক্ষণে মঞ্চ ত্যাগ করে চলে গেছে। সেই স্থান ক্রমালোকিত হলে দেখা যাবে তপস্বী দাঁড়িয়ে আছে। ওয়াফা আবৃত্তি শেষ করে মুখ ঘুরিয়ে সে দিকে তাকিয়েই চমকে ওঠে)

তুমি কে ?

তপস্বী : আমি তপস্বী।

ওয়াফা : ওহ্!

তপস্বী : আপনি বুঝি রিহার্সাল দিচ্ছিলেন ?

ওয়াফা : হ্যাঁ। এখানে যে ছেলেটি বসেছিল সে কোথায় গেল ?

তপস্বী : ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, নেই।

(নিচু হয়ে একটা ইস্তাহার মেঝের ওপর থেকে কুড়িয়ে নেয়। ভাঁজ করে পকেটে পুরে রাখে।)

ওয়াফা : ওটা কী তুলে রাখলে ?

তপস্বী : বাজে কাগজ, ফেলে দেব। আপনার কিন্তু আপা রিহার্সাল পুরোপুরি হতে পারেনি। গোলমালে সব নষ্ট হয়ে গেল।

ওয়াফা : তুমিও দেখেছ নাকি ?

তপস্বী : একেবারে রাণীর মতো দেখাচ্ছিল। শুধু মুকুট ছিল না। আরও ভালো করে রিহার্সাল দিতে পারলে কালকে নিশ্চয়ই দেখতে আরোও ভালো হবে।

ওয়াফা : তার আর এখন উপায় কী ?

তপস্বী : আপনি আরও রিহার্সাল করবেন ?

ওয়াফা : তুমি তার ব্যবস্থা করে দেবে না কি ?

তপস্বী : তা আল্লার মর্জি পারব। প্রত্যেক বছব শুনতে শুনতে ডাকাডাকিগুলো এক রকম মুখস্থ হয়ে গেছে কি না!

ওয়াফা : ভারি মজা তো! পারবে তুমি ?

তপস্বী : আপনি এখানে ঠিক হয়ে দাঁড়ান। আমি ওপরে উঠে যাই। ওখান থেকে ডাক দেব, আপনি এগিয়ে যাবেন।

ওয়াফা : বাঃ চমৎকার হবে। আমি প্রস্তুত।

(তপস্বী পশ্চাৎ মঞ্চে আরোহণ করতে থাকে। একেবারে নিঃশব্দে এবং উভয়ের অলক্ষ্যে ওয়াফার পশ্চাতে এসে দাঁড়ায় কায়সর, গাউন পরা।)

তপস্বী : আপনি বেডি আছেন আপা ?

ওয়াফা : রেডি। কিন্তু আমাকে পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাবে কে ?

তপস্বী : আপনার পেছনের সাহেবকে বলুন।

ওয়াফা : কে ? মনোয়ার ? ওহ্!

কায়সর : কায়সর। আমি- মনোয়ার নই। কায়সর। কায়সর।

তপস্বী : আমি প্রথমে ডীন, পরে চ্যান্সেলর। রেডি ?

কায়সর : রেডি।

তপস্বী : মি. চ্যান্সেলর, আই নাউ প্রেসেন্ট বিফোব ইউ-

কায়সর : বড় গোলমাল হচ্ছে তপস্বী। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে না। আরও চিৎকাব করে বলো।

ওয়াফা : বোধ হয় মাইক নষ্ট হয়ে গেছে। আমিও শুনতে পাচ্ছি না।

তপস্বী : (চিৎকাব করে টেনে টেনে) মি. চ্যান্সেলর, আই নাউ প্রেসেন্ট বিফোর ইউ, ডঃ ওয়াফা খানম, ফর দি ডিগ্রি অব ডক্টরেট অব ফিলসফি ইন আর্টস। ডঃ ওয়াফা খানম!

(নেপথ্যের উপযুক্ত বাদ্যধ্বনির সঙ্গে কায়সরের প্রায় বাহু-সংলগ্ন হয়ে ওয়াফা সম্রাজ্ঞীব মতো পশ্চাৎমঞ্চে আরোহণ করতে থাকে। তপস্বী বেদির ওপর উঠে দাঁড়ায়। মঞ্চ ক্রমশ অন্ধকার হতে থাকে।)

বাই ভারচু অব দি অথরিটি ভেস্টেড ইন মি এ্যাজ দি চ্যান্সেলর অব দি ইউনিভার্সিটি আই কনফার ইউ দি ডিগ্রি অব ডক্টরেট অব ফিলসফি ইন আর্টস!

(তপস্বী, ওয়াফা, কায়সর তিনজনেই পরিপূর্ণ অন্ধকারে আড়াল হয়ে

যায়। অদৃশ্য হয়ে যায়। নেপথ্যে বহু লোকের করতালি ধ্বনিত হয়। ক্রমশ সম্মুখ মঞ্চের ডান কোণ আলোকিত হতে থাকে। লাইলী প্রবেশ করে। যে লাইলী সীতা থেকে অভিন্ন। চায়ের পেয়ালা দুটো দেখে। কাকে খোঁজে। ডাকে।)

লাইলী : মনোয়ার! মনোয়ার!

(ওপরের অন্ধকার থেকে নেমে আসতে থাকে কায়সর।)

লাইলী : তুমি কে ?

কায়সর : কায়সর। মনোয়ার নই, কায়সর।

লাইলী : মনোয়ার কোথায় ?

কায়সর : সে সংবাদ আমার কাছে রেখে যায়নি।

লাইলী : যখন গোলমাল শুরু হয় তখন তুমি কোথায় ছিলে ?

কায়সব : এখানে নয়, অন্য কোনোখানে।

লাইলী : মনোয়ার কোথায় ? আমাকে বলেছিল, এইখানে অপেক্ষা করবে।

কায়সব : হয়তো অন্য কাউকেও একই কথা বলেছিল।

লাইলী : বললে, তোমাকে বলেছিল। তোমরা দু'জনে বসে এখানে চা খেয়েছ। মনোয়ার কোথায় ?

কায়সর : তুমি জান আমি চা খাই না। তুমি কিছু শুনে এসেছ মনোয়ার সম্পর্কে। বিশ্বাস করতে চাইছ না। তাই এখন আমাকে সামনে পেয়ে যা মনে আসছে, তাই বলছ।

লাইলী : মনোয়ার কোথায় ? কী করেছ তাকে ?

কায়সর : আমি নই, অন্য কেউ।

লাইলী : মনোয়ার ' মনোয়ার !

(অন্ধকাব থেকে তপস্বী বেরিয়ে আসে।)

তপস্বী : আপনি কাউকে খুঁজছেন ?

লাইলী : এখানে বসে চা খেয়েছে কারা ?

কায়সর : (তপস্বীকে) তুমি বল। আমার কথা বিশ্বাস কববে না।

তপস্বী : এই পেয়ালায় তো ঠোঁটের রং-ই লেগে রয়েছে। এই শেড কাব, আপনি ভালো করে দেখলে চিনতে পারবেন। আর এই পেয়ালার সাহেব ইস্তাহার বিলি করতে চলে গেছেন।

লাইলী : এত কথা তুমি জানলে কী করে ? নিশ্চয়ই ও তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছে।

তপস্বী : কেউ শিখিয়ে দেবে কেন আপা! কত বছর ধরে দেখছি। দেখতে দেখতে সব মুখস্ত হয়ে গেছে।

কায়সর : আমাকে বিশ্বাস কর। মনোয়ারের জন্য অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই। আমার সঙ্গে চল। তোমাকে হোস্টেলে পৌঁছে দিয়ে আসি।

লাইলী : এখন এসব কথা বলতে লজ্জা হয় না তোমার ? তুমি ভেবেছ মনোয়ারকে ধরে নিয়ে গেছে। হয়তো অনেক দিন তাকে ধরে রাখবে। ভেবেছ এই তোমার সুযোগ! এখন আমি একা, নিরুপায়, অসহায়, তোমাকে অবলম্বন করা ছাড়া আমার গতি কী ?

কায়সর : তুমি নিরূপায় বা অসহায় নও। তোমার শক্তি কোথায় তা তুমি জানো, এত দর্প, এত অবজ্ঞা! নম্র হতে শেখ।

লাইলী : দূর হও! দূর হও আমার চোখের সামনে থেকে। পথে-পাথারে, দোকানে-বাগানে, পাঠাগারে-ছবিঘরে, চাই না, তবু ছায়ার মতো অনুসরণ কর— অসহ্য! দূর হও! চোখের সামনে থেকে দূর হও! দূর হও!

(কায়সর গায়ের গাউন ভালো করে জড়িয়ে পশ্চাৎমঞ্চে গা ঢাকা দেয়। ক্রুদ্ধ লাইলী দাঁড়িয়ে কাঁপে। টেবিলের ওপরের পেয়ালার দিকে চোখ পড়ে। এগিয়ে গিয়ে একটা পেয়ালা সজোরে অন্য পেয়ালার ওপর আছড়ে মারে। পেয়ালা দুটো সশব্দে চূর্ণবিচূর্ণ হয়। তপস্বী পকেট থেকে ছোট একটা নোট বই বার করে কী যেন টুকতে থাকে।)

আমাকে জানিয়ে গেল ইস্তাহার বিলি করতে বেরুবে। হাতে সময় নেই। কিন্তু সঙ্গিনী জুটিয়ে চা খাবার বেলায় সময়ের অভাব হলো না। কোন দিকে গেছে ?

তপস্বী : কে ডক্টরেট আপা ?

লাইলী : পাগলের মতো বোকো না। এই পেয়ালার লোক কোন দিকে গেল ?

তপস্বী : দুটো পেয়ালাই ভেঙে চুরমার। কোনটার কথা বুঝতে পারলাম না। চায়ের দাম ওরা দিয়ে দিয়েছেন। (হাতের কাগজের টুকরো এগিয়ে দেয়) পেয়ালার দাম, তিন টাকা চৌদ্দ আনা। এখন দিয়ে দিলেই ভালো হয়। আজকে বড় গোলমালের দিন আপা। আপনি একটু বাইরে এসে দাঁড়ান। আমি কাফেটেরিয়ার গেটটা বন্ধ করে দিয়ে আপনার সঙ্গে আসছি। চলুন।

(বেরিয়ে যেতে যেতে মঞ্চ পরিপূর্ণ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। ক্রমশ আলোকিত হয় পশ্চাৎমঞ্চ। দৃশ্য দণ্ডকারণ্য। বেদির ওপর হেলান দিয়ে রাম, যে মনোয়ার থেকে অভিন্ন, এক প্রকার নিদ্রামগ্ন। পা টিপে টিপে প্রবেশ করে লক্ষ্মণ, যে কায়সর থেকে অভিন্ন। সে একটা খুব গুপ্ত কর্মে লিপ্ত। রামের সাহায্য চায়। সাবধানে রামকে জাগাতে চেষ্টা করে। রাম চমকে জেগে ওঠে।)

রাম : কে ? কী চাও ?

লক্ষ্মণ : আপনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ভাবিনি।

রাম : কী বলবে বল।

লক্ষ্মণ : একবার বলেছিলেন যে আপনি বেশ ক্ষুধার্ত।

রাম : বলেছিলাম। তোমার হাতে ওটা কী ?

লক্ষণ : দগ্ধ বন্য কুক্কুট।

রাম : দেখি। উত্তম। চমৎকাব। অতি উপাদেয়। পূর্বে কখনও এত সুস্বাদু বস্তু খাইনি। অবণ্যে এ বকম রাজকীয় উপাচাব পরিবেশন কবা একমাত্র সীতাব প্রেম ও প্রতিভাতেই সম্ভব। তুমিও কিছু গ্রহণ কর।

লক্ষণ : আমি ক্ষুধার্ত নই। আপনি সেবা করুন।

বাম : আমি প্রত্যহ বন্য কুক্কুট শিকার কবব। দগ্ধ মাংস যে এত পেলব ও রসাল হতে পাবে এব আগে কল্পনাও কবিনি। আব এতে যে মশলাদির প্রলেপ রয়েছে এই পাণ্ডব-বিবর্জিত দেশে অরণ্যে সীতা সেগুলো সংগ্রহ কবলেন কোথেকে ? এব মধ্যে হযতো তোমাবই কিছু কীর্তি বয়েছে।

লক্ষণ . আমি কিছুই কবিনি।

বাম . অযথা সীতাব প্রতি তখন কিছু বিরূপ হযেছিলাম। অথচ দেখ লক্ষণ, পতিব্রতা কী নিষ্ঠাব সঙ্গেই না স্বামীব ক্ষুধা নিবৃত্তিব চিন্তায মগ্ন থাকতেন৷ সীতা বোধহয আমাব পূর্ব আচরণে ক্ষুব্ধ হযে সম্মুখে আসতে সংকোচ বোধ করছেন। ওঁকে আহ্বান করে এখানে নিয়ে এসো। বাকিটুকু ওঁর সামনে বসে খাব।

লক্ষণ উনি বিশেষ ক্লান্ত এবং গভীব নিদ্রায মগ্ন। আপনি সঙ্গত বিবেচনা কবলে নিদ্রাভঙ্গে প্রবৃত্ত হই।

বাম : না, না তাব আবশ্যক নেই, তবে একটু অবাক হচ্ছি। আমাব জন্য কুক্কুট দগ্ধ কবে উনি নিদ্রাগমন কবলেন ?

লক্ষণ এই কুক্কুট উনি দগ্ধ করেননি।

বাম . কে কবেছেন ? এই কীর্তি তোমাব ?

লক্ষণ · আমি বাহক মাত্র। যিনি প্রেবণ করেছেন তিনি বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কবছেন। আপনাব দর্শনপ্রার্থী।

বাম · এ-দণ্ডকারণ্য দেখছি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিতে পবিপূর্ণ৷ নিয়ে এসো।

(লক্ষণ নিষ্ক্রান্ত হয়েই দর্শনপ্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে প্রবেশ করে। মহিলা। চোখ খোলা কিন্তু নাকের ওপর একটা সিল্কের কাপড় বেঁধে রাখা। নাক থেকে মুখেব নিচের অংশ তাব আড়ালে ঢাকা। চেহারা হঠাৎ চেনা যায় না। তবে পোশাকের বাহাব এবং গমন ভঙ্গি থেকে সহজেই অনুমান করা যায় ইনি শূর্পনখা যিনি ওয়াফা থেকে অভিন্ন কাটা নাক ঢেকে বেখেছেন। বাম হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকাব কবে ওঠে।)

কে ? এ কে ?

শূর্প : ভয় পেও না। আমি অশরীবী নই। আমি শূর্পনখা।

বাম : তুমি এখানে কেন ? কী চাও ? আমার কাছে কী চাও ?

শূর্প : আমার জীবন সার্থক হয়েছে। তুমি আমার স্বহস্তে প্রস্তুত দগ্ধ বন্য কুক্কুট পবিতৃপ্তিব সঙ্গে ভক্ষণ কবেছ।

বাম : তুমি ? তুমি তৈবি কবেছ ? আমি আরও মনে কবেছিলাম, সীতা কবেছে৷

শূর্প : নিরামিষ খাবতে পারে। বন্য কুক্কুট পারবে না। তুমি আবেক খণ্ড গ্রহণ কর, নয়ন ভরে দেখি।

রাম : উত্তম। উত্তম। অতি সুস্বাদু।

শূর্প : আব এই ফলগুলো এনেছি। তুমি তপস্বীকে যা উপহার দিয়েছিলে, দেখ, দেখ, তাব চেয়ে কত বেশি পরিপুষ্ট ও পবিপক্ক।

রাম : কী সুন্দব ঘ্রাণ! কোথায় পেলে ?

শূর্প : আমি প্রতিদিন তোমার জন্য সংগ্রহ করে আনব।

রাম : না, না, তা কেন ? তুমি সন্ধান দিয়ে যাও, লক্ষণই সংগ্রহ কবে আনবে। বাঃ, কী সুমিষ্ট ফল!

শূর্প : ওগুলোতে রস বেশি। যদি কামড়ে খাও সাবধানে খাবে। প্রত্যেক গ্রাসেব সময় জিব দিয়ে বস সড়াৎ করে মুখের ভিতব টেনে নেবে। নইলে বস ঠোঁটের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে। পিপীলিকারা নিদ্রাব ব্যাঘাত ঘটাবে।

রাম : সত্যি এত রসাল ফল জীবনে কখনও খাইনি। তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ, শূর্পনখা।

শূর্প : আমি জানতাম তুমি আমাকে কখনও অবহেলা কবতে পাববে না।

রাম : কেন কবব ? তোমাব রূপ ও আচবণেই আমি বুঝেছিলাম যে তুমি রাজনন্দিনী। তাব ওপব তুমি আমাব সেবিকা। তোমাকে অবহেলা কবব কেন ?

শূর্প : আমি জানতাম বিফল মনোরথ হব না।

রাম : লক্ষণ, অবণ্য অন্ধকাবাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। শূর্পনখাকে তাব আলয় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এসো।

শূর্প : লক্ষণ নিদ্রিত সীতাকে একাকী ফেলে বেখে এখন কোথায় যাবে ? লক্ষণ, তুমি তোমাব কাজে যাও।

রাম . লক্ষণ! তুমি শূর্পনখাব সঙ্গে যাও। সীতাকে আমি দেখব।

লক্ষণ : আমি কাব আজ্ঞা পালন কবব ?

শূর্প : মনের মধ্যে যে ইচ্ছে পুষছ তাই কর গে।

রাম · লক্ষণ!

লক্ষ্মণ : জি।

রাম . শূর্পনখাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।

শূর্প : আমি যাব না। আমি অন্য কোথাও যাব না। এই আমার আলয়, এই আমার আশ্রয়, এই আমাব মন্দির।

রাম . এই বমণী নাসিকা হারিয়ে বুদ্ধিহাবা হয়েছে।

শূর্প : কে আমার নাসিকা হরণ করেছে ? কে আমার বুদ্ধি হবণ করেছে ? আর্যপুত্র তুমি, তুমি, তুমি!

রাম : লক্ষণ এ উন্মাদিনীকে তুমি আমার কাছে নিয়ে এলে কেন ?

শূর্প : আমাকে উন্মাদিনী করেছে কে ? মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের মতো এই অরণ্যে বিচরণ করে বেড়াতাম। তুমি কেন তোমার ঐ মেদহীন সুগঠিত পেশল দেহ নিয়ে ভিখারির মতো সামনে এসে দাঁড়ালে ? আমার এ রূপযৌবন গ্রহণ কর, গ্রহণ কর।

রাম : তোমার কর্তিত নাসিকা থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে সম্ভবত তোমার সাময়িক মতিভ্রম ঘটেছে। নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন কর। নিদ্রা যেতে চেষ্টা কর। আমি আবার স্বীকার করছি, তোমার এই দগ্ধ বন্য কুক্কুট অতি সুস্বাদু হয়েছে, এই ফল খুবই মিষ্টি, খুবই রসাল।

কোনো শক্তিও নেই যা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারে। আর্যপুত্র, তুমি আমার চোখের দিকে তাকাও

তোমার অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না।

আর্যপুত্র দোহাই তোমার আমার কথা শোন।

দূর থেকেই বলো আমি শুনতে পাচ্ছি।

আমার এ ক্ষতি কে করেছে ? তুমি। তোমাকেই এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে। একদিন ছিল [illegible], আমার উপস্থিতির কল্পনায় মুনিগণের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটত। আমার [illegible] প্রণয়লাভের প্রতিযোগিতায় অসুরপুরে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যেত। আর [illegible] নাসিকাহীন শূর্পণখা অরণ্যের উদ্ভিদের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। [illegible] শিহরণ সঞ্চারের ক্ষমতা তার নেই। তুমি তুমি, তুমি, [illegible] এখন [illegible]কে গ্রহণ করবে ? আমাকে দেখে তপস্বী পর্যন্ত চোখ বন্ধ করে [illegible] হয়ে গেল। মরে গেলেও আমার এ কলঙ্ক ঘুচবে না।

রাম : অধীর হয়ো না। তুমি কুহকিনী মন্ত্রবলে [illegible] তোমার বশীভূত হবে।

শূর্প : মন্ত্র এখন ছাই কাজ করবে। নাসিকাই নেই সংস্কার করবো কীসের ?

রাম : (লক্ষ্মণকে) আমি তখনই বারবার নিষেধ করেছিলাম। এখন ঠ্যালা সামলাও। সব নষ্টের গোড়া তুমি

লক্ষ্মণ : দেখি কোনো উপায় করতে পারি কি না

রাম : যদি না পার তোমাকেই [illegible] করে দেব

লক্ষ্মণ : দাঁড়াও একবার চেষ্টা করে দেখি

(মাথা নিচু করে [illegible])

রাম : তুমি কি উন্মাদ হয়ে গেলে [illegible]

লক্ষ্মণ : [illegible] মাটিতে পড়েছিল [illegible] নাসিকার [illegible] খুঁজে বার করে দিচ্ছি [illegible] গেছে। নিশ্চয় নিশ্চয়ই [illegible]

(বিড়বিড় করতে করতে লক্ষ্মণ বেরিয়ে যায়)

রাম : লক্ষ্মণ লক্ষ্মণ কোথায় যাচ্ছ ? [illegible] চলে গেল।

শূর্প : ওকে যেতে দাও।

রাম : তুমি তো সে-কথা বলবেই।

শূর্প : দশরথপুত্র, তুমিই আমার অগতির গতি। তুমি ভ্রমেও নির্দয় হয়ো না। আমার এই নাসিকাহীন বদনের প্রতি কেউ দৃষ্টিপাত করবে না। তুমি না দয়ার্দ্র পুরুষ? আমি কোনো অধিকার চাই না, প্রতাপ কামনা করি না, কোনো মুকুটের প্রত্যাশী নই ঠোঁটের ওপর নাক নেই, মাথার ওপর মুকুট পরে আমার শোভা বর্ধন হবে না শুধু আমায় গ্রহণ কর, গ্রহণ করা পরিত্যাগ করো না

রাম : তোমার দগ্ধ কুক্কুটে আমার উদর পরিপূর্ণ হয়েছে। ফলের রসের মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়েছি। আমার নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে প্রতিরোধের শক্তি নেই।

শূর্প : আমি মশাল নির্বাপিত করে দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও।

রাম : না, না। মশাল নির্বাপিত কোরো না। এ অরণ্যে আমার নিদ্রাকর্ষণ হয় না। আমার নাসিকা-গর্জনে মশকের উপদ্রব আরও বেড়ে ওঠে।

শূর্প : তোমার উন্নত নাসিকাই আমার গৌরব। আরেকটা ফল খাও। আমি মশাল নিভিয়ে দিলাম অন্ধকারে আমার চোখের জ্যোতি কমে না। তুমি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাও। আমি সারা রাত জেগে মশক নিবারণ করবো। তুমি নিদ্রা যাও।

(পশ্চাৎমঞ্চ ক্রমশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়। অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যায় দণ্ডকারণ্য, শূর্পনখা, রাম। ক্রমশ আলোকিত হয় সম্মুখ মঞ্চের বাম অংশ। হুবহু প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। লাইলীর কক্ষ। ফুলের গহনাপরা লাইলী ঘুমে অচেতন। আলোর দিকে পিঠ দিয়ে, ঘুমন্ত লাইলীর মুখে ছায়া ফেলে মাথা তুলে দাঁড়ায় গাউন-পরা কায়সর যে অবয়বে লক্ষণ থেকে অভিন্ন।)

লাইলী : কে? ঘরের মধ্যে কে?

কায়সর : আমি মনোয়ার নই, কায়সর। কায়সর।

লাইলী : তুমি? তুমি এখানে কী করে এলে? তুমি মিথ্যা কথা বলছ। তুমি দুঃস্বপ্ন, তুমি মিথ্যা

কায়সর : আমি সত্য। আমি মনোয়ার নই। আমি কায়সর আমি স্বপ্ন নই। সত্য। এতদিন স্বপ্ন দেখেছি। আজ সত্যি সত্যি এসেছি। তুমি প্রস্তুত হও।

লাইলী : আমি বিশ্বাস করি না।

কায়সর : যখন তীক্ষ্ণ শাণিত স্পর্শ অনুভব করবে তখন বিশ্বাস করবে।

লাইলী : কায়সর! ঘরে ঢুকলে কী করে?

কায়সর : দেয়াল টপকে সিঁড়ি বেয়ে।

লাইলী : কেউ দেখেনি?

কায়সর : হয়তো দেখেছে। ভেবেছে পুলিশ তাড়া করেছে। আশ্রয়ের সন্ধানে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দেয়াল টপকে তোমাদের প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়েছি। কারা যেন গেট বন্ধ করে আলো নিভিয়ে দিল।

লাইলী : পাষণ্ড! পাপিষ্ঠ!

কায়সর : প্রাণভরে গাল দাও। কিন্তু আজ আমি আমার সংকল্প থেকে চ্যুত হবো না। যা আমি চাই, তা গ্রহণ করে তবে শান্ত হবো।

লাইলী : শয়তান। বদমাশ। তুমি মনে করেছ তুমি সহজে রেহাই পাবে? তোমাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

কায়সর : মনোয়ারের হাতে? তার আশা ত্যাগ কর। সে নির্বাসিত। রাজার চর তার ভালো মতন ব্যবস্থা করবে।

লাইলী : সে সংবাদ তুমি কাকে শোনাচ্ছ?

কায়সর : জানি তোমাকে সে পত্র পাঠিয়েছে। তাতে তোমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে। সংকল্প নিয়েছ অনন্তকাল অপেক্ষা করবে। আমি তার মূলে খড়্গাঘাত করব।

লাইলী : তুমি কী করতে চাও?

(কায়সর লাইলীর খাট প্রদক্ষিণ করে। সন্ত্রাসিত লাইলী তাকিয়ে থাকে।)

কায়সর : অন্য কেউ তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না। অন্য কেউ তোমাকে কামনা করবে না। নিরুপায় হয়ে তুমি শুধু আমাকে, আমাকে, কামনা করবে।

লাইলী : মনোয়ার! মনোয়ার!

কায়সর : চুপ! চিৎকার করো না। সবাই দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়েছে। বাইরের চিৎকারে আজ কেউ সাড়া দেবে না।

লাইলী : তুমি অযথা ভয় দেখাচ্ছ। হয়তো কিছু পান করে এসেছ। সময় থাকতে এখনও পালাও। হাউস-টিউটর আপা এক্ষুনি এসে পড়বেন।

কায়সর : উঃ ওয়াফা? আমি জানি, উনি আসবেন না।

লাইলী : এত বড় পাপ তুমি করতে পারো না। এর পরিণাম কী হবে তুমি ভালো করে জান। তুমি নিজেকে সারা জীবন এর জন্য ঘৃণা করবে। আমার ঘৃণার আগুনে পুড়ে তুমি খাক হয়ে যাবে।

কায়সর : পরিণামের পরোয়া করি না।

লাইলী : খবরদার! আর কাছে এগিয়ে এসো না। স্পর্শ করো না, স্পর্শ করো না আমাকে।

(লাইলী গায়ের লেপ মাথা পর্যন্ত টেনে নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেকে দেয়। কায়সর ক্ষিপ্র গতিতে গাউনের ভেতর থেকে একটা দড়ি বার করে লেপের ওপর দিয়ে খাটের সঙ্গে লাইলীকে আষ্টেপৃষ্ঠে ভালো করে বেঁধে ফেলে। হাঁপাতে থাকে লাইলী। কোনোরকমে লেপের ভেতর

থেকে মুখ বার করে ভয়ার্ত চোখ মেলে কায়সরকে দেখে।)

লাইলী : তুমি কী কবতে চাও?

কায়সর : মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। আমি কেবল তোমার নাক কেটে নিয়ে যেতে এসেছি।

লাইলী : নাক?

কায়সর : নাক। যাতে অন্য কেউ আব তোমার ঐ চন্দ্রবদন দেখে মুগ্ধ হতে না পাবে। আমাকে ছাড়া তোমাব যেন অন্য গতি না থাকে।

লাইলী : তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ!

কাযসর : হইনি। প্রমাণ দেখ। এই তুলো। এই এ্যান্টিসেপটিক। এই দেখ নতুন ধারাল র‍্যাজব। তোমায় আমি কষ্ট দেব না।

লাইলী : কায়সর! কায়সর!

কায়সর : আমি কাযসব নই। আমি অন্য কেউ। আমি ওয়ারির সেই ছাত্র যে চলন্ত বিকশার ওপব ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কোনো পরীক্ষার্থিনীব নাসিকা কর্তনেব জন্য। মোমেনশাহীর সেই যুবক যে সৎমার প্রথম পতির কন্যাব জন্য দিওয়ানা হয়ে মধ্যরাতে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে প্রিযতমাব নাক ঘচাৎ কবে কেটে উধাও। আমি দেবদাস, পার্বতীকে প্রহাব কবি। আমি প্রমথেশ বড়ুয়া, যমুনাকে আঘাত করি। আমি রাক্ষস। আমি দণ্ডকাবণ্যেব বাসিন্দা। আমি রামানুজ। আজ্ঞাবহ। প্রতিশ্রুত। খুঁজছি। আমি শূর্পনখাব নাসিকা কর্তন করেছি দণ্ডকারণ্যে। আমি নাসিকা চাই। সুকর্তিত রক্তোজ্জ্বল নাসিকা। লাইলী, প্রস্তুত হও।

(একটা তীব্র আলোর গোলক লক্ষ্মণের মুখমাত্র উদ্ভাসিত করে রেখেছিল। ক্রমশ অন্ধকার গাঢ় হয়। হয়তো কিছুক্ষণ পশ্চাৎমঞ্চ মৃদু আলোকে প্রস্ফুটিত থাকবে। তাতে দেখা যাবে রাম নিদ্রামগ্ন। শূর্পনখা মাটির ওপর উপুড় হয়ে কর্তিত নাসিকা খুঁজছে। লাইলীব ভয়াবহ চিৎকাব। টেবিলেব ওপর থেকে কিছু কাচেব জিনিস ঝনঝন শব্দে পড়ে ভাঙে। স্তব্ধতা। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে।)

পলাশী ব্যারাক ও অন্যান্য

আমার নাট্যমোদিনী তিন ভগিনী
ফিরদৌস, বানু ও রাহেলাকে

পলাশী ব্যারাক

চরিত্র

হাবিব
মারুফ
মফিজ
হাফিজ
তোফাজ্জল
কামাল
পিওন

স্থান : পলাশী ব্যারাক, ঢাকা

কাল : ১৯৪৮ইং

দৃশ্য : একটি ঘরে ছটা ছোট ছোট চৌকি। মঞ্চের পেছনের দিকে দুটো সম্পূর্ণ দেখা যাবে, বাকিগুলোর বিভিন্ন অংশমাত্র উঁকি দেবে। ঘরের দেয়াল বাঁশের বেড়া। মেঝ, লম্বা তক্তার ফালি দিয়ে কোনো রকমে গেঁথে রাখা হয়েছে। সব কিছুই নড়বড়ে, হরেক রকম শব্দ মানুষজন নড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাক্ষ্য দেয়।

সময়, ভোরের দিক। সদ্যছাড়া বিছানার অবস্থা অত্যন্ত অগোছালো। বেশিরভাগই লুঙ্গি পরে আছেন, কারও গায়ে শার্ট আছে, কারও গায়ে শুধু গেঞ্জি।

চাদর জড়িয়ে জুবুথুবু হয়ে বসে মারুফ অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বই পড়ছে। চোখে পুরু চশমা। ক্ষীণ স্বাস্থ্য। অন্য একটা চৌকিতে বসে মফিজ পা দোলাচ্ছে। নিজের মনের কোনো ব্যক্তিগত অশান্তিতে পুড়ে মরছে, নিরীক্ষণ করছে মারুফের নির্বিকার শান্ত আত্মতৃপ্ত ভাবখানা, আর আরও জ্বলে উঠছে হিংসায়। একটু দেখছে, মুখ খিচিয়ে একটু হাঁটছে, আবার বসছে। টুথপেস্ট ও বদনা হাতে নিয়ে ঝড়ের বেগে, চারদিক কাঁপিয়ে, ঘরে প্রবেশ করল হাবিব। ঠক করে হাতের জিনিসগুলো রাখল, বদনাটা উল্টে ফেলে দিল মেঝের ওপর। সটান এসে দাঁড়াল ঠিক মারুফের মাথার ওপর; ঝুঁকে পড়ে মারুফকে দেখতে থাকে। জোরে একবার নিঃশ্বাস টেনে নেয়, চওড়া চোয়াল আরও বিস্তৃত করে। গরগর করে ওঠে একটা চাপা আক্রোশে। মফিজ কিছু না বুঝে উৎসুক হয়ে ওঠে। হাবিব আচমকা মারুফের হাতের বই হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে পাশের চৌকির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়-]

হাবিব : আপনি অঙ্ক শাস্ত্রের কৃতি ছাত্র, না ? ধরুন এই কাগজ আর কলম। নিন, হাতে নিন। ফ্যাল ফ্যাল করে ও-রকম হাবাগোবা ভাব দেখালেই হলো, না ? নিন বলছি কাগজ আর কলম!

মারুফ : (হতভম্ব) তা তা তা আ- কিন্তু আমি যে-

হাবিব : করুন, হিসেব করুন। দেখি আপনি কত বড় জাঁদরেল ম্যাথমেটিশিয়ান! প্রতি ঘর প্রস্থে চোদ্দ হাত দৈর্ঘ্যে পনের হাত, প্রতি ব্লকে পঁচিশটা ঘর, প্রতি ঘরে দশজন করে মানুষ, সবগুলো ব্যারাক মিলিয়ে এখানে থাকে চার হাজার কর্মচারী। এক একটা ব্লকের জন্য মাত্র একটা করে কল, তাতে পানি থাকবে সকাল সাতটা থেকে দশটা অবধি, কলের মুখের ব্যাস কোয়ার্টার ইঞ্চি, পানি পড়বে ঝির ঝির করে-

মারুফ : এ্যাঁ!

হাবিব : এ্যাঁ নয়, হিসেব করুন। অঙ্ক করে বলুন ঐ পানি দিয়ে মুখ ধোবার আমার কোনো হক আছে কি নেই। হিসেব করে আপনাকে বলতে হবে ঐ পানি অফিসে যাবার আগে আমার রুহ দেখতে পাবে কি না। রোজ দশটা পাঁচটা ভরে তো শুধু সরকারের অডিট এ্যাকাউন্টস করেন আর এই সোজা হিসেবটা বোঝাতে পারবেন না ?

মফিজ : ঠিক! এবার বুঝি বাছাধন কেবল সর্ষে ফুল দেখছেন ? সারাদিন তো দেখছি সাবক্ষণ দিব্যে পুরুষ্টু ড্যামগ্যাড ভাব। সারাদিন ঘোষণা করে বেড়ান উনি নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্কের কৃতি ছাত্র ছিলেন। উপদেশ দিয়ে বেড়ান হিসেবের কড়ির মার নেই, হিসেব করে চলতে জানলে কাউকেই পস্তাতে হয় না। আহাহা, কী আমার হিসেব কবনেওয়ালা রে!

হাবিব : একেবারে থিতিয়ে গেলেন যে! বলুন শিগগির, আমি অফিসে যাবার আগে একবারও কলতলায় পৌঁছুতে পারব কি না। দুনিয়াছাড়া গ্রহ নক্ষত্রের ইয়ের্কি-ফাজলেমীর খবর অঙ্ক কষে বার করতে খুব মজা লাগে না ? আর আমি এতগুলো লোকের মাঝে এতখানি সময়ের মধ্যে কলের পানিতে নিজের নখ ডোবাতে পারব সে অঙ্ক বুঝি কিছুতেই মাথার মধ্যে ঢোকে না ?

মফিজ : ছেড়ে দাও, বেচারা ভিরমি খেয়ে গেছে। দেখছ না কী রকম পচা মাছের মতো ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে রয়েছে।

মারুফ : তুমি বুঝি আজও মুখ ধুতে পারনি!

হাবিব : ব্রাশের ওপর পেস্টের ড্যালা তুলে হাত শই করে মাজবার জন্য মাড়ি পর্যন্ত ঠেলে দাঁত উঁচিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিলাম কিউতে, পাক্কা দেড় ঘন্টা।

মারুফ : তারপরও পারলে না ?

হাবিব : জ্বি না। পনের জন দূরে যখন, তখন হড় হড় করে কিছু অতিরিক্ত পানি উগলে দিয়ে ভ স স্ স করে কলটা বন্ধ হয়ে গেল।

মারুফ : বন্ধ হয়ে গেল ?

মফিজ : সবাই তো আপনার মতো ভোর রাতে উঠে কলতলায় বসে দাঁত মাজতে শুরু করে দিতে পারে না। আমাদের জন্য এ-রকম বন্ধ হয়ে যাবেই। আচ্ছা মারুফ সাহেব, আপনার বিবি বুঝি রোজই সোবেহ সাদেকের সময় উঠে ফজরের নামাজ আদায় করেন ? আপনার এই আদত সত্যি কী করে হলো, বলুন না।

মারুফ : আপনি যত সহজে বদ আদতগুলো আয়ত্ত করেছেন, আমার ভালো অভ্যেসগুলো তার চেয়ে সহজে রপ্ত হয়নি। কিন্তু চাকরটা এক্ষুণি চা নিয়ে আসবে যে। হাবিব সাহেব, বাসি মুখে চা খেতে কষ-কষ ঠেকবে না ?

মফিজ : যতসব দেহাতি থিওরি। মুখ না ধুয়ে খেলে কষ-কষ, ধুয়ে খেলে ফুর-ফুরে-যতসব আজগুবি কুসংস্কার। আরে বেড টি; বেড টি করে মেরে

দাও, তা ভোর সাতটাতেই হোক কি দুপুর দশটায়। মুখ না ধুয়ে খেলেই হলো বেড টি, ঢোক ঢোক করে গিলে ফেলো। মনে হবে গরম পানি দিয়ে মুখ ধোয়া হয়ে গেল। তারপর একখিলি পান, বড় এবং দশা কিমাম মিশিয়ে চিবিয়ে নাও। দাঁতগুলো একটু পেতলা রঙের হয়ে উঠবে বটে, কিন্তু মুখমণ্ডল ভরে উঠবে বিদেশী টুথপেস্টের একটা ওরিআণ্টাল ঠাণ্ডা গন্ধে।

মারুফ	কিড়ে পড়া বড়শির টোপের মতো এক গাদা নোংরা জমা মুখে চা হয়তো সকলের রুচিতে সমান নাও লাগতে পারে।

মফিজ	নইলে বিছানা ছাড় সোবেহ সাদেকের সময়, এস্তেঞ্জা কর কুলুক দিয়ে, তারপর মুখে ব্রাশ পুতে মন্ত্রীর পেয়ারা কণ্ট্রাকটরের তৈরি ভাঙ্গা বদনাতলায় এবাদত কর পানির ফোঁটার জন্য সারা সকাল। বাব্বা! আর দেরি করে উঠলে এন্তেজার কর কিউতে দাঁড়িয়ে, তারপর হাবিবের দশা হলে এন্তেকাল করা ছাড়া কোনো পথই থাকবে না।

মারুফ	ওর কথা ছেড়ে দিন। এখান থেকে পুকুর আর কতদূর হবে। আপনি চলুন গল্প করতে করতে আমিও এক সঙ্গে যাচ্ছি। দেরি করলে চা নিয়ে ছোকরা হয়তো এসে পড়বে।

মফিজ	বাবা অঙ্ক কষে তবে রাস্তা বাতলাচ্ছে, যাও যাও! কতদূর আর হবে বড়জোর আধ মাইল। এতে-যেতে ঘন্টাখানেকের বেশি সময় তো লাগতে পারে না। ইতিমধ্যে চা জুড়িয়ে যাবার অবস্থা হলে কষ্ট করে আমরাই না হয় তা গিলে রাখব।

মারুফ	দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, চলুন।

(চা নিয়ে ভৃত্যের প্রবেশ। একগ্লাস চা, একটা করে বিস্কিট ও পান চার জনের জন্য।)

মফিজ	এই যে বাবা এসে গেছে। দাও, দাও। পান এসেছে তো ? বেশ বেশ। আহা, একি আপনারা এখনও রওনা হননি ? যান যান খামকা দেরি করছেন কেন ?

মারুফ	আপনার আর অত দরদ দেখিয়ে তাড়া না দিলেও চলবে। প্রয়োজনমতো আমরা নিজেরাই চলাফেরা করতে পারব। আপনার আর লেজ মুড়ে হেঁট হেঁট করতে হবে না। কি বলেন হাবিব সাহেব, ধোবেন মুখ ?

হাবিব	দেখুন, মানে, আমি মফিজের মতো নোংরা স্বভাবের লোক মোটেই নই। তবে কি না ভোর থেকে একটানা এতক্ষণ উত্তেজিত ছিলাম যে মুখে ঠিক বাসি লালা জমে আছে বলে একদম মনে হচ্ছে না।

মারুফ	হ্যাঁ উত্তেজনায় লালাক্ষরণ একটু বেশিই হয়।

মফিজ	এটা একটা বিজ্ঞানের সত্য না ?

হাবিব	মুখটা এখন এত তাজা আর হাল্কা ঠেকছে যেন-

মফিজ : যেন মনে হচ্ছে না যে তুমি ঘুম থেকে উঠেছ। মানে গত রাতে তুমি যে ঘুমিয়েছ তার অবসাদ মাড়ির গোড়ায় গোড়ায় ঘন লালায় জমাট বেঁধে নেই, সব ধুয়ে হাল্কা হয়ে গেছে।

হাবিব : অনেকটা, হ্যাঁ হ্যাঁ-আ হ্যাঁ হ্যাঁ-অনেকটা সেই রকম।

মারুফ : বুঝেছি। ধরো তোমার চা। হাঁ করে দেখছিস কী। তফাজ্জল সাহেব আর কামাল সাহেব বাইরে গেছেন। ওদের দু'পেয়ালা চৌকির ওপর রেখে তুই তোর কাজে যা।

(তিন জনে মৌজ করে চায়ে চুমুক দিতে থাকে।)

মারুফ : (অনেক আশা ও উৎসাহ নিয়ে। অন্য দুজন আগের মতোই থমথমে।) বুঝলেন হাবিব সাহেব, কাল রাতে হিসেব করে দেখেছি যে,...

(মফিজেব চোখ-মুখের ভাব দেখে আর এগুতে সাহস করে না।)

মফিজ . ও-কী থামলেন কেন ? বলুন, হিসেব করে আপনি...

হাবিব : আপনি, আপনি আবার একটা হিসেব কবেছেন ?

মফিজ : তাতে তুমি অতো ক্ষেপে উঠলে কেন ? ও হিসেব কবলে তোমার পিত্তি জ্বলে ওঠে কেন ?

হাবিব : না ক্ষেপবে না! আজকে শুধু আমি আর ওর রুমমেটটাই ক্ষেপে উঠেছি। তাও তো কামাল এখনো শান্ত। একদিন সমস্ত ব্যাবাকসুদ্ধ লোক যদি ক্ষেপে উঠে ওকে কতল কবে না ফেলেছে তবে এই আমি কসম কাটলাম, গুড়েব চা নয়, মেড়ো বড় সাহেবেব পেচ্ছাব খাচ্ছি, পেচ্ছাব খাচ্ছি

মারুফ : ছি ছি। কী যা তা বকছ। থাক্ আমি আব তোমাদেব কাছে কোনো কথাই বলব না।

হাবিব · ক্ষেপব না! ভোরবেলায় মুখ ধুতে পাবি না কন্ট্রাকটবেব নাফরমানির জন্য। বেটাকে জেলে পুরতে পারছি না মন্ত্রী শালাব সঙ্গে ওব টাকার সম্বন্ধ বলে; যা বেতন পাই তাতে বৌকে মেরে ফেলতে হবে গলা টিপে, বিয কেনার বাড়তি পয়সা নেই বলে; পাকিস্তানেব জন্য আত্মত্যাগ করতে পারব না দেহ ত্যাগ করতে হবে বলে— আর আমি ক্ষেপব না ?

মারুফ : এ কিন্তু বড় অন্যায়। হঠাৎ আমার ওপর এত খাপ্পা হয়ে ওঠার কোনো মানে হয় না।

হাবিব : না না। আপনাকে তো তোয়াজ করব! প্রতি লহমায় আমরা সব দুশ্চিন্তায় আর দুর্ভাবনায় পুড়ে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছি আর উনি রোজ শুয়ে শুয়ে কেবল হিসেব করেন। হ খুব অঙ্কের বড়াই। বি.এ-তে অঙ্কে ফার্স্ট হয়েছিলেন! তাই বলে আপনি আমাদের চোখের সামনে বসে হিসেব করে আবিষ্কার করবেন যে, আপনি সুখে আছেন ? আর সত্যি সত্যি সেই হিসাবের অঙ্কে বিশ্বাস করে, চোখ মুখ গাল খুশিতে চকচকে তেল্-তেলে করে আপনি আমাদের চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন ? আমরা না

হয় সহ্য করলাম। কিন্তু একদিন যদি এই ব্যারাক শুদ্ধ লোক ক্ষেপে যায়, দেখবেন শকুনের মতো ডানা ঝাপটে পড়ে আপনার হাসিভরা মুখটাকে ঠুকরে খুবলে নাই করে দেবে।

(এমন সময় বাইরের কাঠের বারান্দা দিয়ে বোধহয় দু'জন বেশ মোটা লোক খুব ভারি ভারি পা ফেলে দুদ্দাড় শব্দে ছুটে চলে গেল। দোতালার ঘরের কাঠের পাটাতনও সেই ঝাঁকুনিতে থরথর করে কেঁপে ওঠে। চায়ের পেয়ালা দুটো উল্টে পড়বার উপক্রম হয়। বাঁচাবার চেষ্টায় তিনজনই ঝাঁপিয়ে পড়ে কিন্তু রক্ষা করতে পারে না।)

মফিজ : গেল গেল গেল উল্টে। ঘরের পাটাতন নয়তো শালা হারমোনিয়মেব রীড বানিয়ে রেখেছে। দোতলার বারান্দায় এক ফালি করে তক্তায় পা পড়ছে আর ঘরের মধ্যেও অমনি অন্য প্রান্ত তড়াক তড়াক কবে লাফিয়ে উঠছে সারি সারি।

(কাঠের মেঝের ওপর, যেখানে চায়েব পেয়ালা উল্টে পড়েছে সেখানে, মারুফ আর হাবিব উপুড় হয়ে পড়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে কিছু দেখছে।)

কী ? কাঠের ফাঁক দিয়ে চা চুঁইয়ে চুঁইয়ে নিচতলাব ঘবে পড়তে শুরু করেছে ?

হাবিব : (চাপা গলায়) হুঁ। ফোঁটা ফোঁটা করে নয়, একেবারে ঝরঝব কবে।

(নিচতলা থেকে একটা ক্ষুদে হট্টগোল শোনা যাবে। কিছু লোকের ব্যস্ত নড়াচড়া, কিছু ক্রুদ্ধ অস্ফুট উক্তি।)

মোটাগলা : (নেপথ্যে নিচ থেকে জোরে) বলি ওপরের তালার সাহেবরা, আমবা কি একেবারে আন্ডারগ্রাউন্ড ড্রেনে শুয়েছিলাম না কি ?

মিহিগলা : (নিচ থেকে) একেবারে বিছানার নিচ থেকে নর্দমা তৈরি কবে মাল ঢালছেন মনে হচ্ছে।

মারুফ : দেখুন দোষটা আমাদের পুরোপুরি না হলেও মাফ চাইছি। কিন্তু বুঝলেন আমাদের ওপরের তালার মেঝের তক্তাগুলো, সোজা হিসেবেই, প্রত্যেকটা ছ ইঞ্চি চওড়া। বসানো হয়েছে আধ ইঞ্চি দূরে দূরে। বুঝলেন এতগুলো ফুটো, একটু হিসেব করে দেখলেই বুঝতে পারবেন...

মোটাগলা : এ্যাঁ এ্যাঁ এ্যাঁ ?

হাবিব : নিকুচি করি তোমার হিসেবের। তুমি মুখ বন্ধ কর। (পাটাতনের ফাঁকে মুখ রেখে) শুনছেন নিচুতলার সাহেব ?

মিহিগলা : শুনব না কেন ? কানের ছেঁদায় জ্বলন্ত সিগারেটের বোটা তো ফেলেছিলেন গতকাল, তা আজ শুনতে পাব না কেন ?

মফিজ : (চাপা গলায়) আর সিকিটা-দুয়ানিটা পড়লে বুঝি টেরও পাননি! তখন তো ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাওয়া যায় না।

হাবিব : দেখুন, বোধহয় গ্লাস উল্টে কিছু পানি গড়িয়ে পড়ে থাকবে। আমরা সত্যি তার জন্য লজ্জিত!

মোটাগলা : পানি ? শুধু পানি ? তাহলে ধোঁয়া উঠছে কেন ?

হাবিব : মানে মানে গরম, মানে এই সেদ্ধ পানি ছিল। খারাপ কিচ্ছু নয়, সত্যি পাকসাফ পানি!

মিহিগলা : তা বাবা অত আঁঠা-আঁঠা ঠেকছে কেন ?

হাবিব : হেঁ হেঁ। ও কিছু নয় একটু তলানীর গুড় হবে হয়তো। খারাপ কিছু নয়।

মোটাগলা : গুড়! কী বলছেন সাহেব ? শেষে কি আমাদের পিঁপড়ে দিয়ে খাওয়াতে চান নাকি ?

হাবিব : চায়ের গ্লাস উল্টে গিয়ে কুকাণ্ডটা ঘটেছে। তা মিলেমিশে আমাদের থাকতেই হবে। কথা বাড়ানো মানে সকলের শান্তি নষ্ট। কিছুক্ষণ পর যখন আপনারা উনুন ধরাবেন তখন এখানে আমরা চোখ মেলতে পারব না। চোখ পোড়ানির ওপর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় এ ঘর তখন হয়ে উঠবে শীতের লন্ডন শহর।

মফিজ : ব্যস ব্যস। অনেক হয়েছে। এবার উঠে বসো। হাতের চাটা শেষ কর।

(তিনজনে আবার আসরে বসে। নিচ থেকে শেষবারের মতো মিহিগলা ভেসে আসে— "আল্লার আকাশের ধোঁয়া মাঝ পথে আপনারা আটকে রাখলে আমরা কী করব ?" নীরবতা। গভীর তন্ময়তার সঙ্গে ভাবছে মারুফ। অন্যমনস্ক হয়ে আবার জের টেনে আনে-তার না-বলা কথাটাকে।)

মারুফ : বুঝলে, আমি হিসেব করে দেখেছি, বাড়ি যেতে পারব। পয়সায় কুলোবে।

মফিজ : (ব্যঙ্গ) সত্যি ? অঙ্কে ভুল হয়নি তো ?

মারুফ : (সরল ও উদ্ভাসিত) উহুম। শুধু ধীরে ধৈর্য ধরে এগুতে হবে।

হাবিব : (মরিয়া এবং বিস্মিত) বাড়ি যাবার টাকা তুমি হিসেব করে বার করে ফেলেছ ?

মারুফ : (দুলে দুলে গুনগুনিয়ে) হুঁ। স-ব মিলে গেছে। বুঝলে , আমি হিসেব করে দেখলাম, প্রায় দশ টাকার মতো আমি প্রত্যেক মাসেই জমাতে পারি।

হাবিব : কোন্ কোন্ খাতে কমালে ?

মারুফ : বাসে চড়ব না। ধোপায় দু'বার কম দেব। চুল ছাঁটব না।

মফিজ : তারপর ?

মারুফ : তিন মাস পরে সেটা জমে হবে ত্রিশ টাকা।

মফিজ : সে তো তোমার পথ-খরচাতেই লাগবে।

হাবিব : বৌর জন্য একজোড়া শাড়ি। বড় ছেলেটার জন্য জামা, ছোট মেয়েটার জন্য একটা কিনতে হলেও তোমার আরও পঞ্চাশটা টাকা চাই।

মারুফ : ঠিক আমারও তাই হিসাব। আট মাসে হবে আশি টাকা। আমি তখন বাড়ি যাব।

হাফিজ
মফিজ } (এক সঙ্গে ! ব্যঙ্গ!) ওহ্ তাই। ঠিকই তো।

মারুফ : ঠাট্টা নয়। আমি খুব হিসেব করেই কথা বলেছি। আমার ছ'মাস বাকি আছে।

হাবিব : (ক্ষিপ্ত) মানে ?

মারুফ : দশ টাকা হিসাবে এ মাস নিয়ে আমার বিশ টাকা জমা হলো।

(কল্পনায় বিভোর হয়ে হাসতে থাকে।)

হাবিব : শালাকে খুন করব আমি।

মফিজ : দাঁড়াও কামাল আসুক। ওকে শোনালে একটা হেস্তনেস্ত করে ছাড়বেই।

হাবিব : (বিড়বিড় করে) ওকে নিচতলায় শুইয়ে ওপর তলা থেকে, গরম চায়ের গ্লাস একটার পর একটা ওল্টাতে থাকব।

(খোঁড়াতে খোঁড়াতে তোফাজ্জলের প্রবেশ)

তোফাজ্জল : কার চা, আমারটাই বুঝি উল্টে একাকার করেছ ?

মারুফ : (বই ঘাঁটছে। অন্যমনস্ক। আত্মতৃপ্ত। মৃদু মৃদু হাসি।) হুঁম।

হাবিব : তোমার পায়ে কি হলো আবার। বেরিয়েছিলে তো পায়খানা যাবার কাফেলায়, দুর্ঘটনা ঘটল কখন ?

তোফা : বলো না আর। ভাবলাম এত দূর যখন এসেছি একবার সতেরো নম্বর ব্লকে ঢুঁ মেরে যাই। দু'সিঁড়ি না উঠতেই মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল গোটা কাঠামোটাই। পড়ে পাটা মচকে গেছে।

মফিজ : ও, তাহলে বেশি লাগেনি হয়তো।

হাবিব : ওভারসিয়ার বাবুর নাগাল পেলে না ?

তোফা : ও বেচারাকে গাল দিয়ে লাভ নেই। সতেরো নম্বর ব্লকের অনেক আগেই তিনি আটকে রয়েছেন চিরতরে। এদিকে আসবার ওর ফুরসত কোথায় ? রোজই এ-রকম দু'চারটা সিঁড়ি, পার্টিশন, দরজা ভেঙ্গে পড়ছে। গোটা নির্মাণ প্রকৌশলটাই বড় সূক্ষ্ম। তাকে জিইয়ে জিইয়ে রাখা কি কম হেকমতের কাজ।

(এই নৈমিত্তিক প্রসঙ্গে আলোচনার শেষাংশ শ্রোতারা উৎসাহ দেখালো না। চরম ক্লান্তি ও বিরক্তি তোফাজ্জলের মুখেও। বিদ্বেষ ও হতাশার প্রতীক হাবিব ও মফিজের দিক থেকে সরে চোখ মারুফের হাস্যোদ্দীপ্ত মুখের ওপর পড়তেই তোফাজ্জলও ভ্রূ কুঞ্চিত করে। পলকে সবটা বুঝে নেয়। অন্য দু'জনের মতো তার মুখও কালো হয়ে ওঠে। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে, বদনা হাতে, নাক চেপে ধরে জ্বলন্ত আগুনের

হল্‌কার মতো লক লক করে ঘরে ঢোকে কামাল। হাত সরতেই দেখা যাবে, নাকের ও চোখের আশেপাশে অনেকখানি জায়গা ঢোবলা দিয়ে ফুলে উঠেছে। কৌতূহলে জীবন্ত হয়ে ওঠে তিনটি মৃত প্রাণ।)

কামাল : কোথায় সেই অঙ্কবাগীশ ? আমি একবার তাকে দেখতে চাই। এই যে, পেয়েছি তোমাকে। আর মনে থাকে যেন, এখনও তুমি মনে মনে হাসছিলে। নিজের অঙ্ক নিজেই হেসে হেসেই খুব মাৎ করে দিচ্ছ, না ? ভাঁওতা চলবে না আমার কাছে। যদি মেলাতে না পার তবে তোমার অঙ্কের ছোট বড় একক-গুণিতক সব থেঁতলে একাকার করে দেব।

তোফা : হাস, আরো হাস।

হাবিব : ধর এই খাতা। খুব বড় অঙ্ক কি কামাল ভাই ?

মফিজ : এই নাও কলম, কালি পুরোই আছে।

মারুফ : (কাঁদো কাঁদো) তোমবা আমাকে পাগল বানিয়ে দিতে চাও ?

কামাল : শুধু নিজেব হিসেব চুপিসারে সেরে পালাতে পারবে না। তোমায় দিয়ে আমাদের অঙ্কও কিছু করিয়ে নিতে চাই। বুঝলে ? লেখ।

মারুফ : তোমরা আমায়, বুঝেছি, তোমরা আমায়-

হাফিজ
হাবিব
তোফা } (তিনজন এক সঙ্গে) কিছু বোঝনি। বাছাধন, লেখ বলছি

কামাল : এই দেখ, ইচ্ছে হলে স্কেল দিয়ে মেপে দেখতে পাব। আমার মুখের প্রায় তিন বর্গ ইঞ্চি জুড়ে ফুলে উঠেছে। দু এক সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই উঁচু হয়েছে। লাল রং ওখানে নীল ও কালো হয়ে গেছে। কারণ ঘুষি, আমি ঘুষি খেয়েছি। বলতে পার সে ঘুষির বেগ মিনিটে কত মাইল করে ছিল ?

মারুফ : তুমি আমায় মারবে কামাল ? আমি তো কোনো অন্যায় করিনি। ওরা তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলেছে। আমি একবারও হাসিনি। হাসাহাসি করিনি। সত্যি বলছি বিশ্বেস কর।

হাবিব : বাজে না বকে হিসেব শেষ কর।

কামাল : হ্যাঁ, তার আগে আবো একটা হিসেব আছে। লেখ। লেখ বলছি। পায়খানার দরজা প্রথম মাসেই বহুল পরিমাণে ভেঙে পড়ে। এখন প্রতি দুটো খোপের জন্য মাত্র একটি করে দরজা অবশিষ্ট আছে। সে দরজা টানলে এদিকেও আসে, ওদিকেও যায়। নব্বুই ডিগ্রিতে খোলা থাকলে দুটো খুপরিই থাকবে উন্মুক্ত। অন্য যে-কোনো ডিগ্রিতেই লজ্জা নিবারণে তারতম্য দেখা দিতে বাধ্য।

মারুফ : কিন্তু এর মধ্যে অঙ্ক ঠিক কোন্ জায়গায় আছে তা তো আমি ঠাহর করতে পারছি না।

মফিজ : বুদ্ধি একেবারে চনমন করে উঠল যে। সবুর, অঙ্ক আসছে।

হাবিব : বল কামাল ভাই, তোমার অঙ্ক চলুক। ওকে আমরা ঠেসে ধরে রাখছি।

মারুফ : (চিৎকার করে) বুঝেছি, বুঝেছি। ঐযে তোমরা বলাবলি করছিলে আমাকে কতল করবে, এ বুঝি তাই। বুঝেছি। না না না।

কামাল : খামোশ! অঙ্কটা হচ্ছে : দেড়শ লোক খুপরিগুলো এক ঘন্টার মধ্যে ব্যবহার কবতে চাইলে, কত ডিগ্রি কোণ করে কখন তা খুলবে ? খোলার গতি ও কৌণিক অবস্থানের আনুপাতিক সম্পর্ক কী হবে ? যাতে কবে বিনাদোষে আমার নাকের ওপর, অত্যন্ত বেকায়দায় বসে থাকা অবস্থায়, হঠাৎ এক পশলা ঘুষি এসে না পড়ে।

(ডাক পিওনের প্রবেশ)

পিওন : খৎ হায় সাহাব।

(ছিটকে পাঁচজনই দরজার কাছে এগিয়ে যায়।)

পিওন : একই খৎ হায়। মারুফ হোসেন সাহাব কা।

মারুফ : ওঃ, আমার চিঠি দাও দাও।

(চিঠি ছিঁড়ে পড়তে শুরু কবে। জ্বলজ্বলে হাসিভরা মুখ নিযে। সঙ্গিরা দাঁত চেপে হাসি নিরীক্ষণ কবে। হঠাৎ মারুফের চেহারা পাল্টে যায এবং সে প্রায় ভেউ ভেউ কবে কেঁদে ওঠে।)

মারুফ : ও হো হো, আমার স-ব ভুল হযে গেছে, আমি স-ব ভুলে গিযেছিলাম। ও হো হো, কী ভুলই না কবেছি।

সকলে : এ্যাঁ ?

কী বলছে ও ? কী ব্যাপার ?

কাঁদছে না কি ?

কী ভুলে গেল ?

মারুফ ভুল করেছে ?

মারফ : আমার স-ব ভুল হয়েছে, গোটা হিসেবটাই ভুল হয়েছে।

সকলে : ছি ছি কাঁদছ কেন ?

ভুল তো অমন সকলেরই হয।

কার চিঠি ওটা ?

মারুফ : কাবিনামার শর্তই আমি ভুলে গিয়েছিলাম। বৌ মনে করিয়ে দিল যে, কাবিননামায় নাকি শর্ত দেয়া হয়েছিল যে, ছ মাসে একবার বিবির মুখ দর্শন না করলে পাঁচ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে আমায় তালাক মঞ্জুর করতে হবে। আমি অত টাকা কোথায় পাব ? আমার যে আশি টাকা জমাতে আট মাস কেটে যাবে। ও হো হো-স-ব যে হিসেবে ভুল হয়ে

গেল। ও হো হো।

(মারুফের উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ মূর্তি। বাকি চারজন ফ্যাল ফ্যাল করে বোকার মতো সেদিকে তাকিয়ে থাকে।)

[যবনিকা]

ফিট কলাম

চরিত্র

সুটটাই-পরা ভদ্রলোক
ফিরোজ
লতিফ
রিক্‌শাওয়ালা
দোকানী
রসিক
মুছল্লী
ফক্কড়
পাণ্ডা
চশমাধারি
অভিনেতা
বোরখা-পরিহিতা

[কাল : ১৯৪৮ ইং]

স্থান : আদিম ঢাকা যেখানে নয়া শহরের সঙ্গে গলাগলি করে পড়ে আছে সেই রমনা-দেওয়ানবাজারের সংযোগস্থল। তেমাথার এক মুখে পুরাতন বেতার ভবন, অন্য দিকে বিশ্ববিদ্যালয়, তার উল্টো দিকে যাদুঘর।

দৃশ্য : মঞ্চের পেছনের দিকে কাঠের ফ্রেমে টিন গেঁথে দাঁড় করানো একটা উঁচু বড় পানবিড়ির দোকান। দোকানি বিড়ি তৈরি করছে। একজন চশমাধারি সিগ্রেট কিনছে। দোকানের সামনে একটা রিক্শা দাঁড় কবানো, হয়তো সওয়ারিও দোকান থেকে কিছু নেবে ঠিক করেছিল।

পর্দা উঠবে একটা ভয়ংকর রকম উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে। রিক্শার সুটটাই পবা ভদ্রলোক লাফিয়ে পড়ে লুঙ্গি-গেঞ্জি পরা এক লোককে আক্রমণ কবেছে। রিক্শাব ওপর আগাগোড়া বোরখায় মুড়ি দেয়া একটি মানুষমূর্তি-পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে আছে।)

সুইটাই : বদমাশ! খুন করে ফেলব তোমাকে!

বিকশাওয়ালা: (সাহেবের মুষ্টিবদ্ধ উদ্যত হাত ধরে ফেলে) আরে আরে সাব করেন কী, করেন কী? মানুডারে একদম গাইলা ফালাইবেন না কি !

ধবাশায়ী : ফিরোজ মিয়া, ফিরোজ মিয়া!

(এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ফিরোজ মিয়া নামে যে লিকলিকে লোকটা এগিয়ে এলো, তার গায়ে ফিনফিনে পাঞ্জাবি, বুকে বাহুতে কাঁধে চিকনেব কাজ করা। পায়ে বার্ণিশের লাল পাম্প-সু, পরনে জমকালো বোম্বাই লুঙ্গি। নাকের নিচে ক্ষুদে অথচ গোদা গোঁফ; দু'ধাব মোমে মাজা, ছুঁচোলো এবং ফলা ওঁচানো। অনবরত হাত-পা ছোঁড়ে এবং হাত-পা গোটায়, পানির ভেতর চিংড়ি মাছের মতো। তিড়িং বিড়িং চলন-বলন। কথা শেষ না করেই একটু পেছনে সরে একটা ঘুরপাক দিয়ে আসে, এসেই আবার একটুখানি তেড়ে হম্বিতম্বি করে, করেই থেমে যায়। অঙ্গভঙ্গি করে, মুখ বানায, উপড়ে ফেলার ভাব নিয়ে গোঁফের ফলায় টান দেয়।)

ফিরোজ : (রিকশাওয়ালাকে) ব্যাটা এ কি গোলাপের বটু পেয়েছিস নাকি! কবজি ভালো করে ঠেসে ধর্। আরে ঘুষিটা ছুটে বেরিয়ে গেল যে! (সাহেবকে) বলি সাহেব, এটা কী, এটা কী হচ্ছে? সদর রাস্তায় পড়ে এসব লপ্টা-লপ্টি কীসের? কুস্তি লড়ছেন না কি? রাস্তাটাকে কি আখড়া পেয়েছেন? (ধরাশায়ীকে) আরে, এ যে দেখছি লতিফ মিয়া! ঝটপট উঠে পড়ছ না

কেন ? কোলা ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সদর রাস্তায় চিৎপাৎ হয়ে পড়ে রয়েছ যে, ব্যাপার কী ? দিনে-দুপুরে আসমানের তারা পহরা দিচ্ছিলে না কি ?

(এলোমেলো হাত পা ছুঁড়ে ফিরোজ মিয়া ধরাশায়ী লতিফ মিয়াকে সাহেবের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করে।)

সুটটাই : এক ঘুষিতে তোমার চোখে আমি সর্ষেফুল ঝরিয়ে দেব। বদমায়েশির জায়গা পেলে না আর!

রিক্‌শাওয়ালা: (নেমে পড়ে দু'হাত দিয়ে বাধা দেয়) যা মারছেন, হেই বহুত হইছে। মানুডারে একদম ফাক্‌কি কইরা ফালাইবেন নাকি ?

(পানওয়ালার ভালো স্বাস্থ্য, রসিক লোক। খালি গা, নাভির নিচে লুঙ্গির গেরো। অভাবনীয় ঘটনার সমষ্টি নিয়েই যে স্বাভাবিক দুনিয়া, এই উপলব্ধিতে তার সমস্ত চোখ-মুখ ঝকমক করছে। দোকানের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে মন্তব্য করে।)

দোকানী : হালায় একদম বাইলা মাছ বইনা গেছে অখন। ওয়াখত জানস না, মওকা বুঝস না, হামলা করস ক্যান। মর্‌ অখন!

(খুব নিরীহ পণ্ডিত গোছের চশমাপরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে ছাত্রটি এক গাদা মোটা মোটা বই চেপে ধরে অন্য হাতে আগুনের দড়ি থেকে সিগারেট ধরাচ্ছিল সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এসেছে।)

সুটটাই : (এখন লতিফ মিয়াকেই) হারামজাদকির জায়গা পাওনা আর! বোরখাপরা আওরতের মুখের সামনে বিড়ি উঁচিয়ে তুমি আমার কাছে আগুনের খোঁজ করছিলে, না ?

ফিরোজ : আওরত ? আওরত!

লতিফ : (কোনোক্রমে আক্রমণকারীর আওতার বাইরে হেঁটে গিয়ে মাথা পিঠ লুঙ্গি ঝাড়তে থাকে।) কাজটা খুব ভালো হলো না সাহেব। আখেরে অনেক পস্তাতে হবে সাহেব, এই বলে দিলাম।

দোকানী : হালায় দেখি আবার বুলিও কপচায়। খিচ্‌ক যা, খিচ্‌ক যা! সময় থাকতে থাকতে কাইটা পড়্‌ হালায়!

ফিরোজ : আওরত! আগুনের জন্য আওরতের কাছে যাবে কেন ? আপনাকে এখনও হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি বাড়াবাড়ি করবেন না। আপনি জানেন আমি কে ?

সুটটাই : (দাঁতে দাঁত চেপে মারাত্মক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে আসতে) ওটার স্যাংগাত বুঝি ? আরেকটু কাছে এগিয়ে এসো তো বাছাধন, এতদূর থেকে ভালো করে চিনতে পারছি না তোমাকে।

ফিরোজ : (চিৎকার করে) ভালো হবে না, ভালো হবে না বলছি সাহেব। পুলিশ! পুলিশ! পুলিশ! (পকেট হাতড়ায়) শালার গাঁঠকাটা হুইসিলটা আবার খসাল কখন ?

দোকানী : এই চিজ আবার ফোঁপরদালালি করে ক্যান ? তুমি কেউগা ? মাঝখান থাইকা তুমি আবার পাঁচাল শুরু করলা ক্যান ?

সুটটাই : পুলিশ! পুলিশ তো আমিও খুঁজছি। ইতিমধ্যে তোমার নাকের ছেঁদা দুটো যদি আমি ঘুষিতে চিরকালের জন্য বন্ধ করে দি ? শুধু মুখ দিয়ে শোঁয়াস টেনে টেনে হুইসিল ফুঁকতে পারবে না ? ধাপ্পাবাজির আর লোক পেলে না! আমার সামনে পুলিশের লোক সেজে ধোঁকা দিতে চাও!

দোকানি : (ফিরোজ মিয়ার উদ্দেশ্যে) পুলিশের ভাটকী ? সাবাস মিয়া, একটা জব্বর বুদ্ধি ঠাওরাইছ!

(শান্ত গম্ভীর মুখে ছাত্রটি অনেকক্ষণ ধরে বোরখাধারিকে বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল। সুটটাই পরা ভদ্রলোককেও। ওদিকে রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ততক্ষণে আরও একজন মুছুল্লী গোছের টুপিপরা পথচারী যোগ দিয়েছেন। সাহেবকে তারা প্রাণপণে সামলাতে চেষ্টা করছেন আর সাহেব কোনো বাধাই মানতে চাইছেন না।)

মুছুল্লী : আরে ব্যাপারটা কী হয়েছে ? আপনি অত উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন কেন ? একটু শান্ত হয়ে বলুন কী হয়েছে । লোক দুটো তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না!

ফিরোজ : পালাব, পালাব কেন, যুদ্ধ লেগেছে নাকি ? সরকারের নুন খাই না আমরা ?

লতিফ : (ঘাড় টিপতে টিপতে) খুব পাহলোয়ান হয়েছেন। টিট, সব টিট করে দেব আজ!

সুটটাই : চোপরাও! বদমাশ কাঁহিকা ? বিড়ি ধরাবার উছিলা করে তুমি মেয়ে মানুষের বোরখা ওল্টাতে চাও, আবার পাল্টা এখন সাধু সেজে বুলি ঝাড়ছ! হাড় কখানা আস্ত রাখতে সাধ নেই বুঝি!

(বেতার কেন্দ্রের সৌখিন অভিনেতা একজন : হাউই সার্ট, সিল্‌ক পাতলুন। ক্রেপের জুতো, চোখে শেলের ভারী বড় গগলস। বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র কয়েকজন, একজন একটু ফক্কড় গোছের, একজন রাজনৈতিক পাণ্ডা, একজন একটু কবি-কবি ভাবের, অন্যজন চালাক-চতুর রসিক তরুণ। ক্রমে ক্রমে ঘটনাস্থলে চারদিকে লোকের ভিড় বাড়ছে।)

ফক্কড় : ব্যাটা দেখছি আচ্ছা আহাম্মক! এই ভরদুপুরে সদর রাস্তায় কেউ শিকার খুঁজতে বার হয়! আওরত না মরদ তার নেই পাত্তা! কাপড়ের ফুটো দিয়ে দেখেছো তো কেবল এক জোড়া চোখ! সেই দুফালি নজরের তীরেই একেবারে দিওয়ানা বনে গিয়েছিলে না কি ইয়ার ?

রসিক : আঁখির বাণের পর এবার রুলের গুঁতো আসছে। সইতে পারবে তো বাছাধন ? মারধর করে লাভ কী সাহেব, হাজতে পাঠিয়ে দ্যান ব্যাটাদের। অমন গুণধর প্রেম-পিয়াসীদের আমরা না হয় মিছিল করে পৌছে দিয়ে আসব।

চশমাধারী : কে, রশীদ ভাই না!

সুটটাই : আরে, তুমি যে!

চশমাধারী : দাড়ি শেভ করে ফেলেছেন বলে অনেকক্ষণ চিনতে পারিনি। কিন্তু হাতের ঐ কবজি আর পাঞ্জা একই শহরে দুটো কোত্থেকে আসবে! এখানে দাঁড়িয়ে মিছেমিছি আর সময় নষ্ট করবেন না। লোক দুটোকে আমরা দেখছি। আপনি যান। এই রিক্‌শাওয়ালা চালাও।

মুছল্লী : হ্যাঁ হ্যাঁ। আপনি বরঞ্চ চলে যান, সঙ্গে মেয়েছেলে রয়েছে। এই, তোমরা আবার সটকে পড়ো না যেন!

ফিরোজ : (লতিফকে) টুকে রাখ, নামটা টুকে রাখ। রশিদ মিয়া, আগে দাড়ি রাখত। (মুছল্লীকে) কী বললেন ? আমরা সটকে পড়ব ?

লতিফ : আমাদের কি ঠাউরেছেন ? হ্যাঁ, পালাব কেন ?

ফিরোজ : এই রিকশাওয়ালা, ভাগো মৎ। আমরা পালাব ? আমরা পালাব! পালাবার জুররৎ দেখছি আপনাদেরই বেশি। অন্তত খুব জলদি জলদি সে তাগিদ অনুভব করবেন।

মুছল্লী : কী বলছেন, আপনারা ?

দোকানী : হালারা দেখছি এক্কেবারে ঘাউড়া পদের হারামি! জানের ডব নাই একদম' দেখছনি কি রকম ঘাড়ের রগ টান কইরা আবার পাল্টা চিখ্‌খার পাড়বার লাগছে। এত বাৎ ঝাড়নের হিম্মত হইল ক্যামনে হালাগো!

সুটটাই : (আবাব আস্তিন গুটিয়ে) তোমার দাঁতকপাটি একটু বেশি দেখা যাচ্ছে মিয়া। আরেকবার রা করেছ কি মিয়া মুখের দরজাটা একবারে থেঁতলে মিশ করে দেব।

ফিরোজ : গায়ে হাত তুলবেন না সাহেব, খবরদার! জানেন আমরা কাবা ?

সুটটাই : কে ফেরেশতা নাকি ? দেখি!

লতিফ : সব জারিজুরি এখন ছুটিয়ে দেব না।

ফক্কড় : শালাদের দেখছি বড় বুকের পাটা! দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় বোরখার গাঁঠের দিকে নজর তাক করে থাকবে, আবার ধরা পড়লে পাল্টা হুমকিও দেবে! কোনো গভর্ণমেন্টের লোকটোক নয় তো ?

ফক্কড় : সিভিল সাপ্লায়ের মন্ত্রী-শালার আত্মীয়-ফাত্মীয় হবে হয়তো। কে জানে!

ফিরোজ : (গোঁফে হ্যাঁচকা টান দিয়ে) আমরা সিআইডি-র লোক।

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ সিআইডি-র লোক। ফিরোজ মিয়া কার্ডফার্ডগুলো একবার ফস করে এক নজর সাহেবদের দেখিয়ে নেও তো। চোখ ছানাবড়া বনে যাবে!

মুছল্লী : সিআইডি-র লোক!

অভিনেতা : এ পীক সিচুএশন। সিআইডি -র লোক। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন মৌলবি সাহেব। একটা প্রচণ্ড চপেটাঘাতে সাউন্ড সিকোয়েনস্‌টা কমপ্লিট করে ফেলুন। বলে কিনা সিআইডি-র লোক!

ফক্কড় : এইটা খাসা বলেছো বাবা, সিআইডি-র লোক। তা গোয়েন্দা পুলিশের পো, বোরখার আড়ালে আবডালে ঘোরাফেরা করছিলে কীসের তল্লাশে, সেটা কি শুধু স্টেটের খাতিরে, না নিজেরও কিছু গরজ পড়েছিল ?

রসিক : বাবা রূপের আগুন বড় গণগণে। একবার ছোঁয়াচ লাগলেই পুড়ে ছাই হয়ে যেতে। তা বাবা তুমি নিজের নিরাপত্তা বিপন্ন করে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এতো বেচাযেন হয়ে উঠেছিলে কোন আক্কেলে! ডেঁপোমির জায়গা পাও না আর, সিআইডি-র লোক! এক চড়ে মুণ্ডু খসিয়ে দেব।

পাণ্ডা : এই, এতটা টেম্পার দেখানও ঠিক নয়। তুমি কী করে জান যে ওরা সত্যি সত্যি সিআইডি-র লোক নয়। প্রমাণ পেয়েছো কোনো ?

চশমাধারী : এটা মন্দ বলেননি আপনি। দিনে দুপুরে সদর রাস্তায় মেয়েমানুষের বোরখার প্রান্ত ধরে যারা আকর্ষণ করতে চায় তারা যে রাষ্ট্রের আদত খিদমতগার নয়, এ কথা প্রমাণ করা সত্যি কঠিন।

ফক্কড় : বাবা সিআইডি-র লোক না হয় বুঝলাম। বোরখা ছাড়া বুঝি বাছাধন রাষ্ট্রের শত্রু আর কোথাও খুঁজে পেলে না ? দেলের দুশমনের তল্লাশে আছো সে-কথা বলে ফেললেই হয় বাপু!

মুছল্লী : সিআইডি-ফিআইডি বুঝি না। কোন্ মতলবে মেয়ে মানুষের বোরখায় হাত ওঠালে সেটা এখনও ভালো করে না বলতে পারলে মেরে একেবারে বোবা বানিয়ে ছাড়ব।

ফিরোজ : আমরা সিআইডি-র লোক। আপনি কার্ড দেখতে চান ?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। না না। তা কেন হবে ? আপনাদের কার্ড দেখাতে হবে কেন ? কার্ড আমরা কাউকেই দেখাই না।

ফিরোজ : হ্যাঁ। তাইতো! সরকারের গোপন কাগজ রাস্তায় বিজ্ঞাপনের মতো সবাইকে দেখিয়ে বেড়াব না কি ? যা বলি তাই বিশ্বাস করতে হবে।

লতিফ : এই রাস্তা দিয়ে যে রাষ্ট্রের কত শত্রু সকাল-সন্ধ্যা গা-ঢাকা দিয়ে আনাগোনা করে আপনি সে খবর রাখেন ?

ফক্কড় : কিন্তু বাবা ঐ বোরখায় ঢাকা গোশ্‌তের বোঁচকাটাই যে রাষ্ট্রের শত্রু এটা তুমি খালি চোখে ঠাহর করলে কী করে ? শুঁকে শুঁকে আন্দাজ করেছ না কি ?

মুছল্লী : সিআইডি-র লোক বলেই তুমি তো আর হায়ওয়ান জানোয়ার নও। পর্দা আব্রু সব দলে মাড়িয়ে চলবে তোমরা ?

পাণ্ডা : এটা আপনি কি বলছেন মৌলবি সাহেব! রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য জান কোরবান করতে হবে। আর পর্দাপুসিদার ভাঁওতা দিয়ে দুশমনরা মজা লুটে নেবে ?

দোকানি : হায়, হায়, এইটা কী কন সাব, মাইয়া মানুষ শ্যাষে ফিট কলাম বইনা গেল ? ওস্তাদ, একটা ভালো মওকা হইচে, ফিট কলাম মাল হইলে আর এত বেচায়নী কিসের, লুইটা লও, লুইটা লও!

রসিক : এইটে বেড়ে যুক্তি হয়েছে। সদর রাস্তায় আওরতের বোরখা উন্মোচিত করে অন্তরঙ্গ হও আর ফিফথ কলাম, ফিফথ কলাম বলে চ্যাঁচাতে থাক। সরকার এসে মোবারকবাদ জানিয়ে যাবে।

মুছল্লী : বদমাশ! সিআইডি-র ভড়ং ধরে ভেবেছ রেহাই পাবে? এখনো স্পষ্ট করে জবাব দাও আওরতের বোরখার গায়ে হাত লাগিয়েছিলে কেন? যদি ঠিক মতো জবাব দিতে না পার এখানে জ্যান্ত পুঁতে ফেলব।

ফিরোজ : আওরত, আওরত কে? আপনি কি টিপেটুপে দেখেছেন যে বলে ফেললেন এটা আওরত?

লতিফ : আপনি বুঝলেন কী করে যে ওটা মেয়েমানুষ? আমি তো সেটা যাচাই করে দেখবার জন্য মুখের কাছে চোখ এগিয়ে নিয়ে যাই।

ফিরোজ : জানেন না ঐ শালার ফিফথ কলামরা সব বহুরূপী। হাজার রকম ভ্যাংচা ধরতে জানে?

লতিফ : কত জোয়ান মর্দ ঠোঁটে রং মেখে, কোমর দুলিয়ে, পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে আমাদের আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলিয়ে গেছে। সে-সব খবর রাখেন আপনারা?

(এই নতুন সন্দেহে সবাই বোরখাধারির দিকে হা করে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময় ও সন্দেহ মিশ্রিত দৃষ্টি।)

অভিনেতা : হোয়াট এ টেনশন! কেউ শ্রীইক করছেন না কেন! নিদেনপক্ষে বোরখাধারীর চৈতন্য লোপ!

দোকানি : হাচই তো! কেমন যেন একটু বেশি তাগড়া আর ডাগরডোগর মালুম হইতাছে।

ফক্কড় : মাইরি, আলগোছে একবার ছুঁয়ে পরখ করে নেব না কি?

রসিক : পরোয়া কীসের? ফিফথ কলাম সন্দেহই যখন একবার করলি তখন তাকে পুঁজি করে যত খুশি ঘাঁটাঘাটি করস না কেন, সরকারি ফতোয়া ঠিকই অনুমোদন করবে। আওরত হলে কী হবে, ফিফথ কলাম বলে যখন মনে হয়েছে তখন সরকারিভাবে সবই হালাল।

ফিরোজ : এই লতিফ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? মওকা বুঝে ঢাকনাটা একবারই উল্টে দেখে নিয়ে কেটে পড়ছ না কেন?

লতিফ : হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। দেখি ভিড় পাতলা করুন। আপনারা আর এর মধ্যে বেশি মাথা গলাবেন না। আমাদের দায়িত্ব আমাদের পালন করতে দিন। দেখি, দেখি, আপনার সবে সরে দাঁড়ান দেখি।

দোকানি : লালুস কী বানচোতের! কাউরে বখরা দিবার চায় না বুঝি!

সুটটাই : বোরখার উপর হাত দিয়েছ কি আমি পড়পড় করে তোমার গায়ের চামড়া উপড়ে ফেলব। গা খোলাতে চাও, এগিয়ে এসো।

মুছল্লী : কভি নেহী। নিরাপত্তার বাহানা করে আওরত বেপর্দা করতে চাও ? গর্দান ছিঁড়ে ফেলব তোমার।

চশমাধারী : সিআইডি না বাটপাড় কোথাকার! মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য এখন যতসব ভাঁওতা খুঁজছে। (মুছল্লীকে) আপনি ঐদিকে ঠিক হয়ে দাঁড়ান তো, আমি এদিকে রয়েছি। বোরখা ছুঁয়েছে কি হাড় কখানা গুঁড়ো করে ফেলবেন।

ফিরোজ : কী, এত বড় হুমকি ?

লতিফ : ওস্তাদ, ঐ চশমাটাও নিশ্চয়ই ঐ দলের। চেহারাটা মনে মনে টুকে রাখছি।

ফিরোজ : (উত্তেজনার পঞ্চমে, বক্তৃতার ঢঙে) ভাইসব! রাষ্ট্র আজ এখনো শিশু—

লতিফ : শিশু কী, বল গর্ভজাত। রাষ্ট্রের শত্রু ফিফথ কলামদের পেটে ঝুলে আছে, হাত পা মুচড়ে!

ফিরোজ : থাম তুই! আহাম্মক কোথাকার! ভাইসব-

পাণ্ডা : থাম তুমি। আমি বলছি। (চশমাধারীকে) আপনি কী করে বুঝলেন যে ঐ বোরখাধারি রাষ্ট্রের দুশমন নয়, ছদ্মবেশধারী কোনো ফিফথ কলাম নয় ?

ফক্কড় : সূক্ষ্ম সুড়ং দিয়ে একটু আগে চোখ দুটো দেখা যাচ্ছিল! তখন ঠারেঠুরে কোনো পরিচয় হয়ে গেছে কি না কে জানে !

রসিক : যাঃ কী ফাজলেমি করছিস! দেখছিস না ব্যাপারটা কী রকম সিরিয়াস টার্ন নিচ্ছে। হোক না মেয়েমানুষ, তবু সবটা জানতে হবে তো। যদি সত্যি সত্যি ফিফথ কলাম হয়- অন্তত সন্দেহ যখন হয়েছে তখন লুৎফ উঠিয়ে জবাই করব না কেন ?

ফক্কড় : অত সব বুঝি না বাপু। কলাম তো দেখছি একটা, দিব্যি তাজা এবং পুরুষ্টু বলেই বোধ হচ্ছে। শুধু বোরখা দিয়ে ঢাকা এই যা আফসোস।

মুছল্লী : ওসব ফিট কলামী সিআইডি-ফিআইডির জারিজুরি আমার সামনে চলবে না। আমি যতক্ষণ জিন্দা এই মাটির ওপর দাঁড়িয়ে আছি ততক্ষণ ঐ বোরখার আব্রু নষ্ট করে এমন সাধ্য কারো নেই!

পাণ্ডা : ধর্মাবেগে আপনি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন মৌলবি সাহেব। ভুলে যাচ্ছেন নেতার বাণী : পঞ্চম বাহিনীর হাত থেকে রাষ্ট্রকে বাঁচাবার জন্য আমাদের নির্মম হতে হবে।

ফিরোজ : (মুছল্লীকে) শরিয়তের বুলিতে আপনার চোখ ধেঁধে গেছে। আপনি বুঝতে পারছেন না মৌলবি সাহেব আপনি কাদের খপ্পরে গিয়ে পড়ছেন।

লতিফ : দেখি দেখি একটু সড়ে দাঁড়ান তো, আমি এখনই পরীক্ষা করে দেখছি, মরদ না আওরত।

সুটটাই ও মুছল্লী : (এক সঙ্গে গর্জন করে ওঠে) খবরদার!

ফিরোজ : ভইসব! পঞ্চম বাহিনীর কারসাজি এবার চোখ মেলে দেখুন। দেখুন কী কৌশলে তারা প্রয়োজন হলে শরিয়তের খোলস পরে জনতার চোখে ধুলা

দেয়।

লতিফ : এরা গুণ্ডার ওপরও টেক্কা দিতে ওস্তাদ।

ফিরোজ : চুপ কর, আহাম্মক কোথাকার! ভাইসব! আমরা সিআইডি-র লোক-জাতির মেরুদণ্ড, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রধান হাতিয়ার, আমরা গোয়েন্দা পুলিশ। দেখুন, আপনাদের চোখের সামনে, এই পঞ্চম বাহিনীর দল আমাদের পর্যন্ত কী বকম নাস্তানাবুদ করে ছাড়ছে। নিজের চোখের ঠুলি খুলে ফেলুন, চিনে রাখুন এদেরকে।

লতিফ : (আরও উচ্চগ্রামে) জেনে রাখুন এদেরকে! এদের বুলি মধু মাখানো, কিন্তু এরাদায় বিষ। এদের মুখে মুখোশ, বুকে ফাঁদ পাতা। এদেব মনে বোরখা, দেহে বোরখা। এদের চিনে রাখতে হলে বোরখা খুলে ফেলতে হবে। (আরো চিৎকার করে শ্লোগানের ঢঙে বোরখা-'

পাণ্ডা
ফিরোজ
লতিফ
(সবাই এক সঙ্গে) খুলে ফেলতে হবে!

(মুছল্লী, চশমাধারী ও সুটটাই পরা ভদ্রলোক এবং আরও অনেকে, বাধা দেবার জন্য রিকশার সামনে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ান। কিছুক্ষণেব জন্য মানুষের ভিড়ের আড়ালে রিক্‌শা ঢাকা পড়ে যায়।)

পাণ্ডা : (এগিয়ে এসে) বোরখার মুখটা একবার একটুখানি উল্টে সবাইকে এক নজর দেখিয়ে দিতে আপনাব এত আপত্তি কীসের!

সুটটাই : এক শ' বার আপত্তি আছে। আপনি সন্দেহ প্রকাশ করবাব কে ? আপনি কে ?

পাণ্ডা : আমি ? স্টেটের হিতাকাঙ্ক্ষি।

সুটটাই : আহাহা, কী কথা শোনালেন। কাজেই আপনার সামনে আমাব বিবি-বেটির বোরখা সব সময় উল্টে ধরে রাখতে হবে, না ?

মুছল্লী : কভি নেহী। ইজ্জত শরম আব্রু সব আপনি কিনে নিয়েছেন না কি ?

অভিনেতা : সিচুএশানটা এত ঘোরালো না করে সাহেব বোরখাটা একটু নেড়ে-চেড়ে দেখালে মহিলার অঙ্গ তো ক্ষয়ে যাচ্ছে না!

মুছল্লী : এটা ইংলিস্তান নয়, পাকিস্তান। ইসলামিক স্টেট। যার খুশি সে মুখ বুক উরু দেখাক। কিন্তু যে তা চায় না, তার ঈমান আমি শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়ে রক্ষা করব।

রসিক : এক নজর একটু দেখতে দিলে কিছু এসে যেত না। একেবারে অসূর্যম্পর্শা হয়তো নন।

দোকানি : একটু চাখবার দিলে আপনি যদি আরও বেশি বায়না ধরেন! লালুসে লালুস যদি আপনার বাইড়া যায় ?

ফক্কড় : লোকটাই বা বোরখা একটুখানি ওল্টাতে এত মারমুখো হয়ে বাধা দিচ্ছে কেন ? মেয়েটি তো দিব্যি শান্ত স্মার্ট ভঙ্গিতে সেই থেকেই বসে আছে। একটুও ঘাবড়েছে বলে মনে হয়নি।

রসিক : কে জানে হয়তো ইলোপ করে নিয়ে যাচ্ছে। পালাবার পথে এই ঝামেলা। বোরখা সরালে যদি হঠাৎ কেউ চিনে ফেলে সেই ভয়ে এত হাঁকডাক শুরু করেছে।

ফিরোজ : ভাইসব, এখনও আপনারা সময় থাকতে সংঘবদ্ধ হন। আমাদের নেতা বলেছেন- ঐক্যই আমাদের রাষ্ট্রের মূল বুনিয়াদ।

লতিফ : ইনকিলাব-

ফিরোজ : চোপরাও, আহাম্মক কোথাকার!

পাণ্ডা : আপনি তাহলে সত্যি বোরখা তুলে আমাদের পরখ করতে দেবেন না ?

সুটটাই : অসম্ভব।

মুছল্লী : কভি নেহী।

চশমাধাবী : মগের মুলুক পেয়েছেন ? গুণ্ডার খায়েশ মেটাবার জন্য ফিফথ কলামী জুজুর ভয় দেখালেই বিবির মুখের পর্দা আপনার সামনে তুলে ধরব ?

পাণ্ডা : (তারস্বরে বক্তৃতা) ব্রেদারানে ইসলাম! এই চশমাধারী লোকটাকেও আপনারা চিনে রাখুন। এর কথার ঢং হিন্দুস্তানের কুচক্রী নেতাদের মতো। এ পাকিস্তানে অবিশ্বাসী, যুক্তবঙ্গের উপাসক। আমাদের রাষ্ট্রের কল্যাণকে এ যুবক মশ্‌করা করে। এর জবাব দেবেন না আপনারা ?

ফিরোজ : জরুর, জরুর!

(বেতারকেন্দ্রের একজন মহিলা-শিল্পী অভিনেতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।)

মহিলা : ব্যাপার কী ?

অভিনেতা : পঞ্চম বাহিনীর বিচার শুরু হলো বলে। এখন এখানে আপনার না থাকাই বোধহয় ভালো।

ফিরোজ : ভাইসব, আপনারা সব খামোশ কেন ? জনসাধারণের গভর্নমেন্ট, গভর্নমেন্টের হাতিয়ার, সেই হাতিয়ারের ধার- আমরা সিআইডি-র লোক- সেই আমাদের ধার যারা ভোঁতা করে দিচ্ছে তাদের দুশ্‌মনীর সমুচিত জবাব দেবেন না আপনারা ?

লতিফ : নারায়ে তাকবীর-

পাণ্ডা : খামোশ! ব্রেদারানে ইসলাম, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে আমি আহ্বান করছি আপনাদের। আওরত-মরদ, শরিয়ত-বেশরিয়ত, ইজ্জত-বেইজ্জত, আব্রু-বেআব্রুর কোনো সওয়াল এখানে পয়দা হতে পারে না। জোর কদমে এগিয়ে আসুন, সব্বাই কসম করুন, রাষ্ট্রের শত্রু নিপাত যাক-

লতিফ : বোরখা আমরা খুলে ফেলবই।

পাণ্ডা : এগিয়ে এসে সব্বাই মিলে দেখুন বোরখার অন্তরালে কী বিষধর পঞ্চম বাহিনী গা-ঢাকা দিয়ে পালাতে চাইছে। আসুন- ইনকিলাব-

দোকানি : (চিৎকার করে) ভাইসব, আমার ওউগা কথা আছে। ফিট কলাম স্টেট-উড আমি বুঝি না। আমি খালি কইবার চাই আওরতের গায়ে মরদ, সোয়ামি না হইলে, কোনো বেগানা মরদই হাত লাগাইবার পারে না।

ফিরোজ : তোমার তকবির বন্ধ কর এখন।

দোকানি : হুনেন আমার কথা মিয়ারা। যদি বোরখা তুইলা হাচই পরীক্ষা করন লাগে তবে ও-ই হেই কোণে, আর ওউগা আওরত খাড়াইয়া রইছে। হেয়ারে কন আউগাইয়া খাড়াইতে। তিনি গিয়া লাইড়-চাইড়া দেখুক হাচই বোরখা পইরা মাইয়া না পোলা। এইটুকুনই আমার কথা, রাজি আছেন হগলে!

অভিনেতা : ক্যাপিটাল। কী গভীর নাটকীয় অনুভূতি! কী অদ্ভুত উদ্ভাবনী শক্তি!

রসিক : ইতস্তত করছেন কেন ? যান আপনি, তাড়াতাড়ি করুন। যে-কোনো রকম একটা সুরাহা তো হোক!

ফক্কড় : শুধু চোখ-মুখ দেখে ঠাহর করতে পারবেন না। সারা শরীরে নজর ডালেন যেন।

পাণ্ডা : লজ্জা কীসের ? রাষ্ট্রের খেদমত করতে গেলে, পঞ্চম বাহিনীর ধ্বংস সাধনে এসব লজ্জা-সংকোচ বিসর্জন দিতে হবে বৈকি। সেখানে আমরা ধনী-নির্ধন, ছোট-বড়, মেয়ে-পুরুষ সবাই যে সমান, ঐক্যবদ্ধ। আসুন, আসুন-

লতিফ : এই, দেখি দেখি একটু সরে দাঁড়ান দেখি। এই দিক দিয়ে আসুন, এই দিকে- এ-কী এ্যাঁ!!

ফিরোজ : সোবহানাল্লাহ! এরি মধ্যে আওরত গায়েব হলো কোথায়-

(দুধারে লোকজন সরে গেলে দশর্কবৃন্দও এবার খালি রিকশাটা দেখতে পাবে। গোলমালের মধ্যে সবার অলক্ষ্যে বোরখাধারি কখন যেন নেমে সরে পড়েছে।)

সুটটাই : জোবেদা, জোবেদা কোথায় গেলে জোবেদা ? (চশমাধারীকে) নেমে পড়ল কখন ? কোন্ দিকে গেল ? জোবেদা, জোবেদা, কোন্ দিকে, তুমি কোন্ দিকে গেলে ?

(সবাই একটু হতভম্ব)

ফিরোজ : আমাদের সঙ্গে বুজরুকি না!

লতিফ : বোরখার নিচে ডানা লাগানো ছিল না কি ?

দোকানি : এইটা কী কন ? বোরখাপরা থাকলে কী হইব, ভিতরে একটা মানুষ আছিল। আপনারা যে এলাহী কাণ্ড শুরু করছিলেন সব দেইখা-শুইনা মাইয়াটার জান উইড়া যায় নাই ? তাজ্জব হওনের কী আছে ? জানের লগে

পঙ্খিও ডরের চোটে উইড়া পালাইছে। এর মধ্যে তাজ্জব হওনের কী আছে ?

সুটটাই : জোবেদা, জোবেদা! (বলতে বলতে কিছুটা ব্যস্ত উদভ্রান্তের মতো বেরিয়ে যায়। পেছনে পেছনে চশমাধারীও চলে যাবে।)

পাণ্ডা : লোকটা পালাল না তো। সব যেন কী রকম এলোমেলো হয়ে গেল!

ফিরোজ : লতিফ, তুই বাঁ দিকে যা। খুঁজে দেখ্, বোরখার বোঁচকাটা কোন্ দিকে পালাল। আমি সাহেবের পেছন নিচ্ছি। (সব্বাইকে) এখন আর গাধার কানের মতো খাড়া হয়ে থেকে ফয়দা কী ! দুশ্‌মন তো পালিয়েছে!

(লতিফ ও ফিরোজ, দু'জনের দু'দিক দিয়ে প্রস্থান।)

মুছল্লী : শালার জবর ধোঁকা দিল তো! বেইমান সিআইডি সেজে আমার চোখে ধুলো দেবে। বদমায়েশী কবে বলবে ফিট-কলামনীকে ধরেছি, আব ধরা পড়লে, সিআইডি বলে সাধু সাজবে। আবার সব শেষে হুমকি পর্যন্ত দিয়ে যায়। স্টেট-উড বুঝি না, আমি একাই তোমাদের শায়েস্তা করব।

(লতিফকে অনুসরণ কবে নিষ্ক্রান্ত)

বসিক : কী জ্ঞান আহরণ কবলে ওস্তাদ ?

ফক্কড় : আগামীকাল বিশ্ববিদ্যালয়েব করিডোবে প্রয়োগ করে দেখাব, বিশ্বাসঘাতকতা না কবলে তোকেও দলে টানতে পাবি।

বসিক : হাত মেলা।

(এক সঙ্গে দু'জন বেরিয়ে যায়)

মহিলা : বোরখার নিচে ছিল কী ? পুরুষ না মহিলা? পঞ্চম বাহিনীর একজন যে, একথা মনে জাগল কী করে ?

পাণ্ডা : সব সময়েই সতর্ক থাকতে হবে তো। শিশু রাষ্ট্র, কখন কোন্ দিক থেকে গা ঢাকা দিয়ে কে কী মতলব নিয়ে এগিয়ে আসছে, ওত পেতে বসে আছে, কে জানে! সব সময় সাবধান না থাকলে চলবে কেন! (একটু সরে গিয়ে) শালা আওরতই ছিল না ফিফথ কলামনিস্ট ?

(বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়)

মহিলা : মেয়েটার জন্যে আমার কষ্ট হচ্ছে। আপনার ?

অভিনেতা : আপনারই হচ্ছে, আর আমার হবে না ?

মহিলা : রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বিপদগ্রস্ত হচ্ছে ঐ জন্য, না মেয়েটা পালিয়ে আবার কোনো নতুন বিপদে পড়তে পারে সেই আশঙ্কায় ?

অভিনেতা : কোনোটার জন্যই নয়। আপনি বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, যে-কোনো কারণেই হোক, আপনি মনে মনে দুঃখ পাচ্ছেন-ভেবে, আমিও দুঃখিত।

মহিলা : থ্যাংকস। চলুন এখন এগোনো যাক।

অভিনেতা : আধ মিনিট। সিগরেটটা নিয়েনি। দেখি- (দোকানির কাছ থেকে সিগরেট

নিতে নিতে।) আচ্ছা ঐ লোক দুটো সত্যি সিআইডি-র লোক ছিল নাকি, না এমনি বদমাশ লোক বেকায়দায় পড়ে ভাণ করছিল ?

দোকানি : ক্যাম্বায় কমু! বোরখা পড়লেই মরদ যদি আওরত হইবার পারে তবে আওরত দেখলে গুণ্ডা সিআইডি হইবার পারবো না ক্যান ? রক্তের গন্ধ পাইলে বাঘ বেচায়েন হয় না ? সবই এক জাতের সাব-।

(অভিনেতা ও মহিলা শিল্পীর প্রস্থান। দোকানি মহিলার নিক্রমণ এক চোখ ছোট করে রসিয়ে রসিয়ে দেখে।)

হালায় বোরখা পরাইয়া দিলে মাইয়ায় মাইয়ায়ই বা ফরাগ কী! সবই এক জাত!

[নিজের জীবনদর্শনে নিজেই উদ্ভাসিত]

[যবনিকা]

আপনি কে ?

চরিত্র

তরুণ
ব্রিগেডিয়ার
মোমেন
বাসেত
সর্দার
আগন্তুক
তন্বী
কুলসুম

[রৌদ্রালোকিত প্রখর দ্বিপ্রহর। নির্জন প্রান্তর। উন্নত প্রাচীন বটবৃক্ষ; নিম্নে বিস্তৃত ছায়া।

এক তন্বী। গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে মোটা শিকড়ের আসনে পা ছড়িয়ে বসে। হাতে একটা বই, খোলা। পাশে কয়েকটা বই, সাজানো। থম্ ধরে আছেন। নাকে চশ্‌মা, চোখে আগুন।

এক তরুণ। সাদা শার্ট-পায়জামা পরা। গলায় দূরবিন ঝোলানো। কী ভাবতে ভাবতে ঢোকে, চারদিকে চোখ ঘোরায়। আচমকা মেয়েটিকে দেখে স্তব্ধ হয়ে যায়।]

তন্বী : মনে হলো যেন একবারে আঁৎকে উঠেছেন। কী হলো? ভূমিকম্প না বিষধর সর্প?

তরুণ : আমি যাই।

তন্বী : কোথায়? যে দিকে দু-চোখ যায়? চোখের ওপর, হোক নিজের চোখ, অত আস্থা রাখা সব সময় নিরাপদ নয়। তাছাড়া, দূরবিন লাগালে যে চোখের জ্যোতি বাড়ে না, সে-কথাও বোধহয় এখন আর বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। কি বলেন?

তরুণ : আপনি বিশ্বাস করবেন না, জানি।

তন্বী : কেউ করবে না।

তরুণ : আমি সত্যি দুঃখিত। সত্যি লজ্জিত। বিশ্বেস করুন, আমি ইচ্ছে করে এ পথে আসিনি। কোনো লক্ষ্য, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি। আপনি যে ঠিক এই পথই বেছে নিয়েছেন এবং ঠিক এই গাছতলায় এসে পৌঁছেছেন, এ সম্পর্কে একটু আগেও আমার কোনো ধারণা ছিল না।

তন্বী : বাঃ, ভাষা পর্যন্ত অবিকল রাজনৈতিক নেতার। সংবাদপত্রে প্রেরিত বিবৃতির মতো। সত্য-মিথ্যা কিছু বুঝবার জো নেই।

তরুণ : আপনি আমার সব কথা বুঝে-শুনে গ্রহণ করেন, জানা ছিল না। তাহলে ভালো করে শুনে রাখুন। আজকের পিকনিকের নিয়ম আমি ইচ্ছে করে ভঙ্গ করিনি। যা হয়েছে এটা দৈবাৎ। অনিচ্ছাকৃত।

তন্বী : কী হয়েছে?

তরুণ : এই-এখানে আপনার কাছে এসে পড়া।

তন্বী : তার বিরুদ্ধে সর্দারের কোনো নির্দেশ ছিল নাকি?

তরুণ : নির্দেশ ছিল আমরা গাড়ি থেকে নেমেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ব, যার যেমন খুশি। কেউ কাউকে অনুসরণ করব না, সেধে কারো কাছে যাব না। এক মাইলের মধ্যে থাকব এবং প্রত্যেকেই কিছু না কিছু করব, যতক্ষণ না ব্রিগেডিয়ারের বিউগ্‌ল শোনা যাবে। যখন বাজবে তখন সেই শব্দ শুনে সবাই এসে ঐ জায়গায় মিলব। তারপর খাব।

তন্বী : আপনি যে এবারও ফার্স্ট ক্লাস পাবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কথা বানাতেও পারেন। কথা মনে রাখতেও জানেন- আর চাই কী ?

তরুণ : আপনি আগে থেকে একটা সিদ্ধান্ত করে বসে আছেন। কাজেই আপনাকে দিয়ে অন্য রকম কথা বিশ্বাস করানো কঠিন। কিন্তু আমি সত্যি আপনাকে আগে দেখে, তারপর এদিকে আসিনি।

তন্বী : আসলেও তা স্বীকার করার মতো সাহস বা সততা আপনার নেই।

তরুণ : আমি আসিনি।

তন্বী : মিথ্যে কথা।

তরুণ : আমি চলে যাচ্ছি।

তন্বী : তাতে বাঁচতে পারবেন না। কেউ না কেউ দেখে ফেলবেই। আপনার সহপাঠীদের মধ্যে আবো ক'জন পকেটে করে দুরবিন এনেছেন, কে জানে!

তরুণ : বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক অনেক আছেন, কিন্তু সবাই জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে মগ্ন নন। আর আপনিও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরানন্দময় আকাশে এমন কিছু অদৃষ্টপূর্ব জ্যোতিষ্ক নন, যে, সবাই দুরবিন হাতে নিয়ে হন্যে হয়ে আপনাকে খুঁজে বেড়াবে।

তন্বী : অপূর্ব। আপনি চটে গেলে আপনার ভাষাও একেবারে দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে দেখছি।

তরুণ : নিভিয়ে দিলাম। চলে যাচ্ছি।

তন্বী : আমি আসতে বলিনি আপনাকে। আপনি দুরবিন লাগিয়ে খুঁজে বার করেছেন আমাকে। তারপর পরম নিশ্চিন্ত মনে পথ ভুলে এখানে এসে হাজির হয়েছেন।

তরুণ : আপনার দুঃসাহস দেখে অবাক হই।

তন্বী : আমি আপনার মতো নামজাদা ছাত্র না হতে পারি, কিন্তু ভীতু নই।

তরুণ : ভীতু ? আমি ?

তন্বী : হ্যাঁ, আপনি। সবার সামনে যখন বললাম আপনি আমার সঙ্গে চলুন-

তরুণ : কেন বললেন ?

তন্বী : কেন বলব না ? আপনি আমার চেয়ে পড়ালেখা বেশি করেছেন। আপনার সঙ্গে দু-এক ঘন্টা আলাপ-আলোচনা করায় আমার ষোল আনা স্বার্থ।

তরুণ : সবাই সকল স্বার্থ সমান বোঝে না। তাছাড়া মাঠে মাঠে ঘুরে কাজের কথা আলোচনা হয় না।

তন্বী : ইচ্ছে থাকলে সবই হয়। এলোমেলো মাঠে ছড়িয়ে. বড়শির ছিপ আর দুরবিন কাঁধে ঝুলিয়ে, বিউগল বাজিয়ে যদি পিকনিক হতে পারে, তবে তার মধ্যে কিছু কাজের কথাও হতে পারে। আমি লুকিয়ে কাজ করি না।

তরুণ : অন্যেরা অন্য রকম ভাবতে পারতো।

তন্বী : বয়ে গেল। এখন আমি অন্য রকম ভাবতে পারি না ? এই যে সবার সামনে ভাব দেখালেন আপনি আমার কথা মোটে শুনতেই পাননি—তারপর এখন, এখন এই যে কাণ্ডটা করলেন—এ নিয়ে আমি কিছু ভাবতে পারি না ?

তরুণ : কী কাণ্ড করেছি আমি ? কী ভাববেন আপনি ?

তন্বী : কেন ভাবব না ? আপনি প্রবঞ্চনা ভালোবাসেন। আপনার মধ্যে দু'রকম ভাব। লোকের সামনে একরকম, মনের মধ্যে অন্যরকম, আড়ালে আরেক রকম।

তরুণ : কী যা-তা বলছেন!

তন্বী : একশবার বলব। কেন আড়ালে গিয়ে আপনি দুরবিন লাগিয়ে আমাকে খুঁজে বার করলেন ? যখন বললাম, তখন লোকের ভয়ে সঙ্গে আসতে সাহস হলো না ? এখন যে এলেন, লজ্জা করল না। আমার কথায় মুখ ঘুরিয়ে যখন অন্যমনে অন্য দিকে চলে গেলেন, তখন আমার অপমান হয়নি ? কুলসুম আপা আঁচল চেপে হেসে ওঠেনি ? অত আপনভোলা স্কলারই যদি হবেন, তবে এখন কী করে আবার আমার আঁচলের পিছু পিছু ছুটে এলেন ?

তরুণ : আসিনি। আপনার কেন, কোনো তন্বীর আঁচলই আমার জীবনের ঝাণ্ডা নয়। আঁচলের পতাকা দেখে যারা দিকনির্ণয় করে আমি তাদের দলে নই, এ আপনি ভালো করে জানেন।

তন্বী : না জানি না। আমি যা জানি, তা অন্য রকম। সেদিন আপনি জানেন আমি সিনেমায় যাব-

তরুণ : কী করে জানি ?

তন্বী : হয়তো আমিই বলেছি। সেদিনই আপনিও দৈবাৎ সিনেমার হলে গিয়ে হাজির হন। কোনো অনুষ্ঠানে যদি আমার গান গাওয়ার কথা থাকে তবে আপনি লাইব্রেরি ছেড়ে বেখেয়ালে গিয়ে একেবারে প্রথম সারিতে আসন নেন। সবই দৈবাৎ না ? দৈবের সঙ্গে আপনার এত মিতালি কিসের ?

তরুণ : সত্যি বলছি, আপনি যে এই গাছতলায় এসে-

তন্বী : না কিচ্ছু জানতেন না। একেবারে মাসুম। দুরবিন দিয়ে বুঝি কেবল আকাশ আর গাছপালা দেখেছেন, না ? বটগাছের চূড়া দেখেই বুঝি আপনার প্রকৃতি-প্রেম চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর সেই টানেই সব বন বাদাড় পেরিয়ে-

তরুণ : আমার ঘাট হয়েছে। আমি হার মানছি। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষুধায় খুব কাতর হয়েছেন। নইলে কখনই এ-রকম অবর্ণনীয় ভাবকে ভাষা দিতে পারতেন না। দোষ দেই না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। আরো কঠিন বলতে পারেন। আপনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কথা বলার মতো শক্তি নেই আর।

তন্বী : চলে যান না কেন তাহলে, দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন ? একটু আগেই না একবার বিদায় নেবেন বলে হুমকি দিচ্ছিলেন। ক্ষিদেয় কি স্মৃতিভ্রম ঘটেছে নাকি ?

তরুণ : যাচ্ছি।

তন্বী : দাঁড়ান।

তরুণ : কেন ?

তন্বী : দুরবিনটা আমার কাছে রেখে যান। আপনাকে বিশ্বাস কি! আবার হয়তো ঠিক সন্ধান নিয়ে দৈবক্রমে সামনে এসে হাজির হবেন।

তরুণ : সত্যি বিষ ঢালতে জানেন। আমিও জানি। ক্ষিদের চোটে সত্যি আমার মাথার ঠিক নেই। এই ধরুন দুরবিন দেখবেন, যে ভুল আমি করেছি বলে সন্দেহ করছেন, হাতে দুরবিন পেয়ে নিজে যেন তার পুনরাবৃত্তি করবেন না।

তন্বী : কী ? কী বললেন আপনি ? পরিষ্কার করে বলেন তো আরেকবার।

তরুণ : নিশ্চয়ই বলব। আমি চলে যাচ্ছি। যতদূর পারি। খালি চোখে অন্তত যেন দেখা না যায় এতদূরে। দেখবেন, দুরবিন হাতে পেয়ে আপনি যেন ঠিক পেছন পেছন গিয়ে হাজির না হন। অন্তত বিউগল শোনার আগে তেমন দৈবযোগ না ঘটে।

তন্বী : কী! কী বললেন! আপনি নিচ! আপনি বঞ্চক।

তরুণ : আহা হা! করেন কী ? করেন কী ? ওটা ছুঁড়ে মারবেন না। দামি জিনিস। মাথা ফেটে যেতে পারে।

তন্বী : মারব। একশো বার মারব। সব ভেঙে চুরমার করে ফেলব।

(কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই ইউ.ও.টি.সি-র পোশাক পরা ব্রিগেডিয়ার নামধারী ছাত্রটি নিঃশব্দে গাছের পেছন থেকে বেরিয়ে প্রচণ্ড বেগে বিউগল ফুঁকতে থাকে। খুব গম্ভীর ভাবে। তরুণ মাটিতে বসে পড়ে। তন্বীও।)

তরুণ : আপনিও শেষে এই বটবৃক্ষতলকেই শ্রেষ্ঠ স্থান বলে নির্বাচন করলেন ? হাতে কোনো দুরবিন ছিল নাকি ?

ব্রিগেড : এ্যাঁ ? দুরবিন ? কেন আমার তো বিউগল।

তন্বী : একটা ভালো জায়গা খুঁজে বার করতে আপনার এতক্ষণ লাগল ? বেলা ক'টা বাজে খেয়াল আছে ? আপনাদের এই ভুতুড়ে পিকনিকে, শেষে কি খাওয়ার পাটটাও উঠিয়ে দেবেন স্থির করেছেন নাকি?

ব্রিগেড : অন্যের কথা জানি না। আমি তো জঙ্গলে বসে রাক্ষসের মতো খাবো বলেই পিকনিকে আসি।

তরুণ : সর্দারজী কী এনেছে রে ?

ব্রিগেড : টপ সিক্রেট। তবে ট্রেনে তামার হাঁড়িগুলোর মধ্য থেকে যে-রকম খোশবু আসছিল তাতে মনে হলো, সব রান্না করা এবং বেশ জমকালো গোছের।

তরুণ : কাবাব আর রোস্ট যে আছে, সন্দেহ নেই।

তন্বী : সঙ্গে কিছু মাটির হাঁড়িও ছিল। বোধহয় দই-সন্দেশ কিছু হবে-না ?

তরুণ : আপনার খালি চোখের নজর দেখছি বেশ তীক্ষ্ণ।

তন্বী : জ্বি।

তরুণ : আমার দুরবিনটা এবার ফিরিয়ে দেবেন ? আর সবাই আসতে এত দেরি করছে কেন, দেখি। আর সহ্য হচ্ছে না।

তন্বী : মাটিতেই পড়ে আছে। ইচ্ছে হয় তুলে নিতে পারেন।

তরুণ : ক্ষিদেয় আধা-পাগল, বিভেদের দিকে আর নজর দিতে পারছি নে, নইলে সমুচিত জবাব দিতাম।

তন্বী : তর্ক না করে একটু দেখুন-সর্দারজী খাবারের হাঁড়ি-পাতিলগুলো নিয়ে ঠিক পথে ছুটে আসছেন কি না। ব্রিগেডিয়ার,থেমে কেন। আপনি বিউগল বাজাতে থাকুন। সর্দারজী এখন পথ ভুল করলে প্রাণ রাখা কঠিন হবে।

(এরপর থেকে মাঝে মাঝেই বিউগল ধ্বনি হবে। তরুণ চোখে দুরবিন দিয়ে চার দিকে চোখ ঘোরাবে।)

তরুণ : সর্দারজীর কোনো চিহ্ন নাই। তবে আর সবাই চারদিক থেকে রণ দামামা শুনে বীর সৈনিকের মতো ছুটে আসছেন।

ব্রিগেড : আর সবাই জাহান্নামে যাক। খাবার, খাবার চাই। সদারজী কোথায় ?

তন্বী : দুরবিনটা আমার হাতে দিন একটু।

তরুণ : যা আমি দেখছি না, আপনিও তা দেখতে পাবেন না।

তন্বী : সব জিনিস আপনি মন দিয়ে দেখেন বা শোনেন, এ কথা আমি বিশ্বাস কবি না।

ব্রিগেড : কিছু দেখেছেন ?

তন্বী : না। অন্ধকার।

(গোবেচারা মোমেন ধীরে ধীরে ঢোকে। হাতে বড়শির ছিপ, একটা থলি ইত্যাদি। ঢুকে চুপ করে এক পাশে গিয়ে বসে।)

তরুণ : কাছেই ছিলে নাকি ?

মোমেন : এইতো পুকুরপাড়ে।

তন্বী : আর কিছু জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। উত্তর জানা আছে। পুকুরে অনেক বড় বড় মাছ আছে। কয়েকটা লেগে ছুটে গিয়েছিল, শেষটা তার মধ্যে আবার ঐতিহাসিক ভাবে অতিকায় এবং কৌশলী মৎস্য ছিল, ইত্যাদি।

মোমেন : সকলের সঙ্গে মাছ ধরা নিয়ে ডিস্‌কাস্ করা আমি বন্ধ করে দিয়েছি। আপনাদের কি খাওয়া হয়ে গেছে ?

(ঢোকে কুলসুম তারপব বাসেত তারপর আরও অনেকে।)

কুলসুম : কী, এখনো খাওয়া রেডি হয়নি ? তোমাদের মতো লোকের সঙ্গে পিকনিকে আসা এক ঝকমারি। কেবল তোড়জোড় আর হাঁকডাক, আর যত উদ্ভট প্রোগ্রাম। সর্দারজী কোথায় ? বিউগলের সঙ্গে সঙ্গে না খানা এসে হাজির হয় ?

বাসেত : আপা একেবারে যাচ্ছেতাই। সারাক্ষণ তোমাদের মুণ্ডু চিবিয়েছে।

কুলসুম : নিরস। শুকনো। এখন খানা কোথায় বল। তোমাদের সর্দারজীর এত আড়ম্বরের জারিজুরিটা দেখাও একবার।

মোমেন : আমার কিন্তু সর্দারেব উপর পুরো ঈমান আছে। ওর প্ল্যান কখনো এদিক-ওদিক হয় না। হয়তো আরো নতুন কিছু মজা যোগ হচ্ছে, তাই এই দেরিটুকু-

তন্বী : মজা কি ভেজে খাব নাকি ?

তরুণ : যে জিনিস ভাজা হয়েছে, তার আবির্ভাব ছাড়া, অন্য কিছু আমাদের এখন কাম্য নয়। যদি তাতে বিলম্ব ঘটিয়ে অপর কোনো বস্তু এগিয়ে আসে তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেব। আপাতত সেরূপ বর্বর আচরণে কোনো দ্বিধা থাকবে না। বুভুক্ষা সর্বগ্রাসী, সর্বজয়ী।

কুলসুম : বাপ্‌রে! তুমি বাপু এখনো নকশা করে কথা বলতে পার! আমার সে ক্ষমতাও লোপ পেয়েছে। ব্রিগেডিয়ার তোমার বিউগল বাজাতে থাক— বাজাতে থাক প্রাণপণে— যত জোরে পার, যতক্ষণ পার— দেখি খাবার সুদ্ধ সর্দারজী হাজির হয় কিনা ?

মোমেন : না, না, সে-কী ! উনি নিশ্চয়ই এসে গেছেন। নিশ্চয়ই কিছু একটা আছে এর মধ্যে।

তন্বী : বিউগল বাজাও।

তরুণ : বাজাও। বাজাও কলজে ভরে, গলা ফুলিয়ে, গলা ফাটিয়ে। নিঃশেষে প্রাণ দান করে বিউগল বাজাও। কারণ, যদি সর্দারজী না আসে, আমাদের মরণই ভালো।

সকলে : বাজাও, বাজাও।

(বিউগল উঁচিয়ে প্রথম দু'ফুঁ খুব জোরে দিতেই পেছন থেকে ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসে সর্দারজী উপাধিধারী যুবক। ট্রাজিক নায়কের ভাব নিয়ে হাত রাখে ব্রিগেডিয়ারের কাঁধে।)

সকলে : (এলোমেলো) এ-কী! সে-কী! এ মূর্তি কেন তোমার ? খাবারের হাঁড়িগুলো কোথায় ? ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন ? প্রাণ দিয়েও ওগুলো বাঁচালেন না কেন ?

কুলসুম : আমি বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই নিজে সব সাবড়ে এখন নাটক করছেন।

মোমেন : ছি ছি কুলসুম আপা। সর্দারজীকে আপনি এত নীচ ভাবছেন ?

তন্বী : আপনার ইচ্ছে হয় ওঁকে যত খুশি উঁচুতে তুলে রাখুন, বটগাছের মাথায় নিয়ে বসান, কিন্তু আমি আর সহ্য করতে রাজি নই। ভদ্রমহিলার মতো আচরণ আমার কাছ থেকে আশা করবেন না আপনারা।

তরুণ : অপরাপর ব্যক্তিবর্গকে বলছেন না ?

তন্বী : চুপ করুন আপনি। আপনার কথা স্বতন্ত্র। আপনি পিকনিকে এসেছেন দুরবিন ঘুরিয়ে দুনিয়া দেখতে। আমরা সেজন্য আসিনি।

তরুণ : সে তো ঠিকই। আদর্শগত পার্থক্য।

কুলসুম : সর্দারজী, খাবার কোথায় ?

সকলে : (গোলমাল করে) কোনো রকম বক্তৃতা ছাড়া স্পষ্ট জবাব দাও। কথার চালে আর ভুলছিনে। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে কিন্তু। ও-রকম মুখ ফ্যাকাসে করে ভাঁওতা দিতে চেষ্টা করো না। এ-রকম সর্দারী করতে গেলে দুর্ভোগ আছে তোমার।

মোমেন : তোমরা সব মারবে নাকি ওকে ?

সকলে : জবাব দাও। সঙ্গের খাবার কোথায় গেল ?

সর্দার : নেই।

সকলে : (গোলমাল করে) নেই ? নেই কি ?

তন্বী : নেই ? তা হতে পারে না। ছিল যখন, তখন নিশ্চয়ই আছে । কোথায় আছে, সে খবরটা দিন।

সর্দার : আমি সত্যি, কী বলব, জীবনে এমন-

তরুণ : এমন নির্বিবাদে, এমন সুকৌশলে, এমন অবলীলাক্রমে এতগুলো লোককে আহম্মক বানাননি, তাই না ?

কুলসুম : পিকনিকেব এ-রকম ঘোরালো প্রোগ্রাম তো সর্দারজীর মাথা থেকেই এসেছিল না।

ব্রিগেড : সর্দার এটা যদি তোমার রসিকতার নমুনা হয়, তাহলে কিন্তু এই ঠাট্টার জের টেনে, রাইফেল তুলে আমিও তোমাকে ফটাস করে মেরে ফেলতে পারি।

তন্বী : তাই করুন।

মোমেন : এ্যাঁ! সর্দারজী, ওদের কথার জবাব দিচ্ছ না কেন ?

সর্দার : জবাব দেবার কিছু নেই। তাড়াহুড়োয় ট্রেন থেকে খাবার নামানো হয়নি।

সকলে : (হট্টগোল) কী ? কী ? এখন উপায় ? তুমি লিডার, সর্দার। দায়িত্ব তোমার। যেখান থেকে পার, খাবার জোগাড় কর।

তন্বী : এখান থেকে বাজার কতদূর ?

সর্দার : চার মাইলের মতো।

কুলসুম : দু' ক্রোশ!

তন্বী : আপনি আমার সঙ্গে বাজারে যেতে রাজি আছেন ?

তরুণ : তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারবেন তো ? চলুন।

মোমেন : দেখুন। কিছু যদি মনে না করেন, তবে মানে, আমি শপথ নিয়েছিলাম, এসব নিয়ে কারো সঙ্গে কোনো রকম ডিসকাস্ করব না। তা যদি, মানে, এখন যে-রকম-

কুলসুম : মহা মুশকিল! বলতে চাও বলো, না হলে বোলো না।

মোমেন : ইয়ে মানে, আমি তো সঙ্গে করে ছিপ-বড়শি এগুলো নিয়ে এসেছিলাম-

সর্দার : তুই থাম মোমেন। আমাকে রক্ষা করতে গিয়ে আর ডোবাস নে।

তন্বী : যেমন সর্দার তেমনি স্যাঙ্গাৎ! বলিহারী কল্পনাশক্তি! আপনি টোপ ফেলবেন, মাছ সেটা গিলে ফেলবে, তারপর আপনি আবার সেটাকে টেনে ডাংগায় তুলবেন, তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি করে আমরা সেটাকে ভোজন করব। সমস্যার একেবারে কিউইডি করে ছাড়লেন দেখছি।

মোমেন : না না। মানে আমি তা বলছিলাম না। আমি অত দূরের কথা ভাবিনি।

কুলসুম : কথা যদি অত কাছেই হবে, তবে ভাই এত এলোপাথাড়ি খাবি না খেয়ে টক করে বলে ফেল না কেন ?

মোমেন : মানে, আমি একটা মাছ ধরে ফেলেছি। রুই মাছ। বড়ো। ধরেছি। আমার এ হাতের এই ব্যাগটার মধ্যেই আছে। ওটাকে দিয়ে কিছু করা যায় না ?

(হৈ চৈ। তরুণ দুরবিন হাতে দূরে কী খোঁজে।)

ব্রিগেড : মাছ কৈ দেখি ? বাব্বা ! খাসা মাছ ধরেছিস তো !

তন্বী : বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই বরফ দেয়া মাছ, কিনে এনেছে। টিপে দেখুন।

মোমেন : আমি এইজন্যই এসব কথা ডিসকাস্ করতে চাই না। মাছটা যে একটু আগেও জ্যান্ত ছিল তা ওর চোখ দেখেও বুঝতে পারছেন না ? আঁশ দেখছেন না কী-রকম চকচক করছে ?

তন্বী : নরম কেন ?

মোমেন : নতুন পানির টাটকা মাছ একটু নরমই হয়। বাসি হলে পর একটু শক্ত হয়! বরফে রাখলে আরও বেশি শক্ত হয়। যাক সে-সব কথা। আপনার সঙ্গে আমি এ নিয়ে কোনোরকম ডিসকাস্ করব না।

কুলসুম : কিন্তু শুধু মাছ। কেউ কি নেই কিছু করতে পাবে ?

বাসেত : একটু নুন মশলা তো চাই কুলসুম আপা।

ব্রিগেড : না, কিচ্ছু চাই না। তোমরা আগুন জ্বালো। আমার সঙ্গে ছুরি আছে। পুড়িয়ে খাব। যারা রাজি আছ তারা আমার সঙ্গে থাকতে পার। বাকি যারা-

অনেকে : রাজি! রাজি! কাঁচা যে খেয়ে ফেলছি না তাতেই সংযম ও সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে!

তরুণ : (চোখে দুরবিন লাগানই রয়েছে) আমি রাজি নই।

তন্বী : কেন ?

তরুণ : মনে হচ্ছে আমার ভাগ্যে ভালোখাবারই জুটবে।

(সকলে চমকে উঠেছিল। এবার একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।)

তন্বী : আপনার দুরবিন দেখছি যা চায় তাই খুঁজে পায়।

তরুণ : হয়তো। ব্রিগেডিয়ার!

ব্রিগেড : জী। কী দেখছেন ? কী হুকুম ?

কুলসুম : এ আবার কী লড়ায়ের ময়দানের হাবভাব করছো বাপু। কী দেখছ বলেই ফেল না।

তরুণ : ব্রিগেডিয়ার, নিশ্চয়ই আমরাই লক্ষ্য। যদি নাও হয়, টেনে নিয়ে এসো আমাদের দিকে। জীবনের মতো একবার তোমার বিউগলে সাইরেনের যাদু ডেকে নিয়ে এসো। বাজাও।

(ব্রিগেডিয়ার গভীর আবেগ নিয়ে বাজাতে থাকে।)

সর্দার : (উত্তেজিত) তাইতো! এ-কী ? এ লোকটা কে এদিকে আসছে ? পেছনের কুলি দুটোর মাথায় ওগুলোতে আমাদের হাঁড়ি-পাতিল। ইউরেকা! খোদা তুমি আমার মান রেখেছ।

তন্বী : (তরুণকে) আপনি আত্মভোলা স্কলার। এ-রকম খ্যাতি আপনার আছে।

তাই বলে এই রকম পরিস্থিতিতে দুরবিনটা একলা দখল করে রাখা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। একটু দেবেন আমাকে?

তরুণ : না। এ দুরবিন আপনার চক্ষের শূল, আপদের মূল, অশান্তির কাঁটা। এখন যে আবার চাইতে এসেছেন? দেব না। তাছাড়া দুরবিনের আর কোনো দরকার নেই। খালি চোখেই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। যেই হন, ব্রিগেডিয়ারের বিউগল শুনে শুনে ঠিক আমাদের বরাবর চলে আসছে। পৌঁছে গেল বলে।

সর্দার : ঐ যে লম্বা টিফিন কেরিয়ারটা দেখা যাচ্ছে, কুলির হাতে , ওতে আছে ঢাকাই পরোটা। তিনচার কুড়ি। পেতলের হাঁড়িতে মুরগির রোস্ট, গোটা গোটা। আহা হা! মুর্শিদাবাদের বাবুর্চির তৈরি। অমন আর জীবনে জিবে ঠেকাওনি!

তন্বী : ঐ মাটির হাঁড়ি দুটোর মধ্যে কী?

সর্দার : একেবারে আসল গন্ধবণিকের, প্রাণহরা আর মালাই দৈ।

তন্বী : কী বলেছিলাম!

তরুণ : আপনার কেন দুরবিন দরকার হয় না জানি। আপনার চোখে দুরবিন লাগানো রয়েছে।

কুলসুম : কিন্তু লোকটা কে? তোমাদের এ খাবার উনি পেলেন কোথ্‌থেকে? ওর পরিচয় কী? আমাদের খোঁজ পেলেন কী করে?

সর্দার : সে খবর পরে নেব। কমরেড্‌স, এ্যাটেনশন প্লিজ। আমি আমার সর্দারীটা আবার শুরু করতে চাই। যা বলব সবাই মনযোগ দিয়ে শুনুন এবং সেই মতো চলুন। এই লোকটা যেই হোক না কেন—

তরুণ : অন্যকিছুই হতেই পারে না। স্বর্গীয় দূত!

সর্দার : উনি আমাদের প্রাণ বাঁচাবেন এখন। আমরা যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোনো কার্পণ্য না করি। এক্ষুণি এসে পড়বে। আমার ইচ্ছে ওঁর পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডিয়ার একবার সম্মানসূচক বিউগল বাজাবে। তারপর আমবা সবাই তাঁকে সাধ্যমত রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাব। সময় নেই আব। ব্রিগেডিয়ার!

(নেচে নেচে বিউগল বেজে ওঠে। প্রবেশ করে প্রথমে দুজন মুটে, খাবারের হাঁড়িকুড়ি থালাবাটি কেতলি নিয়ে। পেছনে পেছনে মধ্যবয়সী একজন সাধারণ লোক। প্রথমে হুল্লোড়, তারপর সর্দারের সংকেতে সকলে সংযত। মাঝে মাঝে তবু কারো কারো হাত খাবার সরাচ্ছে।)

সর্দার : কমরেডস্‌ এ্যাটেনশন প্লিজ্‌। (আগন্তুককে) আসুন, আসুন। মাঝখানে এসে বসুন। আপনাকে আজ আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা যে সৌভাগ্য এবং মুক্তির স্বাদ পেলাম তা যুগে যুগে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

তন্বী : আপনি মহৎ, আপনি মহান। দেশের ও দশের কল্যাণ, জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থ আপনার মতো বিচক্ষণ ও তীক্ষ্ণধী ব্যক্তির হাতে পড়লে দুঃখি ও নিরন্নজন নিশ্চিন্ত হতে পারত।

মোমেন : (আপন মনে) মাছটা বোধ হয় পচে যাবে। পুকুরে বেঁধে রেখে এলেই পারতাম। ওঁকে দেখাবার শখ মেটাতে গিয়ে এখন-কি দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে ডিসকাস্ করার!

তরুণ : সৈনিক সঙ্গে ছিল তাই তূর্যধ্বনি দ্বারা আপনাকে আমরা অভিনন্দন জানিয়েছি। মালিনী ছিল কিন্তু মালঞ্চের অভাবে আপনাকে ফুলহার উপহার দিতে পারলাম না। আছে হৃদয় তা মুক্ত ও প্রসারিত করে দিয়ে আমরা আপনাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আপনি আমাদের সংকটকালের মুক্তিদাতা, আপনিই আমাদের একমাত্র পরিত্রাণকর্তা!

কুলসুম : আপনি দেবতা, অবতার,ফেরেশতা, ফকির, দরবেশ, আউলিয়া, সেইন্ট সব!

(কিছু খাদ্য মুখে পোরে)

তন্বী : কিন্তু সত্যি আপনি কে ? আপনি মর্তের না উর্ধ্বের ? সব বিশ্বাস করতে রাজি আছি।

তরুণ : আপনার পরিচয় পেয়েছি আপনার কর্মে। উপলব্ধি করেছি যে আপনি সর্বদর্শী এবং সর্বত্রগামী। বুঝেছি আপনি বুদ্ধ যিশু কৃষ্ণের পরমাত্মীয়।

মোমেন : সর্দারজী। একটা জিন্দাবাদ দিয়ে দি। ই ন কা লা বা—

সকলে : জিন্দাবাদ!

আগন্তুক : আমি সামান্য লোক। আপনাদের দোয়ায়- (প্রতিবাদের গুঞ্জন, আপনি অসামান্য, তুলনাহীন ইত্যাদি) সামান্য চাকরি করি। কিছু অন্যরকম খবর ছিল তাই আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলেছিলাম। বুঝলেন না, সঙ্গের জিনিসপত্রের ওপর কড়া নজর রাখা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। আপনারা যখন হৈ চৈ করে কোনো জিনিস না নামিয়েই নিজেরা স্টেশনে নেমে পড়লেন, ধরা পড়ে যাবার ভয়ে আমি না পারলাম আপনাদের ডাকতে, না পারলাম জিনিসগুলো ছেড়ে নেমে পড়তে। ফলভোগ করলাম। তিন স্টেশন পর ক্রসিং পেলাম, গাড়ি পাল্টে জিনিসপত্র সব নিয়ে এই এখন এলাম। বিউগলের সংকেত জানা ছিল, শুনে শুনে সোজা এখানে চলে এসেছি। সত্যি আপনাদের ভাষা ভাব ভঙ্গি-পিকনিকের এত সব উদ্ভট নিয়ম সংকেত—দেখে প্রথম প্রথম—ওকি আপনারা কেউ কোনো কথা বলছেন না কেন ? হাত তুলে বসে রয়েছেন কেন ? খান। আমাকেও কিছু খেতে দিন। সে-কী ? সব এ র ক ম - ?

সকলে : আপনি কে ? আপনি কে ?

আগুন্তুক : সামান্য লোক। আমি কিছু না, সামান্য চাকরি করি। এই আই বি অফিসে। আপনাদের কোনো উপকারে এসে থাকলে সে মানে-!

[সব নিশ্চল, স্তব্ধ]

একতালা-দোতালা

চরিত্র

বশির
দুলাভাই
ভৃত্য
আয়েষা
আপা

[এক নারী অনেক কাগজপত্র সামনে মেলে রেখে এক পুরুষকে নানা রকম প্রশ্ন করছে এবং মাঝে মাঝে জবাব টুকছে]

নারী : নাম ?

পুরুষ : নাজমুল বশীর।

নারী : লেখা-পড়া ?

বশীর : এমবিবিএস।

নারী : পেশা ?

বশীর : একাধিক।

নারী : যেমন ?

বশীব : ডাক্তাবি। এটাই প্রধান চাকরি। তবে ইলেকট্রিক কিম্বা ইলেক্‌ট্রনিকের যন্ত্রপাতিও মেরামত করি। পত্র-পত্রিকায় লিখি, শাক-সব্জির বাগান কবি।

নাবী : পবিবার ?

বশীব : বিয়ে করিনি।

নাবী : সঙ্গে কে কে থাকে ?

বশীব : আপাতত এক ভাগ্নে, এক আর্দালি।

নাবী : বারান্দায় শাড়ি শুকুচ্ছে কার ?

বশীর : কি বললেন ?

নারী : শাড়ি। বারান্দায়। দেখেননি ?

বশীব : আশ্চর্য!

নাবী . কাকে বলছেন, আমাকে ?

বশীর : আপনি কি শাড়িও গণনা করেন না কি ?

নারী : সব সময় নয়। কখনও কখনও। জবাবের সত্য-মিথ্যা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য সকল রকম প্রশ্নই করতে হয়। তবে লিখি কেবল সেগুলো যেগুলো ছাপান ফর্মে প্রশ্নের আকারে উল্লেখ করা রয়েছে। আপনি চটবেন না। যা ইচ্ছে তা-ই বলবেন আমাকে সম্বোধন করতে যাতে অসুবিধা না হয় সে-জন্যে নিজের নামটা আবার বলে রাখছি, আয়েষা, আয়েষা আখতাব। মিস আয়েষা আখতার।

বশীর : সত্যি সত্যি কোনো রকম গবেষণার কাজে আপনি নিযুক্ত আছেন বিশ্বাস করি না। হাতে এক গোছা প্রশ্নপত্র নিয়ে নিরীহ গৃহস্থকে কিছুক্ষণের জন্য ব্যতিব্যস্ত করে তোলা ছাড়া আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই।

আয়েষা : সব ঘরে উৎপাত করি না। আপনি র‍্যান্ডম স্যাম্পলিং বোঝেন ? এলোমেলো

বাছাই করবারও একটা হিসাব আছে। সেই হিসাবে দৈবাৎ আপনার বাড়ির নম্বর আমার তালিকায় উঠে গেছে বলে আপনাকে উত্ত্যক্ত করছি।

বশীর : আমি সহজে উত্ত্যক্ত হই না। বিশেষ করে না চেঁচিয়ে যারা ধীরে সুস্থে কথা বলতে পারে তাদের দ্বারা কখনই উত্ত্যক্ত হই না।

আয়েষা : কী করলে উত্ত্যক্ত হন।

বশীর : বলব কেন ?

আয়েষা : বাঃ আমাকে না বললে চলবে কেন ? আমিতো এগুলোই খোঁজ করছি। বাড়ি বাড়ি ঘুরে খোঁজ নিচ্ছি পাড়া-পড়শির মধ্যে সুসম্পর্ক বিনষ্ট হয় কেন, কে কাকে কীভাবে উত্ত্যক্ত করে, সামাজিকদের মধ্যে পারস্পরিক মন কষাকষির কার্যকারণ কী কী ? আমার গবেষণামূলক জরিপ কার্যের এটাইতো আসল এলাকা।

বশীর : আমি কখনোই উত্ত্যক্ত হই না। কারো পক্ষেই আমার মেজাজ নষ্ট করা কঠিন। আপনি নিজেও নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছেন যে, যে-কোনো অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ধৈর্য ধারণ করবার ক্ষমতা আমার অপবিসীম।

আয়েষা : বারান্দায় শাড়িটা মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে। তুলে ভালো করে শুকুতে দেব ?

বশীর : কী বললেন ? শাড়ি ? কোথায় ? কার ?

আয়েষা : আমাকে জিজ্ঞেস করছেন?

বশীব : শাড়ি এ বাড়ির নয়। দোতালা থেকে উড়ে এসে পড়েছে।

আয়েষা : শাড়ির বাবা মা আছে ?

বশীর : আছে।

আয়েষা : কী করেন ?

বশীর : অধ্যাপনা।

আয়েষা : শাড়ি নিজে কিছু করে ?

বশীব : বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়া-আসা আছে। আপনি আরো কিছু জানতে চান ? ওরা অবাঙালি। বাপ মা, বাংলা বললে বোঝে কিন্তু নিজেরা বলতে পারে না। মেয়ে ইংরেজি বাংলা উর্দু তিনটেকেই মাতৃভাষা বানিয়েছে। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে ?

আয়েষা : আমি চিনতে পেরেছি। আপনার ওপর তলাতেই ওঁরা থাকেন জানতাম না।

বশীর : এখন জেনেছেন।

আয়েষা : হুম। এসব সত্ত্বেও আপনার ক্ষেত্রে উপর-নিচ তলায় কোনো বিরোধ নেই।

বশীর : এসব সত্ত্বেও মানে কী ? কেন থাকবে। আমরা কেউ চেঁচিয়ে কথা বলি না, এর ওর মাথার ওপর অষ্টপ্রহর ঢেঁকি-মুগুর চালাই না। কোনো গোলমাল নেই। নিরিবিলি যে যার কাজ নিয়ে থাকি। ইচ্ছে হলে তাকাই, না হলে তাকাই না। প্রয়োজন হলে কথা বলি, নইলে বলি না। বিরোধ থাকবে কেন ?

আয়েষা : জি।

বশীর : আরো কিছু প্রশ্ন করবেন ?

আয়েষা : না। তবে মানে আমি আরো কিছুক্ষণের জন্য আপনার এখানে অপেক্ষা করতে পারি ?

বশীর : নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কিন্তু, মানে, কেন ?

আয়েষা : কী বলব ঠিক বুঝতে পারছি না। একজন লোক আমাকে ফলো করছে।

বশীর : বলেন কী ? বেরিয়ে গিয়ে দেখে আসব ?

আয়েষা : না না তার দরকার নেই। আমি চাই ও এসে দেখে যাক।

বশীব : আপনি তা হলে ওকে চেনেন ? কী দেখে যাবে ?

(দরজায় ঠক্ ঠক্ শব্দ)

আয়েষা : চুপ জবাব দেবেন না।

বশীর : কেন ?

আয়েষা : আরো কয়েকবার ধাক্কা দিক।

বশীর : কী যাতা বলছেন। (দরজায় জোরে ঘা পড়তে থাকে) উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে নিয়ে আসুন।

আয়েষা : পারব না।

বশীর : পারব না মানে কী ? আপনার চেনা লোক। এতক্ষণ পরে শেষে আমি গিয়ে ওর সামনে দরজা খুলে দাঁড়াব ?

আয়েষা : কী করবে ?

বশীর : কিছু করার কথা হচ্ছে না। কিন্তু দৈবাৎ যদি-

আয়েষা : অত কথা ভাবার আর সময় নেই। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। যান, তাড়াতাড়ি যান। দরজাটা খুলে দিন। দেরি করছেন কেন, গিয়ে দরজাটা খুলে দিন।

বশীর : আশ্চর্য!

(দরজা খুলে দেয়)

আয়েষা : এ-কী ? এ কোত্থেকে এল ?

বশীর : কী চাই ? কাকে খুঁজছিস ?

ভৃত্য : বড় আপার লাল শাড়িটা নাকি উইড়া আইস্যা আপনার বারান্দায় পড়ছে!

বশীর : ভেতরে এসে নিয়ে যা।

ভৃত্য : তাইতো। বড় আপার শাড়িই তো। শুকনা শাড়ি কি না। বাতাস না লাগতেই উইড়া আইছে।

বশীর : বেশি বকিস না । যা।

ভৃত্য : যাই। যাই আপা।

(প্রস্থান। যাবার সময় দরজাটা টেনে দিয়ে যায়)

আয়েষা : এ-রকম যে ঘটতে পারে আমি আশা করিনি।

বশীর : কী আশা করেছিলেন ?

আয়েষা : মানে, আমি ভাবিনি যে ওপর তালা থেকে কেউ এসে দেখে যাবে ? আমি সত্যি লজ্জিত।

বশীর : যা আশা করেছিলেন তা ঘটলে লজ্জিত হতেন না ?

আয়েষা : আমার কথা ছেড়ে দিন। আপনার কী হবে এখন ?

বশীর : কপালে যাই থাকে তাই হবে। কিন্তু আপনাকে দিয়ে তার সংস্কার সাধন করাতে চাই না। আপনি স্বচ্ছন্দে বিদায় নিতে পারেন।

আয়েষা : আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু ছিঃ ছিঃ। এ আমি কী করে গেলাম। চাকর ব্যাটা ওপরে গিয়ে কত রকম কথা রটাবে কে জানে ?

বশীর : এটা ভদ্র পাড়া এখানকার বাসিন্দারা সকলেই অল্প বিস্তর শিক্ষিত। চাকর-বাকরের কথায় তারা উত্তেজিত বোধ করবে এতটা আমি মনে করি না।

আয়েষা : শুধু চাকর কিনা কে জানে ? হয়তো দূত প্রেরিত হয়ে এসেছিল।

বশীর : সবকিছুই নিতান্ত স্ত্রীলোকের মতো বিচার করছেন। এত লেখা-পড়া করেও মনের গড়ন বদলাতে পারেননি।

আয়েষা : কী জন্যে বদলাব ? যিনি দূত পাঠিয়েছিলেন তাঁর জাত আমার জাত আলাদা নয়। আমার মন যদি ছোট হয় তবে তাঁরটাও তাই।

বশীর : তাঁরটা তা নয়। হতে পারে না।

আয়েষা : কেন, পাঞ্জাবি বলে ?

বশীর : উর্দূ বললেই সকলে পাঞ্জাবি হয়ে যায় না।

আয়েষা : না হলো। মেয়ে মেয়েই, সে দেশিই হোক আর খোট্টাই হোক।

বশীর : খোট্টা খোট্টা করছেন কাকে ?

(বার থেকে কেউ দরজায় ধাক্কা দেয়।)

বশীর : দরজার ছিটকানিটা আবার পড়ে গেল কখন ?

আয়েষা : এসে গেছেন। এবার সামলান।

বশীর : কে এসেছে ?

আয়েষা : কে আবার ? একটু আগে পতাকা গুটিয়ে দূত চলে গিয়েছিল, এবার নিশ্চয়ই মুনিব স্বয়ং এসেছেন। দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, দরজা খুলে সংবর্ধনা জানান।

বশীর : আমার চেয়ে আপনার আগ্রহ বেশি। আপনি যান।

আয়েষা : দেখে নিতে চায় আপনাকে, আমি সামনে গিয়ে দাঁড়াব কোন্ সাহসে ?

বশীর : আপনি তো আচ্ছা মেয়ে মানুষ। গবেষণার নাম করে এখন নাটকের তালিম দিচ্ছেন। অকারণ সন্দেহের বশবর্তী হয়ে কেউ উত্তেজিত হয়ে উঠলেই আমি শরমে-ডরে একেবারে দিশাহারা হয়ে যাব, সে রকম ব্যাচেলর আমি নই।

আয়েষা : আপনার দুঃসাহস বেশি হয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করলে উনি হয়ত আর নিজেকে সামলাতে পারবেন না। মেয়ে হলেও পাঞ্জাবি। হয়তো দরজা ভেঙ্গে ঢুকে পড়বেন।

বশীর : আপনাকে বলছি উনি পাঞ্জাবি নন।

আয়েষা : এই-রে ভেঙ্গে ফেলল বুঝি !

বশীব : ফেলুক! এত ছোট যাব মন তাব কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার। আপনি আরও ঘন হয়ে বসুন।

আয়েষা : আপনি দেখি সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছেন। আমার কিন্তু ভয় করছে।

বশীর : খবরদার আসন ছেড়ে উঠতে পাববেন না।

আয়েষা : অসহ্য! না, না, এ আমি কিছুতেই হতে দেব না।

বশীর : আপনাকে আমি দরজা খুলে দিতে নিষেধ করছি।

আয়েষা : অসম্ভব!

(ছুটে গিয়ে দবজা খুলে দেয়। ঘরে ঢোকেন এক মাঝারি বয়সের মোটাসোটা ভদ্রলোক।)

বশীর : একি, দুলাভাই আপনি ?

দুলাভাই : ডাকাত মনে করেছিলে নাকি ?

আয়েষা : না, মানে, আমি ভয়ে একেবারে-

বশীর : আপনাকে কিছু বলতে হবে না।

দুলাভাই : ডাক্তাব ঠিকই বলেছে। আমাকে বুঝিয়ে বলার কিছুই আবশ্যক নেই। চিকিৎসা ডাক্তারকেই করতে হবে, যা বলতে হয় ওকেই বুঝিয়ে বলেন।

বশীর : রোগী নিয়ে এসব বসিকতা আমি আদৌ পছন্দ করি না।

আয়েষা : (দুলাভাইকে) এ ঘরে ঢুকতে আপনাকে কেউ দেখেছে কি ? বাইরে আপনার আশেপাশে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেননি?

দুলাভাই : একজন'ত পাশেই ছিলেন

আয়েষা কোন দিকে চলে গেলেন ?

দুলাভাই : দরজা খুলতে দেবি হচ্ছে দেখে উনি আর অপেক্ষা করলেন না। দোতালায় উঠে গেছেন কিন্তু সে-সব শুনে আপনার কী লাভ

আয়েষা : আপনি বুঝবেন না ডাক্তাব সাহেব, উনি নিশ্চয় কোনো বদ মতলবে ওপরে উঠে গেছে। আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকছি না। অযথা একটা বিপদ টেনে এনে এখন আপনাকে একা ফেলে রেখে চলে যেতে হচ্ছে বলে আমি সত্যি খুব লজ্জিত।

দুলাভাই . আমি রয়েছি

আয়েষা আল্লা আপনাকেও বক্ষা করুক।

(কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে ছুটে বেরিয়ে চলে যায়।)

দুলাভাই : মেয়েটি কে ?

বশীর : চিনি না।

দুলাভাই : লাখ কথার এক কথা। তোমার আপার কথাই ধরো। কম দিন হলো না, এক সঙ্গে ঘর করছি। কিন্তু তাই বলে কি তাকে আজও ষোল আনা চিনে উঠতে পারলাম ?

বশীর : মেজাজ ভালো নেই, এখন বেশি বাজে বকবেন না।

দুলাভাই : ভাই না থাকারই কথা। কারণ, এই যে এই মাত্র চলে গেল, ও বলে বটে বাংলা কিন্তু জবান বড় কড়া। আমার তো সন্দেহ হয়, তোমার ওপব তলার অতি প্রশংসিত গৃহবাসিনীর মতো ইনিও আসলে পাঞ্জাবিনী, বিপাকে পড়ে বাঙ্গালিনী বনেছেন।

বশীর : আমি হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছি মেয়ে মেয়েই। ওর জাত-বেজাত নেই, ভাষা-অভাষা নেই। বাঙ্গালি হোক, পাঞ্জাবি হোক, লেখাপড়া জানুক আব না জানুক নিচতায় সব সমান। এক সময় না এক সময় মুখোশ খসে পড়বেই।

দুলাভাই : এ অবশ্য আরেকটা দৃষ্টিকোণের কথা। কিন্তু আমি ভাবছি তোমার আপা ওপরে চলে গেলেন বলে ও মেয়ে অতি উত্তেজিত হয়ে উঠল কেন ?

বশীর : কে ? আপা এসেছেন ?

দুলাভাই : তোমার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, তারপর হঠাৎ কি মনে করে ওপর তলার মেয়েটির সঙ্গে আগে একটু গল্প করে আসি বলে তরতর করে ওপবে উঠে গেলেন। আমি বাপু অন্য প্রকৃতির লোক। তোমাদের ভাই-বোনের এই খোট্টাপ্রীতির মর্ম বুঝি না।

(ওপর তলা থেকে বিকটাকার দুমদুম শব্দ ভেসে আসে)

ও কিসের শব্দ ?

বশীর : এ-রকম হতে তো আগে কখনো শুনিনি।

দুলাভাই : ভায়া ক্রমশ সব প্রকাশ পাচ্ছে। পূর্ব পশ্চিম চরিয়ে খাই, জানি না কার ভেতর কি।

বশীর : অসহ্য!

(বারান্দার দিকে বেরিয়ে যায়)

(নেপথ্যে, চিৎকার করে, 'ওপরে এত শব্দ হচ্ছে কীসের ?' চিৎকার করে ওপর তলার ভৃত্য জবাব দেয় "আপা কাপর্ড় কাচতাছেন। কইছেন মুগুর দিয়া না পিটাইলে শাড়ি সাফ হয় না।)

(রাগে গরগর করতে করতে বশীর ঘরে ঢোকে।")

দুলাভাই : সব দোষ তোমার। যদি তুমি উৎসাহ না দিতে তবে ভদ্রমহিলা নিশ্চয়ই সালওয়ার কামিজ ফেলে শাড়ি ধরতেন না। এবং যদি না ধরতেন তাহলে তোমাকেও, মাথার ওপরে বসে, মুগুর দিয়ে পেটাতে পারতেন না।

(দুম দুম্ দুম্। দুম্ দুম্। দুম্ দুম্)

বশীর : (চড়া গলায়) জানি। আমিও জানি। নানা রকম শব্দ তৈরি করার যন্ত্র আমারও আছে। আমিও দেখে নেব।

(বলতে বলতে তার লম্বা করে টেনে ঘরের টেপরেকর্ডারটা বারান্দায় বার করে নিয়ে যায়। ফিরে এসে সেলফ ঘেঁটে একটা টেপ বেছে হাতে তুলে নেয়।)

দুলাভাই : এটা কী ?

বশীর : চিড়িয়াখানার সর্ব প্রকার জীবজন্তুর চিৎকার। বারান্দার কোণ থেকে ওদের ঘর বরাবর স্পীকার তাক করে বসিয়ে টপ ভল্যুমে চড়িয়ে দেব। প্রতিবেশির পেছনে লাগার মজা টের পাবেন। (বেরিয়ে যায়)

(দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।)

(হঠাৎ ওপর তলার শব্দ ছাপিয়ে সিংহ ব্যাঘ্র যাবতীয় বন্য জন্তুর প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি হয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওপর তলা থেকে একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। সব নিস্তব্ধ)

(সদর্পে হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করে বশীর)

দুলাভাই : সাবাস, সাবাস, জোয়ান। বাঙ্গালির মুখ বক্ষা করেছ। এইতো চাই। কেবল মুখ বুঁজে সহ্য কর বলেই, ওদের সাহস এত বেড়ে গেছে।

বশীর : থোতা মুখ ভোঁতা করে দিতে আমরাও জানি।

দুলাভাই : জানলেই হবে। না জানলে টিকে থাকবে কী করে ? চুপ করে সব মেনে যাও বলেই ওরা ভাবে আমরা ভীরু দুর্বল। রুখে দাঁড়াও দেখবে সব ঠাণ্ডা!

(ঠিক মাথার ওপরে শব্দ হতে থাকে ঝম্বর ঝন্ ঝন্ । ঝম্বর ঝন্ ঝনাৎ। ঝন্ ঝন্।)

ও কীসের শব্দ ?

বশীর : হামানদিস্তা!

দুলাভাই : তোমাদের দেখছি বেড়ে জুটি হয়েছে। তুমি এ্যালোপ্যাথিক ডাক্তার উনি হেকেমী দাওয়াখানার হামানদিস্তা চালানকারিণী! সাধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে এত টান।

বশীর : দেখাচ্ছি। আমিও মজা দেখাচ্ছি। কাকে ঘাঁটাতে এসেছ টের পাওনি এখনও। বলতে বলতে ছুটে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়।

(দুলাভাই একলা ঘরের মধ্যে পায়চারি করেন্। মাথার ওপর হমানদিস্তা পূর্ণদ্যমে চলতে থাকে। এবার তৎসঙ্গে শুরু হয় ছাদ পেটানো সুরে খড়্ড়াৎ-খড়্ড়াৎ-খড়্ড়াৎ জোড়া জোড়া শব্দ।)

দুলাভাই : খড়ম পিটিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই সঙ্গে আরেকজন কেউ তাল দিচ্ছেন! (শব্দ বাড়ে) বোধহয় কার্পেট তুলে ফেলেছে, নইলে সবটা একেবারে এত খুলির কাছে মনে হচ্ছে কেন ?

(পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। দুটো পুটলি বানিয়ে নিজের দু'কানে ছিপি এটে দেয়। দলা

পাকিয়ে আরও দুটো বানিয়ে সামনে সাজিয়ে রাখে। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে ঢোকে বশীর। একহাতে একটা ছোট বেঁটে দুরমুজ। অন্য হাতে কাগজের ঠোংগা। মাথার ওপর শব্দ সমান তালে চলছে।)

বশীর : একটু দেরি হয়ে গেল। মোড় পর্যন্ত যেতে হয়েছিল। দুরমুজটা অবশ্য বাগানেই ছিল।

দুলাভাই : দুরমুজ দিয়ে কী হবে। উনি তো থাকেন তোমার মাথার ওপর।

বশীর : দেখাচ্ছি।

(টেবিলটা একটু পবিষ্কার করে তার ওপর চেয়ার চাপায়। টেনে দুলাভাইকে তার ওপর দাঁড় করিয়ে দেয়। নিজে চেয়ার চেপে ধরে রাখে। দুরমুজটা দুলাভাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ইশারায় নির্দেশ দেয়, কি করে সেটা দিয়ে জোরে জোরে ছাদে গুঁতো মারতে হবে। দুলাভাই সোৎসাহে দু'হাতে মাথার ওপরে তুলে জোরে দুরমুজ মারে ছাদে। ঘর কেঁপে ওঠে, ওপরের শব্দ থেমে যায়। বশীর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। দুলাভাই যোগ দেয়। উভয়কে স্তব্ধ কবে দিয়ে ওপরের বাদ্য হামানদিস্তা ও খড়মের শব্দ আরো প্রবল হয়। তারপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে চলতে থাকে। নিচ থেকে দুরমুজ, ওপর থেকে হামানদিস্তা ও খড়ম। বশীর ও দুলাভাইয়ের ঘাম ছুটে যায়।)

বশীর : থামুন একটু। ভেবেছিলাম হয়তো দরকার হবে না। এবার এক রাউন্ড এই চালান দেখি।

(ঠোংগা থেকে লাল নীল কাগজ মোড়া ছোটবড় কয়েকটা পটকা বাব কবে। দুর্মুজের মাথায় একটা পটকা বসিয়ে সাবধানে দুলাভাইয়েব হাতে তুলে দেয়। দুলাভাই ছাদ বরাবর তুলে তাক্ ঠিক কবে। ওপব তালার শব্দ আবেকবার বাড়তেই প্রচণ্ড বেগে দুরমুজ মারে। বোমা ফাটার ভয়ানক শব্দ হয়। ওপর তলায় কে যেন চিৎকার করে ওঠে। স্তব্ধতা। দুদ্দাড় করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসে এক ধাক্কায় যিনি দবজা খুলে ঘবে ঢোকেন তিনি বশীরের আপা।)

দুলাভাই : এই যে, তুমি এসে পড়েছ দেখছি। সব কি রকম দেখলে ?

আপা : পাগল। তোমরা সব বদ্ধ পাগল। বন্ধ করবে এসব ?

বশীর : কেন ? শুরু করেছে কে ?

আপা : সে নিয়ে তোর সঙ্গে আমি তর্ক করতে পারব না। সব দোষ আমারই আমি কী করে জানব যে ওদের চাকব ছোকরা আগে থেকেই ওকে তোর ঘবে কে-না-কে এসেছিল তার সম্পর্কে অনেক কথা শুনিয়ে রেখেছে। বাড়িতে অন্য কেউ নেই, আমি যেতেই জিজ্ঞেস করল তোব ঘরে কে এসেছে। কিছু না বুঝে ফস করে বলে ফেললাম, কি করে জানব, দবভাই খোলাতে পারলাম না।

বশীর : আপনি এ কথা বলতে পারলেন ? উহ কী ঝামেলাতেই না পড়লাম।

আপা : শুনে রেগে লাল হয়ে ও গুদাম থেকে মুগুর হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

দুলাভাই : এ্যাঁ ?

(পড়ে যেতে যেতে সামলে নেয়)

আপা : তারপর সোজা গোসলখানায় পিঁড়ি পেতে বসে পানিতে ভেজান শাড়ি দমাদম মুগুর দিয়ে পিটিয়ে সাফ করতে লেগে গেল।

বশীর : উচিত হয়নি। সর্দিতো আছেই, গতরাতে টেম্পারেচারও ছিল।

আপা : এত যদি জানতেই তবে সকাল বেলা ওপর তলায় ছুটে না গিয়ে দরজা সেটে নিজের ঘরে বসে থাকলে কেন ?

দুলাভাই : তাই বলে ও মুগুর দিয়ে শাড়ি পিটবে।

আপা : সে-সুখও তোমাদের সহ্য হলো না। এমন বাঘের হুংকার ছাড়লে যে ওর হাতের মুগুর পিছলে পড়ে পায়ের একটা আঙ্গুলই থেতলে গেল!

দুলাভাই : ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

বশীর : কোন্ আঙ্গুলে লেগেছে ? কোন্ পায়ের কোন্ আঙ্গুলে ? থেতলে গেছে মানে কী ? নীল হয়ে ফুলে উঠেছে ?

আপা : আমাকে দেখতে দিলে তো। এসে বসল হামানদিস্তা নিয়ে, তোর মাথার ওপর। আমিও ক্ষেপে গেলাম। গোসলখানা থেকে খড়ম জোড়া তুলে নিয়ে ওর সঙ্গে তাল ঠুকতে লাগলাম।

দুলাভাই : ও-জন্যে তোমাব লজ্জা বোধ করা উচিত।

আপা : বলতে এতটুকু লজ্জা হলো না তোমার! মেয়েটার কি আর কিছু বাকি রেখেছ তোমরা ? মাথার ওপবের দিকে তোমরা দুবমুজ চালাতে পার স্বপ্নেও ও মেয়ে ভাবতে পারেনি। হঠাৎ এত চমকে ওঠে যে হাতের তাল সামলাতে না পেরে একটা আঙ্গুলই নিজের হামানদিস্তায় পিষে দিল।

বশীব : কী বললেন ? মিথ্যে কথা। কোন্ আঙ্গুল ? নিশ্চয় বাঁ হাতের যে আঙ্গুলে পাথর বসান সোনার আংটি পবানো।

আপা : জানি না বাপু। ইচ্ছে হয় নিজে গিয়ে দেখে এস।

বশীর : আমি যাব ?

আপা : তুমি যাবে না তো আমি যাব ! অজ্ঞান হয়ে দাঁত কপাটি লেগে যে মেয়ে উল্টে পড়ে আছে আমি চিকিৎসা কবে তার জ্ঞান ফেরাতে পারব ?

বশীর : (আর্তনাদ কবে ওঠে) অজ্ঞান হয়ে পড়েছে ?

আপা : ওকি লোহালক্কড় নাকি, অজ্ঞান হবে না ? দালানে দাঁড়িয়ে পায়ের নিচে বোমা ফাটতে শুনলে মানুষ অজ্ঞান হবে না ?

বশীর আমি যাই আপা।

(আচমকা চেয়াব ছেড়ে দিতেই দুলাভাই গড়িয়ে নিচে পড়ে যায়। বশীব কোনো বকমে স্টেথিসকোপটা হাতে তুলে নিয়ে দবজাব দিকে ছোটে। এক

নজর পেছনের দিকে তাকিয়ে) ওঁর কিছু হয়নি আপা। যদি জ্ঞান হারিয়ে থাকেন তবে মাথায় কিছু পানি ঢেলে দেবেন। (ছুটে বেরিয়ে যায়)

(আপা দুলাভাইকে টেনে তোলে। আপার হাত থেকে নিয়ে এক গ্লাস পানি খায়। রুমালে মুখ মোছে। আপা ঘর গোছাতে চেষ্টা করে। দৌড়ে এসে দুলাভাই পটকাগুলো ঠোংগায় ভরে, সন্তর্পণে এক কোণে ঠেলে রাখে। আপা ব্যাগ থেকে চিরুনি বার করে দিলে তা দিয়ে চুল আঁচড়ে নিয়ে আপার পাশে গিয়ে বসে। ওপর থেকে সঙ্গীতের মৃদু রেশ ভেসে আসে। ছাদের দিকে চোখ উল্টে দিয়ে দুলাভাই বিস্মিত হয়।)

আপা : ওদের নতুন রেডিওগ্রাম। আমাকে বলছিল। কোথায় যেন গোলমাল হওয়াতে ওরা কেউ বাজাতে পারছিল না। বোধ হয় বশীর গিয়ে এখন ঠিক করে দিল।

দুলাভাই : (সুরের সঙ্গে দেহ দোলায়) আরেকটু জোরে বাজালেই পারে, আমরাও শুনতে পারতাম।

আপা : তোমার যেমন কাণ্ডজ্ঞান।

(মৃদু সংগীত ধ্বনি বুকে করে করে পর্দা নামে)

মিলিটারী

চরিত্র

মেয়ে
তরুণ
ওস্তাদ
পাগলা
মিলিটারী দুজন

[অন্ধকার রাত। বন্ধ গলি। গলির খোলা মুখ মঞ্চের ডান দিকে। বাঁ দিকের শেষ বাড়ির সদর দরজা। দরজার সামনে এক ফালি খোলা বারান্দা, চওড়া নয়, কিন্তু রাস্তা থেকে কিছু উঁচু। মঞ্চের পেছনটা গলির ওপার, এক সারি ঘরবাড়ির আভাস দেয়া। গলির এপারে দর্শক।

মঞ্চের দু'ধারে ঢেউটিনের দুটো বড়ো ডাস্টবিন। ডান ধারের ডাস্টবিন ঘেঁষে একটা ল্যাম্পপোস্ট। তার আলোটা না থাকার মতো। আলোহীন মঞ্চ। নিরব। স্তব্ধ। সামনে বাস্কেট ঝোলানো সাইকেল চড়ে অত্যন্ত বেগে সিগারেট মুখে এক তরুণ প্রবেশ করে। সাইকেলটা বারান্দায় ঠেকিয়ে রেখে লোকটা অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কী ভাবে। সাইকেলের আলোটা নিবিয়ে দেয়। প্রায় আস্ত সিগারেটটাই না নিবিয়ে ছুঁড়ে মারে ডাস্টবিনের মধ্যে। সাইকেলেব ঘন্টাটা বিশেষভাবে বাজায়। তারপর বারান্দার অন্ধকারে নিজেকে বিলীন করে দেয় যেনো।

ভেতর থেকে সন্তর্পণে কে দরজা খুলতেই এক ঝলক আলো ছিটকে পড়ে গলির বুকে। একটি উনিশ কুড়ি বছরের মেয়ে ঘরের চৌকাঠে পা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ায়। ভয় পাওয়া-না-পাওয়ার মধ্য-সীমানায় গলা রেখে অন্ধকারে স্থিরদৃষ্টি মেলে ধরে। মেয়েটি কথা বলে।]

মেয়ে : কে ? ওখানে কে ?

তরুণ : আমি।

মেয়ে : তুমি ? কি ভয়ই পেয়েছিলাম!

(অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে দরজায় পিঠ দিয়ে সারা মুখে আলো মেখে মেয়েটি স্থির হয়ে দাঁড়ায়।)

তরুণ : তোমার চোখে, মুখে গলায়- তোমার দাঁড়াবার আঁকাবুকি রেখামালার কোনোখানে, ভয়ের চিহ্নমাত্র ছিল না।

মেয়ে : কিসের চিহ্ন ছিল!

তরুণ : লোভের (গর্বের) গ্রাসের।

মেয়ে : তোমাব সঙ্গে উদ্ভট কথার পাল্লা দিয়ে জিতব, এত জ্ঞানবুদ্ধি আমার নেই। দোহাই তোমার, আমার বুকের কাঁপুনি এখনো থামেনি। দুটো সোজা কথার জবাব দেবে ?

তরুণ : এত সহজে আর সাগ্রহে তুমি হাব মেনে নাও যে, যখন ষোল আনা জিতবে তখনও আমি তা টের পাবো না।

মেয়ে : ক্ষতি কী ? ও কথা থাক। আমি সত্যি ভয় পেয়েছি। এখানে এ-সময় তুমি এলে কী করে ?

তরুণ : দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

মেয়ে : জবাবের ছিরি দেখ। তাই বলে এত রাতে? কারফিউর মধ্যে ? দাঙ্গাকে ভয় পাও না মানলাম— কিন্তু তাই বলে মিলিটারীকে ? শহর শুনেছি এখন মিলিটারীর হাতে। কারফিউর পর রাস্তায় কাউকে নড়তে চড়তে দেখলে ওরা নাকি সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়ে।

তরুণ : হবে হয়তো। এখন পর্যন্ত আমার গায়ে একটাও লাগেনি।

মেয়ে : কী অলুক্ষণে কথা। তুমি ছেলেমানুষ নও। এসব পাগলামো তোমাকে শোভা পায় না।

তরুণ : আমি মনে-প্রাণে সত্যিকারে পাগল হতে জানি না, বরাবর এই অভিযোগই তোমার কাছ থেকে শুনে আসছি। হঠাৎ সুর বদলালে কেন ? ভয় পেলে নাকি ?

মেয়ে : আমি ? কী দেখে বুঝলে ?

তরুণ : তোমার কপালের ঘাম। তোমার হাতের দোমড়ানো আঁচল।

মেয়ে : খুব সাহসী হয়েছো।

তরুণ : দেখে খুশি হও। দিনের আলোতে দশজনের মাঝখানে যে আমি শুধু কথার ফুলঝুরি- বিশ্বেস কর শমি- এই মুহূর্তে, এই ঘোর অন্ধকাবে , নির্জন নিষিদ্ধ রাতে আমি অন্য মানুষ। আমি ভীরু নই। তুমি সাহস কবে আমাকে ডেকে ঘরের ভেতরে এসে বসতে বলো।

মেয়ে : না। সব মিথ্যে কথা।

তরুণ : এই কারফিউ, কালো, অন্ধকার, মিলিটারী টহল- এগুলো মিথ্যে কথা ?

মেয়ে : কতক্ষণের জন্য সত্য ? সকাল বেলা যখন এর কোনো ঠাঁই থাকবে না, তখন তুমি তুমিই থাকবে। কাজের কথার মানুষ বনে যাবে। তোমার নিজের লেখা সম্পাদকীয় প্রবন্ধের নিরাপদ উচ্চচিন্তায় তোমার ভেতরটা গম্‌গম্‌ করতে থাকবে। তোমার উন্নতির সোপান, তোমার পরম শ্রদ্ধেয় মুরুব্বিদের কাল্পনিক ভ্রুকুটিতে সন্ত্রস্ত হয়ে তখন কি তুমি আমাকে আছড়ে মেরে ফেলবে না ? তুমি চলে যাও এখান থেকে।

তরুণ : তুমি অবুঝ। আমি চললাম।

মেয়ে : সে-কী ? এই কারফিউয়ের মধ্যে কী করে যাবে ?

তরুণ : যেমন করে এসেছি।

মেয়ে : কেন এলে ?

তরুণ : তোমাকে বলতে।

মেয়ে : কী বলতে ?

তরুণ : তুমি আলোতে। আমি অন্ধকারে । এতদূরে দাঁড়িয়ে সে-কথা বললে তুমি বুঝতে পারবে না।

মেয়ে : বুঝতে চাই না। তোমার আমার সমাজ আলাদা, জগৎ আলাদা; স্বভাব, প্রবণতা সব আলাদা এসব কথা আমি কেন বুঝতে চাইব ? ধীরে সুস্থে এগুনো দরকার, অপেক্ষা করা উচিত, নইলে কারো মঙ্গল নেই! আমার

বাবা আত্মহত্যা করতে পারেন ! তোমাব চাকরি খোয়া যেতে পাবে! এত কাণ্ডজ্ঞান দিয়ে আমি কি করব, বলতে পার ?

তরুণ : আরেকটু আস্তে কথা বল। শান্ত হও। আমাকে ভিতবে এসে বসতে দাও, লক্ষ্মীটি। চারদিকের আবহাওযাটা আমাব ভালো ঠেকছে না। কিছু অঘটন ঘটা অসম্ভব নয়।

মেয়ে : আমি পরোয়া কবি না।

তরুণ : দূরে একটা ট্রাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা আর নিরাপদ নয়।

মেয়ে : কে চায় নিরাপত্তা। আমার বয়স হয়েছে। আমি কচি খুকি নই। আমি পড়ালেখা শিখেছি। দবকাব হলে খেটে খেতে পারব। আমি ঘব সংসাব চাই, তোমাকে চাই। এছাড়া আমার কোনো সমাজ নেই, ধন নেই, এ তুমি জান।

তরুণ : এ তোমাকে বলতে হবে কেন ?

মেয়ে : যা বলার তুমি তা কেন বলতে পারলে না।

তরুণ : বলব বলেই তো এসেছি। শান্ত হয়ে ভেতবে চল। দেরি করো না।

মেয়ে : কেন বলতে পাবলে না, শমি, তুমি বেবিযে এসো।

তরুণ : এতো বাতে এই কাবফিউব মধ্যে ? এই দাঙ্গাব হাঙ্গামায় ?

মেয়ে : তুমি একবাব ডাক দিযে পবখ করে দেখলে না কেন ?

তরুণ : শমি।

মেয়ে : চুপ। তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতব ছুটে এসো। মনে হচ্ছে যেন ট্রাকটা এদিকেই আসছে।

তরুণ : আমাকে ডাকছ ?

মেয়ে : আহ্! পাগল হলে নাকি ? তাড়াতাড়ি ছুটে এসো। শুনবো, শুনবো তোমার কথা এসো।

(তরুণ ঘবেব মধ্যে ঢুকবে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হবে গলি অন্ধকার করে। বাইরে মিলিটারী ট্রাকেব ভারী সচল ইঞ্জিন সজোরে থরথর কবে কাঁপবে। মনে হবে যেন গলিব মুখের বড় রাস্তায় ট্রাকটা একবার থামল। আবাব চলতে শুরু করল। ইঞ্জিনের শব্দ দূরে বিলীন হয়ে যাবে। মঞ্চে স্তব্ধতা। তাবপর-ডানদিকের ডাস্টবিনটাব ভেতর থেকে প্রথমে এক জোড়া হাত, পরে মাথা, ক্রমশ উঁচু হয়ে একটা আস্ত মানুষ প্রকাশিত হলো। চুলে জট, মুখ ভরা দাড়ি, নাঙ্গা শবীর। বলবান লোক, কিন্তু নোংরা। চলনে চাহনিতে পাগল-ফকিব-ভিক্ষুকের আদল।)

লোক : (বাঁ ধারের ডাস্টবিনকে লক্ষ্য করে) পাগলা, ঘুমাস নাকি ?

(বাঁ ধারের ডাস্টবিনের মধ্যে একটা দেশলাই জ্বলে ওঠে। একটা কাশির শব্দ। একরাশ ধূঁয়ো। পাগলা ভেতব থেকে উঠে দাঁড়ায়, মুখে

জ্বলন্ত সিগারেট। রোগা পাতলা গড়ন। ছেঁড়া কাপড়। হাসিখুশি মুখ।)

পাগলা : এত বিজর বিজর করলে ঘুমায় ক্যামনে ? ওয়াগো কথা তুমি হুনছো ওস্তাদ ?

ওস্তাদ : না। আমার এই খান থাইকা সব কথা পষ্ট কানে তোলন যায় নাই। তুই নজদিক আছিলি, বেবাক তুইই লাগ পাইছস।

পাগলা : আমার কানে লাগ পাইছে, আমি না। বুঝনের কত চ্যাষ্টা করলাম, অঙ্গ অবশ হয়া গেল, তবু মর্ম বোঝলাম না। (জোরে সিগারেটে সুখটান দিয়ে।) ওস্তাদ আইজ রাইত আমি ঘুমামু না। ভিতরে বইয়া থাকমু। অরা আবার বাইর অইলে, হুনমু। বুঝি না বুঝি হুনমু।

ওস্তাদ : কস কি তুই ? কাম করবি না ? ব্যাপারি কাইল মাইরা লাল কইরা ফালাইব।

পাগলা : হেয়াও তো ভাবনের কথা। চল তাড়াতাড়ি কাম গুছাইয়া ভিতরে ঢুকি।

ওস্তাদ : তুই সিগারেট পাইলি কৈ ?

পাগলা : আল্লায় মিলাইছে। ঐ যে ভিতরে গেল পোলাডা আমির আছে। মুখের আস্ত সিগারেট ম্যালা মাইরা ময়লা বাক্সে ফেলছে। আগুনটা ছ্যাৎ কইরা গায়ে বিঁধছিল। আমিও কম না। শব্দ করি নাই। সিগারেটটা নিবাইয়া হাতে কইরা বইসা রইছি। টানবা ? বড় ভালো মার্কা।

(দু'জনেই ডাস্টবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। পাগলের কৌতূহল বন্ধ দরজার প্রতি। ওস্তাদ ডান ধারের একটা তালা ঝোলানো দোকানঘর গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেখছে।)

ওস্তাদ : তুই খা। আমার চিত্ত লগে আছে। পরে খামু। ঐদিকে কী দেখস ? এইদিকে আয়।

পাগলা : আইলাম রইলা।

ওস্তাদ : নাঃ। আজ রাইত বুঝি ব্যাকার যায়। একে'ত শালার মিলিটারী বেশি নটঘট শুরু করছে। হের উপরে আবার লাইলা-মজনুর মাতামাতি। একদিক সামলাই তো আরেক দিক ফাল দিয়া উঠে। আইজ কি ধরা পড়মু নাকি ?

(টং করে সাইকেলের ঘন্টার একটা মৃদু অসতর্ক শব্দ।)

ওস্তাদ : করস কী ?

পাগলা : এ্যাঁ। না। কিছু না। এইতো আইছি আমি। কও কী করন লাগব।

ওস্তাদ : জায়গাটা ভালো কইরা নজর কইরা ল। এইটাই বাইনার ঘর।

পাগলা : ভালো কাঠ। ভালো জ্বলব।

ওস্তাদ : ব্যাপারি পয়সাও ভালো দিব কইছে। তাড়াতাড়ি কর।

পাগলা : আমিও তো কই তাড়াতাড়ি কর। কাম সাইরা ভিতরে যামু। হুনমু।

ওস্তাদ : আস্মক। আমার পিছে পিছে আয়। তেলের টিন দেখাইয়া দিমু। আইনা

'পরথম ময়লাব বাক্সটার পিছে বাখ। বাকিটা পরে কমু।

পাগলা : চল।

ওস্তাদ : আচানক মিলিটারী নজদিক আইলে কী করবি মনে থাকে যেন।

পাগলা : ঠাস কইরা মাটিতে পইড়া ঘুমাইয়া যামু।

ওস্তাদ : নিলে হাজত নিব। ডর কী ?

পাগলা : আমি যে হুনতে চাইছিলাম।

ওস্তাদ : আম্মক ! চল্, চল্।

(দুইজন বেরিয়ে যায়। ঝপাৎ করে দরজাটা খুলে যাবে। বারান্দার আলোতে এসে তরুণী দাঁড়ায। অন্ধকারে দেখতে চেষ্টা করে। ঘর থেকে তরুণও বেরিয়ে আসে। মেয়েটি ঘুরে তার দিকে সরাসরি তাকায়। তারপর আবেগে কাঁপা গলায়—)

মেয়ে : আর এক মুহূর্ত দেরি না করে তুমি চলে যাও।

তরুণ : এইতো ভালো ভাবে সব শুনছিলে, হঠাৎ বিগড়ে গেলে কেন ?

মেয়ে : যেতে আর দেরি করলে আমি চিৎকার করে লোকজন জাগিয়ে তুলব।

তরুণ : বেশ। একটু সময় দাও। মনে হলো যেন এখনি এখানে কাদের গলা শুনেছি।

মেয়ে : সে-কী ? কোথায় ? তুমি আমাকে মিছেমিছি ভয় দেখাচ্ছ।

তরুণ : ভয় নেই। আমি দেরি করব না।

মেয়ে : প্রথমে কেন এত সাহসের ভান করলে ? কেন মিছেমিছি আমাকে জাগালে ? কেন বঞ্চনা করলে ?

তরুণ : এ তুমি কী বকছ ?

মেয়ে : আমি ভেবেছিলাম এই রাত, কার্ফিউ, দাঙ্গার রক্তস্রোত, এই মিলিটারী টহল, সব মিলে সত্যি বুঝি তুমি পাগল হয়ে গেছ। আমাকে ছিনিয়ে নিতে ছুটে এসেছ!

তরুণ : এসেছিলাম।

মেয়ে : মিথ্যুক। তুমি স্টেশনে গিয়ে আগে সংবাদ নিয়ে এসেছো যে, বাবার আজ নাইট ডিউটি। ফিরবেন কার্ফিউর পর। পিসীমা দেশে। মন্টু তোমার ভক্ত। আমি দাসী। তাই এসেছ নির্ভয়ে নিষ্পাপ প্রেমকাব্য শোনাতে। নিজের মনোবিলাসকে তুষ্ট করতে যা ভুলে যাবার চেষ্টায় আমার রক্তমাংস কাদাকাদা হয়ে গেল সেখানে তুমি কেন মিথ্যে করে স্বপ্নের ফুল ফোটাতে চাইলে। তুমি বঞ্চক। তুমি নিষ্ঠুর। যাও। দূর হও।

তরুণ : (সাইকেলে হাত রেখে।) তোমার সঙ্গে এখন কথা বলা বৃথা। তোমার বাবা আজ বাড়ি থাকলেও আমি আসতাম, না এসে থাকতে পারতাম না। ছুরি, গুলি, চাকরি-সব কিছু তুচ্ছ করে তোমার কাছে ছুটে আসবার মতো মহামুহূর্ত খুঁজে পেয়েছিলাম আজ রাতে। একটা তুচ্ছ আকস্মিক

যোগাযোগের কারণে তুমি সে দুর্লভ মুহূর্তেব অবমাননা করলে, শমি। দাঙ্গার প্রকোপ যদি কম থাকে, কাল আসব। আসি।

মেয়ে : বিশ্বেস কবি না। কেন বিশ্বেস করবো ? কোনো প্রমাণে ? তুমি তুমিই। আমি তোমাকে জানি। তুমি চলে যাও। যেমন করে বাবা তোমাকে বলেছিল, তেম া করেই বলছি-কোনো দিন, কোনো দিন তুমি এ বাড়িতে আসবে না। আমি চাই না। চাই না। চাই না।

(তরুণ সাইকেলে উধাও। তরুণী ঢুকবে কেঁদে উঠে দরজা বন্ধ করে দেয়। গলির খোলা মুখ দিয়ে সন্তর্পণে হাঁপাতে হাঁপাতে ঢুকবে ওস্তাদ এবং পাগলা। কেরোসিন-টিন বয়ে আনে পাগলা।)

(ডান ধারের ডাস্টবিনের আড়ালে তেলের টিন রেখে নিজের বাঁ দিকের ডাস্টবিনের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।)

পাগলা : মিঞা চইলা গেল না ? ফালাইয়া চইলা গেল ?

ওস্তাদ : শালা তোর কি ? জলদি জলদি কাম সার। ট্রাকটা ঘুইরা এই দিক আইতে আব দেবি নাই।

(ঝুকে পড়ে টিনের মুখ কি দিয়ে যেন চাপ দেয়।)

পাগলা : (চমকে) ওস্তাদ!

ওস্তাদ : কী রে ?

পাগলা : শব্দ অইল কীসের ?

ওস্তাদ : আম্মক। আমি টিন খুলচি। ভস কইরা ত্যাল বাইব হইচে।

পাগলা : না। কিছু আসে বোধ হয় এই দিকে। হঠাৎ থামসে।

(সট করে দুজনই লাফিয়ে যে যার ডাস্টবিনে ঢুকে পড়ে। চারদিক নিঃসাড়। একটা ট্রাকের শব্দ বাড়ে। গড়িয়ে দূবে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সবেগে সাইকেলে ঢোকে তরুণ। দুটো ঘন্টা বাজায়। অস্থির হয়ে দরজায় মৃদু টোকা দেয়। দরজা তৎক্ষণাৎ খুলে যায়। আলোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় তরুণীও ঝাঁপিয়ে পড়ে অনির্দিষ্ট অন্ধকাবে দণ্ডায়মান তরুণের বুকে। সামলে নিয়ে, কান্নায় বিকৃত মুখে উদ্ভাসিত হাসি ছড়িয়ে-)

মেয়ে : ফিরে এলে কেন ?

তরুণ : চুরি করে নিলে কেন ?

মেয়ে : বেশ করেছি। একশোবাব নেবো। কিন্তু কী নিয়েছি ? কোথেকে নিয়েছি, কখন নিলাম ?

তরুণ : আর ন্যাকা সাজতে হবে না।

মেয়ে : না বুঝলেও ক্ষতি নেই জানি, তবু বল না ছাই কী নিয়েছি।

তরুণ : চকলেটের বাক্স।

মেয়ে : চকলেটের বাক্স ?

তরুণ : জি। আমাব এই সাইকেলের বাস্কেটে ছিল।

মেয়ে : এখন নেই ?

তরুণ : কী করে থাকবে ?

মেয়ে : নাই থাকল। কিন্তু এখন কী হবে ?

তরুণ : তুমি আমার সঙ্গে যাবে।

মেয়ে : কোথায় ?

তরুণ : কারফিউর কালো সাগর পাড়ি দিয়ে, পাশের গলির একটা মাঝারি গোছের বাড়িতে।

মেয়ে : তোমার বড় আপা যদি ঝেঁটিয়ে বের করে দেন ?

তরুণ : আমি তার সঙ্গে পরামর্শ করেই এসেছি।

মেয়ে : তোমার বড় দুলাভাই ?

তরুণ : বড় আপার চিরানুগত। কথা বাড়িয়ে আরো দেরি করবে, না চলবে ?

(মেয়েটি কী ভাবে)

বাবাকে আর মন্টুকে বোঝাবার ভার আমার উপর রইল।

মেয়ে : এক সেকেন্ড দাঁড়াও। টেবিলের উপরে একটা বই আছে, তুলে নিয়ে আসি।

(মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বই হাতে বেরিয়ে আসে। দরজাটা বার থেকে ঠেলে দেয়। অন্ধকার গাঢ়তর হয় মঞ্চে।)

তরুণ : পড়ার বই নাকি ? কেবল আমিই অমানুষ ? তুমি এই মুহূর্তেও পরীক্ষার পড়া তৈরির কথা মনে রাখতে পারছ ?

মেয়ে : না। বইটাতে এক টুকরো কাগজ ছিল যা ফেলে যেতে চাইনি।

তরুণ : আমার চিরকুট ?

মেয়ে : না। কারফিউ পাস। সংকট মুক্তির জন্য সঞ্চয় করে রেখেছিলাম। মন্টু জোগাড় করে দিয়েছে। আর রাতেও ওর মেয়াদ আছে। বড় আপার নবজাতক শিশুর আমি দাইমা।

তরুণ : ওহ্! কেবল আমিই নিরাপত্তার দাস, অপ্রেমিক! তুমি কি, শমি ?

মেয়ে : কল্যাণী। দেখি তোমার কারফিউ পাসটা। আমার হাতে ...ও একটুকু পথের মধ্যে কোনো রকম ভুলের মাশুল দিতে আমি রাজি নই

(তরুণ হাতে পাস তুলে দেয়।)

তরুণ : তুমি কী করে জানলে যে আমার কারফিউ পাস আছে ?

মেয়ে : মেয়েরা জানে। সব জানে। তুমি প্রেমিক না হলেও সাংবাদিক, নাইট ডিউটির পর পাস না নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরবে- একথা ... যাব কেন ? তাছাড়া তুমি কত বড় বীর, সে'ত আমার অজানা ন... হাতটা শক্ত করে ধরো। তাড়াতাড়ি চল।

(এক হাতে সাইকেল, অন্য হাতে তন্বীর ... সব প্রস্থান ... মঞ্চের ডানদিক থেকে উদিত হবে ওরা)

ওস্তাদ : পাগলা, ঘুমাস নাকি ?

পাগলা : (ভেতর থেকে) পাগল হইছ, ওস্তাদ ?

ওস্তাদ : তাড়াতাড়ি উইঠা আয়।

পাগলা : (ভেতর থেকে) আব দুগা মুখে দিয়া লই। জবব চিজ।

ওস্তাদ : হারামী কয় কী ? জব জব কইরা কী চিবাস তুই ?

পাগলা : (ডাস্টবিনের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে হাতের প্যাকেট তুলে ধবে।) দুগা তুমিও খাও। জবর চিজ। এ্যংরাজীতে চকোলেট কয়। খুব ভালো জিনিস। সাইকেলের বাস্কেটের থন তুইলা ভিতবে ফালাইয়া বাখছিলাম।

ওস্তাদ : ফালাইয়া রাখ। এখন কাম কর।

পাগলা : তুমি বুঝি এখন মিঠা কিছু খাইবা না ? বুঝছি। চল, কাম কবি।

ওস্তাদ : আইজ সব বরবাদ হইয়া যায় বুঝি। এত বাধা পড়লে কাম করন যায় ? ল, দেশলাই ঠিক কইবা ল। আমি দোকানের তিন মুড়া ত্যাল ঢাইলা বাইব অইয়া চইলা যামু। তুই লগে লগে আগুন লাগাইয়া কাইটা পড়বি। হুনছস।

পাগলা : ওস্তাদ আগুন দিমু ক্যামনে, ম্যাচবাত্তি আছে ?

ওস্তাদ : হারামজাদা কয় কী ! আমি বিড়ি সিগারেট খাই যে ম্যাচবাত্তি লইয়া ফিবমু। তোরটা কী হইল ?

পাগলা : অউগা কাঠি ছিল। তখন সিগারেট ধবাইলাম যে।

(ওস্তাদ মাথা চাপড়ে ডাস্টবিনেব মধ্যে বসে পড়ে।)

চিন্তা কইর না। তুমি ত্যাল ঢাল, আমি দ্যাশলাই লইযা আইলাম বইলা।

(প্রস্থান।)

ওস্তাদ : (লাফিয়ে বাব হয়।) পাগলা সব ডুবাইব। কই যাইতে কই যায়, কে জানে ? ঐ দেখি আবার ট্রাকেব আওয়াজ। পাগলা খাড়া। আমি আই। (প্রস্থান।)

(দূবাগত মিলিটারী ট্রাকেব শব্দ নিকটবর্তী হয। ঠিক গলিব মুখে থামল মনে হয। একজোড়া টর্চ চোখ ধাঁধানো আলো ফেলে বন্ধ গলিতে। মিলিটারী পোশাকে দু'জন লোক প্রবেশ করে। এদিক ওদিক দেখে। তেলের টিনটা নজরে পড়ে। তুলে নিয়ে চলে যায়। যাবাব আগে রাস্তার নাম ঠিকানা নোট বইতে টুকে নেয়। বিরতি। স্তব্ধতা। পা টিপে টিপে ওস্তাদ আর পাগলা আবাব প্রবেশ করে। বুঝল তেলের টিন কারা গায়েব করেছে। কপালে করাঘাত করে বাণী উচ্চাবণ-)

ওস্তাদ : শালারা কওমের খেদমত করবার দিল না!

[যবনিকা]

বংশধর

চরিত্র

বাবা

আশরাফ

পুলিশ অফিসার

দমকল বাহিনী অফিসার

দমকল বাহিনীর দু'জন কর্মী

মা

আমেনা

[মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিচ্ছন্ন ঘর। মধ্যখানে চায়ের টেবিল। ঘরের পেছনের দেয়ালে একটা জানালা, একটা দরজা। এই দিকেই বারান্দা এবং রান্নাঘর-এ যাবার পথ। এক পাশে বাইরে যাবার দরজা। এই দিকেই সিঁড়ি।]

বাবা : সেই বাঁদরটা কি আজও এসেছে নাকি ?

মা : রোজই তো আসছে।

বাবা : কখন আসছে ?

মা : সকালে-বিকালে-দুপুরে, যখন পারছে তখনই লাফিয়ে ঢুকে পড়ছে। ওই বজ্জাতের আবার সময়-অসময় আছে নাকি ?

বাবা : বল কী, এতদূর গড়িয়েছে! হতভাগার এতবড় দুঃসাহস!

মা : তুমি তো আমার কোনো কথাই মনোযোগ দিয়ে পুরোপুরি শুনতে চাও না। নইলে, গতকাল দুপুরে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল, মনে হলেও সারা গা শিউরে ওঠে।

বাবা : কাল দুপুরে কী হয়েছে ? সব কথা খুলে বল।

মা : বলছি। আমেনাকেও আসতে দাও। তোমার জন্য নাস্তা তৈরি করছে। ও আসুক। ওর সামনেই সবটা বলা দরকার।

বাবা : ওর সামনে বলার কোনো দরকার নেই। আগে সবটা আমাকে খুলে বল।

মা : তোমার সবটাতেই বেশি ব্যস্ততা। বলছি। দুপুর বেলা তুমি অফিসে চলে গেছ। আমেনাও খাওয়ার আগেই ইউনিভার্সিটি থেকে চলে এসেছে। দু'জনে এক সঙ্গে হাত লাগিয়ে খাওয়া দাওয়ার জিনিস গুছিয়ে নিয়ে খেতে বসেছি। ভেতরের বারান্দার দরজা দু'টোই বন্ধ, সিঁড়ির দরজাটাও বন্ধ সব আটঘাট বেঁধে তবে খেতে বসেছি। মেয়েকেও রেখেছি চো[খের] সামনে।

বাবা : তারপর ?

মা : সবে খেতে শুরু করেছি, বললে বিশ্বেস করবে না, ঠিক সেই সময়ে সি[ঁড়ি]র দরজায় বাইরে থেকে ঠক্ ঠক্ করে টোকা দিল।

বাবা : এতবড় সাহস বাঁদরটার! আমি বাড়ি থাকব না জেনে, দুপুর বেলা এসে বন্ধ দরজায় টোকা দেয়!

মা : সে কি, তুমি আন্দাজ করলে কী করে ।

বাবা : ওর বাপ মা চৌদ্দগুষ্ঠির খবর রাখি। আর এইটুকু আন্দাজ করতে পারব না ?

মা : কার কথা বলছ তুমি ?

বাবা : কেন ঐ বাঁদরটার। ঐ তোমাদের আশরাফের কথা বলছি।

মা : হায় খোদা, কিসের মধ্যে কি! তোমার সঙ্গে গল্প করাও ঝকমারি। আমি বলছি এক কথা তুমি ভাবছ অন্য কথা। হঠাৎ করে আশরাফের কথা তুললে কেন ?

বাবা : তুমি তো বললে দরজায় এসে টোকা দিল।

মা : কে টোকা দিয়েছে তা তুমি জানলে কী করে ?

বাবা : কে টোকা দিয়েছিল ?

মা : তুমি আমাকে বলতে দিলে তো !

বাবা : নাও, বল, শুনছি।

মা : আমি অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি। ভেবেছি, হয়তো পিওন, ফেরিওয়ালা কেউ হবে। আমেনাকে বললাম উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেখতে। ও হাসিমুখে উঠে গেল।

বাবা : এখনও তোমার সন্দেহ হলো না ?

মা : কিন্তু, তারপর যা কাণ্ডটা হলো! দরজা খুলেই ও চিৎকার করে ছিটকে পেছনে সরে এল। চোখ তুলে দেখে আমিও হতভম্ব। সেই কালামুখ হলো বাঁদরটা। বারান্দার দরজা বন্ধ দেখে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে। দু'হাত তুলে এমন এক বিকট ভেংচি কাটল যে, আমেনা তো ভয়ে ছুটে অন্য ঘরে চলে গেল। অত বড় বাঁদরটা এক লাফে ঘরে ঢুকে, খাবার টেবিলে একেবারে আমার সামনের চেয়ারটায় এসে বসল।

বাবা : তোমার মুখোমুখি চেয়ারে এসে বসল ?

মা : জুঁঠো হাতেই ভাতের বড় চামচটা মুঠ করে ধরেছিলাম ভেবেছিলাম এক বাড়িতে মাথাটা ফাটিয়ে ফেলব।

বাবা : খুব সাহস করেছ!

মা : পারলাম না। ব্যাটা বজ্জাত। আমি হাত তুলবার আগেই এক ঝটকায় হাতের প্যাচে তরকারির বাটি সাপটে ধরে দুই লাফে খোলা দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাবা : যাক আপদ গেছে। অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। তুমি জান না এই বড় বাঁদরগুলো ক্ষেপে গেলে বেশ হিংস্র হয়ে ওঠে।

মা : তোমার দাপট কতদূর সে আমার ভালো করে জানা আছে। যত হম্বিতম্বি ঐ বেচারা আশরাফের ওপর।

বাবা : হ্যা। আমি ওই বাঁদরটার কথা জিজ্ঞেস করছিলাম। গতকালও ও এ বাড়িতে এসেছে নাকি ?

মা : জানি না।

বাবা : আজ এসেছিল ?

মা : জানি না

বাবা : আসবে না কি ?

মা : জানি না।

বাবা : মেয়েকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলে ?

মা : কী জিজ্ঞেস করব ?

বাবা : রোজ রোজ আসে কেন ?

মা : এক পাড়ায় এক সঙ্গে বড় হয়েছে। ছোটকাল থেকে আসা-যাওয়া করছে।

বাবা : বহুদিন ধরে নিয়মিত আসা-যাওয়া করছে। সেই জন্যইতো বলছি। এবার এখন ওর কিছু বলা উচিত। এবং বলতে চাইলে কিছু করাও উচিত।

মা : কী বলবে ? কী করবে ?

বাবা : বলবে যে, সে আমেনাকে বিয়ে করতে চায়।

মা : হয়তো আমেনাকে বলেছে।

বাবা : না আমাকেও বলতে হবে। এবং তখন আমিও তাকে বলব যে, না, তা হবে না, হতে পারে না। অন্তত যতদিন না সে তার পেশা বদল করেছে। সাংবাদিকের সঙ্গে আমি আমার মেয়ে বিয়ে দেব ? লেখাপড়া শিখে রাতদিন টো টো করে পরের হাঁড়ির খোঁজ করে বেড়াবে এ আমার পছন্দ নয়।

মা : পছন্দ করবে কে, তুমি না তোমার মেয়ে ?

বাবা : তোমার মেয়ের যা বুদ্ধি, সে আবার নিজে বুঝেসুঝে পছন্দ করবে! যদি বুদ্ধি থাকত তাহলে ঐ বাঁদরটাকে এতদিনে মানুষ করে তুলতে পারত।

মা : তা তুমি চেষ্টা করে দেখ না কেন ?

বাবা : তাই করব। ছোঁড়া আজ আসুক! অন্য কারও সঙ্গে নয়, ও আজ কথা বলবে আমার সঙ্গে। ভেবেছে গায়ে ফুঁ দিয়ে ফুরফুর করে ভেসে বেড়াবে, কেউ ওকে কিছু বলতে পারবে না। আজ ওর একদিন কি আমার একদিন। আমাকে পরিষ্কার করে কিছু না বলে এ বাড়ি থেকে ফেরত যেতে পারবে না।

মা : তুমি ওকে খুন করবে নাকি ?

বাবা : দেখ তুমি, আমাকে অযথা ক্ষেপিও না। হ্যাঁ, দরকার হলে তাই করব। খুন। হ্যাঁ, খুনই করব।

(নেপথ্যে আমেনার প্রচণ্ড চিৎকার, ভয়ার্ত আর্তনাদ, হাত থেকে পেয়ালা-বাসন পড়ে যাওয়ার ঝন ঝন শব্দ)

মা : আমেনা ! আমেনা!

বাবা : আমেনা! কী হলো ? (এক সঙ্গে)

(আমেনার প্রবেশ। ভয় [illegible] এক হাতে [illegible] সুদ্ধ কয়েকটা [illegible] কাঁপছে।)

বাবা : কী ? কী হয়েছে তোর ? চিৎকার করলি কেন ?

আমেনা : বাঁদর। সেই বাঁদরটা। এক হাতে ছোট ট্রেটার মধ্যে নাস্তা, অন্য হাতে এই কলাগুলো ধরে, বারান্দা দিয়ে এই ঘরের দিকে আসছিলাম। হঠাৎ পেছন থেকে আঁচল ধরে টান দিয়েছে। তাকিয়ে দেখি সেই হুলো কালা মুখ বাঁদরটা। ওরও এক হাত আটকা ছিল। কি একটা কাগজের পোটলা ডান হাত দিয়ে সাপটে ধরেছিল। অন্য হাত দিয়ে কলার গোছা থাবা দিয়ে ছিনিয়ে নিতে চাইল। আমি সরে যেতেই মুখের কাছে এসে এক ভেংচি। তারপর বাঁ হাত দিয়ে আমার ট্রের নিচে এমন এক চাঁটি মারল যে সবটা ফির্নি ছিটকে আমার গায়ে-মুখে পড়ে একাকার। আমি চিৎকাব কবে কলাগুলো আঁকড়ে ধরে রেখেছি আর ওই বজ্জাতও টানাটানি করেছে। শেযে কি মনে করে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে এক লাফে বারান্দা পার হয়ে চলে গেল।

মা : তুই একটু শান্ত হয়ে বোস। মুখটা মুছে ফেল্। খুব বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।

বাবা : নাঃ আজকে এই বাঁদরটারই একদিন কি আমারই একদিন। খুন, সোজা খুন করে ফেলব আজকে। আমেনার মা, তুমি আমাব বন্দুক আর টোটা বার করে রাখ। আমি একবার বারান্দা দিয়ে ঘুবে আসি। দেখি আশেপাশে কোথাও দেখা যায় নাকি ।

(বাবা বারান্দার দিকে চলে যায়)

মা : তোর বাবা আজ ক্ষেপে গেছে। সত্যি সত্যি একটা কিছু কবে না বসে।

আমেনা : আমি দরজার আড়াল থেকে সব শুনেছি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুনেছিলাম। তাইতো বাঁদরটা যে কখন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টের পাইনি।

মা : কিছু ঠিক করেছিস ?

আমেনা : আমি কী ঠিক করব মা ?

মা : আহা সব কিছু তোকে ঠিক করতে বলছে কে ?

আমেনা : ওকে আমি বলব কী করে ?

মা : ও কি আজ আসবে ?

আমেনা : রোজই তো আসে। আসবে।

মা : তোর বাপ বড় রেগে আছে। আজ একটা ভালো মন্দ কথা বলাবলি হয়ে গেলেই ভালো হয়।

আমেনা : মা!

(বাবার পুনঃপ্রবেশ। ঘরে ঢুকে বারান্দার দবজা বন্ধ কবে দেবে।)

বাবা : নাঃ। ব্যাটা পালিয়েছে। ধারে কাছে কোথ্থাও দেখলাম না।

মা : বাঁদর ধরার সখ ছিল তো খালি হাতে গেলে কেন ? কলাগুলো হাতে করে নিয়ে বেরুলেই পারতে, তাহলে হয়তোবা ধবা দি[illegible] বিশ্রাম কব!

বাবা : বাঁদর। সব বাঁদর এক সঙ্গে মিলে আমাকে পাগল কবে দেবে ! (সিঁড়িব দরজায় টোকা পড়ে) কে ? বন্দুক! আমেনার মা, আমার বন্দুকটা!

মা : মশা মারতে কামান দাগতে চাও নাকি ? সাহস থাকে তো একটা লাঠি হাতে নিয়ে এগিয়ে যাও।

আমেনা : হ্যাঁ বাবা, বন্দুক থাক। তুমি লাঠি নিয়েই এগিয়ে যাও।

মা : হ্যাঁ তাই কর। লাঠি বাগিয়ে ঠিক দরজা বরাবর দাঁড়াও। আমি ছিটকিনি খুলে, একটানে দরজার ফাঁক করেই পাল্লার আড়ালে সরে দাঁড়াব।

বাবা : রাইট। আমি ওয়ান, টু, থ্রী বললেই তুমি পাল্লা ধরে টান দেবে।

আমেনা : মা!

মা : কোনো ভয় নেই রে। আমি অনেক বাঁদব দেখেছি।

বাবা : ওয়ান, টু , থ্রী!

(মা দরজা খোলে। আমেনা চিৎকার করে ওঠে। বাবা মাথার ওপর লাঠি উঁচু কবে তুলে ধরেছিল, তুলেই ধরে থাকল। মারতে পাবল না। মা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসল। বাঁদবের বদলে ঘরে প্রবেশ করল আশরাফ। সে একটু হকচকিয়ে গেছে।)

আশবাফ : ঠিক এইরকম সংবর্ধনা লাভেব জন্য তৈরি ছিলাম না। খালুজান কি সত্যি সত্যি আমাকে—

বাবা : না না তোমাকে নয়। আমি ভেবেছিলাম বাঁদর।

আশরাফ : বাঁদব! যাক বাঁচা গেল। তা বাঁদর না হই বাঁদরের বংশধর তো বটেই!

মা : সে তুমি একা হতে যাবে কেন ?

আমেনা : মা, আমি বান্নাঘবে যাই। আব্বার নাস্তা আরেকবার ঠিক কবে নিয়ে আসি।

বাবা : না তুমি এখানেই থাকবে। আশরাফের সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথাবার্তা আছে। তোমরাও সামনে বসে থেকে শুনবে।

আমেনা : মা!

মা : তোমাব আব্বা নিশ্চয়ই তোমার ভালোর জন্যেই বলছেন।

আশরাফ : আমিও তাই মনে করি। আমি প্রস্তুত। আপনি বলুন।

বাবা : আমি তোমাকে ভালো করে বুঝতে চাই। আজ এখানে কী মনে করে এসেছ। এলোমেলো জবাব দেবে না। সত্যি কথা বলবে।

আশরাফ : শুনতে প্রথম হয়তো খুব হাস্যকর শোনাবে, তবু সত্যি বলছি, বিশ্বেস করুন, আমিও একটা বাঁদরের খোঁজে এসেছি।

আমেনা : বাঁদরের খোঁজে ? বাঁদরের জন্য ?

আশরাফ : দু'তিন ঘন্টা আগে ঘটনাটা ঘটে। এক ব্যবসায়ীর গদি থেকে একটা বাঁদব, এক তাড়া নোটের একটা বড় মোটা বান্ডিল তুলে নিয়ে পালিয়েছে।

বাবা : নোটের বান্ডিল ? কত টাকাব ?

আশরাফ তো মোট দু'তিন হাজার টাকার হবে। সমস্ত শহরময় হৈ চৈ পড়ে গেছে। পুলিশের লোক, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি, জনতা সব ঐ বাঁদরের তল্লাশে বেরিয়ে পড়েছে।

বাবা : ধরা পড়েছে?

আশরাফ : কে কাকে ধরে? হয়তো একবার দেখা যায় কোনো দালানের কার্নিশে লেজ ঝুলিয়ে বসেছে। বান্ডিলটা একটু খুটে দেখে। দু'একটা নোট বাতাসে উড়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে। ব্যস আর যায় কোথা। সমস্ত জনতা সেদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে, খাবলা দিয়ে ওগুলো ধরবার জন্য। সাধ্য কি ফায়ার ব্রিগেড কাছে ঘেঁসে। ততক্ষণে গোলমালের ভয় পেয়ে বাঁদরটাও নোটের পুটুলি বগলদাবা করে দুই লাফে আরেক দালানের পেছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।

বাবা : বলো কি? কেউ ধরতে পারল না?

আশরাফ : সেই তখন থেকে আমিও সকলের পেছন পেছন হোন্ডা নিয়ে ঘুরছি। কিছুক্ষণ আগে মনে হলো বাঁদরটা এই পাড়ায় ঢুকেছে।

মা : বাঁদরটাকে দেখেছ তুমি? কী রকম দেখতে?

আশরাফ : ইয়া বড়, কালা মুখ, একটা হুলো বাঁদর।

বাবা : এ্যা!

মা : নোটের ব্যান্ডিলটা কী রকম?

আশরাফ : খবরের কাগজ দিয়ে প্যাঁচান। একটা পাঁউরুটির মতো হবে।

বাবা : এ্যা? আমেনা, তুই ঠিক দেখেছিলি তো?

আমেনা : আমার কোনো সন্দেহ নেই বাবা। যা ভেবেছো ঠিক তাই।

বাবা : তোমার পেছন পেছন কেউ আসেনি তো?

আশরাফ : মনে হয় না যে অন্য কেউ লক্ষ করেছে।

বাবা : তোমরা বসো। আমি আরেকবার বারান্দা দিয়ে ঘুরে আসি।

মা : তুমি একা যেও না। আমিও সঙ্গে আসছি।

বাবা : আশরাফ তুমি চলে যেও না। সাহায্যের দরকার হতে পারে। আমরা এক্ষুণি আসছি।

(বাবা মার বারান্দা দিয়ে প্রস্থান)

আশরাফ : কী ব্যাপার? তোমরা বাঁদরটা ধরেছ নাকি?

আমেনা : না।

আশরাফ : দেখেছ?

আমেনা : বাঁদরের কথা থাক এখন।

আশরাফ : ও কি আর বাঁদর রয়েছে, মহাজন বনে গেছে।

আমেনা : সোয়েটারটা পছন্দ হয়েছে?

আশরাফ : চমৎকার! খুব সুন্দর হয়েছে।

আমেনা : সব কথাই কি আমি বলাব, তারপর তুমি বলবে ? জানালার ফাঁক দিয়ে কী দেখছ ?

আশরাফ : কিছু না. কিছু না। ছাদের কার্নিশ থেকে খয়েরি রঙের কি যেন একটা দুলে উঠল।

আমেনা : ছাদে শুকাতে দেওয়া আমাব শাড়িব পাড় হবে।

আশরাফ . সুন্দব । খুব সুন্দব। চমৎকাব।

আমেনা . কেবল দূরেব জিনিস খুঁজে বেড়াও, কাছের জিনিস ভালো কবে দেখতে পাও না ?

আশরাফ : কী যে বল ! তোমাকে দেখাব কি কোনো আবম্ভ আছে না শেষ আছে ?

(খুট করে দরজা খুলে অতি সন্তর্পণে বাবা প্রবেশ কবে। ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে ধরে।)

বাবা : চুপ। কোনো শব্দ কবো না। অন্য কোথাও যায়নি। চুপ কবে ছাদেব কার্নিশে বসে আছে। আমি এই কলাগুলো নিয়ে যাচ্ছি।

আশরাফ : আমি আসব ?

বাবা : না, না। বাইরে আমবা দু'জনেই যথেষ্ট। তুমি আমেনাকে নিয়ে ঘরের মধ্যেই থাক। আমাব মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে। তোমাকেও পবে দবকাব হবে। দরজা জানালা বন্ধ কবে চুপ করে বসে থাক।

(কলা নিয়ে বারান্দাব পথে বেরিয়ে যাবে।)

আমেনা : ভালো শাস্তি হয়েছে। চুপ করে বসে থাক।

আশরাফ : এ শাস্তি হতে যাবে কেন ? এতো পুবস্কাব।

আমেনা : কথা। কেবল কথা আর কথা। ওকি চুপ কবে বসে থাকতে হবে বলে কি গালে হাত দিয়ে বসে থাকবে নাকি ?

আশরাফ : বলো আব কী বলবে ?

আমেনা : বেশ আমিই বলছি। দু'দিন পরে আমাব পবীক্ষা। বি.এ পাশ করাব পর বাবা বোধহয় আর আমাকে পড়াবেন না।

আশরাফ : তাই নাকি ?

আমেনা : আর কিছু বলার নেই ?

আশরাফ : মানে, পাস যে করবেই তার তো কোনো কথা নেই। না করলে নিশ্চয়ই তোমাকে আরও কিছুকাল কলেজে যাওয়া আসা কবতে দেবেন।

আমেনা : সেই আশাতেই দিন গুনছ নাকি ?

(খুট কবে দরজা খুলে বাবা আবাব প্রবেশ করে। ঘবে ঢুকে বাবান্দাব দিকের জানালার শিকের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে একটা দড়ির মাথা ধরে টানতে টানতে আশরাফের দিকে এগিয়ে আনে)

বাবা : তুমি দড়িব এই মাথা শক্ত করে ধরে রাখ।

আশরাফ : ফাঁস দিয়ে আটকাবেন না কি ? আমার এখনই মনে হচ্ছে বেশ বড় রকমের জমকালো খবর হবে।

বাবা : বাজে বোকো না। কোনো কথা যেন ঘুণাক্ষরেও কারও কাছে প্রকাশ না পায়।

আশরাফ : আমাকে কী করতে হবে ?

বাবা : তুমি এই দড়ির মাথা চেপে ধরে বসে থাক। আমেনার মা রান্না ঘরে লুচি বেলছে। বাঁদরটা কিছুই সন্দেহ করছে না। আমি কলাগুলো. দূর থেকে দেখা যায় এমন জায়গায় গুদামের মধ্যে রেখে এসেছি। এই দড়ির অন্য মাথা গুদামের দরজার কব্জিতে আটকানো রয়েছে। এক হ্যাঁচকা টানে ঝপাৎ করে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

আশরাফ : কিন্তু কখন টানব ? এই ঘর থেকে কিছুই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

বাবা : বারান্দার অন্য কোণায় বসে আমি খবরের কাগজ পড়তে থাকব। দরজার ফাঁক দিয়ে আমাকে স্পষ্ট দেখা যাবে। ইশারা করতেই তুমি দড়ি ধরে জোরে টান দেবে।

আশরাফ : ঠিক আছে। আপনি যান। কোনো চিন্তা নেই।

(বাবা বেরিয়ে যায়। আশরাফ দরজার ফাঁকে দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ রেখে দু'হাতে দড়ি আঁকড়ে ধরে বসে থাকে)

আমেনা : এখন বোধহয় তোমাকে কোনো কথা বলা বৃথা। অথচ আজ আমি সংকল্প গ্রহণ করেছিলাম, বলব-শুনব।

আশরাফ : সংকল্প আমারও ছিল। আজকের জন্যই। মাঝখান থেকে এই বাঁদরটা এসে সব ওলট-পালট করে দিল।

আমেনা : তবু বল। বল। থেমে গেলে কেন ? যা মনে করে এসেছিলে পরিষ্কার করে বল। সবটা বল। সবাইকে শুনিয়ে বল।

আশরাফ : দোহাই তোমার, আমার মনোযোগ নষ্ট করো না। এখন একটু চুপ করে থাক। পরে। পরে বলব। পরে!

আমেনা : পরে, পরে, পরে। আর কতকাল পরে বলবে ? স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি ? একাদশ শেষ হয়েছে, দ্বাদশ শ্রেণী পার হয়েছি। প্রথমবর্ষ বি.এ শেষ হয়েছে, শেষ বর্ষও সমাপ্ত হলো বলে। আর কতকাল, কতকাল পরে বলবে ?

(বারান্দার ইশারা পাবামাত্র আশরাফ প্রবল জোরে দড়ি টানে। মুখ দিয়ে একটা উত্তেজনাসূচক শব্দ বার হয়। বাইরে দড়াম করে দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ, কিছু থালা ঝন্ ঝন্ ঝন্ করে পড়ে ভাঙে, বাবার হর্ষোৎফুল্ল জয়ধ্বনি শোনা যায়। কেবল আমেনাই নিরব ও স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে। বাবা প্রবেশ করে)

বাবা : কেল্লা ফতে। দড়ি খুব টেনেছ। বাছাধন ঘরে ঢুকে কেবল কলার কাঁদিতে হাত রেখেছে, অমনি চোখের পলকে পেছনের পাল্লা দু'টো আটকে গেল।

(আম্মার প্রবেশ, নাস্তাসহ)

মা : এবার সবাই একটু শান্ত হয়ে বসো। নাস্তা খাও। তোমাকেও আর ওই দড়িটা ধরে বসে থাকতে হবে না। আমি আসবার সময় গুদামের দরজায় তালা দিয়ে এসেছি।

বাবা : বাঃ, বাঃ। তোমার যেমনি সাহস তেমনি বুদ্ধি। আমি বরাবরই স্বীকার করে এসেছি। তা বাঁদরটা কি করছে দেখলে?

মা : কোনো চিন্তা ভাবনা নেই। পুটুলিটা পাশে ফেলে রেখে নিশ্চিন্ত মনে কলা গিলছে। খাও তোমরাও শুরু করো। খাও।

(বাবা তবু একবার আহ্লাদিত চিত্তে দড়ির প্রান্ত নাড়াচাড়া করে। সবাই খেতে আরম্ভ করে। সিঁড়ির দরজায় টোকা পড়ে।)

বাবা : কে? কে?

নেপথ্যে : দরজাটা খুলুন বলছি।

(আশরাফ খুললে ঘরে ঢুকবে পুলিশ অফিসার)

পুলিশ : মাফ করবেন, বাড়ির ভেতরে না ঢুকে উপায় ছিল না। বাঁদরের কেসটা আমার কাঁধে পড়েছে। আপনারা বোধহয় জানেন যে দুপুরবেলা একটা বাঁদর নাকি কয়েক হাজার টাকা নিয়ে উধাও হয়।

বাবা : তাই নাকি?

পুলিশ : আপনি না জানলেও আশরাফ সাহেব জানবেন না একথা বিশ্বাস্য নয়?

মা : ভালো করে বসুন। এক পেয়ালা চা খান।

পুলিশ : অনেক ধন্যবাদ। খবর পেলাম বাঁদরটা নাকি এই পাড়াতেই ঢুকেছে।

বাবা : আপনি কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন।

পুলিশ : সে-জন্য আমি খুব দুঃখিত। তবে সব বাড়ির ভেতরে থানাতল্লাসী চালাবার অনুমতি আমি নিয়ে এসেছি।

বাবা : সে-রকম অনুমতি সংগ্রহ করার কারণ?

পুলিশ : মানে, এ কেসটার সেটাও একটা স্বতন্ত্র এ্যাংগেল। ধরুন এমনও হতে পারে যে বাঁদরটা আসলে কারও পোষা বাঁদর। বেশ শিক্ষিত। সারা দুনিয়া চড়ে বেড়ায় বটে কিন্তু রোজই একবার করে ডেরায় ফিরে আসে।

(আশরাফ হেসে ওঠে)

ও কি আপনি হেসে উঠলেন যে?

আশরাফ : না না, আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি হেসেছি অন্য কারণে। আপনার সিদ্ধান্ত যে জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োগ্য সে-কথা মনে পড়ে যাওয়াতে খুশি হয়ে উঠেছিলাম।

আমেনা : তোমার রসিকতা এখন এখানে খুবই বেমানান!

পুলিশ : এই দড়িটা কীসের?

বাবা : এ্যাঁ! দড়ি?

পুলিশ : হ্যাঁ! এই দড়িটা।

বাবা : ওহ্ ? দড়ি ? ওটা মানে আমাদের একটা পোষা বঁ-গোঁ-গরু আছে তার গলার দড়ি।

(বারান্দার দরজায় টোকা পড়ে)

কে ? ওখানে কে ? এ্যাঁ-বেরিয়ে পড়েছে নাকি ? কে ?

(দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করে দমকল বাহিনীর একজন অফিসার।)

দমকল : মাফ করবেন, আগে অনুমতি নিতে পারিনি বলে খুব দুঃখিত।

বাবা : আপনি কোথ্থেকে এলেন ? কী করে এলেন ?

দমকল : মই লাগিয়ে ছাদের ওপর চড়ে ছিলাম, তারপড় সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসেছি।

পুলিশ : মই দিয়ে একবারে ছাদের ওপর পর্যন্ত ওঠা যায় নাকি ? বেশ বাহাদুরি আছে বলতে হবে। তা কিছু দেখলেন ?

দমকল : কার্ণিশ থেকে লাফিয়ে ঘরে ঢুকল মনে হয়। হয়তো কোথাও লুকিয়ে রয়েছে।

পুলিশ : ভাঁড়ার ঘর, গুদাম এগুলো দেখেছেন ?

দমকল : একটা ঘরে বাইরে থেকে তালা দেয়া।

মা : আমি দিয়েছি। ওটা আমাদের গুদাম। একটা বাঁদর কলা খেতে ঢুকেছিল। দরজা আটকে তালা দিয়ে রেখেছি। এই বাঁদরটাকে খুঁজছেন কি না গিয়ে দেখে আসুন।

(বারান্দার জানালায় আরও দুজন ফায়ারব্রিগেড কর্মীর মুখ দেখা যাবে।)

কর্মী (১) : ধরা পড়েছে স্যাব। ঐ বাঁদরটাই । গুদামের মধ্যে।

কর্মী (২) : নোটের বান্ডিলটা খুলে ফেলেছে। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে খামচা-খামচি করছে। ছিঁড়ে ফেটে সব নষ্ট না হয়ে যায়।

পুলিশ : কী সাংঘাতিক কথা ! আব সময় নষ্ট করা যায় না।

(হাতে পিস্তল বার করে নেয়।)

মা : থাক, বাঁদরের ওপর আর বাহাদুরি দেখাতে হবে না। এই ধরুন দরজার চাবি। ফায়ারব্রিগেডের লোকের কাছে নিশ্চয়ই জাল আছে। ওরা ধরে দেবে।

দমকল : উনি ঠিকই বলেছেন। কোনোও অসুবিধা হবে না। আপনি আসুন।

পুলিশ : আপনাদের সহযোগিতার জন্য অশেষ ধন্যবাদ। দরজা-জানালা বন্ধ করে বসুন। আমরাও আর দেরি করব না। শেষে বেশি ভিড় জমে যাবে। কাজ শেষ হলে আমিও ওদের সঙ্গে মই দিয়ে নেমে যাব। দর্শকদের জন্য বেশ ড্রামাটিক হবে। চাই কি আশরাফ সাহেব বলে দিলে কাগজে ছবি পর্যন্ত

বেরিয়ে যেতে পারে। থ্যাংকস। গুড বাই।

(ফায়ারব্রিগেড ও পুলিশ অফিসার বেরিয়ে যায়)

বাবা : ওরা খুঁজে বার করত, করত ! সব কথা তুমি বলে দিতে গেলে কেন ?

মা : হ্যাঁ, আমরা চুপ করে থাকি আর ওরা ঘরের ভেতর থেকে টাকাসহ বাঁদব বার করে বলুক যে সবই আমাদের বাঁদরের কারসাজি। আমাদের ইশারায় করেছে।

আশরাফ : খালাম্মা ঠিকই বলেছেন। তার ওপর আবার দেখে গেছে যে আমরা দড়ি ধরে বসে আছি।

আমেনা : থাক তোমাকে আর কথা বলতে হবে না। বসে রয়েছ কেন ? যা ইচ্ছে হচ্ছে তাই করগে। বেরিয়ে যাও। নিচে গিয়ে দাঁড়াও। সবটা ঘটনা ভালো করে দেখ। না দেখলে বাড়িয়ে বাড়িয়ে লিখবে কী করে ?

আশরাফ : যাচ্ছি। তবে যাবার আগে কয়েকটা কথা বলে যেতে চাই।

আমেনা : আমার মাথা ধরেছে। আমি ভেতরে গিয়ে একটু শোব মা।

মা : এই গোলমালের মধ্যে শুয়ে কোনো লাভ আছে না কি ? সবাই চলে যাক তারপর দেখা যাবে। এখন এইখানেই বোস'

আশরাফ : ও না শুনতে চায় না শুনুক। আপনি আর খালুজান শুনলেও চলবে। বিশেষ করে আপনাদেরকে বলব বলেই আজ আমি ঠিক করে এসেছিলাম। সত্যি কথা বলতে কি, রোজই প্রায় ঠিক করে আসি যে, আজই বলব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পেরে উঠি না। আমার কৈশোর থেকে অতি-চেনা এই পবিবেশে, আপনাকে, খালুজানকে একটা প্রস্তাবের কথায় টেনে নিয়ে আসাব সাহসই হতো না। কেমন যেন নাটুকে এবং অস্বাভাবিক মনে হতো। কিন্তু আজকের এই সম্পূর্ণ এক অবাস্তব পরিবেশেব মধ্যে পড়ে আমার প্রত্যহেব সংকোচ কিছুক্ষণের জন্য হলেও ভেঙ্গে-চুরে গেছে। মনে হচ্ছে, বললে এখনই বলা সংগত।

মা : ওগো শুনছ। আশরাফ তোমাকে কিছু বলতে চাইছে।

বাবা : বাঁদরটাকে বোধহয় এতক্ষণে জালবন্দি করে ফেলেছে।

মা : আশবাফ কী বলতে চাইছে শোন।

বাবা : ক ? আশরাফ ?

আমেনা : মা আমি সবার জন্য আরেকবার চা কবে নিয়ে আসি ?

আশরাফ : আমি কিছু কথা বলতে চাইছিলাম। স্পষ্ট করে বলতে চাইছি।

বাবা : থাক। আজ থাক। আজ মনটা ঠিক নেই। আরেক দিন। আরেক দিন শুনব!

আমেনা : বাবা !

মা : তা বাবা আশরাফ তোমার অত ব্যস্ত হওয়ার কী আছে। আজ না হয় কাল

যখন খুশি বলো। বলা না বলায় কী এসে যায়। তোমাকে কি আমরা জানি না।

আশরাফ : খালাম্মা দোয়া করবেন। আপনাদের স্নেহ, ভালোবাসা থেকে যেন কোনোদিন বঞ্চিত না হই।- ওই যে, বোধহয় বাঁদরসহ মই বেয়ে নামছে। আমি আসি। আমেনা কালকে আবার আসব। তখন কথা হবে। চলি।

(ছুটে বেরিয়ে যায়। বাবা জানালায় মুখ রাখে। আমেনা দরজার দিকে তাকিয়ে থাকে। মা চায়ের জিনিস গুছিয়ে রাখে।)

[যবনিকা]

পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা

নওজোয়ান কবিতা মজলিস

চরিত্র

- তবাররুক আহাম্মদ
- ফৈয়াজ মালী খোরশান
- খোরশান রকিব
- কিয়া ও সিদ্দিন জায়গিরদার
- মোনায়েম খান্নাস
- বেগম খোশবু আহাম্মদ
- শর্মিলা বেগম
- সভর্তৃকা গুহ (কুমারী)

[ইঁহারা সবাই "নওজোয়ান কবিতা মজলিসের" সভ্য-সভ্যা। শহরে ব্ল্যাকআউট থাকায় প্রতিমাসে একবার করিয়া পূর্ণিমা রাতে ইঁহারা একস্থানে মিলিত হন এবং নয়া আদব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তবে মজলিসের একটি বিশেষ নিয়ম হইতেছে যে আসরে প্রত্যেকেই নিজের নিজের লেখা পড়িবেন।]

প্রথম দৃশ্য

সময় : ১৩৪৯, পৌষ মাস

বেলা : রাত্রি আসন্ন

[কলিকাতায় কোনো এক অখ্যাতনামা পাড়ায় শীর্ণ একটি গলিতে জ্যোৎস্নার রোশনাই সবে জমিতে আরম্ভ করিয়াছে। মন্থর গতিতে শর্মিলা বেগম এবং খোশবু আহাম্মদ সাহেবার প্রবেশ।

শর্মিলা : জ্যোৎস্না তোমার খুব ভালো লাগে, না বু ?

খোশবু : তা নইলে অমন ছটফট করে পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম!

শর্মিলা : সত্যি বু, আমারতো রীতিমত ভয়ই লেগে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল চাঁদের আলো তুমি যেন খামচে খামচে মনের কোণায় ভরে নিচ্ছিলে। আমার কিন্তু চাঁদের আলো ভারি বিচ্ছিরি লাগে!

(মিডিয়াম হিলের জুতার অগ্রভাগ দিয়ে একটা পতিত ইট খণ্ডকে জোরে শট করিল)

খোশবু : মিথ্যুক, তবে তুই কেন পার্কে ঘুরছিলি ? মিটিং আরম্ভ হবে তো সেই আটটায়।

শর্মিলা : ওঃ সেই কথা! সে এক মজার ব্যাপার। বিকেলবেলায় ঐ এসপ্লেনেডের মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সময় বোধহয় একটা ফরসা-পানা ছেলের দিকে চেয়ে একটু হেসে ফেলেছিলাম।

খোশবু : ছিঃ ছিঃ, তোর কি একটুও লজ্জা নেই!

শর্মিলা : শোনই সবটা আগে! হঠাৎ হোস্টেলে ফেরার পথে একবার পেছন ফিরে দেখি ছেলেটা দূর থেকে আমায় লক্ষ করছে। বোধহয় ঠিকানা জানবার লোভে বেচারা অতটা পথ ফলো করেছিল। আমার কেমন বেশ মজা লাগলো। তাই এলোমেলো খুব কতক্ষণ ট্রাম থেকে বাস, বাস থেকে পায় হেঁটে চলতে লাগলমে— শেষটায় ঢুকলাম তোমাদের ঐ পার্কে। ছেলেটাও বোধহয় ঐ সন্ধ্যা লাগে লাগে সময় আমার সম্বন্ধে হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিল— চলে গেল !

খোশবু : কী বেহায়া মেয়েরে তুই, তোর কি কিছুই মুখে বাধে না শর্মি ?

শর্মিলা : বুকের বাঁধনেই সারা হলাম, আবার মুখেও ফাঁসি দিবি হায়রে!

(দুঃখের আতিশয্যে পথিমধ্যে শায়িত একটি খালি কাগজের ঠোংগাকে জুতার প্রবল খোঁচায় ফাঁসাইয়া দিল)

খোশবু : আজকের সভার জন্যে কবিতা এনেছিস ?

শর্মিলা : হ্যাঁ।

খোশবু : তুই নিজে লিখেছিস ?

শর্মিলা : না।

খোশবু : তোর ক্লাস নাইনে পড়ুয়া ছোটবোনের খাতা থেকে চুরি করা ?

শর্মিলা : হ্যাঁ। কী যে তুমি প্রশ্ন কর বু ? ছোটবোনের খাতা থেকে চুরি না করলে পাবো কোথায় ? আমার তো আর তেমন—

খোশবু : নিজে চেষ্টা করিস না কেন ?

শর্মিলা : আমি লিখব..প্রেমের কবিতা ? হি... হিহি.. হি। প্রেম নিয়ে কবিতা লেখার মতো শুকনো প্রবৃত্তি এখনও বাকি আছে নাকি ? ও-সব প্রথম প্রথম চলে, এই ক্লাস নাইন টেন অবধি।

(দুই জনেই নীরবে চলিতে থাকে। কিছুক্ষণ পর খোশবু আহাম্মদ কিছুটা উদাস হইয়া ধীরে ধীরে শর্মিলা বেগমের কাঁধের ওপর হাত রাখিল)

খোশবু : জানিস শর্মি, কবিতা লিখতে আমার খু-ব ভালো লাগে।

শর্মিলা : প্রেমে পড়ার চেয়েও ?

খোশবু : ভালোবাসার কবিতা লিখতে লিখতে আমার ইচ্ছে হয় সমস্ত দেহ নিংড়ে ওতে আমার সকল অনুভূতি স্তূপীকৃত করে দি।

শর্মিলা : আচ্ছা বু তোমার কবিতা লেখার অনুভূতি চাড় দিয়ে ওঠে কখন ? টাইমস পত্রিকার বিজ্ঞাপন ঘাঁটতে ঘাঁটতে ?- মামী খোরশান সাহেবের কিন্তু তাই হয়।

খোশবু : আমি যখন কবিতা লিখি আমি চাই সমস্ত প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে নিজের মধ্যে পেতে। আমার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে তাই তার কী আস্বাদন— উপচে ওঠা আলোর স্পর্শ। তাই প্রথমে করি কি অঙ্গ থেকে...

(এই খানে হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল এবং শর্মিলার কানের কাছে মুখ লইয়া ফিসফিস করিয়া অসম্পূর্ণ বাক্য শেষ করিল। শর্মিলা হাসিল, হি হি— হিহিহি— হি...)।

তারপর দরজা বন্ধ করে এলিয়ে দি সমস্ত শরীর। খোলা জানালা দিয়ে আমার নির্বসনা দেহ ভেঙে পড়ে আলোর বন্যা।—

শর্মিলা : তোমার ঘরে চড়ুই পাখি আসে না বু ?

খোশবু : আসে তো, কেন ?

শর্মিলা : না তা হলে আমি পারতাম না। ঘরে চড়ুই পাখি থাকলে শু'তে আমার বড় লজ্জা করে। (খিলখিল করিয়া দুইজনেই হাসিয়া উঠিল) (নীরবতা)

খোশবু : আচ্ছা মালী খোরশান সাহেবের কবিতা তুই তো অনেক পড়িস, কেমন লাগে ?

শর্মিলা : মালী খোরশান সাহেবের সুরতে মোবারক তোমার কেমন লাগে বু ?

খোশবু : আহ্ কী ছ্যাবলামো করছিস ? ওনার কবিতা তোর কেমন লাগে ?

শর্মিলা : বাঃ কবির চেহারা সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করার আগ অবধি কী করে বলি যে ওঁর কবিতা ভাল লাগে কি লাগে না ? তুমি পারো ? কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদারকে দেখার আগে তুমি কোনোদিন জানতে পেরেছিলে যে ও ব্যাটার লেখা তোমার অতো পছন্দ হয় ?

খোশবু : (আরক্তিম মুখে) শমি !

শর্মিলা : মাফ চাইছি। ও নাম নিয়ে আর ঠাট্টা করবো না।

খোশবু : মালী খোরশান সাহেবের চশমার ফ্রেম খুব সুন্দর— এবার বল ওর কবিতা কেমন লাগে ?

শর্মিলা : তাহলে সত্যি কথাই বলে ফেলি। ওর কবিতা পড়ার সময় আমার কী মনে হয় জানো বু ? মনে হয় যেন প্রত্যেক অক্ষরের ফাঁকে ফাঁকে T. S. Eliot লুঙ্গি পরে ধেই ধেই করে সাঁওতালী নাচ নাচছে। আর নাচের ছন্দের সে কী বাহার! বুন্দেলী রোশনাই যেন ঠিকরে ঠিকরে—

(হাসির অত্যধিক উচ্ছ্বাস না রুখিতে পারিয়া খোশবু আহাম্মদ নিজের মুখে জাপানি রুমালিকা গুজিয়া দিল এবং অন্য হাতে শর্মিলার মুখ চাপিয়া ধরিল)

খোশবু : উহ্ ! (হাসি) শমি, থাম্-থাম্। (একটু পরে) কটা বাজলো রে ?

শর্মিলা : (হাতঘড়ি দেখে) সারে সাত, এখনও আধ ঘণ্টা বাকি।

খোশবু : তবু চল্, আমরা এখনই যাই। ওখানে বসে বসে আলাপ করা যাবে।

(উভয়ে চলিতে থাকে। রঙ্গমঞ্চের পদপ্রান্তে আসিয়া আচমকা শর্মিলা বেগম দাঁড়াইয়া পড়িল। খোশবু আহাম্মদ সাহেবাও থামিল। শর্মিলার মুখ গম্ভীর এবং ফ্যাকাসে হইয়া গিয়াছে।)

খোশবু : (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) আবার কী হলো রে ?

শর্মিলা : (অস্ফুট কণ্ঠে) তবাররুক আ-আ-হাম্মদ সা-আ-হে-ব!

(মুহূর্তের মধ্যে খোশবু আহম্মদ সাহেবার মুখও বিবর্ণ হইয়া গেল)

খোশবু : (হতাশা আর্তনাদের সুরে) তাইতো— মনেই ছিল না।

শর্মিলা : না না, এ অত্যাচার আমি আজ আর কিছুতেই মানব না।

খোশবু : কী আর করবি শমি, তবাররুক সাহেব প্রেসিডেন্ট যখন, তখন তাকে মেনে নিতেই হবে।

শর্মিলা : না, এ অসম্ভব। শুধু তুমি মনের বল হারিয়ো না বু'। এর প্রতিকার আজ

আমি করবই দেখে নিও। উহ্! কী ভয়ঙ্কর! প্রেসিডেন্ট বলেই কি তিনি তাঁর ঐ (খুব জোরে) ঐ চারশ লাইনওয়ালা অসংলগ্ন, অযৌক্তিক, অস্বাস্থ্যকর কবিতা আমাদের জোর করে শোনাবেন। এ রীতিমতো মানসিক ব্যাভিচার।

খোশবু : শমি বড় উত্তেজিত হয়ে যাচ্ছ তুমি।

শর্মিলা : উত্তেজিত হব না কেন ? তুমি না হয় কিয়াওমিদ্দিন সাহেবের মুখের দিকে চেয়ে নির্বিবাদে দু'চার ঘন্টা কাটিয়ে দিতে পার। কিন্তু আমি ? প্রচণ্ড উৎসাহে আমাকে তখনও শুনে যেতে হবে তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের নিষ্কাম, নিরুদ্বেগ কবিতাকে যে-কোনো অনিশ্চিত সময়ের জন্য। তাও যদি—

খোশবু : শর্মিলা!

শর্মিলা : (ভ্রুক্ষেপ না করিয়া) তাও যদি (মৃদু ফোঁপানির সুর) খোরশান রকিব সাহেব মাঝে মাঝে আমার দিকে এক আধবার চোখ তুলে চাইত! না, না, এ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

খোশবু : কী করবি ?

শর্মিলা : দু'শো লাইনের বেশি হলে বাধা দেবো। না শুনলে বেরিয়ে আসবো।

খোশবু : পারবি তো, কী বলবি ?

শর্মিলা : সে একটা অজুহাত খুঁজে নেবই। সেটুক না পারলে আর মেয়ে হয়ে জন্মেছি কেন ?

(একটু মুচকি হাসিল। পুনর্বার গম্ভীর হইয়া দৃঢ়চিত্তে, দৃপ্ত পদ-বিক্ষেপে, যুদ্ধংদেহী মূর্তিতে খোশবুকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল। শর্মিলা এবং খোশবু বাহির হইয়া যাইতেই একটা ডাস্টবিনের পিছন হইতে কবি মোনায়েম খান্নাস চুপে চুপে উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

মোনায়েম খান্নাস (ডান হাতে আচকান ঠিক করিতেছেন এবং বাম হাতে কপালের একটা ফুলা অংশকে টিপিয়া ধরিতেছেন। মুখ বেদনা এবং বিরক্তিতে কুঞ্চিত) বাব্বাঃ কী সাংঘাতিক মেয়েরে : খেলার ছলে ইটকে শুট করলো— মনে হলো যেন জুম্মা খাঁ রিটার্ণ কিক মারলেন! আরে সেই ইঁট পড়বিতো পড় এক্কেবারে পড়লো আমারই পোড়া কপালে! (কপালটা ভাল করিয়া টিপিয়া ধরিল) ভীষণ ফুলে উঠেছে যেন। তা যাক, তবু শর্মিলা কথাটা বেশ বলেছিল। মালী খোরশান সাহেবের কবিতা যেন (হাসে ও ভাবে) ঠিকই তো, ও আবার কবিতা নাকি ?... কিন্তু আমার কবিতা সম্বন্ধে ওনার কী মত সেটা জানতে পারলে মন্দ হতো না। নিশ্চয়ই খুব ভালো— নিশ্চয়ই—

(কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদারের প্রবেশ)

কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার আদাব আরজ, খান্নাস সাহেব, মেজাজ শরীফ ?

খান্নাস : ইয়ে, এই দোয়া আপনাদের।

জায়গিরদার : তা একলা একলা কী করছিলেন ?

খান্নাস : এই মানে একটু পায়চারি আরকি, চাঁদের আলোয় ঘোরাফেরা মাত্র।

জায়গিরদার : কিন্তু আপনার কপালে ওটা কী ? বাৎ কেয়া হ্যায় ?

খান্নাস : ইয়ে, মানে সংঘাত, আকস্মিক সংঘাত।

জায়গিরদার : আকস্মিক সংঘাত ? তা আপনাদের মতো intellectual-দের সেটা কি মাথার খুলিতে না ঘটে মাথার ভেতরে ঘটলেই কি স্বাভাবিক হতো না ?

খান্নাস : (ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া) আমার একটা দুর্ঘটনাকে উপলক্ষ করে আপনার অতটা রসালভাবে ব্যঙ্গজনক হয়ে ওঠার কোনোই প্রয়োজন নেই। ব্যাথা পেয়েছি অন্য কারণে—

জায়গিরদার : কারণটা শুনতে পারি কি ?

খান্নাস : গভীর চিত্তে একটা কিছু ভাবতে ভাবতে একটু তন্ময় হয়ে পড়েছিলুম। পথ চলতে গিয়ে টের পাইনি একটা ল্যাম্পপোস্ট আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ঘটনাটা কাজেই বুঝতে পারছেন।

জায়গিরদার : oh! sure sure ! জরুর! সত্যি আজকাল ল্যাম্পপোস্টগুলো বড্ড অসভ্য হয়ে উঠেছে। যেখানে সেখানে হা করে দাঁড়িয়ে থেকে পথিক সুজনের ব্যাপারে মাথা গলাতে আসে! (একটু হেঁটে) তা একটা কথা, এপথ দিয়ে কাউকে যেতে দেখেছেন কি ? I mean মিস খোশবু আহমেদ কিম্বা অন্য কাউকে ?

খান্নাস : (অস্বাভাবিক উচ্চ কণ্ঠে) না-ও!

জায়গিরদার : (সিগারেট কেস খুলে) Never mind. Have a cigarette.

খান্নাস : না, শুকরিয়া, ওটা আমি খাই না।

জায়গিরদার : (আরেক পকেট হইতে বিড়ির কৌটা বাহির করে) ওহ্, তা ওটাও আছে এই নিন্।

খান্নাস : ধন্যবাদ, (একটা নেয়) কিন্তু আপনার সাথে দু'রকমই মজুদ যে ?

জায়গিরদার : আহ এও বুঝলেন না ? ওই খাকিটা হচ্ছে রাজনৈতিক সভার জন্যে আর এটা হলো সাহিত্য আসরের জন্যে। তা চলুন এবার এগুই।

খান্নাস : কোথায় ?

জায়গিরদার : কেন আপনাদের মজলিসে! যেখানে আমার কবিতা খুব মনোযোগ দিয়ে উপভোগ করবেন আপনি আর আপনার কবিতার দার্শনিক রসের রথে চড়ে আমি যাব স্বর্গোদ্বারে। এবং তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের কবিতার কাব্যবাণে আমরা সবাই একত্রে জর্জরিত হবো মহা উল্লাসে।

খান্নাস : এ্যাঁ-ও ! তবাররুক, তবাররুক কী ভয়ঙ্কর! অন্যকে নিজের চার লাইন কবিতা শোনাবার লোভে ঐ কবি পাষণ্ডের চারশ লাইন ছন্দবদ্ধ পাশবিকতা সহ্য করতে হবে ? অ্যাঁ...? কী কঠোর প্রায়শ্চিত্ত!

(প্রবল বেগে ফুলা কপাল চাপিয়া ধরিয়া টলতে টলতে প্রস্থান করিল। জায়গিরদার সেই দিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিলেন তারপর তিনিও বাহির হইয়া গেলেন।)

(প্রায় সাথে সাথেই ফৈয়াজ আলী খোরশান সাহেবের কাঁধে ভর করিয়া কুমারী সভর্তৃকা গুহের ধীর প্রবেশ। সভর্তৃকা গুহের বাঁ হাত একটা স্লিং-এ কাঁধে ঝুলানো, অন্যহাত বাহু ভর করিয়া আছে। মনে হইতেছে যেন হাতে ব্যথা পাওয়াতে ভদ্রমহিলার পায়ে চলিতে একটু কষ্ট হইতেছে!)

সভর্তৃকা গুহ : দাও এবার হাতটা ছেড়ে দাও, এতটুকুন রাস্তা আমি একলাই চলতে পারব।

ফৈয়াজ মালী : থাক না, কেন খামকা কষ্ট করবে, আমার কাঁধে ভর করেই না হয় আরেকটু চললে, দোষ কী? তারপর না হয় একলা একলাই চল।

সভর্তৃকা : না, না, ছিঃ কেউ দেখে ফেললে কী বলবে, তার চেয়ে এমনি ভালো।

(হাতটা মুক্ত করিয়া চলিতে থাকে) জানো মালী, ঘণ্টাখানেক আগে যখন আমি আর তুমি পার্কে বসেছিলাম, এই রুপোলি চাঁদটা এতটা সুন্দর লাগছিল। মনে হচ্ছিল যেন...যেন (আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে)

ফৈয়াজ : ভর্তা (চশমা পরিষ্কার করে) ওরা কারা ঐ সামনে চলছে?

সভর্তৃকা : কবি খান্নাস মশায় এবং কবি জায়গিরদার মশায় বোধ হয়।

ফৈয়াজ : ওহ্ কবি! ছোঃ ওদের আবার কবিতা হয় নাকি? ছন্দ নেই, রুচি নেই, শুধু দুর্বোধ্য দর্শনবাদ দর্শাবার ফাঁপা ইচ্ছে থাকলেই কবি হওয়া যায় না, তাহলে এতদিনে (নিজস্ব প্রিয় ফর্মুলার প্যাঁচে ধরিয়া) এতদিনে একটা কলেজ স্কোয়াবের T. S. Eliot হয়ে উঠতে পারতেন।

সভর্তৃকা : আর ঐ জায়গিবদার মশায়েব কবিতাও আমার এতটুকু পছন্দ হয় না। কেমন একটা বর্বর উল্লাস প্রত্যেক বাক্যে মাথা উঁচিয়ে থাকে। একটা কর্কশ ঔদ্ধত্য যা-যা যে-কোনো সৎস্বভাবা ভদ্র মহিলার পক্ষে সভ্য অবস্থায় পড়া নিতান্ত অসম্ভব। বিশেষ করে বঙ্গদেশেব ঐ উষ্ণ অঞ্চলের পক্ষে ও-রকম ভ্যাপসা কবিতা রীতিমত অস্বাস্থ্যকর।

(এই অবধি বলিয়া হাঁপাইয়া ওঠে। হাঁটে, তারপর আবার চাঁদের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকে। উদাস সুরে)

চাঁদটা কী সুন্দর! যেন, যেন—

ফৈয়াজ : যেন নীল শিরা বসানো প্রেয়সীর গালফুলো মুখ।

সভর্তৃকা : যেন মোল্লা সাহেবের উষ্ণীষ!

(উভয়ে উভয়ের দিকে প্রশংসার দৃষ্টিতে চাহে)

ফৈয়াজ : কিন্তু জানো ভর্তা, আজকের ঐ অমর চাঁদ আর অল্প কিছুক্ষণ পরেই ভেঙে ভেঙে চুরচুর হয়ে যাবে।

সভর্তৃকা : (ব্যথিত কণ্ঠে) চুরচুর?

ফৈয়াজ : থরে থরে গলে ঝরে পড়বে।

সভর্তৃকা : ঝড়ে পড়বে, কেন, কীসের দুঃখে?

ফৈয়াজ : (সমস্ত মুখ বিকৃত করিয়া) তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের বিরামহীন কবিতার কষাঘাতে—এত শুধু জ্যোৎস্নার রুপালি আভা-অন্ধকারে খবিসের লোলুপ চোখের জ্যোতিও নিষ্প্রভ হয়ে যাবে ঐ কবিতার বিচ্ছুরিত আভায় (অপেক্ষাকৃত নিম্নকণ্ঠে) তবু আমি যাব, যেতে হবে, তা নইলে কোথায় পাব লোক, কাকে শোনাব আমার গীতধ্বনি।

সভর্তৃকা : তবু যাব। (পাণ্ডুর হাসি) তবু যাব, আমাদের যেতে হবে।

[আস্তে পর্দা নামিয়া আসিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের ইমামতিতে 'নওজোয়ান কবিতা মজলিসের' আসর আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মাঝারি রকমেব বড় একটা হল কামরা। মেঝেতে পুরু ফরাস পাতা। তাহারই এক মাথায় একটা গোলাকার রঙিন কাপড়ে অদ্যকার সভার ইমাম সাহেব তশরিফ রাখিয়াছেন। তাহার পাশে অপেক্ষাকৃত অল্প দামি আরেক টুকরো রঙ্গিন কাপড়ের ওপর মোকাব্বের ফৈয়াজ মালী খোরশান সাহেব আত্মাহিয়াতোর ভঙ্গিতে বসিয়া আছেন। সামনে অর্ধচক্রাকারে সমিতির অন্যান্য সভ্য-সভ্যারা বসিয়া। ঘরেব পেছন দিকে কতগুলি চেয়ার টেবিল স্তূপিকৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে।]

(একটু ফৃর্সী হুক্কা হইতে একটি বিরাট নল সব্বাইকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া ইমাম সাহেবের হাতের কাছে শেষ হইয়াছে।)

তবাররুক : আজকের মজলিসে গত আসরের রিপোর্ট পড়া হোক।

ফৈয়াজ : (লম্বা একটা খাতা খোলে এবং চশমাটা ঠিক করিয়া লয়) গত ১৯শে নভেম্বর আমাদের এই মজলিসের এক বৈঠকে এই গৃহেই হাসেল হইয়াছিল। সমিতির রেওয়াজ মতো করিবন্ প্রত্যেক উপস্থিত বান্দা মাত্রেই তাঁহার শের এখানে পাঠ করিয়াছিলেন। নিম্নে প্রত্যেকের ওয়াখ্ত হাজির করা হইল :

বেগম খোশবু আহাম্মদ — তিন মিনিট
শর্মিলা বেগম — দুই মিনিট
কুমারী সভর্তৃকা গুহ — চার মিনিট
ফৈয়াজ মালী খোরশান — চার মিনিট
মোনায়েম খান্নাস — পাঁচ মিনিট
কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার — চার মিনিট

তবাররুক আহাম্মদ — তিনঘণ্টা ত্রিশ মিনিট

ইসতরেই রাত সাড়ে বারোটার সময় মজলিস খতম হয়।" মঞ্জুর ?

খান্নাস : আমার জরাসি আপত্তি। জনাব ইমাম সাহেবকে আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি যে ব্যাকরণ মতে মোকাব্বের সাহেবের "বান্দা" শব্দের অর্থ মজলিসের একটা সু-অংশকে মর্মান্তিকভাবে ঘায়েল করে নাই ?

তবাররুক : (হাসিয়া) ঠিক হ্যায়, মোকাব্বের সাহাবই ঠিক হ্যায়।

ফৈয়াজ : মঞ্জুর ?

সবাই একত্রে : মঞ্জুর। (ইমাম সাহেবও ঝুঁকিয়া দস্তখত করিলেন)

তবাররুক : এবার তাহলে আমাদের কাজ শুরু হোক। আমি বেগম খোশবু আহাম্মদ সাহেবাকে তাঁর শের পড়বার জন্যে আহ্বান করছি।

(এক টুকরো নীল কাগজ হাতে লইয়া খোশবু আহাম্মদ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন)

খোশবু : (শাড়ির ভাঁজগুলির উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া) কবিতার নাম "লজ্জা"

"উহ্! কত আলো !
এত আলো আর তার রেখাগুলো
এতই প্রখর ?
আমার ঈষদচ্ছ চর্মে যেন
বিঁধিছে বারবার
এত আঁধার তবু
উহ! কত আলো !
তোমার রক্তিম ঠোঁট
ঐ আঁধারে চমকিছে বারবার
দেহে এলো শিহরণ।
আমার নগ্ন শিহরণ যদিই-বা
তোমার চোখে পড়ে ধরা
তাই বলে কি লজ্জা দেবে আমায়
হাসবে তখন ?
ইস—তাহলে যে আমি
লাজেই মরে যাব।"

(কনে আঙুল ঠোঁটে ঠেকাইয়া উষ্ণমুখ নত করিয়া বেগম খোশবু আহাম্মদ সাহেবা থামিলেন)

খান্নাস, রকিব } (একত্রে)। বাহ্ওয়া-বাহ্ওয়া!

জায়গিরদার : বাগীশ্বরী! (বিভোর চিত্তে)

তবাররুক : বহুৎ আচ্ছা।

ফৈয়াজ : Eres maleque da qui! (অন্য ভাষায় বলিলে সকলে বুঝিয়া ফেলিবে এই জন্য তিনি ল্যাটিনে নিজের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিলেন)

খান্নাস : জায়গিরদার সাহেব, ও জায়গিরদার সাহেব (কিয়াওমিদ্দিন জায়গিরদার তখন চক্ষু বন্ধ করিয়া গভীর নিশ্বাস টানিতেছেন) শুনছেন ? জায়গিরদার সাহেব, এই করছেন কি আপনি, কী শুঁকছেন ?

জায়গিরদার : এঁ্যা, আমায় কিছু বলছেন ?

খান্নাস : হাঁ হাঁ, কী করছিলেন আপনি চোখ বন্ধ করে ?

জায়গিরদার : ও! ঘ্রাণ নিচ্ছিলাম। ভবিষ্যতের আঘ্রান পাচ্ছিলাম ঐ খোশবু আহাম্মদ সাহেবার কবিতায়।

(চোখ বন্ধ করিয়া আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস নিলেন। খান্নাস সাহেব ভেংচি কাটিলেন)

তবাররুক : জায়গিরদার সাহেব, আপনার শের পড়ুন।

জায়গিরদার : আমার আজকের কবিতার নাম "তিরশ্চুম্বক"। কবিতাটি অবচেতন মনের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তের বিবর্ধিত বিবৃতি।

"কোথা সেই পিকাসোর অতিকায় কিন্নরী
তার কিম্ভুতকিমাকার রঙোরার কুণ্ঠণ ?
কোথা সেই অভিপ্সু অবৃঢ়োব
নৈংগিক ক্রন্দন ?
মরুভূঁর স্বর্ণজলে শুধু ব্যর্থতার গ্লানি !
মোদের চিত্ত ভিন্ন মনা।
ছিন্ন করি চশমা সাবেক
তীক্ষ্ণমুখি স্ফুরণে, বল্গাহীন জেব্রা-বেগে-
কুঞ্চিত মাংসপেশি ঋজু করি আনি
মাগে শুধু মহালক্ষ্মী—সিঙ্কের অন্তরালে
শুধু মরণেরে।
মুর্ছিত স্বরসংগিত।
অবলোহিত স্থৈতিক-মোক্ষণে
মিশ্রিত হলো সান্দ্র-স্বর্ণজলে
রহিল শুধু নিরুদ্বেগ তিরশ্চুম্বকতা।'

শর্মিলা
সভর্তৃকা } আহ্— কী-ই-ই

খোশবু : (প্রশংসার আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিল। চোখের পাপড়ি ঝুলিয়া পড়িল।)

খান্নাস : ভাষাটা একটু কর্কশ, একটু রূঢ় তা নইলে কবিতার বিষয়বস্তু অতীব পরিপূর্ণ ও বিশুদ্ধ।

শর্মিলা : আমার মনে হয় বিষয়বস্তু ছাড়া আর সবই বেশ সুন্দর হয়েছে। (পজ্)

তবাররুক : এবার আপনাদের খ্যাতনামা কবি খোরশান রকিব সাহেব তার একটা কবিতা পড়ে শোনাবেন।

রকিব : আমি, আ-আ-মি ? আজ..জকে ?

শর্মিলা : (খুশিতে চলকাইয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি-ই!

খোশবু : শমি!

(শর্মিলা সচেতন হয় এবং এক ধমকে নিজের উচ্ছ্বাস দমন করিয়া ফেলে। রকিব সাহেব উদাসীনভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। মনে মনে সমিতির প্রত্যেক সভ্যই একটা মহত্তর কিছু শুনিবাব আশায় উন্মুখ হইয়া ওঠে। রকিব সাহেব আরো কিছুক্ষণ চুপ করিযা থাকিয়া আরম্ভ করিলেন)

রকিব : কিন্তু আমি তো কোনো কবিতা আজ আনিনি।

(শর্মিলার সর্বপ্রথম দীর্ঘশ্বাসের সাথে সাথে আর প্রত্যেকেই একটু আধটু দুঃখজনক শব্দ উচ্চারণ করিল)

তবাররুক : তা, শামল। বেগম তাহলে আপনিই একটা কবিতা পড়ুন।

শর্মিলা : আচ্ছা পড়ি। (শাড়ির কোনো গুপ্ত ভাঁজ হইতে এক টুকরো কাগজ হাতে লইল। কিন্তু ইনানো-বিনানো মিহি-গলায় এত বেশি দরদ দিয়া তিনি সেটা আবৃত্তি করিলেন যে, কেহই তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।)

রকিব : আপনার কবিতাটা কি একবার দেখতে পারি শর্মিলা সাহেবা ?

শর্মিলা : (ঠোঁট ফুলাইয়া) আমার রিডিং পড়াটা কি এতই খারাপ যে আপনি তার এক বিন্দুও...

রকিব : (নার্ভাস হইয়া তাড়াতাড়ি) না না সে কথা নয়। আপনার কবিতা খুব ভাল হয়েছে তাই তো নিতে চাইছি। আমার "স্যাংগাৎ" পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে চাইছি। (হাতে নিল)

খান্নাস
ফৈয়াজ] বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে কবিতাটা।

তবাররুক : এবার মোনায়েম খান্নাস সাহেব আপনার কবিতা—

খান্নাস : আমার কবিতায় খুব দর্শনবাদ থাকে বলে অনেকেই আমায় দোষ দিয়ে থাকেন। তাই আজকের এই কবিতায় আমি যথাসম্ভব দর্শনবাদ বাদ দিয়ে কবিতার মূল শিল্পকলাকেই—

ফৈয়াজ
কিয়াওমিদ্দিন] আহ্হা ? তাকাল্লুছের কী আছে ? আপনি আদত কবিতাটাই শুরু করুন না।

খান্নাস : (দুইজনের প্রতি কটমট করিয়া চাহিয়া) কবিতার নাম "জন্মের আগে এবং মৃত্যুর পরে"।

"অনেক ভাগ্য বাতাসে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক আশা মনেতে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক নারী মিছিলে ছিল— আমার কপালে ছিল না
অনেক বাঁশি ঘাটেতে ছিল— আমার কপালে ছিল না
আমার কপালে ছিল না বন্ধু আমার কপালে ছিল না
জীবন দেবতা আমারে শুধু করিল প্রবঞ্চনা।
আমার আসার আমলে শুধু জন্ম বিধাতা হাসিল না
সুফলা সখীরা আমারি তরে প্রোটোপ্লাজম আনিল না
বাতাসে কখনও ভাগ্য ছিল না— কপালে আমার ছিল
মনেতে কখনও আশা ছিল না— কপালে আমার ছিল
মিছিলে কখনো নারী ছিল না— কপালে আমার ছিল
ঘাটেতে কখনো বাঁশী ছিল না— কপালে আমার ছিল
কপাল আমার ছিল হে বন্ধু, ছিল আমার কপালে
প্রোটোপ্লাজমের মৃত আত্মা, যেন আধারের মেলে।

শর্মিলা : (ওনার কপাল দেখাইয়া) কিন্তু আপনার কপালে ওটা কী হলো ?

জায়গিরদাব : তাইতো, আপনার কপাল অত ফুলো কেন ?

খান্নাস : (চটিয়া) This is no criticism। ইমাম সাহেবকে অনুরোধ করিতেছি পরবর্তী কবিতা পড়িতে অনুরোধ করা হোক।

তবাবরুক : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বেশি সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই। (সময় নষ্টের কথায় প্রত্যেকে একবাব তবাররুক সাহেবের দিকে চাহিল এবং বিবর্ণ হইয়া গেল)

আঁন্হ,-কুমারী সভর্তৃকা গুহ দেবী। আপনি আপনার কবিতা পাঠ করুন।

সভর্তৃকা : (স্লিং-এ বাঁধা হাতটা ঠিক করে এবং মালী খোরশান সাহেবের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিতে দেখিয়া) কবিতার নাম "এখনি কি যাব চলে?"

মিলনের শেষে শুধু বলেছিলে
　　'এখনই যাইব আমি'
হৃদয়ে যে সুর উঠেছিল জাগি
　　চমকি গেল তা থামি।
অঙ্গে ছিল যে চমক সরস
অতি শীঘ্র হলো নিরস বিরস
বিদায়ের ক্ষণে বলেছিনু কেঁদে
　　'শুধু তুমি এস

ভার্সিটি যদিও ভুলে যায় মোরে
তুমি মোরে ভালবেসো'।
করিডোরে ক্লাসে ভেবেছ কি সেই কথা ?
কভু ভুলে যাও নাই ট্যুটরিল খাতা ?
তোমার চশমার গোলাকার আকার
শুধু মোর মনে আছে
সে চাহনি মনের খোলসে রাত
ব্যাকুলতা আনিয়াছে।
'এখনি যাইব' বলেছিলে তুমি, জানি
ভুলিয়া যাইব সেই কর্কশ বাণী

ফৈয়াজ : Da Quinna, Da Villiaina, Da Cinna (ল্যাটিন)

রকিব : আমার পত্রিকার জন্যে কবিতাটা দেবেন কি ? (নেয়)

(অন্য সবাই এ ওর মুখের দিকে চাহিয়া প্রশংসার হাসি হাসিল কিন্তু তবারক্রুক আহাম্মদ সাহেবের দিকে চোখ পড়িতেই আবার ফ্যাকাশে হইয়া যাইতেছিল)

তবারক্রুক : মোকাব্বের মালী খোরশান সাহেব!

ফৈয়াজ : (কঞ্চি বাঁশের মতো বাঁকা হইয়া) কবিতার ডেফিনেশন দিতে গিয়ে T. S. Eliot একবার বলেছিলেন—

খান্নাস / জোয়ারদার : হাঁ হাঁ করিয়া বাধা দিয়া) তাকাল্লুছের কী আছে, আপনি আদত জিনিসটাই শুরু করুন।'

ফৈয়াজ : (বক্তৃতায় বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় বিশেষ মর্মাহত) কবিতার নাম "এখনি কি চলে যাব?"

বর্ণের জৌলুস চলিয়া গেছে
চর্মের জ্যোতি তাও আর নেই
কাহিল নওজোয়ানের প্রান্তে এসেছে উচ্ছ্বাস।
এ উচ্ছ্বাসে শ্বাস নাই হাসিছে কঙ্কাল
সম্মুখে নতুন গলিতে দিতেছে হাতছানি
পশ্চাতে স্মৃতির তবু অস্থির টানাটানি।
মহব্বৎ গুম্বুজ চূড়ায় মোর জমেছে কুহেলিকা
ভবিষ্যের আকাঙ্ক্ষায় তব কে টানিবে রেখা ?
এখনই কি নেব বিদায় ?
যদি কভু সত্যই যাই চলে
রুদ্ধ বারি অতৃপ্ত দিলের খায়েশ
ত্যাজিয়া তোমার লেবাসের উষ্ণ-ঘন খোশবু আবেশ।
সব বিস্মৃতি তলে আরো ডুবে যায়

ক্ষীণ স্বার্থ অহেতু অন্যায়।
স্যান্ডেল তলে জেগেছিল করিডোরে
সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয় ভরে
অগণিত বক্ষনিচোল উঠেছিল ফুটে
মানস নয়নে মোর জেগেছিল কামনার শিখা
আজ শুধু সেরেফ নিঃসাড় ক্লান্তি
এই দুনিয়ায়—
সত্য শুধু বর্তমান, হোক না তা নির্জীব মুর্ছিত
তব চুচুকের শ্লথ শ্লথ গ্রথিত
নির্বাসিত বিমুগ্ধ, রশ্মির মতো,
যে আল্পনা আঁকিলাম
রক্ত আখরে তীক্ষ্ণ নগরে
তপ্ত ঐ দৃপ্ত উরষে
তাই যেন ভুলে যেও ভবিষ্যের ডাকে
ছিন্ন করি স্মরণের জীর্ণ গ্রন্থিগুলি
ব্যঙ্গ করো, করো জন্মরহস্যে পরম নির্ভয়ে।
প্রিয়ারে ডাকিয়া কহো;
আজ থাক বেদনার ক্রন্দন
প্রিয়তম দূরে চলে গিয়া কেন চশমার অঙ্গন!
এখনি কি যাব চলে ?
যদি কভু সত্যই...(থামিয়া বসিলেন)

(এতক্ষণে আতঙ্ক সব্বাইকে পূর্ণোদ্যমে চাপিয়া বসিয়াছে। সব্বাই প্রত্যেকে বুঝিল যে ইহার পর আর ত্রাণ নাই। আকাশে বাতাসে প্রচণ্ড নিস্তব্ধতা।)

(শর্মিলার চোখে ক্রুদ্ধ ফণিনীর হিম আভা। সে দুই হাতে, কী একটা লইয়া কানের কাছে তুলিল)

খোশবু : (চাপা গলায়) কী ওটা, কী করছিস ?

শর্মিলা : কানে তুলো পুরে রাখলাম। ঘড়ি দেখে দেড়ঘণ্টা পর খুলে ফেলব। যদি তখন ওর গলা শুনতে পাই তাহলে, তাহলে...

(হাঁপাইতে থাকে)

(পেছনের বড় ঘড়িটায় ঢন করিয়া সাড়ে আটটা বাজিল)

তবাররুক : (বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে) এবার তাহলে আমার পালা না ? আরম্ভ করি ?

(বিরাট নিস্তব্ধতা)

তবাররুক : কবিতার নাম :"চৌরংগী-নামা"

(স্তব্ধতা)

"সওদাগর ! মরু সাইমুম
প্রবল আঘাত বাধায়
হোয়াইটওয়ের পুরু কাচে
নিথর মৃত্যু ভয়ঙ্কর
আমিন আমিন রবে
নেচে ওঠে অজন্তার ছাঁদে!
অভিশপ্ত শকুনেরা
রোলস্‌রয়েসে বসে
তায়েফের পথে বাড়ায় পা
রাত্রি ঘনালো তিমির অতলে
আওলাদ সশব্দ ওঠে কাঁদি
ফুকারী মা-মা!

(অস্পষ্ট গুনগুম আবৃত্তির সাথে সাথে আস্তে আস্তে আলো একদম নিভিয়া যাইবে এবং ক্রমশ স্পষ্টতরো আবৃত্তির সাথে আবার স্টেজ আলোকময় হইতে থাকিবে।

তখন দেখা গেল সাড়ে দশটা বাজে। সভ্য-সভ্যাদের চুল অবিন্যস্ত বেশভূষা বিপর্যস্ত, চোখে ক্লান্তি, কপালে ঘাম, অঙ্গে শৈথিল্য— তবু ও)

"শুদ্ধধার সওদাগর জাগো জাগো!
আজরাইলের কণ্ঠস্বর এখনো কি
কলিজায় তব—

(শর্মিলা তার কানের তুলা খুলিতেছে এমন সময় অকস্মাৎ সমস্ত আকাশ চিরিয়া একটা তীক্ষ্ণ সাইরেন বাজিয়া উঠিল। ইমাম ব্যতীত অন্য সকলেই হকচকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে..কিন্তু সম্পূর্ণ অবিচলিত, অদম্য আগ্রহে)

"কলিজায় তব খুন এখনো কি
অবরুদ্ধ বেদনায় ডাকে নাই বানচাল ?
লাম্পট্যের বাহকেরা, জঘন্য বিধ্বংস মানুষের
দোস্ত যাঁরা—
তাহাদের শির কতল কর, কতল কর
ছড়াও হলাহল,
হে বিরাট যুদ্ধ জাহাজ
হে সওদাগর!

(সমিতির সভ্য-সভ্যারা তখন কেহ টেবিলের নিচে, ঘরের কোণে আশ্রয় লইয়া কাঁপিতেছে— তবু ও)

"আমার বাণীর বেহেশ্‌তী রোশনাই
বিস্তারিবে সারা দুনিয়া।

খোঁড়া তৈমুর মৃত হায়দার
জাগিবে আবার,
হে চৌরঙ্গীর সওদাগর
লিপস্টিক ঠোঁটে সন্ধ্যাগমে
যে হুরীর দল...

(বুমবুম করিয়া অতি নিকটেই কোথায় বোমা পড়িল। ঘরের সমস্ত আলো নিভিয়া গেল। "হুড়মুড়" করিয়া ছাদের এক অংশ ভাঙিয়া পড়িল। কয়েকটা স্প্লিন্টার এদিক-সেদিকে বিক্ষিপ্ত গতিতে ছুটিয়া গেল। বেশ কিছুক্ষণ সব স্তব্ধ।

অন্ধকারে ভগ্ন স্তূপের একটা অংশ একটু নড়িয়া উঠিল। স্তূপিকৃত বিধ্বস্ত ইট-পাটকেলের মধ্য হইতে একটা হাত নড়ে, তাতে একটা জ্বলন্ত টর্চ যার আলো একটা বিরাট খাতার উপর ফেলা, আর তবাররুক আহাম্মদ সাহেবের মুখ তাহার ওপর ঝুঁকিয়া- এবং সাথে সাথেই পুনর্বার পূর্ণোদ্যমে)

"লিপিস্টিক ঠোঁটে সন্ধ্যাগমে
যে হুরীর দল
গোরা সৈন্য সকল
বাসরে ইঙ্গিতে দোলে
ইস্পিত দিল যেখানে
খোদার আরশচ্যুত হোলে..

শর্মিলা : (ভগ্নস্তূপের অন্য পাশ হইতে) না, না— এ অসহ্য, বন্ধ করুন!

(এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছয় ইঞ্চি ইট উড়িয়া আসিয়া টর্চটা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিল—তবুও সেই অন্ধকার হইতে তবাবরুক আহাম্মদ সাহেবের ননস্টপেবল নাটকীয় আবৃত্তির আধুনিক পুঁথিসুর শোনা যাইতেছিল...)

তবাররুক : "ওলো লজ্জাবতী ও...লো হুর!
হাঁকে খান্নাস খবিস দল
হাঁকে জান্নাতবাসী গেলমানদল
করি— সুর—
ওলো লজ্জাবতী ও-লো হুর।

(দূরে বোমা পড়ে বুমবুম)

কাফেরের খুনি
কঠোর করাঙুলি ঘাতে ওড়ে
[ধীরে ধীরে পর্দা নামে]

[যবনিকা]

* *ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদেব ১৯৪৩ সনের বর্ষসমাপ্তি অধিবেশনে পঠিত*

সংঘাত

চরিত্র

কবি
তরুণ
ঠাকুর

[খ্যাতনামা অথচ ইদানীং বিলীয়মান কবি— কোনো এক ভোরে তাঁর নিজের ঘরে বসিয়া কী একটা লিখিতেছিলেন। টেবিলের ওপর একটি কাচের গ্লাসে জল। এমন সময়ে ঝড়ের বেগে এক অচেনা তরুণের প্রবেশ।]

কবি : কী চাই ? ওহ্! বুঝেছি, বাণী নিতে এসেছ বোধহয়। [কাগজ কলম হাতে নিয়া] কিন্তু দেখো ওসব দেবার মতো সময় আমার হাতে—

তরুণ : আজ্ঞে বাণী নয়। আপাতত এক গ্লাস পানি মানে জল হলেই চলবে। নিচে একটা লোক অনেকক্ষণ ধরে একটু জল জল বলে কাঁদছে কিনা!

[জলের গ্লাসসহ প্রস্থান]

কবি : [অপ্রস্তুতভাবে ফ্যালফ্যাল নেত্রে] বেশ তো ছন্দ তৈরি করলো ছেলেটা ! বাণী-পানি! [খাতা খুলিয়া লিখিয়া রাখেন]

তরুণ : [প্রবেশ] ধন্যবাদ, এই আপনার গ্লাস।

কবি : মানে ওটা তুমি ঐ রাস্তার গেঁয়ো ম্লেচ্ছটাকে ছুঁতে দিলে ? আমার গ্লাস ?

তরুণ : তাই কি পারি নাকি— ও রকম গ্লাস দিয়ে জল খেতে হলে ও হয়তো ওর হাত-পা-ই কেটে ফেলত— অভ্যাস নেই কিনা ?

কবি : আচ্ছা বসো। তা কী করা হয় ? ঐ সবই নাকি ?

তরুণ : আজ্ঞে ভদ্র সমাজ থেকে চ্যুত না হয়ে পড়ি সেই ভয়েই আজকাল জড়োসড়ো। করব আর কী ? তবে ভদ্রলোক বলে গণ্য হবার জন্যে যত রকম অভদ্র কাজ করা দরকার সেসব কিছুই আজকাল অল্প বিস্তর চেষ্টা কবছি।

কবি : আর কী কর ?

তরুণ : জ্যান্ত মানুষদের নাচিয়ে তুলি আর মরা মানুষদের পুড়িয়ে ফেলি।

কবি : কথার ছাঁদে বড় ছন্দ দেখা যাচ্ছে যে— সাহিত্য কর নাকি ?

তরুণ : বড় লজ্জা দিলেন— মাঝে মাঝে একটু আধটু কবিতা লিখি।

কবি : [লাফাইয়া] অ্যাঁ— কবিতা লেখ। তুমি ? বয়স কত ?

তরুণ : আমার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ— তবে কবিতা লিখছি জন্মের কিছু পর থেকে, এই বছর দশেক ধরে।

কবি : ওই ! নব্য কবি, তুমি নব্য কবি, নাঃ!

তরুণ : আহাহা দেখুন, দেখুন, আপনি বড় উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন, আপনার বয়সে ওটা খুব মঙ্গলজনক চিহ্ন নয়!

কবি : [মুখ বিকৃত করে] অ্যাওহ্! আজ পেয়েছি তোমাকে একজন। দেশের

সাহিত্যের কী করুণ অবস্থা আজ! কোথায় কবিতার বিষয়বস্তু হবে লীলাপদ্ম লোধ্ররেণু, তা নয়, তোমরা কিনা ছেঁড়া ঘা আর চুলোর ছাই নিয়ে আরম্ভ করলে কাব্যচর্চা!—

তরুণ : যার ভাগ্যে যা বুঝলেন না। আমাদের হয়েছে ভীষণ মুশকিল্। মুদ্রার অভাবে যত রকম মুদ্রাদোষ ছিল সব একটা একটা করে উঠে গেল। কিন্তু আপনারা হলেন গুণী, তাইতো সত্তোর বছর বয়সেও যে সব কবিতা আর প্রবন্ধ লিখছেন সে সব রীতিমতো উত্তেজক।

কবি : তুমি কি নিয়ে কবিতা লেখ ?

তরুণ : বছর আটেক আগে প্রাকৃতিক বিষয়ক খুব লিখতাম। তারপর কলেজ জীবনে করিডোরে যা দু'এক টুকরো জর্জেট রেণু নজরে পড়ত, তারই উপর চালিয়ে দিতাম মন্দাক্রান্তা ছন্দের রোলার। আজকাল অবশ্য মানুষ নিয়ে।

কবি : থামলে কেন ? আজকাল বুঝি ফ্যান আর ডাষ্টবিন নিয়ে খুব ফ্যাৎরামো চলছে ?

তরুণ : কী আর করি! চশমার কাচ এত পুরু হয়ে এল যে মনশ্চক্ষু নিয়ে লোধ্ররেণু নাড়াচাড়া করার সুযোগই আর পেলাম না। আপনারা হলেন ক্ষমতাবান পুরুষ, আপনাদের কথা আলাদা।

কবি : ওহ্! রুচির কী অধোগতি ! জানো কবি এমনি হাওয়া যায় না। খাস আর্যরক্ত বওয়া চাই নীল ধমনীর মধ্য দিয়ে, গৌরকান্তি, নধর দেহ,—

তরুণ : হাঁ হাঁ তা নইলে কী চলে ? আর আজকাল আমরা যেন সব মর্কটাকৃতি। কবিতা লিখতে গেলে চেহারাই তো আসল, না ?

কবি : আর দেখো এই অজিত সেন-কে। বছর কয়েক আগেও ছোকরা বেশ লিখত। আমি নিজে ওর ওপর প্রবন্ধ লিখেছি।

তরুণ : সে আপনার করুণা।

কবি : আর সে-ই কিনা সেদিন কবিতা লিখল 'ফ্যান' নিয়ে।

তরুণ : দেখুন তো কী অন্যায়। ফ্যান খেয়ে একটা মানুষ মরার হাত থেকে বাঁচতে পারে, তাই বলে কি তার ওপর একটা কবিতা লেখা চলে ?

কবি : তাও কী! গদ্য কবিতায়। বাহা রে গদ্য, তার আবার কবিতা ?

তরুণ : হ্যাঁ ঠিক যেন ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল, না ? আসলে হচ্ছে কী, অজিত সেনটা ভীষণ আলসে। আরে একটা মানুষ ফ্যান চেয়ে কাঁদছে, অমন কাতরানির সুরটাকে তুই যদি কষ্ট করে রতিবিলাস ছন্দে না বলতে পারলি তা হলে তুই কবি হবি কী করে— আপনারা তাকে কবি বলবেন কেন ?

কবি : জান, আমার মনে হয় ঐ অজিত সেন এতদিন পড়াশুনার জন্যে পারীর কোনো বুলোভের্দায় থাকত, ওর লেখায় একটা সুস্পষ্ট বর্দলেয়ারি সুর

বর্তমান থাকত। তারপরও বুঝি সব ধনী আধুনিক ছোকরার মতোই ঘুরতে গেল রুশিয়া দেশে— ব্যাস ওখান থেকে ঘুরে এসেই ছোকরার মাথাও একদম বিগ্‌ড়ে গেছে।

তরুণ : থামুন থামুন। অত বিরাট একটা থিওরি দিলেন যে, হজম করেনি। অজিত সেনের বাড়ি তো জিঞ্জিরা।

কবি : এ্যাঁ।

তরুণ : আর ওর অবসর সময়ের দৌড় ড্যামরা অবধি।

কবি : [চিৎকার] ড্যামরা। আর ওকে আমি বলেছিলাম কিনা কবি। পূর্ববঙ্গে ড্যামরা একটা গ্রাম—গণ্ড গ্রাম—আহা, সে যে অনার্য্য।

তরুণ : একটা সুসভ্য বর্বর। আপনাদের সভ্যতার অপভ্রংশ! নয় কি ?

কবি : কিন্তু তুমি কী করে তাকে চিনলে ?

তরুণ : লোকটা নিছক বলে! আচ্ছা আমি এখন আসি।

কবি : কোথায় ?

তরুণ : একটা মিলের মিটিং।

কবি : [নাক সিঁটকাইয়া] ওহ্! তুমি তো কবি এবং কর্মীও, চটি জুতোর আবার ফিতে। কিন্তু হ্যাঁ বাণী-টানির দরকার হলে চেয়ে নিও।

তরুণ : ধন্যবাদ। আগে ওদের বর্ণ-পরিচয় ঘটিয়ে দি, তারপর নেব।

[দরজার পথে পা বাড়ায়।]

কবি : এই—একটা কথা, তোমার নামটা বললে না ?

তরুণ : ধন্যবাদ, এত পরে তবু যাহোক নামটা জানতে চাইলেন। নাম অজিত সেন।

[প্রস্থান]

কবি : এ্যাঁ অজিত সেন! আপনি— আ— আ, আপনি। যাকগে, কবিতা আজ আমিও একটা লিখব— অজন্তার চিত্রকৌশল আঁকবো আজ ছন্দের মধ্য দিয়ে। চাই একটুখানি নীরবতা। ধ্যাৎ, বাইরে আবার ওটা কী চেঁচাচ্ছে! [জানালায় উঠিয়া দেখেন, দুই কানে হাত] কী চাইছে, ফ্যান, নাঃ মেজাজটা দিল খিঁচড়ে—। বয়, বয়, [চাকর আসে] চা লে আও।

ঠাকুর : হুজুর, কয়লা লাকড়ি কিছু নেই যে। বাজারে টাকা দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না।

কবি : নাও আমার এইসব রচনা [কয়েকটা বই হাতে নিয়া]— আমার কাব্য ইতিহাস। তাই জ্বালিয়ে চা কর। আমি আজ আমার শ্রেষ্ঠ কবিতা লিখব— কালিদাসকে ফিরিয়ে আনব।

ঠাকুর : হুজুর, চিনিও নেই।

কবি : চিনিও নেই— ওহ্! Get out you fool! [চাকর প্রস্থান করার পর কলম

হাতে নেন] তবু আমি লিখব,— আমার মেঘদূত [লিখতে যান এবং দেখেন কালি নাই] কালি নাই ? ওহ্! তুমিও নাই ? এখন আমি কী নিয়ে কবিতা লিখব, কী দিয়ে লিখব ! [জানালা বন্ধ করে] আহ্! চেঁচাস না থাম সব! নচ্ছার অজিত সেন, কিন্তু কী ছন্দে লিখব ? মন্দাক্রান্তা, অমিত্রাক্ষর ?

[যবনিকা]

গুণ্ডা

চরিত্র

আনোয়ারা বা আনু
আকাশ
গুণ্ডা
নানি
আলম

(বিছানার ওপর মশারি ওঠানো। মাথার কাছের টিপয়ের ওপর নীল শেড দেয়া একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আর বিছানার ওপর শুয়ে একটি মেয়ে। মাথার নিচে তিনটে বালিশকে যতখানি সম্ভব উঁচু করে তাতে মাথা হেলান দেয়া। বুকের ওপর দু'হাতে দাঁড় করানো একটা মোটা খোলা বই। আলো বইয়ে পড়ছে বেশি, মুখে অল্প। গায়ের ওপর বাদামি রঙের একটা পাতলা কাশ্মিরী শাল আলতো করে টেনে দেয়া। দীর্ঘ দেহের ভাঁজে ভাঁজে মসৃণ শালটা কেমন যেন জীবন্ত আগ্রহে নিবিড়ভাবে পেঁচিয়ে ধরেছে আনোয়ারা খানমকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ক্লাসের ছাত্রী আনোয়ারা খানম। মুখে সবসময় একটা জোনাক-জ্বলা হাসি। অকৃপণ কিন্তু সংযত। সেটা সকলকেই খুশি করে চলে কিন্তু কাউকে উৎসাহিত করতে চায় না। সুঠাম স্বাস্থ্যে এমন একটা স্থায়ী সুর জমেছে যে এখন সেটা সম্বন্ধে স্থান-পাত্র নির্বিশেষে নির্বিবাদে উদ্দেশ্যহীন ঔদাসিন্য প্রকাশ করে আনু আপা চলতে পারে। বিশেষ করে যখন গায়ের রং জীবন্ত-সাদা আর ধারালো চিবুকের সুগঠনে রয়েছে একটা ব্যক্তিত্বের ঝাঁঝ।

ঘরের আসবাবপত্র প্রয়োজনীয় এবং পরিচ্ছন্ন। রুচি বিকৃতির এতটুকু বাহুল্য নেই। ঘরের পেছন দিকে একটা গরাদহীন বড় জানালা। তার ওপরের অংশ খোলা। নীল পর্দা উড়ছে তাতে।

আনু আপা পড়ছে।

হঠাৎ একঝলক হাসি আর হুল্লোড় দুদ্দাড় শব্দে সিঁড়ি বেয়ে উঠে মুখ থুবড়ে এসে পড়ল আনু আপার ভেজানো দরজায়। হুড়মুড় করে দলা পাকিয়ে ঘরে এসে ছিটকে পড়লো তিনটি মেয়ে।

তার মধ্যে প্রচুর স্বাস্থ্যে ঠাঁসবুনোট, অত্যন্ত শক্ত লম্বা একটি মেয়ে হাসির গমকে গমকে ফেটে পড়ছে। বেসামাল হয়ে হাসতে হাসতে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে। আর অবরুদ্ধ হাসির বিস্ফোরণকে রুখবার ব্যর্থ প্রয়াসে নিজের হাঁটুই কামড়াচ্ছে লালাক্ত আবেগে।

হোস্টেলের সবাই মেয়েটিকে ডাকে গুণ্ডা বলে। চশমা পরা বেঁটে মতন মেয়েটি কোমরে হাত দিয়ে ভ্রু কুঁচকে গুণ্ডাকে লক্ষ করছে।

হোস্টেলে ডাক নাম এর নানি।

আর মাঝারি গড়নের কোঁকড়া চুলো হাল্কা মেয়েটি ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধের ব্লাউজের নিচের একটা অংশ টিপতে টিপতে ঘুমন্ত চোখ দুটোকে ব্যথিত করে, আনু আপার মাথার কাছে গিয়ে ছুটে দাঁড়াল। একে সবাই নাম দিয়েছে আকাশ।

আনু আপা বই রেখে দিল। বুকের ওপর চৌকো করে দু'হাত জড়িয়ে

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রথমে নানি, তারপর গুগ্তা, তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলল।)

আকাশ : ঐ গুগ্তা, গুগ্তা কামড়ে দিয়েছে।

নানি : (গুগ্তাকে) আর কতক্ষণ ও-রকম অসভ্যতা চলবে ? আরো খানিকক্ষণ চিবুলে শাড়ি কেন তোর হাঁটু শুদ্ধো ছিলে যাবে।

(হাসি থামিয়ে গুগ্তা নানিকে দেখে)

আকাশ : ঠাট্টা নয় আনু আপা, এই দেখ না, কামড় দিয়ে একেবারে গোস্ত উঠিয়ে ফেলেছে। গুগ্তা!

আনু : ইস্ তাইতো, কতখানি জায়গা কী লাল হয়ে গেছে। হ্যাঁরে গুগ্তা তোর স্বভাবটা, ঐ বদ স্বভাবটা বদলাতে পারিস না ? সভ্যসমাজে তোকে যখন চলতেই হবে তখন ওটাকে বদলে ফেলাই ভালো, কী বলিস ? কবে কাকে কামড়ে বসে কী বিপদ ঘটাস কে জানে!

গুগ্তা : না আপা ও আমি বদলাতে পারব না। যার না সয় সে দূরে থাকুক। যখন তখন ফিক করে ঠোঁটের কোণে দাঁত-চাপা মেয়েলি হাসি, কী কৃত্রিম আব ন্যাকা— এসব আমার হয় না। হাসি আমার পায় না। যখন সাবা শবীরে হাসি ফুলে ওঠে, দাঁতের গোড়া অবধি সুড়সুড় করে ওঠে— তখন কিছু না কামড়ালে আমার হাত পা ঝিমঝিম করে।

নানি : তাই বলে তুই যাকে পাবি, তাকেই কামড়াবি ?

আকাশ : যা মুখে ঠেকে তাই ?

গুগ্তা : তাইই—সজ্ঞানে তো আর কামড়াই না! লজ্জা কীসের, ভয়ই-বা কীসেব ?

আনু : এমনকি রাত কি দিন তারও কোনো বাছ-বিচার না করে। তা না হয় বুঝলাম কিন্তু রাতদুপুরে সে বিস্ফোরণটা হঠাৎ আমার ঘর লক্ষ্য করেই উৎক্ষিপ্ত হলো কেন ?

(গুগ্তা একঝলক হাসে)

আকাশ : মাগো! আনু আপা ঐ দেখ গুগ্তা আবার হাসতে শুরু করল বলে।

গুগ্তা : (মুখে কাপড় গুঁজে) না এই বন্ধ করলাম।

নানি : হাসতে হয় হাসো, কিন্তু ঐখানে বসে। আজ থেকে তোমার হাসতে ইচ্ছে হলে মাঠে গিয়ে হাসবে, লোকালয় থেকে দূরে— কারো গায়ে ঘেঁসে বসে তুমি কক্ষণো হাসতে পারবে না।

আনু : কিন্তু রাতদুপুরে তোমার আজ এত হাসি উথলে উথলে উঠছে কেন ? কোনো কারণ আছে না এমনি কাউকে কামড়াবে বলে ?

(গুগ্তা আচমকা আনু আপার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কী বলে)

আকাশ : মিথ্যে কথা, বিশ্বেস করো না, আনু আপা, সব মিথ্যে কথা।

নানি : না, সব সত্যি কথা, অক্ষরে অক্ষরে।

আকাশ : আমি ও-সব কথা একটাও বলিনি।

আনু : কী বলেছিলে সেটা এখন বলে ফেললেই হয়।

আকাশ : আমি শুধু বলেছিলাম—

গুগুা : হাঁ হাঁ বলো বলো।

আকাশ : বলেছিলাম আজ ক্লাসে আলম ভাই—

নানি : আলম ভাই নয়; তুমি বলেছিলে আলম সাহেব।

আকাশ : হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বলেছিলাম, কিন্তু ওকী আনু আপা তুমি এমন করে আমার দিকে চাইছ কেন ? আমি— আমি খারাপ কিছুই বলিনি, জিজ্ঞেস কর ওদের ? আমি খারাপ কিচ্ছু বলিনি, আনু আপা।

আনু : সে-কথা কেউ বলেনি। যা বলছিলে বলতে থাক।

(হাসি থেকে অন্ধকার তখন নেমেছে— আনু আপার চোখে। মুখে একটা ঠাণ্ডা পাথুরে নিশ্চলতা। এক দৃষ্টিতে নিজের পায়ের দিকে চোখ মেলে। গুগুা অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে আনু আপার মুখের পরিবর্তনের রেখাগুলো। নানি নিরীক্ষণ করছে উভয়কে— অবাক হয়ে)

আকাশ : আমি শুধু বলেছিলাম বিস্কিট রঙের সুটের বুকে ঘন নীল সার্টের ওপর লাল টাই চমৎকার মানিয়েছিল!

গুগুা : সত্যি ? আলম ভাই নিজ কানে শুনলে তোকে নিশ্চয়ই—

আকাশ : যা তা ঠাট্টা করো না। আনু আপা তুমিই বল দোষ করেছি কিছু ? তুমি আজ আলম সাহেবকে দেখনি, দেখলে তুমিও—

নানি : বোকার মতো কথা বলিস না আকাশ। আলম সাহেবকে আনু আপা আজও দেখেছে। এবং তোর চেয়ে ভাল করেই। তোর সঙ্গে নয় আলম সাহেব পড়ে আনু আপার সঙ্গে, একই ক্লাশে বুঝলি ?

আকাশ : ও ? তাই তাইতো !

নানি : কামড়ে কামড়ে আনু আপার চাদর ছিঁড়ে ফেলবি নাকি, গুগুা ?

গুগুা : আর কিছু বলনি ? (কোনো রকমে হাসি চেপে)

আকাশ : আর আর শুধু বলেছিলাম হঠাৎ দেখতে একেবারে ঠিক তোমার মতোই—

গুগুা : আর ঠিক যেমন করে যখন তখন চুমু দিয়ে তুমি আমায় আদর করো; ঠিক তেমনি করে—

আকাশ : মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা আমি ওসব কক্ষণো বলিনি। ও-সব ওর বানানো আনু আপা—

আনু : আহ্ চিৎকার কর না আকাশ। গুগুা হাসি থামা, হাসি বন্ধ কর।

(এক ঝাঁকুনি দিয়ে থামিয়ে দেয় গুগুাকে। আকাশ ধমক খেয়ে থতমত খেয়ে যায়)

গুণ্ডা : এখনই কী— মজার কথাটাই তো এখনো শুনলে না। বলে দেব আকাশ ?

আকাশ : আবার কী বলেছি ?

গুণ্ডা : আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেছ— তাহলে কী হবে গুণ্ডা আলম সাহেবকে ভোট আমি দিতে পারব না।

নানি : সত্যি ?

গুণ্ডা : আমিও খুব গম্ভীর হয়ে বললাম— বেশ তো মনে না ধরে, না দিবি। আমার বড় ভাই বলেই যে তাকে ভোট দিতে হবে তার তো কোনো অর্থ নেই।

আনু : এতে এমন হাসির কী হলো ?

নানি : (আগ্রহ) আকাশ কী বলল তারপর ?

গুণ্ডা : তারপর দু'চোখ পুকুর করে, তা থেকে চোখের পলক দিয়ে আঁজলা আঁজলা পানি ছিটিয়ে বলল : আমার তো দেবার ইচ্ছে ছিলই, কিন্তু , কিন্তু আনু আপা নিষেধ করেছে যে! আনু আপা নিষেধ কবেছে আলম ভাইকে-

(বলতে বলতে বুনোহাসির দমকা ঘূর্ণিতে কেঁপে উঠলো গুণ্ডা। এবার নানিও সংক্রামিত হয়ে ওঠে সে হাসিতে। আকাশ কুঁকড়ে আনু আপার গলা জড়িয়ে ধরে। আনু আপা গম্ভীর। গুণ্ডা একটু নিস্তরঙ্গ হযে এলে পর—)

আনু : তোমার মহৎ বড়ভাইকে ভোট দিতে নিষেধ করার মধ্যে এমন কী হাসির কারণ খুঁজে পেলে ?

নানি : তাহলে সত্যি তুমি নিষেধ করেছ আনু আপা ?

আনু : সত্যি নয়তো মিথ্যে নাকি ?

গুণ্ডা : (হঠাৎ শঙ্কিত) অর্থাৎ ?

আনু : বুঝতে কষ্ট হচ্ছে ? তোমার দেবপ্রতিম, গুণধর, সুপুরুষ বড়ভাইকে মেয়েদের হোস্টেলে কেউ ভোট দিতে অস্বীকার করবে— একথা বিশ্বেস করতে মন চাইছে না, না ?

নানি : অন্যের কথা থাক। শুধু নিজের কথা বলো!

গুণ্ডা : কিন্তু আনুআপা তুমি ভোট না দিলে হোস্টেলের আর কেউ যে ভোট দেবে না।

আনু : কাল ভোরে সকলকে সে অনুরোধই করব।

নানি : আলম সাহেব হেরে যাবে যে !

আনু : আমাদের তাহলে আত্মহত্যা করতে হবে না ?

নানি : অন্তত তোমার মনের ভাব তো পরশুও তেমনি ছিল।

আনু : মুখ সামলে কথা বল নানি।

গুণ্ডা : সামলাবে আবার কী ! আমাদের কচি খুকি পেয়েছ নাকি ? 'Romeo juliet' এর যেদিন ক্লাস থাকে সেদিন তুমি কেন বারবার ঐ নীল শাড়িটাই পড়ে যাও। সে-সব খবরও আমরা রাখি।

আকাশ : আনুআপ, এসব কী করছো ? তোমরা অমন করে ঝগড়া করছো কেন ? আমার দিকে অমন করে তুমি তাকিও না আনু আপা!

আনু : থাম আকাশ! (গুণ্ডাকে) তোমার বড়ভাই আর কার কার কোন রঙের শাড়ি পরা সম্বন্ধে কী কী অশ্লীল মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তাও বলে ফেলো- সবাই আলো দেখুক!

গুণ্ডা : যা মুখে আসে তাই বলো না আনু আপা।

আনু : এত ভক্তি! তাও চরিত্র সম্বন্ধে এখনও কিছু বলিনি।

নানি : না বললেও চলবে। দু'দিনের মধ্যে যার মনের রং দু'বার করে বদলায় অন্যের চরিত্র সম্বন্ধে তার মতামত না শুনলেও আমাদের চলবে।

(আনোয়ারা খানম রাগে দাঁড়িয়ে পড়ে)

আকাশ : আনু আপা— আনু আপা—

আনু : তুমি কী বলতে চাও?

নানি : আরো সোজা করে বলব ? তোমার মনের— তোমার একান্ত নিজস্ব মনের একটা উত্তেজক মুহূর্তের খামখেয়ালি আমরা সকলে মেনে নাও নিতে পারি।

আনু : আমার নিষেধ সত্ত্বেও কাল তোমরা সকলে আলম সাহেবকে ভোট দিচ্ছ।

নানি : আর আমার বিশ্বেস অমন করে নিষেধ করতে যেয়ে সকলের কাছে তুমি নিজেকে হাস্যকর করে তুলবে না।

আনু : তোমার কাছ থেকে উপদেশ শোনার জন্য রাত জেগে থাকি না নানি!

নানি : ওহ্ বেরিয়ে যেতে বলছ! তোমার ঘুম নষ্ট হচ্ছে, তাইতো, তা যাই— (দরজা অবধি যেয়ে আবার ফিরে আসে) ওহ্, একটা কথা. এই আকাশ, আকাশ—

আকাশ : আমি ?

নানি : হ্যাঁ, উহ্ আয়। শুতে যাবি না ?

আকাশ : ওহ্ হ্যাঁ! হ্যাঁ!

(উঠে নানির পাশে দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়ায়)

নানি : আমার হাত ধর্, শক্ত করে।

আকাশ : ধরেছি।

নানি : পেছনের দিকে আর দেখিস না— একবারও না

আকাশ : না তাকাব না।

নানি : বল্ আনু আপা যা বলেছে সব মিথ্যে।

আকাশ : সব মিথ্যে।

নানি : মিথ্যে।

আকাশ : মিথ্যে।

নানি : পেছনের দিকে তাকাসনে। বল্‌ কাল তুই কাকে ভোট দিবি ?

আকাশ : আলম ভাইকে।

নানি : বল্‌— যে লোকটার বিস্কিট রঙের সুটের পাশে আকাশ রঙের সার্টের ওপর—

(বলতে বলতে ওরা দু'জন বেরিয়ে যায়। আনোয়ারা আর গুণ্ডা স্থির চোখে দেখে। তারপর গুণ্ডা মাথা ঘুরিয়ে চোখ টেনে মেলে ধরে, আনোয়ারার মুখের ওপর। আনোয়ারা কঠিনমুখে, ঠাণ্ডা ঠোঁট দুটো দাঁত দিয়ে শক্ত করে চেপে চোখে চোখে চায়। সে চোখে আলো নয় আগুন ঠিকরে পড়ছে।)

(গুণ্ডা আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তারপর আরো সোজা হয়ে, ভারী পা ফেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়)

(আনোয়ারা উঠে দরজাটা টেনে দেয়। একবার পালঙ্ক অবধি আসে, আবার দরজা অবধি যায়। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানালার কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়)

(রঙ্গমঞ্চ ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে আর আনোয়ারা খানমের সাজানো দেহ ঘুমে এলিয়ে পড়ে বিছানার ওপর)

[প্রায় এক মিনিট রঙ্গমঞ্চ থাকবে নিস্তব্ধ, নিশ্ছিদ্র, অন্ধকার। এক মিনিট কয়েক ঘণ্টার প্রতীক। আনোয়ারা খানম ঘুমুচ্ছে। ঢনঢন করে রাত্রি দুটোর ঘণ্টা পড়লো। একটু পরেই রঙ্গমঞ্চে একটা শব্দ হলো— খুট্‌। কে একটা লোক যেন ঘরে ঢুকতেই, সিগ্রেট কেস খোলার শব্দ। তারপরেই ফস্‌ করে একটা শব্দের সাথে রঙ্গমঞ্চের মধ্যিখানে এক আলো জ্বলে উঠলো। সে আলোতে দেখা গেল আনোয়ারা খানমের পালঙ্কের পাশে একটা লোক। ঠোঁটে সিগ্রেট, মুখের নিচে একটা লাল টাই। বিস্কিট রঙের সুটের নিচে আকাশ রঙের সার্ট। মাথার হ্যাট্‌ পেছনের দিকে ঠেলে দেয়া, হাতের লাইটার দিয়ে সিগ্রেট ধরাতে যেয়েই লোকটা থমকে গেল— সিগ্রেট ফেলে দিয়ে নিচু হয়ে দেখতে লাগল আনোয়ারা খানমের ঘুমন্ত মুখ।

সমস্ত রঙ্গমঞ্চের মধ্যিখানে ছোট্ট একটি আলোক শিখার শীর্ষবিন্দু। লোকটার ঝুঁকে পড়া নাক আর আনোয়ারা খানমের ঠোঁটের প্রান্তদেশ মাত্র দু'বর্গ ইঞ্চি পরিধির মধ্যে।

ঘন সন্নিবেশিত, স্থির। হঠাৎ লোকটার ঠোঁট বুদবুদের মতো ফুলে উঠতেই টুপ করে এক ফোঁটা চুমু পড়ল আনোয়ারা খানমের ঘুমন্ত ত্বকে।

সাথে সাথে লোকটাও চোখ বন্ধ করে ফেলল— কিন্তু আশ্চর্য তেমন ভয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। চোখ খুলে লোকটা একটু বোকা হলো—বিরক্ত হলো। ঘুরে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। শেডটা ঘুরিয়ে আলো ফেলল ঠিক আনোয়ারার মুখে।

লাইটার দিয়ে টেবিল ঠুকল কিন্তু আনোয়ারা খানম ঘুমুচ্ছে। বেপরোয়া হয়ে লোকটা তখন টেবিলের ওপর থেকে একটুকরো কাগজ দিয়ে ছোট ছোট গুলি পাকিয়ে ছুড়ে মারতে লাগল, প্রথমে আস্তে পরে জোরে।

(একটা জোরে নাকে লাগতেই—)

আনু : কে ? কে ? গুণ্ডা ?

আলম : (অবাক) গুণ্ডা ?!

আনু : ওহ্— না না আপনি আপনি ? (লাফিয়ে ওঠে) আলম সাহেব ? (চোখ কচলে) আপনি এখানে কি চান এতো রাতে ? আপনি—

আলম : থাক্ চিনতে পেরেছেন তবু! কী সব চোর ডাকাত বলছিলেন প্রথম প্রথম— ভয়ই পেয়ে গেছলাম।

আনু : আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা ?

আলম : বেরিয়ে— কোথা দিয়ে ?

আনু : যেখান দিয়ে আপনার মতো অসভ্য বর্বর অসচ্চরিত্র লোকরা—

আলম : ঐ তো ঐ তো আপনি আবার আরম্ভ করলেন।

আনু : এ ঘর থেকে আপনি বেরিয়ে যাবেন কিনা ? নিজের চেহারা আর সামান্য একটু গুণের দৌলতে কতদূর দুঃসাহসিক হওয়া যায়, তা বোধহয় আন্দাজ করে উঠতে পারেননি— না ?

আলম : Thank you! বরাবরই জানতাম যে আপনি আমার গুণ আর রূপ উভয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞাত। লুকিয়ে আর লাভ কী আপনার সম্বন্ধে আমার মনের অবস্থাও—

আনু : আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন কিনা বলেন ?

আলম : বারবার ঐ এক কথা। বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান— আমি— আপনাকে খেয়ে ফেলছি নাকি ? বেরিয়ে যান বললেই হবে না, বেরিয়ে যাবো কোথা দিয়ে ?

আনু : বেশ লোক তো আপনি, এ ঘর যেন আপনার। ফক্কড়ি ছেড়ে, সোজা যে পথে এসেছিলেন সে পথে বেরিয়ে যান—ঐ জানালা দিয়ে পাইপ বেয়ে।

আলম : জানালা দিয়ে ? (উঠে এসে জানালা দিয়ে নিচের দিকে দেখে) ওউহ্— এত উঁচু থেকে— বাবা! ও আমার দ্বারা হবে না। নামবার আগেই নার্ভাস হয়ে মারা যাব।

আনু : আসবার সময় মারা যাননি ? তখন এলেন কী করে ?

আলম : তখন কাজের কথা মনে করে এসেছি। কাজটাই ছিল মনের সামনে বড় হয়ে— পথ লক্ষ করার অবসরই ছিল না।

আনু : কী এমন কাজ ছিল আপনার সেটা যেটা আপনাকে বাঁদরের মতো রাত দুপুরে এতটা পথ শূন্যে লাফিয়ে নিয়ে এল। কী কাজ ?

আলম : বলছি— তবে আপনি ও সব অল্প-চল তুলনা ভবিষ্যতে আর ব্যবহার করবেন না। মেয়েদের মুখে ওটা ভাল শোনায় না।

আনু : আপনি আপনার কাজের কথা বলে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যান।

আলম : আচ্ছা তাই যাব। যাওয়ার সময় কিছু তুলো আর আইডিন দিয়ে দেবেন সঙ্গে।

আনু : কেন পড়ে গেলে হাত পা ব্যান্ডেজ করবেন ?

আলম : না নিজের জন্য চাইনি। গেটের দারওয়ানটার জন্য চাইছি।

আনু : অর্থ ? (ভয়)

আলম : ঢুকবার সময় সাইকেলের বেলটা খুলে পেছন থেকে ব্যাটার খুলিতে মেরেছিলাম। এতক্ষণে মরে গেছে কিনা কে জানে ?

আনু : মরে গেছে ?

আলম : কে জানে ? হয়তো।

আনু : অত জোরে মারতে গেলেন কেন ? (সহানুভূতি)

আলম : ঐতো আবার বোকার মতো প্রশ্ন করছেন— তখন কি আর পরিণতির কথা খেয়াল ছিল ? (পকেটে হাত ঢুকিয়ে লম্বা এক সিট ছাপান কাগজ বার করে) ধরুন, কাগজটা ধরুন, আমি চটপট আমার কাজের কথা সেরে খসে পড়ি।

আনু : (দরদ) কিন্তু যাবেন কোথা দিয়ে— ঐ গেটের মরা লোকটার লাশ দেখে ভয় করবে না ?

আলম : আমার যাবার পথের কথা আপনার না ভাবলেও চলবে। কাজের কথা শুনুন। ঐ হলো আমাদের পার্টির ম্যানিফেস্টো—ওতে আমাদের নাম গুণ— সব লেখা আছে। দয়া করে ভোট দেবেন। ব্যাস আর কিছু বলবার নেই। আমার ব্যান্ডেজগুলো দিয়ে দিন চলে যাই।

আনু : ক্যানভাস করার কি উপযুক্ত সময়-আপনার রুচি আছে বলতে হয়!

আলম : সত্যি বলছি কাজের ভিড়েই এ কয়দিন তোমাকে একবারও বলতে সময় পাইনি। ভাবলাম কাল ভোরেই তো ভোট আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে অথচ আমি নিজে একবারও তোমায়—

আনু : আর আমিনা, জুলেখা, রাশেদা, ওদের নিজে বাসায় যেয়ে খবর দেবার সময়ের অভাব হয়নি না ?

আলম : ওহ সেই কথা!

আনু : হ্যাঁ! সেই কথা ! কতক্ষণ ছিলেন আমেনাদের বাসায় ?

আলম : তা ওদের বাসায় একটু দেরি হয়ে গেল— প্রায় ঘণ্টা দুয়েক ছিলাম হয়তো।

আনু : অতক্ষণ ধরে শুধু ক্যানভাস করছিলেন ?

আলম : ছিঃ ছিঃ কী আশ্চর্য ওর বাবার সঙ্গে কথায় কথায় আটকে পড়লাম যে!

আনু : জুলেখাদের বাড়িতে ক্যানভাস করতে যেয়ে চা খেলেন কেন ?

আলম : মহাবিপদ, ছোটবোনের বন্ধু, চা খেতে দেয়— আমি তো আর সেটা দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসতে পারি না!

আনু : আর কাল বিকেলে লাইব্রেরির বারান্দা দিয়ে আসবার সময় আমার সম্বন্ধে বন্ধুদের কাছে কী বলছিলেন ?

আলম : ওহ তুমি তখনও ভেতরে বসে পড়ছিলে ?— সত্যি আমার মনেও হয়নি যে—

আনু : সে কথা থাক্। আমার সম্বন্ধে কী বলছিলেন সেটা মনে করতে চেষ্টা করুন।

আলম : পাগল নাকি সে-সব কথা এখনও মনে করে বসে আছি নাকি ?

আনু : বলছিলেন আমার মুখ শালগমের মতো— ঠোঁট কাতলা মাছের মতো— মন গোখরা সাপের—

আলম : (দু'ধমক হেসে) আরে ওসব কথা এখনো মনে করে বসে আছ নাকি ?

আনু : স্মরণশক্তি আমার যখন তখন দুর্বল হয় না বলে মনে থেকে যায় ওসব কথা।

আলম : (কোনো রকমে হাসি গিলে) আর ওসব কথা তুমি বিশ্বেস করলে ?

আনু : তোমার কথা অবিশ্বাস করার অভ্যেস আমার নেই।

আলম : ছিঃ ছিঃ! ওসব কি আর তোমাকে বলেছিলাম নাকি ? ওসব বলেছিলাম কতগুলো অন্য ছাত্রকে, যারা তোমাকে হয়তো কোনো কারণে সহ্য করতে পারে না, যারা তোমার নিন্দা শুনলে খুশি, যারা তোমার নিন্দা আমার মুখে শুনলে আরো খুশি হয়, যারা খুশি হলে আমি ভোট আরো বেশি পাই।

(বলতে বলতে লোকটা হাসির আবেগে ঝুঁকে পড়ল)

আনু : সত্যি। সত্যি তাহলে তুমি তাহলে ওসব কথার একটুও মন থেকে বলনি! সত্যি ?

আলম : সত্যি নয়তো মিথ্যে নাকি ?

(বলতে বলতে আমোদে আলম দুলে উঠল হাসির বিক্ষুব্ধ আলোড়নে। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে আর হতভম্ব আনোয়ারা খানমের হাঁটুতে এক কামড়। আনোয়ারার চিৎকার তখন দ্বিগুণ হয়ে উঠলো যখন দেখলো আলম সাহেবের মাথার হ্যাট খুলে পড়ে গেছে আর যেখান থেকে একরাশ ঘন কালো চুল সমুদ্রে ঢেউয়ের মতো তাদের গুণ্ডার পিঠে লুটোপুটি খাচ্ছে। দলির পালঙ্কের নিচ থেকে হাসির আর এক তাল পিণ্ডি গড়াতে গড়াতে বেরিয়ে এলো আকাশ আর নানি হয়ে। নানি কোনো রকমে মুখে শাড়ি গুঁজে দিয়ে টলে দাঁড়িয়ে সোজা হয়ে একটা চিঠি দিলো আনোয়ারা খানমের হাতে আর—)

নানি : সুটটা অবশ্য গুণ্ডার গুণ্ডামি। বাকিটুকু বিশ্বেস না হয় পড়ে দেখ। আলম সাহেবের চিঠি। বিকেলে এসেছিল। আমরা পড়ে দেখেছি। অত্যন্ত শর্মিন্দা সেজন্যে।

[আনোয়ারা খানম আচমকা চিঠিটা ছিনিয়ে নিয়ে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল, বালিশে মুখ গুঁজে]

[যবনিকা]

বেশরিয়তি

চরিত্র

জাফর
লায়লা
আব্বা
চাকর
নয় ও এগার বছরের দুই ছেলে

[দৃশ্য : রঙ্গ-মঞ্চের একেবারে সম্মুখ ভাগে একটা বড় টেবিল। টেবিলের ঠিক মাঝখান দিয়ে একটা কালো পর্দা অত্যন্ত হেকমতের সঙ্গে ঝোলান, যাতে টেবিলের দু'পাশ দিয়ে দুটো লোক যথেষ্ট বদমতলব নিয়ে ঘোরা-ফেরা করলেও পরস্পরকে দেখতে পাবে না অথচ দর্শকরা সব সময়েই দুজনকে দেখতে পাবে।

পর্দার দু'পাশে বসে দু'টি মানুষ; একজন পুরুষ অন্যজন মেয়ে। মেয়েটির বয়স আঠারো। স্বচ্ছ সবুজ ওড়না পিঠের পুরু বেণিকে ঘিরে বুকের উপর আলগোছে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে। ফিকে সবুজ সাটিনের সেলওয়ার থেকে আরম্ভ করে গায়ের বুটিদার সাদা মুগা পাঞ্জাবিটার ভাঁজে ভাঁজে একটা জোর করে আয়ত্ত করা পরিপাট্যের চিহ্ন সুপরিস্ফুট। একটু মনোযোগ দিয়ে দেখলেই বোঝা যায় এ মেয়ে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সাজানো-গুছানো ঐ শান্তিময় আবহাওয়াটাকে যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙেচুরে একাকার করে দিতে পারে। চোখ জোর করে পর্দার ওপর মেলে রাখা, হাত দুটো জোর করে টেবিলের ওপর শান্ত করা। যে-কোনো মুহূর্তে সবকিছু আলুথালু, বিস্রস্ত ও বিবসনা হয়ে যেতে পারে।

পর্দার এ পাশের তরুণ মেয়েটির শিক্ষক, তরুণোত্তোর যুগের স্পন্দনহীন গাম্ভীর্য দিয়ে নিবিষ্ট মনে পেন্সিল দিয়ে একটা খাতা দেখছেন। ফর্সা লম্বা মুখে কালো এক পলতা চাপ দাড়ি, মাথায় কোঁকড়ানো সাদা পশমের টুপি। গায়ে কালো আচকান। সুগঠিত শরীর। মুখে পুরুষজনোচিত সৌন্দর্য। তবে এখন মুখে চোখে এমন এক ধরনের সংযত স্থৈর্য ফুটে আছে যা দেখলে পরমুহূর্তে এ লোকটা কী করবে না করবে তা আগে থেকে আঁচ করা অসম্ভব। প্রথম শব্দ করলো মেয়েটি—]

মেয়েটি : আচ্ছা মাস্টার সাহেব একটা কথা জিজ্ঞেস করব আপনাকে?

মাস্টার : কী?

মেয়েটি : আপনি টুপি পরেন কেন?

মাস্টার : তুমি দেখলে কী করে?

মেয়েটি : বা! ও মেয়েরা আড়াল থেকে সব দেখতে পায়!

মাস্টার : তাহলেও তোমার দেখা উচিত হয়নি।

মেয়েটি : আপনি বড় আজগুবি কথা বল্লেন মাস্টার সাহেব, আমি কি ইচ্ছে করে দেখেছিলাম নাকি?

মাস্টার : দেখ লায়লা, তোমার কথাবার্তার ঢংটা, তোমার আমার সম্মানজনক ব্যবধানকে সব সময় স্বীকার করতে চায় না।

লায়লা : কী করব তাহলে ?

মাস্টার : ভঙ্গিটা বদলাতে চেষ্টা কর।

লায়লা : পারব না।

মাস্টার : (চটে গিয়ে) না পারলে ও-রকম যখন তখন কানের কাছে 'মাস্টার সাহেব' চিৎকার করো না, 'জাফর ভাই' বলে ডেকো আমাকে।

লায়লা : এখন থেকে তাই ডাকব যতক্ষণ অবধি আব্বা না শুনছেন।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। জাফর খাতা দেখে। লায়লা ওড়না মুখে দিয়ে একটা হাসির শব্দকে চেপে ধরতে চায়।)

জাফর : হাসলে কেন ?

লায়লা : দেখলেন কী করে ?

জাফর : দেখিনি, শুনেছি। হাসলে কেন ?

লায়লা : আপনি প্রথম যেদিন আমাদের বাড়ি এসেছিলেন সেদিনের কথা হঠাৎ মনে পড়ছিল, তাই।

জাফর : সেদিন কী হয়েছিল ?

লায়লা : হবে আবার কী ? পাকের ঘরে বসে শুনলাম আমার নতুন মাস্টার আব্বার সঙ্গে গল্প করছে। সে নাকি অদ্ভুত সুন্দর, বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হয়ে এবার নাকি ইকনমিক্সে এম.এ পাশ করেছে।

জাফর : বিশ্বেস না হলে গেজেট খুলে সেটা পরখ করে নিতে পারবে, কিন্তু এতে হাসবার কী আছে ?

(জাফর উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছে)

লায়লা : দৌড়ে ছুটে এলাম বাইরের ঘরের দরজায় পর্দার ফাঁক দিয়ে আপনাকে দেখব বলে—।

জাফর : গরাদের ফাঁক দিয়ে যেমন করে চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দি বাঘ দেখ, তেমনি করে, না ? কিন্তু হাসলে কেন ?

লায়লা : আপনি চটে গেছেন জাফর ভাই ?

জাফর : (চিৎকার করে) না!

লায়লা : তবে অমন করে পর্দা ধরে ঝাঁকানি দিলেন কেন, যদি ছিঁড়ে যেত ?

জাফর : ও তোমার মনের ভুল, পর্দায় আমি হাত দেইনি।

লায়লা : হবে হয়তো। আমি কিন্তু প্রথম দিনই আপনাকে দেখে ঘাবড়ে গেছলাম, সত্যি আপনি টুপি পরেন কেন ?

জাফর : পরি মুসলমান বলে। আর তুমি ঘাবড়ে গেছলে কারণ এর আগে কোনো বলিষ্ঠ তরুণ মুসলমান জ্ঞানী ছেলে তোমার সামনে টুপি মাথায় দিয়ে চলেনি বলে! বিকৃত সমাজের আওতায় গড়া তোমার মন মিথ্যেকে ভালবেসে এত অভ্যস্ত যে সবসময় সত্যকে সইতে পারবে না— তাই।

লায়লা : আমার কিন্তু অন্য রকম বলে মনে হচ্ছিল! আপনি টুপি পরেছিলেন আব্বাকে কাবু করবার জন্যে!

(উঠে ওড়না ওড়াতে থাকে)

জাফর : লায়লা!

লায়লা : আমাকে ডাকছেন ?

জাফর : তবে কি ঐ ঝুলন্ত পর্দাটাকে ডাকছিলাম নাকি ? তুমি কী বলতে চাও লায়লা ?

লায়লা : বাঃ সে তো একটু আগে বললাম-ই।

জাফর : নিজকে খুব সুন্দরী লোভনীয় স্ত্রী বলে ভাব, না ?

লায়লা : আমি ভাবতে যাব কেন, লোকে বলে! আগে যিনি পড়াতেন, তিনিও বলেছেন।

জাফর : কী বলেছেন ?

লায়লা : আমি সুন্দরী।

জাফর : কার কাছে বলেছিলেন ?

লায়লা : বেচারা ভদ্রলোক এমনি বোকা ছিলেন যে আমাকে না বলে একদিন গল্পে গল্পে বেফাঁস হয়ে আব্বার কাছেই বলে ফেলেছিলেন।

জাফর : আমি অতটা বোকা নই লায়লা।

লায়লা : তা হলে আমাকে দেখতে হয় এক ফাঁকে লুকিয়ে দেখে নেবেন। আব্বার কাছে না বললেই আর ভয় নেই— চাকরি যাবে না।

জাফর : তোমাকে দেখতে হলে ফাঁকি দিয়ে চুপ করে এক নজর দেখে লুকিয়ে পড়ার মতো ভীতু তোমার জাফর ভাই নয়। দু'হাত দিয়ে তোমার মুখ উঁচু করে দু'চোখ মেলে দেখবার সাহস তার আছে লায়লা—!

লায়লা : তাহলে দেখে নিলেও তো হয়। খাম্‌কা পর্দাটাকে ও-রকম অন্ধের মতো হাতড়ে বেড়াচ্ছেন কেন ? (হঠাৎ গলার সুর বদলে) মাস্টার সাহেব—

জাফর : কী বললে ?

লায়লা : বাকি অংকগুলো করে রাখব। আপনার চা এসে গেছে।

জাফর : ওহ্—!

(পর্দার যে অংশে লায়লা সেদিককার অন্দর-দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল চাকর। হাতে ট্রেতে পরোটা-কাবাব ও চা। চাকর পর্দার যে প্রান্ত রঙ্গমঞ্চের একেবারে পেছন অবধি গেছে সেখানে গুঁজো হয়ে টুপ করে অত্যন্ত সুকৌশলে পর্দা উল্টে ওপাশে গিয়ে ভুস করে উঠল। জাফর সপ্রশংস দৃষ্টিতে এ প্রক্রিয়া নিরীক্ষণ করল।

জাফর : (চায়ে মুখ দিয়ে) সাহেব কোথায় রে তোদের ?

চাকর : ফজরের নামাজ পড়ে ভোর রাতে শুয়োর শিকারে বেরিয়ে গেছেন, এই এখুনি ফিরবেন হয়তো!

জাফর : ওহ্! তোমার আব্বা বুঝি খুব ভালো বন্দুক ছুড়তে পারেন লায়লা ?

লায়লা : হ্যাঁ বন্দুক আর পর্দাতে তার একমাত্র নেশা।

(কিছুক্ষণ চুপচাপ। চা পান খতম হলে পর চাকর পূর্বোক্ত পন্থায় এদিকে অপসৃয়মান হয়ে ওদিকে উদীয়মান, তারপর দরজা পথে অদৃশ্য)

জাফর : তোমার আব্বাকে আমার কোনোদিনই অত ভয়ঙ্কর মনে হয়নি।

লায়লা : আব্বা এখনো আপনার চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হননি, আপনার লেখা পড়েননি, তাই আপনার সঙ্গে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠাও প্রয়োজন মনে করেননি।

জাফর : যখন জানবেন তখন কী হবে ? আগের মাস্টারের মতো আমাকেও তাড়িয়ে দেবেন ?

লায়লা : আপনার বেলায় তার চেয়েও বেশি হতে পারে। ধোকা যে দেয় আব্বা তাকে কক্ষ্নো এমনিতেই ছেড়ে দেন না। হয়তো টোটা ভরা বন্দুক উঁচিয়ে তেড়ে আসবেন!

(জাফর আস্তে আস্তে কেমন যেন অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছে)

জাফর : তোমার আব্বাকে তুমি অমন সাংঘাতিক চোখে দেখো কেন ? সত্যি সত্যি তোমার আব্বা কিন্তু অত্যন্ত নরম মনের লোক।

লায়লা : নরম না, তুলতুলে না ? চোখে তো কেবল ঐ একটি মাত্র পুরুষকেই সামনা-সামনি দেখেছি, জেনেছি— এই যদি তাঁর কোমলতার নিদর্শন হয় তবে আর পুরুষ দেখে আমার কাজ নেই !

(যেন এর পর পুরুষ চরিত্র সম্বন্ধে পৃথিবীর কোনো নারীর আর কিছু বলবার নেই এমনি একটা ভাব করে লায়লা সরাসরি সহজ ভঙ্গিতে টেবিলের ওপরেই চড়ে বসে। এবং নেহায়ৎই দৈবক্রমে জাফর ঠিক ঐ মুহূর্তে পর্দার ও-পাশের কথা নিবিড় আগ্রহে শুনতে শুনতে টেবিলের ওপর চড়ে বসেছে।

জাফর : তুমি যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন পড়ো লায়লা তখন ছেলেরা কিন্তু তোমার সম্পর্কে—

লায়লা : বিশ্ববিদ্যালয়। যাক অত স্বপ্ন দেখে আমার কাজ নেই। আব্বাকে বন্দুক হাতে দেখেছেন কখনো ?

জাফর : কেন ?

লায়লা : দেখলে আমার স্বপ্ন নিয়ে অমন নিষ্ঠুর ঠাট্টা আপনি কক্ষ্নো করতেন না।

(গলার স্বর ভারি)

জাফর : আরে একী, আমি কী বললাম আবার!

লায়লা : একদিন শুধু আব্বাকে বলেছিলাম, আব্বাজান, বাড়িতে এত কলকব্জা বসিয়ে টাকা খরচ করে মাস্টার না রেখে আমাকে কোনো মেয়ে কলেজে ভর্তি করে দিলে এমন কী দোষ হয় ?

জাফর : কী বললেন তোমার আব্বা ?

লায়লা : বললেন, পড়ালেখা শিখলে বেহায়া, বেআব্রু, বেশরম হবার প্রবল ইচ্ছা তার মেয়েরও যে জাগতে পারে একথা নাকি তাঁর আগেই ভাবা উচিত ছিল।

জাফর : তারপর ?

লায়লা : শেষে বললেন, এখন যখন মেয়ে তাঁর বিদুষী হয়ে উঠেছে তখন মেয়ের যা ইচ্ছে করতে হবে বৈকি!

জাফর : তুমি কী বললে তখন ?

লায়লা : কী বলব আবার— কেঁদে ফেললাম আর কী!

জাফর : ছিঃ কাঁ-দ্-লে! ভিজে সলতের মতো লতিয়ে না পড়ে দপ করে একবার জ্বলে উঠতে পারলে না লায়লা ?

লায়লা : কেবল কথা, কথা আর কথা! আপনার ঐ সব সাজানো-গুছানো আগুন জ্বালানো কথা আপনার লেখা থেকে আমারও ঢের ঢের মুখস্ত আছে।

জাফর : আমার সাহিত্যের কথা হচ্ছে না লায়লা, আমি তোমার জীবনের কথা ভাবছি—

(দু'হাত দিয়ে জাফর পর্দাটা মুঠ করে ধরে— একটু হলেই লায়লার নধর বেণিতে হাত পড়েছিল বলে।)

লায়লা : থাক এক কণা যার কথা ছাড়া কিছু করবার মুরোদ নেই তার আমার সম্বন্ধে কিছু না ভাবলেও চলবে। তার চেয়ে ঘরে বসে বিদ্রোহমূলক সাহিত্য রচনা করুন—খুব শান্তি পাবেন।

জাফর : তুমি ভুল জায়গায় আঘাত দিচ্ছ লায়লা! আমি যা বিশ্বেস করি তা কাজে প্রকাশ করার জন্য তুমি আমাকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা না করলেও পার।

লায়লা : সত্যি ?

(টেবিল থেকে ধীরে নেমে লায়লা জ্বলন্ত চোখে পর্দার বিশেষ দুই বিন্দুতে চেয়ে থাকে। যেখানে জাফরের মুঠ করা হাতের চাপে এত হেকমতে দাঁড় করানো সমস্ত কাপড়ের দেয়ালটা নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে।)

জাফর : জানো লায়লা, শক্তি আমার লেখায় নয়, শক্তি আমার এই দুই বাহুতে। যে মুহূর্তে যখন যা ইচ্ছে করেছি তখনই তা অর্জন করেছি।

লায়লা : এত শক্তি! আর কেবল যে দুর্বল বিদ্রোহ করতে চায় তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসটুকুই নেই ?

জাফর : কী বলতে চাও তুমি পরিষ্কার করে বল লায়লা।

লায়লা : পারেন এই মুহূর্তে দু'হাত দিয়ে এ পর্দাটাকে ছিঁড়ে কেড়ে কুটি কুটি করে আমার পাশে এসে—

(কিন্তু বাক্য শেষ করবার আগেই চিৎকার করতে করতে ন'বছরের একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে পেছনে ধাবমান এগারো বছরের একটি ছেলের কাছ থেকে ছুটে পালিয়ে বাঁচতে গিয়ে হুড়মুড় করে হোঁচট খেল একেবারে পর্দাটার শেষ প্রান্তে এবং অত্যন্ত বিপদজ্জনকভাবে আন্দোলিত পর্দার প্রতি চোখ পড়তেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল লায়লা—)

জাফর : কী, কী হলো, কথা বলছ না কেন ?

লায়লা : (সামলে) কিছু না, ছোট ভাই দু'টো মারামারি করছিল মাত্র।

জাফর : কিন্তু তুমি চিৎকার করে উঠলে কেন ?

লায়লা : আপনার কি চোখ নেই নাকি ? যে-ভাবে ওরা পর্দার ওপর হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ছিল তাতে পর্দা ছিঁড়ে যেতে পারতো যে!

(ছেলে দুটো এ সংলগ্ন অসম্মানজনক সংলাপে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে— কোনো রকমে যে-পথ দিয়ে এসেছিল সে-পথ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।)

জাফর : (হাসির শব্দ)

লায়লা : হাসলেন যে ?

জাফর : বিদ্রোহীর সাহস দেখে।

লায়লা : বিদ্রোহী খুব সাহসী বলে বড়াই করেছিল ?

জাফর : মনে না থাকলেও সাহস ভিক্ষে করার কণ্ঠস্বরে তার জোর যে যথেষ্ট মজুদ ছিল।

লায়লা : আমার অক্ষমতা নিয়ে ঠাট্টা করলে কেঁদে ফেলব জাফর ভাই।

জাফর : তার আগেই আকাশচুম্বী লোহার কাপড়টাকে ডিঙ্গিয়ে কেউ যদি বিদ্রোহীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়, বিদ্রোহী তখনও কাঁদবে ?

(পকেট থেকে দেশলাই বার করে)

ধর এখন যদি আমি—

লায়লা : জাফর ভাই সাবধানে কথা বলো, বাইরের ঘরে আব্বার গলা শুনা যাচ্ছে, এখুনি এসে পড়তে পারেন।

জাফর : এখনও অনেক দূরে আছেন তোমার আব্বা, ধর এই মুহূর্তে আমি যদি এখনই সমস্ত পর্দাটায় আগুন লাগিয়ে দিই ?

(কাঠি ধরাবার প্রচেষ্টায় দেশলাইর বারুদে কাঠি ঘষার শব্দ)

জ্বলন্ত কাপড়ে লেলিহান শিখা—

লায়লা : (ভয়ার্ত) জাফর ভাই— জাফর ভাই!

জাফর : চিৎকার করছ কেন, ভয় পেলে ? আমি পাশে থাকতেও ?

লায়লা : (হঠাৎ) দাও, জ্বালিয়ে দাও জাফর ভাই। দেশলাই দিয়ে আগুন লাগিয়ে দাও। আমাদের মাঝখানের কালো কুৎসিত দেয়ালটা পুড়ে ছাই হয়ে যাক— চমৎকার হবে দেখতে! দেরি করছ কেন ?

জাফর : (কাঠি জ্বেলে একটা সিগারেট ধরায়) নিশ্চিন্ত হওয়া গেল এতক্ষণে! নাঃ এখন খামকা আর অগ্নিকাণ্ড করে লাভ কী ? (পর্দার সম্মুখ প্রান্ত ধরে)

লায়লা : আমার কিন্তু ভয় করছে জাফর ভাই, যদি আব্বা এসে পড়েন ?

জাফর : একলা আছ বলেই ভয় করছে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে দাঁড়ালে ঐ কালো পর্দাটাই তখন হয়ে উঠবে বাইরের ঘন দুর্যোগের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিন দুর্গ।

(লায়লা ভয়ে চোখ বন্ধ করল। চোখ বন্ধ রেখেই অনুভব করলো জাফরের দীর্ঘ দেহ পর্দা ঠেলে তার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। যন্ত্রচালিতের মতো দু'হাতে ওড়ানাটা মাথার ওপর টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল আরও কয়েক মুহূর্ত। চোখ মেলে—)

লায়লা : আপনি—

জাফর : তুমি, তুমি এত সুন্দর লায়লা!

(এমনি সময়ে পর্দার ও-পাশে ঘরে প্রবেশ করলেন গম্ভীর আব্বাজান। হাতে বন্দুক)

আব্বা : লায়লা!

লায়লা : জি'

আব্বা : তোর মাস্টার কখন গেল ?

লায়লা : একটু আগে।

আব্বা : ওর ভাগ্য ভালো যে আজ ও আমার চোখের সামনে পড়েনি। বেঁচে গেল।

লায়লা : কী বললেন আব্বাজান ?

আব্বা : (একটু অস্থির পায়চারি করে) বড্ড মুশকিলে পড়লাম, লোকটা খারাপ অথচ পণ্ডিত যে, বিদ্বান যে। লোকটা নাকি প্রবন্ধ লেখে বড় বেহুদা, বেফয়দা, বেশরিয়তি কথা নিয়ে—

[বলতে বলতে যে দরজা দিয়ে এসেছিলেন সেদিক দিয়েই বেরিয়ে যান]

[যবনিকা]

একাংকিকা

চরিত্র

আব্বাজান
খোকা
জ্যেষ্ঠপুত্র
আম্মাজান
কন্যা

[পর্দা উঠিলে— দেখা যাইতেছে আব্বাজান বারান্দায় একটি পাটিতে বসিয়া গভীর মনোযোগের সহিত এক সুবৃহৎ কিতাব পড়িতেছেন। তন্ময় চিত্তে মাঝে মাঝে আইন-গাইনে সমাকীর্ণ এক-আধ লাইন আবৃত্তিও করিতেছেন।

আব্বাজানের বয়স পঞ্চাশের মাঝামাঝি হেলিয়া পড়িয়াছে। দাড়ি, চুল সাদা। মাথার কিস্তি টুপি সাদা। পোশাক সাদা পাঞ্জাবি এবং সাদা লুঙ্গি।

এমন সময় হন্তদন্ত হইয়া প্রবেশ করিল পেটুক খোকা— বয়স বার। পরিধানে হাফ্‌প্যান্ট, হাতে গুল্‌তি। তারপর সমস্ত পবিত্র গাম্ভীর্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া—]

খোকা : হলো এখন ! হুম্— আমরা কেউ ও-রকম কাণ্ড করলে এতক্ষণে রক্ষা ছিল না। জবাই-ই করে ফেলতেন হয়তো। অথচ—

আব্বা : (কিতাব বন্ধ করিয়া) কী, কীসের কথা বলছিস ? কে কী করল আবার ?

খোকা : কে আবার। বড় আপার আদুরে বকরি আপনার নামাজের—

আব্বা : এঁ্যা! (দাঁড়াইয়া) আবার নামাজের ঘরে ঢুকেছে ?

খোকা : ঢুকেছে নয়, ঢুকে বেবাক কিছু বরবাদ করে দিয়েছে, নাপাক করে দিয়েছে।

আব্বা : উহু! হারামজাদা আর জায়গা পেল না, না ?

খোকা : তবু তো আপনি ওটাকে কিছু করবেন না।

আব্বা : করব না মানে ? শুয়োরটা গেল কোথায় এখন, একবার ওটাকে ধরে নিয়ে আয় তো এখানে।

খোকা : ভাইজান নিয়ে আসছেন। আপার কান্নাকাটির জন্যেই দেরি হচ্ছে হয়তো।

আব্বা : কান্নাকাটি, ওই কুকুরটার জন্যে আবার দরদ দেখানো হচ্ছে! (জোরে হাঁকিয়া) কৈ, বকরিটা আনলি না এখনো ?

(নেপথ্যে জ্যৈষ্ঠপুত্রের কণ্ঠস্বর) —এই যে আনছি, আব্বাজান।

(এবং একটু পরেই একটি নাদুস-নুদুস চক্‌চকে বকরির গলার দড়ি ধরিয়া হেঁচড়াইতে হেঁচড়াইতে প্রবেশ করিল স্বাস্থ্যহীন জ্যেষ্ঠপুত্র। পিছনে অশ্রুসজল কাতর চোখে মেদবহুলা কন্যা)

আব্বা : আজকে চাব্‌কে ওর খাল তুলে ফেলব।

জ্যেষ্ঠপুত্র : চাবকালে ওটার কিছু হবে না আব্বাজান, দেখছেন না খেয়ে খেয়ে কী রকম ফুলেছে; কী রকম জোয়ান আর ধুমসি হয়েছে ?

কন্যা : (বকরির গলা জড়াইয়া, ভাইকে) হিংসুক কোথাকার!

খোকা : অত হাঙ্গামা করে লাভ কী! তার চেয়ে আমি বলি কী ওটাকে সোজাসুজি জবাই করে ফেলা যাক্!

কন্যা : পেটুক, রাক্ষস!

পুত্র : আহা-হা দরদ দেখো, একই রকম দেখতে কিনা!

কন্যা : আব্বাজা-ন!

আব্বা : (গম্ভীর) দেখি, আরেকটু কাছে আন তো বকরিটা।

(কন্যা বকরির কণ্ঠ জড়াইয়া একটু নিকটে সরিয়া আসিল। আব্বাজান অত্যন্ত নিবিষ্ট মনে উহাকে নিরীক্ষণ করিতে থাকেন।)

কন্যা : (অনুনয়) কী মোলায়েম না, আব্বাজান ? কী অসহায় ছলছলে ওর চোখগুলো, দেখলেই মায়া হয় আব্বাজান, না ? ভয়ে বেচারির বুক দূর্ দূর্ করে কাঁপছে। এরপরও আব্বাজান—

আব্বা : না, ওকে আর চাব্কাব না।

কন্যা : বলিনি আমি ?

আব্বা : খোকা, তুই-ই ঠিক বলছিস। এরচেয়ে বেশি গোস্ত হলে চর্বি আরো বেড়ে যাবে, স্বাদ কমে যাবে। আজই জবাই করে ফেলব।

(কন্যা ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। খোকা লাফাইয়া গুল্তির ফাঁসে বক্রির গর্দান আটকাইল। বড় ভাই খাম্চা দিয়া ধরিল দুই ঠ্যাং।)

বকরি : ম্যাহ্ ম্যাহ্ ম্যাহ্ হ্ হ্ হ্ হ্—

আব্বা : তোরা কাঁচাই খেয়ে ফেলবি নাকি ?

খোকা : ভাইজান তোমার হলো পেছনের দিকটা, আমি কিন্তু মাথার দিকটা ছাড়ছি না। আব্বাজান পাবেন মধ্যেরটুকু। আপা তো নিশ্চয়ই খাচ্ছে না।

কন্যা : (ফোঁপাইয়া) গেদ্দার, ভল্লুক-নেকড়ে!

খোকা : ঘাড়ের চামড়াটা দেখেছ ভাইজান, কী নরম! আপার চেয়ে বেশি তুলতুলে। আজিজ দরওয়ানের (একটু ভেবে) না না আজিজ নয়, ও তো কেমন ঘসে ঘসে কাটে। সেলিম বাবুর্চি ঝকঝকে মুরাদাবাদী ছুরিটা যখন—

পুত্র : (শিউরে) আহা-হা অমন করে তুই বলিস না।

খোকা : আমার জবাইর কথা শুনতে ভয়ঙ্কর খারাপ লাগে।

আব্বা : তোরা যে দেখছি মুখেমুখেই ওটাকে জবাই করে রেঁধে ফেলবি!

খোকা : ভাইজান যেন কী! জবাইর সে সুরখ রক্ত জমে ক্ষুদে মতন এক হ্রদ হবে, জেলির মতো থক্থকে লাল পানি— সে সব কথা ভাবতেই তো সব মজা!

কন্যা : জল্লাদ, ভ্যাম্পায়ার!

খোকা : চামড়াটা কিন্তু এবার বিক্রি করা হবে না।

আব্বা : ওটা কোনো সাহায্য ভাণ্ডারে দান করতেই হবে।

পুত্র : তোর ওসব জল্লাদের কথা একটু থামাবি খোকা ? উহ্ কী নৃশংস কল্পনা।

আব্বা : তোদের দেখছি আর তর সয় না। এখনই তো আর জবাই হচ্ছে না, ও-সব কথা থাক না এখন। গোস্ত নাম শুনলেই হলো, অমনি সে-গল্পে মশ্‌গুল! মাথায় বুঝি অন্য কিছু খেলতেই চায় না ?

খোকা : ভালো কথা মনে করিয়েছেন, আব্বাজান। মৌলভি সাহেবও সেদিন বলছিলেন বক্‌রির জিব্ খেলে নাকি জেহেন্ বাড়ে।

কন্যা : যেমন ওস্তাদ তেমনি শাকরেদ।

খোকা : ও, বুঝেছি ওটা বুঝি আমার চেয়ে তোমারই বেশি দরকার। তবু জিব্ আমি ছাড়ছি না, মাথার দিকটা আমার ভাগে পড়েছে।

কন্যা : তোমার ঐ মুরগিখোর মৌলভি সাহেব বলে দিয়েছেন না ?

খোকা : হুজুরকে নিয়ে যা-তা ঠাট্টা করো না, ভালো হবে না বলছি। পড়ে তো নিরামিষখাগী মাস্টারনীদের কাছে। তিনি আবার এখানে এসেছেন খানদানি খানা নিয়ে তক্ক করতে!

কন্যা : আব্বাজা-ন!

আব্বা : আহা, চুপ কর না। ঝগড়া না করতে পারলে বুঝি জিব সুড়সুড় করে ?

পুত্র : তাও অতটুকু একটা জিব্ নিয়ে!

খোকা : তোমার কাছে অতটুকুন লাগল, না ? মসলা দিয়ে কেঁচে-নেয়া জিব্ পনির আর সালাদের টুকরো মিশিয়ে চিবুতে— আহা।— বড় বড় দুটো ঠ্যাং সাবড়াতে পারলেই বুঝি খুব খানা হলো!

পুত্র : (বিজ্ঞ হাসি) হুঁ হুঁ, নেহায়েত ছেলে-মানুষ তুই, ক'দিন ধরেই আর খাচ্ছিস ? আরে বোকা, ঠ্যাং কি আর এমনিই পুড়িয়ে খেয়ে ফেলব নাকি ? এই গোস্তাল রান দুটো দেখেছিস তো, এই উঁচু জায়গাটা ? এটা দিয়ে হবে শাহী তেক্‌কা। ভাঝা ঘিয়ে পুড়ে ওপরটায় যখন আধপোড়া একটা পল্লা পড়ে উঠবে (চুকচুক) তখনই মেলা খুলবে বাহার।

কন্যা : (তন্ময় চিত্তে) তাহলে একটা আলাদা কয়লার উনুন তুলতে হবে ভাইজান, আমাদের এ চুলোয় করলে কাঠপোড়া ঝাঁঝ আর ধুঁয়োর গন্ধ থেকে যাবে। খেয়ে-খেয়েই তো শরীরটা অমন খারাপ করলে। সত্যি এত খানা চেন তুমি !

আব্বা : (বিজ্ঞতরো হাসি) ধ্যেৎ-তোরা, আর কীই-বা খেয়েছিস ? তেক্‌কা হয় দুম্বার পাছার বাড়তি গোস্ত দিয়ে, আর নইলে উঁটের কুঁজের গোস্ত দিয়ে, হজ্জ করবার বছর খেয়েছিলাম ওদের দেশে। সে গোস্তের চাকে যেমন নেই আঁশ, তেমনি আবার রাঁধলে পর ফাঁকে ফাঁকে জমে উঠত ঘন লোয়াবের তার। রাঁধেও বটে ওরা।

কন্যা : ইস্ ও-রকম আমরাও পারি। তুমি কিছু আফসোস করো না ভাইজান,

আমি নিজ হাতে তোমায় তেক্কা রেঁধে খাওয়াব। হুঁ! শুধু আরবের মেয়েরাই বুঝি সব জানে।

খোকা : তেক্কা আমার চাই না, নাইবা খেলাম। সিনার গোস্তটাই বা এমন কী ফালতু হলো। হবে না আব্বাজান, এটা দিয়ে পরছন্দা কাবাব, হবে না?

আব্বা : পরছন্দা? (ভ্রূ কুঁচকাইয়া) আ-আ-হ্যাঁ হ্যাঁ তা হবে, বোধহয়।

কন্যা : (বকরিটাকে ভালো করিয়া দেখে) তা হবে না কেন? দেখি? হবে, হবে। তবে সেলিম বাবুর্চি রাঁধলে হয়েছে আর কী। দেখলি না সেদিন কেমন জ্বালিয়ে শক্ত করে একেবারে শিক কাবারের মতো করে তুলছিল। মাগো, পরছন্দা কাবাব তৈরি করা সে-কী মুখের কথা! সমান আগুনে অল্প অল্প করে ছেঁকতে হয়, একটু স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে আসতেই বাববাব আগুনের তাপ থেকে সরিয়ে নিতে হয়— তবেই না।

খোকা : (দরদ সহকারে) আপা।

কন্যা : কি রে?

খোকা : তুমিই তৈরি করে দিও।

কন্যা : তা অমন করে অনুনয় করছিস কেন? না চাইলেও কি তোদেব কিছু কবে খাওয়াই না নাকি?

(আব্বাজান তীব্র দৃষ্টিতে বকরির পাঁজবেব হাড়গুলো গুণিতেছিলেন।)

আব্বা : দেখ তো মা আমার হিস্‌সা থেকে গোটা ছয়েক গ্ল্যাসি বেরুবে কি না?

কন্যা : (টিপিয়া) হ্যাঁ, তা গোটা ছয়েক লাগসই গ্ল্যাসি তো হবেই।

পুত্র : হাড়গোড় দিয়ে আমার একটা সুপ কিন্তু চাই, আমার পেটেব জন্যে খুব উপকারী হবে।

খোকা : আর আমার এখানে হবে ভুনা মগজের—

কন্যা : দূর বেকুব, বকরির মগজের আবার ভুনা কীসের রে?

খোকা : (ব্যথিত কণ্ঠে) হয় না!

(ক্রমশ প্রত্যেকে যে যার স্বপ্নে বিভোরচিত্তে হাত ধুইতেছে সুপ্‌শপ করিয়া জিব চুষিতেছে, শূন্য-গহ্বর মুখ অযথা চিবাইতেছে— এইরূপ স্বাপ্নিক স্তব্ধতা ছিন্ন করিয়া একবার হঠাৎ মেদবহুলা কন্যাটি হাসিয়া উঠিল)

কন্যা : তোমরা কিন্তু কেউ কলজে, গুর্দার কথা বলনি। ওটা কিন্তু আব্বাজান কাউকে আমি দেব না। পুদিনা পাতা দিয়ে কলজে-গুর্দার দোপেয়াজ—

(কন্যা তার বাক্যের মধ্য পথে সভয়ে থামিয়া গেল। চমকিয়া সকলে দেখিল, পিছনে আম্মাজান আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বাস্তবে ফিরিয়া আসিয়া নিজেদের অসংযম উল্লাসের জন্য সকলেই কেমন যেন হইয়া গেল। এ উহার দিকে চাহিল।)

আম্মা : কীসের কলজে-গুর্দার দোপেয়াজ হবে রে? (হঠাৎ বকরিটাকে লক্ষ করিয়া) ওটার? (সকলে নিশ্চিতভাবে মাথা নাড়িল)

খোকা : হ্যাঁ, আম্মাজান।

আম্মা : দেখি (ভ্রু কুঁচকাইয়া বকরিটিকে আরো কিছুক্ষণ লক্ষ করিলেন) তোমরা কি সব পাগল হলে নাকি, চোখে দেখতে পাও না?

খোকা : কী?

পুত্র : এ্যাঁ।

আম্মা : (কন্যাকে) ধিংগি মেয়ে, খানার কথা শুনে নাচতে লজ্জা করে, না? তখন বুঝি কাণ্ডজ্ঞান থাকে না, না? চোখ নেই, দেখতে পাও না, ওটা আর দু'মাস পর বাচ্চা বিয়োবে?

আব্বা : এ্যাঁ। আস্তাগ-ফেরুল্লাহ্।

আম্মা : তোমার যে কী, বুড়ো বয়সে। ছেলেদের সঙ্গে সব কথাতেই...

[বিড়বিড় করিতে করিতে আম্মাজানের ভারিক্কি প্রস্থান। বোকার মতো এ উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া প্রথমে এক দ্বার পথে পিতা অন্য দ্বার পথে কন্যা নিঃশব্দে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। একটু পবে জ্যেষ্ঠপুত্র। এবং সকলের শেষে কাতর চোখে ছাগলটিকে দেখিতে দেখিতে পেটুক খোকাও গেল।

বকরিটি হতভম্ব হইয়া রঙ্গমঞ্চ আর একবার নাপাক করিতে উদ্যত হইতেই পর্দা পড়িল।]

[যবনিকা]

একটি মশা

চরিত্র

কবীর	:	গৃহস্বামী
নবাব	:	কবীরের ছোট ভাই
মিনু	:	কবীরের ছেলে
ভাবি		
নাদেরা		

[স্থান : যে-পাড়ায় এরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়।

সময় : যে-যুগের খবরের কাগজে সাধারণ মানুষের জন্যে একটিমাত্র খবরই সবচেয়ে বেশি ছাপা হতো-হিন্দু মানুষ আর মুসলমান মানুষ সুযোগ পেলেই পরস্পরের ঘাড় ভেঙে রক্ত চুষছে।]

ভাবি : (হাতকাটা ব্লাউসের প্রান্তদেশে খোলা লাল টুকটুকে সুপুষ্ট বাহুতে একটা প্রচণ্ড চাটি মারে) উঃ!

নবাব : বাব্বাঃ, এত জোরে মেরেছ, বেচারা বোধহয় একেবারে থেঁতলেই মরে গেছে!

ভাবি : (নখ দিয়ে আঘাতপ্রাপ্ত মাংস বিন্দুতে খুঁটতে খুঁটতে) কী রাক্ষুসে কামড় রে বাবা, মনে হলো যেন এক চিম্‌টে গোস্তই উপড়ে ফেলেছে!

নবাব : তাই বলে বেচারাকে তুমি ঐ-রকম ভয়ংকর পাল্টা আক্রমণ করবে নাকি ? তোমার অত আছে, এক আধ গ্লাস ও খেলেই-বা এমন কি তোমার বয়ে যায়!

ভাবি : ফাজলামি না, তোদের এ জায়গার মতন এমন ডাকাত মশা কস্মিনকালেও আর দেখিনি।

নবাব : তোমার বাপের বাড়ির মশাগুলো বুঝি সব অহিংস-ধর্মাবলম্বী, পানি ছাড়া বুঝি ওগুলো আর কিচ্ছু ছোঁয় না। রক্ত-মাংসে বুঝি ওগুলোর একদম অরুচি!

ভাবি : জ্বি। তাই।

নবাব : এখানকার মশাগুলো সত্যি ভাবি একেবারে গুণ্ডা ক্লাস। সবসময়ে মানুষের রক্তের নেশায় ভন্ ভন্ করে ঘুরে বেড়ায়, শুঁকে শুঁকে ঠিক খুঁজে বের করবে কোথায় গোশতের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক ফুটো আছে।

ভাবি : হুম।

নবাব : বনেদি পিশাচ এ জায়গার মশা। এগুলো তোমার চামড়ার ফুটোয় শুঁড় সেঁধিয়ে দিয়ে কি-রকম চোঁ চোঁ করে রক্ত চুষতে শুরু করে দেয়! ঐ এক মুহূর্তের মধ্যে তোমার ক'গণ্ডুষ রক্ত সাবাড় করে ফেলেছে শয়তানটা কে জানে ?

ভাবি : নিজের তো গণ্ডারের খোলস কিনা, তাই অন্যের বেলায় এত ফুর্তি, এত কাব্য!

নবাব : কাব্য নয়, আমার কি মনে হয় জানো ভাবি, এ মশাগুলো যে শুধু তোমার বাপের বাড়ির নয়, তাই নয়। এর বদ্-খাসলিয়তগুলো আরো গভীর কোনো কারণবশত জন্মেছে। এখানকার মশাগুলোর এই রক্তচোষা মানুষ-খেকো প্রবৃত্তিটা নিশ্চয় এখানকার স্থানীয় কোনো প্রাকৃতিক বিকৃতিরই রূপ।

ভাবি তারপর ?

নবাব নিশ্চয় একটা জাতিগত বৈশিষ্ট্য এটা। বুঝলে ভাবি, আমি অনেক চিন্তা করে দেখলাম, তোমায় যে-মশাটা এমন একটা নৃশংস কুটুস্ কামড় দিয়েছিল, ওটা নিশ্চয় নিশ্চয় জাতে হিন্দু মশা হবে! হিন্দু নাহলে তোমাকে ও-রকমভাবে কেউ আক্রমণ করে!

(মিনু হেসে লুটোপুটি)

কবীর : (মিনুর পড়ার টেবিল থেকে লাফিয়ে ওঠে) মিনু, হাসছিস কেন ?

মিনু : বাঃ কাকা অমন হাসির কথা বলল কেন তবে ? হিঁদু মশা, হি হি হি হো হো হো!

কবীর : চুপ! এটা হাসির কথা নয়।

নবাব : ওকে ছেড়ে দাও দাদা, না বুঝে অন্যায় করে ফেলেছে। মিনু, এদিকে আয়।

মিনু : বল কাকা।

নবাব : হিঁদু মশা হাসির কথা নয়। হিঁদু মশা তোর মাকে কামড়েছে এটা গভীর দুঃখের কথা। বুঝলি ?

মিনু : না।

নবাব : না কিরে ? শোন আবার বুঝিয়ে বলছি।

মিনু : বল।

নবাব : তোর মা কী ? বল্ তো তোর মা কী ?

মিনু : মা ? বাঃ, মা তো মা-ই, আবার কী ?

নবাব : ধেৎ বোকা, হলো না, আবার বল্।

মিনু : মা-মা, মানুষ।

নবাব : এবারও হলো না।

মিনু : ওঃ বুঝেছি, মা তো মেয়ে মানুষ।

নবাব : উহুম, এবারও ঠিক হয়নি। কাছাকাছি হয়েছে।

(ভাবি একটু একটু হাসছে। কবীর পেছনে হাত মুঠো করে একেকবার কটমট করে নবাবকে দেখছে, আবার পায়চারি করছে।)

মিনু : (আব্বাকে আড়চোখে দেখে নিয়ে মিটিমিটি দুষ্টুমি হেসে) এবার বুঝেছি। (ফিস্ ফিস্ করে কি বলে)।

ভাবি : কী ?

কবীর : কী বলল ও ? কী বলল ও ?

নবাব : হ্যাঁ এই তো, এতক্ষণে ঠিক বুঝেছিস। মা হলো প্রধানত মুসলমান, তরপর মেয়েলোক, তারপর মানুষ, তারপর হলো কিনা মা।

(মা ও বাবা যুগপৎ বিস্ময়ের সঙ্গে ছেলেকে দেখছে)

এই তো দেখ এখন, ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, এখন আব আমার কথায় হাসি পাওয়া, তোমার বাবার মতে উচিত নয়। হিদু মশা, তার জাতভাই বলে পাশের বাড়ির ঐ চর্বির তৈয়েব বাঁড়ুয্যে-গিন্নিকে রেহাই দিলেও তোমার মাকে আক্রমণ করতে কোনো কসুর করবে না। এটা একটা খুব বিপদ এবং ভয়ের কথা, হাসির কথা নয়, বুঝলি!

মিনু : হুঁউম।

কবীর : হুঁম না, খুব ডেঁপোমি শিখেছ, না ?

ভাবি : ওকে খামকা বকছ কেন ?

কবীব : না বকব কেন ? আদব কবব! তোমরা মায়ে কাকায় মিলে ছেলেটাকে হিঁদু বানিয়ে ফেললেই পার ?

নবাব : না, না, বাইরের একটা লোককে ঘরে ডেকে আবার হাঙ্গামা বাড়িয়ে লাভ কী! তারচেয়ে আমরা যখন হাতের কাছে আছি, ওকে মুসলমান বানিয়ে ফেলতে এমন কি আব তকলিফ হবে। কী বলিস মিনু ?

নু : তাই তো!

ীব : দু'দিন পাড়ার কতগুলো বখাটে হিঁদু ছোকরা নিয়ে দাঙ্গাবিরোধী সংগঠন করেই- (নবাবকে) তোমার চোখে তো মুসলমানমাত্রেই এখন গুণ্ডা আব-

নবাব : ছিঃ ছিঃ সে কী কথা, তুমি হবে গুণ্ডা, তওবা ! ছোবা দেখলেই যে তোমাব বুক কাঁপে! মনে নেই সেবার পল্টনে সার্কাস দেখতে গিয়ে-

কবীব : আর হিন্দুরা সব, সব দেবতা, না ?

নবাব : হিঁদু শাস্ত্র তোমার একেবারে পড়া নেই দাদা! দেবতা কি কবে হিঁদু হবে ওরা তো মানুষ নয়।

মিনু : হিহি হোহো। থুড়ি, আর হাসব না, কাকা। দেখ কাকা, মা তবু হাসছে!

ভাবি : চুপ কর্ খোকা।

কবীর : এদিকে আয় মিনু।

মিনু : মেরো না বাবা।

কবীব : কাল থেকে দু'দিন বাসার বাইবে এক পা-ও যেতে পাবিনে।

মিনু : তাবপর যেতে পারব তো বাবা ?

কবীব : দরকার হবে না।

ভাবি : কী বলছ তুমি ?

কবীর : দু'দিনের মধ্যে যা পার সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। এখান থেকে চলে যাচ্ছি, পরশুর পর আর একদিন্ও এখানে থাকতে আমি রাজি নই।

নবাব : তার আগেই যদি ওরা আমাদের সাবাড় করে দেয় তাহলে যাব কী করে ?

মিনু : ওরা কারা, কাকা ?

ভাবি : কী অলুক্ষণে কথা বলছিস তোরা ?

কবীর : সেটা হওয়া এমন একটা বিচিত্র কিছু নয়। কী করবে তুমি, কে বাঁচাবে তোমায়! ঘরে একটা লোক ঢুকে তোমার গলার হার ছিনিয়ে নিয়েও যদি তুষ্ট না হয়, তোমার গলাটাও যদি কাটতে চায়?

(ভাবির ভীত চিৎকার। কবীর সাহেবও একটু ভড়কে যায়। হাতে বইখাতাসহ পাশের ঘর থেকে দৌড়ে নাদেরার প্রবেশ)

নাদেরা : কী, কী হলো আপা?

নবাব : ভয়ঙ্কর কাণ্ড, একটা এই জোয়ান হিন্দু তোমার আপার গলা থেকে হার ছিনিয়ে তারপর খোপাবাঁধা মাথাটা বামদার এক আঘাতে গর্দান থেকে চ্যুত করে দেবার ইচ্ছায়-।

নাদেরা : (ভয়ার্ত চিৎকার) আপা!

নবাব : কি চ্যাঁচাচ্ছ কেবল। কিছু হয়নি, যদি এ-রকম হয় সেকথা তোমার দুলাভাই বলাতেই তোমার আপা মূর্ছা যাবার উপক্রম হয়েছিল।

নাদেরা : (আপার গলা জড়িয়ে ধরে। এদিক-ওদিক নিশ্চিন্ত চোখ মেলে ও হাঁফ ছেড়ে) ওহ তাই বলুন। আপনারও এ, কিন্তু দুলাভাইর এই বুড়ো বয়সে ও-রকম উৎকট রসিকতার বায়ু চাপল কেন বুঝতে পারছি না।

কবীব : বায়ু?

নবাব : যা মনে করেছ তেমনও নয় কিন্তু, একেবারে সবটা ফাঁকা বানানো বাতাস নয়। সত্যি যা হয়েছিল-

মিনু : হ্যাঁ একটা-

নবাব : হাসি নয়, সত্যি একটা এসেও ছিল, আক্রমণও যে করেনি তা নয়। অমন আঁৎকে উঠো না, তেমন কিছু ক্ষতি করতে পাবেনি। শুধু তোমাব আপার অমন নধর দেহ চুষে কয়েক ফোঁটা টাটকা সুস্বাদু লাল রক্ত নিয়ে গেছে।

নাদেরা : আপা ! (ভয়ার্ত)

ভাবি : ঠাট্টা করছে, আমায় একটা মশা কামড়েছিল, তাই নিয়ে ফাজলেমি কবছে।

নাদেরা : মশা !

নবাব : হ্যাঁ, একটা জাঁদবেল হিন্দু মশা।

[যবনিকা]

নেতা

চরিত্র

হাজি রুহুল করিম : দেশবরেণ্য নেতা, মুল্লুকের একজন প্রধান চালক
নাজিমুল হক : হাজি রুহুল কবিমের প্রাইভেট সেক্রেটারি
মুনশী কোরেশী : দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব প্রেসিডেন্ট
হাফিজ সাহেব : উক্ত প্রতিষ্ঠানের নতুন নেতা
শরীফ মিয়া : উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটাবি
হাওই শার্ট-পরিহিত ব্যক্তি : হাফিজ সাহেবের অনুচর
লম্বাকোর্তা-পরিহিত ব্যক্তি : মুনশী কোরেশীর অনুচব
মিসেস ফিকরী খানম : উক্ত প্রতিষ্ঠানের মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট

হক : (ঢুকে সোজা বোতলটা নাকের কাছে তুলে একটু শুঁকে নিয়ে) আপনার ওষুধের বোতলটা আমি আপাতত সরিয়ে রাখছি।

রুহুল : (সামলাবার চেষ্টায়) সকাল বেলা বিছানা থেকে কোনোক্রমেই আর কোমরটা তুলতে পারছিলাম না। ব্যথায় একেবারে অবশ হয়ে রয়েছে। এদিকে ওদেরও প্রায় আসার সময় হয়ে এলো। ভাবছিলাম একটু গিলে নিলে হয়তো দেহটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

হক্ : ভুল ভেবেছিলেন। এবং নিয়ম ভঙ্গ করেছেন।

রুহুল : তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না, না ? এখনও সোজা হয়ে বসতে পারছি না-

হক : সেটা কতটা বাতের আর কতটা বোতলের আপনি নিজেই ভালো জানেন। কিন্তু সন্ধ্যের সময় কাউন্সিল মিটিং, একটু পর আসল রুই-কাতলাবা এখানে এসে জড় হচ্ছেন- এ-রকম অবস্থায় আপনার সম্পর্কে আমারও একটা দায়িত্ব আছে। আপনাকেও আর কেউ কোমরে গামছা বেঁধে কোদাল মারতে বলছে না। কোমর তুলতে না পারেন, চিৎ হয়ে পড়ে থাকুন। মাথা ঠিক বেখে নাকে-মুখে কথা বলে যান, সব ঠিক হয়ে যাবে।

রুহুল : হুম্।

হক্ : মনটাকে সব সময় অত কোমরের নিচে ফেলে রাখবেন না। টেনে তুলে আরেকটু ওপরেও ঘোরান-ফেরান। নইলে যে গেরো বেঁধেছে তাতে আমার মতো দশটা সেক্রেটারিও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

রুহুল : থাক্ থাক্ আর বোঝাতে হবে না। একদিকে বাতের ব্যথা, অন্যদিকে কাউন্সিল মিটিং-সারারাত ঘুমুতে পারিনি। একবার এসে খোঁজও নিলে না। সন্ধ্যের পর কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিলে।

হক্ : আপনার কাজেই বেরিয়েছিলাম।

রুহুল : প্রভুর জন্যে এত কাজই করছিলে যে সারা রাতের মধ্যে একবার বাড়ি ফিরে যাবার ফুরসতও পেলে না ?

হক্ : খোঁজ নিয়েছিলেন নাকি ?

রুহুল : রাত বারটার পর প্রতি দশ মিনিটে তোমাকে একবার রিং করেছি। প্রত্যেক বারই তোমার চাকর ফোন ধরেছে।

হক্ : ঘুম যদি না-ই আসছিল তবে দু'চার বার আজকের বক্তৃতার খসড়াটায় চোখ বুলিয়ে সময়ের সদ্ব্যবহার করতেন।

রুহুল : দেখো হক, তোমার মতো অত ডিগ্রি আমার নেই। বিলাত গিয়ে মোটা মোটা রাজনীতির বই ঘেঁটে কোনো পরীক্ষায় আমায় কোনোদিন পাশ করতে হয়নি। কিন্তু তবু আমি রাজনীতি করি, করে বড় হয়েছি, পয়সা করেছি।

এবং সে পয়সার জোরে তোমার মতো লোককে নিজের কাজে খাটাচ্ছি।

হক্ : খাঁটি কথা বলেছেন। আমিও নিমকহারাম নই। আপনার স্বার্থ আমার স্বার্থ। আপনি শুধু আমার প্রভু নন, আমার মান আমার প্রাণ; ঠিক এজন্যেই আপনার যে-কোনো বিপদে আমি এত কঠিন এবং রূঢ়। আপনাকে বিপদমুক্ত করা ছাড়া অন্য কোনো কিছুতেই তখন আমল দিতে রাজি নই। এতটা সতর্ক বলে আমার হিসেবেও সাধারণত কোনো ভুল হয় না।

রুহুল : তোমার কথা শুনলে মনে বড় বল পাই। সাহস পাই। তোমার বেযাড়া কথাবার্তাগুলোও সেজন্যে এত সহ্য করি। তোমার পরামর্শ মতো নিজের বাড়িটাকে পর্যন্ত একটা গোলকধাঁধা করে গড়েছি। এর কোন্ দরজা দিয়ে ঢুকলে কোথায় গিয়ে পড়ব, নিজেও সব সময় তা ঠিক করে উঠতে পারি না।

হক্ : পৃথিবীর বড় বড় নেতাদের বাড়ির হদিস আপনার জানা নেই বলে আপনি এত অবাক হচ্ছেন। হাল জামানার রাজনীতি এত ঘোরাল ব্যাপার যে সেখানে বাদশাহী করতে গেলে নিজের বাসগৃহকেও রহস্যপুরী বানাতে হয়।

রুহুল : তোমার কথা মারপ্যাচের মতো, না ? কিন্তু আমি অত থিওরি বুঝি না। আমি চাই মুনাফা, টাটকা এবং তাজা।

হক : রাজনীতির লেনদেনে এত তাড়াহুড়ো করলে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি দিতে হয়।

রুহুল : তা হোক্। তবু এ-রকম ফাঁকা সবুর আমার বরদাশ্‌ত হয় না আমি দরবেশ নই, আমি লিডার। তুমি আমার পীর নও, সেক্রেটারি, তোমার আইন-কানুনের মুগুরে আমার জীবনের সব ফূর্তি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এসব আমি আর মানব না।

হক : কী মানবেন না ?

রুহুল : তোমাদের এসব নয়া রাজনীতির হাদিছ-ফেকা! আজকে কাউন্সিল মিটিং তাই আজকে আমার বরাদ্দ বোতল বন্ধ! কারণ, তোমার মতে কাউন্সিল মিটিং হলো সজাগ বুদ্ধির লড়াই-পরীক্ষা। কালকে জনসভা, কাজেই তোমার নির্দেশ হবে আজ রাতেও আমি যাকে খুশি তাকে ঘরে ডাকতে পারব না। কারণ তোমার মতে একা একা নিশি যাপন করলেই আমার নয়ন-বদন ফুঁড়ে নুরানী রোশনাই বেরুবে যা দেখে বেকুব জনতা বেহুশ হয়ে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলবে। মানব না, এসব আমি মানব না।

হক : কী করতে চান তা হলে ?

রুহুল : আমি এখনই টেলিফোন করব ?

হক : কাকে ?

রুহুল : মিসেস ফিকরী খানমকে।

হক : আপনি অপ্রকৃতস্থ, আজ সকাল বেলাতেই আপনার মাথার ঠিক নেই।

রুহুল : বল মাথা ছাড়া আজ সকাল বেলা আমার শরীরে অন্য কোথাও কিছু ঠিক নেই। কোমরে ব্যথা, ঘুম নেই। তার ওপর তুমি তে এসেই বোতলটা

কেড়ে নিয়েছ। মাথা আমার ঠিক থাকবে কী করে? সারারাত ফোন করে করে হয়রান হয়ে গেছি, তোমারও কোনো পাত্তা নেই।

হক : আমি এখানেই ছিলাম।

রুহুল : মানে?

হক্ : কোন্ দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকলাম লক্ষ করেননি বোধহয়। ঐ পুবের ঘরটায় ছিলাম। আপনার উচিত ছিল একবাব নিজের বাড়িতেই আগে খোঁজ করা।

রুহুল : কী করছিলে এখানে?

হক্ : নানা কাজে রাত হয়ে যাওয়ায় ভাবলাম এখানেই থাকি। কেন, এ ব্যবস্থাও আর আজকের নতুন কিছু নয়!

রুহুল : না, নতুন কিছু নয়। ববঞ্চ বেশি ঘনঘন হচ্ছে বলতে পার। আমার মঙ্গলের জন্য রাত-বিবাতে তুমি যে আমাকে পাহারা পর্যন্ত দাও তা আমি সন্দেহ করতাম— তবে, জানা ছিল না। আই-বি ডিপার্টমেন্টে যদি কোনো বড় চাকরির প্রতি লোভ থাকে তবে জানিও, সুবিধেমত এক সময় জুটিয়ে দেব। যাক, এখন মিসেস ফিকরী খানমকে একবাব ফোন করে জিজ্ঞেস কবতো কাল সাবারাত উনি কোথায় ছিলেন?

হক : কোনো ভদ্রমহিলাকে ও-রকম প্রশ্ন করা উচিত নয়। নিরাপদ নয়। বিশেষ করে, আপনার মতো পজিশনে থেকে। তা ছাড়া সে অধিকার আপনাব নেই।

রুহুল : একশবার আছে। তুমি আমায় চটিও না হক। দেশের বৃহত্তম বাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেব আমি হবু সভাপতি। সেই প্রতিষ্ঠানেব মহিলা শাখাব প্রেসিডেন্ট কোথায় রাত কাটায় সে খোঁজ নেয়ার অধিকার আমাব হাজাব বার আছে। মাঝ রাতেব পর কম কবে হলেও আমি তাকে দশবাব ফোন করেছি। প্রত্যেকবারই জবাব পেয়েছি উনি বাড়ি নেই।

হক্ : ফোন ধরেছিল কে?

রুহুল : ছুঁড়িটা। ওর সেই ইরানী চাকরানীটা। সে ছুঁড়ি আবার টেলিফোন কানে দিয়ে এখনও ভালো করে কথা বলতে পারে না। কানে নাকি শুড়শুড়ি লাগে। আধখানা কথা বলে বাকিটুকু শুধু খল্ খল করে হাসে।

হক : আপনি ওকে কী জবাব দিলেন?

রুহুল : বললাম, তোর কথা ফোনে কিছু বোঝা যায় না।

হক : তাই আপনি রাত দুটোর সময় ওকে সবাসরি দাওয়াত করে বসলেন আপনার বাড়িতে এসে আপনার কানে কানে বাকি কথাগুলো বুঝিয়ে বলার জন্য! চমৎকার!!

রুহুল : আমি জানতাম তুমি আমাকে পাহারা দাও। সবই যদি দেখে থাকবে, তবে তখনই বাধা দিলে না কেন?

হক : কাউন্সিল মিটিং-এর আগের রাতে লিডারদের বাড়িব ওপর কতলোক নজর রাখে খোঁজ রাখেন তার? তখন যদি বাধা দিতাম, তাহলে জানাজানির কিছু কি আর বাকি থাকত ভেবেছেন?

রুহুল   এ বাড়িব নক্‌শা তোমার নিজ হাতে তৈরি। এ বাড়িতে কখন কারা ঢোকে বার হয় তার সব আনাগোনার খবরই যদি বাইরে থেকে লোকে এত সহজে মালুম করতে পারে, তা হলে সে দোষ তোমার। আমার তরফ থেকে কাঁচা কাজ পাবে না। কোন্ খুপরি দিয়ে ঢুকলে সহজে চোরা সিঁড়ি পাবে, তাও ছুঁড়ি ভালো করে জানত, টুপ করে ঢুকে পড়েছে।

হক : ওহ' ব্যাপারটা তাহলে নতুন কিছু নয়। এতটা আমারও জানা ছিল না।

রুহুল . শেখ, শেখ, শেখ। তোমারও শেখার অনেক কিছু এখনও বাকি আছে। অনেক লাইন আছে, যেখানে তোমাকেও আমি অনেক কিছু শেখাতে পারি।

হক্ : তা হলেও সব মামলা চুকেই গেছে। এখন আবার সাত সকালেই মিসেস ফিকরী খানমের খোঁজ করছেন কেন ?

রুহুল : আসল কথা হলো এই যে, প্রভুকে যদি কাবু করতে চাও তবে আগে তার গোলামকে ধরো। বেগমেব বেলায় বাঁদী। ফাবসি বয়েতটা আর বললাম না। বললেও বুঝতে পারতে না।

হক : আমাব-আপনার চেয়ে ফারসি শতগুণে ভালো জানেন, এমন লোকই আসছেন। কোন্ বয়েতে তাকে কাবু করবেন এই বেলা সেটাই শোনাতে শুরু করুন। জানালা দিয়ে এইমাত্র তাঁরই কিস্তি টুপিব ধ্বজা দেখলাম।

রুহুল : কে ? মুন্সী কোরেশী ? কিন্তু এত সকালে ?

হক : নয়া রাজনীতি। আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে। বিকেলে জনসভা, কিন্তু তার আগের রাতে কাউন্সিল মিটিং। তারও আগে বিশিষ্ট নেতৃবর্গেব ঘরোয়া বৈঠক। তারও আগে এক এক করে নেতায় নেতায় রুদ্ধদ্বাব কক্ষে নিভৃত আলাপ। সেই কেস্‌সার একেবারে গোড়ায় মওলানা কোরেশীর প্রথম আবির্ভাব। বাকি সবাই নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে এসে জুটবেন।

রুহুল : সারারাত ধরে এ কাজেও সুতো টেনেছ নাকি ?

হক্ : কিছুটা। আমি আপনার নুন খাই। তবে বুনটের আসল নকশা আপনার হাতে। যেমন চালাবেন তেমনি হবে। মুন্সী কোরেশীর খুঁটি, প্রতিষ্ঠানের জন্ম থেকেই, উনি তার সভাপতি বনে বনে এতদূর এসেছেন। আর আপনার তরফে আসল জোর, আপনার হালের সরকারি ক্ষমতা। বুঝে শুনে মাকু চালাবেন। তবে আমার মনের হয় আগে-ভাগে কোরেশী সাহেবকে বুঝতে না দেয়া যে এইবার আপনি নিজেই সভাপতি পদের জন্য-

রুহুল : বুঝেছি। কিন্তু এইবার মুন্সীকে বোঝাতে পারলে হয়।

(হক দরজার দিকে দু'কদম এগিয়ে যায়)

হক্ : আসুন, আসুন মুন্সী সাহেব। উনি এ ঘরেই আছেন।

মুন্সী : (প্রবেশ করে) আচ্ছালামো আলাইকুম।

রুহুল : ওলাইকুম ওয়াচ্ছালাম। আসুন, আসুন। মাফ ক[illegible] কোমবের বেদনার জন্যে দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। (হক্ ভেতরে চলে যা[illegible])

কোরেশী : বসো, বসো। তাতে কী হয়েছে ? তবে তোমাদের দেখলে দুঃখ হয়। এই বয়সেই শরীরের কী হাল করেছ। কেবল বসে বসে লাল-নীল ওষুধ খেলে সেহেদ ঠিক থাকবে কি করে ? একটু ওঠবসও করতে হয়!

রুহুল : একেবারেই যে করছি না সে-রকম ভাবছেন কেন ? রাষ্ট্রযন্ত্রের ক্ষমতা হাতে পেলে কেবল শুয়ে শুয়ে দিন কাটান যায় এ ধারণা আপনার ভুল।

কোরেশী : হতে পারে। হয়তো বেশি ওঠবস্ করেই কোমর তোমার অকেজো হয়ে পড়েছে। বুঝলে মিঞা সবই পরিমিত এবং নিয়মিত হওয়া দরকার।

রুহুল : আজ একেবারে সকাল বেলাই ওয়াজ শুরু করলেন যে! অনেক হেঁটেছেন। মুখচোখ একেবারে লাল হয়ে গেছে। এই বয়সে অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়ে সারা সকাল এত হাঁটাহাঁটি করেন কী করে ভেবে অবাক হয়ে যাই।

কোরেশী : বেশি দূর হাঁটিনি। একটা জায়গার চারপাশ একটু ঘুরে ফিরে দেখছিলাম। প্রায়ই আসি। নিজের অজান্তেই এসে পড়ি। কী যেন আমাকে টেনে নিয়ে আসে।

রুহুল : কোথায় ?

কোরেশী : বলতো ?

রুহুল : পুরনো পুকুর পাড়ের ঐ কালো মাজাব ? হাসছেন যে ?

কোরেশী : বলতে পারলে না। নয়া সড়কের ওপর তোমার এই নয়া ইমারত। রোজই তোমার বাড়িটাকে চারধার থেকে ভালো করে দেখি। দিনের বেলায় লোকে কী বলবে এই ভয়ে খুব ভোরে যখন একটু একটু আঁধার থাকে তখন আসি। তোমার বাড়িটা দেখি। বেড়ানোও হয়।

রুহুল : দেখে কী মনে হয় ?

কোরেশী : জটিল। সাদাসিধা কিছু নয়। যখন আবছা আলোতে দেখি তখন আবব্য উপন্যাসের নিশিঘেরা পুরী মনে জাগে। আলোতে মনে হয়, এ কোনো কুঠি নয়, দুর্গ।

রুহুল : বয়স আপনার কল্পনার জৌলুসকে একটুও ম্লান করতে পারেনি দেখছি।

কোরেশী : চোখেব জ্যোতিকেও না। সাদামাটা কাণ্ডজ্ঞানকেও নয়। এতবড় প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচন কবার বেলায় তারা যে এত দিন একবার ভুল করেনি এত তার আরেকটা প্রমাণ।

রুহুল : কী দেখেছেন আপনি ?

কোরেশী : তোমার ঐ পশ্চিমের একটা লতা-ঢাকা দরজা দিয়ে বেরিয়ে, এক টুকটুকে পরী উড়ে চলে গেল। দিশি পরী হলে নিশ্চয়ই পরে চলত, ধরে ফেলতে পারতাম। মনে হলো এটি বিদেশী, ডানা মেলে চলে। ইরান তুরানের হরিণ বোধহয়।

রুহুল : আপনি পাকা শিকারি। ঠিকই ধরেছেন। ঝোপেঝাড়ে আর পেটাবার দরকার নেই, কী বলতে চান সরাসরি বলে ফেলুন।

কোরেশী : তোমার সমালোচনা আমি কবতে চাইনে।

রুহুল : আপনি মুরুব্বি লোক, কবলেও আমি কিছু মনে করব না।

কোবেশী : বেশ আমি অবশ্য আমার নিজের সুখ-সুবিধের চেয়ে বড় করে দেখছি আমাদের প্রতিষ্ঠানকে, আমার কওমকে।

রুহুল : আপনি খাঁটি লোক। আপনি সব সময়েই বলে এসেছেন ইমানই আপনার একমাত্র সম্বল। (ড্রয়াব খুলে বোতল-গ্লাস বের করবে)

কোবেশী : ওটা কী ?

রুহুল . ওষুধ। কোমরেব ব্যথাটা বড্ড বেড়েছে। সেক্রেটারি ঢুকলে আবার গোলমাল কববে। আপনি বলতে থাকুন এই অবসরে আমি কিছুটা নিশ্চিত মনে খেয়েনি।

(ঢেলে শুরু কববে)

কোবেশী : খাও, যত খুশি খাও। আমি তোমার সমালোচনা কবতে আজ আসিনি। তবু এইটুকু তোমাকে জানাতে এসেছি যে আজকেব সন্ধ্যেব কাউন্সিল মিটিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে সব কিছুই একটু গভীবভাবে তলিয়ে বিচাব কবে তাবপর তুমি তোমাব মত দেবে।

রুহুল : মদ। লাহুওলা' আপনাকে মদ দেব ? এই সকাল বেলা ?

কোবেশী : বুঝতে পারছি আর দু'এক গ্লাশ পর আমাব কোনো কথাই তুমি স্পষ্ট বুঝতে পারবে না। তাড়াতাড়ি সব বলছি আগে ভালো কবে শুনে নাও।

রুহুল : আরজ করুন।

কোবেশী : আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদেব ঘরোয়া বৈঠক বসবে। কাউন্সিল মিটিং-এ কী ঠিক হবে তার প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সেখানেই গ্রহণ করা হবে। তোমাব কাছ থেকে আমি পরিষ্কার বুঝে নিতে চাই প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটাবির পদেব জন্য কে কে তোমাব পূর্ণ সমর্থন পাবে।

রুহুল : প্রতিষ্ঠানেব কোনো পদে আমি অধিষ্ঠিত নই। অতএব পদাধিকার বলে প্রথম প্রস্তাব করার অধিকার আপনার। গত বিশ বছর ধরে আপনি বুঝি বারবাবই সভাপতি নির্বাচিত হচ্ছেন ?

কোরেশী : হ্যাঁ। এবং আরেকবার হতে চাই। প্রতিষ্ঠানের খাতিবে, কওমেব খেদমতেব জন্য। এবং সেই তোমার নিরাপত্তার জন্যও বটে।

রুহুল . উত্তম। শুভ কামনার মুখে এক চুমুক চেখে নিলে হতো না। মুন্সী সাহেব ?

কোবেশী : না, এইখানেই তোমার সঙ্গে আমার পার্থক্য।

রুহুল : সে কি মুন্সী সাহেব ? আপনিও শেষে সাদা পানি খাওয়া ধরলেন ? বিশ্বেস করতে বলছেন নাকি ?

কোবেশী : ভুল বুঝেছ। তোমাব কাছ থেকে লুকোবার আমার কিছু নেই। তবে আমি হিসেব কবে চলি।

রুহুল সে আপনার ব্যবসার উন্নতি দেখে আঁচ করা যায়।

কোবেশী : ব্যবসা ছাড়াও তুমি হয়তো খেয়াল না কবতে পারো কিন্তু দেশব্যাপী আমাকে এখনো প্রতিষ্ঠানেব সভাপতি হিসেবেই জানে।

রুহুল : জীবন আপনার আর কতটুকু বাকি আছে। তাকে যদি আবার ভাগাভাগি করেন তা হলে কারো জন্যেই আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। তাছাড়া আমার এই নিভৃত কক্ষে একটু পান করলে, আপনার ঐ পাবলিক দূরে থাকুক কাকপক্ষীও রা করবে না।

কোরেশী : তোমার ফালসফার সঙ্গে আমার কোথায় অমিল সে তত্ত্বই বোঝাচ্ছিলাম। অনেক ঠেকে তবে শিখেছি। যে নীতি মঞ্চ থেকে বড় গলায় অষ্টপ্রহর জাহির করো, অষ্টপ্রহরই তাকে মেনে চলতে হবে, এমন কথা আমি বলব না কিন্তু অষ্টপ্রহরই যদি তাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলো, তবে অভ্যেসে ঢিলেমী এসে যাবে। মনের মধ্যে অসতর্কতা বাসা বাঁধবে। পাবলিক শত হাদা হলেও তখন খপ্ করে একদিন ধরে ফেলবে।

রুহুল : আপনাকে পারবে না।

কোরেশী : কারণ, জীবনটাকে আমি ভাগ করে চলি। যে ভাগ জনতার তাতে কখনো হাত দেই না দেবও না।

রুহুল : জনতার ভাগ কোন্‌টা ?

কোরেশী : ফজর থেকে মাগরেব। মাঝখানের সময়টুকু ফালতু। তারপর আবার এশার থেকে ফজর আমার। তখনকার আমাকে তুমি যদি কোনো অনুরোধ করো ফেলব না।

রুহুল : একটি সকালেও কি তার ব্যতিক্রম হতে পারে না ?

কোরেশী : এটুকু যেন বুঝতে তোমার কোনো কষ্ট না হয় এ জন্যই এত কথা বলা। সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ইজ্জত-কুয়ত আমার সংযত সতর্ক বোধবুদ্ধিব হেফাজতে যত নিরাপদ থাকবে এবং বাড়বে, এমন আব কারো বেলায় হবে না। আর সবাই নড়বে, টলবে। আমি অটুট থাকব। থাকতে জানি। থেকে এসেছি।

রুহুল : আর ফিকবী খানম ?

কোরেশী : না, মানতে পারব না। তাকে তোমাব দবকার তা আমি জানি। কিন্তু তাই বলে একেবারে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট করে না পেলে তোমার চলে না এতটা আমি মানতে রাজি নই। মূল প্রতিষ্ঠানের আমি হবো দাড়ি-দোলান সভাপতি, আর তারই এক শাখায় তোমাব পোষা পাখি পেখম তুলে নাচবে-লোকেব চোখে কওমী প্রতিষ্ঠানকে একটা সার্কাস পার্টি করে তুলতে চাও নাকি ?

রুহুল : ভুল কবছেন। চিড়িয়া এখনো পোষ মানেনি। বশ কবতে পাবলে কি আর প্রেসিডেন্ট কবে বাখার কথা তুলতাম ?

কোরেশী : এটা কি তাহলে একবাবই সাময়িক ব্যবস্থা ?

রুহুল : খুবই।

কোরেশী : মানে, আমি-তুমি-তুমি-মানে তোমার পক্ষে অন্য কোনো বকম পথ বেছে নেয়া কি সম্ভব নয় ? এতবড় একটা সরকারি ক্ষমতা তোমাব হাতে। খেলো-মেলো করে কী ?

রুহুল : আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না মন্ত্রী সাহেব। এ ঠিক জাতের মেয়ে নয়

যে! বড় খান্দানের মেয়ে. অনেক উচু তব্‌কার। টাকাব বস্তার সিঁড়ি ফেলে এ বান্দা কেবল তার নাগাল পেয়েছে। বাকি মদদটুকু আপনাকে করতে হবে। মূল সভাপতি হিসেবে আপনার নাম আমি সমর্থন করব। মাথা নিচু করে অত ভাবছেন কী ?

কোবেশী : সরকারি ক্ষমতা তোমার। ফিকরী খানম তোমার। আমি বুড়ো হব 'সভাপতি'। মহিলা শাখার ফিকরী খানম। (ভাবে)

রুন্থল : আমরা সবাই গণতন্ত্রের পূজারী।

কোবেশী : আমি রাজি! ফিকরী খানম যাতে মহিলা শাখার সভাপতি হয় সে প্রস্তাব আমি করব।

রুন্থল : আপনার মুখ থেকে সে-কথা উঠলে কারো মনেই আর কোনো প্রশ্ন জাগবে না। আর আপনি যাতে মূল সভাপতি হন তার প্রচার আমি চালাব। তবে কাউন্সিল মিটিং-এর আগে পর্যন্ত প্রকাশ্যত আমরা পবস্পবেব বিরোধী-যেমন ছিলাম।

কোরেশী : বেশ তোমার সরকারি ক্ষমতা যাতে অটুট থাকে পার্টি থেকে তাব ব্যবস্থা আমি কবব।

রুন্থল : ওয়াদা পাক্কা।

কোরেশী : পাক্কা।

রুন্থল : একটু ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। শুকনো ভিটেতে পাকা কাজ হয় না। গলাটা একটু ভিজিয়ে নিলে কি খুব ক্ষতি হয়ে যাবে ? এ-রকম একটা শুভ সঙ্কল্পের মুখে পুরোনো নিয়ম না হয় একটু ভাঙ্গলেনই।

কোরেশী : আজ ভোর রাত থেকেই তুমি আমার নিয়ম সংযম ওলট-পালট কবে দিচ্ছ। গত দশ বছবের মধ্যে সূর্যাস্তেব আগে জোয়ান মেয়েছেলে নিয়ে কোনোদিন এত আলোচনা করিনি।

রুন্থল : ধুয়ে ফেলুন। একগ্লাস ঢেলে দিয়ে গলাটা একেবারে সাফ করে ফেলুন।

কোরেশী : সবটা গিয়ে জমবে পেটের মধ্যে। দাপাদাপি শুরু করবে সাবা শরীরে। রাস্তায় বেরুব কোন্ সাহসে ? যাকে তাকে যদি ফিকরী খানম বলে মনে হয়, তখন ? কিম্বা ইরান তুরানের হরিণ (দেখে) রঙ্গটাতো বড় খাসা!

রুন্থল : গন্ধটা আরো ভালো।

কোরেশী : উ-ফ্। বেড়ে!

রুন্থল : আরো কাছে নিয়ে দেখুন।

কোরেশী : দেখি দাও। একটা কথা দিয়ে নাও আমাকে।

রুন্থল : বলুন।

কোরেশী : এক চুমুকে আমি সবটা খেয়ে নেব। তারপর আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াব না। কিন্তু যে পথে এসেছি সে পথ দিয়ে নয়। কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাক এ আমি চাই না।

রুন্থল : উত্তম।

কোরেশী : যে দরজা দিয়ে বেরুলে একেবারে তোমার বাড়ির পেছনের কুঞ্জবনে গিয়ে হাজির হওয়া যায় সে দরজা আমায় দেখিয়ে দেবে।

রুহুল : এই দক্ষিণের দরজা। ঢুকে সোজা সামনে এগিয়ে যাবেন। ডাইনে বাঁয়ে তাকাবেন না, ঘুরবেন না।

কোরেশী : না। হাতে অত সময় নেই আজ।

(নির্দিষ্ট দরজা দিয়ে ঢুকে দবজা টেনে দিয়ে অদৃশ্য)

(পর্দার আড়াল থেকে আস্তে বেরিয়ে হাততালি দিতে থাকে এক মধ্যবয়সী নেতা। পোশাক-পরিচ্ছদে একেবারে নিখুঁত সাহেব।)

সাহেব : গুড। আপনাদের মধ্যে কে সভাপতি হবেন, ফয়সালা এত চট্ করে মিটিয়ে ফেলা সম্ভব, তা স্বপ্নেও ভাবিনি। কার যে যোগ্যতা বেশি তা আমি পর্যন্ত এতক্ষণ কিছুতেই ঠিক করে উঠতে পারছিলাম না। অবিকল এক নমুনা!

রুহুল : তুমি ! হাফিজ! তুমি এখানে কী করে এলে ? কখন ঢুকেছ ? ঢুকলেকী করে ?

সাহেব : আপনার ঐ সেক্রেটারি ছোঁড়া বুদ্ধিমান। কিন্তু সে জানে না যে যারা ডালে ডালে ঘোরে তাদের পেছনে পাতায় পাতায় ঘোরার লোকও থাকে। এ বিশেষ ক্ষেত্রে লক্ষ করলাম যে সিঁড়িতে সিঁড়িতে আমার আরোহণের পথ রুদ্ধ। কাজেই পাইপের পথ গ্রহণ করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না।

রুহুল : অর্থ ?

সাহেব : ভোররাত্রি থেকে দেখি আপনার বাড়ির চার ধাবে মুন্সী সাহেব ঘুরঘুর করছেন। তখনি ঠিক করলাম যে উনি যখন সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা মনস্থ করেছেন তখন আমাকে অন্য পথে আরো ওপরে উঠে ওঁর ওপর নজর রাখতে হবে। সেই পথেই এখানে ঢুকেছি। তবে কেমন করে যে এ পর্দার পেছনে এসে পড়লাম তা নিজেও ঠিক মালুম করতে পারিনি। আপনার এই স্বপ্নপুরীর দুয়োর-জানালা, সিঁড়ি-সুড়ং একদিনে কেমন করে বুঝে উঠব ?

রুহুল : বসো, ধরো। (কিছু ঢেলে দেয়)

সাহেব : (ঠোঁট দিয়ে একটু চেঁটে দেখে) আপনি এ করছেন কী ? এ যে আগুন! মুন্সী সাহেবকে আপনি এ জিনিস খাইয়ে দিলেন ?

রুহুল : ভয় নেই। মুন্সী সাহেব অত কচি নয়।

সাহেব : (গ্লাসটা সাবাড় করে) মরুক সে! আমি বাবা ওসব বুজরুকির মধ্যে নেই। আমি আপনাকে এই শেষবারের মতো জানিয়ে দিচ্ছি ঐ মুন্সী যদি সভাপতি হয় তবে আমি অনেকের ওপর নিশ্চয়ই শারীরিক হামলা চালাব।

রুহুল : প্রথমেই অত উত্তেজিত হয়ে পড়লে রাজনীতি চলে না। আপোষের রাস্তা সব সময় কিছু না কিছু থাকে।

সাহেব : মুন্সীকে আমি বরদাশ্‌ত করব না।

রুহুল : উত্তম, আমাকে দলে পাবে।

সাহেব : কিন্তু আপনি যে একা আসতে রাজি হবেন তা আর বিশ্বেস হয় না। ফিকরী খানম- তাকেও আমি আর সহ্য করব না। মহিলা শাখা-বেফজুল। মহিলা

শাখা আমি সহ্য করব না।

রুহুল : এটা তোমার অন্যায় আব্দার। প্রতিষ্ঠান গড়লে তার দু'চারটা শাখা প্রশাখা রাখতেই হয়।

সাহেব : তার জন্য মহিলা শাখাই করতে হবে তার কী মানে আছে ? ঐ হাত-পা কাঁপা, দাঁত-নড়া বাহাত্তুরে মুন্সী কি মহিলাদের শাখা দিয়ে মেসওয়াক বানাবে না-কি ?

রুহুল : সিঁড়িতে শরিফের গলা শুনতে পেলাম। ও ঢুকে পড়ার আগে অদৃশ্য হতে চাইলে এখনি রওনা হও। যতদূর উঠেছ ততদূব নামতে হবে কিন্তু!

সাহেব : এত কাঁচা লোক মনে করবেন না আমাকে। পাইপের পথে ফিবছি না। মুন্সীকে অনুসরণ করে ঐ পেছনের সিঁড়িই ধরব। তবে যাবার আগে আপনাকে শেষবারের মতো বলছি...

(বলতে বলতে দরজা খুলে মুন্সীর পথে অদৃশ্য হবে। দবজা বন্ধ হবার প্রায় সাথেই নেপথ্যে একটা হাঁক শোনা যাবে- "ইযা হাক্।" উত্তর ভেসে আসে "গোলাম হাজিব হ্যায়, আলামপনা।" তাবপব অস্পষ্ট কথোপকথন ধ্বনি)

রুহুল : (বিড় বিড় করে) সেবেছে! আজ বোধহয় ঘুম থেকে উঠেই পিপে ভর্তি করে নিয়েছে। হবে না কেন ? মুন্সী যেমন সভাপতি এ ব্যাটা তেমনি তার জেনারেল সেক্রেটারি।-এসো, এসো মিয়া সেই সকাল থেকে তোমাব জন্য এন্তেজার করছি। কি খবব শরিফ মিয়া ? এত দেবি যে ?

শরীফ : দেরি! দেরি কীসের ? বরঞ্চ একটু আগে এসে পড়েছি। আশেপাশে দু'চাবজনকে লক্ষ করলাম খামোকা দোকান হোটেলে বসে মিনিট গুনছে। সবাই একেবারে যথাসম্ভব সময়মত হাজির হতে চায়। মতলব বড় সুবিধেব মনে হচ্ছে না। কিছু লোহা-লক্কড়েব জোগাড় বাখব ?

রুহুল : না, অতটা দরকার হবে না। এ ছোট ঘরোযা বৈঠক। তোমবা দু'একজন একটু হাত-পা নাড়লেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

শরীফ : ঐ সাহেব বুঝি আপনাকে খুব শাসিয়ে গেছে, না ?

রুহুল : দু'বকম শাখাই বাখা হবে এমন প্রস্তাবও করেছি আমি ওকে। মানতে চায়নি। আমতা আমতা করেছে।

শরীফ : এমন শিক্ষা আমি একদিন দিয়ে দেব বাছাধনকে আব কোনো শাখাতেই চড়তে হবে না। আব আপনাকে বলি স্যার, শাখা-প্রশাখার এত জঞ্জাল সৃষ্টি কবে লাভ কী ? আপনার আমাব দরকার হলে -সরাসরি- সেটা-

রুহুল : তোমাব দবকার মানে ? কথাটা নতুন শুনলাম।

শরীফ : আস্তাগফেরুল্লাহ্। কী যে বলেন স্যার! ও একটা কথার কথা বললাম। ফিকবী খানম আমার কে ? তা ছাড়া আপনি আব আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি তাকে যেমন করে পাহারা দিয়ে বেড়ান তাতে সাধ্য কি যে বেঞ্জের মধ্যে ঘেঁষি ?

রুহুল : তাইতো এখনো তোমাকে কিছু মিত্র হিসেবে পাচ্ছি। শুনেছি, ফিকরী খানমের কাছে যারা একবার এসেছে তারা কেউ আর ফিরে যেতে পারেনি। ফিরে ফিবে আরো কাছে আসতে চেয়েছে বারবার।

শরীফ : (একগ্লাস ঢেলে সাবাড় করে) বোতলগুলো সরান। সবাই বোধহয় এসেছে (পকেট হাতড়ে) আরে, চাবিটা কোথায় রাখলাম ওহ্।

রুহুল : চাবি! কিসের চাবি!

শরীফ : ঐ পেছনের সিঁড়ির দরজার। আমি একবার আপনার কুঞ্জবন থেকে ঘুবে আসি। বৈঠকের আগে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা করে রাখা দরকাব।

রুহুল : যাও, চাবি না হলেও চলতো। দরজার লক্ ভোর রাত থেকেই খোলা আছে।

(ততক্ষণে শরীফ প্রস্থান করেছে)

(হক্ প্রবেশ করে)

হক্ : সবাইকে সরাসরি এ ঘরেই নিয়ে এলাম স্যাব।

রুহুল : বেশ কবেছ।

(প্রথমে মুন্সী সাহেব। চোখমুখ অসম্ভব বকম থমথমে। যান্ত্রিক সালাম গ্রহণ কবে কলেব পুতুলেব মতো আসন গ্রহণ কবে। তার পেছনে ঢুকলেন হাফীজ সাহেব। মাথার হ্যাট উল্টো করে পরা। শিস্ দিতে দিতে ঢুকছিলেন হঠাৎ কেতাদুরস্তভাবে মাথা নুইয়ে নুইয়ে নিজেব আসনে গিয়ে গ্যাট হয়ে বসেন।

আবো দু'জন লোক প্রবেশ করবে যারা মাতাল নয়। একজনের পরনে হাওযাই সার্ট আরেকজনের লম্বাকোর্তা। হাওয়াই সার্ট গিয়ে বসবে সাহেবের পাশে এবং লম্বা কোর্তা মুন্সী কোরেশীর কাছে। সকলেব শেষে শরীফ। সে বসতে গিয়ে চেয়াব সুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে যাবে। কিছুক্ষণের স্তব্ধতা। তাবপব-)

কোরেশী : (হক্‌কে) দরজাটা বন্ধ করে দাও।

হক্ : সবাই যে এখনো আসেননি।

কোরেশী : আসার দরকার নেই।

সাহেব : না আসে যেন তার ব্যবস্থাটা করে এসেছি।

শরীফ : এ্যাঁ! সে-কী কথা। খুনটুন্ কবে এসেছেন নাকি ?

সাহেব : না এখনো করিনি। সামনে কবব। দরকার হলে। জাতির জন্যে, কওমের জন্যে, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্যে।

রুহুল : মারহাবা, মারহাবা। (হক্‌কে) এরা কি বক্তৃতা দিতে শুরু করে দিয়েছে নাকি। কিন্তু মিটিং শুরু হলো কখন ? সভাপতি কে ?

হক্ : ব্যস্ত হবেন না। নিয়মমতো কিছুই এখনও আরম্ভ হয়নি।

কোরেশী : নিয়মমতো কিছু হবাব দবকারও নেই।

সাহেব : হতে আমি দেব না।

শরীফ	:	এতো দেখছি শান্তিতে কাজ এগুতে দেবে না। গোলমাল দাওয়াত করছে। (রুহুলকে) আপনি কিন্তু আমাকে পরে দোষ দিতে পারবেন না।
রুহুল	:	না না, সে কী কথা। ওসব এখনি শুরু, করতে হবে নাকি ? হক্ এসব কী শুনছি ? আরো লোকজন ডাকলে হতো না ?
কোরেশী	:	না। হতো না। দরকার নেই। কারণ, আমি আর আমাদের এই সাহেব আমরা দু'জন বাইরে থেকেই ঠিক করে এসেছি যে, কোনো বাড়তি লোক আজকের বৈঠকে ঢুকতে দেব না। আমরা এই ক'জন মিলে যা ঠিক করব পরে সবাইকে দিয়ে তা অনুমোদন করিয়ে নিলেই চলবে।
রুহুল	:	বেশ, বেশ। উত্তম। আপনি প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষি। আমরা রাজনীতি করি, ইমান, ঐক্য, শৃঙ্খলা ছাড়া আমাদের অন্য কোনো পুঁজি নেই।
শরীফ	:	শান্তিতে যতদূর হয়। নিশ্চয়ই। সে-পথই ভালো। নইলে আচকান পায়জামা ছেঁড়া যাবে। হাড়গোড় ভাঙ্গা যাবে। তাতে লাভ কী ?
হক্	:	শরীফ সাহেব কথাটা ঠিক বলেননি। এ-বকম চোখে দেখলে প্রতিষ্ঠানেব প্রাণশক্তি এবং চিন্তাশক্তির অপমান করা হবে। আপনি কি বলতে চান আমাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে শুধুই ব্যক্তিগত লালসা চরিতার্থ করা নিয়েই মত ও পথের বিরোধিতা ? জীবনের আদর্শগত কোনো দার্শনিক তত্ত্বই কি এদের এই দ্বন্দ্ব সংঘর্ষের মূলে অনুপ্রেরণা জোগায় না।
সকলে	:	মারহাবা! মারহাবা!
সাহেব	:	আমি আমার আদর্শের কথা ভুলিনি। আদর্শের কথা ভুললে কওমী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত থাকারও আর কোনো সার্থকতা থাকত না। তবে, আজ আপনাদের আমি একটু অনুরোধ করব।
হাওই	:	আলোচনার দ্বারা সুরাহা হয়ে যায় ভালোই। নইলে শরীফ সাহেবের ভাষায় অন্য পথ তো রয়েইছে!
সাহেব	:	ঠিক। কথাটা খুবই মামুলি, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূণ। আমাদের প্রতিষ্ঠানের এখন নবশক্তি সঞ্চারের সুযোগ হয়েছে। সময় হয়েছে এখন এব মধ্যে নয়া রক্ত সঞ্চালনের।
কোরেশী	:	কাজেই তোমার চোখে আর একবত্তি ঘুম নেই।
লম্বাকোর্তা	:	পাকিস্তানে আমরা এসব বরদাশত করব না। এ পাকিস্তান আমরা পাক সাফ রাখবই।
শরীফ	:	আলবত।
		(সাহেব ও মুন্সী সাহেব এবং তাদের দুই অনুচব দাঁড়িয়ে পড়েছে। উত্তেজনা।)
সাহেব	:	আমার কথাটা সম্পূর্ণ করতে দিন। আমি বলছিলাম, তেমনি জেগেছে আজ দেশের আওরত জাতি।
সকলে	:	মারহাবা! মারহাবা!

সাহেব : তাই বলছিলাম, পুরুষ শাখার যিনি সভাপতি হবেন, তাকে হতে হবে পুরুষ-সিংহ। কোনো বাহাত্তুরে বুড়োর কাজ নয়। প্রতিষ্ঠানের ও কওমের এই জাগ্রত নব শক্তিকে...।

(বাক্য শেষ হবার পূর্বেই মুন্সী ও তার অনুচর লাফিয়ে পড়বে সাহেব ও তার স্যাঙ্গাতের ওপর। অপটু ধস্তাধস্তি। চেয়ার ওল্টানো, আচকান-কোট টানাটানি। হ্যাট-টুপি ছেড়াঁছেঁড়ি। শরীফ এসে অম্লান বদনে কোরেশীর পক্ষ অবলম্বন করে। হক শান্তি স্থাপনের অভিনয় করবে। সাহেব ও তার চর কাবু হবে।)

কোরেশী : (হাফাতে হাঁফাতে) যতসব বদখাসলিয়ত!

সাহেব : আমি আমার এই মুষ্ঠিবদ্ধ প্রতিবাদ জানিয়ে এই গৃহ ত্যাগ করছি। জবাব কাউন্সিল মিটিং-এ দেব। কিন্তু মনে রাখবেন মিসেস ফিকরী খানমকে মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট আমি বানাব, বানাব, বানাব।

(অনুচরসহ বেগে নিষ্ক্রমণ।)

রুহুল : এ্যাঁ। হক এসব কথার অর্থ কী? এ ব্যাটার মতবাদে এ বিবর্তন কেমন করে সৃষ্টি হলো?

কোরেশী : মিসেস ফিকরী খানম! প্রতিষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তাকে লাভ করা আমাদের এক মহা সৌভাগ্য!

রুহুল : মুন্সী সাহেব, আপনি এরপর আর কোনোদিন সকাল বেলা কিছু খাবেন না। এত অল্পে এতদূর গড়াবে তা ভাবিনি।

কোরেশী : (এক গ্লাস পান করে) এইবার তুমি জবাব দাও। গতকাল পর্যন্ত সবাই ছিল মহিলা শাখার বিরোধী, আজকে দেখছি সবাই খানম-পাগল। বল, কী করেছ তুমি?

হক : আমি? আমি কিছু করিনি স্যার! আপনিই'ত চাইছিলেন ওনাকে সবাই মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট করুক। সবাই সমস্বরে এখন সে দাবি জানাচ্ছে। এতে আপনার বিচলিত হবার কোনো কারণ আমি দেখি না।

(হঠাৎ ভেতরের দিকের বন্ধ দরজার ভেতর থেকে কে যেন দড়াম দড়াম করে আঘাত করে।)

রুহুল : এ-কী? ওখানে কে? দরজাটা তুমি আবার বন্ধ করলে কখন? হা করে চোখ বড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? দরজা খুলে দাও।

(স্তম্ভিত, হতভম্ব, শঙ্কিত হক এগিয়ে দরজা খুলে দিতেই এক ধাক্কায় দরজার পাল্লা উড়িয়ে ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিপর্যস্ত বেশভূষার এক সুদর্শনা স্থির যৌবনা তরুণী।)

রুহুল : মিসেস ফিকরী খানম!!

খানম : (আর্তস্বরে) বাঁচান, আমাকে বাঁচান।

রুহুল : কে? কারা? কী হয়েছে আপনার?

হক : হঠাৎ চেঁচামেচি করে ওপর থেকে বেরিয়ে এখানে আসা আপনার উচিত

হয়নি।

খানম : আপনি ভাবছেন সবটা আমার অভিনয় ? আমি মিছামিছি আপনাদের ভয় দেখাচ্ছি। সন্দেহ থাকে তো নিজে ঘরে ঢুকে একবার জানালা দিয়ে উঁকি দিন।

রুহুল : কে ? কারা নিচে ? কী করছে তারা সেখানে ?

খানম : চোরা সিঁড়ির দরজায় তিনজন একসঙ্গে এসে হাজির। এখান থেকে বেরিয়েই বোধহয় তিনজনই সোজা ঐ দিকে রওনা হয়েছে। এতক্ষণে বোধহয় খুনাখুনি হয়ে গেছে। আমার ভয় করছে।

হক্ : আপনি গিয়ে ও-দিক্কার ঘরে বসুন। কোনো ভয় সেই। আমি দেখছি সব।

খানম : (এগুতে এগুতে) এ-রকম জানলে ওদের কক্ষণো আমি এত শরাব খেতে দিতাম না। হাতে তুলে দিলাম যখন, তখন পানির মতো চুমুক দিয়ে খেল। এখন এ-কী কাণ্ড'

(বলতে বলতে প্রস্থান।)

(হক্ ঘুরে চোরা সিঁড়ির খোঁজ নিতে এগিয়ে যাবাব সময়-)

রুহুল : দাঁড়াও। আমার কয়েকটা সোজা প্রশ্নের জবাব দিয়ে নাও।

হক : বলুন।

রুহুল : মিসেস খানম সারাবাত আমার বাড়িতে, ঐ ঘরেই ছিলেন ?

হক্ : জি।

রুহুল : মুন্সী সাহেব, বেতাল সাহেব আর মাতাল সাহেব তিনজনই যখন এক এক কবে ঐ পেছনেব দরজা দিয়ে পালিয়ে যায়, তখন তাবা যাবার পথে সবাই এক একবাব করে মিসেস খানমের সাক্ষাত লাভ করেছে'

হক্ : জি।

রুহুল : এসব তুমি কার হুকুমে কবেছ ?

হক্ : মিসেস ফিকরী খানমের। অবিকল আপনার সেই ফারসি বয়েতটার মতো। আমি আপনার গোলাম। বেগমের বাঁদী ইরানী বেটি। ফিকরী খানম আপনার কি জানি না, তবে বয়েতটা কি জানি। প্রভুকে কাবু করতে হলে গোলাম ধরো। বেগমের বেলায় বাঁদী। মিসেস ফিকরী খানম আমাকে ধরেছেন। আমি যাই। দেরি করলে পুলিশ ডাকতে হতে পারে।

(প্রস্থান)

রুহুল : কাউন্সিল মিটিং-এর আগেই এই! সামনে তক্দিরে কী লেখা আছে আল্লা মালুম'

(একটি সম্পূর্ণ বোতল উপুড় করে ঢক্ঢক করে একটানা চুমুকে শেষ করে। ঠক করে বোতলটা রাখে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ধপ্ করে নিজেও মাটিতে বসে পড়ে।)

[যবনিকা]

গতকাল ঈদ ছিল

চরিত্র

মৌলভি মোখছেদ আলী : উচ্চপদস্থ সরকাবি কর্মচারী

নওয়াব মিয়া : দূব সম্পর্কেব কোনো ভাই-এর ছেলে

খোরশেদ আলী : বড় ছেলে। বিজ্ঞানের ছাত্র

খসরু : জায়গির থাকিয়া পড়ে

বেগম সাহেবা : আম্মাজান

সাহারা : বড় মেয়ে

আয়েষা : কলেজের ছাত্রী

আমিনা : দশম শ্রেণীর ছাত্রী

প্রথম দৃশ্য

মোখছেদ আলী সাহেবের বাড়ি, খসরুর ঘর।

আসবাব : পড়ার টেবিল। শুইবার চৌকি। দুই একটা চেয়ার।

দিন : ঈদের আগের দিন

ক্ষণ : আছরের নামাজের পর

[পর্দা উঠিলে দেখা যাইতেছে খসরু টেবিলেব উপর পা তুলিয়া একটা অতিকায় বই নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে পড়িতেছে। হাতে কম্পাস এবং বিচিত্র নক্সায় পরিপূর্ণ কতগুলি কাগজ সামনে। ঠোঁটে সিগাবেট। পেছনের বন্ধ দরজা ঠেলিয়া চুপিচুপি... প্রবেশ করিল আমিনা। হাতে খাতা।]

আমিনা : (চৌকিতে বসিয়া গম্ভীর কণ্ঠে) মাস্টার সাহেব !

খসরু : বলুন।

আমিনা : মুখটা আমার দিকে ঘুরিয়ে উত্তর দিলেও এমন কিছু ক্ষয়ে যাচ্ছে না !

খসরু : মুখ না ঘুরিয়ে যদি উত্তর দেয়া যায়, তাহলে কষ্ট কবে লাভ কী ? বলুন।

আমিনা : ট্রানসলেশন দেখে দিন।

খসরু : কী লিখেছেন পড়ে যান, এতে রিডিংটাও অভ্যেস হবে।

আমিনা : (দাঁত কিড়মিড় করে) মানুষের মধ্যে যারা জানোয়ার কেবল...

খসরু : Only those men who are animals—

আমিনা : কুত্তা !

খসরু : Dog না, বরঞ্চ লিখুন Cat

(আমিনা সজোরে খাতাটা খসরুর মস্তকে নিক্ষেপ করতঃ লাফাইয়া টেবিলের উপর চড়িয়া বসিল।)

খসরু : (বই নামাইয়া) মুরব্বির সঙ্গে এমনি করে ব্যবহার করতে হয় ? এটা কি কোনো ভদ্রমহিলাব মতো আচরণ হলো ?

আমিনা : খসরু ভাই।

খসরু : কী আনু ?

আমিনা : আমার নাম আনু নয়।

খসরু : তাহলে কি তোকে 'আমি' বলে ডাকব ?

আমিনা : আমার নাম আমি-ও নয়, আনুও নয়। আমার নাম আমিনা। আর আমার সঙ্গে সব সময় তুই তুকারি করে কথা বলবেন না।

খসরু : তাতো বলিই না। তোর আব্বা আম্মার সামনেও তোকে তুমি সম্মান

দিয়েই ডাকি।

আমিনা : আব্বা আম্মাকে মিষ্টি কথায় অত ভুলাতে পেরেছেন বলে তাদের অত বোকাও ভাববেন না। আর তাঁরা আপনাকে বড্ড বেশি আদর করেন বলে ভাববেন না যে তার দাবিতে আপনি যা খুশি তা করতে পারেন।

খসরু : যেমন ?

আমিনা : তুমি—

খসরু : কী বললেন ?

আমিনা : ঠাট্টা রাখো খসরু ভাই। নামাজ পড়বার সময় তুমি অমন করে পেছন থেকে আমার মাথার কাপড় ফেলে দিয়ে চলে এলে কেন ?

খসরু : এমনিই তো দেখতে যা চেহারা, তার ওপর আবার মাথায় কাপড় দেয়া হয়! খোদা দেখলে বলত কী ? হাঁ!

আমিনা : খসরু ভাই ! (ধমকে)

খসরু : কেন খামকা ঝগড়া করতে..... বল্‌তো ? তোর ভালোর জন্যে একটা কাজ করলাম— তুই-ই শেষে কোমর বেঁধে মারতে এলি আমায়!

(আমিনা স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। খসরু সিগারেটটাকে ভাল করে চেপে ধরে ফুঁকে)

কিছু মনে করিস না আনু একটা কথা বলি তোকে। তোর ছলছুতোগুলো এত সরল যে অনেক দূর থেকেই ওর ফাঁকা ছেঁদাগুলো পরিষ্কার দেখা যায়। গোধূলি লগনে আমার ঘরে ঢুকলি, ভাবটা এই যেন, কিছু নয় ট্রান্সলেশন করবি বলে এলি। অথচ ফুলো কণ্ঠনালিতে মুখরা কুঁদুলী মেয়ে নীল শিরায় বগবগ করছে। তারপর সত্যি সত্যি যখন ঝগড়া করতে নামলি তখন দেখি ভেতর থেকে অশান্ত, অবাধ্য দুষ্টুবোকা মন কেবল উঁকিঝুঁকি দেয়। এই চোখটা একটু নামা না, এফোঁড় ওফোঁড় করে দিবি নাকি ?

(আচমকা আমিনা টেবিল থেকে লাফিয়ে পড়ে বড় বইটা খসরুর হাতে ঠুকে দিলো। তারপর ক্ষিপ্র হস্তে ওর মুখের সিগারেটটা টান দিয়ে নিয়ে, সুড়ুৎ করে চৌকিটার নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। হতভম্ব খসরুর অস্ফুট অবাকধ্বনি উচ্চারিত হবার আগেই—)

আম্মাজান : তোমায় কতবার বারণ করেছি, খসরু। অতো পড়ো না, পড়ো না, চোখ দুটো কি একেবারে খেয়ে ফেলতে চাও!

খসরু : পড়ছিলাম কোথায় খালাম্মা, আমি তো—

আম্মাজান : হ্যা হ্যাঁ কথা বলছিলে বলে মনে হলো যেন। কার সঙ্গে কথা বলছিলে, এখানে ছিল নাকি কেউ ? কী বললে, আমি আসার আগেই চলে গেছে ?

খসরু : চলে যাবে কে আবার ? ছিলই না কেউ এখানে। আমি তো আপন মনেই এমনি বকছিলাম

আম্মাজান : পাগল ছেলে আমার! (যেতে যেতে) আচ্ছা ইফতার করে ছাদে যাস, সবই মিলে চাঁদ দেখব। (প্রস্থান)

আমিনা : (বেরুতে বেরুতে) কী নোংরা তোমার চৌকির নিচটা! পোড়া সিগারেট দেশলাইর কাঠি যত রাজ্যের জঞ্জাল!

খসরু : ওটা আস্তাকুঁড় হলেই বা এমন কী এসে যায়। আমায় তো আর চৌকিব নিচে শুতে হয় না। আমি সাধারণত ওপরেই ঘুমোই।

আমিনা : (আঙুল চুষতে চুষতে) স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ!

খসরু : আহা ? বড়াই কত! পালালি তো নিজের ভয়ে, ভাবখানা এই যেন আমায় বাঁচাতে।

আমিনা : যা তা বলো না খসরু ভাই, ভয় কীসের ?

খসরু : কী কচি খুকিরে! টেবিলের ওপর, আমার বুকের কাছে বসে, আবছা আলো, দরজা ভেজানো—ওকী আঙুল চুষছিস কেন, ইফ্‌তিরি হচ্ছে নাকি ?

আমিনা : জ্বালা করছে যে !

খসরু : কী হলো, কিছুতে—

আমিনা : কিছুতে নয়, তাড়াতাড়ি কবে তোমার সিগারেট নিভাতে যেয়েই তো পুড়ে গেল। চৌকির নিচ থেকে ধোঁয়া উঠলে তোমাব বোজা রাখার মুখোশটা খুব আঁট থাকত না ?

খসরু : রোজার তাঁনত তোর জন্যেই করি আমি। নইলে খালু খালাম্মা বিরূপ হবেন সে আশঙ্কা যে আমাব চেয়ে আমার 'আমিব'ই বেশি—

আমনি : খসরু ভাই, জ্বলছে যে !

খসরু : জ্বলছে ? দেখি, তাই তো (হাত নিজের মুঠোব মধ্যে পুরে) আবে কী ভয়ঙ্কব লাল হয়ে উঠছে। ফোস্কা পড়বে নাকি ?

আমিনা : যাও তোমাব আর ফাজলেমিব দবকাব নেই, ছেড়ে দাও আমার হাত। অসভ্য, বেদরদি কোথাকাব! ছেড়ে দাও বলছি- –

খসরু : তাই তো কী করা যায় এখন। তুই তো আব'ব বোজা, তোর তো চোষা ঠিক হবে না ! আর তোব মুখে পোরা এঁটো হাত আমিই বা কী কবে—

আমিনা : ভিক্ষে চাইছি, দেবে এবাব ছেড়ে ?

খসরু : এতো ভয় ? দেখলই বা কেউ, কী হবে। হঠাৎ নওয়াব মিয়া এখন এঘবে এলেতো বেশ মজাই হয।

আমিনা : না না খসরু ভাই সত্যি আমার ভয করছে। নওয়াব মিয়া টের পেলে আব্বা আম্মাকে এমন কবে লাগাবে যে তোমার আর এখানে এক মুহূর্তও টিকতে হবে না।

খসরু : এত প্রতাপ তাব! গত চার বছরেব খালু খালাম্মার সব অকৃত্রিম ভালবাসা উবে যাবে ?

আমিনা : স-ব !

খসরু . তাও মন্দ নয়, একবার পরীক্ষা করতে দোষ কি ? (বাব হতে একটা অস্পষ্ট শব্দ) ঐ যে নাম করতেই বোধ হয় এসে হাজির হলো।

আমিনা · খসরু ভাই মরবে, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, বলছি, ছেড়ে দাও— (খট খট)

খসরু · (সিঁড়ির ওপর থেকে কার নামার শব্দ) তোর আঙুলগুলো আরেকটু মুখের কাছে তুলি ?

আমিনা : (কান পেতে কী শোনে)

(ভ্রু দুটো একটু কুঁচকে) নাও আরো কাছে তুলে নাও।

খসরু : হঠাৎ এতো সাহস যে ?

আমিনা . আয়েষা আপা, আয়েষা আপা তোমার ঘরে আসছে।

খসরু : (চমকে— ভয়ার্ত— হাত ছেড়ে দেয়) আয়েষা!

আমিনা · হ্যাঁ আয়েষা আপা, তোমার ঘরে আয়েষা আপা এমন সময় কেন আসে ?

খসরু · আনু কী বকছিস ? তাড়াতাড়ি লুকো কোথাও, যা চোখ আবার আয়েষার—

আমিনা · না আমি লুকোব না। যা করছিলে আমার হাত ধরে তাই করো- আয়েষা আপা দেখুক—

খসরু : আনু!

আমিনা : দেখলে পরে তোমার ঘরে এমন সময় কোনোদিন—

খসরু : বড্ড ছেলেমানুষী হচ্ছে আনু! তোর নিজের জন্যে না হলেও, অন্তত আমার জন্য কর-উহ্-এসে পড়ল বলে বুঝি। তাড়াতাড়ি ঐ চৌকিটার নিচে। হয়েছে—বাস্। ফোঁস ফোঁস করিসনে যেন। নিঃশ্বেস বন্ধ করে থাকিস— যা কান আবার ওর!

(আমিনাকে চৌকির নিচে ঠেলে উপুড় হয়ে ওর শাড়ির প্রান্তদেশ গুঁজে শেষ করে দাঁড়াতে যাবে এমন সময়..)

আয়েষা : (ঘরে ঢুকে) ওকী উপুড় হয়ে কী করছিলেন মাস্টার সাহেব ? হাঁপাচ্ছেন কেন অত ?

খসরু : একটা ইঁদুর ভয়ঙ্কর জ্বালাচ্ছিল।

আয়েষা : ইঁদুর ?

খসরু : হ্যাঁ! আমি বসে বই পড়ছিলাম তা ব্যাটার একদম নজরেই এলো না। লাট সাহেবের মতো টেবিলের নিচে বিছানার ওপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছিল। বেজায় বেয়াদপ ইঁদুর!

আয়েষা : আশ্চর্য তো !

খসরু : বলো না আর ! আজ ব্যাটাকে মেরেছিলাম আর কী । একটুর জন্যে বেঁচে গেছে, চৌকির নিচে পালিয়ে গেল।

আয়েষা : বলেন কী ? এখনো আছে নাকি ?

খসরু : বোধ হয়।

আয়েষা : দাঁড়ান আমি তাহলে আমার বেড়ালটাকে ধরে নিয়ে আসি, কী বলেন ?

খসরু : সঙ্গে বাবুর্চিকেও বলে আসবেন একটা লাঠি নিয়ে আসতে, ব্যাটাকে আজ আমি খতম করবই।

আয়েষা : হ্যাঁ তাও মন্দ হবে না। আপনি দরজাটা ভাল করে এঁটে দিয়ে ওই নর্দমাটার কাছে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমি এক্ষুণি আসছি। ওকী ? কী একটা শব্দ হলো যেন ?

(আয়েষা বন্ধ দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়ায় আর খসরু সামনে)

খসরু : শব্দ ?

আয়েষা : হ্যাঁ চুষনির মতো।

খসরু : ইঁদুরের ডাক বোধহয়, ব্যাটা ভয় পেয়েছে তাহলে। আলোটা জ্বালিয়ে দেখব না কি ?

আয়েষা : (তাড়াতাড়ি হাত ধরে) না না আলো জ্বালাবেন না। হঠাৎ বেশি আলো দেখলে লাফালাফি করে পালিয়ে যেতে পারে। ওটা কী, ফোঁস করে কি একটা শব্দ হলো যেন ?

খসরু : ফোঁস করে? সাপ নাকি ?

আয়েষা : ওমা ! সাপ ! (ভয়ে জড়সড় হয়ে খসরুর বুক ঘেঁসে দাড়ায়। হঠাৎ হেসে ওঠে) কী ভীতু আপনি ! ফোঁস একটুখানি শব্দ শুনেই ভয়ে কাঁপছেন ? দেখব নাকি নিচু হয়ে ওটা কি সাপ না ব্যাঙ ?

খসরু : না, না, শেষে কী বিপদ হয়ে পড়বে কে জানে ?

আয়েষা : আপনার জন্যে একটুখানি বিপদে না হয় শখ করেই পড়লাম।

খসরু : তাছাড়া তোমার অমন দামি শাড়িটা আমার মেঝের ময়লা লেগে কলঙ্কিত হয়ে উঠবে যে !

আয়েষা : আপনার ঘরে আসবার সময় কলঙ্কের ভয় আমার থাকে না।

(বিড়বিড় করে বলতে বলতে গুঁজো হচ্ছিল)

খসরু : (বাধা দিয়ে হাত ধরে) কলঙ্কের ভয় তোমার না থাকলেও আমার আছে, কাজেই শাড়িটা নষ্ট করতে তোমায় আমি দেবো না।

আয়েষা : চুড়িগুলো ছেড়ে দিয়ে আরেকটু উপরে ধরুন।

সাহারা : (নেপথ্যে) খসরু ঘরে আছ ?

আয়েষা : আস্তে আপা। আস্তে চুপি চুপি কথা বলো!

সাহারা : (মুখে চমকে ওঠা ভাব, কণ্ঠস্বর সপ্রতিভ) চুপি চুপি কেন ? কী হয়েছে ? খসরু ঘরে নেই ? দরজাটা খোল না ?

আয়েষা : (খসরুর হাত ছাড়িয়ে দেয় অথবা খসরুই ছেড়ে নেয়) খুলছি। দরজাটা খুলুন না খসরু ভাই। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ? খুব সাবধানে কিন্তু

পালিয়ে না যায় যেন ?

খসরু : (সামলে নিয়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব সাবধানে ঢুকো আপা। অল্প একটু ফাঁক করছি আমি। পা'টা গলিয়ে দাও ওর মধ্যে।

আয়েষা : ঢুকে পড় না শুট করে, পালিয়ে যাবে যে!

সাহারা : (প্রথমে জামদানি শাড়িব একটুখানি প্রান্ত, পরে পা, তার পেছন সমস্ত শবীরে ঘরে প্রবেশ কবতে করতে— সন্ত্রস্ত) কী, কী পাগলামি ?

খসরু : ইঁদুর—

সাহাবা : ইঁদুর ? ওরে বাবা আমার পায়েব ওপর ওটা কী লাগল !

(এবং পর-মুহূর্তে একটা ভয়ার্ত চিৎকার করে দু'লাফে সাহারা একেবারে খসরুব চৌকিব ওপর আসীন। দুর্বল চৌকি একটুখানি আর্তনাদ করে উঠল। দরজাটা হাঁ করে।)

খসরু : যাঃ ব্যাটা পালিয়ে গেল !

আয়েষা : আপনাব যত অনাচ্ছিষ্টি ভয় !

সাহাবা : খসরু এখনও চৌকিটা বদলে নাওনি ? যা নড়বড়ে, আমার কিন্তু সত্যি ভয় করছে। দু'দিনের জন্যে বেড়াতে এসে শেষে একটা কিছু হয়ে না যায়!

আয়েষা : চৌকির আর দোষ কী, দিন দিন যা বহবে বাড়ছ !

(এক হাতে একটা ছুরি, অন্য হাতে একটা ফরসেপ নিয়ে দৌড়ে ঘবে ঢুকে খোরশেদ)

খোবশেদ : কী কী হয়েছে অত গণ্ডগোল কীসেব ?

আয়েষা : তোমাব আব খবরদারি করে দরকাব নেই।

খোরশেদ : চুপ কর্ আয়েষা। হট্টগোল করে করে আমার সমস্ত একস্পেরিমেন্টটা নষ্ট করে দিলি। আর এই (আয়েষাকে) অত গয়না পরে থাকিস কেন ? কী বিকৃত রুচি মেয়েগুলোর— যেখানে সেখানে ছেঁদা করে সোনামুক্তা গেঁথে বাখে— কী অপব্যয়! (আয়েষা পরম তাচ্ছিল্যে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়) আব খসরু বুঝলে কী আশ্চর্য ! খোদা ওদের এত মাংস দিয়েছে অথচ এতটুকু প্রাণ দেয়নি, এতটুকুন বুদ্ধি দেয়নি ? আরে শরীরে ফাঁকা জায়গা তো একটাই আছে, বাইবেব জিনিস দিয়ে যেটা ভরাট করা যায়— সেটা হচ্ছে পেট। সেই হাজাব হাজার শূন্য গহ্বর অভুক্ত থেকে চারদিকে কাতরাচ্ছে। আর এরা কিনা, এখনও শরীরের নানা স্থানে বাঁকা করে, ভাঁজ করে, গর্ত করে তাবপর সেগুলো মণিমুক্তো দিয়ে ভরাট করছে। পিশাচ! পিশাচ!

খসরু : দাদা ওকথা থাক এখন।

খোরশেদ : আচ্ছা থাক থাক। সে কথা থাক। কিন্তু Sciatic nerve ছিঁড়ে গেল যে, আমি এখন আব একটা ব্যাঙ কোথায় পাই!

সাহাবা : তুমি আবার এখন ব্যাঙ খুঁজতে আরম্ভ করবে নাকি। ওসব হবে না দাদা, ত.র চেয়ে ছাদে চলো সবাই মিলে ঈদের চাঁদ..

খোরশেদ : ঈদ ! হুম! ঈদ আতর আর খানা না ! পিশাচ, পিশাচ। যাক ওসব কথা, থাক। খসরু তোমার ঘরে ব্যাঙ নেই ?

খসরু : ব্যাঙ না'তো।

খোরশেদ : বড় মুশকিল হলো। আবার তাহলে একবার ফিরে ওদের বাড়িতে যেতে হবে দেখছি... সন্ধেও হয়ে এল। (ফিরে দাঁড়ায়)

সাহাবা : ব্যাঙ নেই কেন... দাদা আবার এখন বেরুবে। সারারাত হয়তো তাহলে আর ফিরবেই না। তোমার এখানে ইঁদুর আছে আর ব্যাঙ নেই । খুঁজে দেখ না একটু।

খোরশেদ : (ঘুরে দাঁড়ায়) ইঁদুর ছিল। তাহলে বোধহয় ব্যাঙও আছে। বুঝলে খসরু ইঁদুরের রোগ ধ্বংস করতে। তুমি তো নিজের চোখেই দেখেছ দু'দুটো লোক ১ নং বস্তিতে মারা গেল। ভয়ঙ্কর ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে বোধ হয় এ বছরও আর বেশি দেরি নেই। ব্যাঙ-লালা দিয়ে একটা প্রতিকার –থাক থাক ওসব তুমি ঠিক বুঝবে না। তোমার চৌকির নিচে-টিচে এক আধটা-

(নিচু হয়ে দেখতে যাবে—)

খসরু : (বাধা দিয়ে) থাক থাক আপনি কষ্ট করবেন না, আমিই দেখছি আপনি বসুন আপনি চৌকির ওপর বসুন— হ্যাঁ ঠিক হয়ে বসুন।

(জোর করে বসিয়ে দেয়, চৌকিটা কঁকিয়ে ওঠে)।

(খসরু উপুড় হয়ে খুঁজছে)

খোরশেদ : দেখছ এক আধটা ?

খসরু : না, তো।

সাহারা : তুমি অন্ধকারে কী করে দেখবে ?

খোরশেদ : তাই তো দাঁড়াও আমি আলোটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

(খসরু বাধা দেবার আগেই আলো জ্বলল)

দাঁড়াও আমিও একসাথে খুঁজছি।

খসরু : না না এই যে, আমি দেখছি কিছু।

(আড়চোখে সাহাবাকে দেখে)

খোরশেদ পেলে, পেয়েছ ব্যাঙ ?

খসরু হ্যাঁ, না, মানে ইয়ে ওটা খেয়ে ফেলেছে সব

সাহাবা ও, মাগো কীসে ?

খোরশেদ [illegible] খেয়ে ফেলেছে

খসরু [illegible] খানে খাচ্ছে

সাহাবা [illegible]

খোরশেদ : দেখি তো।

(বলে উবু হয়ে ঝুঁকে পড়ে)—

তাই তো ' এ দেখি একটা বস্তার মতো দেখাচ্ছে। দেব নাকি ছুরি দিয়ে একটা খোঁচা, আমার ব্যাঙ খেল।

সাহাবা : আ উ উ !

খসরু : না, না, দেবেন না, অমন কাজটি করবেন না যেন।

খোবশেদ : (আচমকা হো হো শব্দে হাসতে থাকে) হা-হা-হা— পেত্নীগুলোও দেখতে এতো বিচ্ছিরি— হা-হা-হা- (দরজা পথে পা বাড়ায়) হা হা হা—

সাহারা : দাদা দাদা আমায় একলা ফেলে যেও না বলছি— যেও না—

(এক লাফে, দুর্বল চৌকিটাকে একটা নির্মম আঘাত হেনে, খোরশেদের হাত ধরে জোরে বেরিয়ে যায়।—)

আমিনা : (গরগর) কুত্-তা (বেরুতে বেরুতে)

খসরু : ভালো হবে না বলছি, গাল দিলে ভালো হবে না বলছি আনু'

আমিনা : (সম্পূর্ণ বেরিয়ে) কুত্তা, কুত্তা, কুত্তা।

[যবনিকা]

ঢাক

চরিত্র

ফুফু আম্মা
রেজিনা
হায়দর সাহেব (চাচাজান)
প্রফেসর
খালেদ
আমিন

শব্দাবেষ্টনী : খুব করুণ এবং ক্ষীণ একটি সুরের রেশকে পেছনে রেখে মাঝরাতে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে।

কণ্ঠস্বর : আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ।

রেজিনা : কেন ? আল্লাহ্ এই শাস্তি কেন ? কোন অপরাধে ? খালেদ ভাই তো কোনো গুনাহ্ করেনি! আল্লাহ্ চাচাজানকে সুমতি দাও, সুমতি দাও! চাচাজান কেন সব জেনেশুনে ভেঙে চুরে খানখান করে দিতে চাইছেন ? কেন ? কেন ? কোন স্বার্থে ? আমাকে খালেদ ভাইর হাতে সঁপে দিতে চাচাজানের এত আপত্তি কীসের! আল্লাহ্ আমায় শক্তি দাও, শক্তি দাও, বুদ্ধি দাও, আলো দাও—

খালেদ : অন্ধকার ঘরে ডুকরে ডুকরে কাঁদলেই তো আর আলো জ্বলে উঠবে না রেজিনা!

রেজিনা : কে ? কে ? খালেদ ভাই! তুমি কখন এলে ? এ ঘরে ঢুকলে কখন ?

খালেদ : অ-নে-ক-খ-ন! সে-ই যখন থেকে তোমার একটার পর একটা 'কেন' অন্ধকারে অনর্থক ফোঁস ফোঁস করে ছুটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল— সেই তখন থেকে।

রেজিনা : আমি চলে আসার পর চাচা তোমাকে আর কিছু বলেননি ?

খালেদ : আমাদের মানে তোমাদের— খান্দানের পবিত্রতা, তার মর্যাদা, তার অতীত গৌরব এ স-ব তিনি আমায় নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিলেন। তিন তিনবার আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন— তোমাকে বিয়ে করার আজগুবে কল্পনা আমি যেন আমার মন থেকে মুছে ফেলি— চিরদিনের জন্যে!

রেজিনা : তুমি কী জবাব দিলে ?

খালেদ : তোমার চাচাজানকে বললাম আমি বাঁদির সন্তান, কিন্তু আপনার মরহুম বড় ভাই, এ খান্দানের অতীত মুকুট, এ জমিদারির প্রধান মালিক— তিনিই ছিলেন আমার জন্মদাতা।

রেজিনা : এসব কথা আমি শুনতে চাই না।

খালেদ : কোনো দিন শুনতে চাওনি বলেই আজ অন্ধকারে কেঁদে মরছো। চাচাকে বললাম আমার জন্মের সময়েই আমার মা'র মৃত্যু হয় শুনেছি। আপনার বড় ভাইও তার কিছুকাল পর ইন্তেকাল করেন। শুনেছি মরবার সময়েও তিনি ছিলেন বিপত্নীক এবং নিঃসন্তান। আমার দাইমার মুখে শুনতাম আমার মা পড়ালেখা জানতেন, নম্রস্বভাবা মেয়ে ছিলেন— শুধু বাবাকে যখন ভালবাসেন তখনই একবার জ্বলে উঠেছিলেন লকলক করে— বাবাও নাকি কোনোদিন মাকে অশ্রদ্ধা করেনি। এ বাড়ির অন্য কাউকেও করতে দেয়নি।

রেজিনা : যে বিরাট সম্পত্তি আজ চাচা দখল করে আছেন সামান্য একটু সামাজিক আইনের পরিবর্তে আজ তার একচ্ছত্র মালিক হতে পারতে তুমি! কোন অধিকারে চাচা আজ তোমায় কাঙ্গাল করে রাখতে চায়? কোন নীতিতে চাচা আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়? জবাব দাও, খালেদ জবাব দাও, আমাকে!

খালেদ : [চাপা বিকৃত হাসি] তোমার চাচা কত উদার! পঁচিশ বছর ধরে আমায় খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে তুলেছেন! আমার পেছনে কত টাকা ঢেলেছেন! কী অধিকার ছিল আমার! তবু আমার খাঁই মিটল না!

রেজিনা : [ফোঁপানি] খালেদ!

খালেদ : আগামীকাল আমি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবো। তবে যাবার আগে আমাকে পঁচিশ বছর ধরে এই অভিশপ্ত বাড়িতে রেখেছেন বলে একটা ধন্যবাদও জানিয়ে দিয়ে যাব। আর—

রেজিনা : আর আ-মি?

[কে একটা লোক শিস দিতে দিতে আসছে।]

খালেদ : কে যেন এই ঘরের দিকেই আসছে।

[শিসটা নিকটবর্তী হবে এবং একটা দরজার সাথে ধাক্কা লেগে থেমে যাবে।]

আমিন : বাড়ি নয়তো একটা দুর্গ যেন! বারান্দাগুলো সুড়ঙ্গের মতো! আঁকাবাঁকা, উঁচু-নিচু। তকলিফ করবে তবু একটু মেরামত হবে না! উহ! যা একটা ধাক্কা খেলাম দরজাটার সঙ্গে, কপালের কোনটা ভেঙেই গেছে বোধহয়। দরজাগুলোরও যা ছিরি! সব পার্বত্যগুহা, গুহা! একেকটা দরজা আকাশের সমান উঁচু হাওদা চাপান হাতির সড়ক যেন! দরজা কী! ধাক্কালে নড়ে না, নড়ে উঠলে বাজ পড়তে থাকে!

খালেদ : সাবধানে ঘরে ঢুকো আমিন! দাঁড়াও আমি আলোটা জ্বেলে দিচ্ছি।

আমিন : আরে খালেদ ভাই যে! এ-কী রেজিনা আপাও দেখছি। তা অন্ধকারে ওরকম মমির মতো থম ধরে বসে রয়েছ কেন? তোমাদেরও যা কান্ড, এখনো কাচের ঝালরে মোম না গলালে তোমাদের চলে না। বাতাসও আর সব সময়ে মেজাজ বুঝে চলে না, যে অতবড় হা করা খোলা দরজা পেয়েও হু-হু করে ছুটে এসে ঝাপটা দিয়ে আলো নিভিয়ে দেবে না?

রেজিনা : হঠাৎ এখন কোত্থেকে এলে?

আমিন : অফিস থেকে।

রেজিনা : অফিস! এই গ্রামে? ছুটির পর কলেজে ফিরবে না নাকি আর? মতলব কী? অফিস কীসের?

আমিন : যাত্রাদলের। ওরা আমায় চাকরি দিয়েছে রেজিনা আপা।

খালেদ : তোমার আব্বা সেদিন চাচাজানের কাছে নালিশ করছিলেন— তুমি নাকি শহরে থেকে একদম বখে গেছ। কলেজ ফাঁকি দিয়ে কেবল গানবাজনা করে বেড়াও! গ্রামে এসে এখন যাত্রাদলের পালা শুরু করবে নাকি ?

আমিন : বাব্বা! অভিনয়! এ কম্মটি আমায় দিয়ে কোনো দিন হবে না। এই হপ্তা থেকে আমি ওদের একজন আবহসঙ্গীত পরিচালক— চারকোণা দুটো চৌকির ওপর রণক্ষেত্রের আবেষ্টনী তো শুধু চিৎকারেই প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে না ?

রেজিনা : কোন যন্ত্র তুমি বাজাবে ঠিক করেছ ? তোমার সেতার কি গীটার কিম্বা বেহালা ঐ যাত্রাদলের গগনভেদী হুঙ্কারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারবে তো ?

আমিন : ম্যানেজারকে এইমাত্র বাজিয়ে শুনিয়ে এলাম। ব্যাটা একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেছে। তোমরা সব শুনতে যেও কিন্তু! আমি ঢাক বাজাব!

রেজিনা : ঢাক ?

খালেদ : বাঁয়া নয়, তবলা নয়, খোল নয়, ঢোল নয়— একেবারে ঢাক-ই বাজাবে তুমি!

আমিন : তোমরা হাসছ, না ? বিশ্বেসই হচ্ছে না যে ঢাকের বাদ্যেও সাধনার প্রয়োজন হয়। বাজাতে জানলে ঢাকেও কালোয়াতি করা যায়। খুব হাসছ না, ভাবছ আমি মশ্‌করা করছি! হাতের কাছে একটা থাকলে দুটো কাঠি মেরে এখনি বুঝিয়ে দিতাম, আমার হাতের গুণ আর ঢাকের মাহাত্ম্য!

খালেদ : ঐ তো তোমার মাথার ওপর দেয়ালের গায়ে একটা ঝুলছে— একবার দেখবে পরখ করে ?

আমিন : আরে! ওটা কোনোদিন আমার নজরেই পড়েনি। এ যে একেবারে বনেদি ঢাক, বেশ মোটাসোটা জবড়জং চেহারা দেখছি! অতবড় ঢ্যাপুরে যন্ত্রে সুর তুলতে অসুরের শক্তি দরকার হতো নিশ্চয়ই। খালেদ ভাই তুমি একটু হাত দাও তো ওটাকে দেয়াল থেকে নামিয়ে নি আগে।

রেজিনা : আহাহা কী করছ তোমরা! ও ঢাকটা থাকুক না ওখানে। ওসব উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পুরনো পারিবারিক সম্পদ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভালো। কখন কোনটা ছুঁলে কী হয়ে যায় কে জানে— চাচাজান শেষে মিছেমিছি একটা রাগারাগি করে বসবেন! ও ঢাকটা ছেড়ে দাও আমিন!

আমিন : অসম্ভব! এতবড় ঢাক আমি কোনোদিন বাজাইনি। কী ভাবী খোল আর কড়া পর্দা! আমি হলপ করে বলতে পারি রেজিনা আপা, এই ঢাকের বোলে দরিয়াপুরের এই তিন মহলা জমিদারি কুঠি কড়িবরগা সুদ্ধ ছন্দে ছন্দে নাচতে শুরু করে দেবে।— এই— হ্যাঁ— এই— একটু, নিচে ধরুন খালেদ ভাই-এই-এই-এই ব্যাস-রাখুন, রাখুন মেঝের উপর এবার। ইস্ কতদিনের ঢাক এটা রেজিনা বু ? আংটিগুলোতে সুদ্ধ মর্চে ধরে গেছে।

খালেদ : এখানে বসেই বাজাতে শুরু করবে নাকি ?

আমিন : নিশ্চয়ই! এত কষ্ট করে ওটাকে নামালাম আর দুটো ঘা না মেরেই ওটাকে ছেড়ে দেব ভেবেছেন ? ঢাকের শব্দকম্পন থমথমে অন্ধকারে গুমগুম করে জমবে বেশি। এক ফুঁয়ে আলোটা নিভিয়ে ফেলুন তো খালেদ ভাই!

খালেদ : এই নাও, দিলাম।

রেজিনা : আমার কী রকম ভয় করছে! তুমি আমাব হাত ধবে থাক শক্ত করে।

সঙ্গীত ঝংকার তো থাকবেই	[ঢাক্ বাজবে। দুটো ভয়ঙ্কর গম্ভীব গুমগুম ধ্বনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটু দূর থেকে একটা তীব্র, ভয়ার্ত কণ্ঠেব আর্তনাদ। সেই "Shreik" "কে—কোন্‌দিক থেকে" এ বকম প্রশ্ন দিয়েও শুরু হতে পাবে।]

[কয়েক মুহূর্তের আকস্মিক স্তব্ধতা।]

আমিন : কে ? চিৎকার করে উঠল কে ?

খালেদ : দরজার ওপাশে কে যেন হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল মনে হলো।

রেজিনা : আলো, শিগগিরি আলোটা জ্বালো! ফুফু আম্মার চিৎকার ওটা, কিছু একটা হয়েছে নিশ্চই। আমার ভয় করছে।

আমিন : আলোটা আমার হাতে দিন, আমি বাব হয়ে দেখছি কী হলো। আপনাবা ভেতরেই থাকুন।

[একটু দূরে গিয়ে]

এ-কী ? রেজিনা আপা, তাড়াতাড়ি এক গ্লাস পানি নিয়ে আসুন। দরজার কাছে আপনার ফুপু আম্মা অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। মুখ দিয়ে কী রকম ফেনা বার হচ্ছে, তাড়াতাড়ি করুন।

[ক্ষণিক বিরতিসূচক সঙ্গীত-চিহ্ন। মৃদু, পরিচ্ছন্ন এবং সংযত গুঞ্জন, অস্ফুট উক্তি ইত্যাদি। রেজিনা, আমিন ও খালেদের মধ্যে— 'মাথার নিচে আরেকটা বালিশ দিন খালেদ ভাই', 'মুখে আবো একটু পানির ছিটে দেব ?', 'এই তো চোখ মেলেছেন, জ্ঞান ফিরে আসছে'— ইত্যাদি]

ফুফু : আ-মি কো-থা-য় ? তোমরা আমায় নিয়ে এ ঘরে, কী করছ ? আমার কী হয়েছে ?

আমিন : এ ঘরের দরজার কাছে আপনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলেন, আমরা—

ফুফু : ওহ্ ওহ্! হ্যাঁ মনে পড়েছে। ঢাক! ঐ তো ! কে ? কে? কে ঐ ঢাক নামিয়েছে ? তোমরা কেউ উত্তর দিচ্ছ না কেন ? ওই ঢাক নামিয়েছে কে ? ও ঢাক বাজাল কে ? বল, বল, বল।

রেজিনা : আপনার শরীর এখনও দুর্বল, আপনি অত উত্তেজিত হবেন না ফুফু আম্মা।

ফুফু : থাক্ থাক্। আমায় আর ধরে তুলতে হবে না। আমি ঠিক হয়ে গেছি।

ফুফু : ঐ ঢাক স্পর্শ করার মতো সাহস তোমরা কোত্থেকে পেলে ? ঐ ঢাকের চামড়ার লালচে পর্দাটা কীসের তৈরি জান ?

আমিন : আপনার কথা শুনে কেবল অবাকই হচ্ছি, বুঝতে পারছি না কিছু। আপনি হঠাৎ ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠলেন কেন ?

ফুফু : ঐ ঢাকের শব্দ শুনে; মানুষের চামড়ায় তৈরি ঐ ঢাক।

খালেদ : কী বলছেন আপনি ?

আমিন : রেজিনা আপা, এক বাটি গরম দুধ নিয়ে আসুন, জলদি করে। ওনার চোখ এখনো কী রকম ঘোলাটে দেখেছেন, কথাবার্তা খুব গোছালো মনে হচ্ছে না।

ফুফু : ছেলেমানুষি করো না। আমি এখন আব অজ্ঞান নই। যা বলছি, জেনে শুনে ভালো করে ভেবেই বলছি। তোমরা আজকালকার ছেলে, লেখাপড়া শিখে অনেক কিছুকেই অস্বীকার করতে শিখেছ। কথায় কথায় তোমাদের বিজ্ঞানের বাহাদুরি। কিন্তু ঐ ঢাকটা মানুষের গায়ের চামড়ায় তৈরি, এটা সত্য কথা। এ পরিবারের ইতিহাস যাবা একটু জানে, তারা কেউ ঐ ঢাক তৈবিব কাহিনীকে অবিশ্বাস করেনি।

আমিন : কাহিনী ?

রেজিনা : ঐ ঢাকটা মানুষের চামড়ায় তৈরি ?

খালেদ : আগে তো কোনোদিন শুনিনি।

ফুফু : এই পবিবারের কেউ ও কাহিনী নিয়ে কোনোদিন আলোচনা করে না। সবাই জানে, মাঝে মাঝে ভাবে, আব শিউরে ওঠে।

আমিন : শিউরে ওঠে ? কেন ?

ফুফু : আমার বাবা—

রেজিনা : লাল কাজী!

ফুফু : হ্যাঁ লাল কাজী বলেই দু'দশ গ্রামের লোক তাকে জানত। একরাশ সাদা দাড়ির ভেতর থেকেও রক্তবর্ণ গায়ের রং ঝকমক করত। বর্শা, লাঠি, তলোয়ার সবগুলো সমান চালাতে জানতেন। জমিদার লাল কাজীর নামে থরথর কাঁপত না এমন বুকের পাটা এ তল্লাটে সে জামানায় কারো ছিল না।

আমিন : তারপর!

ফুফু : একবার শুধু পাশের গ্রামের এক উদ্ধত জমিদার সীমানা নিয়ে লাল কাজীর বিরুদ্ধে হাঙ্গামা শুরু করেছিল। সীমানা নিয়ে সে যুগের জমিদারে জমিদারে লড়াই— সে যে কী ভয়াঁনক রক্তারক্তি কাণ্ড তা তোমরা ভাবতে পারবে না। লাঠি, সড়কি, বর্শা সব দু'দলই এনে জড়ো করল সীমানাব এক প্রান্ত থেকে শুরু করে অন্য কিনার অবধি।

আমিন : রীতিমতো যুদ্ধ বলুন।

ফুফু : লাল কাজীর সীমানা প্রহরীদের মধ্যে একটা ছিল বছর দশেকের রোগা লিকলিকে ছেলে। উঁচু গাছের মাথায় মাচা করে বসে ও পাহারা দিত। একদিন শেষ রাতের দিকে বেচারা ক্লান্ত হয়ে ঝিমুতে থাকে, ঘুমের ভারে চোখ মেলে রাখতে পারছিল না— ঠিক সেই মুহূর্তে ও দলের এক দংগল লেঠেল সীমানা পেরিয়ে লাল কাজীর জমির ফসল কেটে নিয়ে সরে পড়ে।

রেজিনা : ফুফুআম্মা!

খালেদ : ঐ ঢাক কার চামড়ায় তৈরি ফুফু আম্মা ?

আমিন : কাহিনী বলতে জানেন বটে। গোটা ব্যাপারটাকে রীতিমতো রহস্যময়-রোমাঞ্চকর করে তুলেছেন।

ফুফু : পরেরদিন ভোরে ছেলেটার শাস্তি হলো। কাঁটা বসানো চামড়ার চাবুকে ওর পিঠ কেটে ছিলে রক্তে একাকার। আশির ঘরে পৌঁছবার আগেই গোঁ গোঁ করে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে আর নড়ল না। মরে শক্ত হয়ে পড়ে রইল। গুণে গুণে চাবুক একশ অবধি চলল। তারপর ওর চামড়াটা খলিয়ে শুকিয়ে একটা ঢাক তৈরি হয়। যাতে ওটা বাজাতে আর কোনো প্রহরী যেন কোনোদিন ভুলে না যায়। পাহারা দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে না পড়ে।

আমিন : Horrible!

ফুফু : আজ চল্লিশ বছর ধরে ও ঢাকে কেউ হাত দেয়নি। কিন্তু ঐ ঢাক এই চল্লিশ বছরের মধ্যেও একবারও তার কর্তব্য ভুলে যায়নি। প্রভুভক্ত পাকা শিকারি কুকুরের মতো একটানা পাহারা দিয়ে এসেছে চল্লিশ বছর ধরে। যখনই সময় ঘনিয়ে এসেছে তখনই ডুগডুগ করে বেজে উঠেছে, সংকেতে হুঁশিয়ার হতে বলেছে সবাইকে। তাই তো আজ আমি হঠাৎ ঐ ঢাকের শব্দ শুনে অত চমকে উঠেছিলাম, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! আচ্ছা আমি যাই, শুতে যাই।

রেজিনা : আপনি একলা উঠবেন না। আমি ধরছি, আমার কাঁধে ভর করুন।

আমিন : এ ঢাক আপনা থেকেই বেজে ওঠে ? কার জন্যে পাহারা দেয় ? সংকেত কীসের ? হুঁশিয়ার করে দেয় কাকে, কেন ? আমি কিছু বুঝলাম না!

ফুফু : মাঝে মাঝে এ ঢাক এমনি ডুগডুগ করে ওঠে। যখনই এ ঢাক বেজে উঠেছে সেদিনই এই পরিবারের প্রধান কর্তার মৃত্যু ঘটেছে। এ ঢাক এই বিরাট জমিদারির যে কোনো জীবিত প্রধান মালিকের স্থায়ী প্রহরী— তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসবার আগে ঠিক ঢাক বাজিয়ে যাবে।

খালেদ : লাল কাজীর হুকুম তামিল করে যাচ্ছে।

ফুফু : লাল কাজী, আমার বাবা, যেদিন মারা যান সেদিন সকালে সবাই ঢাকের বাদ্য শুনেছে। যেদিন সন্ধ্যায় তোমার বাবার অসুখের টেলিগ্রাম হঠাৎ আসে সে দিন সকালে হায়দর আমি সবাই স্পষ্ট ঢাক শুনেছি। মনে হয় যেন কে ঢাকটাকে নিখুঁত তালে বাজাচ্ছে। একটানা ডুগ ডুগ শব্দ তুলে বারান্দার এক প্রান্ত থেকে ক্রমশ এগুতে থাকে— তারপর আস্তে আস্তে

তালে তালে পা ফেলে দূরে মিলিয়ে যায়। এ রকম একবাব দু'বার তিনবার। একবার কাছে আসে আবার দূরে চলে যায়।

রেজিনা : এ ঘরে আরেকটু বসে বিশ্রাম নিলে ভালো করতেন ফুফু আম্মা। আপনি হাঁপাচ্ছেন এখনো।

ফুফু : ও কিছু না। থাক্ থাক্ তোমাকে ধবতে হবে না বাছা। আমি একলাই যেতে পারব। ঐ ঢাকটা তোমরা ধরাধরি করে এখনই তুলে রাখ। আমি যাই, শুয়ে পড়ি গিয়ে। ও কিছু না, ঢাকটা এমনি বাজেনি তো, আমিন না জেনেশুনে বাজিয়েছে। ও ঠিক আছে। আমি যাই।

[প্রস্থান]

খালেদ : আমিও যাই। চাচার সঙ্গে আর একবার মোলাকাত করে আসি।

রেজিনা : আজ রাতে একবার দেখা না করলেই নয় ? একদিনের জন্য অনেক তো হয়েছে। মনের ওপর অত চাপ তোমার শরীরের জন্যে এমনিতেও ভাল নয়। নিজের ঘরে গিয়ে আজ রাতের মতো বিশ্রাম নাও। ঘুমুতে চেষ্টা কর।

খালেদ : ঘুম আসবে না। বুকের ব্যথাটাও যেন সময় বুঝে বেঁকে বসতে চাইছে। একদম কাবু কবে ফেলবার আগেই চাচার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাওয়া ভালো না ?

রেজিনা : ও সব কথা মুখে এনো না।

খালেদ : আমি আমার ঘরে চললাম। দু'গ্লাস ওষুধ গিলে শরীরটাকে একটু চাঙ্গা করে নেব আগে। তারপর চাচার সঙ্গে আলাপ করব। চললাম আমিন। তোমার সঙ্গে বাকি কথাগুলো কাল ভোরে হবে রেজিনা— এখন যাই।

[স্তব্ধতা : বিদঘুটে : ক্ষণিকের]

আমিন : যতসব আজগুবে আষাঢ়ে গল্প! ওর আমি এক বর্ণও মানি না, বিশ্বাস করি না।

রেজিনা : আমার কিন্তু খারাপ লাগছে। ওই ঢাকটা তুমি তুলে রাখ শিগগির।

আমিন : বললেই হলো না! বুড়ি বেহুঁশ হয়ে কী সব বকে গেল আর ওমনি তোমাদের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে ঢুকে গেছে। এ ঢাক আমি বাজাব, তবে ছাড়ব।

বেজিনা : আমিন! অমন কাজ করো না! ফুফু আম্মাকে তুমি চেন না। এ বাড়িতে তুমি ও ঢাক বাজাতে পারবে না।

আমিন : তোমার ফুফু আম্মাকে চিনি আর না চিনি— শব্দ যন্ত্রকে আমি চিনি। আমি সুরের, শব্দের, রবের, ছন্দের সাধক। এ ঢাক আমার পছন্দ হয়েছে, এ ঢাক আমি বাজাবোই। কোনো রকম বুজরুকি নিষেধ আমায় বাঁধা দিতে পারবে না রেজিনা আপা!

রেজিনা : ও কী হচ্ছে আমিন ?

আমিন : এই আমি ঢাক কাঁধে তুললাম। তোমাদের বাড়িতে না হয়, আমাদের বাড়িতে গিয়ে সাধনা করব।

রেজিনা : আমিন!

আমিন : (দূর থেকে যেতে যেতে) আমি চললাম রেজিনা আপা। আব্বা বোধ হয় এখন তোমার চাচাজানের সঙ্গে বসে বসে গল্প করছেন। আমাকে খোঁজ করলে বলে দিও বাড়ি চলে গেছি, উনি যেন অপেক্ষা না করে একলাই চলে আসেন।

[প্রস্থান]

[একটা দ্রুত শব্দতরঙ্গ ঢেউ তুলে এসে মিলে যাবে একজন ভারী গলার বৃদ্ধ অথচ বলিষ্ঠ পুরুষ কণ্ঠের অট্টহাসির সাথে]

প্রফেসর : (অট্টহাসি) তুমি অবাক করলে হায়দার, অবাক করলে। আজ বাদে কাল তোমার নিজের ছেলে বিলেত থেকে ডাক্তারি পাশ করে ফিরে আসছে। তোমার মনে কিনা এখন ঐ কথা!

চাচা : (বিরক্ত ও ঈষৎ কড়া মেজাজে) উড়িয়ে দিতে চাইলে কী হবে? ঐ ঢাকের বাদ্য আমি নিজ কানে তিনবার শুনেছি। প্রথমবার আমার নিজের বাবা, তারপর আমার বড় ভাই, তারপবের বার ঐ রেজিনাব বাবাকে— আমার ছোট ভাইকে আমি আমার চোখের সামনে ছটফট করে মরে যেতে দেখেছি।

প্রফেসর : সে-তো অনেক কারণেই মবে যেতে পারে। ঢাক পিটুনি শুনে মরে গেল এ কথা তোমাকে বলল কে? মৃত্যুর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কটাকে সরাসরি অস্বীকার করে একটা অশরীরি ইঙ্গিত আবিষ্কার করতে পারলে তোমরা যেন আর অন্য কিছুই ভাবতেই চাও না।

চাচা : অস্বীকার আমি কিছুই করিনি।

প্রফেসর : কত বছর ধরে মরণের দূত সেজে, এ জমিদারীর প্রতি জীবিত মালিককে গুমগুম শব্দ তুলে সতর্ক করে দিয়ে যায়! পরপারের পাহারাদার যেন!

চাচা : তুমি বিজ্ঞানের প্রফেসর, পণ্ডিত লোক, তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করব না।

প্রফেসর : বেশ!

চাচা : সমস্ত ছুটি এই গ্রামেই কাটাবে ঠিক করেছ?

প্রফেসর : হ্যাঁ। ও হায়দর, তোমার ছেলে বিলেত থেকে ফিরছে কবে? কোনো খবর-টবর পেয়েছ নাকি?

চাচা : এ মাসেই এসে পড়বে। ওদের আখ্‌তটাও আমি ঠিক করেছি যত তাড়াতাড়ি পারি সেরে ফেলব।

প্রফেসর : এত বেশি তাড়াহুড়ো না করে, আমার মনে হয় এ বিষয় নিয়ে রেজিনার সঙ্গে একটু আগে থেকে আলাপ করে রাখলে ভালো হতো না? রেজিনার নিজেরও বয়স হয়েছে, বুদ্ধি হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে, তার নিজস্ব একটা আলাদা মতামতও থাকতে পারে।

চাচা : না। নেই। থাকতে পারে না।

প্রফেসর : তাছাড়া তোমার ছেলেই যে বিলেত থেকে ঘুরে এসে রেজিনাকে বিয়ে করতে রাজি হবে তারও তো কোনো ঠিক নেই।

চাচা : আছে। ঠিক আছে। আমার ছেলে আমার বুদ্ধি বিবেচনাকে শ্রদ্ধা করে। আমার পরামর্শ অনুযায়ী ও চলবেই। যতদিন কাণ্ডজ্ঞান ঠিক থাকবে ততদিন আমার কথা মতোই ও চলবে। বিলেত থেকে আসছে বলেই ও আর অন্ধ হয়ে আসছে না।

প্রফেসর : এটা অবশ্য ঠিকই বলেছ। তোমার মতো সজাগ সংসারী বুদ্ধি ওর ঘটে যদি একটুও থাকে তবে রেজিনাকে বিয়ে করতে ওর এক রত্তিও আপত্তি হবে না।

চাচা : হতে আমি দেব না।

প্রফেসর : তাহলে তো হায়দর তুমি দেখছি বিরাট লোক বনে যাবে। তোমার বড়ভাইর মৃত্যুর পরবর্তী সর্বজ্যেষ্ঠ জীবিত মালিক হিসেবে বড়ভাইর অংশ তুমি পেয়েছ। এখন রেজিনা যদি তোমার ছেলেকে বিয়ে করে তবে ছোটভাইর অংশও তোমার দখলে আসছে বলো!

চাচা : হুম। খালেদ হচ্ছে আমাদের খান্দানের একটা ব্যাধিগ্রস্থ অঙ্গ, আমার মরহুম বড়ভাইর উচ্ছৃংখলতার স্মারক, আমার প্রতি পদক্ষেপের স্থায়ী শৃঙ্খল।

প্রফেসর : খালেদের বাবা দুশ্চরিত্র ছিল, এ কথা কোনোদিন বিশ্বেস করব না। ও তো খালেদের মাকে বিয়ে করার জন্য তৈরি হয়েই তোমাদের কাছে অনুমতি চাইছিল। বাঁদির সাথে বিয়ে দিতে অরাজি হওয়ায় সে গৃহত্যাগী হয়।

চাচা : ধর্মের, সমাজের অভিশাপ মাথায় নিয়ে এই বাড়িতেই নিজের মাকে খেয়ে খালেদ জন্মগ্রহণ করে।

[হঠাৎ গাঢ় কণ্ঠে]

খালেদ : কিন্তু আমি তবু চিৎকার করে ঘোষণা করছি আমি নিরাপরাধ, নির্দোষী, নিষ্কলঙ্ক। আমাকে সাজা দেয়ার আপনার কোনো অধিকার নেই। আজকে আমি এসেছি, আমার হক দাবি করতে— কীসের জোরে আপনি তা অস্বীকার করেন— আমি তা দেখব।

চাচা : খালেদ, তুমি আবার মদ খেয়েছ। তুমি এখন অপ্রকৃতিস্থ। ঘরে গিয়ে শুয়ে থাক।

খালেদ : আর সেই ফাঁকে বিলেত থেকে আপনার মূর্খ দুশ্চরিত্র সন্তান জাফর এসে রেজিনাকে বিয়ে করে সরে পড়ুক, না? চাচাজান, আমার হক আমি আজ আদায় করে তবে এ ঘর ছাড়ব।

প্রফেসর : তোমরা অত উত্তেজিত হয়ে উঠো না।

চাচা : তোমার কোনো হক নেই, ছিল না। পঁচিশ বছরের ওপর তোমায়

লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছি, অন্নবস্ত্র দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছি— এইজন্য খোদার কাছে শোকর গোজারী কর।

খালেদ : কিন্তু কেন ? কেন ? আমি তার জবাব চাই। রেজিনাব সম্পত্তিকে গ্রাস করতে চান বলে একটা লম্পটের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চাইছেন— সেটা বুঝি।

চাচা : খালেদ!

খালেদ : কিন্তু পঁচিশ বছর ধরে আমার অন্নবস্ত্র যুগিয়ে এলেন আপনি কোন স্বার্থে ? আপনার মধ্যে এতো উদারতা রহস্যময়। জবাব দিন, বলুন কেন আপনি আমায় পঁচিশ বছর ধরে এতো সযত্নে মানুষ করে তুলতে চেয়েছেন ? জবাব দিন!

[ক্ষণিক স্তব্ধতা]

[দূরে খুব স্পষ্ট নয়, ঢাকের প্রাথমিক ভয়াবহ ধ্বনি]

চাচা : প্রফেসর! ঐ ঐ! শুনতে পাচ্ছ তুমি ?

[ঢাক থেমে গেছে]

প্রফেসর : ও কী, তুমি ও রকম করছো কেন ? কী হয়েছে ? কি ? কৈ আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

চাচা : শুনতে পাচ্ছ না। ঐ বারান্দার ঐ প্রান্ত থেকে উঠছে। ঢা-ক!

খালেদ : (অট্টহাসি) হা হা হা। আমার জবাব আমি পেয়েছি। পঁচিশ বছর ধরে চাচাজান ঐ ঢাক শোনাব জন্য অপেক্ষা করছিলেন ?

চাচা : প্রফেসর! আমি— আমি— আজই আমার শেষ দিন। প্রফেসর— আমি জীবনে অনেক গুনাহ করেছি। গুনাহ, গুনাহ্!

প্রফেসর : শান্ত হও, শান্ত হও! ভুলও তো শুনতে পারো তুমি। শান্ত হও।

খালেদ : (অট্টহাসি) আপনিও শেষে গুনাহ্গার বলে স্বীকার যাচ্ছেন ? হা হা হা! আপনার নীতিবোধের এই নবজন্মকে মোবাবকবাদ জানাচ্ছি, চাচাজান। হা হা হা!

প্রফেসর : মাতলামি করো না খালেদ! তুমি শান্ত হও হায়দার!

চাচা : খালেদ! আমার সবচেয়ে বড় গুনাহ্ তোমার বিরুদ্ধে আমার হীন ষড়যন্ত্র! তোমার ভালোবাসার সামগ্রী থেকে, তোমার ন্যায্য সম্পত্তির অংশ থেকে তোমাকে নির্মমভাবে বঞ্চিত করার জন্য আমি পঁচিশ বছর ধরে ষড়যন্ত্র করছি খালেদ।

খালেদ : তার অর্থ ?

প্রফেসর : তুমি কী বলছ হায়দার ?

[ঢাকের নিকটবর্তী নাদ]

চাচা : প্রফেসব! প্রফেসর! আমার কী রকম জানি দম বন্ধ হয়ে আসছে বলে মনে হচ্ছে।

[ঢাক থেমে যাবে]

আচ্ছা প্রফেসর মরবার আগে সব গুনাহ্ স্বীকার করে, তওবা চাইলে— সব গুনাহ মাফ হয়ে যায় না প্রফেসর ? বল হয়, বল।

প্রফেসর : হ্যাঁ, সব হয়! তুমি শান্ত হও।

চাচা : শোন খালেদ তোমাব মা'র সঙ্গে তোমার বাবার ধর্মসঙ্গত বিয়ে হয়েছিল, তার আইনসঙ্গত দলিলপত্রাদি তোমার বাবা আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যায়, যাতে—

খালেদ : বাবা!

চাচা . আমায় বাধা দিও না। সবটা বলে শেষ করতে দাও। সে বিয়ের দলিল তেতালার ঘবে, চোরা সিন্দুকের একদম নিচের খাপে, ডানদিকের খুপরিতে ভাঁজ কবা আছে। খালেদ একটু পানি, পানি—পানি—পানি।

[ছুটতে ছুটতে]

ফুফু : কে ? কে ? পানি পানি করে চিৎকার কবছে কে ? ভাই-ই'

চাচা : আমি সব খালেদকে বলে দিয়েছি বোন। ওকে তুই বলে দে যে ওকে আমি কোনো দিন ঠিক ঠকাতে চাইনি। তাহলে পঁচিশ বছব ধরে ওকে কোলে পিঠে করে মানুষ করতাম না। শুধু নিজেব ছেলের বিলেত যাবার খবচ যোগাবাব জন্যে ওর কাছ থেকে আসল কথাটা লুকিয়ে বেখেছিলাম মাত্র' আল্লাহ্!

খালেদ : (হাসি) লুকিয়ে ? পঁচিশ বছর ধরেও মানুষ এ রকম কথা লুকিয়ে রাখে , চাচাজান' ঢাকেব শব্দ কি এখন আব শুনতে পাচ্ছেন না ?

ফুফু : ঢাক ? কোন ঢাক ? আমিনকে অত করে বাবণ করলাম তবু আবারও ঐ ঢাক বাজাতে শুরু করেছে ?

প্রফেসব : আমিন'

চাচা : আমিন ? ও ঢাক আমিন বাজাচ্ছিল ?

ফুফু : আব তুমি প্রলাপের ঘোরে তাই শুনে খালেদকে কতগুলো বাজে, আজগুবি কথা বলে ফেললে! সব মিছে কথা, মিছে কথা। ওর এক বর্ণও সত্য নয।

খালেদ : (অট্টহাসি) ঢাকটা না হয় বুঝলাম ফাঁকি, কিন্তু দলিলটা ? চিলেকোঠার ঘবে, চোরা সিন্দুকে, নিচেব খাপে, ডান খুপরিতে ভাঁজ করা আছে সেটা। যাই আমি ওটা সময় থাকতে নিয়ে আসি গিয়ে।

চাচা : খালেদ, দাঁড়াও। ওখানে কিচ্ছু নেই, সব মিছে কথা। মিথ্যে, মিথ্যে বকাবের ঘোরে বলা।

খালেদ . সত্য না মিথ্যে তা আমি নিজেই পরখ কবে দেখব, আপনাব অত উত্তেজিত হবার প্রয়োজন নেই। বাধা দিতে চেষ্টা করলে বিপদ ঘটতে পাবে। আপনারা সবাই অপেক্ষা করুন আমি দলিলটা নিয়ে আসছি।

আমিন যে! তুমি আবাব ফিরে এলে যে বড়। তুমিও ওঘবে বস গিয়ে। তোমার দৌলতেই সব ঘটল কিন্তু।

আমিন : কী ? খালেদ ভাই কী বলে গেল আব্বা ? সব্বাই ওরকম করে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন কেন ? আমি কী করেছি ?

চাচা : তোমাকে খুন করব ছোকরা!

ফুফু : আমার নিষেধের পরও তুমি ওই ঢাকে হাত দিতে গেলে কোন সাহসে ?

আমিন : ঢাক ? কৈ আমি তো কোনো ঢাক বাজাইনি। ও ঢাক তো আমি বাসায় রেখে আব্বার দেরি দেখে আব্বাকে নিয়ে যেতে ফিরে এলাম।

চাচা : ও ঢাক তা হলে তুমি বাজাওনি ?

[গুম্ গুম্-গুম্ গুম্! ঢাক আবার বাজতে শুরু করেছে]

চাচা : আমায় একটু পা-নি।

[হঠাৎ খালেদের একটা প্রচণ্ড চিৎকার—ভয়ার্ত এবং বেদনাক্লিষ্ট। সঙ্গীত-তরঙ্গ সংবলিত। সিঁড়ি দিয়ে একটা মৃতদেহ গড়িয়ে পড়বার মতো আনুষঙ্গিক পতন ধ্বনি।]

খালেদ : (দূরে) রেজিনা! রেজিনা! পানি! একটু পানি! রেজি—! (স্তব্ধতা!)

চাচা : ও-কী! খালেদ চিৎকার করে উঠলো কেন ?

আমিন : আমি দেখে আসছি।

প্রফেসর : সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল মনে হলো!

ফুফু : সে-কী!

চাচা : খালেদ! খালেদ! কোনো সাড়া শব্দ নেই দেখছি আর। খালেদ! এই যে রেজিনা, আমিন— খালেদ, খালেদ কোথায় ?

রেজিনা : সিঁড়ির নিচে। ঘরে পড়ে আছে। মরবার আগে একটু রক্তবমি করেছে।

চাচা : খালেদ মারা গেছে ?

ফুফু : লাল কাজীর ঢাক! (বিকৃত হাসি) এ পরিবারের মৃত বড় ছেলের, ধর্মসঙ্গত বড় ছেলে খালেদ মারা গেছে। জমিদারির প্রধান মালিক, জ্যেষ্ঠতম জীবিত উত্তরাধিকারী খালেদ— লাল কাজীর ঢাক শুনেছে! হি হি হি।

[ঢাকের প্রবল ধ্বনি]

[ধ্বনি শেষ]

[যবনিকা]

আগামী যুদ্ধ

(কোনো ঘর নয়, ট্রেঞ্চের গহ্বরটাই রঙ্গমঞ্চ। তবে সে ট্রেঞ্চের দেয়াল, গড়ন, আকার, চেহারা সবটাই এত ঝকঝকে, মজবুত এবং ছিমছাম যে দেখলে মনে হয় যেন কোনো আধুনিক আমিরের প্রাসাদের অন্দর মহল।

একটি কিশোরী টেবিল-বাতির নিচে খাতা কলম রেখে কঠিন চিন্তায় ঠোঁট কামড়াচ্ছে। একটি মাঝ বয়েসী চাকরানি ঘরের এটা-সেটা ঝেড়ে মুছে ঠিক করে রাখছে।)

কিশোরী : (মাথা না তুলেই) কে খালা নাকি ? সত্যি খালা, তোমাকেই এতক্ষণ ধরে খুঁজছিলাম! (চোখ তুলে) ওহ্, তুমি! উহ্ ! কী মুশকিলেই যে পড়েছি।

চাকরানি : কেন কী হয়েছে ?

কিশোরী : টিচারজী প্রবন্ধ লিখতে দিয়েছে। যুদ্ধ কী করে শুরু হলো তার ওপর। টিচারজী ক্লাসে সবই বলে দিয়েছিলেন। কিন্তু এত চেঁচিয়ে বলেছিলেন যে, আমার মাথার মধ্যে সব গোলমাল হয়ে গেছে, কিচ্ছু মনে করতে পারছি না। আচ্ছা আমরা কেন যুদ্ধ করছি একটু বলে দেবে আমায় ?

চাকরানি : কেন যুদ্ধ করছি তা আমি কী করে জানব ?

কিশোরী : কী সাংঘাতিক না ?

চাকরানি : কি, যুদ্ধ ?

কিশোরী : না না, আমি আমার প্রবন্ধটার কথা বলছি। আমার থেকে থেকে কী মনে হচ্ছে জানো দাদি ? আগামী যুদ্ধগুলো যেন এত আহাম্মকিতে ভরা হয়, যাতে কাউকে কোনো দিন তার ওপর কোনো প্রবন্ধ লিখতে না হয়।

চাকরানি : পাগলী! সব যুদ্ধই তো আহাম্মকের কাণ্ড!

কিশোরী : বাহ্ তা হতে যাবে কেন ? যুদ্ধ হচ্ছে— হচ্ছে।

কৈ আমরা তো তাই বলে এমন কিছু কষ্টে নেই চাকরানি। হয়তো সব্বাই এত আরামে নেই!

কিশোরী : হবেও বা। আব্বাজানের চিঠি পাই না আজ কতদিন হলো।

(কিশোরী তার লেখায় মন দেয়। চাকরানি বেরিয়ে যায়। কিশোরী কলমের গোড়া চিবুতে থাকে। হঠাৎ দরজায় ভারি পায়ের শব্দ। আজগুবি পোষাক পরা একটা লোক ঘরে ঢোকে। পরণে ময়লা পোষাক, কাঁধে ঝুলানো বন্দুক। ঘরে ঢুকেই ধপাস করে একটা চেয়ারে বসে পড়ে হাঁপাতে থাকে)

কিশোরী : (হতভম্ব) আপনি কে ? আপনি এখানে কী চান ? কোত্থেকে এসেছেন ?

মানুষ : শোন কথা। উহ্ ! এরা কি আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে নাকি ?

কিশোরী : আপনি কি ছুটি নিয়েছেন নাকি ? ছুটির কাগজপত্র সঙ্গে আছে ?

মানুষ : অ্যাঁ ? ছুটি ? কীসের ছুটি ?

কিশোরী : বাহ ছুটি না নিয়ে আপনি ট্রেঞ্চে আসবেন কেন ? নিশ্চয়ই আপনি আপনার স্ত্রীকে খুঁজতে বেরিয়েছেন।

মানুষ : (নিজেকে) আমি নিশ্চয়ই পাগল হয়ে যাচ্ছি না ?

কিশোরী : বাহ্। বড় মজা তো। দেখি দেখি ওটা কী এনেছেন।

মানুষ : (আরো হক্‌চকিয়ে) কী ? কী হয়েছে ?

কিশোরী : আপনার কাঁধে ওটা কী ঝুলছে ?

মানুষ : ওহ্ ! ওটা তো একটা বন্দুক।

কিশোরী : বন্দুক ? ওটার নামই তাহলে বন্দুক ? বড় মজার তো?

মানুষ : মজার ? বন্দুকের মধ্যে আবাব মজার কী খুঁজে পেলে তুমি ?

কিশোরী : (গম্ভীর হতে চেষ্টা করে) বন্দুক দিয়ে আপনি এখানে কী কবতে চান ?

মানুষ : এ দেখছি আচ্ছা আজব মেয়ে! আমি এসেছি লড়াই কবতে—আমার দেশের শত্রুদের শেষ করতে ' এ-দেশেব যারা—

কিশোরী : মানে—আপনি এ-দেশের লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চান ?

মানুষ : জি ঠিক তাই। আশাকরি এবাব আর ব্যাপাবটা নিশ্চযই খুব মজাব মনে হচ্ছে না!

কিশোরী : (কোনো বকমে হাসি চেপে) যুদ্ধ করবেন—বন্দুক দিযে ?... হি-হি-হি...আর সেই জন্য এসেছেন ট্রেঞ্চে! হি-হি-হি!

মানুষ : ভালো মুসিবতের মধ্যে পড়লাম দেখছি! এ জাযগার ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত পাগল হয়ে গেছে নাকি'

কিশোরী : (ভাবখানা আম্মাজানের অবর্তমানে আমিই গৃহকর্ত্রী) আপনি দয়া করে আমাদের এখানেই উঠেছেন, সে জন্য আমরা সবাই খুব সুখী হয়েছি। বিশেষ করে বন্দুকটা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছেন দেখে খালাম্মা নিশ্চয়ই আরো খুশি হবেন। আপনি জানেন না আমাদের এখানে ইঁদুরের বড় উৎপাত! আর ইঁদুর আমরা কেউ দু'চক্ষে দেখতে পারি না। আপনি এসেছেন, বড় ভালো হয়েছে। আমাদেব ইঁদুরগুলো সব আপনার বন্দুক দিয়ে মেরে ফেলবেন। খালাম্মা সব সময়ে বলেন, ইঁদুর বড় বজ্জাৎ। বিষের ওষুধ দিয়ে ওগুলোকে কাবু করা যাবে না। দরকার একজন বন্দুকওয়ালা আদ্‌মি—যে টোটা ভরে ওঁৎ পেতে থাকবে—শয়তানগুলো গর্তের মধ্য থেকে মাথা একটু বার করেছে—আর—গুড়ুম! (লোকটার স্তম্ভিত ভাবকে আমল না দিয়ে) আপনার বন্দুকে টোটা ভরা আছে তো ? ইঁদুর কিন্তু বড় বজ্জাৎ। একটু বেখেয়াল হয়েছেন কী—ফুড়ুত—কোনো পাত্তা পাবেন না আর। ঐ যে টেবিলের কোণে যে একটু গর্তের মতোন দেখা যাচ্ছে—তাকান ঐ বরাবর—তাকান, তা

মানুষ : (আহত কণ্ঠে) ইঁদুর মারার জন্য আমি আসি নি। ঐ এরাদা নিয়ে এতদূর পথ পাড়ি দিই নি। ও কর্ম আমি আমার ঘরে বসেও সমাপন কবতে পারতাম।

কিশোরী : বারে, তাহলে আর এখানে এলেন কেন ? আপনার স্ত্রীকে দেখতে এসেছেন ?

মানুষ : হায় খোদা! আমার নিজের ঘরে বিবির এতই অভাব নাকি ?

কিশোরী : মানে—ইয়ে—মানে আপনার ঘরে কি অনেকগুলো বিবি রয়েছে নাকি ?

মানুষ : জি!

কিশোবী : সবগুলো—বিয়ে করা ?

মানুষ : তা নয় তো কী ধরে রাখা নাকি ? এ মেয়ে বলে কী'

কিশোরী : কতগুলো ?

মানুষ . পাঁচটা।

কিশোরী : বা-প-রে! আপনি তাই বুঝি এখানে পালিয়ে এসেছেন ?

মানুষ : (কোনো বকমে নিজেকে সংযত বেখে) আমি এসেছি লড়াই করতে। আমার মাতৃভূমিব শত্রুর বিরুদ্ধে। আমি এদেশের সন্তান। বাড়ি আমাব দক্ষিণ মুলুকে। সব ছেড়েছুড়ে ছুটে এসেছি নিজের দেশেব সেবায় প্রাণ উৎসর্গ কবতে। ডিঙি নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিযে এই উত্তব সীমান্তে এসে হাজির হয়েছি। ডাইনে-বাঁয়ে কোনো দিকে তাকাই নি। পথে যার সঙ্গেই দেখা হযেছে— একটি মাত্র প্রশ্ন কবেছি : সীমান্ত কোন দিকে ? হুম ! এখন সীমান্তে পৌছে আমাকে নিজেকে নিজে জিজ্ঞাসা করতে হচ্ছে— পাগল হয়ে যাই নি তো ?

(ধূসর শাড়িতে জড়ানো, সুদেহী, চশমা পরা এক পরিণত বযেসেব মহিলার প্রবেশ)

মহিলা : কী ব্যাপাব— কী হয়েছে ?

কিশোরী : ও আম্মা। দেখ কী মজার কাণ্ড ' এ লোকটাব বাড়ি দক্ষিণ দেশে। বিয়ে করেছে পাঁচটা, সঙ্গে বন্দুক আছে। অথচ বলে কিনা ও-দেশের লোক মারবে—কিন্তু ইঁদুর কিছুতেই মারতে রাজি নয়!

মানুষ : আরেকটা মেয়ে লোক! এখানে এত মেয়েলোক এল কোত্থেকে ? ,শেষে কি মেয়েরাও যুদ্ধে নেবেছে নাকি ?

আম্মা : দেখে মনে হচ্ছে আপনি এ-দেশেরই লোক। অনেককাল বিদেশে কাটিয়ে এখন দেশের সেবা কবার ইচ্ছে হয়েছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু এখানে কেন ? যদি কারো কথা শুনে এসে থাকেন—তাহলে বলব সে আপনাকে ভুল জায়গায় পাঠিয়েছে।

কিশোবী : কাকে কী বলছ আম্মা! এ লোক তো কাউকে কিছু জিজ্ঞেসই কবে নি। ইনি যে একেবারে ডাইনে বাঁয়ে না তাকিয়ে এখানে এসে হাজিব

হয়েছেন। (লোকটাকে। খুব পাকামীর সঙ্গে) আপনার উচিত ছিল প্রথমেই সব পরিষ্কার করে বুঝিয়ে বলা।

আম্মা : তুই থাম দেখি বুলবুলী! (লোকটাকে) আপনি বসুন। নিশ্চয খুব থ'কে গেছেন। একটু চা করে দেব ?

মানুষ : না। কোনো দরকার নেই। ধন্যবাদ। আপনি দয়া করে বুঝিয়ে বলবেন কি—এখানকার কাণ্ডকারখানাটা কী ? দেখেশুনে আমার তো মনে হচ্ছে দুনিয়াটা নিশ্চয়ই ঠ্যাং ওপরের দিকে তুলে দিয়ে মাথা মাটিতে ঠেকিয়ে আছে।

আম্মা : নিজের দেশের জন্য এগিয়ে এসেছেন—এটা বীরের মতোই কাজ করেছেন।

মানুষ : দেখুন শিকার করা আমাদের অনেক দিনের নেশা। পাকা শিকারিও বটে। কিন্তু দোহাই আপনার, একটু বলে দেবেন কি—আমার সাহস, আমার শক্তি, আমার নিশানা— কোথায় গেলে কাজে লাগাতে পারি ? এখানে তো দেখছি শুধু মেয়েলোক! আমার কওমের আসল ভাইরা, যোদ্ধারা, পুরুষরা— তারা সব গেল কোথায় ?

আম্মা : যে যার বাড়িতেই আছে। শহরে, গাঁয়ে, অফিসে, কলকারখানাতে। সেখানেই তো ওদের আসল জায়গা। রসায়নশাস্ত্র সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করেছেন ?

মানুষ : রসায়নশাস্ত্র ? নামটা তো আগে শুনিনি কোনো দিন। কী ব্যাপার সেটা ?

আম্মা : বন্দুকটা রেখে দিন। বন্দুক দিয়ে আজকাল এমন কী কাজটাই বা আর হচ্ছে। যে যুদ্ধে এখনো আমরা জড়িয়ে আছি—এটা প্রধানত গ্যাসযুদ্ধ— অফুরন্ত গ্যাসসম্পদ নিয়ে পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার চেষ্টা। তোমার কর্তব্য শহরে গিয়ে কিছুকাল রসায়নশাস্ত্র নিয়ে পড়াশুনা করা। প্রায় রোজ-ই একটা না একটা নতুন মারাত্মক অস্ত্র আবিষ্কার হচ্ছে। সে জন্যই তো শহরের লোক আজকাল সব্বাই লিটমাস কাগজ সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করে।

মানুষ : কী যা-তা বকছেন। আমি লড়াই করতে চাই— রসায়নশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে চাই না। আমার মুঠোর মধ্যে চাই শক্ত ভদ্র অস্ত্র, যা দিয়ে আমি ও-দেশের মানুষকে শেষ করে দিতে পারি !

আম্মা : আপনার একটু দেরি হয়ে গেছে। যদি আর বছর খানেক আগেও আসতেন, হয়তো কাজে লাগানো চলত। ঘর পাহারাদার কিংবা শত্রু পক্ষের বোমারু উড়োজাহাজ ছেঁদা করার জন্য আপনাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নে'য়া যেত। এখন তো সব উল্টে গেছে। বোমা ফেলতে হলে কেউ আজকাল তার সঙ্গে আর আসে না—বোমা তো এখন রকেটের ধাক্কাতেই চলে। বোমা ছুঁড়ল ওরা ওদের দেশে বসে—সে বোমা এসে ফাটলো আমাদের দেশের শহরে। সে বোমার আবার এমন গ্যাস—যে খালি চোখে

তাব কিছুই দেখা যায় না।... এ খবরও শোনেন নি কোনো দিন ? এ রকম তো আজকাল হরদম ঘটছে। সে বোমাগুলো এত উঁচু দিযে ছোটে যে, খালি চোখে ওদের দেখাই যায না—কেবল কান পাতলে একটা শোঁ শোঁ শব্দ কখনও কখনও শোনা যায়। অবশ্য শব্দ শুনে সে বোমা কোন দিকে ছুটছে তার কিছুই আন্দাজ করা যায় না—আমাদের ওপরই ফাটবে না ও-দেশে গিয়ে পড়বে। আপনি অনেক জানেন ? বাঁকা রেখার গণিত ? প্যারাবোলার সমীকরণ জানেন ? ট্রাজেক্টরি ? ব্যালিস্টিক্স কাকে বলে বোঝেন ? আরম্ভিকর বেগ আর গতিকোণ দেয়া থাকলে অঙ্ক কষে ওর পতনবিন্দু বার করতে পারেন ?

মানুষ : অ্যাঁ ? এ সব কী বলছেন আপনি ? অঙ্ক ? হিসেব ? আমি কি একটা নাম্‌তার বই নাকি ?... বলে কী এরা ? ব্যালিস্টিকস্ ! বলে কিনা শত্রু না দেখে আকাশে গুলি ছুঁড়তে হবে। সব পাগল, পাগল হয়ে গেছে!

আম্মা : (শান্ত) ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে আপনি ভুল করেছেন।

মানুষ : আমি এ দেশেব লোক। এ-দেশই আমাব ঘর।

আম্মা : নিজেব বিবি-বাল-বাচ্চা নিয়ে থাকলেই ভালো করতেন।

মানুষ : এর মধ্যে বিবির কথা এল কোত্থেকে ?

কিশোরী : জানো আম্মা পাঁচ পাঁচটা আছে ওর।

আম্মা : তুই থাম বুলবুলী। সত্যি তো আপনি ঘরে নেই, এখন আপনার বিবিদেব কী অবস্থা যাচ্ছে কে জানে।

মানুষ : লড়াই করছে, মানে ঝগড়া করছে। সে ওরা আমি ঘবে থাকলেও কবে। সে জন্য আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। আপনি ববঞ্চ দয়া করে আমাকে একটু বুঝিয়ে দিন, আপনারা এখানে কী কবছেন ? এই যুদ্ধ ফ্রন্টে শত্রুর মুখোমুখি এত মেয়ে মানুষ কেন ?

আম্মা : কারণ এটাই হলো সবচেয়ে নিরাপদ জাযগা। আমাদের ট্রেঞ্চের এই কংক্রিটের যে দেয়াল দেখছেন, এগুলো যে কোনো দুর্গেব চেয়ে বেশি মজবুত। বোমা মেরে এই গাঁথুনির কিছু করতে পাববে না। দরকার হলে এর ছাদের ঢাক্‌নি এমন করে সেঁটে দেয়া যায় যে, কোনো গ্যাস ঢুকতে পারবে না। এগুলো সব তৈরি হয়েছিল এ-যুদ্ধের গোড়ার দিকে—তখনও মানুষ ট্রেঞ্চে বসে যুদ্ধ কবত।

কিশোরী : ও আম্মা আমাকে তো ওসব কথা দিয়েই একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে—যুদ্ধের গোড়ার ইতিহাস। টিচারজী বলে দিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষদের সাহস, আত্মত্যাগ আর বীবত্বের কথা যেন খুব ভালো করে বর্ণনা করি। প্রথম গ্যাসযুদ্ধের কথাটাও লিখতে হবে। সেটা কীরকম হয়েছিল আম্মা ?

আম্মা : (সাড়ম্বরে) যুদ্ধ যখন শুরু হয় বিষাক্ত গ্যাস প্রয়োগ তখনও নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধ-ফ্রন্ট তৈরি হলো, দু'দিকেই। তৈরি হলো মুখোমুখি ট্রেঞ্চ। কিন্তু কেউ আর এগুতে পারে না। পিছু হটতেও রাজি নয়। আক্রমণের কোনো অর্থই

থাকল না আর। সৈন্যরা বসে বসে আর কী করবে—নিজের ট্রেঞ্চকে যত রকমে আরো উন্নততরো করে তোলা যায়; সে দিকে মন দিল। তৈরি করল এমন ট্রেঞ্চ যা রাজার পুরীর চেয়েও সুন্দর, দুর্গের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। তারপর বসে থাকতে থাকতে সবাই এত ক্লান্ত হয়ে পড়ল যে শেষে বিরক্ত হয়েই গ্যাসের যুদ্ধ শুরু করে দিল।

কিশোরী : (লিখতে শুরু) "বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে শেষে বিরক্ত হয়েই আমরা—"

আম্মা : আরে করিস কী পাগলী, ওসব কথা লিখতে হয় নাকি?

কিশোরী : লিখব না কেন?

আম্মা : টিচারজীর হাতে তা হলে আর পাশ করতে হবে না।

কিশোরী : বাহ্ পাশ করব না কেন? সত্য কথা লিখব না তা হলে? এই ট্রেঞ্চের মধ্যে একঘেয়ে দিন গুণতে আমারও কি ছাই ভালো লাগে। এর চেয়ে আমাদের দেশের বাড়িতে রোজই কত মজার মজার কাণ্ড ঘটছে। পাশের ট্রেঞ্চের লম্বা বেণীর কাছে ওর বাবার গল্প শুনলাম। জানো আম্মা, ওর আব্বা নাকি সেদিন বাড়িতে বসে চা খাচ্ছিল। হঠাৎ দেখে কী, চায়ের রংটা ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে নীল্‌চে হয়ে যাচ্ছে। এই না দেখে লম্বা বেণীর বাবা তাড়াতাড়ি করে গ্যাসমুখোস পরে ফেলল। ভাগ্যিস চায়ের রং বদলানোটুকু লক্ষ করেছিলেন। নইলে আরেকটু হলে অক্কা পেয়েছিলেন আর কী! কী অদ্ভুত কাণ্ডটা না আম্মা?

আম্মা : তুমি কী লিখবে বলে দিচ্ছি। "আমাদের দেশের বিরুদ্ধে সবাই যখন অস্ত্রধারণ করল তখন আন্তর্জাতিক মৈত্রীসংঘেরও পতন ঘটল।"

কিশোরী : "তখন আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘেরও পতন ঘটল।"

আম্মা : না, তার চেয়ে বরঞ্চ লেখ মৈত্রীসংঘে ভাঙন ধরল—না, লেখ, তখন সে মৈত্রীসংঘের কোনো অর্থ থাকল না আর। হ্যাঁ, এইটাই সবচেয়ে ভালো হবে।

কিশোরী : "... কোনো অর্থ থাকল না আর।"

আম্মা : "চারদিক থেকে আমাদের দেশ শত্রু পরিবেষ্টিত। পথ আটকে আমাদের না খাইয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা চলেছে। গ্যাসবোমার ব্যবহার ছাড়া তখন আমাদের অন্যকোনো পথ আর খোলা রইল না। দুনিয়ার সেরা রসায়নাগার ছিল আমাদের দেশে। গ্যাসবোমা হয়ে দাঁড়াল আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার। মরা বাঁচার যোগস্থলে দাঁড়িয়ে এ পথই আমরা তখন গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম।"

কিশোরী : কী যুক্তি! তারপরই বোধহয় সবকিছুই খুব মজার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল।

আম্মা : ছিঃ। অমন করে বলতে হয় না। তুমি কোনো জিনিস যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিচার করতে শেখোনি এখনো। তোমার বাবা এখন দেশের বাড়িতে বসে আছেন। যে কোনো সময়ে অদৃশ্য, নীরব গ্যাসবোমার বিষ ওর ঘরে ঢুকে

পড়তে পারে— সে বিষাক্ত বাষ্প ধরা ছোঁয়ার বাইরে, চোখে দেখা যায় না— নাকে গেল, ফুসফুসের ক্রিয়া বন্ধ! (গাঢ় গলায়) আমাদের যোদ্ধারা সব কলে পড়া ইঁদুরের মতো, জানে না ওদের বিষ খাইয়ে মারা হবে না পানিতে ডুবিয়ে।

কিশোরী : "...কলে পড়া ইঁদুরের মতো"

আম্মা : কী করছিস, ওটাও লিখছিস নাকি ?

কিশোরী : এটাও লিখব না ? কী লিখব তাহলে ?

আম্মা : লিখ যে তারা ছিল বীর, অঙ্ক আর রসায়নশাস্ত্রে বড় বড় পণ্ডিত। যারা প্রত্যেকেই কোনো না কোনো নতুন মারাত্মক গ্যাস আবিষ্কার করেছেন আবার সেই সঙ্গে শত্রুপক্ষের গ্যাসকে কী করে জয় করা যায় তার কৌশলও আবিষ্কার করেছেন। হয়তো শিগ্‌গিরই এমন একদিন আসবে— (আবেগে কণ্ঠরুদ্ধ)

কিশোরী : কেমন দিন আম্মা ?

আম্মা : (সামলে নিয়ে) ভবিষ্যৎই বলে দেবে। সে কথা থাক এখন। তোমার প্রবন্ধে সে কথা না থাকলেও চলবে। সত্য কোনটা বোঝা বড় শক্ত বড়রা পর্যন্ত সব সময়ে পরিষ্কার করে বুঝতে পারে না। তুমি লিখে যাও কী করে ট্রেঞ্চের যুদ্ধ গ্যাসবোমার যুদ্ধে পরিবর্তিত হলো। প্রথমে বর্ণনা করো কী করে প্রথম বোমা নগরে নগরে ফাটল আর মরল অগুনতি শিশু আর মেয়ে। অথচ আসল সৈন্য যারা গুলিগোলা নিয়ে মঞ্চে বসেছিল তাদের গায়ে একটা আঁচড়ও লাগল না। দুই যুদ্ধমান সৈনিক দল যেন পরামর্শ করে ঠিক করেছে—যুদ্ধ ফ্রন্টে কেউ কাউকে আঘাত করবে না। তারা বোমা ছুঁড়ল মাথার ওপর দিয়েই—কিছু পড়ল অনেক দূরে। এই তো— এরপরও অনেক কিছু তুমিও জানো। পাশের ঘরে বসে লিখতে থাকো গিয়ে।

কিশোরী : (লেখার সরঞ্জাম নিয়ে যেতে যেতে) ইঁদুর দেখা গেলে আমায় খবর দিও কিন্তু। গুলি করে ইঁদুর মারা দেখতে কী মজাই না লাগবে! আপনার বন্দুকের শব্দ খুব জোরে হয় তো।

আম্মা : বুলবুলী, তুমি যাও এখন।

কিশোরী : যাচ্ছি! আমায় ডাকতে ভুলে যেও না যেন। (প্রস্থান)

আম্মা : আপনি কী করে যে এখানে এসে পৌঁছলেন ভেবে অবাক হয়ে যাই। সঙ্গে না ছিল গ্যাসমুখোস, না ছিল—

মানুষ : (অসহ্য!) না কিছু ছিল না।

আম্মা : এখন কি করবেন ঠিক করেছেন ? কিছু আপনি শেখেন নি। কোনো রকম অভিজ্ঞতাও নেই আপনার। শহরে ফিরে যাবার পথে কিছু বুঝে উঠবার আগেই হয়তো মারা পড়বেন।

মানুষ : ফিরে যাব কেন ? এগিয়ে যাব। ঢুকে পড়ব শত্রু সীমান্তে।

আম্মা : তাতে লাভ কী হবে। সীমান্তে তো শুধু মেয়েলোক থাকে, আমাদের মতোই।

মানুষ : আবার মেয়েলোক। দুনিয়ায় পুরুষ আদমি শেষ হয়ে গেল নাকি। যুদ্ধক্ষেত্রেও শুধু মেয়েলোক। এর চেয়ে যে ঘরে বসে—

আম্মা : হ্যাঁ— ঠিকই ধরেছেন। আপনার পক্ষে সেটাই উচিত ছিল।

মানুষ : (পাগলপ্রায় মাথাব চুল ছিঁড়ে) আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটু বাতাস চাই। খোলা হাওয়া। দরজা কোন দিকে আপনাদেব ? দরজা—

আম্মা : একি কোথায় চল্লেন ? বেশিক্ষণ দেরি কববেন না যেন। আপনার জন্য কফি তৈরি করে রাখব।

মানুষ : যদি ফিরে আসি খাওয়া যাবে। (বেগে প্রস্থান)

(খানিকক্ষণ নীরব। মাঝে মাঝে দূরে রকেটের হুস-শাঁইইই শব্দ। চাকরানির প্রবেশ)

আম্মা : কফিটা করতে খুব দেরি হবে কি ?

চাকরানি : পানি তো ফুটে গেছে। বললেই নিয়ে আসব! কিছু কেক কেটে দেব ?

আম্মা : ঘরের তৈরি কিছু কি বাকী আছে এখনও ?

চাকরানি : অনেক।

আম্মা : আমার দুষ্টু ছেলেটা কোথায় গেল।

চাকরানি : খাদের মধ্যেই কোথাও খেলছে হয়তো।

আম্মা : কোথায় কার সঙ্গে খেলছে কে জানে। নাহ্ এ গোঁয়াব ছেলেটাকে নিয়ে আর পারলাম না।

চাকরানি : কী আবার হবে মা। কামানগুলোব কাছে একটু আগে আমি ওকে দেখে এসেছি।

আম্মা : কামানের কাছে ? (ভীত)

চাকরানি : একটা কামানের ওপর পা ছড়িয়ে খোকা খেলছে।

আম্মা : না না। সে কী ? কামান কী খেলার জিনিস নাকি। যদি একটা কিছু হয়ে যায়।

চাকরানি : হবে আবার কী মা। গোলা বারুদ নেই এমনি কতদিন ধরে ওগুলো পড়ে রয়েছে। কবে যে ওর মধ্য দিয়ে আগুন বেরুতো সে কথা মনেও নেই এখন।

আম্মা : না না তবু—ও ঠিক হচ্ছে না।

(সুশ্রী এক তন্বীর প্রবেশ। পোশাক সাধারণ হলেও চোখে পড়ার মতো।)

তন্বী : আপা আপা ও এল বলে! ও সত্যি সত্যি আমাদের এখানে কফি খাবে। ওর কাছে শুনলাম তোমার সঙ্গে নাকি ইতোমধ্যে ওর আলাপ হয়ে গেছে। কী আলাপ করলে তোমরা, আমাকে ডাকলে না কেন ?

আম্মা : কী আবোল তাবোল বকছিস! কার কথা বলছিস ?

তন্বী : বাহ্ সে লোকটার কথা! ঐ যে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে ভেসে ভেসে যে এল। কী অদ্ভুত আশ্চর্য মানুষ!

আম্মা : ওহ। এরই মধ্যে পরিচয় করে নিয়েছ তাহলে!

তন্বী : হুহ্ ওর আসল নাম জংবাহাদুর। আমি সংবাদুড় বলে ডাকি। একটুও রাগ করল না সে জন্য। আমি যাই। এইবার পোষাকটা একটু বদলে আসি। (ছুটে বেরিয়ে গেল)

আম্মা : (হতাশায় মাথা নেড়ে) তিনটে পেয়ালা দিসরে!

চাকরানি : (স্পষ্ট—উত্তেজনা) কেউ আসবে নাকি ?

আম্মা : শুনতেই তো পেলি সব !

চাকরানি : কম বয়েসী পুরুষ মানুষ ?

আম্মা : না। মাঝ বয়েসী। তবে লোক ঝাঁঝালো।

চাকরানি : ওহ! আমি কাপড়টা একটু বদলে আসব মা ?

আম্মা : যা আছে তাই থাক। ওতে চোখে পড়ার ভয় কম থাকবে। লোকটার ঘরে পাঁচজন আছে।

চাকরানি : অ্যাঁ পাঁচ বিবি!... ওর দেশ কোথায় ?

আম্মা : দক্ষিণ মুলুকে।

চাকরানি : সে তো অসভ্যদের দেশ। ওরা জ্যান্ত মানুষ খায়। এতদিনে ওর পাঁচ বিবির মধ্যে কেউ হয়তো এক আধজনকে খেয়ে শেষ করে ফেলেছে, সে ফাঁক ভরবার জন্য লোকটা যদি আবার বিবি খোঁজে ? পাঁচ বিবি! বাব্বা! লোকটার জীবন কেমন করেই না জানি ওরা চালায়!

(চাকরানি মাথা নাড়তে নাড়তে চলে যায়। পেছন পেছন আম্মাও। এক মিনিটের জন্য মঞ্চ অন্ধকার। আবার আলো জ্বলতেই দেখা যাবে সুসজ্জিতা তন্বী আর লোকটা কফি খাচ্ছে)।

তন্বী : আপনি আশ্চর্য লোক।

মানুষ : কেকটা তো খেতে মন্দ লাগছে না।

তন্বী : কী করে এতদূর পথ অতিক্রম করে আমাদের কাছে এলে সে গল্প শোনাবে না আমাকে ? নিশ্চয়ই পথে কত কত রোমাঞ্চকর ঘটনা ঘটেছে ?

মানুষ : তা হ্যাঁ— এক রকম হয়েছে বৈকি।

তন্বী : সাগরের বুকে ছোট নৌকায়। একা তুমি কী অদ্ভুত সাগরে ভাসতে।

মানুষ : আরো কেক আছে নাকি ?

তন্বী : এই নাও।... চার দিকে নীল ঢেউ। পাশে কেউ নেই। এক মুহূর্তের জন্যও তোমার খুব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেনি ? মানে তোমার অমন গমগমে সংসারেব পর— মানে তোমরা দক্ষিণ মুলুকের উষ্ণাঞ্চলের লোকরা শুনেছি— একটু

বেশি— বিশেষ করে পাঁচ বিবিতে অভ্যেস হয়ে যাবার পর হঠাৎ অত নিঃসঙ্গতা কি একটু বেশি—

মানুষ : তা তো এক রকম লেগেছি বৈকি!

তন্বী : শুধু পানি আর পানি। দিগন্ত পর্যন্ত দেখা যায় না! রাতের পব রাত পার হয়ে যাচ্ছে। জোৎস্না ঢেউয়ে আছড়ে মরছে। (লোকটার ওপর কোনো আসর হয় না) আচ্ছা, এখানে নেবেও কি তুমি কারো দিকে তাকাওনি। কোনো পুরুষ— কোনো মেয়েমানুষ—

মানুষ : কারো দিকেই নয়। রাস্তায় তেমন কোনো মেয়েলোককে আমি দেখিনি।

তন্বী : কিন্তু যখন তুমি এসে আমাদের এখানে পৌছলে! তখন? অন্তহীন সমুদ্রের নিঃসঙ্গ বুকে যে বেদনা তুমি অনুভব করেছিলে তার কোনো মুক্তির ইঙ্গিত কি তুমি তখনও খুঁজে পাও নি? সত্যি কি পাও নি? লজ্জা কীসের! আমাকে বলতে লজ্জা কীসের!

মানুষ : উম্?

তন্বী : (আরেকটু ঘনিষ্ঠ হয়ে) তোমার সে বেদনা আমার কাছে কি অব্যক্ত থাকতে পারে? আমার কাছে প্রকাশ করো। হয়তো আমি তোমাকে— না মানে তা কেন— হয়তো তুমিই তাহলে কোনো এক করুণ তন্বীকে— তাব মানে ইয়ে— তোমরা জানো ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে সঙ্গীহীন দীর্ঘ রাত ও জীবন কী বিভৎস অভিশাপ।... আমি, ক্ষমা করো আমায়।

মানুষ : মদের বোতলটা এগিয়ে দাও তো।

তন্বী : মদের বোতল? অ্যাঁ? ওহ! না মদ আমাদের আর বেশি নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন— আমার ভুল হয়ে গেছে।

(হঠাৎ বাইরে একটা শব্দ গুড়ুম! গুলির আওয়াজ)

মানুষ : (লাফিয়ে উঠে) গুলিব আওয়াজ! গুলি করার মতো তাহলে কিছু পাওয়া গেছে। আমি যাই। আমার ডাক এসেছে।

(ছুটে বেরিয়ে যায়)

আম্মা : (ভযার্ত চেহারা। ছুটে ঢোকে) শব্দ— কীসের শব্দ হলো ওটা?

তন্বী : কোথাও কেউ গুলি ছুঁড়েছে হয়তো। শব্দ শুনে তাই মনে হলো।

আম্মা : কে, কে, এ কাজ করেছে? কী করে হলো এ রকম? গত এক বছবের মধ্যে কোনো দিনও এমন অঘটন এদিকে হয় নি।

চাকবানি : (একটি কিশোবকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে) এই সেই খুনে ছেলেটা। সারা ট্রেঞ্চের বাসিন্দাদের মধ্যে ওলট পালট হয়ে গেছে।

ছেলে মেশিনগান নিয়ে খেলছিল। হঠাৎ ছুটে গিয়ে এই কাণ্ড। গুলি ভবা ছিল।

আম্মা : (কিশোরকে) এদিকে এস তুমি। তোমায় মজা দেখাচ্ছি, পাজি কোথাকার।... উহ! কী সাংঘাতিক, মেশিনগান নিয়ে খেলা।

কিশোব : আমার কিন্তু দোষ নাই আম্মা। পশ্চিমের ট্রেঞ্চের ঐ যে ছেলেটা, ঐ না হঠাৎ ঘোড়াটা টিপে বসল। আমায় মেরো না আম্মা।

আম্মা : মারব না আবার। গুলি যদি কারও গায়ে গিয়ে লাগত ? (চাকবানি) কোনো খুন জখম হয়ে নি তো ?

চাকবানি : কে জানে ?

কিশোব : কারো দিকে গুলি ছুটে যায়নি আম্মা। নল আকাশের দিকে উঁচু করা ছিল একটু ঐ দিকে হেলান দেয়া।

আম্মা : কী বললি ? কোন দিকে ? খেয়েছে রে খেয়েছে। ও দিকে তো ও দেশের সীমান্ত, (চাকরানি) তুমি শিগ্‌গির যেয়ে একবার খোঁজ করো তো। সর্বনাশ হয়েছে! সর্বনাশ হয়েছে ' (চাকরানি চলে যায়। দুষ্ট ছেলেটা একটু জড়সড়ো হয়ে কোণে গিয়ে দাঁড়ায়। আম্মা উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করছে।)

কিশোব : (কান্না কান্না) আমাকে মেরো না। আমাকে মেরো না মা। আর কোনো দিন আমি এ বকম করব না।

আম্মা : যদি সত্যি তোর গুলি ও দেশের কারো গায়ে গিযে লেগে থাকে— ওবা আমাদের কী ভাববে বল তো ?

কিশোব : আমি জেনে শুনে করি নি। (কেঁদে ফেলে) হয়তো আমার গুলি লেগেই জুলি আর জিন মবে গেছে। কে জানে ? সব দোষ তো ঐ ছেলেটাব, আমি কি জানতাম যে টোটা—

আম্মা : (বাধা দিয়ে) কী বললি ? জুলি, জিন—এরা কারা ?

কিশোর : ওদের বাড়ি ওদেশে। ওপারের ট্রেঞ্চে থাকে। আমবা এক সঙ্গে খেলতাম— (ফুঁপিয়ে উঠে)।

আম্মা : বাহ্ চমৎকার! তারপর ?

কিশোর : আমবা লুকিয়ে লুকিয়ে সীমান্ত ডিঙিয়ে একত্র হতাম। (আম্মা হতবাক!)

চাকবানি : (ছুটে ঢোকে) মা মা কে জানি আসছে। ওপাব থেকে। ও দেশের মেয়েলোক। হাতে সাদা নিশান। হায় কী সর্বনেশে কাণ্ড রে বাবা। ওই সীমান্তের ট্রেঞ্চ থেকে আমাদেব দিকে ছুটে আসছে।

মানুষ : (উল্লসিত) সাদা পতাকা! সন্ধি, সন্ধি চায় ওবা কাপুরুষ এক গুলিব চোটেই আত্মসমর্পণ করতে ছুটে আসছে।

কিশোর : (কিছুক্ষণ আগেই অলক্ষ্যে ঢুকেছে) আম্মা যুদ্ধ কি শেষ হয়ে গেল নাকি ?

মানুষ . (যেন সব ঘটনাব সেই আসল সমঝদাব) সন্ধিব প্রস্তাব আমি আলোচনা কবব। ওসব আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমবা দূবে থেকো আমার সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না।

(জং বাহাদুরের প্রস্থান)

আম্মা : কী হবে। কী হবে এখন ? পাজি ছেলে তোর গুলি যদি সত্যি ওদের কারো গায়ে গিয়ে লেগে থাকে তাহলে এখন কী হবে ?

কিশোর : (ডুকরে ডুকরে) এমন কাজ আমি আর কক্ষণো করব না, কক্ষণো না।

মানুষ : (নেপথ্যে ঘোষণা করে) আসুন এই পথে আসুন। (হাতে সাদা নিশান, পোষাক আলাদা ধরনের, একজন ওদেশের মেয়ে প্রবেশ করে। আঁটো আঁটো সুঠাম মহিলা)

ওদেশের মেয়ে : (উচ্চারণে বিজাতীয় টান) এই যে সব্বাই ভালো আছেন আপনুরা ? আমি শুনছি উকটা দুষ্টু ছেলেই নাকি সব নুষ্টের গুড়া। আমরা সব্বাই কু ভূয়ী পুয়াছিলাম। ঐটুই সে ছেলুটা নুকি ? (এগিয়ে যায়)

আম্মা : খোকা, আদাব দাও। ক্ষমা চাও ওর কাছে।

কিশোর : আমি তো ওনাকে চিনি আম্মা। উনি তো জুলির মা। ও দেশে গিয়ে যখন একদিন নুকিয়ে নুকিয়ে আমরা খেলছিলাম তখন জুলি দূর থেকে ওনাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। এখন দেখেই আমি ঠিক চিনতে পেরেছি।

ওদেশের মেয়ে : তুমি তাহলে আমুকে চেনু ? আমুদের ওদুকে তাহলে তুমি যাও। কুই জুলিত কোনুদিন সে কথা আমুকে বুলে নি ?

কিশোব : ভয়ে আমবা কাউকে জানাতাম না, যদি বারণ করে দিন আপনারা।

মানুষ : (গলা খাকবা দিয়ে কিশোরকে) তোমার বন্ধু— ঐ যে কী একটা নাম বললে তাব— সেও কি আমাদের ট্রেঞ্চেব মধ্যে আসত নাকি ?

কিশোব · নিশ্চযই। প্রাযই আসে। আমবা একসঙ্গে খেলি যে।

মানুষ গুপ্তচর। গুপ্তচর। গুপ্তচবের কারসাজি এগুলো। হায় খোদা এদের কি কোনো দিন বুদ্ধিসুদ্ধি হবে না।

তন্বী সং-বাহাদুর যাতা বকো না। গুপ্তচবে গুপ্তামি করার মতো না এদিকে কিছু আছে না ওদিকে কিছু হয়েছে। ঠিক বলি নি ?

ও-মেয়ে . একশু-বুব (কিশোবকে) তুমি যদি সুত্যি সুত্যি আমুর মেয়ুর বন্ধু হও— কুনু তাহুলে তুমি তুব—তুমি তুর শুব্দু টু কি যেনু—

তন্বী · ক্ষতি অমঙ্গল।

ও-মেয়ে : হ্যাঁ হ্যাঁ। ও ঠিক না ?

কিশোর আমি ইচ্ছে করে ছুঁড়িনি। হঠাৎ ছুটে গিয়েছিল। আমি নিজে ভয়ে কেঁদে ফেলিনি ?

আম্মা আপনার দিকেব কেউ আহত হয় নি তো ?

ও-মেয়ে : কেউ না। রুদেব মুধ্যে কাপুড় শুকুতে দিছুলুম তার একটা একটু ফুটু হযেছে।

আম্মা আমবা আপনাকে একটা নতুন কাপড় তৈরি করে দেব।

ও-মেযে কেনু এসুব কথা বলুছেন ? আমুবাত প্রথুমেই বুঝুছিলুম যে নিশ্চই কোনু ভুলে ওটা ফুটুছে। তবু ওরা আমুকে পাঠুছে ভালু করে শুনু যেতে

আম্মা : আপনাদের এ-ব্যবহারে আমরা সত্যি মুগ্ধ। বসুন। এক পেয়ালা কফি খান আমাদের সঙ্গে।

ও-মেয়ে : একশু বুর।

আম্মা : (চাকরানিকে) ওঁকে এক পেয়ালা কফি এনে দাও। তারপর একবার পোস্ট অফিসে যেয়ে দেখে এস আমাদের কোনো ডাক আছে নাকি।

(চাকরানি কফি ঢেলে চলে যাবে)

ও-মেয়ে : আপ্নুদের খাবার ব্যবস্থাত বুড় ভালু। কী চমুৎকার কুরে সুজিয়েছেন সব কিছু। এটা কী ? কুক্! আহ! বিদেশী কুক কতুদিন খাই নি।

আম্মা : খান তাহলে ভালো করে খান।

ও-মেয়ে : একশু-বুর (বসে পড়ে)

তন্বী : আপনি দেখছি আমাদের ভাষাতেও খুব চমৎকার কথা বলতে পারেন।

ও-মেয়ে : আমু যে এইখানকাব কলুজ্যে পুড়েছি। সে যুদ্ধুব অনেক আগে (হঠাৎ উচ্ছ্বসিত)। আরে আপুনার পোষুকটাত বড় সুন্দর।

তন্বী · আমাব নিজ হাতে তৈরি।

ও-মেযে : চমুৎকার। পাট্যার্নটা আছে তু। আমুকে একু দিনের জনু দিতে হবে। বড় খুশি হলুম, বড় খুশি হলুম। (আম্মাকে) আবে আপুনি উহা কি শিলুই করছেন ? বাহ্ কী চমৎকার। নিজে ঐ নক্শা বুনুছিল ? নিজেব জনু ? ওটা কী ?

আম্মা : আমাব স্বামীর জন্য তৈরি কবছি। নতুন ডিজাইনের একটা গ্যাসমুখোস।

ও-মেযে : শিলুইতে নতুন ডিজাইন দেখুলে আমু একিবুরে পুষগুল হযে যাই। আপুনার স্বামী দেখে নিশ্চই খুবু খুশু হবুন! কী চমুৎকার ?

মানুষ : (ক্ষেপে) বাবে কুকিল। কেবল কু-কু কবে।

ও-মেয়ে : (ঘুরে তাকায। হেসে) বুলুলেন ?

মানুষ : প্রস্তাব পেশ করবেন কখন ? অনেকক্ষণ ধৈর্য ধবে বসে রয়েছি। আব সহ্য হচ্ছে না। প্রস্তাব পেশ করুন।

ও-মেয়ে : প্রস্তুবু ? কীসের প্রস্তুবু ? কী বুলুছুন আপনি ? দুষ্টু ছুলুটা ত বুলুছে এমুন কাজ আব কুখুনু কুরুবু না! বুলুনি তুমি খুকু ?

খোকা : ঝকমক।

ও মেয়ে : বাহ্ কী চমৎকার নাম। ঝুকুমুকু! (লোকটাকে) আপনার নাম কী ?

তন্বী : আমি ডাকি সং-বাদুড় বলে। নিজে পরিচয় দেয় জং-বাহাদুর বলে।

ও-মেয়ে : জুংবুং দুহুর! বাহ্ এটুও কী চমুৎকার নাম। জুংবুং দুহুর অপুনি আমুদের উদিকে বেড়াতে আসুবেন একুদিন ? দুনিয়ার সেরা শ্পমুয়া আমুরা খেতু দুবু আপুনাকে।

মানুষ : (সুব বদলে) সত্যি ? ওহ্ গলাটা একেবারে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কতদিন যে ভালো মাল পড়ছে না।

(লোকটা প্রায় তখনই যাবে বলে উঠতে যায়)

তন্বী : (ক্ষিপ্ত হস্তে বাধা দিয়ে) না। ও কোথাও যাবে না। ও আবার দেশে ফিরে যাবে, ও যুদ্ধ করবে। এতদূর পথ খামোকা এসে শেষে কিনা—

ও-মেয়ে : মাক্রভূমুর জন্য যুদ্ধ কুরুবেন ? জুংবুং দুহুর আপনি বীর—আপুনাকে আমি শ্রুদ্ধা কুরি। (মেয়েদের দিকে ঘুরে) আপনুরা সবাই কিন্তু নিশ্চই আসুবেন। হয় তু আমুদেব মধ্যে আমুরা একুটা শিলুয়ের ক্লাবও শুরু কুরু দিতু পাবে' তাহলে বুড়ু মুজার হবে! চুপুচুপু উকুউকু বুসু থাকতে বুড়ু খুরাব লাগে।

(চাকরানি— হাতে টেলিগ্রাম। চোখমুখ অন্যরকম)

আম্মা : কী ? কী হয়েছে ? তোমার চোখমুখ ও রকম কেন ?

চাকবানি · আপনাব নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

আম্মা : (কাঁপছে) আমার নামে ? দেখি, দেখি।

চাকবানি . বাড়ির খবর। (ফুঁপিয়ে) নতুন এক গ্যাস! বহু লোক মবেছে। এ গ্যাস নাকি সব কিছু ভেদ করতে পারে। চামড়ায় গিয়ে লেগে থাকে। কোনো গ্যাসমুখোসই আটকাতে পারে না এটাকে।

আম্মা : কোথায় ? টেলিগ্রাম কোথায় ? (টেলিগ্রাম পড়ে পাথর বনে যায়। প্রাণহীন গলায়) যারা মারা গেছে— আমাব স্বামী তাদের মধ্যে একজন।... এ না হয়ে বোধ হয় উপায় ছিল না।

কিশোব : আম্মা! আম্মা! কী হয়েছে আম্মা ?

(চিৎকার করে ডুকবে ওঠে)

আম্মা খোকা!

ও-মেয়ে আমি সত্যি দুঃখ্যিত! আমু আমার আন্তুরিক—মানে—হয়ো—শব্দুটা কী যেনু ? মুনু পুড়ছে না ছাই!

(লোকটা এক লাফুনিতে বন্দুক তুলে নেয়। মাথায় হেলমেট এঁটে দরজার পথে পা বাড়ায় কিশোরী ঘরে ঢোকে)

কুপোকাত

চরিত্র

খরগোশ
বাঘ
শেযাল
মোষ
সজারু
হরিণ
ময়ূর

[দৃশ্য : অরণ্য। এক পাশে মাটির ঢিপি। তার গায়ে স্তম্ভের আকারে ইষ্টক চিত্রিত। দেখে মনে হবে যেন একটা কুয়ো, ঢিপির চুড়োয় তার মুখ।

ঘটনা : পশুদের জনসভা। আছে মোষ, ময়ূর, হরিণ, সজারু, শেয়াল ও খরগোশ। সভাপতি হলেন মোষ।]

মোষ : [করতালি শেষ হলে] বড়ই পরিতাপের বিষয় যে খরগোশ আমাদের সিদ্ধান্ত মানতে রাজি হচ্ছে না। তাকে আমরা সকলে সাধ্যমতো বুঝিয়ে বলেছি। জাতীয় স্বার্থে সকলেরই আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। খরগোশ অবুঝ। সে কেবল নিজের জীবনকেই বেশি মূল্যবান মনে করে। কে না জানে এক ভীষণ বাঘের অত্যাচারে আমাদের সকলের জীবন বিপন্ন। এই ভয়ানক ব্যাঘ্র প্রত্যহ নির্বিচারে বহু প্রাণী হত্যা করে। কিছু খায়, কিছু ফেলে রাখে। আমাদেরই অনুরোধে শেয়াল বাঘের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে একটা আপোষ-রফা করে। সেই অনুযায়ী স্থির হয় যে, অদ্য খরগোশ স্বেচ্ছায় মহামান্য বাঘের খাদ্য হিসেবে নিজেকে উৎসর্গ করবে। কিন্তু খরগোশ এই প্রস্তাব মানতে অনিচ্ছুক। এখন উপায় কী? আমি আর একবার শেয়ালকে বলি, আপনাদেরকেও বলি, খরগোশকে বুঝিয়ে বলুন। তাকে রাজি করান।

শেযাল : দেখ খরগোশ, আমি অনেক কষ্টে বাঘকে শান্ত করেছি। সে বলেছে যে তাকে যদি রোজ একটি করে জীব আমরা উপহার দেই, তবে সেদিন সে আর অকারণে অন্য জীব হত্যা করবে না। আজ তুমি বীরের মতো সহাস্যে এগিয়ে যাও, কাল তোমার পথ অনুসরণ করে অন্যজন যাবে। সকলের মঙ্গলের জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে তোমার ইচ্ছে করে না?

খরগোশ : না। আমি অন্যের খাদ্য হতে চাই না। আমি নিজে খেতে চাই, বাঁচতে চাই।

সজারু : সে সকলেই চায়। কথা তা নিয়ে নয়। যে দিন আমার সময় আসবে, আমি পেছপা হব না। অবশ্য হয়তো আমাকে নির্বাচন করা কখনই ঠিক হবে না। কারণ আমার সর্বাঙ্গে কাঁটা। চেহারাও বিদঘুটে। বাঘ হয়ত আমাকে দেখে, খাওয়ার বদলে ক্ষেপে যাবে। তাতে সকলের বিপদ আরও বেড়ে যেতে পারে। অবুঝ হোয়ো না। দেরি না করে বাঘের গুহায় চলে যাও।

মোষ : সজারু ঠিকই বলেছে। শেয়াল যা করে তা আমাদের মঙ্গলের জন্যই করে।

ময়ূর : অবশ্য এর মধ্যে আরও একটু কথা আছে। সজারুর কথাও ঠিক আবার তার উল্টোটাও ঠিক।

শেয়াল : একটু পেখম ছড়িয়ে বলো, সবাই সহজে বুঝতে পাবে.

ময়ূর　　মানে, কদাকার হওয়ার যেমন সুবিধা অসুবিধা আছে, তেমনি বেশি সুন্দর হবারও অসুবিধা অনেক। আমি সব সময়ই যেতে রাজি আছি। যেদিন সকলে আমার যাওয়া স্থির করবেন, আমি নিশ্চয়ই যাব। তবে, আমি লক্ষ করেছি, আমাকে সামনে পেলে, সবাই খাওয়ার কথা ভুলে যায়। আমার শোভায় মুগ্ধ হয়। বেশি সুন্দর বলে কেউ খেতে চায় না। আমাকে খাওয়া চলে না বলে মনে করে। বাঘ তা পছন্দ নাও করতে পারে। তাতেও সকলের বিপদ বাড়বে বই কমবে না।

হরিণ　: কথা বাড়াস নে খরগোশ। লক্ষ্মী ভাই, তোর লেজে পড়ি, এবার যা তুই!

মোষ　: বেলা বেড়ে যাচ্ছে। বাঘ নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে। আর বেশিক্ষণ এখানে সমবেতভাবে থাকা মোটেই নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

শেয়াল　: সভাপতি সাহেব, সভা ভেঙে দিন। গর্জন শোনা যাচ্ছে। হয়তো এখানেই এসে পড়বে। খরগোশ না যেতে চায় এখানেই থাকুক। আপনি সভা ভেঙে দিন। আমরা বিদায় হই।

মোষ　: সভা ভঙ্গ। বিদায়, বিদায়, বিদায়!

[খরগোশ ব্যতীত অন্য সকলের দ্রুত প্রস্থান]

খরগোশ　: (একাকী)

কত গাজর কত মূলো কত না সুন্দব এই পৃথিবী,
স্বপ্নের মতো কচি কচি কত সবুজ ঘন বাঁধাকপি।
মবিতে চাহি না অল্প বয়সে,
চাহি নাক যেতে বাঘের গ্রাসে।
যে করে পারি রহিব আঁকড়ি লইব মাটির সুরভী,
আহা, কত গাজর, কত মূলো, কত না সুন্দর এই পৃথিবী।
সকালে বিকালে, পাতায় পাতায়, ঝরিবে আলোর ঝরণা,
ঘাসের ডগায়, ফসল মূলে, কাঁপিবে কত শিশির কণা।
আমি কি রব ব্যাঘ্র উদরে,
ঘুমায়ে পড়িব চিরতরে ?
চিবায়ে চিবায়ে দাঁতের ফাঁকে, লুটিবে মজা ঘোর পাপী।
আহা, স্বপ্নের মতো কচি কত সবুজ ঘন বাঁধাকপি।

[চিন্তাযুক্তভাবে পদচারণা।]

সকলে বলে
ভেজিটেবিলে
　　শক্তি বাড়ে বুদ্ধি গজায়!
ও ভাই পালং
ও ভাই মূলো
　　শীঘ্র বল মুক্তি উপায়।

গাজর কপি
মটর শুঁটি
খেয়েছি বোজ মজায় মজায়:
তবু কি আজ
হবে না কাজ
বিপদ যখন নাকেব ডগায় ?

[প্রাণপণে কাঁচা তরকারি চিবিয়ে খায় এবং চিন্তা করে। হঠাৎ উল্লসিত হয়ে]

পেয়েছি পেয়েছি পেয়ে গেছি ভাই, বুদ্ধি, ফুর্তি, ফুর্তি'
এখনি দেখিবে, কেমনে হবে কার্য সিদ্ধি, ফুর্তি ফুর্তি'
বাবাজি ব্যাঘ্র দেখেছো মোষ, দেখনি কি খরগোশ.
বাঘেব ছালে বানাব আজ নরম বালাপোশ'

[নেপথ্যে বাঘের গর্জন।] /

বাবাবে বাবা, কাঁপিছে প্রাণ, হাঁকিছে বজ্রনির্ঘোষ'
দেখিয়া দেরি আসিছে স্বয়ং, ক্ষেপেছে বেটা বাক্কোস'
এখনই বুঝি, প্রবেশে আসি, তুলিয়া ধরিবে থাবা'
আসলে ফাঁকি, সকলি ভাণ, সাজিতে হবে গো হাবা'

[খরগোশ মাথা নিচু করে কাঁদতে থাকে। বাঘের প্রবেশ]

বাঘ : আমি ক্ষুধার্ত। কথা ছিল সূর্য খাড়া মাথার উপর উঠার সঙ্গে সঙ্গে আমাব দুপুরের খাদ্য আমার সামনে হাজিব হবে। হযনি কেন ?

খরগোশ : হুজুরে হাজির হলাম!

বাঘ : কিন্তু দেবি হলো কেন ?

খরগোশ : সে কথা মনে করেই তো কাঁদছি।

বাঘ : তোর মনে আবার এতো দুঃখ থাকবে কেন ? এতটুকু পশু তুই। তোব সুখই কী আর দুঃখই কী ?

খরগোশ : আমার অনেক দুঃখ। মনে অনেক কষ্ট।

বাঘ : আমার অভ্যন্তরে যেতে হবে বলে তোর এত দুঃখ! দেখ্ আমি হচ্ছি এই অরণ্যেব সন্ত্রাস, যাকে বলে বাজা বাহাদুব। আমাব ওপরে কেউ নেই। আমার ডোরাদার পেটের মধ্যে যেতে পাবা তোর মতো ক্ষুদ্র পশুর পক্ষে এক মহা সৌভাগ্য!

খবগোশ : আপনার ওপবে আরেকজন আছে। সেই তো সব নষ্ট কবেছে। সেই জন্যই তো কাঁদছি।

বাঘ : কী বললি ? অত ফোঁপাস নে। ফোঁপালে তোর গোঁফ আর পশম এত থব থর করে কাঁপে যে তাতে সব কথা আটকে যায। কিছুই পবিষ্কাব কবে বুঝতে পারছি না। গোড়া থেকে বল। কাঁদছিস কেন ?

খরগোশ : আমি এত ছোট, এত সামান্য, পরিমাণে এত অল্প! আমাকে খেয়ে কি আপনার কোনো পরিতৃপ্তি হবে ? এই দুঃখে কাঁদছি।

বাঘ : আমি আবার তোর বেড়াল ভাইয়ের দাদা হই কি না, দিনেব বেলায় সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পাই না। কাছে আয় দেখি। তাইতো, তুই দেখছি সত্যি অতি ক্ষুদ্রকায়। শেয়াল পণ্ডিত দেখছি ভারি পাজি। বেছে বেছে সবচেয়ে গুটকোটাকে পাঠালো ?

খবগোশ : না না, হুজুর, শিয়াল মামার কোনো দোষ নেই। আপনার জন্য পাঠান হয়েছিল আমার সেজ আপাকে। ইয়া মোটাসোটা। কী হৃষ্টপুষ্ট!

বাঘ : এ্যাঁ! তাহলে তাব বদলে তুই এলি কী জন্যে ?

খবগোশ : সেই দুঃখেই তো কাঁদছি। সেজ আপাকে আরেকটা বাঘ খেয়ে ফেলেছে'

বাঘ : কী বললি ? আমার মুখের গ্রাস অন্যে কেড়ে নিয়েছে ? এত বড় সাহস!

খরগোশ : সেজ আপাও কত কান্নাকাটি করল। বারবার আপনার কথা বললো। কিন্তু কিছুতেই শুনল না। ঐ বাঘটা দেখতেও ঠিক আপনার মতো। তবে আবও রাগী আরও তেজি। তাই তো কাঁদছি। তখন উপায় না দেখে সবাই আপার জায়গায় আমাকে ঠেলে পাঠাল। আমি কি আপনার খাদ্য হবাব যোগ্য ? আমার কি সেজ আপার বহর আছে, না সে বকম মেদময় অঙ্গ! আমাব কত দুঃখ' সে জন্যই তো কাঁদছি!

বাঘ : কাঁদিস না। আজ বোধ হয় তোকে বাইরেই জীবন কাটাতে হবে। কারণ আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে নিজের ঐ জাত ভাইটির ঘাড় মটকাই। রক্ত হাড় মাংস সব এক সঙ্গে মিশিয়ে লোকমা লোকমা খাই! কোথায় ওটাকে পাওয়া যাবে একবার আমাকে দেখিয়ে দিতে পারিস ?

খরগোশ : তা পারব। তবে আপনি সামনে থাকবেন, আমি পেছন পেছন এগিয়ে আসব। আপনার সংকল্প দেখে আমার দুঃখ একটু একটু করে কমছে।

বাঘ : কোনো ভয় নেই তোব। আমি সঙ্গে আছি। পথ দেখিয়ে নিয়ে যা। আমি আবার দিনের বেলায় সব ঠিক মতো ঠাহর করতে পারি না। শেষে ভুলে অন্য কাউকে সাবড়ে না দেই।

খবগোশ : আসুন। এই দিক দিয়ে আসুন। এই ঢালু পথটা দিয়ে একটু নিচে নামব। এরপর থেকে জঙ্গল কিছু ঘন হয়ে এসেছে। সাবধানে পা ফেলবেন হুজুর। এইবারে একটু উপবেব দিকে উঠতে হবে। পাহাড়িয়া পথ কিনা। এর মাথাতেই আপনার দুষমনের গুহা। আসুন আরেকটু এগিয়ে আসুন। আমার ভয় করছে। আপনি সামনে আসুন। গুহার মধ্যে চোখ দিয়ে ভেতরে নিচের দিকে তাকান।

বাঘ : কৈ কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

খরগোশ : হুজুরের বোধহয় আলোর ঘোর এখনো ভাল করে কাটেনি। আর একটু চেষ্টা করে দেখেন। কিন্তু সাবধান থাকবেন। আপনাকে দেখতে পেলে ও কিন্তু ক্ষেপে যাবে।

বাঘ ঐ তো! ঐ তো! দেখা যাচ্ছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। চকচক করছে অবিকল আমার মতো দেখতে। এ্যা! এত বড় সাহস, আমাকে চোখ পাকাচ্ছে। খবরদার! আমাকে তুই হুমকি দিস?

খরগোশ হুজুর!

বাঘ না না। কোনো কথা নয়! ওর একদিন কি আমার একদিন। আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছিস? তোর মাথা ফাটাব, দাঁত ভাঙব, গোঁফ উপড়ে ফেলব, চামড়া খুলে ফেলব! কী আমাকে পাল্টা গালি দিচ্ছিস তুই? তবে রে ও জানোয়ার—হালুম! হালুম! হালুম!

[ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ও কুয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। পানির মধ্যে ঝপাৎ করে পড়ার এবং পরে তার মধ্যে হাবুডুবু খাবার শব্দ শোনা যাবে।]

খরগোশ (নাচতে নাচতে)

হুররে হুয়া, কেয়া মজা, বনের রাজা কুপোকাত
কুয়ার মধ্যে দেখে ছায়া, ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত!
হুররে হুয়া কেয়া মজা, কেল্লা ফতে বাজিমাত!
বনের রাজা কুপোকাত,
ঝম্প দিয়ে প্রাণপাত!
তাইতো বলি যত পারো কেবল খাও তরকারি
বাড়বে দেখ গায়ের বল, বুদ্ধি হবে তরবারি
গাজর মূলো শাক-সব্জি
শক্ত হবে হাতের কব্জি,
খেলে পাবে পুষ্ট পালং টাটকা, তাজা শালগম,
হবেই হবে সকল কাজে অতিশয় পারঙ্গম!

[যবনিকা]

মর্মান্তিক

একটি গীতি-রণ-রঙ্গনাট্য

চরিত্র

অধ্যাপক
প্রকটক
খোকেন
মোমেন
রসুল
ফজল
প্রবোধক
ছাত্রদল
মাসুমা
সায়েরা
১ম তন্বী
২য় তন্বী
৩য় তন্বী
ছাত্রীদল

[মঞ্চের এক কোণে একটি চায়ের টেবিলে চারজন যুবক। একজন বেশি উত্তেজিত বলে সর্বক্ষণ বসে থাকতে পারছে না। টেবিলে ধূমায়িত চা সারিবদ্ধ সাজানো রয়েছে এমনকি চায়ের চামচগুলো পর্যন্ত একই দিকে ভর্তাবতে কাত করে রাখা। যুবকদের পোশাক টেনিস খেলার। সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, সাদা মোজা, সাদা কেটস। গায়ে হাতকাটা নীল সোয়েটার, হাতে টেনিস র‍্যাকেট, সবার হাতে একই ভঙ্গিতে মুঠ করে ধরে রাখা। সংলাপের সময় না হলেও গানের সময় অবশ্যই, অন্যান্য সময়ও যখনই সম্ভব হবে, প্রত্যেকের হাত, পা, শরীর, হাতের র‍্যাকেট, চামচ সবই কথা ও সঙ্গীতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নড়বে চড়বে। যে যুবক বেশি উত্তেজিত তার নাম খোর্শেদ। অন্যান্যরা মোমেন, রসুল, ফজল।]

সমবেত — আমরা মর্মাহত

আমরা মর্মাহত

আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ — সে ছিল আমাদের সহপাঠিনী

ছিল নাকি পথচারি যৌবনী উদাসিনী

কটিনে কোনোদিন করেনি কামাই,

আচল শাড়িতে খেলতো কতো না রোশনাই।

অথচ কী অখণ্ড মনোযোগে,

লেকচার শুনতো

নিঃশ্বাস প্রহত,

আড়চোখে তাকালে

কত না শর্মাতো।

সমবেত — আমরা মর্মাহত

আমরা মর্মাহত

আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ — একান্ত করে ছিল না সে

তোমার কি আমার

তবু ছিল কাছাকাছি,

প্রতিদিন নাম ডাকে সাড়া দিত,

মনে হতো বেঁচে আছি, বেচে আছি।

কাঠের বেঞ্চিতে তার বসন এলায়িত,
গুরুর ঘন ঘন চিৎকারে ক্লাশঘর মুখরিত
হৃদয়ের বাসনা হৃদয়ে গুঞ্জরিত।

সমবেত : আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ : মায়েরা বানুর সবে প্রথম বর্ষ,
তিনটি বছর ছিল অনাগত।
কত না মধুর ছন্দে চিৎপ্রকর্ষ
ক্রমে ক্রমে হতো বিকশিত।

সমবেত : আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত।

খোর্শেদ : আকস্মাৎ গুরুর এ-কী নির্মম আচরণ,
কেড়ে নিল শিষ্যের ধন, ছেড়ে উচ্চাসন।
মঞ্চে ও বেঞ্চিতে নির্ণীত ছিল শুধু
বাক্যের বন্ধন
কেন তাতে মেশালে
দিনে দিনে কৌশলে
হৃদয়ের স্পন্দন?
হতে হলো অপমানিত
চিরতরে অপসারিত।

সমবেত আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত
আমরা মর্মাহত

খোর্শেদ : চুপ করো, চুপ করো, বন্ধ করো আর্তনাদ,
সহ্য না হয় আর বিষণ্ণ বিষাদ।
মর্মে মর্মে নিহত হয়ে আমরাই কুপোকাৎ,
কর্মে কর্মে জেগে উঠো, শত্রুকে হানো আঘাত
তোমরা হও উত্তেজিত, হও কর্মে রত
শুধু বসে বসে হয়ে থেকো না মর্মাহত

সমবেত : আমরা উত্তেজিত
আমরা কর্মোদ্যত,
আমরা রব না রব না মর্মাহত।

সমবেত — চাচাচা চাচা।

খোর্শেদ — হাত মুঠ শিব উঁচা

বাজে কুচকাওয়াজ

জান বাঁচা জান বাচা।

সমবেত — চাচাচা চাচা।

খোর্শেদ — প্রকটকে জানা

বণ ডঙ্কা আজ

জোবসে বাজা।

সমবেত — চাচাচা চাচা।

(তালে তালে সাবিবদ্ধভাবে প্রস্থান। চাব তন্বীব প্রবেশ। তিনজন এক একজোটে, একজন স্বতন্ত্র। স্বতন্ত্রেব নাম মাসুমা।)

তিন তন্বী — ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।

এ-কী কাণ্ড গর্হিত।

প্রথম বর্ষেব কন্যায প্রণয়েচ্ছা।

এ যে অন্যায অনুচিত।

মাসুমা — তুমি গুরু, তুমি অধ্যাপক, অতি শ্রদ্ধাভাজন,

জ্ঞানমন্ত্রে মেনেছ জীবন-মবণ-সাধন।

চতুর্বর্ষ ধবে দেখেছি, তোমাব কর্মধাবা

দেখিনি কখনও প্রণয কৌতুকে এতো মাতোযাবা

বিদায বেলায দেখে যেতে হলো লুপ্ত তোমাব সম্বিৎ,

বালিকাব রূপ কেড়ে নিলো জ্ঞান, বিবেকেব হিতাহিত।

তিন তন্বী — এ-কী কাণ্ড গর্হিত,

এ যে অন্যায অনুচিত।

প্রথম বর্ষেব কন্যায প্রণয়েচ্ছা,

ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।

মাসুমা — শুধু ধিক্কাব নিন্দায হবে না শান্ত

অন্তব মাতন,

দেখে যেতে চাই তাব চবম শিক্ষা অপমান

নির্যাতন।

এম এ পরীক্ষা সদ্য কর্বেছি সমাপ্ত

ত্যাজিনি বিদ্যাভবন,

এরি মধ্যে আমারে বঞ্চিয়া কবেছো হিয়া

ষোড়শীবে সমর্পণ।

জানে গো জানি; কোন গুণে করেছ
নবীনারে মোহিত,
তোমার এ কীর্তি গুরুজন মাঝে
তুলনা রহিত।

তিন তন্বী : এ-কী কাণ্ড গর্হিত,
এ যে অন্যায় অনুচিত।
প্রথম বর্গের কন্যায় প্রণয়েচ্ছা
ছি ছি এ-কী লজ্জা, লজ্জা।

মাসুমা : তাই বলে, হইনি উদাসীন প্রসাধনে,
রীতিমতো করি সাজসজ্জা'
তোমার কুকাণ্ডে হইনি হতবুদ্ধি,
আদৌ যাইনি মূর্চ্ছা।

তিন তন্বী : মাসুমা মাসুমা তুমি নও একা,
আমরা তোমার দুঃখ সুখের সহচর।
নব না নব না নম্র লতিকা
হানব আঘাত রুদ্র ভয়ঙ্কর।

১ম তন্বী . যুদ্ধ এবার গৃহ সীমান্তে,
ক্ষুব্ধ চেতনা রোষে উদ্বেল।

২য় তন্বী · হানাদারে দিতে শিক্ষা
শিখেছি চালাতে রাইফেল।

৩য় তন্বী না যদি হয় কথার বাধ্য
বিদ্ধ হবে হৃদয়ে শেল।

মাসুমা ভয় নাই মোর ভয় নাই আর
তোমরা করেছ অঙ্গীকার,
এবার তবে পুরুষপুঙ্গব
চূর্ণ করিব অহঙ্কার।
বিলাপে নয় কালক্ষয়,
কর্মে হোক পরিচয়।
মর্মে মর্মে বোঝাব তারে
প্রণয় নয় রঙ্গময়।

তিন তন্বী তবে বিলম্বে কী কাজ
তোরা পরে নে পরে নে সাজ।
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।

চল যাই সার বেঁধে
গুরুজীর কক্ষে,
দেখে নেব অদ্য
কে কাহারে রক্ষে।
যদি আজ কন্যা
এসে পড়ে অচিরাৎ,
নিশানায় নির্ভুল
আঘাতিব নির্ঘাৎ।
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।

মাসুমা — ওরে তোরা থাম রে থাম
এখনি চলে যাসনে।
জপিতে জপিতে গুরুর নাম
কে যেন আসিছে এখানে।

তিন তন্বী — চলো যাই তাড়াতাড়ি ঐ ডালে লুকাই,
এ যে দেখি মেয়ে নয়, জ্বলন্ত আশনাই।

(সায়েরা বানুর প্রবেশ)

সায়েরা — আমি তন্বী, আমি ছাত্রী, আমি সম্রাজ্ঞী,
লভেছি স্বাদ, জেনেছি অদ্য, অনুরাগ কী।
না করিব না করিব আর ট্যুটোরিয়াল ক্লাশ,
পাঠাগার কারাগার জীবন-সন্ত্রাস।
জ্ঞানভাণ্ডারি প্রেমকাণ্ডারি জানো না কি ;
সেই মহাজনে জাগরে স্বপনে সাথে রাখি।
আমি তন্বী, আমি ছাত্রী, আমি সম্রাজ্ঞী,
লভেছি স্বাদ, জেনেছি অদ্য, অনুরাগ কী।

তিন তন্বী — শোনো গো প্রথম বর্ষের কন্যা,
ভেবো না নিজেকে পুলকে ধন্যা।
জানো না কি গুরুজীর পীরিতির বন্যা
উপচিত জনে জনে কেহ নহে অনন্যা।

১ম তন্বী — মনীষী নয় কোনো ঐ তরুণ তাপস,
গুরুগিরি শুধু ছলনা, অন্তরে আতশ।

২য় তন্বী : শুনেছি তার বৌ আছে, গেছে পিত্রালয়ে
র ধারে অনর্থ অনিবার্য, মহাবিদ্যালয়ে

৩য় তন্বী   আছে কাচ্চা বাচ্চা গণ্ডা গণ্ডা,
শ্যালকেরা অতিশয় ষণ্ডা ষণ্ডা।

(সবটা সমবেত ভাবে পুনরাবৃত্ত হবে এবং তন্বীগণ ক্রমশ সায়েরা বানুর নিষ্ক্রমণের পথ রুদ্ধ করে ব্যূহ রচনা করে ঘিরে দাঁড়াতে থাকে।)

সায়েরা   : আহা তোমরা সবাই কত ভালো,
পরহিত চিন্তায় ঘুম নেই
যদি খুঁজে পেলে অনাচার,
আশু প্রতিকার করবেই।
কিন্তু শুনো গো মানবী দেবিনী,
তোমাদের করি জোড় হাত,
সুনীতির কথা শুনিতে পারি না
আমি তো নহি তোমাদের ধাত

তিন তন্বী   সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।
তোরা পরে নে পরে নে রণ-সাজ,
এসেছে সময়, রেখে দে অন্য কাজ
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।
যেতে নাহি দিব কারে গুরুজীর কক্ষে,
দেখে নেব অদ্য কে কাহারে রক্ষে।
তবু যদি কন্যা চলে যায় অচিরাৎ
নিশানায় নির্ভুল আঘাতের নির্ঘাৎ
সম্মুখে পা ট্রিগারে হাত,
সঙ্গীন শোভিত সুকোমল কাঁধ।

সায়েরা   : এ-কী তোমাদের ষড়যন্ত্র,
অকারণে করো অবরোধ।
বুঝেছি তোমাদের সুনীতির মূলমন্ত্র,
নহি তো অবলা নির্বোধ।
ভেবেছো বুঝি বিগত যুদ্ধে ভীত সন্ত্রস্ত,
ছিলাম কেবল পাঠে মগ্ন
চালাতে বুঝি শিখিনি কোনো মারণাস্ত্র,
(গান)   আসেনি রণ-লগ্ন।

খোর্শেদ হাহাহাহ

সিংহের বাচ্চা

যেই কথা সেই কাজ

সাচ্চা সাচ্চা।

সমবেত চাচাচা চাচা

খোর্শেদ জোড়ে জোড়ে পা

শক্ত আওয়াজ

আচ্ছা আচ্ছা।

সমবেত হাত মুঠ শির উঁচ

বাজে কাড়াকাওয়াজ

জান বাঁচা জান বাঁচা।

সমবেত চাচাচা চাচা

খোর্শেদ প্রকটের জান

রণডংকা আজ

জোরসে বাজ।

(কাড়া-নাকাড়ায় রণবাদ্যের তাল শুরু হবে।)

সমবেত জাগো জাগো প্রকটক

জলদি, জলদি,

কাটো কাটো কন্টক

জলদি জলদি

প্রকটক প্রকটক জাগো।

প্রেম কন্টক কন্টক কাটো

জলদি জলদি।

অংকুর বৃক্ষ কাণ্ড উৎপাটো

জলদি জলদি,

প্রেম ভৃত্য দুর্বৃত্ত সংহারো,

জলদি জলদি,

ভাংগো ভাংগো পীরিতির ভণ্ড

জলদি জলদি,

তুলে ধর শক্ত বংশদণ্ড

জলদি জলদি।

গেল চলে রসাতলে বিশ্ব

প্রকটক প্রকটক।

গুরুজীব কবতলে শিষ্য
প্রকটক প্রকটক।
বক্ষো বক্ষো প্রকটক বক্ষো
জাগো জাগো প্রকটক জাগো
প্রেম কণ্টক, কণ্টক কাটো
অংকুর বৃক্ষ কাণ্ড উৎপাটো,
প্রেমতৃত্য দুর্বৃত্ত সংহাবো,
সহপাঠি তন্বী ছাত্রী উদ্ধাবো

(এক প্রকাব জমকালো সামবিক পোশাক পবিহিত প্রকটকেব প্রবেশ, গলায দূববীন। প্রকটকেব গানেব মধ্যে, ঠিক তাব পবপবই, তালে তালে, সমবেত কণ্ঠেব ধ্বনি জলদি জলদি শোনা যাবে।)

প্রকটক . এত গোলমাল, কিসেব জন্যে'
এত চিৎকাব কিসেব জন্যে,
এত সাজগোজ, লাফালাফি কেন,
কিসেব জন্যে?
[illegible] প্রণয় [illegible]
ছাত্র নয়নে ঘোর [illegible]
জানো না কি?
[illegible] হলো হানা
কিসেব জন্যে,

সমবেত গেল গেল বসাতলে বিশ্ব,
প্রকটক, প্রকটক।
গুরুজীব কবতলে শিষ্য
প্রকটক, প্রকটক।
দূববীন, দূববীন দূববীন তোলো
তাডাতাডি কবো।
ফার্তব কাববাব এন্তাব হলো
তাডাতাড়ি, তাড়াতাডি, তাডাতাডি কবো।

প্রকটক ছিন্ন কোবো না কর্ণ পটাহ,
চিত্ত আমাব, এমনিতেই তপ্ত কটাহ।
নিত্য নতুন নব উৎপাত
যাকে না দেখি সেই চিৎপাত।

(দূববীন তুলে নানাদিকে দৃক্‌পাত)

মোমেন		না না না, ওদিকে নয়,
ওখানে তো কিছু হয় না
কবিডোরে শুধু, হয়তো বা কভু,
কথা বলাবলি হয়।
তার বেশি কিছু হয় না।
(প্রকটক অন্য দিকে ছুটে গিয়ে দূরবীন তুলে ধরে)

রসূল		না না না ওদিকে নয়
ওখানেও কিছু হয় না।
পাঠাগারে শুধু, হাসি হাসি মৃদু,
খাতা বিনিময় হয়,
তার বেশি কিছু হয় না
(প্রকটক আরেক প্রান্তে ছুটে যায়)

[illegible]		না না না ওদিকে নয়
ওখানেও কিছু হয় না।
মাঠে প্রান্তরে শুধু, হয়তো বা কভু,
ছোয়াছুঁয়ি একটুকু হয়,
তার বেশি কিছু হয় না
(অন্য এক স্থানে গিয়ে দূরবীন তুলেই স্তব্ধ হয়ে যায়)

[illegible]		ঠিক ঠিক এইবার দূরবীন ভেদিয়াছে লক্ষ্য
চুপ চুপ চোখ মুখ কম্পিত শেলাঘাতে বক্ষ,
রোষে ক্ষোভে ফেটে পড়ে, মুখে নেই বাক্য।
প্রকটক প্রকটক রক্ষো, রক্ষো।

প্রকটক		চিনি। এ মেয়েকে আমি চিনি।
প্রথম বর্ষের ছাত্রী, একটু গরবিনী।
[illegible] সত্যের, হস্টেলে থাকে
কী করে এখানে, এলো কোন ফাঁকে,
আমি তো জানতে পারিনি,
চিনি, এ মেয়েকে আমি চিনি,
প্রথম বর্ষের ছাত্রী,
একটু গরবিনী।
(আরেকবার দূরবীন তুলে দেখে)
তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা।
গুরু-ছাত্রীতে এত মেশামেশি।

ফিস ফিস করে এত কিসের শল্লা
কেন বারবার এত হাসাহাসি।
(দূরবীন তুলে আরো একবার দেখে)
তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা!
দেখো দেখো বসেছে কত কাছাকাছি।
বেহায়া বেহদ্দ বেলেল্লা
এ-কী এ-কী করছে শুরু নাচানাচি।
তওবা তওবা আস্তাগফেরুল্লা, তওবা তওবা।

ছাত্রদল : তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করো।
ছুটে গিয়ে উভয়েব পাকড়ো পাকড়ো।
যদি বলো খববেগে আমরাই ছুটে যাই,
এক কোপে জোড়া ঘুঘু করে দি জবাই।

প্রকটক : চুপ চুপ চুপ কবো কসাই, কসাই
এটা ভার্সিটি, নয় খামাব গোযাল
আমি প্রকটক, নই কোতোয়াল।
লাল বই দেখে দেখে ছুরিকা চালাই,
চুপ চুপ চুপ কবো কসাই কসাই।
আইনের ফাইনের মাব প্যাঁচ কত শত।
আমি শুধু প্রকটক, নই দণ্ড মুণ্ডের হর্তা
দেখে যাই টুকে যাই, যা কবেন কর্তা।

সমস্বরে : প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো প্রকাশো পরিচয়।
কে সে, কোথা সে, প্রকাশো পবিচয, আছে কি হৃদয।
নীতি গেল বসাতলে সব হলো প্রেমময়
কোথা তুমি মহাবীব, এসেছে প্রলয় প্রলয়।

প্রকটক : প্রকটক শুধু প্রকটিতে জানে
কিন্তু, প্রবোধ দিতে জানে কে;

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক।

প্রকটক : গেবো বেঁধে দিতে সকলেই পারে
কিন্তু লটকে দিতে আসে কে,

সমস্বরে : প্রবোধক প্রবোধক প্রবোধক!

প্রকটক : নামে বোলে পরিচয় অনেকে জানে,
কিন্তু, মনেব খবর রাখে কে;

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক।

প্রকটক : গোলমালে ছুটোছুটি সকলে করে,
কিন্তু আসল চাল চালে কে ?

সমস্বরে : প্রবোধক, প্রবোধক, প্রবোধক।

প্রকটক : জপ করে তার নাম ডাকো ক্ষণে ক্ষণে
আরো জোরে ভাই সব হাঁকো প্রাণপণে।

সমস্বরে : প্রবোধক! প্রবোধক ! প্রবোধক!

(চার বয়োঃবৃদ্ধ প্রবোধকের প্রবেশ। চারজনেই আলখাল্লা পবা, দীর্ঘদেহী, গুরুগম্ভীর শ্মশ্রু গুম্ফধারী)

প্রবোধক : আমরা প্রবোধক, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষক!
অন্যায় অবিচার পীরিতি প্রণেয়ো মোক্ষক।
হও শান্ত, ধরো ধৈর্য, শোনো আমাদের পরামর্শ,
হবে প্রতিকার, অন্যায় অবিচার, হয়ো না বিমর্ষ

(দলবদ্ধভাবে মেয়েদের প্রবেশ)

ছাত্রীদল : ধন্য ধন্য প্রবোধক, শোনালে বাণী পূণ্যময়,
তুমিই প্রতিপালক, শুদ্ধ করিলে বিদ্যালয়।
দণ্ড ধরো কঠিন করে, বিদ্ধ করো যুগল হৃদয়,
চরণ ধরে রইবো পড়ে, ক্ষতের করো নিরাময়।
আমরা নারী, তোমার পূজারি, হয়েছি আজ নিসংশয়,
নীতির তুমি মহান রূপক, শ্মশ্রুধারী গুম্ফময়।

প্রবোধক : চারিধারে অবিরামে ঘোরে মোদের বহু চর,
ক্রমাগত পাপাচার বাড়ে তবু বহুতর।
লেখাপড়া ক্লাস করা সবই হলো বিঘ্নকর!
অধ্যাপকে ছাত্রী লয়ে নৃত্য করে দ্বিপ্রহর।

খোর্শেদ : দোষ নেই দোষ নেই দোষ নেই কোনো
সদ্য আগত শ্রীমতি অবলার,
গুরুজী কুশলী সেজেছে মুরলী মোহনো,
কঠিন শাস্তি এখনি করো তার

মাসুমা : কে বলে তারে সরলা বালিকা
ছলমাময়ী চতুরা,
নিজেরে করেছে সুরভী কলিকা,
পুরাতনী হলো ধুতুরা।
কুন্তলে হরি হিঁচড়িয়া আনি
বহিষ্কারো কুটিলা নারী।

জ্বলিবে মর্মে, গুরু হবে জ্ঞানী
অঙ্গে লাগিবে শীতল বারি।

বোধক : মন দেয়া নেয়া চলবে না স্পষ্ট মোদের নীতি,
হোক সে নর হোক সে নারী শাস্তি পাবে দুর্মতি।
পথ প্রদর্শো প্রকটক, প্রবেশো প্রণয় কক্ষে
যেখানে কন্যা রয়েছে লগ্না গুরুর কণ্ঠ বক্ষে।

(এরপর থেকে কথা ও গানের অধিকতর উদ্দীপনামূলক দ্রুততর তালের সঙ্গে পা মিলিয়ে ছাত্র ছাত্রী, প্রবোধক প্রকটক বিভিন্ন সারিতে আবদ্ধ হয়ে এক প্রকার সামরিক শৃঙ্খলায় মার্চ করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হবে।)

প্রকটক : হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার।
দুর্নীতির উচ্চশির চূরমার।
হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার।

ছাত্রদল : এসেছে ছাত্র ঐক্য জেগেছে কর্তৃপক্ষ
পরে মেতেছে সর্বদল।

ছাত্রীদল : হাঁকিছে সৈন্যাধ্যক্ষ আজিকে দক্ষযজ্ঞ
বুঝিবে কর্মফল।

সমস্বরে : ছাত্র ঐক্য জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
প্রকটকো প্রবোধকো জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

(অধ্যাপকের কক্ষ। এক হাতে বই অন্য হাতে কুর্সি টেনে নিয়ে অধ্যাপক নিজেই পট পরিবর্তনে সাহায্য করতে পারেন। চেয়ারে বসে নিবিষ্ট মনে বই পড়তে থাকেন। বলা বাহুল্য প্রত্যেকটি ভঙ্গি রীত্যায়িত ও তাল লয় সম্বলিত। সায়েরা প্রবেশ করে নৃত্যের ভঙ্গিতে। নানা ভঙ্গিমায় অধ্যাপকের হৃদয় বন্দনা করে, তাকে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নৃত্যে উচ্ছ্বসিত হয়। অধ্যাপক তৃপ্তির সঙ্গে এই স্তব গ্রহণ করে, মাঝে মাঝে চোখে মুখে ফুটিয়ে তোলে একটা কৃত্রিম অতি আনন্দের ঔজ্জ্বল্য।)

অধ্যাপক : আহা বেশ বেশ অতি উত্তম
এই তালে তালে ভালোবাসা
প্রণয় নিবেদন।
কাছে এসো আরো না করো শরম
কাঁধে হাত রাখো, চোখে ভাষা
জ্বলুক হুতাশন।

ভালো ভালো দূরে রাখো সম্ভ্রম
দূরবীনে দেখেছে খাসা
ঘটনা চিরন্তন।
শুরু হবে আজ যুদ্ধ চরম
মাসুমা ত্যাজিবে উচ্চ আশা
বিদেশী সম্মোহন!

সায়েরা : হাত কাঁপছে
পা টলছে
মন বলছে
ছুটে আসছে
শুনবে না কোনো কথা প্রথমেই নির্ঘাত
চারিদিকে দেখে শুনে হানবে আঘাত।
ভেবেছিলে ক্ষেপে যাবে শুধু একজন
ক্ষেপে গেছে জনে জনে সজ্জন দুর্জন।
তেড়ে আসছে
হাত কাঁপছে
পা টলছে
মন বলছে
দেবে নাকো ফুরসত বলতে
নানা হও কী করে কী মতে।

অধ্যাপক : তুমি মোর ভাগ্নিব কন্যা কাছাকাছি সুবাতে
ছাপ দেয়া ভর্তির ফর্মে লেখা আছে কালিতে।
জানা আছে ফন্দি কৌশল প্রকটকে মানাতে
কুলোপানা চক্কর শুধু বিষ নেই ফণাতে।

সায়েবা : তবু ভালো লাগে না ভালো লাগে না
এই মিথ্যা অভিনয়,
তোমাব মাসুমা তোমাব প্রণয়
নিজে নিজে করো জয়।
তাছাড়া গুরুতর আরো আছে ভয
যে বালক আমারে দিয়েছে হৃদয
সে তো কতবার বুঝেও অবুঝ হয়,
বুঝিবে কি কপট হৃদয় বিনিময় ?

অধ্যাপক : দোহাই তোমার তর্ক করে

নষ্ট কোরো না সময়

মাসুমাব মনে জেগেছে ঈর্ষা

উথলে উঠেছে ভয়,

শুধু দু'মিনিট আর দু'মিনিট

বন্ধ কোবো না প্রণয়'

যে করে পারো মুখ বুঁজে সও

প্রাণপণে করো অভিনয়।

অঙ্গে আনো দোল, কটাক্ষ বিলোল

ভালোবাসো চিৎকাব কবে,

যত দূবে থাক হবে হতবাক

বিঁধিবে শলাকা অন্তবে।

(পববর্তী অংশ গীত এবং অভিনীত হবে অতি উচ্চ কণ্ঠে এবং অতিবঞ্জিত ঢং-এ। হস্ত প্রসাবণ, নতজানু নিবেদন, জোড়-কব বক্ষে ধাবণ ইত্যাদির সাহায্যে প্রেমাভিনয়ের চূড়ান্ত হবে।)

সায়েবা : ওগো সুন্দর, ওগো প্রিয়তম, ওগো পরাণের ধন।

(নিম্নকণ্ঠে) ওগো দুর্জন, ওগো মাতামহ, এ যে অসহ প্রতাবণ'

অধ্যাপক : আহা মধু বরিষণ, মধুর বচন

আজ, দয়া কবে কবো হৃদয়ে বরণ।

(নিম্নকণ্ঠে) আড়ালে বসেছে কন্যা, টেনে আববণ,

শোনাও তাহারে অদ্য অকথ্য কথন।

সায়েবা : শোন চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা সপেছি আত্মহারা

আমার এ তনুমন,

ভালোবাসি রাশিরাশি ভালোবাসি ভালোবাসি দিবানিশি

ভালোবাসি অনুখন।

অধ্যাপক : ভালোবাসি তোমাকে আপাদমস্তক

ইস্তক পাতলী পাদুকা,

ভালোবাসি সব, কুন্তল পদনখ,

দেহের শোণিত কণিকা।

দুজনে : ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি

ভালোবাসি রাশিরাশি, ভালোবাসি দিবানিশি

ভালোবাসি নাচিনাচি, ভালোবাসি হাসিহাসি

ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি ভালোবাসি।

(মঞ্চান্তরালের কোনো উচ্চ স্থান থেকে লম্ফ দিয়ে মঞ্চে
উটকো হয়ে পড়ে প্রকটক। তড়াক করে লাফিয়ে সোজা হ

প্রকটক : সাবধান অধ্যাপক সাবধান, আমি প্রকটক,
দেখেছ কেবল পুষ্প বাগান, দেখনি কণ্টক।

অধ্যাপক : সালাম জনাব সালাম, বসতে আজ্ঞা হোক।

প্রকটক : উঠবস আমি অনেক করেছি, বিনা আমন্ত্রণে,
এবার তোমাকে বমাল ধরেছি, ভাগ্যে শুভক্ষণে।
রয়েছে বিধান রাখো ব্যবধান, ছাত্রী গুরুজনে,
নবনারী সব রহিবে পৃথক, আমি মধ্যিখানে।

অধ্যাপক : এত উত্তেজিত হওয়া নিষিদ্ধ, চিকিৎসা বিজ্ঞানে
কোনো অপবাধ কলহ-বিবাদ, করিনি সজ্ঞানে।

প্রকটক : ক ᐟ চাতুরি, মিছে কারিগরি, এই দেখ ফিতে
দার্জির হিসেবে হদিস মিলিᐟব ছিলে কত মেতে।
এক ফুট দুই ফুট তিন ফুᐟ চার ফুট
এখন হয়েছে মুখ লজ্জায় ক টুক!
তখন, ছিলে নাকো দূরে, ᐟসেছিলে কাছে সবে
এক দুই তিন গিরে, কত কিনারে কিনারে।

(প্রবেশ ছাত্রদল)

ছাত্রদল : ওহো কী মর্মান্তিক
এসেছিল নিকটে অতি আত্যন্তিক।
ছুঁয়েছিল শুধু কি অঞ্চল প্রান্তিক
ওহো কী মর্মান্তিক!

ছাত্রীদল : দেরি নয় দেরি নয় আর
নেই কোনো ব্যাখ্যার দরকার।
ফিতে মেপে দেখা গেছে, কত কম ইঞ্চি
কাছে ঘেঁসে করেছে সুনীতির নিকুচি।
নাম কেটে হল থেকে বের করে দাও,
বেঁচে যাবে গুরুজন, দুর্নীতি উধাও।

(প্রবোধকের প্রবেশ)

প্রবোধক : শো-কজ শো-কজ শো-কজ, প্রবোধক নিয়ম অটল
আগে করি জারি শো-কজ তারপরে করিব কতল।
অন্তর অগ্নিতে ক্রমাগত,
গুম্ফ শ্মশ্রু হতেছে স্ফীত।

তবু ন্যায় বিচারে অবিচল,
শো-কজ শো-কজ শো-কজ প্রবোধক নিয়মে অটল।

অধ্যাপক : প্রণয় পরিমাপ, নহে দর্জিগিরি
কখনো কপট খেলা, কখনো ছলনা।
অনুমোদ্য কিছু কিছু প্রতারণা!
এই শ্রীমতির অত কাছে আসা কেবলি প্রবঞ্চনা,
নিকট সুবাতে নাতিনী আমার, আমি হই নানা।

ছাত্রদল : জানি জানি সব জানি
খালাতো বোন, নানা নাতনী!
লুকোচুরি সব ফাঁস হলে
সাধু সন্ন্যাসী সব তাই বলে।

মাসুমা : যদি তাই হয় তাই হয়,
শান্ত হও অশান্ত হৃদয়!
যদি তাই হয় তাই হয়
প্রকটকে হবে কি প্রত্যয়:
যদি তাই হয় তাই হয়
মিথ্যা শঙ্কা, সব ভয়!
যদি তাই হয়, তাই হয়।

প্রবোধক : জিজ্ঞাসো জিজ্ঞাসো প্রকটক আরও স্পষ্ট ভাষায়
প্রকৃতই আছে কিনা সত্য এই নব্য ঘোষণায়?

প্রকটক : আছে কোনো চিরকুট, কোনো দলিল খতিয়ান
কোনো কপি ফটোস্ট্যাট, কোনো অকাট্য ফরমান?

(অধ্যাপক কর্তৃক ফর্ম প্রদর্শন। এক রকম থাবাথাবি পড়ে যায়। প্রথমে প্রকটক, তারপর ক্রমান্বয়ে ছাত্রদল, ছাত্রীদল, সবশেষে প্রবোধক পরীক্ষা করে।)

প্রকটক : হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ তাইতো এইতো
উপাচার্যের স্বাক্ষর।
লেখা আছে ফর্মের লাইনে
লাগানো সীল মোহর!

ছাত্রদল : আরে বাবা তাইতো এইতো
জাল নয় এক চুল,
মিছেমিছি হয়েছি ভাবিত
আগাগোড়া সব ভুল!

ছাত্রীদল : কী আনন্দ তাইতো তাইতো
হয়েছি প্রবঞ্চিত।
মন চঞ্চল কম্পিত অঞ্চল
হৃদয আলোকিত।

সাযেবা : গুরুজনে কেউ ভালবাসে কি ?
আমাব উনি মাতামহ।
সফল কবিতে দুরভিসন্ধি
আমি হয়েছি আজ্ঞাবহ'
কোথাকাব কোন্ প্রণয়ী ওঁব
বিদেশ গমনে উদ্যত,
মেগেছে আমার সহায গুণী
তাহারে কবিতে বিবত।
কাতর করুণ আবেদনে তাঁর
কুক্ষণে হই সম্মত,
এবাব এখন অবসর চাই
নিজের মনেব মতো।

প্রবোধক : কী আশ্চর্য তাইতো তাইতো
খামোকা হযেছি হযরান।
প্রকটক বড় বেবুঝ তুমি
তাড়াতাড়ি করো প্রস্থান।
নানা নাতনীতে রঙ্গ রস
এদেশে প্রাচীন প্রথা
অযথা তাতে চাহিলে কেন
গলাতে তোমার মাথা;

সমস্বরে : ওহো কী মর্মান্তিক'
তীবে এসে তরী ডোবা
বলিব কী অধিক!
ওহো কী মর্মান্তিক!

প্রকটক : যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল আমি প্রকটক।
অচিরে ধবিব প্রেমপাপী পুরিব ফাটক।
যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল আমি প্রকটক,
আমি চলে গেলে প্রবলতর, আসিবে ঘাতক,
যাই, থাকিতে আসিনি চিরকাল, আমি প্রকটক।

সমস্বরে : ওহো কী মর্মান্তিক,

প্রবোধকে হতে হলো

ব্যর্থ অভিযাত্রিক।

ওহো কী মর্মান্তিক!

(গায়ের চাদর অপসারিত করে অতি ঝলোমলো পোশাকে মাসুমা মেয়েদের দলের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে অধ্যাপকের দিকে এগিয়ে যায়)

মাসুমা : ক্ষমা করো ক্ষমা করো হৃদয়েশ্বরো

যাব না যাব না বিদেশে একা,

দুদিনে বুঝেছি মর্ম যাতনা কত

কোথাও কখনো পৃথক থাকা।

থিসিসে পিপাসা মিটিবে না মোর

যদি না জানি নিশ্চিতে

আঁধারে বাড়াব যতবার হাত

পারিব তারে স্পর্শিতে।

অধ্যাপক : মাসুমা করিও ক্ষমা,

যদি করে থাকি অপরাধ।

হারাবার ভয়ে ভীত হয়ে রমা,

রচেছি কুটিল ফাঁদ।

ছাত্রীদল : দেরি নয়, দেরি নয়, দেরি নয় আর

হৃদয়ে হৃদয়ে হয়েছে অঙ্গীকার।

(ক্রমশ রঙ্গমঞ্চ বহুবর্ণের আলোক রশ্মিতে উদ্‌ভাসিত হয়ে এক মহোৎসবের পরিবেশ রচনা করে। মাসুমার নাচে হৃদয় নিবেদনের বিভিন্ন মুদ্রা পরিপূর্ণ আনন্দের পুষ্পকে বিকশিত করে। পরিসমাপ্তি লাভ করে লজ্জাবনতা অবগুণ্ঠিতা নববধূর উপবেশনের ভঙ্গিমায়। পেছনে নানা সারিতে তরুণ তরুণীর দল চক্রাকারে নৃত্যরত। তাদের সমবেতকণ্ঠে যে গান ধ্বনিত হয় তার ধূয়া।)

ভালো ভালো ভালোবাসা, ভালো ভালো প্রণয়

তার চেয়ে ভালো পরিণয়।

বলো জয় জয় প্রেমের জয়

পরিণামে যার পরিণয় পরিণয়।

[যবনিকা]

ছোটগল্প

সূচি

নগ্ন পা

পাড়ার যুবক ছেলেবা একবার রাহেলার দিকে চোখ তুলে চাইল, তারপর আনোয়ারা, রওশনারা, জুলেখার পানে চোখ নামালো। সবার শেষে আবার আঁখি-ভরা কৌতূহল নিয়ে চোখ তুললো রাহেলাব দিকে— আর দৃষ্টিশক্তির সব ক্ষীণ রশ্মিগুলো স্থির হয়ে রইল সেই এক বিন্দুতেই।

চৌধুরীদের নতুন বৌ রাহেলা। দুদিন হয়নি এ পাড়ায় এসেছে কিন্তু এরি মধ্যে বান্ধবীর ওর অভাব নেই। ওর অনুকরণে শাড়ি পরতে, পূর্ণ রঙের লিপস্টিক্ ঘষতে যুবতী মহলে লেগে গেছে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব। রাহেলা ঘুরছে এদের ভিড়ের মাঝে জ্বলন্ত একটা নক্ষত্রের মতো। রক্তবর্ণ ক্রেপ-ডি-সিন শাড়িটা যখন-তখন ঘূর্ণী দিয়ে ফুলের ফোয়ারা তুলে আগুনের ফুলকির মতো কথা বলে চলেছে সবার সাথে। যখন-তখন ভেঙে পড়ছে রসিকতার উচ্ছৃঙ্খল হাসিতে। ওর চারধার আঁধার করে কোনও নতুন-বৌ-আবহাওয়া যেন সৃষ্টি হয়ে উঠতে পারেনি। নতুন শাশুড়ীর কঠোরতাও যেন ভেঙে ফেলেছে অনেক আগেই।

নতুন বৌব বেহায়াপনার প্রতি কটাক্ষ করে দাদী খালাম্মাদের কেউ কেউ মাথা নাড়তে লাগলেন। মৃদু সুবে নিচু আঘাতে দুচাবটা মতামতও প্রকাশ করলেন। স্নেহমাখা সুরে শাশুড়ি শুধু বললেন, 'বৌর আমার কচি বয়স, তাই। দুদিন যাক, দেখো জ্ঞান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পাশের ঘবে বাহেলাব শ্বশুর মসুদ হুসেন সাহেব গুড়গুড়িতে টান দিলেন আবেকটু জোরে। নিজের যুবক বয়সটাকে চোখ বন্ধ করে জীবন্ত করে তুলতে চেষ্টা করলেন একবার। না পেরে, ক্লান্ত হয়ে চোখ দুটো আর খুলতে চাইলেন না। আধ-ঘুমো হয়ে গুড়গুড়িতে আবার মৃদু টান দিলেন, তারপব স্বল্প কাৎ হয়ে ইজি চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

ইউসুফ সাহেবি স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। পাতলা রোগা ছিপছিপে দেহের গড়ন। যতটুকু দেখে তার চেয়ে বেশি বোঝে। যতটুকু বোঝে তাব চেয়ে বেশি বলে। আর যতটুকু বলে তার চেয়ে অনেক বেশি ভাবে। এককথায় ও ওর সুন্দরী, স্বাস্থ্যবতী, চপলগতি বড় বোন বওশনাবাব সংক্ষিপ্ত পুরুষ সংস্করণ।

সেদিন বিকেল বেলা ক্রিকেট মাঠে খেলা দেখতে দেখতে ওর মনেব মাঝে হঠাৎ চমকে উঠল রাহেলার দেহ-ছন্দ। খেলার মাঠে আসবার পথে আপাকে রাহেলাদের বাড়িতে ছেড়ে আসবার সময় অল্প কয়েক মিনিটের উদাস দেখা স্মৃতিচিহ্নটা হঠাৎ লাল ক্রিকেট বলটার সাথে তীব্র গতিতে জ্বলে উঠল ওর মাথায়। বড় আপার রূপটাই এতদিন ওর শিল্পীমনের বেদীতে নিখুঁত রূপকল্পনার দেবী হয়ে পুজো পাচ্ছিল নিঃশব্দে। হঠাৎ ওর মনের মাঝের পারদভবা পাথর-বাটিটা যেন ভেঙে চূর্ণ হয়ে ছিটকে পড়ল সবুজ মাঠে।

দুদিন পর। রওশনারাকে স্বীকার কবতেই হলো যে ইউসুফের কথায় মোহ আছে। ও জানে সংলাপের মাঝে কোথায এসে গলাটা কবে তুলতে হবে সদা-ঘুম-ভাঙা, কোথায় স্বব নিচু করে

থাক্ দিতে হবে ঘন-ঘন। মেয়ে হয়েও রওশনারা হার মানলো ছোট ভাইর কাছে। বুঝল যে নিজের শ্রদ্ধার আসনটা ইউসুফের মনে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে অনেকখানি। আর এ-ও বুঝল যে রাহেলার সাথে ইউসুফ যখন কথা বলছে সাহিত্য কি সিনেমা নিয়ে সেখানে রওশনাবার কোনও বিশেষ প্রয়োজন নেই, প্রাণ নেই। ইউসুফের ভাবি ডাকে রাহেলা যে ম্যাডোনা হয়ে ওঠে!

রাহেলা আর রওশনারা বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে লুডো খেলছিল। রওশনারাই যেন খেলছিল বেশি। রাহেলার আগ্রহ ততটা আছে বলে মনে হয় না। মাঝে মাঝে তাই ক্ষীণ অনিচ্ছার চিহ্ন নিয়ে বাঁ পা-টা বিছানার ওপর উঠছিল আর পড়ছিল। ফেনপুঞ্জের মতো মাঝে মাঝে শাড়ির গোছা জমে উঠছিল সুগঠিত পায়ের গোছার নিচে। ঘরের কোণায় ইউসুফ রাহেলার এ্যালবামটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চোখ তুলে রাহেলার দিকে চাইল। ওর ইচ্ছে হয়েছিল ভাবিকে কিছু বলে একটা বিশেষ ছবি সম্বন্ধে। আচমকা ও কথা বলতে গিয়ে থমকে গেল। ঘরের অন্য কোণে সিলাইরত রাহেলার শাশুড়ীকে ও ভুলে গেল। একদৃষ্টিতে ও চেয়ে রইল ওর শূন্যতে। মনের মাঝে মুহূর্তের জন্য ডি'মেলোর নগ্ন পায়ের গোছাটা পেডাস্টালচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়ল অসীম অন্ধকাবে।

'ইউসুফ, ইউসুফ', অট্টহাসির সাথে রাহেলা চিৎকার করে উঠল, 'বলি, আমাব পা-টাকে কি খেয়ে ফেলবি নাকি! বাবারে। বাবারে! জুতোর দোকানের অসভ্য দোকানীটাও অমন করে চোখ দিয়ে গিলে খায় না।' হাসির ভাঙনে টুকরো হয়ে রাহেলা উঠে দাঁড়াল। রাহেলাব রসিকতাটা কেমন যেন বিশ্রী মনে হলো। আম্মাজান বোধ হয়ে শুনেও শুনল না। ইউসুফের রুগ্ন দেহের ফিকে রক্ত তবু যেন একবার ঝলসে উঠল সমস্ত মুখে। স্ববচা পৃথিবী থেকে আচমকা ফিরতে গিয়ে ও লাল হয়ে উঠল অকারণে।

সন্ধ্যার সময় ইউসুফ সিঁড়িব গোড়ায় এসে ডাক দিল— 'ভাবি'।

প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যায়নি তখন; রাহেলা মভ্ রঙের শাড়িটা সাপেব মতো তনুময় পেঁচিয়ে দেখা দিল সিঁড়ির গোড়ায়। একঝলক আলোব তরঙ্গের মতো পিছলে নেবে পড়ল সিঁড়ি-পথে। তারপর সেখান থেকেই চিৎকাব করে আম্মাজানকে জানিয়ে দি·, সে আজ সিনেমায় যাচ্ছে আর তাই বেবি অস্টিন গাড়িটা থাকবে তারই হুকুমে, সিনেমা শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অল্প আলোতে সন্ধ্যা দেবীকে ইউসুফের চোখে ঠেকল বড়বেশি স্থির; তবে আত্মাটা যেন গতির প্রতীক। সেলফ স্টার্টারে টান দিয়ে রাহেলা একবার জিজ্ঞেস করল, 'কোন পথে' ?

তারপর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই স্পিড বাড়িয়ে দিল রমনার দক্ষিণ কোণে। বিদেশী ছবির রাজপ্রাসাদ পানে।

বোধহয় এক ঘণ্টাও হয়নি। হুডবিহীন লাল বেবি অস্টিনটা হঠাৎ কর্কশ একটা শব্দ করে আবার চলতে আরম্ভ করল রাহেলাদের বাড়ির দিকে। তৃতীয় গিয়ারে উঠেই রাহেলা চাপা গলায় বলে উঠল : 'ছি, ছি, না না, ক্ষমা তোমায় আমি করব না। আর তোমার সাথে সিনেমা দেখাও আমার এই শেষ।—'

'ভাবি—'

'চুপ কর। কোনো কথা আমি শুনতে চাইনে। সত্যি এতটা তোমায় আমি কোনোকালেই ভাবতে পারিনি।'

গাড়ির গতিটা আরেকটু কমিয়ে রাহেলা চুপ করে রইল। একটা অকথ্য বিশ্রী বেদনায়

ইউসুফের সমস্ত দেহ কুঁচকে এল। ছন্নছাড়া ব্যথায় চোখ দুটো ওর ভরে এল তপ্ত অশ্রুতে। ক্ষমাহীন অত্যাচারে সিক্ত চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠল রাস্তার মৃদু আলোকে। ধীরে রাহেলা ওর বুকের ভাঁজ থেকে উগ্র সেন্ট-মাখা ক্ষুদ্র উষ্ণ রুমালটা ওর চোখে চেপে দিল। স্টিয়ারিংটা শক্ত করে ধরে হিম নিষ্পলক দৃষ্টিতে রাহেলা চেয়ে রইল সম্মুখ দূরত্বের পানে।

সমদূরে দাঁড়ানো ল্যাম্পপোস্টের বৈদ্যুতিক আলোতে বেবি অস্টিনের ছায়া কখনও লম্বা হয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ হয়ে উঠল। কখনও পেছনে কখনও সামনে।

গাড়ি থেকে নামতেই রাহেলা আবার চক্মকিয়ে উঠল ওর পুরোনো উচ্ছ্বাসে। হৈচৈ করে ইউসুফকে টেনে নিয়ে উপরে উঠে গেল। আম্মাজান একটু অবাক হয়ে বললেন, 'ব্যাপার কী, তোদের আজ হলো কী ? এত শিগ্‌গির চলে এলি যে!'

'বিশ্রী ছবি আম্মাজান বুঝলেন, তাই চলে এলাম। আর দেখুন আমাদের ইউসুফ সাহেব আবার চটে আছেন ভীষণ। ওনাকে আমার নিজ হাতে কিছু না খাওয়ালে কিছুতেই আর ওর রাগ ভাঙানো যাবে না।'

রাহেলার স্বামী মাহমুদ সাহেব তখন ঘরে ফিরেছেন। সবাই মিলে ডাইনিং টেবিলে খেতে বসল। জোর করে রাহেলা ওর নিজের হাতে ইউসুফকে খাওয়াল। ইউসুফের তবু মাঝে মাঝে মনে হচ্ছিল, বুঝিবা সব একটা নিছক ব্যঙ্গ-অভিনয়। রাত সাড়ে নটার সময় অযথা-আদরে উথ্‌লে ওঠা পরিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরল, ওর মন তখন আবার ফিরে এসেছে নিজের রচা স্বপ্নরাজ্যে।

রাত্রি বেলা শোবার সময় অন্ধকার ঘরে ড্রেসিং গাউনটা ভাল করে সমস্ত দেহে জড়িয়ে ধরে যন্ত্রচালিতের মতো রাহেলা চুলের ভেতর চিরুনি চালিয়ে যাচ্ছিল। ওর লম্বা কালো কোঁকড়া চুল। হাল্‌কা মনটা গুঁড়ো কাঁচের ওপর ইঁদুরের পদধ্বনির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিল উদ্দেশ্যহীন নিঃশব্দে। ওর স্বামী মাহমুদ বিছানায় শুয়ে সিগারেট টানছিল নিবিষ্ট মনে। হঠাৎ ডাকল, 'রাহেলা।'

'কী ?— বল।'

'ইউসুফ এখানে রোজ কেন আসে ?'

'অর্থ ? ও কথা ওকে জিজ্ঞেস করলেই পার।'

রাহেল হঠাৎ বিষিয়ে ফুলে উঠল। ঘন আঁধারে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মাহমুদ সুকটু জোর গলায় বলে উঠল, 'আমি তোমায় জিজ্ঞেস করছি।'

'কেন ? আমি কি ওকে আসতে বলেছি ?'

'কাল থেকে তুমি তাহলে তাকে আসতে নিষেধ করবে।'

'মানে, তুমি কী বলতে চাও ?—'

'কাল থেকে ও এখানে আসবে না— ব্যাস এই।'

আঁধারে একটা চাপা হাসির বিকৃত মুখ সংকোচনে রাহেলার সমস্ত দেহটা একবার দুলে উঠল। আলাদা বিছানায় শুতে শুতে ওর সমস্ত মাংসপেশীগুলো শিউরে উঠল সব পুরোনো কল্পনা আর আদর্শের অত্যাচারে।

হঠাৎ মনের ভেতরকার উচ্ছ্বাসটা থমকে দাঁড়াল একটা আরো বড় সুন্দর কঠোর মন-নির্দেশে।

কয়েক ফার্লং দূরে ইউসুফ নিজের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠল। ওর মাথার কোষে

তখন অজস্র আঙুল বিপর্যস্ত ভঙ্গিতে, স্থিতিহীন অসংখ্য আকার ভাঙছে, গড়ছে। চোগতাই-আঁকা— মোগল শিল্পী-রচা নিখুঁত আঙুলগুলো রেণু রেণু হয়ে গুঁড়ো হয়ে গেল মনের আদর্শ-বিন্দু থেকে। ওর শিল্পীমনটা একবার চিৎকার করে উঠল, 'না-না এ অসম্ভব। খোদা-সৃষ্ট দেহ এসে ধ্বংস করবে ওর রুচির আদর্শ'। তবু ওর হার হলো। স্পর্শ পাওয়ার অদম্য উন্মাদনায় ও পাগলা হয়ে উঠল। পকেট থেকে অশ্রু-ভেজা গন্ধমাখা ছোট্ট রুমালটা ও চেপে ধরল ওর সমস্ত মুখে, ঠোঁটে। স্পর্শ করেছিল রাহেলার ঐ বিচিত্র আঙুল, ওকে খাওয়াবার জন্যে ঘণ্টা দুই আগে।

ভাল করে বেলা না হতেই একটা অর্থহীন কারণ খুঁজে নিয়ে ও রাহেলাদের বাড়িতে এল। 'ভাবি' বলে একটা ডাক দিয়ে রাহেলার পড়ার ঘরে ঢুকল। রাহেলা তখন হাতের বিদেশী নভেলটা ছেড়ে, মাথায় কাপড় দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রসিকতাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ইউসুফ হেসে উঠল। তারপর ধীরে রাহেলার টেবিলের ওপর বিছানো আঙুলগুলোকে মৃদু স্পর্শ করে ও সবে একটা প্রশ্ন করতে যাবে,— তড়িৎ গতিতে হাতটা সরিয়ে নিয়ে রাহেলা গম্ভীর সুরে উচ্চারণ করল— 'ইউসুফ!—' ইউসুফ চমকে উঠল। ভয়ার্ত চোখে ও বলতে গেল।

'ভাবি— এ—'

'ইউসুফ কাল থেকে তুমি এ বাড়িতে এস না।'

'ভাবি, কী বলছ? কেনই বা আসব না?'

'কাল থেকে আমিই যাব। তোমার কাছে!' অস্ফুট কণ্ঠে রাহেলা শুধু উচ্চারণ করল।

.

সর্পিল লেকের কোণে সন্ধ্যায় ঘনান্ধকারে ছায়ামূর্তির মতো দুটো মানুষ বসেছিল পাশাপাশি। ছেলেটার অনভিজ্ঞ ভীরু মন তখনও কাঁপছিল আধ-আলো আধ-অন্ধকারে পানির ছলাৎ ছলাৎ শব্দের সাথে। নিঃশব্দে ইউসুফ রাহেলাকে স্পর্শ করল। রাহেলা স্বপ্ন ভরা সুরে শুধু বলল, 'ইউসুফ আমায় তুমি অন্ধ কবেছ'।

খুট করে দরজা খুলে রাহেলা হল ঘরে ঢুকল। আম্মাজান ও ঘরেই বসেছিলেন। রাহেলার বাইরে যাওয়ার পোশাক দেখে মনে মনে হাসলেন। ব্যবহারের নম্রতা দেখে খুশী হয়ে উঠলেন খুব। রাহেলার দেহ ঘিরে কালো একটা বোরখা জড়ানো। শুধু মুখের পাতলা কাপড়টা স্বল্প উঠানো।

বোরখা ছাড়া রাহেলা এখন আর কোথাও বেরোয় না। অযথা অসভ্য রসিকতার অট্টহাসিতে ভেঙে পড়ে না।

আম্মাজান গর্বে হেসে উঠে নীরবে বললেন, বলেছিলাম না— 'আরেকটু জ্ঞান হোক, তখন দেখো।'

আব্বাজান গুড়গুড়ি টানতে টানতে আরেকটা কিছু অসম্ভব স্বপ্ন দেখতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু সফলকাম হবার আগেই ঘুমিয়ে পড়লেন আবার ইজি চেয়ারে। কাৎ হয়ে।

পাড়ার যুবক ছেলেরা চোখ তুলে রাহেলার দিকে আরেকবার চাইল, তারপর রওশনারা, আনোয়ারা, জুলেখার পানে। সবার শেষে আবার চোখ উঠাল রাহেলার পানে— আর সেখানেই স্থির হয়ে রইল সবগুলো চমকানো-ব্যাগ্র আঁখি।

হালুম

আশরাফ মুনশির এক চোখ কানা। কালো, বলিষ্ঠ জোয়ান দেহ। সমস্ত মুখে গুটি বসন্তের ছোট ছোট গর্ত। বুদ্ধির দীপ্তিতে ভালো চোখটা সব সময়েই জ্বলছে। আশরাফ মুনশিকে ভয় করে না চৌধুরী বাড়িতে এমন কেউ নেই। বাড়ির বৌ ঝিরা আড়ালে আবডালে আশরাফ মুনশিকে ডাকে 'হালুম' বলে। অর্থাৎ শুধু বাঘ নয়; এ একেবারে বাঘের নির্দয় আক্রমণ।

কাছারি ঘর থেকে আশরাফ মুনশির গলা খাকর শোনা গেল। অমনি বিশ্রামরতা মুনশির তিন ছেলের তিন বৌ অদ্ভুত তৎপরতার সঙ্গে কঠিন কর্মব্যস্ততায় ছিট্‌কে পড়ল উঠানময়। তক্‌তকে উঠান ছোট বৌর ঝাটাব নিতান্ত অনাবশ্যক স্পর্শে দ্বিতীয়বার মুখরিত হয়ে ওঠে। কোলের শিশুকে দড়াম করে মাটিতে শুইয়ে স্থূলকায়া মেজ বৌ শীর্ণমুখী পিপের মধ্যে অর্ধেক শবীর গলিয়ে দিল মরিচ বার কবতে। সুন্দরী বড় বৌ শুধু নিষ্কম্প পায়ে উঠে এল শোলার বেড়া অবধি; ফাঁক দিয়ে হরিণ চোখে একবার দূরত্ব টুকুন আন্দাজ করল, তারপর মুখের কম্পিত ঘর্ম্মবিন্দু মুছতে মুছতে শুকাতে দেয়া কাওন ধানগুলো আরো ভালো করে বিছিয়ে দিতে শুরু করে দেয়। এমনকি ওদের শাশুড়ি জাহেদা বিবি পর্যন্ত উত্তেজনায় উনুনের মধ্যে এক সাথেই পুরে দিল এক গাদা লাক্‌ড়ি।

উঠানে আশরাফ মুনশি প্রবেশ করলেন। পেছন পেছন এল পশ্চিম বাড়িব মকিম কাকা। মুনশি এক চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সব নিরীক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। তীব্র সন্ধানী আলোর মতো সে চোখ যেন সমস্ত উঠান তন্ন তন্ন করে দেখল কোথাও কোনো খুঁত আছে কিনা। কোথাও কেও আকামা বসে আছে কিনা। আশরাফ মুনশি সব পারে কিন্তু ঐ কুঁড়েমি বরদাস্ত করা তার পক্ষে অসম্ভব। এই বাড়ির ভাত গিলতে হলে কাজ করতে হবে। শুধু কাজ আর কাজ। মুনশি তাহলেই খুশি। কিন্তু কাজের এত নিখুঁত প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও আশরাফ মুনশি খুশি হলো কিনা বোঝা গেল না। কোনো দিনই সেটা বোঝা যায় না। আশরাফ মুনশির সে তীব্র চোখ যেমন একক, তেমনি অভিব্যক্তিহীন, পরিবর্তনহীন। মকিম কাকাকে ঘরের দাওয়ায় বসতে বলে মুনশি গরু নিয়ে গোয়ালে ঢোকে। সেখানে থেকেই বড় বৌকে উদ্দেশ্য করে হাঁক দেয়— জৈল্যা কৈরে ? জৈল্ল্যা মুনশির বড় ছেলে, বড় বৌর স্বামী। বড় বৌ একটু এগিয়ে এসে, মাথার কাপড় ভালো করে টেনে, অত্যন্ত আদপের সঙ্গে একটা মিথ্যে কথা বলে ফেলল— হ্যাতেনত ধান নিরাইতো হাঁতেরো গেছে আব্বাজান!

ধান নিরানো দূরে থাক জলিল মানে জৈল্ল্যা তখন ক্ষেতের আশেপাশেও কোথাও নেই। বৌর হাত বাঁরা ভাত খেয়ে সে তখন গোলার ঘরে ঘুমাচ্ছে। বড় বৌর এই স্বার্থপর, নির্লজ্জ মিথ্যাভাষণে ঈর্ষান্বিত হয়ে ছোট এবং মেজ উভয়েই আঁচলের আড়ালে ভেংচি কেটে উঠল।

মুনশি আবার গর্জে উঠল— হেতীরে ক্যানা ভাত লই আইতো। হেতী মানে সে অর্থাৎ আশরাফ মুনশির স্ত্রী, ওরফে জাহেদা বিবি, তখন মাটির বাসনে ভাত আর কলাপাতার পোড়া ছোট মাছ সাজিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে।

খেতে খেতে আশরাফ মুনশি মকিম কাকাকে আগামী মোকদ্দমার সব মারপ্যাঁচ সম্বন্ধে শিখিয়ে পড়িয়ে নিচ্ছিল। মোকদ্দমা করা মুনশির এক অদ্ভুত নেশা। আশে পাশের দু'চার গ্রামে এ ব্যাপারে মুনশির বেশ নাম ডাক আছে। দলিল ওলটপালট করা থেকে মিথ্যে সাক্ষী মর্মস্পর্শী করে দাঁড় করাতে মুনশির জুড়ি এ তল্লাটে আর নেই। হাতের লোকমা মুখে তুলে মুনশি মকিমের সাক্ষীর শেষ মহড়া শুনবার জন্য পরীক্ষকের সুরে প্রশ্ন করে— এইবার ক্যছেন কী করি? গড় গড় করে মকিম তার মুখস্ত সাক্ষী এক নিঃশ্বাসে আউড়ে যায়। কিন্তু শেষ না হতেই মুনশি প্রচণ্ড গর্জনে ধমকে ওঠে, কী কিইলি? আমতা আমতা করে ঢোক গিলে মকিম আবার বলে, অ্যাঁ কঁইয়ুম আঁই টাকা লইন্য। মুনশি ফেটে পড়ল— আরামজাদ টাকা' ন্য, 'ট্যায়া' 'ট্যাঁয়া' তুই মুজুর মান্দারের জাত, তোর মুখে টাকা হুইনলে হাকিম, হাকিম বুঝি ফালাইব যে কেউ হিঁয়াই দিছে। তুই কবি ট্যাঁয়া, ট্যায়া! বুইঝত নি? মকিম থতমত খেয়ে ভয়ে কয়েকবার টাকার প্রতিশব্দ নিজ ভাষায় মুখস্ত করতে শুরু করে— ট্যায়া, ট্যায়া, ট্যায়া' টাকা'-ট্যায়া! ট্যায়া!

মশ ষ্ ষ্ ষ্ ঝুপ!

শব্দ শুনেই তিনটি বৌ চমকে ওঠে। এ ওর দিকে তাকায়। চোখে মুখের ভাষায় এ ওকে জানায় যে পাতাটা পড়েছে দক্ষিণের বাগানে।

শব্দটা আর কিছুরই নয়, শুকনো নারকেলের পাতা ডগা বাতাসে ভেঙে নিচে পড়েছে তারই। গ্রামের ভাষায় বলে 'বাক্‌সা পাতা'। চার পাঁচ হাত লম্বা পুরু ডাঁটের ঐ পাতায় চমৎকাব জ্বালানি কাঠের কাজ চলে। জ্বলে ভালো, ধুঁয়োও কম হয়। খোদার বাতাসে ধাক্কা লেগে সে পাতা মাটিতে পড়েছে। তাই যে আগে ছুটে গিয়ে সেটা তুলতে পারে সেই হয় তার মালিক। এই হলো ঘরোয়া বিধান।

পা টিপে তিনটি বৌ শ্বশুরের জ্বলন্ত চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে আস্তে আস্তে ছাঁট দেয়াল ঘেঁষে এগুতে থাকে। দৃষ্টি সীমানার বাইরে এসেই নির্লজ্জ বেগে ছুটতে আরম্ভ করে তিনটি বৌ। বর্তুলাকার মেজ বৌ মাঝ পথেই একবার হুড়মুড়ি খেয়ে পড়ে যায়। ছোট বৌ মরিবাঁচি করে দৌড়ের ঝোঁকের মধ্যেই লম্বা করে হাতটা বাড়িয়ে দিল পাতাটাকে ধরবার জন্য। এমন সময় কোত্থেকে সুডৌল পায়ে ভর করে বিদ্যুৎ বেগে বড় বৌ এসে দাঁড়াল একেবারে পাতাটার গা ঘেঁসে। এবং ব্যথিত ছোট বৌর ক্লান্ত কম্পিত আঙুলের একেবারে স্পর্শ সীমানার মধ্য থেকেই বড় বৌ সড়াৎ করে সরিয়ে নিল পাতাটা। কালো ঘন দীর্ঘ উড়ন্ত চুলের মাঝখানে, বড় বৌর অরক্তিম মুখে সে কী উদ্ভাসিত হাসি! সেখানে নেই বিন্দুমাত্র সহানুভূতির আর্দ্রতা। চক্‌চক্ করছে শুধু একটা আলোকোজ্জ্বল নির্মম বিজয়োল্লাস।

সবাই এক পরিবারের। তাই একজন পাতার একচ্ছত্র অধিকারিণী হওয়াতে ব্যক্তিগতভাবে কারোই এমন কিছু ক্ষতি হচ্ছে না। তবু পরাজয়ের এ গ্লানি অন্য দু' বৌর মুখে এঁকে দিল গভীর সুস্পষ্ট ছাপ।

আশরাফ মুনশি বাড়ি নেই। শহরে গেছে মোকদ্দমা চালাতে। সমস্ত বাড়ি জুড়ে শান্তি আর আলসেমি যেন হাই তুলছে। উঠানের গরুগুলো পর্যন্ত গলার ঘণ্টা নেড়ে মাথা ঘুরিয়ে শুয়ে আছে। মুখের জঙ্গল মুখে তুলতে আজ আর ওদের একটুও গরজ নেই। আশরাফ মুনশি আজ বাড়িতে ছিল না, তাই কেউ আজ আর বুদ্ধি করে গরুগুলোকে প্রথমে মুগের গাছ খাইয়ে তারপর ঘাস দেয়নি। তাই ওরাও আজ নবাব হয়ে উঠছে। মানুষের মতো গরুও খুব ক্ষিদের

সময় যা সামনে পেত তাই চিবাত। এমনি করে মুগের জঙ্গল তৃপ্তির সঙ্গে খেত। কিন্তু এখন ওরা জঙ্গল কিছুতেই মুখে তুলবে না। এই নরম কচি ঠাণ্ডা ঘাস; তুল্‌তুলে, সবুজ।

ঘরের দাওয়ায় বসে ছোট বৌ, মেজ বৌর ছেলেকে চুম দিয়ে কাঁদাচ্ছে। মেজ বৌ বড় বৌ একরাশ বেসামাল কালোচুল কোলে নিয়ে ঘেমে উঠছে; উঁকুন বাছতে গিয়ে নিজের চোখমুখ হারিয়ে ফেলছে ঐ কালো ঘন চিকন আকাশে। মুগ্ধ হয়ে শুধু উচ্চারণ করে— বড় বিবি তোর চুল কী সোন্দর!

আহ ছিড়ি হালাইবি নাকি ? চুলে টান পড়াতে চিৎকার করে ওঠে বড় বৌ। মেজ বড়োর মাথায় একটা হোটা দিয়ে বলল, ছিড়তাম ন্য এত সোন্দর ক্যা তোর চুল ?

মশষ পর ঝুপ ?

কোথায় শিশু কোথায় চুল তিনটি বৌ একসাথে দাঁড়িয়ে পড়ে চোখের পলকে। ছোট বৌ এই ক্ষণিক অবসরের মধ্যে শুধু একবার, হিষ হিষ করে ওঠে— দেইখ্যুম বড় বিবি তুই হাঁস্ ক্যামনে এইবার ? বলেই ছুট। কানের হিসাব খুব ভুল হয়নি। অন্দরের ঘাটে দাঁড়িয়ে তিনো বৌ দেখল পাতাটা পড়েছে পুকুরের উল্টো পাড়ের মাঝামাঝি। তাও ডাংগায় নয়, পড়েছে পানিতে। বিরাট পুকুর। ডান পাড় দিয়ে ঘুরে ছুটলে বেশি ভালো হবে না, বাঁ পাড় দিয়ে গেলে আগে পৌঁছানো যাবে— মেজ আর ছোট কেউ তা ঠিক ঠাওর করে উঠতে পারে না। বড় বৌ স্থির গভীর চোখ মেলে ভাসমান পাতাটাকে শুধু দেখছে। আচম্‌কা ছুটল ছোট বৌ দক্ষিণ পাড় ধরে, মেজ অমনি নিল উত্তরের পথ। মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে রইল বড় বৌ, স্থানুব মতো স্থির। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। এবং তারপরই মেজ আর ছোট হতভম্ব হয়ে দেখল কী করে সাদা শাড়িতে মোড়া বড় বৌর সুগঠিত দীর্ঘ দেহ তীর্যক হয়ে পানি কেটে, তীব্র বেগে সাঁতরে চলছে পাতাটার দিকে। দু'জনেই গালে হাত দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল। দেখতে লাগল বড় বৌর এই নতুন রূপ।

দু'হাত দিয়ে পাতাটাকে ঠেলতে ঠেলতে বড় বৌ ফিরছে বিজয় গৌরবে। পানিতে ঢেউয়েব তালে তালে লাথি মারছে আব মাঝে মাঝে মুখ পুরে পানি নিয়ে ওপরের দিকে ফোয়ারার মতো করে ছুঁড়ছে— ঠিক যেন একটা সাদা ক্ষুদে তিমি মাছ।

এমন সময় হঠাৎ যেন ককড়াৎ ককড়াৎ করে আকাশ ভেঙে বাজ পড়ল। দক্ষিণপাড় থেকে ছোট বৌ একটা আতঙ্কিত, বিভৎস চিৎকার করে উঠল— হালুম। বড় বৌ পাড়ের দিকে তাকিয়েই দেখলে পশ্চিম পাড়ের আনারস ঝোঁপের ফাঁকে একটা নিকশ কালো মুখ, কাঁচা পাকা দাড়িতে ঢাকা। আর লক্‌লকে কাটাপাতার ফাঁক দিয়ে সে মুখের শুধু একটা চোখ স্থির হয়ে জ্বলছে। বড় বৌর মনে হলো তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আর পানির নিচের মাটি থেকে কী একটা যেন ক্রমশ তাকে কেবল টানছে। ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ পুকুরের চার পাড় কাঁপিয়ে, নারকেল সুপারি বাগানের স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল একটা বিকট বিস্ফোরিত অট্টহাসি। চোখটা নেচে উঠল, দাড়ি দুলে উঠল। আশরাফ মুনশি ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেও ক্রমাগত হাসির তোড়ে অট্টধ্বনিতে ভেঙে পড়ছে। তারপর একটু সামলে বগলের হরেক রকমের পুঁটলিগুলো দু'হাতে উঁচু করে ধরে দরাজ গলায় হাঁক দিল— নিবি নিবি, জলদি করে আয়। তোগো লই ফুলতেল আন্‌ছি রঙ্গ সাবান আইনছি চুড়ি আইনছি। নিবি তো জলদি করি আয়'।

আশরাফ মুনশি মোকদ্দমায় জিতেছে। এবং সেই খুশিতে দশক্রোশ পথ এক হাঁটাতেই পাড়ি দিয়ে এত তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। ব্যাপারটা চোখের পলকে পরিষ্কার হয়ে আসতেই কিছুক্ষণ আগেব ভীতসন্ত্রস্থিত তিনটি বৌ-ই নতুন আলো, নতুন প্রাণ পেল। ছুটতে শুরু করল তিনজন; পশ্চিম পারেব আনারস ঝোপের দিকে। দু'জন ডাঙায় দৌড়ে, একজন পানিতে সাঁতরে।

আর পবিত্যক্ত বাক্‌সা পাতাটা তবঙ্গায়িত পুকুবেব মাঝখানে তখন ভাসছে অত্যন্ত করুণভাবে।

ফিডিং বটল

সাজ্জাদ দুই তিনবার গা মোড়ামুড়ি দিয়া ঘুমের জড়তা কিছুটা ঝাড়িয়া লইল। প্রশস্ত বিছানার অপর পার্শ্বেই তন্বী স্ত্রী ঝুঁকিয়া পড়িয়া নবলব্ধ শিশুকে দুধ খাওয়াইতেছে। সাজ্জাদ ঘাড় ফিরাইয়া ম্যাডোনা মূর্তির এই বাংলা সংস্করণ হইতে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের উন্মুক্ত অনুভূতি দ্বারা রস পান করিতে লাগিল। শায়িত অবস্থাতেই হাত বাড়াইয়া বালিশের নিচ হইতে ম্যাচ এবং সিগ্রেট কেস হস্তগত করিল। ছোট খোকা, ফিডিং বোতল চুক চুক করিয়া চুষিতেছে। মাতা তাহার মুখের সামনে নিবিষ্ট মনে ঝুকিয়া পড়িয়াছে— অনতিদূরে স্বামী চুষনির শব্দের সাথে তাল মিলাইয়া ধুঁয়ার রিং ছাড়িতেছে। সমস্ত বিশ্বের দাম্পত্য জীবনের ছবি যেন পূর্ণাঙ্গ বাস্তব রূপ পাইল।

হামাগুড়ি দিয়া গড়াইয়া সাজ্জাদ মাতাপুত্রের নিকটে সরিয়া আসিল। তারপর আচমকা ভ্রূ কুচকাইয়া একবার নিজের স্ত্রী আর একবার পুত্রের দিকে সঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। স্ত্রী আবেদা অস্থির হইয়া ওঠে। জিজ্ঞাসা করিল : 'অমন করছ কেন ?'

'না দেখছি।'

'কী দেখছো ?'

সাজ্জাদ সহসা ছোট খোকার চোখের কাছে চোখ লাগাইয়া কী যেন দেখিল। মুখ ঘুরাইয়া আবেদাকে প্রশ্ন করিল। 'খোকার মুখ ধুয়েছিলে ?'

আবেদা কোনও উত্তর দিল না। নির্লিপ্ত ভংগিতে শুধু ফিডিং বোতলটাকে আরেকটু কাত করিয়া শিশুর দুই ঠোঁটের মাঝে ভাল করিয়া ধরিয়া রাখিল। নাকের নীচে এক টুকরা হাসির কল্পিত গুড়া লাগিয়া! সাজ্জাদ ক্ষেপিয়া গেল। তারপর দৃঢ় স্বরে, 'উত্তর দিচ্ছ না যে বড় ?'

'কীসের ?'

'খোকার মুখ ধুয়েছিলে কি না ?'

'বা, মুখ না ধুইয়ে দুধ আমি খাওয়াতে যাব কেন ?'

'মুখে দু-ঝাপটা পানি ছিটিয়ে বাসি আঁচল দিয়ে মুছে নেওয়াটাকে ধোয়া বলে না।'

'এই ভোর বেলায় তোমার সাথে তর্ক করতে আমি রাজি নই।'

'মানে, আমার ছেলেকে তুমি নোংরা করে যা তা অযত্ন দেখাবে আর আমি কিছু বলব না ?'

'ছেলে তোমার একলার নয়।'

'হ্যাঁ, ছেলে আমার একলারই।'

'না—'

'হ্যাঁ— শুধু আমারই ছেলে।'

'না, তোমার নয়, শুধু আমারই।'

বিবাহিত জীবনের বিশ্বরূপ আবার প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। উচ্চপদস্থ তরুণ সরকারি কর্মচারী

সাজ্জাদ তখন হিংস্র পিতার মূর্তি ধারণ করিয়াছে, গর্জন করিল, 'না, আমার ছেলেকে অযত্ন তুমি করতে পারবে না।'

এবং সাথে সাথেই সাজ্জাদ ক্ষিপ্র হস্তে ফিডিং বোতলটা ছিনাইয়া লইয়া জোরে জানালা পথে ছুঁড়িয়া দিল। ছোট খোকার তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ফিডিং বোতলের ভাংগিবার চূর্ণিত শব্দকে ছাপাইয়া গেল। উপর হইতে দোর্দণ্ড শব্দে মা, ভাই, বোন ছুটিয়া আসিবার পূর্বেই কলেজে পড়ুয়া আলোকপ্রাপ্তা আবিদা বেগম তখন ঘরের বৌ'র স্বাভাবিক নম্রতা ভুলিয়া পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় খিঁচাইয়া উঠিল। দ্রুতগতিতে পাকের ঘর ইতে দুধের সসপ্যানটা আনিয়া খপ করিয়া স্বামীর সম্মুখে ফেলিল। তারপর বহ্নি নয়নের সাথে বাহির হইল স্ফীত উচ্চারণ : 'এই রইল তোমার দুধ আর এই রইল তোমার ছেলে, যত পার এখন আদর-যত্ন কর।'

রাগে সাজ্জাদ নির্বাক। নিষ্পলক দেখিতেছে কী করিয়া আবিদা একটা বিদেশী উপন্যাস হাতে লইতেছে। তারপর পাকের ঘরে যাইয়া নিবিড় হইয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় সেই গল্পের বই'র মাঝে নিজেকে বিলাইতেছে। সাজ্জাদ চিৎকার করিয়া উঠিল। 'আনু— আনু।'

বিধবা ছোট বোন আনোয়ারা আসিল।

'নে ঐ ডাইনির কাজ নয় সন্তান পালে। তুই নিয়ে যা, ওপরে নিয়ে তোর কাছেই রাখবি এখন থেকে। বুঝলি ? মাকেও এই বলে দিবি।'

মা ততক্ষণে নিচে নামিয়া আসিয়াছে। দূর দূর করিয়া ছেলেকে গালি দিয়া উঠিল। সাজ্জাদ অটল। আরেকবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিতে আনোয়ারা খোকাকে কোলে লইয়া আর সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিতে সাহস করিল না। আস্তে আস্তে উপরে চলিল। মাও পিছু লইলেন।

সোফা হইতে দৃপ্ত কদমে আবিদা উঠিয়া আসিয়া সশব্দে মাঝখানের দরজাটা রুদ্ধ করিয়াছিল। সাজ্জাদ একাগ্র চিত্তে কান পাতিয়াও বুঝিতে পারিল না ঘর হইতে যে মৃদু শব্দের রেশ থাকিয়া ভাসিয়া আসিতেছিল তা উপন্যাসের পাতা উল্টাইবার না ফোঁপানির কান্নার চাপা প্রতিধ্বনি। জানালার কাছে তখন আনোয়ারার ছোট ভাই রশিদ, রশিদের ছোট বোন জাহানারা, তারপর যথাক্রমে তিনু, মনু সব ভীড় করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে মজা দেখিতেছে। সাজ্জাদ মুখ বিকৃত করিতেই তারা এক ছুটে অদৃশ্য হইয়া গেল।

বেলা বারটা বাজে। দৃশ্য পূর্ববৎ।

সাজ্জাদের আম্মা বৌ'র অনাগত দ্বিতীয় সন্তানের কথা স্মরণ করিয়া একটু শংকিত হইলেন। আবিদার অংগে গণ্ডে হাত বুলাইয়া অনুরোধে করিলেন, 'বৌ, তোমার শরীর খারাপ, এখন উঠে কিছু খাও।' আনোয়ারা যোগ দিল।

'তুমি কি চাও আজ সারা দিন না খেয়েই থাকবো ?'

আবেদ চুপ করিয়া রহিল।

জাহানারা যথাসম্ভব দরদ ভরা সুরে— 'ভাবি তুমি ভাত খাবে না ?'

তিনু মনু সাহস করিয়া আবিদার দুহাত ধরিয়া ফেরসে বলিল, 'ভাবি উঠ, চল না খেতে যাই!'

এবার আবিদার ধৈর্যের বাঁধ ভাংগিল। হাতের বইটা শূন্যে ছুড়িয়া চেয়ার হইতে লাফাইয়া চিৎকার করিয়া উঠিল— 'এটা কি চিড়িয়াখানা না কি ? আমি কিছু খাবো না— খাবো— না।'

ব্যাকুল কণ্ঠে আম্মা দুর্বার অনুরোধ করিল। 'লক্ষ্মী বৌ এমন কোরো না। তোমার নিজের আম্মা এসে যদি আজ অনুরোধ করতো তাহলে কি আজ তুমি তা ঠেলে ফেলতে পারতে ?'

'আমার নিজের আম্মা হলে এমন অনুরোধ করতেনও না।'

আম্মা এবার সত্যি ব্যথিত হইল। পাশের ঘর হইতে সাজ্জাদ জোরে জানাইল : 'আম্মা আপনি কেন ঐ গোয়ারটাকে শুধু শুধু অনুরোধ করছেন ? চলে আসেন। ক্ষিদে লাগলে আপনি ও খেয়ে কুল পাবে না। রশিদ, আনু, মনু তোরা চলে আয়।'

বেলা দুইটা। পরিস্থিতির কোনই পরিবর্তন নেই। সাজ্জাদ ঘর জুড়িয়া পায়চারি করিতেছে আর আবিদাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আনোয়ারার নিকট গরগর করিতেছে।

'খাবে খাবে আপনিই খাবে! একটু পরেই যখন দাঁত কপাটি লেগে বেহুঁশ হয়ে উল্টে পড়বেন তখনই গিলবেন। রশিদ তুই চলে আয় এখানে। আয় তাস খেলি বসে বসে।'

বশিদ তার ভাবির সামনে হইতে উঠিয়া বন্ধ দরজা একটু ফাঁক করিয়া এ ঘরে প্রবেশ করিল। সাজ্জাদ তাসের প্যাকেট খুলিয়া শাফল করিতেছে। কিছুক্ষণ খেলা চলার পব— 'মিঞা ভাই কী খেলছ তুমি ? তোমার তো রানিং ফ্লাশ খামোকা এত আগেই ছেড়ে দিলে কেন ?'

সাজ্জাদ কর্ণপাত করিল না। অকস্মাৎ কানের কাছে মুখ লাগাইয়া বলিল— 'এই তুই দেখ না একবার। তোর সংগে ত অনেক খাতির, তুইই দেখ না তোর ভাবিকে বলে কয়ে কোনো রকমে খাওয়াতে পারিস কিনা। পারলে, বুঝলি দুটো দু'দুটো টাকা তোকে দেব। রশিদ বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। সাজ্জাদ ভাইর ঐ হাম্বিতাম্বির গোড়ায় তা হইলে এই। সুযোগ পাইয়া রশিদ এবার উপরিহস্ত চালনা করিতে ছাড়িল না। যেন চলিয়াছে এমনি গম্ভীর কণ্ঠে জানাইল, 'আচ্ছা, আমি দেখছি একবার চেষ্টা করে মিঞা ভাই— ঘাবড়াবেন না।'

সাজ্জাদ ভাই তখনও তাঁর আত্মসম্মান আঁকড়াইয়া পূর্ণ গাম্ভীর্যের সহিত বসিয়া রহিলেন। উচ্চকণ্ঠে চাকরকে ডাকিলেন, 'এই, একটা টেলিগ্রাম ফর্ম নিয়ে আয়। ওর আব্বাকেই একবার টেলিগ্রাম করে দি। নিজের মেয়েকে এসে নিয়েই খাইয়ে বাঁচাবেন। আমার কী ?'

কিছুক্ষণ পরে রশীদও পাশের ঘর হইতে ফিরিয়া আসিল। মুখ গম্ভীর। আয়নার কাছে দাঁড়াইয়া চোখের পানি রুমাল দিয়া মুছিতে মুছিতে নিম্নকণ্ঠে যে বিবৃতি দিল তাহার অর্থ এই সে তাহার পক্ষ হইতে কোনরকম ত্রুটিই হয় নাই। কিন্তু তাহার নসিবে নাই তা টাকা দুই বা সে আর কী করিযা পাইবে। ভাবির দুই পায়ের উপর হইয়া সে অনুরোধ সত্যই করিয়াছিল। এমনকি ভাবাবেগে কাঁদিয়া পর্যন্ত ফেলিয়াছিল। তাহার আশায় ছাই ফেলিয়া ভাবিও নাকি উল্টা কাঁদিয়া ফেলিল। এবং জানাইল যে রশিদ ছেলে মানুষ, সে এসব বুঝিবে না। ব্যাপার এখানে অন্যরকমভাবে গুরুতর। রশিদ চটিয়া গিয়াছে— অন্য রকম কী ? তাহার জ্বলজ্যান্ত দুই টাকা খামোকা মারা যাইতেছে। আর ব্যাপার কিনা অন্যরকম যা সে বুঝে না। হুর।

বেলা চারটা। উত্তেজনার করাল ছায়া ঘন হইয়া উঠিয়াছে। আনোয়ারা অন্য পাশের ঘরে ছোট খোকাকে চিমটি দিয়া কাঁদাইয়া দেখিয়াছে— উত্তর আসিয়াছে— 'যে ছেলে কাঁদে তার মা মরে গেছে!'

সব্বাই আশা ছাড়িয়া দিল। শেষ উপায় সাজ্জাদের নিজের হাতে। কিন্তু সাজ্জাদ না হয় তার আত্মসম্মানে জলাঞ্জলি দিল— তাহা হইলেই সে সকল সমস্যার সমাধান তাহারই বা এমনকি সুনিয়শ্চতা আছে ? তখনও যদি আবিদা গোঁ ধরিয়া থাকে ? আনোয়ারা শুধু ঘাড় নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া জানাইল— 'নারে না তা হয় না। এই রহিল তোর খোকা— এবার তুই দেখ।'

অন্তর যুদ্ধে জর্জরিত, মলিন বসনে সাজ্জাদ আরও কিছুক্ষণ নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে কী সব চিন্তা করিল। তারপর বীরের মতো কণ্ঠ করিয়া ঘোষণা করিল— 'আচ্ছা তাই হবে। কিন্তু তোরা সব আগে উপরে যা।— যা শিগ্‌গির।'

বসিয়া আনোয়ারা, তাহার পিছনে মেষ মাবকের মতো তিনু, মনু ও সবার শেষে ধীর পদবিক্ষেপে রশিদ সিঁড়ি দিয়া উপরের ছাদের কোঠায় চলিয়া গেল। সাজ্জাদ পেছন পেছন দরজা বন্ধ করিয়া দিল। আমিনা আগে হতেই সেখানে অশ্রুসিক্ত বদনে অজু করিয়া তসবি গুণিতেছেন।

যখন আশংকায় প্রায় এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, নিঃশ্বাস বসিয়া থাকিতে থাকিতে রশিদেব অসহ্য বোধ হইতেছে। তাহার উপর অনিশ্চয়তার এই মানসিক চাপ। সেই উঠিয়া দাঁড়াইল। আতংকে ভয়ার্ত অংগভঙ্গীর দ্বারা সবাই তাকে বসাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু রশিদ বেপরোয়া। এমন নির্জীব হইয়া জড়পিণ্ডের মতো আর কতক্ষণ ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা চলে?

পা টিপিয়া টিপিয়া সে নিচে আসিল। তারপর জানলার একটা সংকীর্ণ খড়খড়ির ফাঁক দিয়া ঔৎসুক নেত্রে চাহিয়া রহিল। সে দেখিল ভাবি দিব্যি আরামের সংগে পা ছড়াইয়া পাশেব প্লেট হইতে ছানামাখা একটি একটি ক্রিম ক্র্যাকার তুলিয়া মুখে দিতেছে আব তার সাজ্জাদ ভাই সমস্ত পুরুষজাতির কলংক হইয়া সেই বিস্কুটে মাখন লাগাইতেছে। উভয়ের মধ্যস্থলে ছোট খোকা এক নতুন ফিডিং বোতল হইতে মহানন্দে চুকচুক কবিযা দুধ খাইতেছে।

বাবা ফেকু

চিবুকের ডান দিকে রগটা কাটা। ছোটকালে বাঁশের সাঁকো ভেঙ্গে গিয়ে ঐ দুর্ঘটনাটা ঘটে। অনেক চিকিৎসে করেও ওটা আর পরে ভাল করা যায় নি। এখন সব সময়েই ওটা দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি পড়ে— লালাক্ত পানি। উষ্ণ লবণাক্ত স্বাদ।

লোকটা নাকি একেবারে কসাই। জীবনে নাকি কোনদিন কাঁদে নি। হয়ত চোখের পানি গালের ছেঁদা দিয়ে বেরুতে সব ফুরিয়ে গেছে।

ফেকু মিঞার প্রতিপত্তি অবশ্য এতে কিছু কমে নি। কায়দা কবে থুতনির বুকে রাখা হয়েছে কয়েক গাছি দাড়ি। কাঁধের ওপর সব সময়ই থাকে একটা পুরু গামছা। এমন সুনিপুণ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ডান কাঁধটাকে ওপবে দিকে অর্ধ চক্রাকারে টেনে তুলে ফেলবেন যে আবার নামিয়ে আনায় সময় কেউ বুঝতেও পারবে না যে এবি মধ্যে ফুটো রগটা বেশ করে মোছা হয়ে গেছে। খুতনি বেয়ে দাড়ির গোড়া ধবে সেই পানি বড় জোর দাড়ির মাথা অবধি এসেছে একটা স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতিতে যান্ত্রিক কাঁধটা অমনি সব মুছে নেবে ভাঁজ করা গামছায়— খান বাহাদুর গোফরান সাহেবের ভাগ্নে হন ফেকু মিঞা। দোর্দণ্ড প্রতাপ তাই ফেকু মিঞার সমস্ত শহর জুড়ে। দুষ্ট লোকে বলে ফেকু মিঞা খান বাহাদুর সাহেবকে তুক করেছে। তা নইলে ওর এত নষ্টামি গোফরান সাহেবের মতো উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী গোড়া নিষ্ঠাবানের চোখ এগিয়ে যায়! তিনি ত অর্ধচক্ষু সস্নেহে মুদে 'বাবা ফেকু' ছাড়া ভাগ্নেকে ডাকতেই পারেন না। আসল কথা ফেকু মিঞা মন্ত্রও জানে না, তুকও করে নি; সে শুধু বুদ্ধিমান। সে জানে বুড়ো মানুষের ভাঙন ধরা মনের প্রতিটা ফাটল। জানতো কোথা থেকে আক্রমণ করলে পরে অত বড় আলেম এবং অভিজ্ঞ সংসারি গোফরান সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও তার সমস্ত বিরাটত্ব গুটিয়ে আশ্রেয় খুঁজবে ভাগ্নেব রোমশ বুকে।

সন্ধের পর—

গবমে টিকতে না পেরে একটা শীতল পাটিতে শুয়ে বারান্দায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। মোটরে সারাদিন মফস্বল করে গাটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। খাস খিদমতগারটা একবার এসেছিল গা টিপে দেবার জন্যে। নিষেধ করে ফিরিয়ে দিয়েছেন। আদর্শবাদী গোফরান সাহেব চান না যে তাঁর নিজের সন্তানেরা শিখুক যে টাকা পয়সা বেশি হলে চাকরবাকর দিয়ে পা টেপানো আভিজাত্যের নমুনা। নিজের কষ্ট হোক তবু ছেলেমেয়েদের সামনে সে আদর্শ তিনি কোনও দিনই স্থাপন করবেন না। হঠাৎ পায়ের কাছে কার অত্যন্ত মোলায়েম স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠলেন, 'কে রে?'

গোফরান সাহেব খাস অভিজাত কিন্তু ঘরে কথা বলেন দিশী ভাষায়, বাইরে শান্তিপুরী, চাকরবাকরদের সঙ্গে উর্দু।

'মামুজি আঁই!'

'ওহ্! বাবা ফেকু নি?'

ফেকু মিঞা তখন নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে মামুজি পা-উরু গলদঘর্ম হয়ে টিপছে। অর্ধচক্ষু মুদে গোফরান সাহেব,

'বাঁচি থাক, বাঁচি থাক বাবা!'

ফেকু মিঞার মুখের পেছনে মেঘ ছিঁড়ে রেলিঙের ওপাশে আস্তে আস্তে চাঁদটা আবার ভেসে ভেসে উঠল। ফেকুর প্রতিটি চাপে গোফরান সাহেবের ঘুমের স্তর যেন আরো ঘন হয়ে আসছে। আচমকা তন্দ্রা টুটে গেল। পায়ের উপর যেন কয়েক ফোঁটা পানি পড়ল— গরম। ফেকু কাঁদছে নাকি?

'বাবা ফেকু— কী অইছে?'

'কিছু না মামু জান।'

'কান্দনি তুঁই— এঁ্যা?'

এমন এক কণ্ঠস্বরে এর প্রতিবাদ এল যে গোফরান সাহেব বুঝলেন যে ফেকু কাঁদছে।

'বুঝছি, আঁর কাছে তোঁয়ারা কাকে সব লুকাই রাইখবিই। কইত্যি ন্য?'

'কী কইতাম?'

'কাঁন্দস ক্যা?'

'কৈ কাঁইদলাম?'

'হাছানি। তৈলে গরম পানির হইড়ল কোনানতন।'

ফেকু এবার সত্যি ডুকরে ফুঁপিয়ে উঠল। ঝরঝর করে আরো কয়েক ফোঁটা গবম পানি পড়ল গোফরান সাহেবেব পায়ের উপর।

'চোখের পানি ন্য মামুজি, আঁর বুকের রক্ত হইড়ছে আম্মার পায়ের উপর। খোদা তাঁকে বেহেস্তে নেন— আইজ যদি আইন্যের বড় ভাই বাঁচি থাইকত—'

লক্ষ্য এবার অব্যর্থ। মৃত প্রিয় বড়ভাইর কথা এমন করুণ কণ্ঠে দরদীর মুখে শুনে গোফবান সাহেব নিজেই আর চোখের পানি চাপতে পারলেন না। একটু থেমে ফেকু বলে, 'আঁবে কত আদর কইত্য।'

কাঁদতে কাঁদতে গোফরান সাহেব মনে করে উঠতে পারলেন না— সত্যি তার মরহুম ভাই ফেকুকে ঘৃণাই করত না খুব ভালবাসত। শুধু বললেন, 'হেই কথা আর কইছ্যারে বা'

'কইত্যম ন্য ক্যা— আইজ— যদি হ্যাতে বাঁচি থইকত তই কি— ক্যালা দুইশ টায়ার নাই বিশ কানি জমি ডিক্রি ত উঠত? মাইনষে আঁর বাড়িঘর ক্রোক করণের ক্যতা কইত?

চোখের কোণা মুছে গোফরান সাহেব ধীরে প্রশ্ন করলেন, 'ডিক্রি জারির তারিখ কবে?'

এর পবের সব উত্তর ফেকু মিঞা দিয়েছে আংকিক নিয়মে হিসেব করে। দরদ দেবার কথা ভাবেও নি। ভাববার তার অবসরও ছিল না। সে তখন ভাবছিল আর কত টাকা হলে আগামী ছুটিতে বাড়ি গিয়ে পাটারীদের জমিটা কিনতে পারে।

আর ভাবছিল চাম্বেলীর কথা। গোফরান সাহেবের বাসায় সুন্দরী কিশোরী চাকরাণীর কথা। ও মাগী অত সুন্দরী হলো কী করে? ওর বাবাকে ত সে দেখেছে। না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরে পড়েছিল— পরনে একটা নেংটির মতো ছেঁড়া লুংগি— চেহারাটা কুৎসিত আর বছর বারকের একটা হ্যাংলা মতন মেয়ে মুর্দার বুকের উপর মুখ থুবড়ে কাঁদছিল। এখন চাম্বেলীব

বয়স কত ? ষোল ? এত কম ? আমাব নিজেব বয়স কত ? ছত্রিশ ?— না-না-ত্রিশ আরো কম। পঁচিশ। দেখতে ত সে কত জোয়ান। আরো কম। একুশ।

ডান হাত দিয়ে চোখটা মুছলো। যন্ত্রচালিত চক্রের মতো গামছা বসান ডান বাহুটা উর্ধ্বমুখী চক্রাকারের ঘুরে এল, ডান থুতনি ঘেষে সিক্ত ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি ঘঁষে।

চাম্বেলী তখন জোছনায় ভরা ছাদের উপর অস্থির চিত্তে ঘুরছে। নারকেল তেলে চুবিয়ে আঁট করে বেঁধেছে চুল। খোপায় বসিয়েছে লাল পলাশ। হাতে একটা বকুলফুলের মালা। কেরামত এখনও আসছে না কেন ? সারাদিন অত পানি তুলতে হলে গায়ের ব্যথাতেই ওর হাড়গোড় নিশ্চয়ই গুঁড়ো হয়ে যেত। কিন্তু কী জোয়ান তার কেরামত! এতদিন তার সঙ্গে এক সাথে হেসেছে, কত গল্প করেছে, তবু কোনদিন একটুও গায়ের কাছে ঘেঁষে বসতে চায় নি। একলা নিরালা জায়গা হলে, বরঞ্চ তাড়াতাড়ি কাজের অজুহাত দিয়ে পালিয়ে গেছে। আজ আসুক। এই ফুলের মালা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে সব কথা খুলে বলবে। তারপর কাল ভোরে দুজনে গিয়ে আব্বার পায়ে কদমবুচি করে হুকুম চাইবে বিয়ের। তাদের মনিব নিশ্চয়ই রাজি হবেন।

ভাবতেও চাম্বেলীর গা শিউবে ওঠে. বুক দুর দুর করে ? কেরামত একলা বলতে পারবে কি ? এতবড় জোয়ান হলে কি, একদম ভীতু ও। হঠাৎ ওর খেয়াল হয়,— আচ্ছা, ফেকু মিঞাকে বললে হয় না ? উনি বললে আব্বা নিশ্চয়ই মানবেন।

ছাদের মধ্যের একটা ছোট খুপরির ভিতর দিয়ে গোফরান সাহেবদের ড্রইংরুম দেখা যায়। ভাবতে ভাবতে চাম্বেলী সেই খুপরিটার ধারে এসে দাঁড়াল। চাঁদের আলো পড়ায় সিল্কের একটা বড় সোফা পরিষ্কার দেখা যায়। দুজনে বসে কথা কইতে কত আরাম কত নরম। কয়েক সপ্তাহ আগে একদিন দুপুরে সব গেছে বেড়াতে, মুনিবও আফিসে। কী একটা জিনিসের খোঁজে ও এসেছিল এই ড্রইং রুমে। চলেই যেত, কিন্তু হঠাৎ কী জানি মনে হলো। ইচ্ছে হলো একবার বসে দেখতে। কেমন লাগে ঐ গদিওয়ালা চক্‌চকে চেয়ারে বসতে! বসেই সে উঠেও যেত, কিন্তু কী যে তার খেয়াল হলো— ভাবল কেউত আর এখন এখানে আসছে না, একটু বসতে দোষ কী ? কুর্সি ত আর খয়ে যাবে না। পায়ের ওপর পা দিয়ে সে ভাবছিল,— ও পাশে বসবে এসে কেরামত। তারপর ওর কোলে মাথা রেখে এমন লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে সে। আর এমনি পোড়া কপাল যে টের পেল না কখন সে নিজে সোফায় হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখছে সে যেন আবার তাদের বাড়িতে ফিরে গেছে। গোয়ালে গরু, মড়ায় ধান! দুর্ভিক্ষ নেই। উঠোন ভরা ধান সিদ্ধের গন্ধ। দুপুর বেলা পেট ভরে ভাত খেয়ে খড়ের গাদার উপর শুয়ে সে ঘুমোচ্ছে। চারিদিকে সোনালি তুলোর মতো রাশি রাশি খড়। ধানের গন্ধ যেন এখনও ওদের গায়ে লেগে। কী নরম— কী তুলতুলে। এসব ছেড়ে বাবা কেন তার হাত ধরে নোংরা শহরে চলে এল ? কিন্তু খড়ের গাদার ওপাশে কেরামত কী করে এল ? চোখে দুষ্টুমি বুদ্ধি। হাতে একটা শুকনো, সূক্ষ্ম খড়। ওহ! সুড়সুড়ি দিয়ে ঘুম ভাঙাতে আসছে না ? মনে করেছে সে বুঝি এখনও টের পায় নি। আচ্ছা, কাছে আসুক! আরো জোর করে চাম্বেলী চোখ বুঁজে রইল।

কিন্তু ঘুম তার ভাঙল! চোখ কচলে সব ব্যাপারটা বুজবার আগেই পরপর আরো কয়েকটা লাথি এসে পড়ল ওর কাঁধে, পিঠে, কোমরে! সোফা থেকে ছিটকে পড়ে ও গোঁ গোঁ কবছে আর ফেকু মিঞার এলোপাথাড়ি মার চলছে— পা থেকে মাথা অবধি।

'দেখছেন নি মামী আম্মা, হারামজাদির সাহস।'

'গুমোর কত, এখনও হুশ আছে—!' লাগা আরো। বললে কেউ।

বকুল মালাটা চুলের খোপায় জড়িয়ে চাম্বেলী খুপরি ছেড়ে একটু সরে আসে! ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে আর এক মুহূর্তও তার প্রবৃত্তি হয় না।

সবচেয়ে দুঃখ হয়েছিল তার, যখন সে দেখল সে অফিস থেকে ফিরে এসে গোফরান সাহেব তাকে নয়,— চাবকাচ্ছে চাকর কেরামতকে। কে লাগিয়েছে সব দোষ নাকি কেরামতেরই, চাম্বেলীকে সেই সাহস দিয়েছে ওখানে শুতে, আর বিপদ বুঝে ব্যাটা নিজে শট্‌কেছে।

তবু সে ফেকু মিঞার পায়েই পড়বে। যদি ফেকু মিঞা চেষ্টা কবে, তাদের বিয়ে হতে পারে সহজ, সুগম।

'বাঃ বাঃ চাম্বেলী ফুল দ্যেই আইজ বাহারে ফুইটছে।'

শিউরে উঠে চাম্বেলী দেখে পেছনে দাঁড়িয়ে ফেকু হাসছে। সুঁচোল সিক্ত দাড়ি চাঁদের আলোয় জ্বলছে। হঠাৎ ফেকু মিঞার হাসিকে অপ্রতিভ করে দিয়ে চাম্বেলী ওর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

'ফেকু মিঞা আপনে আমার বাপ, যা কন স—ব শুনুম। আমাব এটা উপকাব কইবা দিবেন?'

'দুর দুর, এইডা করস্ কী? সরি যা, সরি যা।'

কয়েক পা পিছিয়ে এল ফেকু মিঞা। শুধু ওকে ঠেলে দেবার সময় ঝুলে পড়া বকুল মালাটা ওর খোপা থেকে ছিঁড়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিল,

'এই ফুল রাইখছস আবার! চুলের মধ্যেও সাপের বাসা বানাইবি নাকি?'

চাম্বেলী কাত্‌রে কাত্‌রে বলছে, 'যা কন সব শুনুম— যা কন। আপনে আমার ধেম্ম বাপ।'

ফেকু মিঞা ধীরে ধীরে সপ্রতিভ হঁয়ে এল। ব্যাপারটা পুরো আঁচ করে নিয়ে একটু দূবে সরে দাঁড়াল।

'কান্দস ক্যা? ক, করিউম। তোর লাই করিউম, বেশি কি?'

কথার মারপ্যাচ বোজার মতো মন তখন চাম্বেলীর নয়। সে শুধু জানে যে ফেকু মিঞার অপ্রতিহত ক্ষমতা, আর জানে, একবার কেরামতকে পাশে পেলেই হয়। নরম পৃথিবীকে আর কিসের ভয়? সব কথা নিঃসংকোচে সে ফেকু মিঞাকে বলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। চোখে অসহায় মিনতি। হাত রেখে ফেকু মিঞা চোখ সংকীর্ণ করে হাসল।

'সব কমু। করিউম। তবে আজই কইতাম পারি না, কাইল কউম। তবে ইয়ানো থাকিস কাইল। যা কমু করন লাইগব কিন্তু।'

'যা কন্— যা কন।'

ফেকু মিঞার ডান কাঁধটা হঠাৎ ওপরে উঠে থুতনি ঘষল।

পরের দিন রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই শুতে যাবে এমন সময় সকলে শুনল ছাদের ওপর থেকে চাম্বেলীর একটা ভয়ার্ত আর্তনাদ। ছাদে কারা যেন দুদ্দাড় শব্দে ধ্বস্তাধ্বস্তি করছে। সকলে ছুটে ছাদে গিয়ে দেখে ফেকু মিঞার বুকের ওপর বসে বলিষ্ঠ কেরামত এক হাতে দাড়ির অগ্রভাগ ধরে প্রাণপণে ঘুষোচ্ছে— ফেকু মিঞাও প্রাণলাভের জন্য চিৎকার করছে, গাল দিচ্ছে, আর হাত পা ছুঁড়েছে। পাশেই নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে চাম্বেলী—

তৃপ্তিব ঈষৎ আবেগে ঠোঁট কাঁপছে।

দুজনকে ছাড়িয়ে দিয়ে সবাই যখন নিচে নেমে এল তখন ফেকু মিঞা শারীরিক বিশেষ কাহিল। বাড়ির প্রত্যেকে এ দৃশ্যে হতভম্ব এবং পরিণতির কথা চিন্তা করে ভীত।

কাঁধের উপর গামছাটা ফেলে সে কাঁধ দিয়ে চিবুকের প্রান্ত মুছতে মুছতে ফেকু মিঞা একটু হাসল। হিসেবে তার খুব ভুল হয়নি। খানবাহাদুর সাহেব বাড়ি নেই— মফস্বলে। কাল ফিরবেন। তবে চাম্বেলী বিবির বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেবে সে।

এর পরের ঘটনা খুবই সংক্ষিপ্ত। পরের রাত্রে বাতাস করতে করতে ফেকু মিঞা খানবাহাদুর সাহেবের কানে কী মন্ত্র ঢাল্লেন তা কেউ জানে না। তবে শায়িত অবস্থাতেই গোফরান সাহেব রাগে গড়গড় করে উঠলেন— 'আঁর ছাবুকটা লই আছেন।'

ফেকু মিঞা চাবুকটা বাড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত নিরীহ কণ্ঠে ডাক দিল কেরামতের নাম ধরে জোরে। ছুটে এল অন্য আরেকটা চাকর। হুমকি দিলেন খানবাহাদুর সাহেব— 'বদমাস তোমকো নেহি, কেরামত কাঁহা?'

'আব্বা লাই।'

'লাই কেয়া?'

'চইলা গ্যাছে— পলাইয়া গেছে।'

ফোঁস করে উঠল উত্তেজিত ফেকু মিঞা— হাতে চাবুক।

'তৈ চাম্বেলীরে ডাকি লই আয় ইয়াঁনে।'

'হে-ও'ত চইলা গেছে হেই লগে।'

খানবাহাদুর সাহেব ধড়মড় করে উঠে বসলেন : 'কেয়া কাহা?' খানবাহাদুর সাহেবের নধর কাঁধে টুপ্ করে পড়ল কয়েক ফোঁটা পানি— গরম। চমকে উঠে খানবাহাদুর সাহেব অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ্যা, তুই কাঁদ নি? বাবা ফেকু তুই চাম্বেলীর লাই কাঁইদলা নি?'

'না না কাঁইনদুম ক্যা মামুজি, এগুন আঁর গালের হানি।'

ক্ষিপ্রবেগে শূন্যে লাফিয়ে উঠল ফেকু মিঞার ডান কাঁধ। এবং আর এক ফোঁটা চকচকে পানি ধারাল চিবুক গলিয়ে ছুঁচোল দাড়ি চুঁইয়ে পড়বার আগেই সবটাকে এসে গ্রাস করল একটা অর্ধ-সিক্ত গামছা।

ন্যাংটার দেশে

বশিরুল্লাহ্ কারীর মিঠে আজানের আগে, চৌধুরীদের লাল ঝুঁটি ওঁচানো মোরগ ডাকেরও অনেক আগে আমিনের বাপ ঘরের মধ্যে গরগর করে ওঠে, ঘাড়ের রগগুলো ফুলে ফুলে ওঠে। থরথর করে কাঁপছে। কিন্তু সে অশ্লীল অকথ্য গালি-গালাজের বিরাম নেই; কলেরাগ্রস্ত রোগীর কুৎসিত বমির মতো কেবল গলগল করে বেরুচ্ছেই। কিছু নিজের কুমারী মেয়েকে উদ্দেশ্য করে, কিছু বৌকে, কিছু নিজের মৃত মাকে। আর সবগুলোই গর্ভ সংক্রান্ত। যে জাতির আব্রু রক্ষা করতে সমস্ত শরীর ঢাকতে কাপড়— সোনার কাপড়, বার হাত তের হাত লেপটে নিতে হয়, স্তনে-স্তনে উরুতে-উরুতে থেতলে আমিনার বাপ আজ তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়।

কুয়াশাচ্ছন্ন আবছা উঠানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আমিনার বাপ আরেকবার চাপা গর্জন করে উঠল। রুক্ষ কঠিন হাড়ের কাঠামোব মধ্য দিয়ে অতীতের বিরাট বলিষ্ঠ পুরুষটিকে চিনতে কষ্ট হয় না। দীর্ঘ নগ্ন দেহের মধ্যখানে শুধু অস্পষ্ট পাতলা এক ফালি ন্যাকড়া মতো গামছা জড়ানো।

দুহাত দিয়ে বিশাল দুর্বল দুই উরু চেপে ধরে বিড়বিড় করে কী বলল। চিৎকাব করে খোদাকে ডাকল, প্রতিজ্ঞা করল শহর থেকে আজ কাঁপড় না নিয়ে সে ফিরবে না। এই ল্যাংটা উরু কাপড় না এনে মা-মেয়েকে কোনদিন সে আর দেখাবে না। দেখাবে না। দেখতে দেবে না।

ভাঙা বেড়ার ফাঁক দিয়ে দুজোড়া ঝাপসা চোখ স্থির হয়ে দেখে কী করে আমিনার বাপ বড় বড় পা ফেলে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল— শহরের পথে।

শহর মানে, নোয়াখালী শহর। এখান থেকে কম করে হলেও ত্রিশ মাইল হবে। মইয়ের মতো হাড় বের করা অতবড় পা দিয়ে একটানা চললেও চব্বিশ ঘণ্টার আগে আমিনার বাপ কখনো ফিরতে পারবে না।

আরেকটা ব্যাঙ দেখতে পেয়ে খুশিতে মকুর চোখ জ্বল জ্বল করে ওঠে। সন্তর্পণে ডান পা'টা তুলে আরেকটু সামনে ফেলে। পাকা শিকারীর পা, পানি নড়ল কিন্তু শব্দ হলো না। ব্যাঙটা তার চেয়েও পাকা, মকুর খাপ-পাতা হাত ক্ষিপ্রবেগে এগিয়ে আসবার আগেই তিড়িক করে এক লাফে আর একটা ধানের গোড়ায় গিয়ে বসে। দুলে ওঠা ধানশিষটার দিকে নজর রাখতে-রাখতে মকু হতচ্ছাড়া ব্যাঙটার চৌদ্দ পুরুষের সঙ্গে মুখে মুখে একবার যৌনসংগম করে ফেলে। তার পরই পা টিপেটিপে মকু শ্যাওলা পড়া ধানের জলা ঠেলে খুঁজতে থাকে ব্যাঙ। ডোরা কাটা সোনালি হলুদে চকচকে ক্ষুদে ব্যাঙ। এই ভর সন্ধ্যার আবছা আলোতেও চকচক করে জ্বলে ওগুলোর রঙ। হোক্কা ভাই বলেছে এ ব্যাংকগুলো নাকি শৌলমাছের চরম টোপ। ভোররাতের অন্ধকারে চৌধুরীদের ছাড়া পুকুরেব পাড় দিয়ে পানির ওপর একবার নাচতে পারলেই হলো। গবাগব ধরবে।

কোমরে বাঁধা ব্যাঙ-এর পুটলিটা একবার টিপে দেখে শুকনো : আরও কিছু ধরতেই হবে। একটা তুলতুলে ব্যাঙ হাতের মুঠোয় থেতলে আধমরা করে কোমরে গুঁজতে-গুঁজতে ওর হঠাৎ আমিনার কথা মনে পড়ে।

দুপুরের শেষ দিকে চারিদিকে যখন নিরালা হয়ে আসে আমিনা তখন ছাড়া পুকুরে পানি নিতে আসে। আজো এসেছিল মার ঘরে বসিয়ে মার নীল শাড়িটা পরে। একে ত আমিনার বাড়ন্ত গড়নের পরিপুষ্ট শরীরে মায়ের ক্ষয়ে যাওয়া পুরানো শাড়ি ভাল করে বেড় খায় না, তারপর চারিদিকে যখন কেউ নেই কিম্বা কেউ আছে জেনেই যেন আমিনার হাতের টানে কাঁখের কলসির চাপে শাড়িটা আরও ছোট হয়ে সরে পড়ে যেতে চায়। কলসির ধাক্কায় পা না সরিয়ে আমিনা একবার এদিক সেদিক কাকে খোঁজে। না পেয়ে আরো জোরে ধাক্কা দিয়ে আবাব চোখ তুলে এদিক সেদিক দেখে। বিরক্ত হয়ে ঢকঢক করে কলসি ভরে আমিনা উঠে দাঁড়াতেই দেখে বড় নারকেল গাছটায় আড়াল থেকে মুখ বার করে মকু হাসছে, পরনে তার একটা লাল সবুজ ডোরাদার নতুন গামছা, পরিপাটি করে কাছা দেয়া। আঁচলের কোনও বাড়তি অংশ ছিল না। তবু এখানে সেখানে দুএকটা অনাবশ্যক আকর্ষণ করে বেগানা পুরুষের উপস্থিতি সর্বাঙ্গে স্বীকার করে লজ্জাশীল তন্বী উচ্চারণ করল : হাক করি ছাই রইছ ক্যা ? মাইয়া হোলা দেইখলে বুঝি আর চোখের হাত হালাইতা মন কয় না ?

মকু স্বভাবত লাজুক হলেও এ সনাতন ধমকে বিচলিত হয় না : যেখানে পানিতে ভিজে শাড়ি আছে কি নেই কিম্বা যেখানে পানিও পড়েনি শাড়িও পড়েনি অত্যন্ত সাবলীল নির্লজ্জতার সঙ্গে তা নিরীক্ষণ করতে-করতে জবাব দিল— 'হ্যাঁঃ তুইও এক মাইয়া হোলা আর আঁরও এক হৈরা চোখ! হানি লইছিলি যা আঁই ইঁয়ানো আছি হৈলমাছ টোকাইতাম, তোরে না বুইঝ্যৎ ?' নিজের ছোট শাড়িতে ঢাকা বড় দেহটা'র প্রতি আঙুল দেখিয়ে আমিনা থলথল করে ওঠে, 'হৈলমাছ বুঝি ইয়ানো ?'

এরপরেই অবশ্য ঠাট্টা করতে করতে মকু এক সময় আমিনার কাছে প্রতিজ্ঞা করে ফেলে যে কাল ভোরের মধ্যে ওদের বাড়িতে সে শৌলমাছ পৌছিয়ে দিয়ে আসবেই। তাব পবেই না হোক্কা ভাইর কাছে আসা পরামর্শের জন্যে। হোক্কা ভাই ওস্তাদ লোক, না পারে এমন কিছু নেই। আজকাল কেবল কেমন যেন মুখ ভার কবে থাকে। চুরি করতেও বেবোয় না, বলে পোষায় না।

খপখপ করে মকু আরো কয়েকটা ব্যাঙ নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। বাড়ির পথে চলতে চলতে ভাবে এগুলোকে কী করে পুটলি করে পানিতে চুবিয়ে রাখবে একদম মবে না যায়। শেষ রাত অবধি আজ রাখতে হবে ত।

শেষ রাতে আমিনার ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে-শুয়েই সর্বাঙ্গে হাত বুলিয়ে নিজের রহস্যময় শরীরটাকে নিবিড়ভাবে একবার অনুভব করে নেয়— কী নিটোল ভরাট স্বাস্থ্য, কোথাও এতটুকুন ফাঁকি নেই। নিজেকে সে যেন ঘুমের মধ্যে হারিয়ে ফেলে আবার খুঁজে পেয়েছে এমন একটা খুশির হাসি নিয়ে আমিনা উঠে দাঁড়াল। দরজার গোড়ায় এসে ভাল করে একবার চারিদিক দেখে নেয়। অবশ্য সেই ঘুটঘুটে অন্ধকারে দুহাত দূরে কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে তাকে দেখা যেত কিনা সন্দেহ। তুব অনেক দিনের অভ্যেসমতো, ঘর থেকে বেরিয়েই আমিনা তবু দুহাত জড় করে নিজের নগ্ন বুককে ঢাকা দিতে চায়। তাবপব আচমকা দুহাত লম্বা করে ঝুলিয়ে দিয়ে সহজ হয়ে চলতে শুরু করে।

চলতে-চলতে আমিনা থেকে থেকে হেসে উঠেছিল। কী অদ্ভুত আজ প্রায় এক মাস ধরেই ত ওরা মায়ে-ঝিয়ে এক কাপড়ে চলছে!

চলে। তবু এখনও অন্ধকার নিরালা রাতে ন্যাংটা হয়ে হাঁটতে ওর লজ্জা করে কেন? কদিন হয় মা নিয়ম করেছে ন্যাংটা হয়ে শুতে হবে। কাপড় পরে শুলে ঘামে আর মাটির ঘসায় কাপড় নাকি সহজে ছিঁড়ে যায়। ন্যাংটা হয়ে শুতে আমিনা যে খুব একটা অস্বস্তি অনুভব করে তা নয়, কেমন ঘুম থেকে উঠলেই ওর প্রথম মনে হয় ও যেন নেই। দুহাত দিয়ে খুঁজে হাতড়ে নিজেকে বের করে নিতে হয়— এই যা!

কিন্তু কাল রাতে এমন আর হবে না। ফজরের নামাজের আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে বাবা তাঁর খোদা সাক্ষী রেখে কসম কেটেছে কাপড় আনবে। গালি-গালাজ তার বাবা প্রায় সর্বক্ষণই করে। কিন্তু কসম খুব কম কাটে। যদি কখন কাটেও তখন সেটা পালন করবেই, দরকার হলে গলা কেটেও। বাবার যেমনি শরীর মনটাও তেমনি পাহাড়। আমিনা এসব ভাল করেই লক্ষ করেছে। তাই আমিনা আজ জনহীন অন্ধকার ঘন নারিকেল সুপারির বাগানে, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়ে নিশ্চিন্ত মনে তৃপ্তির হাসি হাসছে। কাল ভোরে সে নতুন কাপড় পরবে। দুপুর বেলায় পানি আনতে যাবার সময় বাধ্য হয়ে তাকে কাল আর কখনো যেখানে-সেখানে গা উদোল রাখতে হবে না। ঘুম থেকে উঠেই কাল আর নিজেকে খুঁজে বেড়াতে হবে না। কাল যদি এমনি রাতে সে বাগানে বেরোয় তখন তাকে গাছের পাতার শব্দে চমকে উঠে দুহাত দিয়ে বুক ঢাকতে হবে না— দুটা সুপারিগাছ জড়িয়ে ধরে আমিনা খুশিতে দুলতে থাকে।

পড়তে-পড়তে আমিনা কোনোরকমে সামলে নেয়। খেয়ালই নেই কখন সে ছাড়া পুকুরের একদম পাড়ের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে। নিচে ঢালু পাড়ের ওপর বসে বোধ হয় দুটো লোক। অনেক দিনের পুরানো প্রবৃত্তির আদেশে পাড়ের নারকেল গোড়ার ঝোপ-জঙ্গলে চট করে আমিনা প্রায় তার সবটা দেহ আড়াল করে নিল। তারপর সেখান থেকে উৎসুক চোখে চেয়ে রইল নিচে যেখানে একটা কুপি মাছের ডুলোর মধ্যে জ্বলছে। লোক দুটাকে ঠিক চেনা যায় না। মাছের ডুলোর ফাঁক দিয়ে বেরুনো আলো সাদাকালোয় খোপখোপ দামী তাঁতের কাপড়ের মতো, লোক দুটার ওপর যেন বিছিয়ে আছে। আমিনা ভাবছে কাল ভোবে বাবা তার যদি অমনি সাদা-কালো ঘর ঘর তাঁতের শাড়িই নিয়ে আসে, কী মজাই না হবে।

এখানেই ত থাকার কথা, নেই কেন? মাছের ডুলার লণ্ঠন দিয়ে মকু ডুরে কাটা অন্ধকারে ওস্তাদ হোক্কা ভাইকে খুঁজছে। চাপা গলায় আর একবার নাম ধরে ডাকল। শব্দের রেশ অন্ধকার ঝোপজঙ্গলে মিলিয়ে যাবার আগে পাল্টা একটা ধমক এল : 'ছিল্ল্যাস ক্যা, ইঁয়ানোই ত ব্যই রইছি। নওয়াব এতক্ষণে আইছেন, আর এ মুই হালম রাইত ভর্‌রি মশায় হোনমারি শেষ করে দিল আঁরে।'

মকু আলো উঁচিয়ে দেখল নারকেল গোড়ায় ঝোপের ওপর হোক্কাভাইর চোখ দুটো শুধু জ্বলছে। মকু জানে তার দেরী হয় নি, তবু হোক্কাভাইর মুখের ওপর কথা বলা তার সাহসের বাইরে। দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। হোক্কা আবার প্রশ্ন করল, 'ব্যাও হাইছত নি?'

'হাইছি।'

'কোঁগা? দেঁয়াছেন?'

ঝোপের ভেতর থেকে একটা বলিষ্ঠ রোমশ হাত বেরিয়ে এসে ব্যাঙ-এর পুটলিটা পরীক্ষা করে নিল। তারপর এক দৃষ্টিতে মকুকে চোখ দিয়ে ছাঁকতে-ছাঁকতে ব্যঙ্গ করে উঠল, 'আরমজাদ মাছ মাইত্য আইছে না বিয়া কইত্য আইছে য্যান। নংছইংগা গামছা মারি এ ন্যা আইছে।'

সে চোখের সামনে মকু অস্বস্তি অনুভব করে। ইচ্ছে হলো একবার বলে যে এ গামছা ছাড়া বাকি লুঙ্গি যেটা আছে সেটা নেহায়েৎই ছেঁড়া। এ গামছা সে সখ করে পরে নি। পরেছে বাধ্য হয়ে। এটা না পরলে তাকে প্রায় ন্যাংটাই আসতে হত। কিন্তু মুখে কিছু বলতে পারল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পরবর্তী হুকুমের অপেক্ষায়। হুকুম এল— 'যা বাত্তি তলে থুই আয়। এই ছিপও ধর; নিচে রইে ইয়ানো আইস আবার।'

সাদায়-কালোয় ঘর কাটা সিল্কের কাপড়ের মতো পাতলা আলোতে মুড়ি দিয়ে দুলতে দুলতে মকু ঢালু পাড় বেয়ে নাবতে লাগল। ফিরে এসে আবার চুপ করে অন্ধকার ঝোপের পাশে দাঁড়াল। ঝোপের ভেতর থেকে দীর্ঘ দেহটা দাঁড় করিয়ে হোক্কা এক হাত দিয়ে মকুর কাঁধ ধরল। গম্ভীর গলায় বলল, 'খুলি হালা।'

মকু বোঝে না।

'গামছা খুলি হালা।'

লোহার মতো শক্ত আঙুলগুলো মকুর নরম মাংসপেশীতে আঁট হয়ে বসে। মকু থতমত খেয়ে গামছাটা খুলতে থাকে। ঝোপ থেকে সম্পূর্ণ বেরিয়ে এসে হোক্কা মকুর পাশে দাঁড়াল। অত্যন্ত নরম গলায় বলল,

'ভালা গামছা নষ্ট করবি কিল্লাই? আর এই অন্ধকাইর রাইতবে দেইব কাকে?— হিয়াল্লাই কইলাম আবাই, রাগ করিস নি ত?'

হোক্কাভাইর এত নরম কণ্ঠ মকু খুব কমই শুনেছে। অবাকও হয়, খুশিও হয়। ঢালু পাড় দিয়ে নাবতে নাবতে আচমকা মকু হোক্কাভাইর দিকে চেয়ে স্তম্ভিত হয়ে থাকে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রশ্ন করে ফেলল। 'আমনে বাড়ির তন ল্যাংডাই আইছেন?'

নির্বিষ্ট মনে কালো নিশ্চল পানি কোথাও নড়ছে কিনা দেখতে-দেখতে হোক্কা বলে, 'উম।'

'দিনের ছিঁড়া লুংগি হেইডা ছরি আইলেন ক্যা?'

নিজের বলিষ্ঠ উলংগ দেহের দিকে তাকিয়ে হোক্কা উত্তর করল।

'হেইডা তোর ভাবির হিন্দন অন।'

হোক্কাভাই হো হো করে হেসে উঠল। পানির যত কাছে আসছে মাছের যত কাছে আসছে তার হোক্কাভাইর মনে রস যেন তত বাড়ছে। মকু কিন্তু উত্তরহীন।

পাশে বসে থাকতে-থাকতে মকু প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। মজবুত একটা বাঁশের ছিপ বড়শিতে ব্যাঙ গাঁথা। হোক্কা ছিপটাকে ক্রমাগত উঁচু করে ধরে টানছে, একবার ডাইনে আর একবার বামে। আর বড়শীর মাথায় মরা ব্যাঙটা তবতর করে পানির উপর লাফিয়ে বেড়াচ্ছে একবার ডাইনে আবার বামে।

সাদায়-কালোয় ছককাটা পাতলা শাড়িতে তাকে মানাবে কেমন— আমিনা শুধু ঐ এক চিন্তাতেই মশগুল। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ঐ আলোর শাড়ি যত রকমে পারা যায়, পরে-পরে খুলে আমিনা আবার পরছে।

কী একটা দড়াম শব্দে মকুব তন্দ্রা ছুটে গেল। একটা বিরাট মাছের আলোড়নে সমস্ত পুকুরের পানি থরথব করে কাঁপছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে মকু হোক্কাভাইর দিকে চেয়ে থাকে। যন্ত্রের কলের মতো ছিপটা নাড়াচ্ছে ডান দিক থেকে বামে আর স্থির পলকবিহীন চোখ ক্ষিপ্ত বেগে লাফিয়ে বেড়ানো মৃত ব্যাঙটাকে অনুসরণ করে বেড়াচ্ছে। লেজের বাড়ি দিয়ে মাছটা একেবারে পানির ওপরে উঠে ব্যাঙটাকে গিলে ফেলতে চায়। কিন্তু বারবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। লেজেব বাড়িতে সমস্ত পুকুব তোলপাড় করে ফেলতে চায় মাছটা। হোক্কা একবার চাপা গলায় বলল : 'শুধু তোব আমিনার ভাইগ ভালারে মকু।' এবং বলা শেষ হবার আগেই একটা প্রচণ্ড হ্যাঁচকা টানে ওস্তাদ হোক্কাভাই গেঁথে ফেলল শৌলমাছটাকে। অল্প কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পরে হোক্কা মাছটাকে টেনে ডাংগায় তুলে ফেলে নিজের নগ্ন দুই হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে মকুকে বলল : 'দে ছটি দে, নইলে লাফ দি ছলি যাইব, রাইখতাম হাইতাম না! গোটা দুই লাথি আর মাড়ান দিয়ে মকু সেই শেওলা পড়া অতিকায় শৌল মাছটাকে আধমরা করে ফেলল।

হোক্কা কিন্তু ততক্ষণে নির্বিবাদে আবেকটা মবা ব্যাঙ হাতের মুঠোয় পুরে ফু দিয়ে পেট ফুলিয়ে নিল। গেঁথে আবার ফেলল আগেব মতন। দেরি করলে চলবে না। এর জুড়িটাকে ধরতে হবে ত।

ফুর্তিতে দৌড়ে মকু ওপরে উঠছিল মাছটা দুহাতে ধরে। নাবকেল গোড়ার ঝোপে মাছটা রেখে আবার ছুটে গিয়ে হোক্কাভাইব পরের শিকাব দেখবে সে। কিন্তু ঝোপের কাছে আসতে না আসতেই কী বকম ভয়ার্ত চিৎকাব শুনে মকু দৌড়ে পাশের নারকেল সুপাবিগাছের আড়ালে নিজেকে লুকুল। গাছের আড়ালে পালাল ঠিক ভয়ে নয়, মকু জ্বিন-পেত্নীকে ভয় করে না, কিন্তু এ যে মেয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর মনে হলো। গলা ঝেড়ে মকু প্রশ্ন করল, কে হিয়ানো ?

খিলখিল করে হেসে মেয়েলি কণ্ঠে উত্তর হলো— 'ও মা, তুই নি। আঁই মনে কচ্ছিলাম কে—না কে ?'

আমিনা ? মকু ত প্রায় খুশিব আতিশয্যে ছুটে বেরিয়েই আসে। সামলে নিয়ে বলল, 'এত রাইতে তুই ইয়াঁনো যে ?'

'এমনে আইছি আবি, তোঁগো মাছ ধরা দেইখতাম।'

আমিনার তখন কেমন ঢঙ কবাব বসে ধরেছে। মকুর একটু খটকা লাগে কিছুক্ষণ আগে যে হোক্কাভাই ত এখানে ছিল। চিৎকার করে ওঠে। 'আমিনা, তুই হালম রাইতই কি ইয়াঁনো আছিলি নি ? কতক্ষণে আইছিস তুই ?'

প্রশ্নের শেষটুকু অত জোবে কেন বলা হলো আমিনা তার অর্থ খুঁজে পায় না।

উত্তব দিল, 'দুব, হালম রাইত আইব ক্যা ? আঁইত হবে এনা আইলাম।'

মকুর নিজেব সন্দেহে নিজেই লজ্জিত হয়, বোকাই বা সে কিছু কম নাকি ? সারা রাত ওখানে থাকলে নিচ থেকে আসবার সময় মকুকে দেখে বুঝি ভয়ে প্রশ্ন করে উঠত ? মকু গুণগুণ করে, 'তোবল মাছ পাইছি। দেখছত নি আমু ?' আমিনাও কেমন স্বপ্নে রানী হয়ে ওঠে, আলোর শাড়িতে দেহ মুড়ে মকুকে সে সরাসরি দাওয়াত করেই বসে। 'দেখছি। কাইল আইও আঁগো ইয়ানো তোগো মাছ খাইবা, ক্যান ? হোক্কাভাইরেও লই আইও— এ্যা।' আমিনার উদারতায় মকুও গর্ব অনুভব না করে পারে না।

নিচে হোক্কাভাইর ছিপের নিচে জুড়ি শৌলমাছটা পানি আবার তোলপাড় কবে তুলেছে। হোক্কার পাকা হাতের টানে মরা ব্যাঙটা জীবন্ত ব্যাঙ-এর চেয়ে নিপুণতাব সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে শৌলমাছটাকে ফাঁকি দিচ্ছে আর খেঁপিয়ে তুলছে।

দুহাত দিয়ে অত বড় শৌলমাছটাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে আমিনা ছুটে ওদের বাড়ির মধ্যে ঢুকল। ছি ছি কী লজ্জার কথা! লক্ষ্যই করে নি, কী কবে আঁধার পাতলা হয়ে আসছিল। অন্ধকার যেন দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বাগানের মধ্যে এখনও অবশ্য অল্প আঁধার তেমন জমাট কিন্তু ভাঙতে আর কতক্ষণ বাকি। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘর থেকে চিৎকার শুনে কাপড় না নিয়েই ছুটে এল মা। তারপর মেয়ের ভয়ার্ত চোখ অনুসরণ করে উঠোনের কোণেব দিকে চোখ পড়তেই থ বনে গেল।

মা আর মেয়ে দেখল, আমিনার বাপ তার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারেনি। সোবেহ্ সাদেকের সময় খোদা সাক্ষী রেখে আমিনার বাপ যে প্রতিজ্ঞা করেছিল তা রক্ষা করেনি।

ঐ ত সামনেই আমিনার বাপের ন্যাংটা উরু, তারও পরের দেহটাও উলংগ সামনের মাদার গাছের বড় ডালটা থেকে ঝুলছে। গলায় শুধু বাঁধা আমিনার বাপের শেষ সম্বল কাপড়েব টুকরো, তার পুরানো গামছাটা!

খড়ম

মসজিদের সামনে একজোড়া খড়ম। রাত্রির অন্ধকারে এশারের নামাজের পর একে একে সবাই চলে গেছে। সবার শেষে গেছে পরহেজগার ফজু বেপারী। মজবুত খড়ম জোড়া তারই। সারাদিন অন্ধকারে একবার মাত্র খড়ম থেকে পৃথিবীতে নামে ফজু বেপারী। সমস্ত দিনের মধ্যে নোংরা মাটি অজু নষ্ট করার সময় পায় এই প্রথম।

সাড়ে চার টাকা দরে ধানের মণ কিনে সোয়া চার টাকা দরে বিক্রি করেও নেক বখ্‌ত আলেম ফজু বেপারীব মণ-প্রতি চার আনা লাভ থাকে। সাধারণত রহস্যের সমাধান অসম্ভব। এমনকি গ্রামেব মাতব্বররাও কোনোদিন এ বিষয়ে বিশেষ গবেষণা করতে সাহসী হয় নি। খোদার যে প্রিয় বান্দা খোদার হেকমতে তার ভাগ্য অনেক রকমেই খুলতে পারে। গ্রামবাসীরাও তাই বিশ্বাস করতো। যার শরীর পাক মনে হালাল রোজগারের চেষ্টা করলে, খোদা তার উন্নতি না করেই পারেন না। সমস্ত দিনের মধ্যে সব সময়ে পাক থাকতেও তারা দেখেছে ঐ একমাত্র ফজু ব্যাপারীকেই। চালের বস্তার পাশে চৌকির ওপর, সারাটা দিনই ত ফজু বেপারী ওখানে বসে থাকে। অথচ অজু নাই, এমন কথা কোনও ক্রেতাই কখনও বলতে পারবে না। যদিও বা এক-আধবার পায়খানা পেচ্ছাব করার জন্য তাকে উঠতে হয় তবুও আবার দোকানে এসে বসবার আগেই অজু করে এসে বসা চাই। মেটে রঙের পরিচ্ছন্ন খালি পায়ে ফরসা লুংগি পরে, মাথায় বাঁশের পরিচ্ছন্ন টুপি পরে হ্যাঁচকা একটানে তুলে ধরে দাঁড়িপাল্লা। হাঁ করে ক্রেতার দল কী করে আর পালাক্রমে এক হাতের পাল্লা টানে পাল্লাটা উঠে যাচ্ছে, একদিকে আধমণি বাটখারা অন্যদিকে আধমণ ওজনের ধান একটুও হাত কাঁপছে না, নড়ছে না, সাধা দাড়িগুলো কেঁপে উঠছে, কাঁধে পিছের পেটানো মাংসপেশীগুলো থরে থরে ফুলে শক্ত হয়ে স্থির হয়ে যায়। পেছনের সুসজ্জিত চালের বস্তা খয়েরি পাহাড়ের মতো। পঞ্চাশ বছরের অস্থিমাংসের এই অদ্ভুত বলিষ্ঠতা এ শুধু খোদার হুকুমেই সম্ভবপর। পাক নেক লোকই এ শক্তির অধিকারী হতে পারে। কেউ কেউ তাই ধানের বস্তা নিয়ে যাবার আগে ভক্তির আবেগে কদমবুছিও করে ফেলে। ঘুণাক্ষরেও ফজু বেপারীকে সন্দেহ করার মতো পাপচিন্তা ওরা মনের মধ্যে ঢুকতে দেয় নি। কোনদিন চালের বস্তা দ্বিতীয়বার ওজন করে তার ওজনের ঠিক পরিমাণ পরীক্ষা করে দেখবার অসম্ভব কল্পনা ওদের মনে জাগে নি। আর যদিই বা সে মাপে কম ধরা পড়ত তখন ওরা হয়তো নিজেদের চোখকে অবিশ্বাস করত কিন্তু ফজু বেপারীকে...?

হাটখোলার মধ্যিখানে বিরাট এক বটগাছ। কটি সবুজ পাতা ভোরের কাঁচা আলোতে ঝলমল করছে। সাদা ঠাণ্ডা আঁটালে মাটিতে গত দিনের হাটের ভাঙা গুড়ের হাঁড়ির টুকরো, ব্যাপারীদের ফেলে যাওয়া হলদে শুকনো কলাপাতা, শিশিরে ভেজা খড়ের দলা এমনি আরো কত ছোটখাট ময়লা এখানে সেখানে জড় হয়ে। সূর্য তখনো পুরোপুরি ওঠে নি। মতি ডাক্তারের ডিসপেন্সারির দরজা বন্ধ। উল্টো দিকের বেনে দোকানের মালিক বশিরুল্লাহ কারী শুধু তার দোকানের সামনের জায়গাটুকু ঝাড় দিয়ে ঘরের ঝাঁপি তুলে সুপুরিগাছের তক্তার মাচায় বসে সুর করে কোরান শরীফ পড়ছে। পাকা টেফলের গোটা খেয়ে বট ঘুঘুর ঝাঁক

তখন ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। স্বল্প সূর্যের আলোতে ওদের নরম পাখা তেতে ওঠে। পত্‌পত্‌ করে হলুদ মাখানো ছাইরঙা পাখিগুলো ডানা মেলে উড়ে চলে গেল।

কাঠের পুলের ওপর দিয়ে খড়ম ঠুকে খালের ওপার থেকে ফজু বেপারী আসছে। পুলের মধ্যিখানে একবার থেমে নিয়মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কেটগা আইলি আইজ?'

'অ্যাঅনন্তাই ছোটগা।'

পুলের নিচ থেকে উত্তর দিল কালা মাঝি। মাথার ওপর লুঙ্গি জড়ান। উলঙ্গ বলিষ্ঠ দেহ, নাভি পর্যন্ত পানির মধ্যে, দুহাত দিয়ে কাঁটা ঝোপ সরিয়ে একটা কাঁশের 'আন্তা' তুলছে। আর তার মধ্যে একটা এক বিঘত লম্বা এ পুষ্টি চিংড়িমাছ-শেওলাপড়া ছপ্‌ছপ্‌ করে লাফাচ্ছে। মনে মনে কালা একবার ব্যাপারীকে ছালাম করল। নেক লোককে দেখলেও বরাত ফেরে। বাকি আণ্ডাটা দেখে ঠিক করে কালা লুঙ্গি জড়িয়ে উঠে পড়ে। আটটা চিংড়ি হয়েছে। কিন্তু শুধু চিংড়িমাছ দিয়ে কী হবে? অসুখে পড়া মেয়েটা কী খাবে? আগুনে পুড়িয়ে মরিচ দিয়ে সে নিজে না হয় একবেলা চালিয়ে দেবে। কিন্তু মেয়েটা? একটা চিংড়ি হঠাৎ তার মৃতপ্রায় লম্বা ঠ্যাঙের চিমটি দিয়ে কালার হাতের গোস্ত কেটে বসিয়ে দেয়। মেয়েটার ক্ষুধার চিৎকার ভোর রাতে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। বৌকে তাই লাথি মেরে সে ঘর থেকে বেরিয়েছে। বেরিয়েই মনে হয়েছে লাথিটা তার নিজের গায়ে মারা উচিত ছিল। বুকে দুধ থাকলে মেয়েটাকে খাওয়াতে পারে আরফানি, কিন্তু না থাকলে? মায়ের গোস্ত মেয়ে খেলে, বোধ হয় তাও পারত। কালা শিউরে ওঠে। আরফানির বিয়ে হয়েছে মাত্র বছর চারেক হবে। কিন্তু ওর বুকের দিকে চাইলে কালার নিজের বুকই ফেটে ওঠে। কেমন যেন বাদুরের মতো কুকড়ে চেপ্টে আছে।

'বেগগুন কি ইছা নি রে?'

ডিস্‌পেনসারি থেকে বেরিয়ে প্রশ্ন করল মতি ডাক্তার। কালা মাথা নাড়ল রোজকার মতো ভয়ে ভয়ে। মতি ডাক্তার কী বলবে তা সে জানত, শুনতে শুনতে তার মুখস্থ হয়ে গেছে। চিংড়িমাছ নাকি পানির পোকা, ওতে রক্ত নেই। চিংড়িমাছ ক্রমাগত বেশি খেলে নাকি রক্ত সাদা হয়ে যায়— কিন্তু তোর ঐ 'আন্তার', এ সময়ে খালে যে চিংড়ি ছাড়া আর কিছুই ওঠে না। সে কী করবে?

'কাইল যে তোর মাইয়ার লাই কুনাইন মিকচার দিলাম হেইডার টেয়সা কিরে কালা?

বলতে-বলতে মতি ডাক্তার ওর হাতের খলুই থেকে গোটা চারেক বাছাই করা বড় চিংড়ি তুলে নিয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে মাছগুলোকে নিরীক্ষণ করে বলতে থাকে,

'একছার গুড়াগুড়া এ না। তাথা কাইল আরও চাইগা দিস। হেইলেই সারব।' বলে ডিসপেনসারির মধ্যে পা বাড়ায়। কালা কোনোরকমে উচ্চারণে করে।

'ডাগদর সাব আঁর মাইয়া বঁনাইবেত?'

ডাক্তার মুখ খিচিয়ে ওঠে 'বাঁইচতন ক্যা? বাঁইবে খোদা বাছাইলে বাঁইচতনা ক্যা?'

কালা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে।

'হাক করি চাই রইছত ক্যা? খাওয়া, খাওয়া, খাওয়ালেই মানুষ বাঁছে বুঝ্যত? তোর মাইয়া বাইছব।'

কালার কান দুটা ঝাঝা করে ওঠে। সে টলতে-টলতে সরে যায়। ডাক্তার তখনও গড়গড় করছে।

'বাঁইচ্চত ন্যা ক্যা বাঁচে কিন্তু ক্যাল আঁর কুনাইনের পানি, আর ইছার গুঁড়া খাই বাঁছে না'।'
দুহাত দিয়ে কালা কান চেপে ধরে। শেষেরটুক সে শুনতে চায় না, নিজে জানলেও ডাক্তারের মুখ থেকে সে কথা শুনতে চায় না। একবার ইচ্ছে হয় অমন কথা বলবার আগে বাকি চিংড়ি কটাও ছুঁড়ে মারে ডাক্তারের মুখে। চিংড়িগুলো সে বাড়িতে ফিরিয়ে নেবে না। বৌকে সে আজ খেতে দেবে, মেয়েকে সে আজ খাওয়াবে, সাদা চিংড়ি নয়, সাদা চাল, সাদা দুধ! যা খেলে মানুষ বাঁচে। রক্ত লাল হয়।

হঠাৎ ফজু ব্যাপারীর চালের দোকানের দিকে চোখ পড়তেই সে আঁৎকে উঠলো। কেরোসিন টিনের দোকানের কাল বেড়াব ওপর সাদা চুন দিয়ে লেখা এখানে মওতের কাপড় বিক্রয় হয়। ছোট কালের কারীর পাঠশালায় লেখা বিদ্যার ওপরও যথেষ্ট নির্ভর করতে পারে না। ফজু ব্যাপারীর চালের আড়তে মওতের কাপড় অর্থাৎ কাফনের কাপড় কবর দেবার আগে সে কাপড় ভেতর থেকে দেখতে যেয়ে ফজু ব্যাপারী জিজ্ঞেস করে— 'তোর মাইয়া ভালা নি রে আইজ ? চাই রইস ক্যা, লাগব নিরে কোন তা ?'

'না, না', কালা কোন রকমে চিৎকার করে ওঠে।

'আইন্যেগো দোয়া, আইন্যেগো দোয়া', বলতে বলতে কালা ছুটে হাটখোলা থেকে বেরিয়ে যায়। যাদের স্বাস্থ্য সুন্দর, যাদের পরনের কাপড় পরিষ্কার, যাদেব দেহ অজুতে পাক তাদের কাছ থেকে কালা পালিযে বাঁচতে চায়। ফজু ব্যাপারীর মুখে তার মেয়ের অসুখের খোঁজ থেকে সে ত্রাণ পেতে চায়।

চাল না নিয়ে আজ সে বাড়ি ফিরবে না।— এ সমস্যাব সমাধান হলো মুন্সি বাড়ির বৈঠকখানার দুকানি জমি যদি সে নিড়াতে পারে তবে দেড় টাকা পাবে। তাও খোরাকি ছাড়া। কালা রাজি।

সকাল গড়িয়ে দুপুরের রোদ মাথার উপর তেড়ে উঠে। ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে, প্রায় হাঁটুজল ময়লা গাজাল পানিতে দাঁড়িয়ে কালা আগাছা উপড়ে চলেছে। রোদে পুড়ে পেটের চামড়া চড়চড় করছে। হাতের টানের এক আধফোটা পানি তাই গায়ে পড়লে সারা গা শির শির করে ওঠে। মনে হয় যেন জ্বর আসছে, কাঁপুনি দিয়ে। দুদিনের অভুক্ত পেট দু'রাত চালের দুস্বপ্ন দেখা চোখ ঘোলাটে হয়ে আসে। কাঁচা ধানের সবুজ আর ঘাষের তামাটে সবুজ সব ওলট-পালট করে যায়। ঘাস টানতে ধানের গোছা উপড়ে ফেলছে। দু'হাতে রগ টিপি কালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়, চোখ মেলে দেখে সামনের সীমাহীন বাকি জমিটুকু। সবুজ জল-ফড়িংগুলো নাড়া পেলেই লাফাচ্ছে।

হঠাৎ ওর মনে হয় আজ না জুম্মার দিন ? জুম্মার নামাজ তো সে কখনো বাদ দেয় নি। আজ সে নামাজ পড়বে। আজ তার জীবনের উৎসব। আজ সে টাকা দিয়ে চাল কিনবে। দুধ কিনবে। রাস্তার উপরে এসে কালা আচমকা থেমে পড়ল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। নিজের ভুলে নিজেই ও হেসে ফেটে পড়তে চায় বাড়তি লুঙ্গি তার শেষ হয়েছে যে দিন থেকে সরকারের পেয়াদা এসে তার কেরায়া নৌকা পাঁচশ টাকায় আর ভবিষ্যতের অনেক প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। পরনে লুঙ্গিটা আজ পরছে একাধারে সপ্তাতিনেক ধরে, লুঙ্গি পাক থাকবে কোত্থেকে। সে তো আর ফেরেস্তা নয় ? আর বৌর সঙ্গে সেত আর ল্যাংটা হয়ে সংসার করতে পারে না। সে রোজ ভোরে গোছল সেরে, পাক লুঙ্গি পরে সে ঘর থকে বেরুবে ? হাসতে হাসতে ওর মুখ নীল হয়ে ওঠে। আরো কালো হয়ে ওঠে

যখন আবার বিস্ময়ে ও দেখতে পেল তার বৌ আরফানি চিৎকার করতে করতে তার দিকে ছুটে আসছে। পেছনে ছুটতে ছুটতে ফজু ব্যাপারী আর গ্রামের আরো দুচারজন গণ্যমান্য লোক। আরফানির কাপড়ে বাঁধনে না আছে ইজ্জত, না আছে আব্রু। কালা মাঝির চোখের সামনে সমস্ত দিগন্ত জুড়ে হাহা করে, আরফানির রুক্ষ চুল কান-ফাটা আর্তনাদ করে ছুটে আসছে।

কিছুই হয়নি। দিনচার ধরে অনবরত কেবল কয়েক ফোঁটা করে কুইনিন মিক্‌চারে বেঁচে থেকে এই ভোর বেলা কালার মেয়েটা ফট্ করে মরে গেছে।

ঘরের দাওয়ায় কালা গুম হয়ে বসে আছে। দুহাতে মাথা গুঁজে পায়ের দিকে মরা চোখে চেয়ে দেখে সেখানে একটা জোঁক অনেকক্ষণ ধরে রক্ত চুষে পেট ফুলে উলটে পড়ে আছে। সেই একটুখানি ক্ষীণ রক্তস্রোতের চারপাশের চামড়া পড়া পানিতে ভিজে কেমন যেন সাদা আর ছ্যাকড়া ছ্যাকড়া। ঘরের ভেতর থেকে আরফানি থেকে থেকে গোংগর—'আঁই ভাত খাইয়ুম, আঁই মইরস্তামন, আই মইত্যামন, আঁই ভাত খাইয়ুম!'

কালা পা-টা একবার নাড়ে, দেখে নড়ে কিনা, লাথি মারবাব জোর আছে কিনা। ফজু ব্যাপারী চলে গেছে। ফজু ব্যাপারী দয়া করে সব করে গেছে। আর নিজ দোকান থেকে কাফনের কাপড়টুকু অবধি ধার দিয়েছে। যাবার সময় শুধু আরফানিকে বলে গেছে কাফনের কাপড় বাকি রাখা গুনাহ। ওতে মুর্দার রুহ্ কষ্ট পায়। কাফনের বাবদ বাকি তিন টাকা যেন তাই যেমন করেই হোক কাল ভোরেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। আরফানি আবার কাতরাচ্ছে—

'আঁই মইস্তামন। আঁই মইল্লে আঁরও কাফনের কাপড়ের দাম বাকি থাইকব। আঁই... ...'

কালার পা-মাথা সব ভারি হয়ে আসছে, কিছুই আর নড়তে চায় না। কানের কাছে আরফানির অসংলগ্ন বিলাপ ওর স্নায়ুতন্ত্রীকে ঠাণ্ডা করে আনতে চায়। কোনোরকমে দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে একবার ঘরের দুয়ার অবধি আসে, তারপর সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার পথ হাতড়ে বাঁশবনের ভেতর দিয়ে কালা চলতে শুরু করে দেয়। দুচোখ আঁঠাল হয়ে বুঁজে আসে একটা অদ্ভুত ক্লান্ত শ্লথ ঘুমে।

বৃষ্টির ছাঁট লেগে যখন চোখ মেলল তখন চারদিকে ঘোর অন্ধকার। খালপাড়েব মরা তালগাছটার গোড়ায় মাথা দিয়ে শুয়ে। চারদিকে ঝিঁঝিঁ ডাকছে। শুয়ে শুয়েই সে সব কথা মনে করতে পারল। হাত-পা সব ব্যথায় টনটন করছে।

মসজিদের কাছে এসে হঠাৎ কী মনে করে তার সামনে বসে পড়ল। তক্তার আব মাটির সিঁড়ির সামনে। এশারের নামাজও তখন শেষ হয়ে গেছে। সকলে চলে গেছে। সামনেব সিঁড়ির ওপর একজোড়া খড়ম। শক্ত। বড়। ফজু ব্যাপারীর কনিষ্ঠ পায়েব দাগ মস্। কাঠের ওপর আরও কাল হয়ে ছাপ পড়েছে। পাটা আর চামড়ার ঘষায় সে সুস্পষ্ট দাগের কথকে আঙ্গুলগুলো স্পষ্ট গোনা যায়। গুনতে গুনতে কালা মাঝির চোখ জ্বলজ্বল কবে ওঠে, বিড়বিড় করে ওঠে : 'আই মইস্তামন, আই মইস্তামন।'

নিঝুম রাত্রির আঁধারে পা টিপে-টিপে কালা মাঝি ফজু ব্যাপারীর চালেব দোকানে পেছনেব বেড়া ঘেঁসে দাঁড়াল। ঠাণ্ডা টিন নিঃশব্দে টিপে দেখছে কতখানি মজবুত। সড়াৎ করে হাতটা সে সরিয়ে নিল। ভেতরে যেন কারা আছে। কাঁরা যেন নড়ছে। কালা কান ঘোড়ে টিনেব সাথে চেপে ধরে। ধানের রোঁয়া রোঁয়া গন্ধ এসে কালার স্নায়ুকে বিবশ কবে দিচ্ছে। আর ভেতর থেকে অস্পষ্ট দ্রুত নিঃশ্বাস স্পন্দিত শব্দ

'আহ। কবস কী ? এমুটে সরি আয়। কাফনের উপর হুচ্ছ্যত ক্যা ? এমুট কাইত্যই আয়।' খিলখিল কবে একটা মেয়ে হেসে ওঠে।

'কাফনের কাপড় হি হি হি হি-বাঃ হেমুই যে আবার তর ছাইলের বস্তা। আঁই ইয়ানোই হুতুইম— ছাইলেব বস্তাব লগে ঠেস দিলে আর ডর কইওনা— হিহি হিহি—'

আবফানির বিকৃত হাসিব কাকলিকে নিষ্পেষিত করে গর্জন করে ওঠে ফজু ব্যাপারীর স্ফীত নাসাব তপ্ত প্রশ্বাস।

পবেব দিন ভোর বেলায় বট ঘুঘুর ঝাঁক যখন রোদের আঁচ পাওয়া মাত্র উড়ে চলে গেছে। যখন সদ্যস্নাত শান্ত-সৌম্য ফজু ব্যাপারী তাব দোকানে এসে বসেছে, তখন ধীরে ধীবে এসে দাঁড়াল কালু মাঝি। কোমর থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ফজু ব্যাপারীর সামনে রাখল। পরিচিত নোটের ভাঁজে সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্রশ্ন করল— 'কাফনের বাকি দিতা আইলা বুঝি বাবা।'

'জি।'

'আব কী দিমুম, কিছু চাইল ?'

'না। বাকি টাঁদিও কাফনেব কাপড় দেন।'

আঁতকে উঠলো ফজু ব্যাপাবি।

'কাফনেব কাপড় ? কাব লাই ?'

'আবফানিব লাই।'

চমকে উঠছিল শুধু এক মুহূর্তের জন্য। তারপরই ফজু ব্যাপারী পরিচ্ছন্ন হাতে কাপড় কাটতে শুরু কবে। সাদা কাপড় প্রমাণ মাপেব স্ত্রী মুর্দাকে আগাগোড়া মুড়ি দেবাব জন্যে যতখানি দরকার।

শবেবরাত

আশরাফ অ্যারিস্টোফেনের "ফ্রগ্স্" পড়ছিল।

হঠাৎ নীল পর্দার মেঘ সরিয়ে ঘরে ঢুকল ভাবি। আশরাফকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়েই একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে ওর চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলল। তারপর সুডৌল বাহুর মৃদু আকর্ষণে দিল তাকে দাঁড় করিয়ে। হাতের বইটা কোলাব্যাঙের মতো খপ্ করে চেপ্‌টে পড়ে রইল সোফার ওপর।

একটু অপ্রস্তুত হয়ে আশরাফ জিজ্ঞেস করল : ব্যাপার কী ?

ভাবি নির্বাক। ধীরে ধীরে ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে প্রথমে একটা পাউডার পাফ বের করল। সেটা দিয়ে আশরাফের মুখে দুটো মৃদু আঁচড় দিয়ে, হাতে নিল একটা ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম চিরুনি। তারপর তার রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলোকে আঁচড়ে, টিপে ওকে যেন একটু ভদ্রগোছের করে তুলবার চেষ্টা চলল কিছুক্ষণ, এ অসহ্য পরিক্রিয়ার অত্যাচারে ওর মনটা খিঁচড়ে গেল। মাথার তন্ত্রীর মাঝে তখনো ওর তাজা ইউরিপাউড্স্-স্কাইলাসের যুদ্ধংদেহী মূর্তি। ভাবি কিন্তু এদিকে নীরবে ওর মুখের অংশে সভ্যসমাজের যতখানি মাখামাখি চলে করল। তারপর নিঃশব্দ পদবিক্ষেপে আলনা পর্যন্ত এগিয়ে গেল। সেখান থেকে আশরাফেরই শেরওয়ানি আর পায়জামা তুলে নিয়ে ওর অসাড় হাতে গুঁজে দিল— চট্ করে লক্ষ্মী ছেলের মতন এগুলো পরে নাও তো— আমি এখুনি আসছি।

বিরক্তিতে আশরাফ তখন প্রায় অপ্রকৃতিস্থ। বাধা দিয়ে বলল, মতলবটা কী বল তো ?

তোমায় একটু সভ্যতরো করে তোলা।

ঠাট্টা রাখো, এ আমি পছন্দ করি না। দেখলে পড়ছিলাম, তবুও খামোকা খানিকটা মেয়েলি রসিকতা করে দিলে সমস্ত আবেস্টনীটাকে পণ্ড করে।

বিকেল ছ'টা কখনো পড়াশুনোর সময় নয়।

মাঠে গিয়ে বলিবর্দের মতো দৌড়ুতে বল, না ?

ঠিক মাঠ নয় তবে নদীর পাড় অবধি নিশ্চয়। হ্যাঁ দৌড়দৌড়ি অবশ্য নয়, শুধু কিছুক্ষণ মার্জিত পায়চারি। আর মাঝে মাঝে আমাদের মতো সুযৌবনের দর্শন পেলে নিষ্পলক নেত্রে ফ্যালফ্যাল্ করে চেয়ে থেকে জন্ম সার্থক করবি। ঘোমটার দেশে তো আর তোদের সে সৌভাগ্য কখনো হয় না।

ড্যাম্ ভাঙ্গা হাসির তোড়ে ভাবির সুগঠিত দেহ এত বেশি ফুলে ফুলে দুলে উঠল যে অল্প সময়ের জন্য কথার দুয়ার রুদ্ধ হয়ে রইল। তারপর একটু সাম্‌লে নিয়ে বলল, সত্যি আশি, তুই হলি কী ? পরীক্ষা তো এখনো অনেক দেরি, তবু কেন ঐসব পুরনো বইর কালো কালো অক্ষরগুলোকে তোর রক্তকে অমন করে শুষতে দিস্ ? চশমার কাচ দু' ইঞ্চিতে ঠেক্‌ল, বুকের মাপ উনত্রিশ ইঞ্চিতে পৌঁছল বলে— তবুও তুই যে কী ছাই-ভস্ম তৃপ্তি পাস্ ঐ বইগুলোর ভেতর। আর পড়িসই বা তুই কী করতে, স্মরণশক্তি বলেও কি তোর কিছু আছে নাকি ?

এবার আশরাফ সত্যিই ঘাবড়ে গেল। ওর মনে হলো, তাই তো কয়েকদিন ধরে কেমন যেন একটা ডাল-মেমোরি মতন অনুভব করছিল ও। তাহলে কি আলিগড়ে ভেড়ার গোস্ত খেতে খেতে স্মরণশক্তির কোষটায় চর্বি জমে গেছে? নাহ্, বিএ পাশ করার পর জায়গাটা ও ছেড়েই দেবে। ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করল, আমার স্মরণশক্তি যে দুর্বল তার প্রমাণ তুমি কী করে পেলে?

বাহ্ কাল যে দিব্যি কথা দিয়েছিলি আমাকে নিয়ে তুই স্টিমার ঘাটে যাবি!

কেন ইলোপ করতে?

বে-তমিজ! এও মনে নেই যে তোর খালাম্মা তারা আজ আসছেন?

না হেসে আশরাফ আর পারে না। ছি ছি! কী পাগলামী! খালাম্মা তারা যে আজ আসবেন একথা মনে নেই বলেই নাকি তৎক্ষণাৎ প্রমাণিত হয়ে গেল যে তার স্মরণশক্তি অস্বাভাবিক রকম দুর্বল! আর তাই অডিপাস্-আগামেম্নন নিয়ে নাড়াচাড়া করা তার পক্ষে কেবলমাত্র নির্বুদ্ধিতার পরিচয়! এমন সময়ে আশরাফের সাত বছরের বোন টুনী ফ্রক্ জুতো ইত্যাদি পরিহিত অবস্থায় ঘরে ঢুকে হঠাৎ আশরাফকে দেখেই একটা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল। তারপর রীতিমতো বৃদ্ধা অভিভাবিকার মতো সোফায় ঝপ্ করে বসে পড়ে দু'গালে হাত দিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ উচ্চারণ করল—ওমা! আশি ভাই এখন পর্যন্ত তুমি কাপড়ও পরোনি?

আশরাফের মনে হলো সে যেন এতক্ষণ উলঙ্গ হয়ে বসে ছিল। আর টিকতে পারল না। গ্রিক্ নাট্যকারের সমস্ত প্রলোভন ত্যাগ করে ওকে উঠতেই হলো।

বারান্দায় আসতেই একটা বিশ্রী ভুরভুরে গন্ধ নাকে গেল। ওপরের দিকে চেয়ে আশরাফ বুঝল গন্ধ আসছে পাকের ঘর থেকে। আম্মাজান বোধহয় তাঁর আগতপ্রায় বোনের জন্যই এ অসময়েও পাকের ঘরের গরম আঁচে ঘেমে উঠেছেন। আশরাফের নাকটা কুঁচকে ওঠে। কী কুচ্ছিৎ কটা গন্ধ— দারুচিনি, আর ঘিয়ে ভাজা পেঁয়াজ আর পেস্তা, বাদাম।

সব্বাই এসে গাড়িতে ওঠে। আঁশরাফ এসে স্টিয়ারিংটা আল-গোছে ধরে বসল। আরেকবার নাকটা সিটকালো। নাহ্ পাকঘরটা কী ন্যুইসেন্স! পুরনো প্যাটার্নের ব্যুইক্ গাড়িটা যেন একটু বেগেই ঘর্‌ঘর্‌ করতে লাগল। ক্লাচ টেপা অবস্থাতেই এ্যাক্সিলেটরে জোরে চাপ দিল আশরাফ। খানিকটা পোড়া স্পিরিট আর মোবিলের গন্ধে বাতাস ভরে উঠল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল আশরাফ। আহ'— যাক এতক্ষণে তবুও ঐ নোংরা পাকের ঘরের স্মৃতি থেকে বাঁচা গেল'

দূরে ঢাকা মেলের বাঁশি কেঁপে কেঁপে বাজতে থাকে।

জর্ডন কোয়াটার পেরিয়ে ওরাও তখন স্টিমারঘাটে প্রায় পৌছল বলে।

স্টিমার এল।

কড়া এসেন্সের গন্ধ পেয়ে আশরাফ চোখ তুলতেই দেখে ভাবি তার রুমাল নাড়ছে। প্রথম শ্রেণীর রেলিং ঘেঁষে আক্রামভাইও স্মিতমুখে ভাবিকে সংবর্ধনা জানা[illegible] ওহ্‌! ভাবির অত্যধিক আগ্রহের একটা হদিস তবু এতক্ষণে পাওয়া গেল।

সিঁড়ি বেয়ে ওরা নেমে আসছে।

কিন্তু আক্রাম ভাইর পাশে ওটা কে? সাহানু— সাহী? মাথা থেকে কোমর পর্যন্ত শীর্ণ হয়ে নেমেছে সিল্কের বোরখাটা তারপর হঠাৎ কুচি দিয়ে ফুলে উঠেছে পা অবধি। বিসর্পিল সে ঢেউ খেলানো সীমারেখার নিচে, স্বচ্ছ ভেনিসিয়ান স্যান্ডেলে জড়ানো শুভ্র একবিন্দু তুলতুলে

পা। মাংস আর সিল্কে মিলে হেলেনের প্রশ্নবোধক চিহ্নটা তীক্ষ্ণ বর্শার মতো এসে বিদ্ধ হলো ক্ষতাক্ত হৃৎপিণ্ডে। সুপ্তোত্থিত দানবের মতো গৃধিনী উচ্চে হাই তুলল হাংগ্রিল ক্ষুধা!

ভাবি একটা আঙুলে গুঁতো দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, ভাবছিস উডস্টেডের স্ট্রাইপ দেয়া সুট্‌টা পরে এলেই ভালো করতি না?

রক্তিম হয়ে ভীরুকণ্ঠে শোধরাবার চেষ্টায় আশরাফ বলল, কী যে বল— তিন বছর পরে দেখছি, তাও একটু উদগ্রীব হব না? তোমার পাপ মন কিনা তাই ওসব ভাব!

বুঝেছি গো বুঝেছি। আর বলতে হবে না। মুচকি হাসিতে লতিয়ে উঠল ভাবি।

সকাল আট-টা।

নিট্‌শির কবিতায় দর্শনবাদ খুঁজতে খুঁজতে আশরাফ চায়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। পর্দার ওপাশ থেকে স্যান্ডেলের আওয়াজ ভেসে এল। আশরাফ বুঝল ভাবি চা নিয়ে আসছেন। আরো গম্ভীর হয়ে ও পড়তে থাকে। পায়ের শব্দ আরো কাছে এগিয়ে আসে, একেবারে ওর চেয়ারের পেছন অবধি। আশরাফ তবু নির্লিপ্তভাবে পড়েই চলেছে।

দেরি করার জন্য ক্ষমা চাইছি, কণ্ঠস্বর সাহানুর!

চমকে উঠে চোখ ঘুরিয়ে ও দেখে চায়ের ট্রে হাতে করে দাঁড়িয়ে সাহানু। অত্যধিক সহজ সচল হবার চেষ্টায় আশরাফ প্রশ্ন করল, তা ভাবি আসলেন না কেন?

আম্মা চায়ের টেবিল থেকে ওনায় ছাড়লেন না, তাই ভাবির অনুরোধে আমাকেই নিয়ে আসতে হলো।

বলতে বলতে ও টি-পটটা টেনে নিয়ে চা বানাতে শুরু করে। একটু থেমে —এ কিন্তু আপনার অন্যায় আব্দার, সকলের সঙ্গে বসে চা-ও খাবেন না, আবার চাকর-বাকরে বানিয়ে দিলে সেটাও ছোঁবেন না!

আশরাফের দিকে এক পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে ও নিজেও বসে পড়ল পাশের সোফায়।

আশরাফ চোখ থেকে এবার শেলের চশমাটা খুলে ফেলে। চেয়ারটা একটু ঘুরিয়ে সম্পূর্ণভাবে ঘুরে সাহানুর মুখোমুখি হয়ে বসে। জার্মান দশনবাদের গুরুগম্ভীর গৈরিক আড়ষ্টতাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করে ও উত্তর দেয়।

দেখ, আর সব ব্যাপারে আমি অভদ্র, অসামাজিক থেকে আরম্ভ ক'রে অমানুষিক অবধি হতে পারি, কিন্তু চা খাওয়ার বেলায় আমি খাস জাত অভিজাত। আমার কাছে চা'টা শুধু এক পেয়ালা রঙিন গরম পানি নয়, তাতেই চায়ের ডেফিনিশন পূর্ণ হলো না। তাকে ঘিরে থাকা চাই একটা নরম, নবনীয়, রুচিসম্পন্ন আবেষ্টনী। তাই যে পেয়ালায় আমি চা খাব তাতে থাকা চাই উড়ন্ত চীনে হাঁস আঁকা, যে হাত সে চা ধরবে তাতে থাকা চাই একটা পরিচ্ছন্ন স্নিগ্ধতা।

বুঝলাম! আপনি যে সাজিয়ে কথা বলতে সিদ্ধহস্ত সে কথা বুঝলাম। বলে সাহানু পিছলে পড়া শাড়ির প্রান্তটুকু কাঁধের ওপর গুছিয়ে নিতে থাকে।

হাঁ করে দেখছিস কী, চা খা না কেন? বলতে বলতে ওর খোশবুদার ভাবি প্রবেশ করল সশব্দে। অপ্রয়োজনীয়ভাবে অপ্রস্তুত হয়ে আশরাফ অনাবশ্যক তাড়াতাড়িতে গরম চা ঠোঁটে ঠেকাতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলল জিভ। ছলকে-পড়া কিছু চা নষ্ট করে দিল ওর সাদা পাঞ্জাবির ক্ষুদ্র একটা অংশ। তারপরই এই হাস্যকর পরিস্থিতি থেকে তাড়াতাড়ি রেহাই পাওয়ার জন্য

অধিকতর বোকার মতো বলে ফেলল, বাহ্ এত গরম চা কী করে খাই ?

ভাবি হেসে উঠল প্রচণ্ড ধ্বনিতে।

সাহানুর টোল খাওয়া গালে কে যেন আবীর ছিটিযে দিয়েছে তখন। হাসির আবর্তেব মাঝে তবু কেন জানি থেকে থেকে জেগে উঠছিল লজ্জাব এক আধটা আড়ষ্ট ইঙ্গিত।

কিছু হয়নি, তবু ওরা যখন ঘব থেকে বেরিযে গেল তখন আশরাফেব ভীষণ অস্বস্তি বোধ হতে থাকে। ওর মনে হতে থাকে ভাবিব ঐ দোলাযিত হংসগ্রীবার প্রতিটা ভাঁজে কী একটা প্রচ্ছন্ন খোঁচা ওকে ব্যঙ্গ করে চলে গেল। ভাবির ঐ বাঁ কানের চমকানো হীবের দুলটা যাবার সময যেন ওর দিকে ঝিকমিক কবে হেসে বলল—অত্যন্ত দুঃখিত, তোমাদেব ঐ নির্জন বঁদেভূতে ববাহুত ভূতেব মতো অকস্মাৎ উপস্থিত হবার জন্য আমি লজ্জিত।

পড়তে পড়তে আশরাফ একসময হাতের বইটা ভুলে যায। অন্যমনস্কভাবে ভাবতে আরম্ভ কবে। অদ্ভুত, খাপছাড়া কল্পনাব অজস্র বন্যা এসে অল্প সমযেব মধ্যে ওকে ভাসিযে নিযে যায এ পৃথিবীর অনেক দূবে! ধীবে ধীরে মরক্কো লেদারে বাঁধানো নীল বইটা ক্রমশ অস্পষ্ট হযে আসে— কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে ওর সোনালি নামটা। কুণ্ডলাকৃতি ধোঁয়াব মতো ওব মাঝখান থেকে পেঁচিযে উঠতে থাকে কাবও সিল্ক আচ্ছাদনেব মোলাযেম প্রান্ত, তাব ফুলে ফেঁপে ওঠা মসৃণ খাঁজ। ওব মনেব ঠাণ্ডা গহ্বব থেকে জেগে ওঠে স্যালোম্বোব উষ্ণ দেহেব পূর্ণাঙ্গ সীমাবেখা। অদেহী কোনো কিন্নবীর কোকেনী আলিঙ্গনের মতো সবটা স্বপ্ন ওব সমস্ত তন্ত্রীকে করে তোলে তন্দ্রালু নিস্তেজ হিমেল।

আচমকা আশবাফের ইচ্ছে হয়, চুমু দেবাব সময যদি ও বক্তও চুষতে পাবত। সত্যি আজ ও বুঝতে পারে যে নিবক্ত দেহ ও কোনো দিন ভালোবাসতে পাববে না। অঙ্গ গঠনে বিকৃত থাক আপত্তি নেই কিন্তু কোষে কোষে থাকা চাই উপচে-ওঠা নোনতা বক্ত। চুমু দিতে দিতে ও চুষে খাবে। বিকারগ্রস্তের মতো ও বিড় বিড় কবে ওঠে—খোদা, দাঁত আমাব সাপেব মতো সূচ-ছিদ্র করে দাও, আমি রক্ত চুষব, শুষব।

দবজার কাছে কার পদধ্বনি শোনা যায। সম্বিত পেযে নিজেব কল্পনায আশবাফ নিজেই শিউরে ওঠে।

আসতে পারি কি ? পর্দাটা না সবিয়েই মিহি গলায বাব থেকে কে প্রশ্ন কবল।

নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে এক পেযালা চা আব এক প্লেট বিস্কিট হাতে নিযে ঘবেব ভেতব ঢুকল সাহানু। আশরাফ অনেকটা সপ্রতিভ কণ্ঠে বলল, এই এখন হঠাৎ চা নিযে যে।

তোমার ঘরে অসময়ে আসবার এ ছাড়া আব অন্য কোনো অজুহাতই নাকি চলে না। অবশ্যি ঘুষ দেবাব এ ফন্দিটা ভাবিব কাছে সদ্য শেখা।

চীনে হাঁস আঁকা চায়েব পেযালাব সোনালি বিমে চুমুক দিয়ে আশবাফ আবম্ভ কবে—অর্থাৎ, তোমরা দুজনে মিলে ষড়যন্ত্র কবে আমাব সমস্ত পড়াশুনো একেবাবে মাটি করে দিতে চাও, না ?

আশরাফের কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম গাম্ভীর্যেব নিখুঁত আবেষ্টনী। সাহানু হঠাৎ চেযার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। মুখে ওর একটা করুণ বক্তিম আভা। মুখে শুধু বলল, বেশ, —তুমি তা হলে পড়ো। সমস্ত বছর ভরে তো আব হাজাব মাইল ছুটে গিযে তোমাব সময নষ্ট কবে, বিবক্ত কবতে যাই না।

এতটুকু বলে সাহানু আর দাঁড়ায় না। দরজার দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে।

সাহানু! আশরাফ একটু জোরেই ডাকে। সাহানু কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়েই পর্দাটা ঠেলে ধরেছে বাইরে যাবার জন্য। আশরাফ প্রায় চিৎকার করে উঠল. সাহী !

শিউরে উঠে সাহানু পর্দাটা ছেড়ে দিল। নিজের নামের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে যে অতটা উদাত্ত কল্লোল ধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে এ কথা ও আগে কোনো দিনই ভাবতে পারেনি। মুখ ঘুরিয়ে নিচু সুরে শুধু প্রশ্ন করল, কী ?

আশরাফ তখন গাঢ় চোখে সাহানুর দিকে চেয়ে আছে, সাহানুর মুখের পানে। সেখানে এরই মধ্যে দুটো লাস্যময়ী টোল দুলতে দুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। চারপাশে জমে উঠেছে ঘোর রক্তিম আভা। মনে হচ্ছে রক্তের একটা ক্ষ্যাপা ক্ষুদ্র ঘূর্ণি! আশরাফ হেসে উঠল—তুই একটা ছেলেমানুষ, একটুখানি ঠাট্টা করলুম অমনি অত চটে গেলি !

বলে আশরাফ শূন্যপথে আঙুল তুলে রেখাঙ্কিত করে সাহানুর পথ চিহ্ন করে দিল। সেই পথ লক্ষ্য করে সাহানু আবার এসে চেয়ারে বসতে বাধ্য হলো।

চটব না, বাহ্। সব্বাই বারান্দায় বসে গল্প করছিল, হঠাৎ আমার এমনিতেই একটু ইচ্ছে হলো তোমায় দেখতে। উঠে পড়লাম। ভাবলাম অত রাত, একলা বসে বসে অনেকক্ষণ পড়ছো, এক পেয়ালা চা পেলে সত্যিই হয়তো তুমি খুশি হয়ে উঠবে। তারপর তুমিই বলো, প্রতিদানে ঘরে ঢুকেই যে সম্ভাষণটা পেলাম তাতে দুঃখ হওয়া সত্যিই কি বিচিত্র ?

আশরাফ চা শেষ করে নীরবে খালি পেয়ালাটা এগিয়ে দিল সাহানুর দিকে। তারপর উদগ্রীব আঁখি মেলে চেয়ে রইল, কী করে সাহানুর খোঁদাই করা হাত বিস্তৃত হয়ে আসে পেয়ালাটা নিতে! আচমকা আশরাফ চেঁচিয়ে উঠল, ও-কী, তোমার হাতে কী হলো ?

আশরাফ ওব হাতটা তুলে নিল ওর নিজের হাতে। অত্যন্ত নিবিড়ভাবে নিরীক্ষণ করতে লাগল হাতের খোলসের তুলতুলে একটুখানি নরম মাংস। হাতটা ছাড়াবার চেষ্টায় সাহানু একটু ছট্‌ফট্ কবে উঠল। আহ্ ছেড়ে দাও না. ও কিচ্ছু হয়নি!

কিন্তু রক্ত যে, কাটল কী করে ?

তবু খামাকা তর্ক করছো, বলছি কিচ্ছু হয়নি।

সাহানু কিছুতেই বলবে না কী করে কেটেছে। আশরাফও নাছোড়বান্দা। অতঃপর সাহানু স্বীকার করল যে একটু আগে ক্রিম ক্র্যাকারের টিন খুলতে গিয়ে ঐ ছোট অবহেলীয় দুর্ঘটনাটা ঘটেছে।

আমার জন্য বিস্কিট আনতে গিয়ে তোমার হাত কেটে গেল ? ছি ছি ছি! এখন না আনলে আমার তরফ থেকে কিইবা এমন ক্ষতি হতো ? মাঝখান থেকে খালি খালি তোমার হাতটা অমন করে কেটে অত রক্ত—

থামো না, কী বাজে বকছো!

না, না, বলা যায় না, রক্ত! সে যে ভয়ঙ্কর দামি জিনিস! আর তা ছাড়া তোমার রক্ত, আমার জন্য নষ্ট হবে সে—

শব্দগুলো বরফকুচির মতো জমে উঠল। আশরাফ ততক্ষণে সাহানুর নিটোল হাতটা টেনে তুলে ফেলেছে নিজের চোখ আর নাকের বড্ড কাছে। অস্ফুট আড়ষ্ট কণ্ঠে সাহানুর মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসল—আশি ভাই, ও কী ছেলেমানুষী হচ্ছে ?

আশরাফের চোখের সামনে তখন সাহানু অদৃশ্য, অদৃশ্য হয়ে গেছে 'স্যালাম্বো'র নীল মরক্কো লেদারে বাঁধানো রাজ সংস্করণ। চারদিকে শুধু একটা সম্পূর্ণ অবলুপ্তির হিমেল গভীর গুহা, শব্দহীন স্পন্দনহীন। এর মধ্যেই চারদিক ঝলসে দিয়ে ভেসে উঠল একটা মসৃণ চক্‌চকে মেজার গ্লাস, ফোঁটা ফোঁটা টাটকা তপ্ত রক্ত পড়ে ভরে উঠছে সেটা। আর কে যেন তাতে ঢেলে দিয়েছে দু'এক কণা স্যাকারিনের সোনালি গুঁড়ো। আর নিচু হয়ে আশরাফ সেটা চুষছে, চুষছে, চুষছে।

কেন জানি এরপর দুদিন ধরে সাহানু আর আশরাফের সাথে এক রকম কথাবার্তা হয়নি বললেই চলে। সন্তর্পণে এ ওকে যতদূর সম্ভব এড়িয়েই চলেছে। ভাবি-ই এ দু'দিন আগের মতো চা এনে দিয়েছে। সবই বেশ স্বাভাবিকভাবে চলছিল। ভাবির সামনে আশরাফ তবু চাইত আরো স্বাভাবিক হয়ে উঠতে। নিজকে সে তার ফলে করে তুলত হাস্যকর, অদ্ভুতভাবে ভীরু ভীরু। আর তাই প্রত্যেকবারই ভাবি যখন নিঃশব্দে চা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যেত ওর তখন মনে হতো ভাবি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে হাসছে। ওর চোখ জ্বালা করে উঠত ভাবির ঐ বাঁ কানের চমকানো হীরে আর হংস-গ্রীবার ওপর কোঁকড়ানো চুলের ভাঙা অংশগুলোকে কাঁপতে দেখে।

সন্ধ্যার দিকে ভাবি হঠাৎ ওর ঘরে এসে হাজির। হুকুম করল ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্য।

নদীর ধারে শুরকি দেওয়া লালরাস্তা ধরে ওরা তিনজন হাঁটছিল। ভাবি মাঝখানে, আশরাফ আর সাহানু দু'পাশে। নদীর ওপর থেকে ভেসে আসছিল বেশ ঠাণ্ডা একটা বাতাস হু হু করে। সেই শব্দ এসে আবার ঢেউ তুলছিল ঝাউ বনে, একটা একটানা শোঁ শোঁ প্রতিধ্বনিতে।

ভাবি একলাই উৎফুল্ল হবার চেষ্টায় খুব জোর গলাতেই কথা বলছিল অনবরত। মাঝখানে সহজ কণ্ঠে আশরাফ বাধা দিল। ভাবির কথার তর্কে জের টেনে বলল—তবু শেষ অবধি তোমাদের অবস্থা ঐ বাদুড়ের চেয়ে খুব বেশি উন্নত নয়।

অর্থাৎ ?

ভাবির কণ্ঠস্বরে সশব্দমান প্রশ্ন গর্জন। সাহানুর চোখে অবরুদ্ধ আবেগের নিঃশব্দ তর্জন।

কিচ্ছু না।

আশরাফ একবার গলাটা ঝেড়ে আরো ভঙ্গিমা করে : কিচ্ছু না, শুধু এই যে সন্ধ্যা না হলে যেমন তোমরা পথে বেরুতে পার না, ওরাও তার আগে আকাশপথে কিছুতেই বেরুতে সাহস করে না। তবে তফাত এই যে ওরা না দেখে অন্ধ, আর তোমরা দেখেও অন্ধ থাকতে বাধ্য! অবশ্য তোমরা দিনের আলোয় যে একেবারেই বেরুতে পার না তা নয়— তবে বোরখার আঁধার আগে চারধারে সৃষ্টি করে নিয়ে তারপর। তাই তো তোমাদের মনে আড়ষ্টতা চরণে জড়তা বলনে সঙ্কোচ।

ব্যাস বন্ধ কর। তোর লেকচার এখানে চলবে না, এই আমার অর্ডার।

ভাবি হেসে উঠল।... সাহানু নীরবে হেঁটে চলেছে। সাবুনে আকাশে একটা প্রায় পুরন্ত চাঁদ নদীর পানিকে রুপোলি করে দিতে প্রাণপণ যুজ্‌ছে।

কালকে শবে-বরাত, না ? ভাবি প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, আর পরশু আমাদের যাবার দিন, সাহানুর উত্তর।

অবশ্য, তার আগে যদি তোমাদের কারো ভয়ঙ্কর একটা অসুখ না হয়ে পড়ে। যা পাতলা একটা ফ্যাশন-দুরন্ত শাড়ি পড়ে এসেছ— নাও, এই চাদরটা জড়িয়ে ধরো।

এবং সাহানু কিছু আপত্তি করবার আগেই আশরাফ নিজের চাদরটা সাহানুর দু'কাঁধের ওপর দৃঢ়ভাবে জড়িয়ে দিল।

বেড়িয়ে এসে ওরা ড্রইং রুমে বসে। জানালা দিয়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে চাঁদের আলো এসে ডুবিয়ে দিচ্ছিল সমস্ত ঘরটাকে। ভাবি বসল চাঁদের দিকে মুখ করে। সাহানু অকারণেই চুপ করে গিয়ে বসল একটা অন্ধকার কোনায়। তিনজনই চুপচাপ, হঠাৎ আশরাফ নিজের অজান্তেই আত্মস্থ হয়ে নিঃসাড় হয়ে বসে আছে, তার নিজেরই খেয়াল নেই। টেরই পায়নি কখন এরই মধ্যে নিঃশব্দে ভাবি ঘর থেকে চলে গেছে। অজস্র এলোমেলো কল্পনা থেকে যখন বিচ্ছিন্ন করে নিল নিজকে, তখন খালাম্মার সাথে ভাবির উগ্ররসে ভরা ঝাঁঝালো ঝগড়ার কণ্ঠস্বর অন্দরমহল থেকে ভেসে আসছিল। সাহানুর কথা বোধহয় ও ভুলে গিয়েছিল। আশরাফ কী ভেবে লাইটের সুইচটা অন্‌ করে দিয়েই সঙ্গে সঙ্গে আবার তা নিবিয়ে দিল।

তুমি আলো জ্বাললে কেন ? সাহানু অন্ধকার কোণ থেকে চিৎকার করে উঠল উত্তেজিত কম্পিত সুরে।

আশরাফ ততক্ষণে নিজকে সামলে নিয়েছে। নীল্‌চে জোছ্‌নায় একটুখানিক ব্যাঙ্গাত্মক পাংশু হাসি ছিটিয়ে আস্তে আস্তে উচ্চারণ করল, আলো না জ্বাললেও চলত কারণ তোমার আমার মতো বয়সের মেয়ে ছেলেরা কখন কী করতে পারে সে সব প্রতিটা মুহূর্তের ইতিহাস, ফ্রয়েড মশায় খুব পরিষ্কার করে লিখে গেছে। আলো জ্বালিয়ে তার প্রমাণ আমার না দেখলেও চলত।

কেবল ফ্রয়েড আর ফ্লবেয়ার। যতসব ছাপার অক্ষরে চে'খা চোখা সাজানো বুলি! কেন দরদ দিয়ে নিজের মন থেকে সহজ সরল করে একটা কথাও কি তুমি বলতে পার না, আশি ভাই ? এক নিঃশ্বাসে এই অবধি বলে সাহানু আর সেখানে দাঁড়াল না, খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ঘর থেকে চলে গেল।

আশরাফ প্রথমটায় একটু অগোছালো হয়ে পড়ল। ও ভেবে ভেবে অবাক: এ কেমন অদ্ভুত মন্বন্তর! আমার আলোয়ানটাকে নিবিড়ভাবে বাহুর ওপর, গলার ওপর, বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে তুমি অন্ধকারে বসে বসে নিজের দেহকে উষ্ণ রাখছিলে— শীতের ভয়ে। বেশ তো, তাতে হয়েছে কী ? আর আমি যখন আলো জ্বাললাম তখন কিনা সব দোষ হলো আমার ?

হঠাৎ চমকে উঠল আশরাফ, আঁধারে দ্যুতিময় একটা কিছু জ্বলছে টেবিলের ওপর। চারধারে তার বিচিত্র বিচ্ছুরিত বর্ণচ্ছটা।

আমার দুল জোড়া বোধহয় টেবিলের ওপর ফেলে গেছলাম নারে ? দুলের খোঁজে ঘরে ঢুক্‌ল ভাবি, কোনো কথা না বলে তুলে নিল দুল জোড়া। তারপর তার পানে চেয়ে নিঃশব্দে কানে দুল পরাতে পরাতে পা বাড়াল ঘরের বাইরে।

আশরাফ ভাবে, রহস্যময় হবার ভাবির কোনো প্রয়োজন ছিল কি ? আশরাফের চোখ দুটো যন্ত্রণায় জ্বালা করে উঠল। ভাবির দুটো নিটোলবাহু বাঁ কানের হীরেটা ধরে, তা থেকে বহুবর্ণের টুকরো টুকরো প্রতিফলিত রঙিন আলোর রেখা, শালকের মতো কোমল ঘাড়ে নীলচে চাঁদের আলো— সবটা মিলে আশরাফকেই যেন ব্যঙ্গ করে কিছু বলছে, হাসছে, বিদ্রূপ করছে।

গরম চাদরটা গায়ের ওপর টেনে নিয়ে আশরাফ শুয়ে পড়ল। রাত খুব কম হয়নি। এগারটা বোধহয় বেজে গেছে। শবে-বরাত, অন্দরমহলের কোলাহল তখনো অবশ্য তেমন কিছু

কর্মেন। আশরাফ ভাবছিল সাহানুর কথা। এ সাহানুর অন্যায়। সাহীর এ দুর্বলতা অক্ষমার্হ। সত্যিই যদি সে তার আশি ভাইকে ভালোবাসবে, তবে তা প্রকাশ করার মতো সাহস কেন নেই ওর? আলোতে আসতে ভয় পায় কেন? চাদরটা গায়ের ওপর ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে এবার আশরাফ সত্যিই ঘুমুবার চেষ্টা করল।

গভীর রাত তখন। দু'টো থেকে তিনটে অবধি হতে পারে। মাথার কাছে অনেকক্ষণ অবধি কার অধীর পায়ের শব্দ শুনে আশরাফের ঘুম ভেঙে গেল। গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, কে?

আ-মি, সাহানু।

তুমি, এত রাতে ঘুমোওনি যে?

আজ রাতে সবাই জেগে আছে, তাই আমিও জেগেছিলাম।

ওহ্।

আশরাফ আবার চাদর মুড়ি দিয়ে চোখ বন্ধ করল।

আশি-ভা-ই-ই!

কে যেন মৃদু স্পর্শ করে ডাক দিল। মুখের ওপর থেকে চাদরটা একটু সরিয়ে বলল, কে সাহী নাকি? বস ঐ সামনের চেয়ারটায়, বলবে নাকি আমায় কিছু?

একটা কথা শুধু আশি ভাই, তোমার ঘুমের সত্যি বেশি ব্যাঘাত করব না। বল, তুমি আমার সেদিনের কথায় রাগ করনি তো?

ঘুমের ঘোরে আশরাফ ঠিক বুঝতে পারছিল না। সাহানু কবেকার কিসের কথা বলছে। তা ছাড়া বেশ লাগছিল ঘুমকাতুরে ঝাপসা চোখে পাণ্ডুর জ্যোৎস্নায় সাহানুকে দেখতে। কথার রেশ ধরতে না পারলেও বেশ লাগছিল এ ধরনের আবছা সংলাপ। তবুও একটু সপ্রতিভতার সুর টানল—পাগল, তোমার আমার রাগ সে তো বরাবর এক তরফাই চলছে।

মনে মনে আশরাফ তখন হিসেব করছিল কার কথায় বেশি অসংলগ্নতা প্রকাশ পেল— কে বেশি তন্দ্রাচ্ছন্ন? সে না সাহানু?

তারপর জড়িয়ে জড়িয়ে মিঠে সুরে সাহানু আরো কী কী বলছিল, আশরাফ তার সবটা শোনেওনি হয়তো। শুনলেও বুঝবার চেষ্টা করেছিল কিনা সন্দেহজনক। একজন উচ্ছ্বসিত আবেগে অনর্গল গুঞ্জরণ করে চলেছে, অন্যজন স্তিমিত তন্দ্রীতে নির্বিকার চিত্তে কিছু শোনেওনি। শুধু আধ বোঁজা মদির চোখে অক্ষরগুলোকে যেন উদাসীন আগ্রহে শূন্য থেকে ধরবার চেষ্টা করছে।

এক সময়ে আশরাফের আবছা চোখের সামনে ছোট একটা নরম পুঁটুলি নড়ে উঠল। চোখগুলো একটু টেনে আশরাফ বুঝল সাহানু কিছু বলছে খুব উত্তেজিত সুরে, আর তুলতুলে পুঁটুলিটা ওরই একটু মুঠকরা হাত। আশরাফের গলার স্বরে ক্ষীণ জিজ্ঞাসার চিহ্ন, কী?

বলতে পার, আমার এ হাতের মুঠোর মধ্যে কী আছে?

বাহ্ তা আমি কী করে বলব।

পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস, এখন বলো তো?

হীরের দুল?

দুর ছাই— আবার বলো।

পুঁতির মালা।

হয়নি, কিছু হয়নি।

তাহলে আমি আগে খুলেই দেখি তারপর না হয় বলব কী ছিল তোমার হাতে।

আশরাফ মন্থর গতিতে ওর ঘুমন্ত হাতটাকে হেঁচড়ে তুলে ধরে, সাহানুর মুঠো খুলবার জন্য। সাহানু ভীষণ ভয় পেয়ে যায়। চট্ করে দ্রুত বেগে হাতটা সরিয়ে নেয়। রহস্যশংকালু কণ্ঠে শুধু বলতে থাকে—না-না। তোমায় আমি দেখাব না। আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে গোপনীয়— আমার দেহের সঙ্গে বন্দি করে রেখেছি সে-সম্পদকে এই মুঠোয়। তা আমি তোমায় দেখাব না। তুমি তা দেখতে পারবে না, কক্ষণো পার না—না—!

এরপর আর একটা অক্ষরও আশরাফ বুঝতে পারে না। চোখ দুটো ওর সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে আসে ঘুমে।

বোধহয় এর ঘণ্টাখানেক পর। আশরাফের ঘুম ভেঙে গেল, এক অস্বস্তিকর কল্পনার সংঘাতে। ওর মনে হতে থাকে যেন একটু আগে সাহানু এসেছিল ওর বিছানার কাছে; কথা বলেছিল ওর সাথে। তবুও কী যেন বলেছিল ওর কিছুতেই মনে পড়ে না। তাহলে সাহানু সত্যি এসেছিল! ঐ বিছানার ধারে চেয়ারটাও ঠিক জায়গাতেই আছে। কী একটা লুকিয়েছিল সাহানু তাকে দেখতে দেয়নি। আশরাফ উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ছোট্ট টর্চটা নিয়ে ও দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরটার দিকে চলতে থাকে। ঐখানেই থাকে এ কয়দিন ধরে সাহানু আর ভাবি। আশরাফ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো সে ঘরে ঢুকল। সাহানুকে সে ডেকে তুলবে, জিজ্ঞেস করবে, জোর করে দেখবে, যা সে লুকিয়ে নিয়ে এসেছে, আশরাফের চোখের সামনে থেকে। সে চোখ তখন ছিল ক্লান্ত, এখন তা জাগ্রত। আশরাফ তাই দেখতে চায়। আশরাফ সাহানুকে ভালোবাসে সে দাবির সুষ্ঠুতাকে সংকটে ফেলতে হলেও আশরাফ জানতে চায় সাহানুর চরম পরম গোপন সম্পদকে।

মশারির কিনার দিয়ে ঝুলে পড়েছে সাহানুর জাফরানি রঙের ওড়নির জড়ির পাড়টুকু। আঁধারে জ্বলছে ভাবির হীরের দুলটার মতো ঠিক্‌রে ওঠা আভায়ম। মশারিটা ধীরে সরিয়ে আশরাফ টর্চটা জ্বালল। ওড়নির ওপরই সাহানুর অসহায় হাতটা ঠিক তেমনিভাবে মুঠা করা অবস্থায় বিছিয়ে আছে ওড়নির ওপর। আল্‌তো হয়ে বুঁজে আছে। অত্যন্ত সন্তর্পণে আশরাফ ওর মুঠোর আঙুলগুলো নির্ভয়ে ছাড়িয়ে নিল। তারপর মুহূর্তেই আলোটা সাহানুর সুন্দর ছোট হাতের নরম বুকে পড়তেই শিউরে উঠল আশরাফ।

সাহানুর হাতের ওপর মেহদি পাতার লাল অক্ষরে খুব পরিষ্কার করে লেখা— আশি।

কিন্তু তবু ক্ষণিকের উচ্ছ্বাস, আত্মতৃপ্তির সে কলরোল সব ছাপিয়ে আশরাফের চোখের সামনে ক্রমশ ভেসে উঠতে লাগল একটা সিরিঞ্জ। টিউবের ওয়াসারটা ওপরে উঠছে আর ফাঁপা বাতাস সূচ-ছিদ্র পথে টেনে তুলছে লাল টাট্‌কা তপ্ত রক্ত।

ওর মনে হতে থাকে সাহানুর ছোট হাতের মাঝে ঐ যে লাল দু'টো অক্ষরের ইঙ্গিত, তা শুধু অন্তরালের স্ফীত রক্ত কণিকার অতৃপ্ত বিস্তৃতি। ঐ পাতলা চামড়া ছিঁড়ে ওরা যেন বেরিয়ে আসতে চায়। ওরা যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আশি, আশি— আশি !

একটি তালাকের কাহিনী

হাঁসের ঠোঁটের মতো চ্যাপ্টা পাট বোঝাই নৌকার গোলুইটা হঠাৎ ঘচ্ করে জার্মানি ফেনার স্তূপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শীর্ণ খালের মধ্য দিয়ে গত দু'ঘণ্টা যাবৎ একটানা লগি ঠেলতে ঠেলতে নজু মিঞার মাথার মধ্যেও যে প্রশ্নটা খুঁটি ওপড়ান পোঁয়ার বলদের মতো সব কিছু তোলপাড় তছ্‌নছ্ করে ছুটাছুটি করছিল সেটাও আচমকা থমকে স্থির নিশ্চল শান্ত হয়ে গেল। নৌকাটার মাথার দিকে আরও আঁটসাট হয়ে জমাট বেঁধে উঠেছে। বাড়ির ঘাট থেকে রও হবার সময় মোল্লাবাড়ির হাঁপানীতে ভোগা কাসেমভাই খক্‌খক গলায় সে বিদ্রূপটা এক দলা কফের মতো ওর কানের গর্তে ছুঁড়ে মেরেছিল। মনে মনে নজু আরেকবার সেটা নেড়েচেড়ে দেখে। নিরুত্তেজ নিরুদ্বেগ নির্লিপ্ত বুদ্ধি নিয়ে। কাসেমভাইর ঐ সন্ধ্যেবেলার একটা খোঁচা থেকেইত তার মনের প্রশ্নটা জন্ম নেয় নি। একটু একটু করে সন্দেহটা জমে উঠতে শুরু করেছে গত দুসপ্তাহ থেকে। বাজারের শেকুমিঞার মুচ্‌কি হাসি, কামাল ডাক্তারের অযাচিত উপদেশ করিম মুন্সির আত্মতৃপ্তির হাসিমাখা সাবধানবাণী আরো হাজারো নানা রকমের ঘুসঘুসে ফিসফিস্ করা গুজব একটার পর একটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠল ওর মনে। একটার সংগে আরেকটা যেন কাসেমভাইর হাঁপানী বুকের শক্ত সবুজ আঁঠাল কফ দিয়ে গায়ে-গায়ে লাগানো। ঝাঁকুনি দিলে আলাদা হয় না। ঝেড়ে ফেলতে চাইলে পড়ে যায় না।

পাটের দুই উঁচু পাহাড়ের মধ্যে হাত-পা গুটিয়ে জ্যাঠাও ভাই কালু মিয়া ঝিমুচ্ছিল। লগি ঠেলবার পালা তার ছিল শেষরাতে। নৌকার পেটের মধ্যে যেটুকুন জায়গা-ধারগা ছিল পাটের স্তূপের একদিকের গাঁটে হেলান দিয়ে তাতেই সে বেশ আরাম করে শুয়েছিল। নৌকা থেমে যাওয়াতে কাৎ হয়ে একবার মুখ বাড়াল সামনের দিকে। নৌকা থেকে নেমে হাত দিয়ে টেনে-টেনে কিছু জার্মানিন ফেনা উপড়ে না ফেললে নৌকা যে আর নড়ছে না তা সে বুঝতে পারল। যা শক্ত আর মোটা আর ভারি এই বদ পানার জাত। তবু ভাইজানকে একবার গলা ছেড়ে জিজ্ঞেস করলো, 'নামন লাইগব নি নজুভাই ? চৈর ধরি উজা যাইতি' ন ?'

নজু মিঞা ততক্ষণে তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেছে। অশান্ত দ্বন্দ্ব প্রশ্নাবলীকে দিলে চূর্ণ করে তখন মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে একটা তীক্ষ্ণ কঠিন সংকল্প। তাইত ততক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর হঠাৎ পেছনের ডাক শুনি চমকে উঠল না একটুও। অত্যন্ত স্বাভাবিক কণ্ঠে একটা অত্যন্ত স্বাভাবিক গালি জুড়ে উত্তর দিল, 'হুতি হুতি নবাবি করিচছা আর। নামি যাই। হোন্দের কিনার টানি ধর আঁই এমুইর গলুই ধইরছি!'

বলতে বলতে নজু মিঞা পানিতে পা ঠেকাল। পেছনের দিকে নেমে নৌকা ধরে কালু। ফেনার জংগল থেকে নৌকা মুক্ত করে কালু নৌকায় উঠে দেখল নজুভাইর তার খালপাড়ে দাঁড়িয়ে পা ধুচ্ছে। নৌকায় চড়বার উদ্দেশ্যই যেন নেই। সে অবাক হয়ে চেয়ে রইল ভাইর দিকে। পাড়ে দাঁড়িয়ে নজু মিঞা খুব শান্ত কণ্ঠে ওকে নির্দেশ দিল :

মাল নিয়ে ওকে একলাই যেতে হবে হাজিগঞ্জের বাজার পর্যন্ত। নজু মিঞার নাকি কি একটা জরুরি কাজ বাড়িতে, আগামীকাল। এতক্ষণ একদম খেয়াল ছিল না, এখন মনে পড়েছে।

এই বাজার থেকে ফিরতে তার বড় জোর বাড়ি পৌছাতে ঘণ্টা দুই লাগবে। মাঝ রাতের আগেই বাড়ি পৌছাতে পারবে। কাজেই সে চলল।

জোস্নার আলোতে ঝলমলো কাঁচা মাটির বাঁধান রাস্তা। হাঁটতে হাঁটতে নজু মিঞা তার জরুরি কাজের মহড়া দিচ্ছে মনে মনে। আজ রাতেই গুজব আর মুচকি হাসি আর বিদ্রূপের গলা টিপে মারবে সে। ফাতেমার রূপের গর্বে আজ রাতেই সে মাখাবে রক্তের ছোপ। নতুন স্বামীর সোহাগে মাজা গলা ঢাকা যৌবন আজ রাতে তাকে ভোলাতে পারবে না। আজ রাতে ফাতেমা জানে সে ফিরবে না, হাজিগঞ্জের বাজার সেরে আসতে অন্তত পরের দিনের ভোর উতরে যাবেই। ঐ রসে রাঙা আগুনে শরীর বিয়ের পরেই না পেতেই কত পুরুষের সোহাগের জন্য লক্‌লক্ করে ওঠে আজ সে নিজ চোখে পরখ করে দেখবে।

দুই

দড়াম! দড়াম!

দু'হাত দিয়ে, দু'পা দিয়ে প্রচণ্ড বেগে লাথি মেরে ঘুসি মেরে চলেছে নজু মিঞা। ভেতরের হুড়কো ঠেলে ভেঙে পড়তে চাইছে। কাঠের দরজা, ঠক্‌কায় ঠক্‌কায় নড়ে উঠছে টিনের চালা পর্যন্ত। অত রাতে স্বামী ফিরবে না জেনে বৌ যদি ঘুমিয়ে পড়ে গিয়ে থাকে তাহলে খুব স্বাভাবিকভাবেই দরজা খুলতে দেরী হতে পারে সে খেয়ালটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে নজু মিঞা। মরিয়া হয়ে আরেকবার জোড়াপায়ে জোড়াহাতে আঘাত করতেই ভেতরের হুড়কোটা দুটুকরো হয়ে ছিটকে পড়লো দূরে। ভয়ংকর শব্দ করে কপাটের দুধার আঘাত করল মাটির দেয়ালের দু'ধারকে। সে শব্দ ডুবিয়ে দিল ফাতেমার ভয়ার্ত আর্তনাদ। লাফিয়ে ঘরে ঢুকল নজুমিঞা। বড় বড় চোখে ফাতেমা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তার স্বামীর দিকে, ভয়ে বিস্ময়ে সে চাহনি হয়ে উঠেছে দ্যুতিহীন, পাথুরে। অগোছাল শাড়ির প্রান্ত ধরে ধরে চাঁদের আলো ওর অসংবৃত দেহকে অশ্রুহীন নির্লজ্জ যৌবনে উন্মুখ করে তুলেছে সেদিকে পর্যন্ত ফাতেমার খেয়াল নেই, চাঁদের আলোতে ওর স্বামীর ক্রূর মুখে চোখ জ্বলজ্বল করছে সাপের চাহনির মতো— দেখে ফাতেমা শিউরে উঠল। তবু চেতনা হলো না গায়ে কাপড় ভাল করে টেনে দেবার, মাথার আচল তুলবার। নিষ্পলক চোখে শুধু দাঁড়িয়ে রইল ঘরের কোণে। বাড়ির ভেতরের দিকে পুকুরঘাটে যাবার দরজাটা খোলার সংগে সংগে তীরের মতো দৌড়ে কে যেন ঐ পথ দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল!

চিৎকার করে উঠলো নজু : 'কে! কারে বাইর করি দিলি ইয়ানদি, জলদি করি ক, হারামজাদি ক' জলদি করি, নইলে গলাটিপি ঠাইৎ মারি হালাইউম!'

এবং তার পরেই উত্তরের অপেক্ষা না করেই পাগলের মতো খোলা দরজা দিয়ে উঠানে নেমে পড়ে পলাতক মানুষটির খোঁজে। ফাতেমা সম্বিত ফিরে পায়। বুঝতে পারে স্বামীর আকস্মিক প্রত্যাবর্তনের কারণ আর ঐ অবিশ্বাস্য উন্মত্ততার তাৎপর্য। স্বামীর বিরুদ্ধে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে এল পাতলা লাল ঠোঁট, চিকন কালো ভ্রূ। গায়ের ওপর শাড়ি ভাল করে গুছিয়ে প্রস্তুত হলো স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য। বাইরে কারো হদিস না দেখে নজু ঘরে ফিরে এসেছে। উত্তেজনায় থরথর করে তার গা কাঁপছে, দরদর করে ঘাম পড়ছে। চরম কর্তব্য স্থির করার আগে সে মরিয়া হয়ে একবার প্রশ্ন করল। 'বিছনাত হুতি আছিল কে ?'

'আই।' শান্ত সুরে জবাব দেয় ফাতেমা।

দম বন্ধ করে নজু আবার প্রশ্ন করে। 'তুই হতে হতে হুতি আছিলি ইয়ানো ? আরও তুই... এই দরজা খুলি বাইর অই গেল কে ?'

'আঁই একবার উঠছিলাম হোওনের ওক্তে, লাগানোর কথা মোনো আছিল না আর—'

'আরে আর ভারাইচ্ছারে হারামজাদি ? তোর গা উদাম করল কে হেইলে, তোর গার কাপড়ের প্যাঁচ হস্ করাইল কে ? তোর উদাম হ্যাতে উদাম গা আঁই ঘরে ঢুই দেই না ?'

চিৎকারে ব্যাঙ্গ কর্কশ হয়ে এল ফাতেমার গলাও— 'আঁই কি নটি নি! আঁই কি নটি নি ? সোয়ামীর ঘরে হুইতুম গা উদাম করে হুইত্তাম না কি ছালার ছট দি নিজেকে মুড়ি রাইখুম নি ?'

উভয়ের গলার স্বরে তখন প্রতিবেশীরা দু'একজন উঠে পড়েছে। জটলা বেঁধে কেউ কেউ ঘুম নষ্ট করে ঝগড়া শুনছে, উপভোগ করছে। সে ঝগড়ার তখন কোনও মুখোশ নেই। শালী নগর ও চেষ্টা নেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ইংগিত রহস্যে আঘাত করার। গলার স্বর সপ্তমে শব্দ প্রয়োগ আদিম হিংস্র বন্যতা।

তর্কের সীমা শেষ হয়ে এল এইখানে। সন্দেহের পুরো ভঞ্জন ঘটুক বা না ঘটুক সময় হয়ে গেছে সিদ্ধান্তের, সংকল্পের, কর্মের। হলোও তাই। নজু মিঞা বজ্র কণ্ঠে ঘাড়ের শিরা ফুলিয়ে ঘোষণা করল বিবির বিরুদ্ধে তালাকের ফরমান। একবার, দু'বার, তিনবার।

ফলাফলটা জানাবার পর পাড়াপড়শীরা গুটিগুটি করে সরে পড়ল যে যার ঘরে। নিশ্চিত হলো চরম পরিণতি সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট জ্ঞানলাভ করার জন্যে। ইমাম সাহেবের নির্দেশমতো তাদের চোখের সামনে দিয়ে পাড়ার মসজিদের একজন চলে গেল রূপসা গ্রামের দিকে। মেয়ের বাপকে খবর দিতে হবে। ফাতেমা বিবির তালাক হয়েছে, একেবারে তিন তালাক, পরিষ্কার। শুনেছে এমন তিনজন সাক্ষীর নামও সেখানে যোগাড় করা হলো। এরপর ফাতেমা বিবিও আর স্বামীর ঘরে একরাতও থাকতে পারবে না। কাল ভোরে ফরিদ মোল্লা আসবে। তালাক দেয়া মেয়েকে নিয়ে যাবে নিজের পাড়াতে। শ্বশুরবাড়ি থেকে ছাড়িয়ে।

তিন

ব্যাপারটা যত নীরবে নির্বিঘ্নে নির্ঝঞ্ঝাটে চুকে যাবে বলে সবাই গতরাতে আশা করেছিল। পরের দিন ভোর বেলায় দেখল ঘটনাটা একটা রীতিমতো উত্তেজনাপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। ফাতেমার আব্বা ফরিদ ব্যাপারী মেয়েকে নেবার জন্য বেশ প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। তার সঙ্গে এসেছিল তার প্রাণের মুখী তাহের মোল্লা। এই মৌলভি সাহেবই নাকি সবটা শুনে, তদন্ত তদারক করে ফতোয়া দিয়েছে যে তালাক নাকি কবুল করার যোগ্য নয়। যে তিনজনকে সাক্ষী হিসেবে সকর্ণে তালাক ঘোষণা শুনেছে বলে দাবি করে তাদের একজন নামাজ জানে না, একজন জেনেও একদম পড়ে না, আর একজনের আদম থাকলেও প্রায় রোজই দু-এক ওয়াক্ত একাজ ওকাজের জন্য বাদ দেয়। এরা সব মোনাফেক। মোনাফেকের সাক্ষীর ইসলামের চোখে কোনো মূল্য নেই। কাজেই তাদের সাক্ষী কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নয়। ফাতেমা বিবির বাপের গ্রামের তাহের মোল্লা তাই ফতোয়া দিয়ে দিলেন যে নজু মিঞার বিবি তালাক হয়নি। ফরিদ মিঞাও স্থির করলেন মেয়েকে তার সোয়ামীর ঘর থেকে কিছুতেই তিনি বার করে নিয়ে যাবেন না। কেউ জবরদস্তি বার করে দিতে চাইলে সেই মোনাফেকের শরিয়তের বিরোধী কার্যকলাপকে তিনি জান দিয়ে হলেও বাঁধা দিবেন।

ভিন গাঁয়ের মোল্লার এই উদ্ধত ফতোয়ার এই গায়ের ইসলাম হলো আহত। ইমাম সাহেবের সিদ্ধান্তকে এ রকমভাবে উড়িয়ে দেয়াতে নজু মিঞার প্রতিবেশীরা উত্তেজিত হয়ে উঠল। তারা অপেক্ষা করতে লাগল তাদের ইমাম সাহেবের নির্দেশের জন্য। এ অপমানের প্রতিকার তারা করবেই। ইমাম সাহেব আশেপাশের দু'দশ পাড়ার বিয়ের আর জমির মামলার সকল রকম দলির নথিপত্রাদির নাড়ি-নক্ষত্র ভাল করেই জানেন। প্রত্যক্ষভাবে নিজে সেগুলোর কর্মকর্তা না হলেও অন্তত দাওয়াতের কল্যাণে সব রকম কর্মক্ষেত্রেই তিনি উপস্থিত থাকেন। হঠাৎ ইমাম সাহেবও সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে রূপসা গ্রামের তাহের মোল্লার যুক্তি তিনি মেনে নিচ্ছেন তবে তাদের মোল্লাকেই মানতে হবে সে যুক্তির প্রতিটি ইশারা। নজু মিঞার বিয়েতে যে তিন ব্যক্তি সাক্ষী ছিল তাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করে করেই তিনি সমগ্র গ্রামবাসীকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, এদের একজন শরাব পান করে, একজনে জুয়া খেলে, অন্যজনে একটি দাগী চোর। মোনাফেক সাক্ষী রেখে যে বিয়ে মানা হয়েছে তাই কিছুতে কবুল করা চলে না। নজু মিঞার বিয়ে শরিয়ত মোতাবেক কোনও দিনই হয়নি। ফাতেমা বিবিকে দেহ সঙ্গিনী করে যে জেনার সম্পর্ক গত ছমাস ধরে গড়ে উঠেছিল সেটা সম্পূর্ণ অবৈধ। ধর্মের চোখে গুনাহ। যতক্ষণ এ বাড়িতে ফাতেমা থাকবে ততক্ষণ প্রতি লহমায় সে গুনাহ্র পরিমাণই শুধু বাড়বে। ফাতেমার বাবার তাই একমাত্র কর্তব্য মেয়ে যত শিগগির সম্ভব এ বাড়ি থেকে সরিয়ে নেয়। নইলে নজু মিঞাকে ধর্মের খাতিরে বাধ্য হয়ে কঠোর পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ধর্মের সংগে ত আপোস চলে না।

ততক্ষণে বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যায় নেমেছে। ফরিদ মোল্লার গ্রামের লোকেরও অনেক ভীড় হয়েছে নজু মিঞার বাড়ির উঠানে। লাঠি, সড়কির আমদানিও হয়েছে প্রচুর। তাদের গায়ের মেয়েকে যে ভিটে থেকে বার করে দেয় তারা দেখে নেবে। আল্লার কালামের বিরোধিতা করতে যারা আসবে তাদের গর্দান আস্ত রাখবে না এরা।

নজু মিঞার পাড়া-পড়শীরাও প্রস্তুত। ইমাম সাহেবের মেয়েকে ঘরে রেখে নিজেদের গ্রামকে তারা কলুষিত করতে কিছুতেই রাজি নয়।

কিছুক্ষণ তর্ক হলো। তারপর খোলাখুলি গালিগালাজ। চরম অবস্থায় হাতাহাতিও শুরু হয়ে গেল। দাও, বটি, লাঠি চলল এলোপাথাড়ি, ইসলামকে অপমানের হাত থেকে বাঁচাতে, গ্রামকে কলঙ্কিনী নারীর সংগ থেকে গিয়ে শুরু হলো একটা মুক্ত অথচ রক্তাক্ত হাঁক। শান্ত হয়ে রণাঙ্গন থেকে সবাই ছুটল থানায় খুন জখমের কথা ডায়রি করে আসতে। এ ওর বিরুদ্ধে মোকদ্দমার নালিশ সরকারীভাবে পাকাপাকি করে রাখবার জন্য।

নজু মিঞার গ্রামে এই দাংগায় গুরুতরভাবে একজন, মোট আহত হয়েছে এগারজন। ও পাড়ার আশংকাজনকদের সংখ্যা তিন, এমনি জখমের সংখ্যা একুশ জনের মতো। নজু মিঞার বিরুদ্ধে ফরিদ মোল্লার, আবার শ্বশুরের বিরুদ্ধে জামায়ের দু'তরফ থেকেই আদালতে নালিশ দাখিল করা হলো। উভয়ের অভিযোগই নরহত্যা ও তার উস্কানিকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে একে অন্যের বিরুদ্ধে।

চার

সমস্ত ঘটনাটা সম্পূর্ণ শুনে আদালতের নতুন মুসলমান হাকিম কিংকর্তব্যবিমূঢ়। বিচরাসনে এসে হাকিম বিস্মিত হতবাক! কার জন্যে কী শাস্তির বিধান হবে তার হদিস না পেয়ে হাকিম

যেন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে সবাইকে হকচকিয়ে যে রায় করলেন সেটা আরও আশ্চর্যকর।

সবাইকে বাদ দিয়ে কেবল দু'পাড়ার দুই ফতোয়া জারি মৌলভি সাহেবের বিরুদ্ধে ঘোষিত হলো রাজদণ্ড। করিম মোল্লা আর ইমাম সাহেবের দীর্ঘ ছমাসের জন্যে সশ্রম কারাদণ্ড বরণ করতে হবে।

পাঁচ

হাকিম শত হলেও এ যুগের বিচারক। মোগল যুগের কাজির বিচার হলে দণ্ডবিধানের রূপটা নিশ্চয়ই আরও সূক্ষ্ম ও স্পষ্ট হত। কই হাকিম তো দুই মৌলভির কারাগারে অবস্থান সম্পর্কে তেমন পরিষ্কার কিছু নির্দেশ দিয়ে দিল না। হুকুমের চাকর পুলিশ যদি কিছু না বুঝে কারাগারের একই কক্ষে দুই মোল্লাকে এক সাথে আটক করে রাখে— তখন?

মানুষের জন্য

আত্তাহিয়াতো শেষ করে কেবল ছালাম ফিরিয়েছেন, মোনাজাতের জন্য তখনও হাত তোলেননি। বাইরে রাত কেটে আলো ফুটেছে কিন্তু ফিনকি দিয়ে সে আলোর ফালি ছড়িয়ে পড়ে নি তখনও। ফজরের নামাজের প্রান্তে মোনাজাতের আদ্যক্ষণে প্রকৃতির সমস্ত সাদা পবিত্রতাকে চিরে ছিঁড়ে খান খান করে উত্তর বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে আকাশের দিকে উঠে গেল একটা বিকট অশ্রাব্য সম্ভাষণ। চৌধুরী বাড়ির মুন্সি আফজাল সাহেব জায়নামাজের উপরই একবার মুখ বিকৃত করে ফেললেন সে শব্দে। চেষ্টা করলেন, দু'কানকে কিছু না শুনিয়ে শূন্যে এমনি ঝুলিয়ে রাখতে। প্রাণপণ চেষ্টা করলেন জোড়া হাতের প্রশস্ত গহ্বরে মনকে নিমজ্জিত করে আল্লাহর কাছে পৌঁছুতে। পৃথিবী থেকে পালিয়ে সম্পূর্ণ মায়ামুক্ত দিল দিয়ে চাইলেন জলদি জলদি মোনাজাত খতম করতে।

আফজাল সাহেব পরহেজগার মুসল্লি হলেও এমন কিছু সুফি আউলিয়া ছিলেন না, কাজেই মোনাজাত করবার সময়ও উত্তর বাড়ির প্রাঙ্গণ থেকে ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর তিনি সর্বক্ষণ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন। ছদুমিঞার যেমন গলা তেমনি ভাষা। অর্থজ্ঞাপক অঙ্গভঙ্গিও যে নিশ্চয়ই সব সময় ভাষা প্রয়োগকে টীকা হিসেবে অনুসরণ করে চলছিল তাও আফজাল সাহেব অজুকরা রেখাঙ্কিত হাতে স্পষ্ট দেখতে পান।

ছদুমিঞা গালি দিচ্ছে। লক্ষবস্তু বাড়ির কেউ। বেশি দূর হলেও সে নিশ্চয়ই পাঁচ-দশ হাতের মধ্যেই উপস্থিত আছে, কিন্তু গলার স্বর গ্রামের দূরতম গৃহকোণের গভীরতম নিদ্রায় মগ্ন মানুষকে হঠাৎ উচ্চকিত করে তোলবার পক্ষে যথেষ্ট। আর যে বিষয়বস্তু সে কণ্ঠ দিয়ে নিঃসৃত হচ্ছিল, তার ভাবার্থ হয় না। দ্বিতীয়বার পুনরাবৃত্তিও সম্ভব নয়। যেমন তার বেগ, তেমনি তার আবেগ। সে গালিগালাজ দুপুর অবধি চললেও মনে হবে যেন ছদুমিঞার নিরবচ্ছিন্ন প্রথম বাক্যটাই ব্যাকরণসম্মতভাবে এখনও শেষ হয়নি। প্রতি উচ্চারণেই সে একটা করে নতুন যৌন সম্পর্ক স্থাপন করছে। এই মুহূর্তে নিজের আপন ভাইকে, মাকে, বৌকে, বোনকে সম্বোধন করছে নিজের ঔরসজাত সন্তান বলে। আবার পরমুহূর্তেই এদের প্রত্যেকের আগত এবং অনাগত প্রতিটি সন্তানের দেহসঙ্গত জন্মদাতা বলে নিজের দাবিও জানিয়ে রাখছে নির্বিকার চিত্তে।

তছবির ছড়া লম্বা কোর্তার পকেটে পুরে আফজাল মুন্সি এবার উঠে দাঁড়ালেন। আকাশ ভরে এখন ছদুমিঞার কণ্ঠস্বর, সে বিষ ঠেলে আরো ওপরের কোনও পুণ্যস্তরে ভক্তের পবিত্র আর্তনাদ হয়তো পৌঁছবে না। ছদুমিঞার প্রতিটি স্পষ্ট উক্তি কখন যেন অলক্ষ্যে পিছলে ঢুকে পড়েছে মুন্সি সাহেবের মনের মধ্যেও চকচকে সাপের পিঠের মতো ইচ্ছেমতো কিলবিল করে বেড়াচ্ছে এখন।

চারদিক আবার শান্ত না হলে খোদার কথায় মন দেওয়া মুন্সি সাহেবের পক্ষে সম্ভব নয়। নামাজের পাটি থেকে উঠে খড়মজোড়া পায়ে দিলেন। পুকুরের ডান পাড় দিয়ে ধীরে ধীরে

অগ্রসর হলেন উত্তর বাড়ির দিকে। অনেক রকম বিলাপ ও গর্জনের মধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে শুধু ছদুমিঞার কণ্ঠ— একাগ্রচিত্তে শুনছেন। আর তার খণ্ড খণ্ড সূত্র ধরে প্রাণপণে বুঝতে চেষ্টা করছেন পুরো ঘটনাটা।

উত্তর বাড়ির আঙ্গিনায় ঢুকে মুন্সি সাহেব আরো হকচকিয়ে গেলেন। ছদুমিঞা একটা ভাঙা পুরানো নৌকার বৈঠা তুলে বারবার চেষ্টা করছে পাশের বন্ধ দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে। হুঙ্কারে হুঙ্কারে ঘোষণা করছে, হত্যা করার অটল সঙ্কল্প। সঙ্গের মসজিদে যারা নামাজ পড়তে এসেছিল তারাই ভিড় করে রয়েছে ছদুমিঞাকে ঘিরে। ৪/৫জন চেপে ধরে রেখেছে অসম্বৃত লুঙ্গিতে আধঢাকা, কামিজহীন, ছদুমিঞার স্ফীত মাংসপেশীর ঘর্মাক্ত কালো বলিষ্ঠ দেহটাকে। কেউ তাকে উপদেশ দিচ্ছে, কেউ হুমকি, কেউ অনুনয়ও করছে। কিন্তু ছদু অপরিবর্তিত, শরীরে, আওয়াজে, ভাষায় ভয়ঙ্কর রকম বে-সামাল।

মুন্সি সাহেব বুঝলেন, বন্ধঘরের মধ্যেই এমন একটি লোক আছে, যাকে ছদু খুন করতে চায়, কিন্তু কেন ? আশ্চর্য. আজ উঠানের একটি লোকও মুন্সি সাহেবের শান্ত, সৌম্য গম্ভীর মুখ দেখে একবারের জন্য সসম্ভ্রমে ছালাম জানাল না। তিনি দাঁড়িয়ে আছেন দেখেও কেউ একটি পিঁড়ি এনে দিল না। অথচ এই মুন্সি সাহেবের মুখের কথা এ গাঁয়েই শরিয়তের শেষ ফতোয়ার মতো মান্য। উত্তেজনায় এত বে-খেয়াল হয়ে আছে সবাই। এমনি নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ আর এমন চাঞ্চল্যকর দৃশ্য দেখা চলে। মুন্সি সাহেবেরও ধৈর্যের সীমা আছে, কৌতূহলের শুরু হয়। একবার মুন্সি সাহেব ইশারা করে একে ডাকেন, আবার ওকে। আদ্যপান্ত সবটা ঘটনা জানার জন্য মুন্সি সাহেব ব্যগ্র, চঞ্চল, রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন।

কয়েকমাস আগে ছদু ক্ষেতে গেছে ধান নিড়াতে। রান্নাব কাজ সেরে তফুরী বিবি ঘরের দাওয়ায় বসে প'টি বুনছিল। স্বামীর কিশোরী ছোটবোন হঠাৎ কোত্থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ভাবির গলা জ'ড়িয়ে ধরে আদর করতে লাগল। একটা বেতের চাঁছা লতা ঠিক ঘর মত বসাতে যাবে এ'ন সময় ননদের আকস্মিক সোহাগ এসে বাধা দিল কাজে। কৃত্রিম রাগের ঢঙে ধমকে উঠ'ো— 'এইলা উলালে দেখি একছার বাছছ না আর। তোর কি আইজ হাঙ্গা লাইগছে নি। ছা'ড়, গলা ছাড়ি দে'।

'একখানে এ্যাক 'জার ছিজ দ্যেই আইছি ভাবি, কইত্যাম ন্য আঁই'।

মজার জিনিস আবিষ্কার করে যে অত উৎফুল্ল হয়ে ভাবির কাছে তা প্রকাশ করতে ছুটে আসে, সে জিনিস সম্পর্কে কিছুই গোপন রাখা যে ফজিলতের উদ্দেশ্য নয়, একথা বোঝা পানির মতো সোজা। বরঞ্চ প্রথমে রহস্য সৃষ্টি করে, পরে প্রকাশের ইচ্ছের মধ্যে একটা কিছু স্বার্থ লুকোনো থাকা সম্ভব। তফুরীর কল্পনা মিছে নয়। ভাবিকে চুপ করে থাকতে দেখে ফজিলতই আবার গায়ে পড়ে বলে।

'এক খাওনের জিনিস, বড় মজার। হুইনলেই জিহ্বাৎ হানি আইব'। ভাবি তবু বেশি উৎসাহ প্রকাশ করে না। দীর্ঘ নিটোল বাহুতে ঢেউ তুলে বেতলতা ঘরে ঘরে টানা দিতে থাকে। ফজিলত কানের কাছে মুখ লাগিয়ে ফিসফিস করে এবার সব বলেই দেয়। এইমাত্র অন্দরের ঘাটলা দিয়ে পানি তোলবার সময় সুপারির খোলের পর্দার ফাঁক দিয়ে সে অমন অতুলনীয় লোভনীয় দ্রব্যটি আবিষ্কার করেছে। মোটা ফুটফুটে এক থোকা ঝুলমান বেতফল, শত্রুর চোখে ধুলো দিয়ে যার প্রতিটি ফল ফুলেফুলে নধর হয়েছে ইচ্ছে করলেই নাকি সেই থোকাটা

খুব সহজে এখনই পাড়া যায়। ডাগর কাল চোখ নাচিয়ে ভাবিই এবার ননদকে আদর করতে শুরু করে দেয়। মেটে হাঁড়ির তলার কালি আর বাটা মরিচ নুনে ঝাকিয়ে নিলে যে অদ্ভুত তার আসবে ঐ বেতফলের টকেঝালে সেই কল্পনাতে উথলে উঠে ভাবি। ফজিলতের পরামর্শ কল্পনাকে নিকট বাস্তবে নিয়ে আসে—

'আঁই আঁকশি বান্ধি ঠিক করি রাইখছি। গেলে অনই উডন লাহগব। হইর কিনারে গোছলের ভিড় জইমলে হেই ওক্তে আর ব্যাত ঝোপের পর্দায় কুলাইত না'। ভাবিও তৎপর হয়ে ওঠে। ফজিলতের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলে ঘাটলার দিকে। কর্মে এত প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ফজিলতের একটা আপত্তি আছে, 'আঁই ছাট-দেয়ালের হেই কিনারে দিনে দুফরে গেলে মায়ে হ্যাদাইবো' একটু থেমে সে-ই আবার প্রশ্ন করে, 'আইচ্ছা ভাবি, হেইদিনত হাললম দিন পাড়া চরি বেড়াইতাম, এই কদিনেই আই এমন কিইবা ডাঙ্গর হই গেলাম'। মার উদ্বেগ ও সাবধানবাণীর তাৎপর্য তফুরী বোঝে, ফজিলতের গালে দুটো টোকা মেরে ছন্দ মিলিয়ে, অঙ্গ দুলিয়ে বলে, 'তোর যে দুই দিন বাদে হাঙ্গা'।

বিয়ের কথায় কিশোরী ফজিলত লাল হয়ে চোখ বুজ ফেলে। এটা ত আর ঠাট্টা নয়, এ সত্য কথা। ও নিজেও জানে। হাঁড়ির কালি, বাটা মরিচ, নুন এবং আরো অন্যান্য সরঞ্জাম ঠিক করবার নির্দেশ দিয়ে তফুরী ঘাটলার পথে পা বাড়ায়। ফজিলত তার আবিষ্কৃত রহস্যের চাবিকাঠিটা শেষবারের মতো ছুঁড়ে মারে, চিৎকার করে। 'বাইর বাড়ি দি যান ভাবি, হুইর কিনার দি। কাঁডল গাছের হোচ্ছম দি রেইনলেই সামনে বেত্যার থোব দেইবেন'। যেতে যেতে মাথা নাড়িয়ে ভাবি আঁকশিটা তুলে নেয়। শাশুড়ির উপস্থিতি হঠাৎ কোনো বিস্ময়কর দুর্যোগ ডেকে না আনে, এই ভয়ে ত্রস্তপদে তফুরী মিলিয়ে গেল ছাট দেয়ালের ওপাশে। যাবার ভঙ্গিটার কথা ফজিলত কিন্তু তখনও ভাবছে। ভাবির রূপ যেন থেমে থাকতে চায় না কখনও। বড় বড় পা, বড় বড় হাত, বড় চোখ, বড় চুল, একটুখানি নড়লেই রূপ যেন সারা সাদা অঙ্গে টলটল করে নাচতে থাকে। ফজিলত একবার মনে মনে ভাবে, কিসের জোরে ভাবি শ্বশুরবাড়িতেও দিগ্বিজয়ী রানীর মতো বেপরোয়া চলাফেরা করে। সেকি শুধুই রূপের জোরে, না আর কারও সোহাগ বর্ম হয়ে ঘিরে রয়েছে ভাবিকে ? ছদুভাই ভাবিকে আর ভাবি ছদুভাইকে এত ভালবাসে যে, ফজিলত পর্যন্ত মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যায়, তার তৃপ্তিহীন, সীমাহীন, কুল-কিনারাহীন উচ্ছ্বাসের কথা কল্পনা করে।

দুটো মাটির হাঁড়ির সরাকে মুখোমুখি উপড় করে চেপে ধরে ভাবি-ননদে ঝাকুনি দিয়ে তৈরি করেছে বেতুই ফলের ভর্তা। ভাবি এত মশগুল হয়ে আছে যে, বেতের কাঁটায় ছিঁড়ে যাওয়া শাড়ির আঁচলটা পর্যন্ত স্বামী বা শাশুড়ির চোখ থেকে আড়াল করার চিন্তাটুকুও নেই। ভাবি-ননদ কাড়াকাড়ি করে খায়। মন্তব্য প্রকাশ করে, কালির ঝুলে বেতফলের কাঁচা কষ কতটা কেটেছে আর কতটা রয়ে গেছে। ফজিলত অল্পক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারে যে, ভাবির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জেতা তার পক্ষে সম্ভব নয়। গালের মধ্যে মস্ত একদলা ভর্তা আঙুলের পাতা থেকে পাতলা জিবের ডগা দিয়ে ভাবি তুলে নিচ্ছে। তারপর আশ্চর্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে ঠোঁট দুটো স্বল্প জোরে সংযুক্ত করেই এক কোণের একটুখানি শিথিল পথ দিয়ে পুটপুট করে এক গাদা স্বাদহীন মসৃণ দানা জিব দিয়ে ঠেলে বের করে দিচ্ছে। ঝগড়া শুরু করে দেয় ফজিলত। লাভ হচ্ছে না দেখে জোরাজুরি, তাতেও হেরে যাচ্ছে দেখে এবং ভাবি নির্বিকার চিত্তে নির্মম বেগে খেয়েই যাচ্ছে বুঝে ফজিলত ফুপিয়ে শুরু করে তার অপরাজেয় সংগ্রামের

প্রথম পাঠ। নাছোড়বান্দা ভাবি ভর্তার সরাসহ ছুটে সরে পড়তে চাইল রণক্ষেত্র থেকে। মরিয়া হইয়া ফজিলত ভাবির ফুলে ওঠা উড়ন্ত আঁচল শূন্য থেকে সাপটে ধরলো। চোখের পলকে এক হেঁচকা টানে ফস করে ওর ক্ষুদে মুঠো থেকে বেরিয়ে গেল আঁচল, উড়ে চলে গেল ভাবি। শুধু যাবার সময়ের সামান্য অ-সাবধানতার জন্য মাটির সরাটা পড়ে খানখান হয়ে গেল। শব্দ শুনে হাঁ হাঁ করে একদিক থেকে বেরিয়ে এল মা, দৈবক্রমে ঠিক সে সময়ে বার থেকেও লাঙ্গল কাঁধে আঙিনায় প্রবেশ করল কর্মক্লান্ত পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত ছদু। সুন্দরী স্ত্রীর পলায়ন গতিটুকু দেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মুচকি হাসতে লাগল। মনে মনে মরণ ক্ষুধার মধ্যেও নিজের খোশ নসিবের জন্য খোদার কাছে একবার শোকরগুজারি করল। লাঙ্গলটা উঠানের কিনারে রেখে, বৌর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে ডাকল। ভাত বাড়ার জন্য জানিয়ে দিল ক্ষিদেয় সে মরে যাচ্ছে। মা তখন ফজিলতকে জেরা করছে, সরা ভাঙল কে ? বেতুই ফল পাড়তে খোলা পুকুরপাড়ে গিয়েছিল কে ? বৌর দুঃসাহস যে কুলটা রমণীর পুকুরপাড় ধরে প্রান্তরে পা বাড়াবার পূর্বাভাস মাত্র, সেটা বেশ জোরে জোরেই রূপসীর স্বামীকে শুনিয়ে দিল। একে পেটের মধ্যে ক্ষিদে নাভিমূলে মোচড় দিতে দিতে ব্যথা তুলে দিয়েছে, তায় মা'র ঐরকম সুউচ্চ কণ্ঠের হৃৎকাঁপানো মিথ্যে কটাক্ষ। ছদুমিঞার মেজাজটা গরম দুধে লেবুর মতো রাগে ঝাঁজে ভরে উঠল। আরো বেশি কিছু শুনতে হয়, এই ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বাইরের ঘাটলায় হাত-পা ধুতে চলে গেল। কিন্তু শব্দ বাতাসে ভর করে চলে, যত বেশি জোরে সাড়া দেবে, ততই বেশি দূরে ধেয়ে যাবে। মা তখন বৌর শাড়ি ছেঁড়ার পর্ব শুনেছেন মাত্র। ভস্মীভূত বিষ তাঁতানো জিব থেকে জ্বলন্ত আগুনের হলকার মতো বেরুচ্ছে। শাড়ি তো আর এমনি সব সময়ে ঘোমটা হয়ে বৌর মাথায় পড়ে ছিল না। কাঁটায় যখন শাড়ি একবার আটকে ছিল, তখন নিশ্চয়ই শাড়ির সে অংশটা হয় বৌ'র গায়ের উপর ছিল, নয় গাছের উপর ছিল। একই সময় একই শাড়ির আঁচল তো দু'জায়গায় থাকতে পারে না। আর গাছে আটকেই ত' শাড়ি ছিঁড়ে যায় নি, বৌ নিশ্চয়ই তাড়াহুড়ো করে টানাটানি করেছে বলেই ফেড়ে গিয়েছে। গাছে কারো শাড়ির প্রান্ত অভ্যাসভাবে আটকে গিয়ে থাকলে পুকুরপাড় থেকে— হয়তো রহিম মোল্লা হা করে মানুষটাকে দেখেছিল— নইলে বৌ তাড়াহুড়ো করে হেঁচকা টানে আঁচল ছিঁড়বেই বা কেন ?

ছদুমিঞা রান্না ঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে বৌ'কে আর একবার ডাকল কর্কশ ঝাঁঝাল কণ্ঠে। নিছক ক্ষুধাতুর মানুষ— স্বামী নয়, প্রেমিক নয়, যেমন করে তার রাধুনীকে ডাকে। মাথায় কাপড় টেনে রক্তিম মুখে মাথা নিচু করে এগিয়ে এল তফুরী। এক হাতে সরাটা পরিচ্ছন্ন করে ধোয়া। কিন্তু ঘরে ঢুকেই তফুরী থ বনে যায়। চোখ-মুখ তার ফেকাশে হয়ে আসে। হাতের ভাল সরাটাও খসে পড়ে গিয়ে চৌচির হয়ে যায়। ছদু ততক্ষণে ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছে। সেও দেখল ভাত আর তরকারির হাঁড়িটা খোলা পেয়ে পোষা বিড়ালটা আর রাস্তার একটা ঘেয়ো কুকুর নির্বিবাদে মুখ ঢুকিয়ে মাছ আর ভাত ছপছপ করে খাচ্ছে। ছদুর মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা খুব প্রয়োজনীয় রগ বুঝিবা অতিরিক্ত রক্তচাপ সহ্য করতে না পেরে ছিঁড়ে ফেটে পড়ল। তফুরী চোখের পানি ঠেলে রেখে কোনরকমে একবার বলতে চেষ্টা করল, অল্পক্ষণ মধ্যেই সে কিছু চাল ফুটিয়ে নেবে। এই এক ছিলিম তামাক শেষ না হতেই সে আবার ভাত বেড়ে আনছে। ঠায় অমনি চুপ করে ঠিক কতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, তা ছদু নিজেও বলতে পারবে না। আচমকা সে চিৎকার করে উঠল বিভৎসভাবে। রাগে ক্ষুধায় কাঁপতে কাঁপতে ছদ যা

উচ্চারণ করল, তার মর্ম স্পষ্ট। এখন কেন, কোনোদিনই আর এই চুলোয় তফুরীকে ভাত চড়াতে হবে না। সে তাকে মুক্তি দিচ্ছে। তফুরী স্বচ্ছন্দে ফুল কাঁটায় আঁচল আটকে মাথার কাপড় বুকের নিচে ফেলে এখনই পুকুরপাড় ধরে রহিম মোল্লার হাতে হাত রেখে প্রান্তরের পথে পা বাড়াতে পারে। তফুরী চিৎকার করে দুহাত দিয়ে মুখ চেপে ধরতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু ততক্ষণে চরম বাণী ছদু উচ্চারণ করে ফেলেছে। তালাক। তাও সোজা সহজ কিছু নয়, একেবারে তিন তালাক।

উঠান থেকে মা আর মেয়ে আচম্বিৎ এমন সাংঘাতিক ঘোষণা শুনে শিউরে আঁৎকে ভয়ার্ত আর্তনাদ করে দৌড়ে ছুটে আসে। বাইরের প্রাঙ্গণ থেকে ছুটে এল ছোটভাই ফজু। সঙ্গে আরো দুএকজন প্রতিবেশী। কিছুক্ষণ আগের তুমুল ঝগড়ার কথা মুহূর্তের মধ্যে ভুলে গিয়ে হায় হায় করে ঘরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ল মা আর মেয়ে।

তফুরী অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে মেঝের ওপর। ছদু বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে সেদিকে। এগিয়ে এসে ঐ সোনার শরীরকে স্পর্শ করার সাহসটুকু পর্যন্ত তার উবে গেছে। বাজপড়া মানুষের মতো সে শুধু খাড়া হয়ে আছে। নিশ্চল দাঁড়িয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে চোখের পলকে কোত্থেকে কী করে এ কাণ্ড হয়ে গেল। মা-মেয়ে পাড়া-প্রতিবেশিনীর সহানুভূতিসূচক বিলাপ আর কান্নার করুণ ঐকতানের মধ্যে ধীর শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে এল বয়সে কম কিন্তু বুদ্ধিতে প্রবীণ, ছোটভাই ফজু। কেবল সেই উপলব্ধি করছিল যে ছদুর নিশ্চুপ তন্ময়তা অস্বাভাবিক ও ভয়ংকর। কিছু না বলে সে বড়ভাইকে টেনে বার করে নিয়ে গেল, বহু কান্নার ফোঁপানিতে দমবন্ধ ঘরের গুমোট আবহাওয়া থেকে।

নিজের হঠকারিতায় যে বুকভাঙা ঘটনার সৃষ্টি করেছে, তার জন্য অনুতাপে শোকে কাহিল ছদু সারা দুপুর কারো সঙ্গে কথা বলতে পারেনি। রহিম মোল্লাও সবটা শুনে ফতোয়া দিয়েছে শরিয়ত মোতাবেক। তিন তালাকের কঠিন বিধি-নিষেধ ছদুমিঞার মহব্বতের জন্য শিথিল করে দেয়া সম্ভব নয়। ঠিক হলো, পরের দিন লোক এসে তফুরীকে তার বাপের বাড়ি নিয়ে যাবে।

গভীর রাতে নিদ্রাহীন ছদুমিঞার বিছানার প্রান্তে এসে ফজু বসল। ফজু থাকে পশ্চিমের ঘরে। এঘরের ভাইরের সঙ্গে তার সম্পর্ক মূলত আর্থিক ও সাংসারিক। নাড়ি আর পরিবারের বন্ধনটাকে গতবছর সে অনেকখানি শিথিল করে দিয়েছে। তখন মেজাজ তার সব সময় একটু রুক্ষ থাকলেও ভেতরে ভেতরে সে ছিল বেজায় রসিক। হপ্তায় হপ্তায় গঞ্জের হাটে, ফুলেল তৈল মেখে, ঢেউ পাটের সিঁথি কেটে একটু গান বাজনা ও ফূর্তির আসরে না বসলে তার চলত না। একবার কিছু সুপারি চুরি করে বেচতে গিয়ে ভাইর কাছে ধরা পড়ে যায়। জোয়ান বড়ভাইয়ের হাতে সেদিন প্রচুর মার খেয়েছিল। তারপর থেকেই নাকি তাকে আর কেউ কোনোদিন কোনো রকম হাসি-তামাশার হল্লায় দেখেনি। এর কিছুদিন পর সে নিজেই উদ্যোগ করে জায়গা-জমি সব ভাগ করিয়েছে। কিন্তু পাড়ার দশজনে মিলে দু'ভাইয়ের জমির যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়েছে ফজুমিঞার তা মোটেই পছন্দ হয়নি। তার ধারণা, গ্রামবাসীরা তাকে অপছন্দ করে বলে বড়ভাই তাদের সঙ্গে একজোট হয়ে ষড়যন্ত্র করে তাকে ঠকিয়েছে। বেছে বেছে তার ভাগে ঠেলে দিঁয়েছে যত পড়ো, অজন্মা জোলো-জংলা জমিগুলো। লোকে বলে, সে নাকি আব্বার কবরের ওপর দাঁড়িয়ে রোজ রাতে বিড়বিড় করে আজও ভাইর বিরুদ্ধে নালিশ জানায়, গজব দেয়। প্রতিশোধের জন্য ক্ষমতা মাগে। ছদু

অবশ্য এ সব প্রচারের কিছুই বিশ্বাস করে না। সে দেখেছে ফজু কেমন ধীরে ধীরে সুস্থ, শান্ত, কর্মঠ হয়ে উঠেছে। ছদু ঠিক করেছে, ওকে স্বেচ্ছায় আরো কিছুটা জমি ছেড়ে দেবে। ফজুমিঞা ভাইয়ের মুখের দিকে কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলল, 'আইন্যে যদি আঁরে বিশ্বাস করেন ত একটা কতা কইতাম হারি'।

'কী' ?

'ভাবিরে এক দিনের লাই বিয়া করি আঁই ছাড়ি দিমু। কারোত্তন কিছু না কইলেই শাইরবো। এক লগে হুইতলেও আল্লার দোহাই'।

দড়মড় করে লাফিয়ে উঠল ছদু। তার মায়ের পেটের ছোটভাই। হোলোই বা তালাক দেয়া বৌ, তাই বলে বড়ভাইয়ের অনুরোধে তিনমাস দশদিন পর তাকে একটা লোক দেখান বিয়ে করে একরাত মন ভুলানো ঘব তার সঙ্গে পেতে সবার চোখে ধুলো দিয়ে সে যদি পরের দিন তাকে তালাক দিতে পারে ? রাতের বেলায় অর্গল দেয়া দুয়োরের ফাঁক দিয়ে রহিম ত আর উঁকি দিয়ে থাকছে না ? আনন্দে উল্লাসে ছদু বুকে জড়িয়ে ধরে ছোটভাইকে। অস্ফুট কণ্ঠস্বর আবার বুঝিয়েও বলে যে, তালাক তার ত সত্যি সত্যি হয় নি। দিল দিয়ে সে তালাক দেয়নি। কাজেই ফজু যেন বিয়ের রাতেও তফুরীকে ভাবির সম্মান দেখায়। ভাবি, ভাবি, কে না জানে ভাবি মায়ের সমান।

ঠিক তিনমাস দশদিন পর গতরাতে তিনজন সাক্ষী আর একজন মোল্লা নিয়ে ব্যাপারটা তারা এত চুপচাপ সেরেছে যে মুন্সি সাহেব পর্যন্ত একদম টের পান নি। ফজুর সাথে তফুরীব বিয়ে হয়ে গেছে। ভোররাত থেকেই তিনজন সাক্ষীসহ ছদু প্রান্তের আঙিনায় অপেক্ষা করছিল ফজুর জন্য। সকাল বেলাই ফজু তালাক দেবে তার নয়া বিবিকে, পুরানো ভাবিকে। কিন্তু ফজু হঠাৎ ভোরবেলা দরজা খুলেই নাকি ভাইকে দেখে বুহদিন পর তাব বাজারের সেই পরিচিত পুরাতন অট্টহাসিতে চমকে দিয়েছে সব্বাইকে। তারপর চিৎকার করে বলেছে— 'তালাক আঁই দিতান ন্য। দিতান ন্য। ব্যাক ভালা বালা জমির টুকরা আঁরে ভাড়াই আননে লই গ্যাছেন, ইয়াদ আছে হেই কথা ? হে— হে— হে। আইজ আননের ব্যাকেরতন ভালা জমির টুকরা আঁই হাইছি। এইডা আঁই ছাড়ুম ক্যা ? ছাইড়তান ন্য, আই ছাইড়তান ন্য'।

ছদুর শ্রেষ্ঠ সম্পত্তির টুকরো সে যখন আজ একবার মুঠোর মধ্যে পেয়েছে, তখন জান গেলেও ফজু তা ছাড়বে না। সঙ্গে এটুকুও জানিয়ে দেয়, 'হেই লগে এইডাও হুনি রাখেন ভাইজান, জমির লগে জমির ফসলও যায়, বুইজছেন ? আঁর জমিৎ আমনে ফসল কইল্লান ক্যা হেইডাও আঁই দিতান ন্য। গলা টিফি মারি হালাইয়ুম।' ছদুর অনাগত সন্তানকে পর্যন্ত সে গলাটিপে মেরে ফেলতে চায়। বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে ছদু তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছে। হাতের কাছে শক্ত যে জিনিসটা ছিল সেটা নিয়েই সে ছুটল ফজুকে খুন করতে। সড়াৎ করে ঘরের ভেতর ঢুকে ফজু দরজা বন্ধ করে দিয়েছে, কয়েকজন এসে চেপে ধরেছে ছদুমিঞাকে। চিৎকারে ছদুর গলা দিয়ে যেন রক্ত বেরুচ্ছে, চোখ যেন উলটে বের হয়ে আসতে চায়।

সবটা ঘটনা বুঝতে পেরে মুন্সি সাহেবের শুভ্র দাড়ি উত্তেজনায় স্ফীত নাসার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেঁপে ফুলে উঠল। সত্তর বছরের দুর্বল দেহটাকে হঠাৎ টান দিয়ে সিটিয়ে শক্ত সবল করে ফেললেন এক ঝাঁকুনিতে। তার আচম্বিতে পায়ের খড়ম জোড়া হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ছদুমিঞার ওপর। সকলে হতবাক হয়ে শুনল মুন্সি সাহেবের গালাগালি— অশ্লীল, অকথ্য,

অশ্রাব্য। গ্রামবাসীর দৈনন্দিন উত্তেজনার আদিম বুনো পরিভাষা। বল্গাহীন, উদ্দামতার স্রোতবেগ।

'আরামজাদা, জারুয়া— শরিয়ত তোগো লাইন্য, তোগো, লাই শরিয়তন্য। হাইওয়ান জানোয়ারের লাই শরিয়ত হয় ন্য— শরিয়ত হইছে মাইনষের লাই।'

দম বন্ধ করে মুন্সি সাহেবের এই অভূতপূর্ব ব্যবহার দেখতে থাকে সবাই। ছদু নিজেকে খড়মের পিটুনির হাত থেকে বাঁচাতে ভুলে গিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে মুন্সি সাহেবের অস্বাভাবিক চেহারার দিকে চেয়ে থাকে, মুন্সি সাহেব প্রচণ্ড চিৎকার ফেটে পড়েন— 'মজুর মান্দার আরামজাদ কোনানকার। আরামজাদ বিয়া কইছত ক্যা? বিয়া করছ ক্যা? এইডাও জানছ না যে হেইড্যা মাইয়া হোলার উপর তালাক লাগে না— হ্যাডে হোলা থাইকলে তালাক অয় না। হেই কথা না জাইনলে তালাক দ্যাছ ক্যা? শরিয়ত মানছ ক্যা? আইজো মানুষ হ। মানুষ হ। শরিয়ত মাইনষের লাই, হাইওয়ান জানোয়ারের লাইন্য'।

মুন্সি সাহেব আর পারেন না। হাঁপাতে থাকেন। ক্ষোভে, ক্রোধে চোখ ভেঙে তাঁর পানি গড়িয়ে আসে। সন্তানবতী নারীকে যে কখনই তালাক দেয়া যায় না এই নতুন তথ্য শুনে উত্তরবাড়ির প্রাঙ্গণ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। সব উত্তেজনাহীন, কোলাহলহীন, নীরব। সব্বাই এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ছদুমিঞার দিকে। ঘট করে একটা শব্দ হতেই দরজা খুলে নতুন লালশাড়ি পরা তফুরী বেরিয়ে এল ঘর থেকে আঙ্গিনায়, এক পা-এক-পা করে এগুতে লাগলো ছদুর দিকে। নিতান্ত অনভিপ্রেত একটা রূপ ভোরের পাকাধানী আলোতে বারবার কম্পিত তার চুলে, চোখে আঁচলের প্রান্তে। আর ছদু আজ থেকে তিনমাস দশদিন আগে ঠিক যেমন অর্থহীন মরা চোখে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখছিল তফুরীর ভূলুণ্ঠিত অজ্ঞান দেহটাকে— সেই অকম্পিত চোখ জোড়াই সে আজও আবার মেলে ধরল মুন্সি সাহেবের মুখের ওপর মানুষের জন্য, হাইওয়ান জানোয়ারের জন্য— একথা তৃতীয়বার মনে হতেই মুন্সি ছদুর চোখের ওপর থেকে নামিয়ে নিলেন নিজের চোখ মাটির দিকে। হাত ছাড়িয়ে স্পর্শ করলেন ভোর থেকে পকেটে পরিত্যক্ত কঠিন পাথুরে তছবির ছড়াটাকে।

ভাষাতত্ত্ব

বাংলা ভাষা-বর্ণনার ভূমিকা

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিষয় ভাষা এবং ভাষাতত্ত্ব। দুটোকে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করার সংগত কারণ রয়েছে। ভাষা মানুষের মুখের জিনিস, সামাজিক জীবনে যে সকল বিচিত্র আচরণের মধ্যে সে নিজেকে ব্যাপৃত রাখে ভাষা তারই একটা বিশিষ্ট প্রকাশ। চলাফেরার মতোই ভাষা একটি মানবিক আচরণ যা সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সেই পরিমাণে সাক্ষাৎ পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অধীন। ভাষার যে তাৎপর্য ইন্দ্রিয়াতীত আমাদের সীমিত আলোচনায় তা অগ্রাহ্য। অপরপক্ষে, ভাষাতত্ত্ব একান্তভাবে ভাষাবিজ্ঞানীর ভাষা। ভাষাকে বর্ণনা করার একটা কৌশল মাত্র। ভাষাবিজ্ঞানীর নিজের প্রয়োজনে নির্মিত এ এমন একটি হাতিয়ার যাকে আশ্রয় কবে তিনি ভাষা সম্পর্কে তাঁর ইন্দ্রিয়লব্ধ ধ্যানধারণাকে নিপুণভাবে ব্যক্ত করতে পারেন। অন্যান্য বিজ্ঞানবিদ্যার সঙ্গে ভাষাবিজ্ঞানের এই একটা প্রধান পার্থক্য। বর্ণিত বিষয় ও বর্ণনার মাধ্যম দুইই এখানে এক অর্থাৎ ভাষা। উভয়ের মধ্যে এই অপরিহার্য ঐক্য তত্ত্বের দিক থেকে কিছু অহেতুক জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে গোড়া থেকে সতর্ক থাকা ভালো।

আমাদের বর্ণনার মূল বিষয় বাংলা ভাষা। এবং সেই সঙ্গে ভাষাতত্ত্বের যেসব বিশিষ্ট নীতিনিয়ম সূত্রপদ্ধতি এই বর্ণনাকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দান করার জন্যে অনুসৃত হয় তার কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা।

একটা পুরনো তর্কের কিছু নতুন জবাব পাওয়া গেছে, সেই কথাটা তোলা যাক। ভাষাতত্ত্বটা কি সত্যি বিজ্ঞান ? সত্তর-আশি বছর আগে আক্রমণটা এসেছিল ফিললজিস্টদের ওপর। তাঁরা নাকি অনুমানের অলীক সিঁড়ি বেয়ে ভাষার বিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন। এবং সেই অনুমানের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন সৃষ্টি করলে তাদের কাছে স্বরবর্ণতো ছার ব্যঞ্জনবর্ণেরও মান পাওয়া ভার ছিল। এই অভিযোগের অবসান ঘটেছে প্রাচীন ভাষাসমূহ থেকে প্রচুর প্রমাণাদি সংগৃহীত হবার পর এবং একাধিক লুপ্ত ও অজানিত ভাষার পুনরুদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে। কালের স্রোতে ভাষায় যে ধ্বনি বিবর্তন ঘটে সে সম্পর্কে বহু সাধারণ সূত্র এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। একাধিক ভাষার ক্ষেত্র থেকে নজির তুলে সেগুলোর প্রয়োগ কুশলতা প্রমাণ করা এখন কঠিন নয়।

ইতোমধ্যে ভাষাতত্ত্বের নিজের সাধনার ক্ষেত্রেও বিস্ময়করভাবে প্রসার লাভ করেছে। তাতে নতুন প্রাণ সৃষ্টি হয়েছে, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি সঞ্চারিত হয়েছে। নানা শাখায় বিস্তার লাভ করে গণিতশাস্ত্র, মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদিকে আত্মসাৎ করে সে নতুন নতুন পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ভাষাতত্ত্ব বলতে আগে বোঝাত কেবলমাত্র ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বকে। তার লক্ষ্য ছিল কোনো ভাষার জন্ম বৃদ্ধি বিস্তারকে নিপুণ শৃংখলার সঙ্গে বিচার করা, ক্রমবিকাশের ধারায় কোনো গ্রন্থি হারিয়ে গিয়ে থাকলে তার পুনর্গঠন করা, অন্য ভাষার সঙ্গে তুলনা করে তার বংশ বিচার করা। বংশ পরিচয়ের জয়টিকা আজকাল সমাজে যেমন সন্ত্রাসিত শ্রদ্ধা বা আকর্ষণ লাভ করে না, ভাষাবিজ্ঞানীরাও তেমনি হালে কোনো ভাষার চতুর্দশ পুরুষের পরিচয় উদ্ধার করাটাকে তাঁদের সাধনার

একমাত্র লক্ষ্য বলে মনে করেন না। অতীত ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করার চেয়ে বর্তমান ও প্রত্যক্ষকে বর্ণনা করার দিকেই তাঁদের মুখ্য প্রবণতা।

এই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিশ্লেষণ পদ্ধতি আলোচনা করা এ গ্রন্থের অন্যতম লক্ষ্য। মানববিদ্যাসমূহের মধ্যে বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব অনেক কারণে বৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত হওয়ার দাবি রাখে। মানবাচরণের অন্যতম অঙ্গ ভাষাকে এই বিজ্ঞান ন্যূনতম বিভাজ্য খণ্ডে বিশ্লেষিত করে সেই অংশসমূহের সংযোজনধর্মকে বর্ণনা করে। শুদ্ধাশুদ্ধ বিচারের নির্দেশনামা তৈরি করে না। কোন্টা উচিত আর কোন্টা অনুচিত, মনগড়া আদর্শের কৃত্রিম ভিত্তিতে সেটা বিচার করতে উদ্যোগী নয়। মূল্য বিচার করে দণ্ডনীতি জারি করা সে ছিল প্রাচীন ও প্রচলিত ব্যাকরণের রেওয়াজ। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব আধুনিক ব্যাকরণের বুনিয়াদ গড়েছে। তার মূল বাণী হলো এই যে, শুরু করতে হবে ভাষা থেকে, কোনো ধরাবাঁধা সূত্র থেকে নয়। বর্ণনাই কেবলমাত্র উদ্দেশ্য এবং যা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায় কেবলমাত্র তারই বর্ণনা করা। যে ভাষা মুখে মুখে প্রকাশ লাভ করে সামাজিক মানুষের জীবনযাত্রাকে সম্ভব করে তুলেছে সেই মৌখিক ভাষাই আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদের চোখে সবচেয়ে মূল্যবান। মুখের বাণীই অগ্রগণ্য। কালিকলমে লিখিত ভাষা তারই পরোক্ষ রূপায়ণ মাত্র। এই অর্থে লিখিত ভাষা প্রতীকের প্রতীক। বাকধ্বনির প্রবাহকে আমরা নির্দিষ্ট ভাব বা বস্তুর প্রতীক বলে গ্রহণ করি, তাতেই ভাষার সৃষ্টি। এই শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনি প্রতীককে বোঝাতে যখন আবার দর্শনীয় রেখা প্রতীক প্রয়োগ করতে শুরু করলাম তখন থেকে জন্ম হল লেখার। ভাষার ধ্বনিগত রূপ বা মুখের প্রকাশটাই ভাষাতত্ত্ববিদদের বিচারে অপেক্ষাকৃত মৌলিক ও মুখ্য অনুমিত হয়।

যে বাংলাকে ঘিরে আমাদের আলোচনা তা কথ্য বাংলা। ভৌগোলিক বাংলা। ভৌগোলিক মাপকাঠিতে এই বাংলার জন্ম পশ্চিমবঙ্গে এবং সকল শিক্ষিত বাংলা ভাষাভাষীর বাঙালি এই বাংলাকে আদর্শ সাধারণ চলতি বাংলা বলে গ্রহণ করেছেন।

বৈজ্ঞানিক সততা বজায় রাখতে হলে এইখানে আরো একটা স্বীকারোক্তি থাকা দরকার। মার্জিত কথ্যবুলির যে ব্যবহারিক রূপ আমাদের দুজনের মুখে কানে স্বভাবত প্রচলিত কেবলমাত্র তাকে বর্ণনা করতেই আমরা উদ্যোগী হয়েছি। যাঁরা অন্যরকম বলেন শোনেন তাঁদের ব্যাখ্যায় এবং আমাদের ব্যাখ্যায় কিছু সূক্ষ্ম ভেদ দৃষ্ট হওয়া বিচিত্র নয়। এ নিয়ে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। যেহেতু আমরা একই ভাষা বর্ণনা করছি, এরকম সামান্য প্রভেদে মূল বক্তব্যের ওলট-পালট হবে না।

বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিকতা এইখানে আরো স্পষ্ট। বর্ণিত বিষয়ের বিশিষ্ট অবস্থা ও পরিবেশ বিস্তৃতভাবে ও নিঃসংশয় রূপে উল্লিখিত থাকা চাই। যে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সীমাবদ্ধ প্রয়োগ ক্ষেত্রকেও যেন জাজ্বল্যমান রূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, এত সতর্কতা সেই উদ্দেশ্যে।

আরো একটা জিনিস লক্ষ করার মতো। ভিন্ন ভিন্ন দেশ ও প্রকৃতির একাধিক আধুনিক ভাষাতত্ত্ববিদ একেবারে নিজে থেকে স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করে কোনো এক বিশেষ নতুন ভাষার বর্ণনা করেছেন, মিলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, সকল বর্ণনার আসল কথাগুলো মোটামুটি একই। মার্কিন ও রুশ ভাষাতত্ত্ববিদের লেখা আরবি বা তুর্কি ভাষার বর্ণনামূলক ব্যাকরণে মৌলিক বিরোধিতা নেই। উভয়েই কোনো প্রাচীন ব্যাকরণ নকল করেছেন সেই

জন্যে নয়। এর কারণ হলো এই যে, আধুনিক ভাষাতত্ত্ব তার বিশ্লেষণরীতিকে চুলচেরা যুক্তিবিচারে দাঁড় করিয়েছে, সিদ্ধান্তকে প্রমাণ-নির্ভর রেখেছে। ভাষা সম্পর্কে কোনো সূত্রই আপ্তবাক্যের উপর নির্ভর করে গ্রহণ করেন নি। বিশ্লেষণের ক্রমিক পদক্ষেপকে সুনির্দিষ্ট যুক্তির বাঁধনে এঁটে দিয়েছেন। বিশ্লেষণের রীতি নির্ধারক প্রতিটি সংজ্ঞা সুচিন্তিত, সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত, অপরাপর সংজ্ঞার সঙ্গে তার সম্পর্ক সুগ্রথিত, প্রয়োগ পর্যায়ে সেগুলোর ধারাবাহিকতা সুনির্ধারিত। এই কারণে কেবলমাত্র সাধারণ বুদ্ধি খাটিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের সকল কথার তাৎপর্য গ্রহণ করা যাবে ভাবা ঠিক নয়। ভাষাতাত্ত্বিকের বিশেষ উদ্দেশ্য কী, তার বর্ণনীয় উপাদানের স্বরূপ কী, প্রতি স্তরে অনুসৃত রীতিপদ্ধতির তত্ত্বগত বুনিয়াদ কী—এ সব কথা খেটেখুটে বুঝে নিতে হবে। নইলে ভাযাতত্ত্ববিদের সঙ্গে ভাষাভাষীর নানারকম অকারণ ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হতে পারে।

ভাষার ধ্বনিময় প্রবহমান সত্তাকে পরিপূর্ণ উপলব্ধি করার জন্যে, ভাষাতত্ত্বে ভাষাকে অণুতম বোধগম্য খণ্ডে বিভক্ত করে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রচিত হয়। এই প্রকার ক্রমবর্ধমান খণ্ডাংশের পর্যায়ক্রম বজায় রেখে এই গ্রন্থের পরিচ্ছেদসমূহ গ্রথিত হয়েছে।

এই গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ, বাক্‌ধ্বনির বর্ণনা। কোনো বিশেষ ভাষার বাক্‌ধ্বনি নয়, যে কোনো মানুষের কণ্ঠ থেকে নিঃসৃত যে কোনো ভাষায় যত রকমের সম্ভাব্য ধ্বনি ব্যবহৃত হতে পারে তার পরিচয়। এ রকম ধ্বনি নিশ্চয় অগুণতি, তাব সবটা বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে নানা রকম শ্রেণীতে ভাগ করে নানারকম ছকে ফেলে সেই ধ্বনিবৈচিত্র্যের নানা সীমানা অনুমান করা যায়। কিছু মাপকাঠিও নিরূপণ করা যায়, যাকে আশ্রয় করে যে কোনো নতুন ধ্বনির জাতবিচার সহজ হয়, তার স্বকীয় রূপ প্রায় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বাক্‌ধ্বনির বর্ণনাকে সীমাবদ্ধ করে বিশেষ ভাষার গণ্ডির মধ্যে টেনে নেওয়া হবে। বিচার্য বিষয় বিশেষ ভাষার মধ্যে কোন কোন ধ্বনি তাৎপর্যপূর্ণ, বাক্‌ধ্বনির কী ন্যূনতম পার্থক্যের জন্যে সেই ভাষায় অর্থভেদ ঘটে ইত্যাদি। প্রথম পরিচ্ছেদ যদি থাকে phone-এর আলোচনা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হবে phoneme বিচার। ফোনের প্রতিশব্দ ধ্বনি। ফোনিমের কোনো প্রতিশব্দ বাংলায় নেই। ধ্বনিম বলতে যদি সকলের আপত্তি না থাকে তা গ্রহণ করা চলতে পারে। আমরা ইংরেজি শব্দ ফোনিমই ব্যবহার করেছি, কদাচিৎ ধ্বনিম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ morphology বা রূপতত্ত্ব। অর্থাৎ ধ্বনিসমষ্টি যে স্তরে অর্থপূর্ণ শব্দের বা শব্দাংশের আকার নিয়েছে। কী নিয়মে শব্দ-শব্দাংশ পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত হয়, ধ্বনির কী সামান্য পরিবর্তনে মূল অর্থের আংশিক পরিবর্তন ঘটে, ইত্যাদির পরিচয়। নিয়মটা ওপর থেকে চাপানো হয়েছে, এমন নয়। সেটা বৈচিত্র্যের মধ্যে আবিষ্কার করা হয় মাত্র, যাকে অবলম্বন করে সে বৈচিত্র্যের স্বরূপ বোধগম্যরূপে প্রকাশ করা যায়। এই স্তরে ভাষার বস্তুগত প্রকাশের দিক—অর্থাৎ তার ধ্বনিরূপ, ভাবের দিক অর্থাৎ তার অর্থরূপের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে বাক্যরীতি।

গ্রন্থের বাকি অংশে আঞ্চলিক ভাষা, শিক্ষায় ভাষাতত্ত্বের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা।

ধ্বনিরূপ তত্ত্ব

ধ্বনির রূপ বিচার করা এই পরিচ্ছেদের বিশেষ উদ্দেশ্য। কোনো বিশেষ ভাষার অপরিহার্যরূপে ব্যবহৃত বিশিষ্ট ধ্বনিসমূহ বর্ণনা করার আগে, মানুষ মাত্রই নানা দেশে নানা ভাষায় কথা বলতে গিয়ে মুখ দিয়ে যত রকম আওয়াজ বের করে থাকে সে সম্পর্কে একটা সামগ্রিক ধারণা গড়ে নেয়া দরকার। যে শাস্ত্র সকল রকম সম্ভাব্য বিচিত্র বাক্‌ধ্বনির বর্ণনায় উদ্যোগী তাকেই ইংরেজিতে phonetics বলে। আমরা বাংলায় তাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলে থাকি। ধ্বনিরূপ তত্ত্ব বললে হয়ত আরো ভালো হয়, কারণ ধ্বনির ভাষাগত তাৎপর্য নয় কেবলমাত্র তার শ্রবণগ্রাহ্যরূপের শারীরিক বর্ণনাই হলো এই শাস্ত্রের লক্ষ্য। দুটো ধ্বনির মধ্যে অতি সামান্য পার্থক্য যদি কোনো বিশেষ ভাষায় অর্থগত কোনো তাৎপর্য বহন নাও করে, ধ্বনিরূপের তত্ত্বালোচনায় সে তুচ্ছ পার্থক্যকেও প্রকট করে তুলতে হবে। এরকম দুরূহ বর্ণনায় প্রয়াসী হওয়ায় সার্থকতা এইখানে যে এতে করে স্বকর্ণে শোনার ক্ষমতাটা আর নিতান্তই অনুমান বা অভ্যাসের দাস হয়ে থাকে না। কানের পর্দাটা সরকারি ঘোষকের ঢোলের পরিবর্তে ওস্তাদ বাজিয়ের তবলায় পরিণতি লাভ করে। ধ্বনির সূক্ষ্মতম তারতম্যও তখন জাজ্বল্যমানরূপে অনুভূত হয়। নির্বিশেষে বাক্‌ধ্বনির অন্তহীন রূপগত বৈচিত্র্য সম্পর্কে যখন এরকম সুস্পষ্ট এবং সম্পূর্ণ ধারণা জন্মে তখনই বিশেষ ভাষায় গ্রাহ্যবিশিষ্ট বাক্‌ধ্বনিসমূহের ভাষাগত সত্তার, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা সহজ হয়। অবশ্য এখানে একটা মস্তবড় প্রশ্নের মুখোমুখি না হয়ে উপায় নেই। নানা ভাষার নানা লোকের নজির দূরে থাক, একই ব্যক্তি একই কথা যখন দুবার উচ্চারণ করে তখন সে দুটোও কি সকল দিক থেকে হুবহু এক রকম হয়? প্রাণপণ চেষ্টা করলেও কি হতে পারে? বিজ্ঞানাগারের গবেষক দুটো নমুনাকেই যন্ত্রে গ্রহণ করে বিশ্লেষণে করে বলতে চান যে সে রকম হওয়া প্রায় অসম্ভব। সূক্ষ্ম বিচারে প্রবেশ করলে একই কথার একাধিক উচ্চারণেও প্রতিবারেই কিছু না কিছু অমিল লক্ষ করা যাবে। এবং তাই যদি হয় তাহলে বাক্‌ধ্বনির অগুণতি রূপভেদ নিঃশেষ বর্ণনা করা কোনদিনই সম্ভব হবে না। ভাব-ভাষা নিরপেক্ষ এই অর্থে বাক্‌ধ্বনির সামগ্রিক রূপ বর্ণনা সব সময়েই অসম্পূর্ণ, আংশিক এবং সীমাবদ্ধ।

Phonetics নিজের শাস্ত্রের সম্পূর্ণতা লাভের অপারগতা সম্পর্কে সচেতন। আধুনিক ধ্বনিরূপ তত্ত্ব এইজন্যে স্বেচ্ছায় নিজের বিচারাধীন এলাকার গণ্ডীকে নানা দিক থেকে সীমিত করে দিয়েছে। সকল সম্ভব অসম্ভব স্বতন্ত্র বাক্‌ধ্বনির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তারতম্য নির্ণয়ের পরিবর্তে আধুনিক ধ্বনিরূপ তত্ত্ব সমগ্র বাক্‌ধ্বনিকে নানা সাধারণ শ্রেণীতে বিভক্ত করে তাদের রূপগত জাতবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছে। নানা শ্রেণীর অন্তর্গত অনিরূপিত সংকীর্ণ ভেদাভেদ, অবস্থা বিশেষে বিস্তৃতরূপে পরিমাপযোগ্য বলে উহ্য রেখে দেয়। কিন্তু এই সীমিত শ্রেণীকরণের অন্তর্নিহিত মূলনীতির মধ্যে এমন ইঙ্গিত থাকা চাই যাকে অবলম্বন করে বিস্তৃত বৈচিত্র্যকে অনুমান করা যায়। যার কাঠামোকে আশ্রয় করে সমগ্রকে উপলব্ধি করা যায়, যার মানদণ্ড আরোপ করে মিহি ও মোটা সকল আওয়াজের স্বরূপ বর্ণনা করা সম্ভব হয়।

ভাবের মতো ধ্বনি দেহহীন নয়। ধ্বনি মাত্রই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। তার একটা পদার্থগত অস্তিত্ব আছে যা প্রত্যক্ষত পর্যবেক্ষণযোগ্য। তার বর্ণনা প্রধানত তিনটে দৃষ্টিকোণ থেকে শুরু করা যেতে পারে। প্রথমত ঠোঁট-জিব-গলার নানা রকম কারসাজির ফলে বাক্‌ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এই সব মানবাঙ্গের ব্যবহারভেদে ধ্বনি-বৈচিত্র্যের প্রকাশ। সকল রকম ধ্বনিকে তার

সৃষ্টিকারী শারীরিক ক্রিয়াকৌশলের ভিত্তিতে বর্ণনা করা চলতে পারে। ধ্বনিরূপ তত্ত্বের এই অংশ দেহবিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত বাকধ্বনিকে বিচার করা চলতে পারে কেবলমাত্র তাব বাহন বায়বীয় ধ্বনিতরঙ্গের রূপে বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে। ভাষাতত্ত্বের এই এলাকা পদার্থবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তৃতীয়ত বাক্ধ্বনির রূপ ব্যাখ্যা চলতে পারে শ্রোতার কানে কোন ধ্বনি কী রকম বাজে সেই ধারণাকে ভিত্তি করে। এই শেষোক্ত বিচার বিজ্ঞানসম্মত নৈর্ব্যক্তিকতাকে বজায় রেখে এগোয় না। সাধারণ বুদ্ধিপ্রসূত ব্যক্তিগত অনুমান বা স্বকীয় স্নায়ুগত বোধশক্তির ওপর অতিরিক্ত আস্থাবান। আমাদের ধ্বনিরূপের এই আলোচনা বাক্ধ্বনির শারীরিক কারণ উৎসকে প্রধান বর্ণিতব্য বিষয় বলে মেনে নেবে। অবশ্য অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ আছেন যারা কেবল ধ্বনির বায়ুতরঙ্গকে বিশ্লেষণ করে ধ্বনির রূপ বিচার করাটাকেই সবচেয়ে বেশি লাভজনক এবং বৈজ্ঞানিক বলে মনে করেন। এখানে আমাদের প্রয়াস অত সম্পূর্ণরূপে বৈজ্ঞানিক না হলেও বহুল পমিাণে নির্ভরযোগ্য এবং কার্যকরী। এ কথা সত্য যে, মোটামুটি একই ধ্বনি দুজন মানুষ, বা একই ব্যক্তি, একাধিক উপায়ে উচ্চারণ করতে পারে। যে কোনো পেশাদার হরবোলা এ কথা প্রমাণ করতে সক্ষম। তবুও সাধারণভাবে, গলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত মুখের ভেতরের নানা অংশের ভিত্তি কবে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্ধ্বনির বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা অসঙ্গত নয়। এ রকম বর্ণনাব জন্যে প্রথমে জীববিদ্যা থেকে কিছু প্রয়োজনীয় নামধাম সংগ্রহ করে নেয়া দরকাব এবং সেই সঙ্গে বাক্য উচ্চারণের যন্ত্র হিসেবে আমাদের গলা ও মুখ কিভাবে কাজ কবে তার পরিচয় নেয়া যাক। বাক্য উচ্চারণের শরীর-ক্রিয়া, মানবদেহের অন্যান্য ক্রিয়াব মতোই জটিল। তবে আমাদের ধ্বনিরূপ বর্ণনার স্পষ্টতার জন্যে এই জটিল ক্রিয়াপদ্ধতির বিস্তৃত বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। কেবল যে কয়েকটি অংশ বাক্ধ্বনির বৈচিত্র্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, তাদের স্বরূপ জানলেই চলবে। মুখেব যেসব অংশ এ ব্যাপারে প্রধান সেগুলো হলো—*ঠোঁট*, জিব, দাঁত, মাড়ি, তালু, আলজিব, নাসাপথ, গলবিল, স্বরযন্ত্র, স্বরতন্ত্রী, ফুসফুস। এগুলোর মধ্যে কোনোটা সক্রিয়, কোনোটা নিষ্ক্রিয়। এগুলোর মধ্যে ঠোঁট, জিব আর স্বরতন্ত্রী খুবই সক্রিয়। Phonetics-এর পাঠ্য বইতে কী কারণে জানি না সব সময়েই বাম দিকে মুখ ফেরানো একটা নক্সা এঁকে এগুলো চিহ্নিত করে দেয়া থাকে। যেমন—

মানুষ 'গলার আওয়াজটাকে ঠোঁটে, দাঁতে, জিবে, টাকরায়, নাকের গর্তে, ঘুরিয়ে ধ্বনির পুঞ্জ গড়ে তোলে'। ধ্বনির জাত বিচার করার সময় তাই উচ্চারণের স্থান যাচাই করা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। ফুসফুসের হাওয়া যখন সাধারণ অবস্থায় আসা-যাওয়া করে তখন কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় না। যখন কোনোরকম বাধা পায় তখনই ধ্বনির জন্ম। এই বাধার স্থানকেই আমরা ধ্বনির উচ্চারণ-স্থান বলছি। বলা বাহুল্য বাধা সৃষ্টিকারী অঙ্গাংশ একটি নয়, একাধিক। অনেক ক্ষেত্রে তার একটি সচল, অন্যটি অচল এবং প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাধার স্থানের সচলাংশ নিচে এবং অচলাংশ ওপরে থাকে। কোনো ধ্বনির নামকরণের সময় যে কোনো
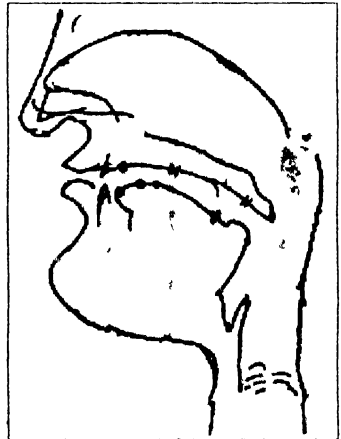
একটাকে মাত্র উল্লেখ করা হয়। বাধার স্থান বা উচ্চারণ-স্থান যদি ঠোঁট হয় তবে তাকে আমরা বলি ওষ্ঠধ্বনি। যেমন প। এখানে ঠোঁটে ঠোঁট মিলেছে। দুটোই সচল। আবার সচল নিচের ঠোঁট অচল দাঁতের সঙ্গে যুক্ত হয়েও ধ্বনি সৃষ্টি করতে পারে। যেমন ইংরেজির ফ। এ জাতের ধ্বনিকে বলব দন্তৌষ্ঠ্য।

জিব মিলতে পারে দাঁত, মাড়ি ও তালুর সঙ্গে। জিবের আবার নানা অংশ রয়েছে। যেমন জিবের ডগা, জিবের পাতা, জিবের মাঝখান এবং জিবের মূল। এমনি করে তালু বা টাকরাকেও ভাগ করা চলে সম্মুখ, মধ্য ও পশ্চাৎভাগে। তালুর সামনেরটা এবং মধ্যভাগ শক্ত কিন্তু পেছনের অংশ অতি নরম। এই নরম তালুর পরেই নিচের দিকে ঝুলন্ত লক্‌লকে ক্ষুদে মাংসের ফালিটি হলো আলজিব। নরম তালুর অপর পিঠ ওপরের দিকে নড়তে পারে এবং ইচ্ছেমতন ঠেলে উঠে নাসাপথ বন্ধ করে দিতে পারে। জিবের ডগা যখন দাঁতের সঙ্গে মেলে তখন আমরা তাকে বলি দন্ত্যধ্বনি। মাড়ির সঙ্গে বা তালুর সম্মুখভাগের সঙ্গে যুক্ত হলে বলি দন্তমূলীয়। যেমন, ত দন্ত্যধ্বনি, কিন্তু ট দন্তমূলীয়। জিবের ডগা কুঁকড়ে বেঁকিয়ে যখন মধ্যতালুকে স্পর্শ করে তখন মূর্ধন্য ধ্বনির সৃষ্টি হয় যেমন ট। জিবের স্থিতিস্থাপকতা যতই থাকুক না কেন জিবের ডগার পক্ষে বাঁকা হয়ে উল্টে তালুর একেবারে পশ্চাদভাগ অর্থাৎ নরম তালুর নাগাল পাওয়া কঠিন। জিবের পাতা দন্তমূলে বা তালুর সামনে ভাগে মিলতে পারে। এবকম শ হলো তালব্য বা অগ্রতালু জাতীয়। জিবের পেছনের অংশ আর তালুর পেছনের অংশ মিলে বাধা সৃষ্টি করলে পাই জিহ্বামূলীয় ধ্বনি।

উচ্চারণ বা বাধার স্থানের ভিত্তিতে এই কয়েকটি মোটামোটা ভাগে বিভিন্ন শ্রেণীর বাক্‌ধ্বনিকে ভাগ করা যায়।

ধ্বনির শ্রেণীকরণের আরেকটিতে হলো উচ্চারণরীতি। বাধার স্থান এক হয়েও উচ্চারণরীতি স্বতন্ত্র হওয়ার ফলে ধ্বনি ভিন্নরূপ ধারণ করতে পারে। যেমন ত আর ন দুটোই স্থানের দিক থেকে ভেদহীন, অর্থাৎ উভয়েই দন্ত্যধ্বনি কিন্তু পৃথক হয়েছে রীতি আলাদা বলে। এইখানে বাধা বা উচ্চারণের স্থান বলে আমরা এতক্ষণ যে অবস্থাকে ধরে নিয়েছিলাম, সে কথাটার আরো খুঁটিয়ে যাচাই করে নেয়া দরকার। বাধার স্থান বলতে এমন মনে হয় যেন, স্থানটা কোনো এক বিশেষ বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত, অন্য সর্বত্র অপরিবর্তনীয়রূপে অবাধ এবং বাধা সৃষ্টি হয়েছে দুটো অঙ্গাংশের সম্পূর্ণ সংযোগের ফলে। এ ধারণাটা শুধরে নেয়া দরকার। মুখের ভেতরের চলমান বায়ুস্তম্ভ মুক্তিলাভের চেষ্টায় যেখানে সবচেয়ে বেশি বাধা পাচ্ছে, ধাক্কা খাচ্ছে বা চাপ খাচ্ছে সে মুখ্য বিঘ্নকারী এলাকাকেই আমরা উচ্চারণস্থান বলে অভিহিত করেছি। মুক্তিপথ আচমকা বন্ধ হওয়ার জন্য ধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে, রুদ্ধ পথ আচমকা খোলার জন্যেও ধ্বনি উৎপাদিত হতে পারে, বায়ুপথের বিশেষ অংশ সংকীর্ণ হয়ে বা কেঁপে উঠেও ধ্বনি উৎপাদিত হতে পারে, বায়ুপথের বিশেষ অংশ সংকীর্ণ হয়ে বা কেঁপে উঠেও ধ্বনি-সৃষ্টিকারী বিঘ্ন তৈরি করতে পারে। মুখ্য বাধা স্থান ছাড়াও অন্য অঙ্গাংশের রকমারি কারাসাজির কারণেও ধ্বনিবৈচিত্র্য ঘটে। এই রীতিবহুলতার সীমানা যাচাই করা হলো বাক্‌ধ্বনির শ্রেণীকরণের দ্বিতীয় পন্থা। এক এক করে উচ্চারণ স্থানের মতো এই রীতির বিভিন্নতা এখন দৃষ্টান্তসহ আলোচনা করা যাক।

রীতি-বৈষম্যের ফলস্বরূপ সবার আগে যে দু'জাতের বাক্‌ধ্বনি নজরে পড়ে তাদের রূপ-বৈপরীত্য এত মৌলিক যে উভয়ের বিশ্লেষণ স্বতন্ত্রভাবে না করে উপায় নেই। এক শ্রেণীর

নাম ব্যঞ্জনধ্বনি, অপরটি স্বরধ্বনি। স্বরযন্ত্রে অবস্থিত স্বরতন্ত্রীর কম্পন হেতু যে ধ্বনিপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তা যদি মুখের ভেতরে কোথাও আটকা না পড়ে কোনো সংকীর্ণ পথে ঘর্ষণলাভ না করে অবাধে মুখের মধ্যপথ দিয়ে, কখনও বা একই সঙ্গে নাক দিয়ে, বেরিয়ে যায় তবে তাকে স্বরধ্বনি বলি। যেহেতু এই ধ্বনিপ্রবাহ মুখের মধ্যে পুরাপুরি আটকা পড়ে না, পীড়িত হয় না, স্বরধ্বনির রূপাকারে তারতম্য ঘটে অনুনাদক মুখগহ্বরের আভ্যন্তরীণ আয়তনের নানারকম ইচ্ছাকৃত পরিবর্তনের ফলে। স্বরধ্বনির নানা রূপ প্রকার বিষয়ে আমরা পরে বিস্তৃত আলোচনা করব। আগে ব্যঞ্জনধ্বনির পরিপ্রেক্ষিতে বাক্ধ্বনির রীতিগত বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া যাক।

শ্বাসনালী যেখানে গলায় এসে শেষ হয়েছে সেই মাথায় স্বরতন্ত্রী অবস্থিত। পাতলা ঠোঁটের মতো দু'ফালি স্থিতিস্থাপক মাংসপেশীতে গড়া। সাধারণ অবস্থায় স্বরতন্ত্রী শিথিল থাকে। দু'ফালি মাংসপেশীর মাঝখানের ফাঁকটি তখন বড়। শ্বাসনালীতে বাতাস এই পথে অবাধে আসা-যাওয়া করতে পারে। কোনো ধ্বনির সৃষ্টি হয় না। কিন্তু যখন ব্যক্তির ইচ্ছায় এই স্বরতন্ত্রীতে টান পড়ে, মাংসপেশীর ফালি তখন আর শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়ে থাকে না। শক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। বাতাসের চাপে সম্পূর্ণ যুক্ত হতে পারে না কিন্তু মধ্যের ফাঁক খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। এই সংকীর্ণ পথ ঠেলে বাতাস যখন বেরিয়ে যেতে চায় তখন স্বরতন্ত্রী থরথর করে কাঁপতে থাকে। এই কম্পনের ফলে যে সুরময় ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় স্বর বা নাদ। অন্য কোনো বাধাস্থানে উৎপাদিত ধ্বনি যেমন স্বরহীন হতে পারে তেমনি স্বরযুক্তও হতে পারে। স্থান এবং রীতির দিক থেকে অভিন্ন হয়েও দুটো ধ্বনি এই স্বগুণে নিজেদের প্রভেদ ঘোষণা করতে পারে। স্বরহীন ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষ ধ্বনি, স্বরযুক্তকে ঘোষ। এই ঘোষ-অঘোষ রীতিভেদ প্রায় সকল ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যেই লক্ষ করা যাবে।

কয়েক জাতের স্বরহীন বা স্বরযুক্ত ধ্বনিকে আরো একটা রীতিগতভাবে ভাগ করা যায়। সে হলো ধ্বনি বিশেষের সঙ্গে স্বরতন্ত্রীর ঘর্ষণজাত কোনো দমকা হাওয়ায় ধাক্কা দিয়ে বার হয় কিনা। এ দমকা হাওয়ার অতিরিক্ত ঝোঁকটাকে বলে প্রাণ। লিখে বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, যে-কোনো ধ্বনির সঙ্গে একত্রে যদি হ উচ্চারিত হয় তবেই তাকে প্রাণযুক্ত বলা যেতে পারে। এই রীতি অনেক ভাষায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত বলে বাকধ্বনিকে প্রাণহীন ও প্রাণযুক্ত এই শ্রেণীতে বিচার করা প্রয়োজনীয়। ধ্বনিরূপতত্ত্বে বাংলায় প্রাণহীন ধ্বনিকে বলা হয় অল্পপ্রাণ, প্রাণযুক্তকে মহাপ্রাণ।

ধ্বনির রীতিগত রূপ বিচারে এই স্বর ও প্রাণ যে ভেদ সৃষ্টি করে, তার একটা বিশিষ্ট তাৎপর্য রয়েছে। এই ভেদ প্রায় যে-কোনো স্থানের যে-কোনো রীতির ক্ষেত্রেই আরোপিত হতে পারে। এই অর্থে স্বর ও প্রাণ মৌলিক রীতির সূক্ষ্মতর শ্রেণী সূচিত করে।

উচ্চারণরীতির দিক থেকে শ্রেণীকরণ করতে গেলে এর পরই যে প্রধান মানদণ্ডের উল্লেখ করতে হয়। সে হলো বাধার স্থানের বিশেষ ক্রিয়া বা অবস্থা। যেমন, শ্বাসনালী থেকে বাতাস বেরিয়ে আসবার সময় হঠাৎ মুখের মধ্যে কোনো স্থানে পলকের জন্য আটকা পড়ে মৃদু বিস্ফোরকের সঙ্গে মুক্তি পেলে তাকে আমরা বলি স্পৃষ্ট ধ্বনি। অবশ্য মুখের মধ্যে বায়ুপ্রবাহ হঠাৎ আটকা পড়লেও স্পৃষ্ট ধ্বনি সৃষ্ট হতে পারে। বাংলা প, স্পৃষ্ট ওষ্ঠ্য ধ্বনি, ক স্পৃষ্ট জিহ্বামূলী ধ্বনি।

মুখ্য বাধার স্থান যদি সম্পূর্ণরূপে যুক্ত না থেকে ঈষৎ বিযুক্ত থাকে যাতে সে সংকীর্ণ পথ দিয়ে বেরুতে গিয়ে বায়ুপ্রবাহ হঠাৎ বাধা পায় না কিন্তু ঘর্ষিত ও পীড়িত হয় তাহলে সেই ঘর্ষণজাত ধ্বনিকে বলে উষ্ম বা শিস্‌জাত ধ্বনি। বাংলা হলো উষ্ম তালব্য ধ্বনি। এই বর্ণ স্বরতন্ত্রীর পেশীদ্বয় থেকে শুরু করে দুঠোঁট পর্যন্ত যে-কোনো স্থানে সৃষ্টি হতে পারে। স্বরতন্ত্রীর কম্পিত বা অকম্পিত পেশীদ্বয়ের সংকীর্ণায়ত রন্ধ্রপথে পীড়িত বায়ুপ্রবাহ যে শ্রুতিগ্রাহ্য ধ্বনির সৃষ্টি করে তাকে বলে উষ্ম কণ্ঠ্যধ্বনি। যেমন বাংলা হ। ইরেজি ফ হলো উষ্ম ওষ্ঠ্য ধ্বনি উষ্ম ধ্বনি তার উচ্চারণরীতির কারণেই স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য নয়। ইচ্ছে মতোন টেনে তার প্রলম্বিত ধ্বনিকরণ সম্ভব। শিস্‌জাত ধ্বনি কখনো-কখনো সোজা প্রবাহিত না হয়ে সংকীর্ণায়ত স্থানের এক পাশ বা দুপাশ দিয়ে বেঁকে বার হতে থাকে। এরকম ধ্বনিকে বলা যেতে পারে পার্শ্বস্থ উষ্ম ধ্বনি। যখন সংকীর্ণায়ত মুখ্য বিঘ্নস্থল পাশাপাশি লম্বিত তখন তাকে বলব লম্বিত উষ্ম এবং ওপর নিচে খাঁজ কাটা হলে তাকে বলব নালীয়। বাংলা তালব্য শ নালীয় উষ্ম কিন্তু কণ্ঠ্য হ লম্বিত। হ জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণের সময় স্বরতন্ত্রীর পেশীদ্বয় টানা পড়ে প্রসৃত পরস্পরকে চেপে ধরতে চায়।

এক বিশেষ শ্রেণীর স্পৃষ্টধ্বনি আছে যার বায়ুপ্রবাহ বাধার স্থানে পূর্ণ বাধায় আটকা পড়েই সঙ্গে সঙ্গে এক দমকে মুক্ত হয় না। অপেক্ষাকৃত ধীরে পথমুক্ত হয়। অনেকটা ঘর্ষণজনিত উষ্মধ্বনির মতো। এ জাতীয় ঘর্ষিত স্পৃষ্টধ্বনির নাম ঘৃষ্ট। এক অর্থে স্পৃষ্টধ্বনির মৌলিক বা একক ধ্বনি নয়। এ ধ্বনি গড়ে ওঠে কোন স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে সমস্থানীয় উষ্ম ধ্বনির যুগ্ম উচ্চারণে।

গলার শব্দ যদি মুখ দিয়ে বার না হয়ে নাক দিয়ে বার হয় তবে তাকে বলি নাসিক্য ধ্বনি। বলা বাহুল্য নাসিক্য ধ্বনি স্বরযুক্ত। তার রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় অনুনাদক মুখগহ্বরের আয়তনকে নানা স্থানে সীমিত করে। যেমন ঠোঁট দিয়ে মুখ বন্ধ করে গলার আওয়াজ নাক দিয়ে বার করলে পাই ওষ্ঠ্য নাসিক্য ধ্বনি, ম। জিবের ডগা দাঁতে চেপে যদি নাক দিয়ে ধ্বনি সৃষ্টি করি তবে পাই দন্ত্য নাসিক্য ধ্বনি। এমনি করে মূর্ধন্য নাসিক্য ধ্বনি।

সব ধ্বনির বায়ুনির্গমন পথ মুখগহ্বরের সরল রেখাঙ্কিত মধ্যপথ নয়। সকল স্বরধ্বনি বায়ুনির্গমন পথ মুখগহ্বরের সরল রেখাঙ্কিত মধ্যপথ নয়। সকল স্বরধ্বনি ও অনেক ব্যঞ্জনধ্বনির বাধার স্থান যেখানেই হোক না কেন, মুখের ঠিক মাঝখান বরাবর তার বায়ুপ্রবাহের চলাচল। কিন্তু কিছু ধ্বনি আছে। যেখানে ধ্বনিবাহী বায়ু বরাবর মাঝপথে না চলে বাধার স্থানে বিভক্ত হয়ে দুপাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরকম ধ্বনিকে বলা হয় পার্শ্বিক যেমন, ল। ল উচ্চারণ করবার সময় জিবের ডগা দন্তমূল ছোঁয় আর বাধা পাওয়া হাওয়া টোল খাওয়া জিবের পাতার বিযুক্ত দুপাশ দিয়ে মুক্তি পায়।

এইখানে অর্ধস্বরের বর্ণনা প্রাসঙ্গিক। অর্ধস্বর স্বরধ্বমির সঙ্গে এইজন্যে তুলনীয় যে এ ধ্বনি উৎপাদনে মুখের কোথাও কোনো পূর্ণ বাধা সৃষ্টি হয় না বা কোনো মুক্তিপথ অতি সংকীর্ণায়ত হয়ে ধ্বনিবাহী বায়ুপ্রবাহকে পীড়িত করে শিসজাত ধ্বনির জন্ম দেয় না এবং বহির্মুখী বায়ু সরলরেখায় মুখের মধ্যপথ দিয়েই নির্গত হয়। পার্থক্য এই যে স্বরধ্বনি উচ্চারণে অনুনাদক মুখবিবরের আয়তন পরিবর্তনকারী অঙ্গসংস্থান অর্ধস্বরধ্বনি উচ্চারণে সংকীর্ণতর হয়। এবং অতি মৃদু ঘর্ষণও লাভ করে। স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উভয় গুণ এই ধ্বনিতে বর্তে বলে একে অর্ধব্যঞ্জন বা অর্ধস্বর যে-কোনো নামে অভিহিত করা চলতে পারে।

কোনো নাম অধিকতর উপযোগী হবে তা নির্ভর করবে বিশিষ্ট ভাষায় এই ধ্বনির ব্যবহার ধর্মেব ওপর। নাসিক্য ম-কার জাতীয় ধ্বনি, পার্শ্বিক ল-কার জাতীয় এবং অর্ধস্বর ইংরেজি y-জাতীয় ধ্বনিরূপতত্ত্বে একটা সাধারণ নাম দেয়া হয়ে থাকে। এই সবগুলো ধ্বনিরই রূপবৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় পূর্ণ বাধা সৃষ্টি করে নয়। কিংবা বাধার স্থান অতি সংকীর্ণায়ত করে নয়। অনুনাদক মুখগহ্বরের আয়তন নানাস্থানে পরিবর্তিত করেই এদের রূপভেদ সূচিত হয়। এই ধ্বনিগুলোকে বলা যেতে পারে Resonants বা অনুনাদিত ধ্বনি।

কোনো কোনো সময় জিবের ডগা তালুর কোনো অংশ স্পর্শ না করে ধ্বনি উৎপাদক বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে, জিবের লক্‌লকে পাতলা ডগা বেরিয়ে আসা হাওয়ার তোড়ে যদি ফরফর করে কাঁপতে থাকে তখন যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলি কম্পিত ধ্বনি। বাংলা র তার একটি উদাহরণ। অবশ্য এই কম্পন ক্রিয়া ঠোঁটের প্রান্তেও সম্ভব আলজিবের পক্ষেও সম্ভব। এই অর্থে সকল স্বরধ্বনিকেও একপ্রকার কণ্ঠ্য-কম্পিত ধ্বনি বলে অভিহিত করা অযৌক্তিক হবে না।

কোনো কোনো সময় জিবের ডগা কোনো জায়গায় স্পষ্টত যুক্ত হয়ে থেকে স্পৃষ্ট ধ্বনি উৎপাদন করে না। আবার কেঁপে কেঁপে কম্পিত ধ্বনিরও জন্ম দেয় না। এ'দুয়েব মাঝখানে তার আর একটা তৃতীয় বিশিষ্ট রীতি লক্ষ করা যায়। জিবের ডগা ক্ষণিকের জন্য একবাব মাত্র পত করে কেঁপে উঠে বা তড়িত বেগে তালুর কোনো বিশেষ বিন্দু আলগোছে স্পর্শ কবে যে ধ্বনির সৃষ্টি করে থাকে, বলি তাড়িত ধ্বনি। যেমন ড়, ঘোষ তালব্য তাড়িত ধ্বনি।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীকরণের যে দুটি মূল মাপকাঠি দাঁড় করানো হলো তার ভিত্তিতে প্রায় সকল সম্ভাব্য ব্যঞ্জনধ্বনির রূপবৈচিত্র্যকে নির্দেশিত কবা যায় ৫৫৩ পৃষ্ঠাব ছকে আমরা তার একটি লৈখিক নক্‌শা চিত্রিত করছি। ডান থেকে বামে পাশাপাশি ঘবের ভাগ উচ্চাবণ স্থানের নির্দেশিক। একেবারে বাম ধারে, ওপর থেকে নিচে উচ্চারণরীতির।

আমরা আমাদের নকশায় বাংলা হরফ ব্যবহার না করে ধ্বনিতত্ত্বে বিশেষরূপে ব্যবহৃত চিহ্নদিকে স্থান দিয়েছি। তার কারণ হলো এই যে-কোনো বিশেষ ভাষায় প্রচলিত হরফাদি একাধিক ধ্বনির প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে বাধ্য। বর্ণতত্ত্ব পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা থাকবে। বর্তমান পরিচ্ছেদে ছকের বাইরে অন্যত্র যেখানেই কোনো বিশেষ ধ্বনিব রূপ বোঝাতে বাংলা বা ইংরেজি হরফ ব্যবহার করা হয়েছে। সেখানেই তার তাৎপর্য কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট বর্ণিত ধ্বনির বিশিষ্ট রূপার্থে গ্রহণ করতে হবে। স্বকীয় ভাষায় এই সব হরফের সাধারণ ও বিকল্পিক রূপাকার কী তা অগ্রাহ্য করে। অর্থাৎ এগুলো ব্যবহার করেছি বর্ণনাকে ব্যাখ্যা করার জন্যে, স্পষ্ট করবার জন্যে । অন্য যে-কোনো প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করলেও চলতে পারত। কেবল এতটুকু সতর্কতা প্রয়োজন যে ধ্বনিরূপতত্ত্বে একই চিহ্ন যেন একাধিক রূপের জন্য কখনও ব্যবহৃত না হয়।

৫৫৩ পৃষ্ঠায় ছক একে ধ্বনির নানারূপের বৈচিত্র্য সম্পর্কে যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে তা নিতান্তই অসম্পূর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত। এর সার্থকতা এইখানে যে এই কাঠামোকে সামনে রেখে যে কোনো ধ্বনির অমূল্য বৈশিষ্ট্যকে একটি মাত্র হরফ বা চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করা যায়।

উচ্চারণ স্থানের যে কয়েকটি প্রধান শ্রেণী ছকে নির্দেশিত হয়েছে, প্রতি স্তরে তার আরো অনেক সূক্ষ্মতর বিভাগ সহজেই অনুমেয়। একই অংগ সংস্থান নির্দেশিত মানদণ্ডকে স্বীকার করেও এক ধ্বনির ক্ষেত্রে সামান্য সামনে, অন্যটির ক্ষেত্রে সামান্য পেছনে অবশ্যই হতে পারে। দ্ব্যর্থহীনভাবে সকল ধ্বনির বৈচিত্র্যকে বোঝাতে হলে এই ছককে আরো অন্তহীন

ওষ্ঠ্য
জিহ্বাগ্র
জিবের পাতা
জিবের মূল
স্বরতন্ত্রী
ওষ্ঠ্য
দন্ত্য
দন্তমূলীয়
মূর্ধন্য
তালব্য
জিহ্বামূলীয়
কণ্ঠ্য
সম্মুখ
ঠোঁটে
দাঁতে
দাঁতে
দন্তমূলে
মধ্য তালুতে
তালুতে
নরম তালুতে
স্বরতন্ত্রীতে
স্পৃষ্ট :
সহজ <
মহাপ্রাণ <
স্পৃষ্ট :
অল্পপ্রাণ <
মহাপ্রাণ <
উষ্ম :
লম্বিত
নালীয়
পার্শ্বস্থ
নাদিত :
নাসিক্য
পার্শ্বিক
অর্ধস্বর
তাড়িত
কম্পিত
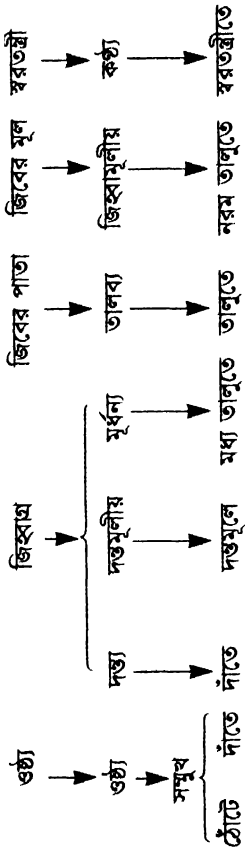
রেখায় আকীর্ণ করে তুলতে হয়। জগতের সুপরিচিত ভাষাসমূহে মূল যে ক' জাতের ভাষা ব্যবহৃত হয় মোটামুটি তাদের কথা মনের পেছনে রেখেই এই নক্‌শা। একই স্থানের ধ্বনিকে অধিকতর অণুশ্রেণীতে বিভক্ত করার জন্যে আমরা কয়েকটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করতে পারি। যেমন, হরফের নিচে বিন্দু (.) দিলে বুঝব যে তুলনামূলকভাবে অপেক্ষাকৃত পেছনে অবস্থিত। যদি নিচে সামনমুখী ফলা < আঁকা থাকে তবে বুঝব একটু বেশি সামনে। প্রয়োজন অনুসারে এরকম সূক্ষ্মতর ভেদের অন্যান্য চিহ্নাদিও তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। উচ্চারণরীতির দিক থেকে অনেক জটিলতা এই ছকে স্থান পায় নি। রীতির দিক থেকে কোনো স্বাতন্ত্র্যকে আমরা হয়তো এক ধ্বনির ক্ষেত্রে নির্দেশ করেছি, অন্য শ্রেণীর ধ্বনির বেলায় করিনি। যেমন অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ বৈপরীত্যকে আমরা কেবলমাত্র স্পৃষ্ট ধ্বনির ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছি, অন্যত্র নয়। অল্পপ্রাণ এবং মহাপ্রাণ উভয় জাতের নাদিত ধ্বনিই অর্থাৎ নাসিক্য, শিসজাত, পার্শ্বস্থ ইত্যাদি। কান সজাগ রাখলে অনেক ভাষার লোকের মুখেই শোনা যাবে। একই রকম ভাবে ঘোষ-অঘোষ পার্থক্য বিচারও স্পৃষ্ট ধ্বনিকে অতিক্রম করে অন্যান্য ধ্বনির ক্ষেত্রেও যুক্তিসংগতভাবে প্রসারিত করা চলতে পারে।

কিছু রীতিবৈচিত্র্যের কথা এ পর্যন্ত আমরা আদৌ উল্লেখ করি নি। ধ্বনির রীতিগত শ্রেণীকরণে আমরা এতক্ষণ ধরে নিয়েছিলাম যে ধ্বনিবাহী বায়ু ফুস্‌ফুস্‌ থেকে উঠে মুখ বা নাক দিয়ে বার হয়ে যায়। এর গতিটা বহির্মুখী। কিন্তু বাক্‌ধ্বনি অন্তর্মুখী বায়ুপ্রবাহ থেকেও উৎপাদিত হতে পারে। অর্থাৎ বার থেকে বাতাস যখন ফুসফুসের টানে জোরে মুখের ভেতর প্রবেশ করতে চায় তখন যদি কোনো উচ্চারণস্থানে বাধা পড়ে তাহলেই অন্তর্মুখী বা অন্তর্বাহী বাক্‌ধ্বনিব সৃষ্টি হয়। এই ভিত্তিতে সহজেই সকল রীতির ধ্বনিকে, অবিকল বহির্মুখী ধ্বনির বিস্তৃত শাখা-প্রশাখার মতোই বর্ণনা করা চলতে পারে। এরকম অন্তর্মুখী ধ্বনিকে কেউ চিৎকার জাতীয় ধ্বনি বলেছেন। স্পষ্ট চুম্বনে যে মৃদু বিস্ফোরণ ধ্বনি শ্রুত হয় তাকে ধ্বনিরূপতত্ত্বে অন্তর্মুখী স্পৃষ্ট ওষ্ঠ ধ্বনি রূপে অভিহিত করা চলে। বাঙালি আফসোস প্রকাশ করতে যে চুকচুক শব্দ করে সেটা দন্তমূলীয় চিৎকার। আফ্রিকার কোনো কোনো ভাষায় শীৎকার জাতীয় ধ্বনি শব্দগঠনের মৌলিক ধ্বনি হিসেবেই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণীকরণ সম্পর্কে আলোচনা শেষ করার আগে এর রীতিগত জটিলতার আবেকটা দিক সম্পর্কে অবশ্যই আলোচনা করা দরকার। কোনো একটি উচ্চারণের সম্পূর্ণ কালব্যাপী, সে যত ক্ষণিকই হোক না কেন, কেবল একটি উচ্চারণস্থানই সক্রিয় থাকে বা আগগোড়া একটি রীতিই অনুসৃত হয় এমন ধারণা করা ভুল হবে। নানা কারণে একক উচ্চারণের সময়ে একই কালে একাধিক উচ্চারণস্থান ক্রিয়াশীল হতে পারে, একাধিক রীতি যুগ্মভাবে আরোপিত হতে পারে। এ তত্ত্বের কিছু আভাস আছে ঘৃষ্টধ্বনির বর্ণনায় । কিন্তু আরো স্পষ্ট করে এখানে বলা দরকার যে এ জাতীয় যৌগিক ধ্বনি একক ধ্বনির সঙ্গে তুল্যমূল্য। দুটো পৃথক ধ্বনি অতি দ্রুত পরপর উচ্চারণ করলেই তাকে যৌগিক ধ্বনি বলব না, দুটো ধ্বনিবৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে উচ্চারিত হলে তখন পাই যৌগিক ধ্বনি। যেমন প-জাতীয় ধ্বনি উচ্চারণে ওষ্ঠপুটের যে মিলন ঘটে, মুখের আরো পেছনের অনেক স্পৃষ্ট ধ্বনির সঙ্গে একই কালে যুক্ত-মুক্ত হতে পারে। ভাষাতত্ত্বে হরফের মাথায় লিখে এই যৌক্তিকতা প্রকাশ করা যেতে পারে। এমনি করে জিহ্বামূলে সংযোগমুখের সামনের অন্যান্য ধ্বনির সঙ্গে সমকালে ধ্বনিত হতে পারে। ওপরে ক লিখে তা বোঝান চলতে পারে। তালব্য ছাড়া অন্য স্থানের ধ্বনির সঙ্গে তালব্য জাতীয় সংযোগ বিদ্যমান থাকলে হরফের মাথায় ই লেখা

চলতে পারে। ক" বললে বোঝাবে কণ্ঠেষ্ঠ স্পৃষ্ট ধ্বনি, প" ওষ্ঠ্য-কণ্ঠ্য, ত' দন্ত্য-তালব্য। এমনিভাবে যৌগিক ধর্মভেদে বহুতর সম্ভাব্য ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণনা করা কঠিন নয়।

স্বরধ্বনির উচ্চারণে বায়ু মুখে ভেতরে কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না, সংকীর্ণায়ত পথে পীড়িত হয় না, কোনো অংগাংশের কম্পিত প্রান্তে অনুরণন লাভ করে না। শুধুমাত্র গলায় অর্থাৎ স্বরযন্ত্রে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় বা অবাধে মুখের ভেতর দিয়ে বা নাকের ভেতর দিয়ে বা উভয়ের মধ্য দিয়ে বার হয়ে যায়। মুখগহ্বরের অনুনাদী আয়তনকে নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত করে তার রূপাকারে নানা বিভিন্নতা প্রকাশ পায়। স্বরধ্বনির শ্রেণীকরণে এই জন্য মুখগহ্বরের আয়তন নিয়ন্ত্রণকারী নানা অংগাংশের আচরণকে জানা দরকার। জিব এবং ঠোঁটের অবস্থানই হলো এর মধ্যে প্রধান। জিবের কোন অংশ কতখানি উত্তোলিত এই দুই কোণ থেকে স্বরধ্বনির একটি মুখ্য বিভাগ সম্ভব। সেই সঙ্গে ঠোঁটের রন্ধ্রপথ কি প্রসৃত না বর্তুলাকার এই দুই মানদণ্ড আরোপ করে স্বরধ্বনির আরেক রকম বিচার সম্ভব। যেমন উচ্চারণের সময়ে যদি ঠোঁটের ফাঁকে পাশাপাশি বেশি চেরা না হয়ে অপেক্ষাকৃত গোলাকার আকার নেয় এবং জিহ্বামূল নামমাত্র ওপরমুখী ওঠান, তবে সে ধ্বনিক আমরা লিখতে পারি—অ। যদি ঠোঁট আরো বেশি গোলাকার হয় এবং জিবের পেছনের অংশ আরো বেশি উঁচুতে ওঠে তাহলে লিখি—ও। এমনিভাবে জিবের সামনের অংশ সামান্য উঁচু, ঠোঁট প্রসৃত থাকলে পাব এ্যা বা আ জাতীয় ধ্বনি। বাংলা শব্দে এ্যা-কার, এ-কার ও ই-কার প্রসৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি, জিবের উচ্চতা ক্রমশ ওপরে উঠেছে। বাংলা শব্দে অ-কার, ও-কার, উ-কার বর্তুল পশ্চাৎস্বর, জিবের উচ্চতা ক্রমশ উপরমুখী। স্পষ্টই লক্ষ করা যাচ্ছে যে সম্মুখ জিব ক্রমোত্তোলিত করে যখন সম্মুখ স্বরধ্বনিসমূহ উচ্চারণ করা হয়, ঠোঁট জোড়া তখন পাশ পাশ ফাঁক হয়ে থাকে। জিবের পশ্চাৎ অংশ ক্রমশ উঁচু করে যে সব পশ্চাৎ স্বর উচ্চারিত হয়, সে সব স্থলে ঠোঁট অনুপাত মতো বর্তুলাকার ধারণ করে। এই সরল ভাগের মধ্যে আরেকটা জটিল স্তর অবশ্য লক্ষণীয়। সম্মুখ স্বর বর্তুলাকার ঠোঁটে যেমন সম্ভব, তেমনি পশ্চাৎ স্বর প্রসৃত ঠোঁটেও উচ্চারিত হতে পারে। এই কারণে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় জাতের সকল উচ্চতার ধ্বনিকেই প্রসৃত এবং বর্তুল—এই দুইভাগে শ্রেণীকরণ করা প্রয়োজনীয়। আবার সম্মুখ এবং পশ্চাৎ বলতে আমরা এতক্ষণ ধরে নিয়েছিলাম যে, স্বরধ্বনি হয় জিবের সম্মুখ ভাগ দিয়ে নয় পশ্চাৎভাগের সক্রিয়তায় রূপলাভ করে। বলা বাহুল্য, সমগ্র জিবের প্রক্রিয়া দুইভাগে ভাগ করা নিতান্তই অতি সরলীকরণ। নানা সূক্ষ্মতর বিভাগের সম্ভাব্য অস্তিত্বকে স্বীকার করে অন্তত জিবের সক্রিয় অংশকে অন্তত তিনটে মুলভাগে ফেলা দরকার—সম্মুখ, মধ্য, পশ্চাৎ। ঠোঁটের উচ্চতার ভিত্তিতে স্বরধ্বনির শ্রেণীকরণে এতক্ষণ যে তিনটে মূল ক্রমিক স্তরকে প্রধান বলে ধরে নিচ্ছিলাম তারও অসংখ্য সূক্ষ্মতর বিভাগ সম্ভব এবং স্বাভাবিক। তবে আমরা আমাদের সীমিত বর্ণনায় মৌলিক তিনটি ভাগের অন্তর্বর্তী, আরো চারটি ক্রমিক উচ্চতার স্তরকে স্বীকার করব। আমাদের বিচার্য উচ্চতার মোট সাতটি স্বর উপর, উপরনিচ, মধ্যের ওপর, মধ্য, মধ্যের নিচ, নিচের ওপর, নিচ। নিচে এ জাতীয় নানা ভাগকে ছকে চিত্রিত করে দেখান হচ্ছে। হরফগুলোর ব্যবহার করা হয়েছে ধ্বনিতত্ত্বের। কোনো বিশেষ ভাষার নয়। একেবারে ওপরে, ডান থেকে বামে জিবের কোন অংশ সক্রিয় তার নির্দেশ। তার নিচে, ডান থেকে বামে প্রতি অংশের ধ্বনির প্রসৃত ও বর্তুল উভয় রূপ বিচার। বামে ওপর থেকে নিচে উচ্চতার সাতটি স্তর ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী।

	সম্মুখ		মধ্য		পশ্চাৎ	
	প্রসৃত	বর্তুল	প্রসৃত	বর্তুল	প্রসৃত	বর্তুল
উপর						
উপর-নিচ						
মধ্যের উপর						
মধ্য						
মধ্যের নিচ						
নিচের উপর						
নিচ						

এই ছকের বাইরে আরো যে কয়েক জাতের স্বরধ্বনি পৃথিবীর অনেক ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়, সেগুলোর উল্লেখ করা দরকার। এগুলো রীতির দিক থেকে বর্ণিত স্বরধ্বনিসমূহ থেকে স্বতন্ত্র। এই অর্থে অঙ্কিত ছকের প্রতিটি স্বরধ্বনির ওপর এই রীতির আরোপ কল্পনা করা যায়। যেমন এতক্ষণ যে স্বরধ্বনির বর্ণনা করেছি তাব সবই মুক্তি পায় মুখ দিয়ে। কিন্তু জিবের সকল অংশের সকল উচ্চতার বর্তুল এবং প্রসৃত সকল স্বরধ্বনিই নাসাপথেও মুক্তিলাভ করতে পারে। সাধারণ স্বরধ্বনি উচ্চারণে অপর পিঠ নাসাপথের মুখ বন্ধ রেখে ধ্বনিবাহী সকল বায়ুপ্রবাহ কেবলমাত্র মুখের পথে ঠেলে দেয়। কিন্তু যদি নরম তালুর অপর পিঠ ঝুলে পড়ে নাসাপথ খুলে রাখে তাহলে হাওয়া একই সঙ্গে মুখ ও নাক উভয় পথে বেরুতে থাকবে। ধ্বনি আনুনাসিক হবে। নাসিক্য স্বরধ্বনি বাঙালির মুখে হরদম শোনা যায়। যেমন পাঁচ, পোঁচ, ছুঁচকে ইত্যাদি শব্দের প্রথম স্বরধ্বনি।

বিভিন্ন স্বরধ্বনি উচ্চারণে সাধারণ অবস্থায় জিবের সম্মুখ, মধ্য বা পশ্চাৎ যে অংশই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করুক না কেন, জিবের ডগা কিন্তু সব সময়েই একরকম নিষ্ক্রিয় এবং পরিবর্তনহীন। জিবের ডগা নিচের দিকে ঝুলে পড়ে নিচের দাঁত বা দাঁতের গোড়া আলতোভাবে স্পর্শ করে এলিয়ে থাকে। কিন্তু স্বরধ্বনি উচ্চারণ করবার সময়েও মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের মতো সকলকে জিবের ডগাকে ওপরের দিকে ঠেলে তুলে বেঁকিয়ে মধ্য তালুমুখী করে রাখা যায়। যে সমস্ত স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিবের স্থান ও উচ্চতা এবং ঠোঁটের বিশিষ্ট অবস্থান বর্ণিত ছকের অনুরূপ হয়েও, একই সঙ্গে জিবের ডগার এই মূর্ধামুখী বক্রতাকেও প্রশ্রয় দেয় সেগুলোকে মূর্ধন্যস্বর বলা যেতে পারে। ইংরেজি হরফ অনেক মার্কিন দেশীয় ব্যক্তি যেভাবে উচ্চারণ করেন তাতে মধ্য-জিবের মধ্য-উচ্চতার প্রসৃত স্বরধ্বনির সঙ্গে জিহ্বাগ্রের মূর্ধামুখী বক্রতা প্রায় সব সময়ে বিদ্যমান থাকে। ধ্বনিতত্ত্বে এটাকে প্রকাশ করা হয় ∂ ~ হরফ দ্বারা। এমনি করে অন্যান্য সকল সাধারণ স্বরধ্বনির একটি করে মূর্ধন্যরূপও ধ্বনিতত্ত্বের বিশ্লেষণে যুক্তিসংগতভাবে বিচার করা যেতে পারে।

স্বরধ্বনি সব সময়ে স্বরযুক্ত এটা সাধারণভাবে যখন-তখন বলি বটে, কিন্তু এর ব্যতিক্রম অসম্ভব নয়। পৃথিবীতে এমন ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় যেখানে ঘোষ স্বরধ্বনি এবং অঘোষ স্বরধ্বনি উভয়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য করা হয়। আমরাও বিশেষ অবস্থায় ফিসফিস

করে বা অতি ক্ষীণ কণ্ঠে যখন কথা বলি তখন স্বর প্রায় ধ্বনিতই হয় না। অবশ্য ইংরেজি বা বাংলায় সাধারণ কথায় অঘোষ স্বরধ্বনি শোনা যায় না, শোনা গেলেও তার কোনো বিশিষ্ট তাৎপর্য নেই।

হ জাতীয় ধ্বনিকে কেউ কেউ সকল অঘোষ স্বরধ্বনির সাধারণ প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করতে রাজি হয়েছেন। এর কারণ হলো এই যে ব্যঞ্জনধ্বনি বর্ণানুযায়ী হ জাতীয় ধ্বনি হলো কণ্ঠ্য শিসজাত এবং স্বরযন্ত্রের উৎপাদিত এই ধ্বনি মুখের অন্য কোথাও বাধা পায় না, পীড়িত হয় না বা কম্পন সৃষ্টি করে না। হ'র নানা সূক্ষ্ম রূপভেদ নির্ভর করে পরবর্তী স্বরধ্বনির ওপর। প্রতিটি বিশেষ হ উচ্চারণের সময় কেবলমাত্র গলার মধ্যে স্বরতন্ত্রী দুটো শক্ত হয়, সংকীর্ণায়িত পথে বাতাসকে পীড়িত করে এবং মুখের অনুগামী গহ্বর পরবর্তী স্বরধ্বনির বিশিষ্ট আয়তনাকার গ্রহণ করে। এইভাবে বিচার করলে প্রতিটি হ পরবর্তী ঘোষ স্বরধ্বনি অবিকল অঘোষ পূর্বাভাষ মাত্র।

ব্যঞ্জনধ্বনির প্রাণ-মহাপ্রাণ ধ্বনির অনুরূপ স্বরধ্বনিকেও একরকম কোমল ও কঠিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। কোমল স্বরধ্বনি উচ্চারণে মুখের নানা পেশী অপেক্ষাকৃত শিথিল এবং বায়ুপ্রবাহ মৃদুতর। কঠিন স্বরধ্বনিতে বিপরীত অবস্থা। ধ্বনিতত্ত্বে উপর, মধ্যের উপর এবং মধ্যের নিচে এই তিন স্থানের স্বরধ্বনিকে তুলনামূলকভাবে কঠিন এবং বাকিগুলোকে তুলনায় কোমল বলে অভিহিত করা হয়। ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে মহাপ্রাণতা কাঠিন্যের লক্ষণ, স্বল্পপ্রাণতা কোমলতার।

বাকধ্বনির শ্রেণীকরণে উদ্যোগী হয়ে আমরা প্রথম থেকে ধরে নিয়েছি যে মুখের বহতাবাণীকে বিশ্লেষণের স্বার্থে খণ্ড খণ্ড ধ্বনিতে বিভক্ত করা অসঙ্গত নয়। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমরা এ যাবৎ স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির বিস্তৃত বর্ণনা করেছি এবং মনে মনে এমন ধারণাও পোষণ করেছি যে, শুধুমাত্র স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনি নানা রকমে পরপর গেঁথে মুখের বুলি তৈরি হয়। এরকম ধারণায় গলদ কোথায়, এবার সেটাই বিবেচনা করে দেখা যাক। দুনিয়ার এমন অনেক ভাষা আছে যার অনেক কথা বা কথার অংশ স্বরব্যঞ্জন ধ্বনির সমাবেশের দিক থেকে অবিকল এক হয়েও ভিন্নার্থ প্রকাশ করে। এর কারণ হলো এই যে অংগসংস্থানের ভিত্তিতে পুঙ্খাপুঙ্খরূপে বর্ণিত স্বরব্যঞ্জন ধ্বনিকে আমরা যখন কোনো ভাষায় মুখের বুলিতে রূপ দেই তখন তার ওপর আরো নতুন গুণাগুণ আরোপ করি। সেহেতু এই গুণাগুণ বিশেষ ধ্বনির একক বৈশিষ্ট্য নয়, এবং এর প্রভাব অনেক ক্ষেত্রে একাধিক ধ্বনিপুঞ্জের ওপর সম্মিলিতভাবে বিস্তৃত থাকতে পারে। এই কারণে ধ্বনির মৌলিক শ্রেণীকরণে রূপভেদের এই তত্ত্বটা উহ্য রাখা হয়েছিল। কিন্তু একে একেবারে অবহেলা করা যায় না। রীতি ও উচ্চারণের দিক থেকে হুবহু এক হয়েও কোনো কোনো ধ্বনি কেবলমাত্র হ্রস্ব-দীর্ঘতার ভিত্তিতে ভিন্ন তাৎপর্য বহন করতে পারে। একই ব্যঞ্জনধ্বনি শোয়াসের ঝোঁক দিয়ে জোরে উচ্চারিত হচ্ছে আবার অন্য কোথাও বিনা ঝোঁকেও সহজ তালে বলা হয়। একই স্বরধ্বনি কখনও নিচুসুরে বাঁধা থাকে, কখনও স্বরতন্ত্রীর দ্রুততর কম্পনে তীক্ষ্ণতর উঁচুসুরে ধ্বনিত হয়। প্রায় সব ভাষাতেই একরকম হয়। তবে কোনো ভাষায় বৈষম্য নিতান্ত ধ্বনিগত এবং তুচ্ছ, কোনো ভাষায় এরকম তারতম্য ভাষাভাষীদের কাছে তাৎপর্যপূর্ণ, অর্থবাহী। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে এই তিনটি রূপবৈশিষ্ট্য—কালগত মাত্রা, শ্বাসাঘাত ও স্বরাঘাত—সবই সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার্য। কোনো স্থির নির্ধারিত পরম মান এখানে অচল। স্বর ও ব্যাঞ্জন ইত্যাদি ধ্বনির কল্পিত খণ্ডসত্তার সঙ্গে এরা অব্যবহিতভাবে সমকালে

বিদ্যমান থাকতে পারে বলে এবং কখন-কখনও গ্রন্থিবদ্ধ একাধিক ধ্বনির এলাকাকে প্রভাবান্বিত করে বলে এগুলোকে আমরা আরোপিত এবং বিস্তৃত ধ্বনিবৈশিষ্ট্য বলে অভিহিত করতে পারি। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বরব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহকে খণ্ডিত মূল ধ্বনি বলা অসঙ্গত হবে না। কারণ কালগত মাত্রা, শ্বাসঘাত এবং স্বরাঘাত মূল ধ্বনিকে আশ্রয় করে সূচিত হয়, স্বতন্ত্র কোনো স্বাধীন সত্তা নেই। এগুলো ধ্বনি নয়, ধ্বনি ও ধ্বনিমালার বৈশিষ্ট্য মাত্র।

আরেকটা উল্লেখযোগ্য ধ্বনিবৈশিষ্ট্য আছে বাকধ্বনির রূপবিচারে যারও নাম না করলেই নয়। ধ্বনিতে ধ্বনি গেঁথে মানুষ কথা বলে বা ধ্বনির মালা গড়ে। কিন্তু সকল ভাষায় ধ্বনি গাঁথার রীতি এক নয়। এক ধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির বাঁধন সব সময় একরকম হয় না। দুটো বাক্যের বা বাক্যাংশের মধ্যে লক্ষণীয় বিরাম পড়ে, দুটো শব্দে তার চেয়ে সংক্ষিপ্ত ধ্বনি বিরতি, একই শব্দে প্রায় নিরবচ্ছিন্নতা। সন্ধি করা জোড় শব্দে অনেক ধ্বনির গাঁথুনিতে শ্রুতিগ্রাহ্য ফাঁক পড়ে কি ? অনেক ভাষায় ধ্বনির গ্রন্থনরীতি স্পষ্ট, পরস্পরের জোড় একেবারে মিলে যায় না। অন্তত যে-কোনো দীর্ঘ বুলিতে কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর নানা আকৃতির ধ্বনিগুচ্ছের পর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট গ্রন্থিচ্ছেদ লক্ষ করা যায়। কোনো ভাষায়, বিশ্লেষণের জন্য, দীর্ঘ বুলিকে খণ্ডিত করা দুরূহ হয়ে পড়ে, কারণ তার ছোট বড় ধ্বনিপুঞ্জের মধ্যে কোনো বিভাজ্য ফাটল পাওয়া যায় না, সবটাই কী রকম যেন এক নিরবচ্ছিন্ন ধ্বনিমালার মতো মনে হয়। আবার এমন অনেক ভাষা আছে যেখানে দুটো ধ্বনির মধ্যে বিরতি ছেদ কত সংক্ষিপ্ত বা প্রলম্বিত তার ওপব ভাবার্থ নির্ভর করে। সার্থক ব্যাকরণেব পক্ষে তখন চোখে আঙুল দিয়ে একথাটা দেখিয়ে দেয়া দরকার যে, একই ধ্বনিপুঞ্জ আরোপিত গুণে মণ্ডিত এবং একই ক্রমে গ্রথিত হওয়া সত্ত্বেও কেবলমাত্র ধ্বনি পরস্পরেব গ্রন্থনরীতি পৃথক হওয়ার জন্য গোটা বুলির তাৎপর্য পাল্টে যাচ্ছে। এই গ্রন্থনরীতি কত রকমের হতে পারে তার ধারণা বিশেষ ভাষার উদাহরণ ছাড়া স্পষ্ট করে তোলা দুরূহ। যেহেতু এর নিজস্ব ধ্বনিগত প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নানা পরিমাণের নীরবতা, এর বর্ণনা দৃষ্টান্ত সহকারে পেশ করাই লাভজনক। বর্ণতত্ত্বের পরিচ্ছেদের সে আলোচনা সংযোজিত হবে। নিপুণ মালাকার যেমন সব ফুলের মালা একই রকম করে গাঁথে না, এই মালায় নানা রকম গেরোয় কারসাজিতে ছোটবড় বিচিত্র গুচ্ছে ফুলকে বাঁধে আমরাও তেমনি যখন বাক্‌ধ্বনির পুঁজি সম্বল করে কথামালা রচি তখন পরপর তাদের সাজিয়ে যাই বটে কিন্তু কখনো ফাঁক রেখে, কখনো ঘন করে, কখনো গুচ্ছে গুচ্ছে বেঁধে। এখন থেকে ভাষাব এই কৌশলকে আমরা ধ্বনি গ্রন্থি বলে উল্লেখ করব।

রকমারি রূপ : একই ভাষার রকম ফের

দুটো মুখের বুলির মধ্যে কতদূর পার্থক্য থাকলে দুটোকে একই ভাষার অন্তর্গত বলে বিবেচনা করব আর কখন দুভাষায় ভাগ করে দেব তার নীতি নির্ধারণ করা কঠিন, শুনতে একরকম মনে হলেই দুটো একই ভাষাভুক্ত হবে তার কোনো মানে নেই। কিছুই জানা নেই এমন দুটো ভাষার মধ্যে কেবলমাত্র শুনেই পার্থক্য করা, বিশেষ করে যদি সে দুটো এক গোত্রের ভাষা হয়, অনেক সময়েই সম্ভব নয়। চার-পাঁচ রকমের রেড ইন্ডিয়ান ভাষা পরপর আউড়ে গেলেও ধরতে পারব না কখন একটার শেষ, আরেকটার শুরু। ধরতে পারব না সেগুলোর মধ্যে ভাষাগতভাবে কোনটার সঙ্গে কোনটার কী আত্মীয়তা। একেবারে বিপরীত, শোনালেই যে

দুটো ভাষা বলে ধরে নিতে হবে তারও কোনো মানে নেই, একই ভাষা অঞ্চলবিশেষে এমনভাবে কথিত হয় যে অন্য অঞ্চলের লোকের কাছে তা অকথ্য এবং অশ্রাব্য। এমন কি দুজন বক্তা যদি পরস্পরের কথা বুঝতে না পারেন তবুও নিশ্চয় করে বলা চলে না যে দুজন দুভাষায় কথা কন। বোধগম্যতার মাত্রা পরিমাপ করাও দুরূহ। কোলকাতার বাবু নোয়াখালীর চাষীর কথা বুঝবেন বলে ভরসা কম। চাঁটগায়ের লোক বাড়ির পাশের চাকমাদের কথা বোঝে না। ভাষাতাত্ত্বিক বহু যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারেন যে, এগুলো সবই বাংলা ভাষার রকমফের মাত্র। যদি নিতান্তই একটা সংজ্ঞা দাঁড় করাতে হয় তবে এমন বলা চলে যে যদি কয়েকটি অঞ্চলের ভাষাভাষীরা পরস্পরের কথা সরাসরি বুঝতে পারে বা তাদের মধ্যবর্তী যে-কোনো অঞ্চল বা নিকটতম অঞ্চলসমূহের ভাষা বোঝে এবং পরস্পরের সঙ্গে বোধগম্যতার এই ক্রমানুসারে পরপর শৃংখলিত থাকে অথবা প্রতি অঞ্চলের নিজ ভাষারূপ ছাড়াও যদি সর্ব অঞ্চলের মান্য কোনো সাধারণ ভাষারূপ প্রচলিত থাকে এবং এই সকল অঞ্চলের ভাষারূপের মধ্যে যদি বর্ণ ও ব্যাকরণগত মিল দৃষ্ট হয় তবেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষা একই ভাষার অন্তর্গত নানা রূপ বলে পরিগণিত হবে। আমরা এই দীর্ঘ সংজ্ঞায় ভাষার আঞ্চলিক রূপের কথা বলেছি বটে তবে এই সংজ্ঞার মূল ভাব, যে কোনো অন্য রীতির বা প্রকারের ভাষারূপ সম্পর্কেও সমানভাবে প্রযোজ্য। আমরা এই পরিচ্ছেদে ভাষার নানা প্রকার রকমফের এবং তার অনুশীলন-রীতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

একই ভাষা কালে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে আমরা জানি। তিনশ বছর আগে বাংলার যে রূপ ছিল আজ তা নেই। চর্যাপদের বাংলা শহীদুল্লাহ সাহেব বুঝিয়ে না দিলে হাল আমলের বাংলা পাঠকের সাধ্য নেই যে অর্থোদ্ধার করে। ভাষার এই কালগত বিবর্তন ঐতিহাসিক বা তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের বিচার্য বিষয়। এই বিজ্ঞান বিবর্তনের ধারাকে বর্ণনা করে নানা শাখায় তার বিস্তারকে স্পষ্ট করে তোলে। নতুন ভাষার জন্মকালের ইঙ্গিত দেয়। এর সবটাই বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আওতার বাইরে। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব কেবলমাত্র সাম্প্রতিককালে চলন্ত ভাষার রূপ ব্যাখ্যায় উদ্যোগী। ভাষার যে রকমফেরকে প্রত্যক্ষ করতে চায় তা কালে বিস্তৃত নয়, তার বিস্তার বিশেষ স্থানে, বিশেষ কালে, বিশেষ সমাজে।

একই কালে একই ভাষা নানা অঞ্চলে নানা রূপ নিতে পারে, বিশেষ অঞ্চলের নামের সঙ্গে ভাষার সাধারণ নামটি জুড়ে দিয়ে এর আঞ্চলিক পরিচয় দিয়ে থাকি। যেমন নোয়াখালীর বাংলা, চট্টগ্রামের বাংলা ইত্যাদি, অনেক ভাষার ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে সমাজে সকল শ্রেণীর লোকের বুলি এক প্রকারের নয়, সামাজিক শ্রেণীভেদে ভাষার রূপভেদ দ্রাবিড় ভাষায় মেলে। দক্ষিণ ভারতের কোনো কোনো স্থানে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণের বুলিতে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ করা যায়। যেমন ধারওয়ার কানাডায়। বাংলাতে যে এরকম একেবারে হয় না তা নয়। ঢাকার যে বুলিকে ঢাকাইয়া বলা হয় তার কথকদের বিশেষ সামাজিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা সম্ভব। ঢাকার শাঁখারী এবং শকট-চালকেরা নিজেদের মধ্যে যে বিশেষ ভাষা ব্যবহার করে তার রূপ ঢাকার অন্যান্য পেশার অশিক্ষিত জনসাধারণের থেকেও স্বতন্ত্র। এ হলো ভাষার সামাজিক শ্রেণীভেদ।

এ দুজাতের ভিন্নতা ছাড়া ভাষার আরেকটি তৃতীয় পর্যায়ের স্তরভেদ লক্ষ করা যায়। যেমন অনেক ভাষাভাষীদের মধ্যে এমন রেওয়াজ প্রচলিত আছে যে একই ব্যক্তি দুরকম অবস্থায় একই ভাষাকে দুরকমে ব্যবহার করে। যেমন আরবিভাষীরা। রীতিগতভাবে আরবিভাষার

দুটো রূপ আছে। একটা হলো সাধু আরেকটা চলতি। অনেকটা বাংলার মতো, যদিও ব্যবহারিক তাৎপর্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। সাধু আরবিতে কেতাবাদি লেখা হয়। এই ভাষাই যে-কোনো ভদ্র পরিবেশে কহতব্য। বক্তৃতামঞ্চে, রেডিওতে, মজলিশে এই ভাষাই শোনা যায়। চলতি ভাষার এলাকা হলো ঘরে, যা নিতান্ত ঘরোয়া পরিস্থিতিতে। কোনো ভাষার এই পর্যায়ের বৈচিত্র্যকে আমরা আচরণিক বলে অভিহিত করতে পারি। পূর্ববঙ্গে বাংলা কয়েকটি বিশিষ্ট আচরণিক রূপ অনেক দিন থেকেই প্রচলিত ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পর সেগুলো আরো স্পষ্টতা লাভ করেছে এবং নতুন স্তরের ভিত্ গড়ে দিয়েছে। যেমন বঙ্গবাসী বরাবরই ঘরে বা ঘরোয়া পরিস্থিতিতে নিজের পৈতৃক আঞ্চলিক বাংলা ব্যবহার করত। বাইরে একটু পোশাকী অবস্থায় পড়লেই আপ্রাণ চেষ্টা করতো নদে-শান্তিপুরের বাংলাকে অনুকরণ করতে। কারণ শেষের ভাষাটাই ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে গোটা বঙ্গের আদর্শ চলতি বাংলার মর্যাদা লাভ করে এবং সকল শিক্ষিত বাঙালির কাছে বরণীয় হয়ে ওঠে। দেশভাগের পর পূর্বপাকিস্তানিদের মুখে বাংলা বুলি আরেকটা নতুন মোড় নিতে শুরু করেছেন বলে মনে সন্দেহ জাগে। বঙ্গজ বুলিকে বহুকাল থেকে বাঙালি সমাজে এবং বঙ্গসাহিত্যে অবজ্ঞা-উপহাসের গ্লানি বয়ে বেড়াতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গের লোক অনেক চেষ্টা করেও যখন অবস্থা বিশেষে কলকাতাই বুলি ভালমতো নকল করতে পারে নি তখন বিব্রত অনুভব করেছে, অপদস্থ হয়েছে। এরকম অবস্থার স্বাভাবিক ফল হিসাবে মনে হয় যে অভিযোগ এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আজ সেটাই যেন এখানে সেখানে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ভারতীয় প্রদেশ পশ্চিমবঙ্গের বুলি নির্ভুলভাবে অনুকরণ করতে না পারলেই হেয় হয়ে যাব, আজকের পূর্ববঙ্গবাসী যেন চোখ বুঁজে একথা মানতে আর রাজি নয়। আগের মতো আজও সে ঘরে আঞ্চলিক বুলি ব্যবহার করে, কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়েই সেটাকে ঝেড়ে ফেলে না। যাকে অন্যান্য অঞ্চলের শ্রোতার কানে অসহনীয় না হয় সে রকম করে একটু মেজে-ঘষে নিয়ে এই ঘরের বুলিকেই ঘরের বাইরে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত বাঙালি আজ এই রকম একটা অনির্দিষ্ট অস্থির মানের পরিমার্জিত আঞ্চলিক বুলিতে যে-কোনো বুদ্ধিবৃত্তিমূলক কঠিন তত্ত্বালোচনা অবাধে চালিয়ে যান। কলকাতার বুলিকে একেবারে বর্জন করেছেন তা নয়। বক্তৃতামঞ্চে, রেডিওতে, সাহিত্যের আসরে এখনও সে বুলির একচ্ছত্র আধিপত্য। তবে এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে, এই তিন ভঙ্গীর বাংলার মধ্যে কালক্রমে মধ্যের বুলিটি নতুন নতুন শক্তি সঞ্চয় করে, নতুন মর্যাদায় মণ্ডিত হয়ে সর্বজন অনুকরণীয় পূর্বপাকিস্তানের সাধারণ চলতি বাংলায় পরিণতি লাভ করতে পারে। নানা আঞ্চলিক ভাষায় লেনদেনের মধ্য দিয়ে কোনো দেশে একটি নতুন সাধারণ কথ্যবুলি কী করে জন্ম নেয় তার বিরাট পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে পূর্বপাকিস্তানে। উৎসাহী ভাষাতত্ত্ববিদদের কর্তব্য এই অবস্থার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ও পরিপূর্ণ বর্ণনা সকলের সামনে পেশ করা।

আঞ্চলিক, সামাজিক এবং আচরণিক ভাষার এই তিনটি বহু প্রচলিত প্রকরণের মধ্যে প্রথমটি ভাষাতত্ত্ববিদদের মনোযোগ লাভ করেছে সবচেয়ে বেশি। আধুনিক বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের জন্মলাভের অনেক আগে আঞ্চলিক বা ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্বের কাজ শুরু হয়। ভাষাতত্ত্ববিদদের প্রথম টনক নড়ে যখন কালের ধারায় কোনো ভাষার বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হঠাৎ লক্ষ করলেন যে কিছু দৃষ্টান্ত সব সময়েই এদিক-সেদিক ছড়িয়ে থাকে, যেগুলোকে কোনো সূত্রের বাঁধনেই স্থিরভাবে গেঁথে দেয়া যাচ্ছে না। একটি অবিভক্ত উৎস

থেকে পরবর্তী শাখা এবং প্রতি অবিভক্ত শাখা থেকে পরবর্তী প্রশাখা বিস্তার লাভ করেছে, এমন মীমাংসা পরিপূর্ণরূপে সন্তোষজনক হচ্ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল প্রতি স্তরেরই উৎস বা মূল একাধিক বা একই স্তরের একই ভাষার রূপ বিচিত্র এবং একই ভাষার নানারূপ সামগ্রিকভাবে বিবর্তনের ধারায় বা যে কোনো সাধারণ নীতি-নিয়মের বন্ধনকে স্বীকার করতে পারে। এই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উনবিংশ শতাব্দীর জার্মান ও ফরাসি ভাষাবিদরা ভাষার মানচিত্র অঙ্কনে উদ্যোগী হলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল একই ভাষার নানা এলাকার রূপগত সীমাকে স্পষ্ট করে চিহ্নিত করা। প্রসঙ্গত একই ভাষার নানা বৈশিষ্ট্য কি বিচিত্র সম্পর্কে নানা এলাকায় বিস্তারিত, কি সম্ভাব্য কারণে তারা পরস্পরের উপর প্রভাবশালী, নানা ভাষাগত প্রভাবের জয় পরাজায়ের টানাপোড়েন ইত্যাদি সকল ইতিবৃত্তকে উদ্ঘাটিত করা তাদের লক্ষ্য। আমরা আরো বিস্তৃতভাবে জার্মান ও ফরাসি ভাষার দুটো বিখ্যাত মানচিত্রের আলোচনা করব এবং তাদের অনুসন্ধান রীতির মূল তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করব। পূর্ববঙ্গে আঞ্চলিক ভাষার রূপভেদ লক্ষ করা যায় তারও একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা এই পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অবশ্য তার আগে ভৌগোলিক ভাষাতত্ত্ববিদরা ভাষার আঞ্চলিক বিবর্তন বর্ণনা করতে গিয়ে যে পরিভাষা ব্যবহার করেন তার দু'একটা সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করে নেয়া ভালো। প্রথম কথা হলো এই যে, ভাষার রূপভেদকে বর্ণনা করতে হলে এলোমেলো বিচার না করে ধাপে ধাপে এগুতে হবে। বিরাট এলাকার জবানী সংগ্রহ করে তাদের ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, অর্থ, বাক্য সব তুলনা করে তবে স্থির করতে হবে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকারের তারতম্য কত গভীর বা অগভীর।

ধ্বনিগত পার্থক্য এবং বর্ণগত পার্থক্য এক নয়, যেমন ধরা যাক দুটো কথা : /কাল/এবং/খাল/। 'ক' এবং 'খ' এ ভাষার দুটো স্বতন্ত্র বর্ণ। কারণ ধ্বনির এই সামান্য পাথ্যক্যের জন্য অর্থভেদ ঘটছে। ক অল্পপ্রাণ, খ মহাপ্রাণ। এই ভাষার কোনো বিশেষ অঞ্চলে কোনো অনির্ণীত কারণে হয়ত কেউ খ কে একটু অতিরিক্ত খসখসে গলায় বলতে শুরু করল। দেখাদেখি আরো অনেকে এই ঘর্ষণজানিত ধ্বনি খ-কে উচ্চারণ করতে লাগ। ক্রমে এমন দাঁড়াল যে এই অঞ্চলে প্রায় সবাই খালকে [X al] বলে। এরকম অবস্থায় আমরা এমন বলতে পারি না যে, এ অঞ্চলে খ বর্ণ নেই, আছে X কারণ, বৈপরীত্যের বর্ণ ধর্ম অনুসারে আদর্শ বুলির ক ঃ খ এবং অঞ্চল বিশেষের K ঃ X সম্পূর্ণরূপে তুল্যমূল্য। যতক্ষণ অবধি দ্বিতীয় বুলিতে খ'র সঙ্গে K ঃ X-র কোনো তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য সূচিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত উভয় বুলির মূল বর্ণসম্পদ অভিন্ন বলে মেনে নিতে হবে। দুই অঞ্চলের ভাষার মধ্যে যে ধ্বনিগত বৈষম্যের দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো তার ভিত্তি হলো সংখ্যানুপাত। অনেক লোকের মুখে দ্বিতীয় অঞ্চলে/খ/বর্ণের শব্দাদি [x] ধ্বনিতে উচ্চারিত হয়, এইমাত্র। আরো একটা কথা। এই [x] উচ্চারণ বর্ণগত নয়, অবস্থানগত। যেমন, হতে পারে যে শব্দের আদিতে, স্বরবর্ণের আগে এই অঞ্চলে [x] উচ্চারিত হয়, অন্যত্র [kh], এরকম অবস্থায় প্রথম বুলির বর্ণ /ক/এবং/খ/, দ্বিতীয় অঞ্চলের বর্ণ /ক/এবং/x/। একরকম বলার কোনো কারণ নেই। আঞ্চলিক ভাষা বর্ণনার ক্ষেত্রে এরকম সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে নানা অঞ্চলের বুলির বর্ণমালা এক হয়েও তাদের ধ্বনিরূপ বহু এবং বিচিত্র হতে পারে।

ধ্বনিগত পার্থক্য কখন বর্ণগত পার্থক্য বলে পরিগণিত হতে পারে তার একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত নেয়া যাক। ধরা যাক, কোনো বিশেষ অঞ্চলে /ক/,/খ/ দুটো বর্ণ আছে। /খ/এর দুটো ধ্বনিরূপ আছে। একটা হলো [kh] অন্যটা [x] শব্দের আদিতে, স্বরধ্বনির পূর্বে [x]

যেমন xy অন্যত্র [kh]. [kh] পাই দুই স্বরধ্বনির মধ্যে যেমন VkhV. এখন যদি কোনো কারণে কোনো বিশেষ শব্দের আদ্যস্বর লুপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু [kh] উচ্চারণ অটুট থাকে তাহলেই বর্ণ বৈপরীত্য সৃষ্টি হলো। তখন বলতে হবে এ অঞ্চলে x একটি স্বতন্ত্র বর্ণ, খ'র ধ্বনিরূপ মাত্র নয়। এই অঞ্চলে /ক/,/খ/এবং /x/। তিনটেই বর্ণরূপে বিবেচ্য।

এমনি করে দুটো অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দাবলী মোটামুটি এক হলেও পদগঠনের রীতি একেবারে বিপরীত। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের বাংলার মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই পদগঠনের রীতি নিয়ে। অঞ্চলভেদে বাক্যরীতির ভেদ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মাত্র দুটো খণ্ডিত উক্তি সামনে রেখে তাদের মধ্যে ভাষাগত পার্থক্য কী তা বর্ণনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু দৃষ্টান্ত যদি বহু এবং বিস্তৃত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে যে পার্থক্যগত বৈশিষ্ট্য তাকে যদি জটিলতার ক্রমানুসারে সাজাতে হয় তবে সে কাজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। তার ওপর যদি সেই বৈশিষ্ট্যের ক্রমসম্বল করে জমি জরিপে নামতে হয়, কোন বৈশিষ্ট্য কোন ভূমির কোন প্রান্ত থেকে কোন প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত তার মীমাংসা করতে হয়, তাহলে সে দায়িত্ব পালন প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। কারণ ভাষা মানুষের মুখের সম্পদ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলেও ঠিক নদী-সাগর-গাছপালার মতো অপেক্ষাকৃত স্থির স্থায়ী, স্পষ্ট বস্তু সীমানায় আবদ্ধ নয়। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলের ভাষা-সীমানা ঠিক কোনখানে, দু'অঞ্চলের মধ্যে একশবার ছুটোছুটি করেও, সাধারণ পথিকের সাধ্য নয় তাকে খুঁজে বার করে। একটু একটু করে বদলাতে হয় এক জায়গা এসে সবটা মিলে এমন রূপ নেয় যে, তখন শোনামাত্র সন্দেহ থাকে না যে এটা ভিন্ন অঞ্চলের বুলি। এইজন্যে অনেকে বলেছেন যে ভাষার ভৌগোলিক সীমানা বলে ধরাবাঁধা কোনো স্পষ্ট সীমারেখা থাকতে পারে না। সবই ক্রমিক, কিছুই আকস্মিক নয়। সবই ঢালামেলা, কিছুই চুলচেরা নয়।

ভাষাবিদরা এটা অস্বীকার করেন না। অবশ্য তাঁরা বলেন যে, আমরা যখন আঞ্চলিক ভাষাব আঞ্চলিক মানচিত্র আঁকতে বসি তখন আমরাও এমন কিছু সূক্ষ্ম রেখায় সীমানা চিহ্নিত কবব বলে মনস্থ করি না। আমরা মানি যে কোনো অঞ্চলের ভাষারূপে যখন আস্মিকভাবে একটা নয়া বাকভঙ্গী সংযুক্ত হয় তখন প্রথম সেটা মাত্র অল্প কয়েকজনের মুখে আন্দোলিত হয়। যদি সে নবীনতার প্রাণশক্তি প্রবল হয় তবে ক্রমে সেটা অধিক সংখ্যক লোকের মুখে ভর করে চক্রাকারে তরঙ্গায়িত হয়ে ক্রমশ বৃহত্তর এলাকায় বিস্তার লাভ করে। উৎসগত কেন্দ্রবিন্দু থেকে যত দূরে যায়, তত তার প্রভাব ক্ষীণ হতে থাকে এবং শেষটায় প্রবলতর কোনো বিপরীতমুখী ভাষারূপগত প্রভাবের তরঙ্গাঘাতে বা অন্য কোনো মানবিক বা প্রাকৃতিক বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। আমাদের গোটা বিচারটাই পরিসংখ্যানমূলক। মোটামুটিভাবে একটা দৃষ্টান্ত যদি এক গ্রামের অনেক লোকের মুখে একরকম উচ্চারিত হয়, পাশের গ্রামের অনেক লোকের মুখে অন্যরকম; তাহলে আমরা এই দু'গ্রামের মধ্য দিয়ে একটা ভাষা-রেখ বা আইসোগ্লাস কল্পনা করতে পারি। কত অধিক বিচিত্র এবং তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত কত বেশি লোকের জবানিতে পরখ করছি এবং সেই সব লোকেরা কত কাছাকাছি অবস্থিত, তার ওপর নির্ভর করে পরিসংখ্যানমূলক বিচার। বাস্তব অবস্থাকে কতটা সততার সঙ্গে প্রতিফলিত করছে। যেখানে পাহাড় মাথা তুলেছে, নদী বয়ে গেছে. জিলা-থানা-গ্রামের সীমানা পড়েছে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ শ্রেণীতে মানুষ ভাগ হয়েছে, কোনো কারণে বসতি বিরল হয়ে এসেছে এমন স্থানেই ভাষা-রেখও স্পষ্টতা লাভ করতে চায়। ভাষাতত্ত্ববিদ যখন তার প্রশ্নাবলী তৈরি করেন, তখনই এগুলোরও সন্ধান নেন এবং

এরকম সম্ভাবনাপূর্ণ সন্ধিস্থলে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হন।

একটা ভাষা-রেখ একটি খণ্ডিত বুলির প্রতীক, যার দু'পাড়ে সেই একক বৈশিষ্ট্যের দুটো ভিন্ন রূপ দৃষ্ট হয়েছে। যেমন দাগ টেনে একপাশে লেখা হলো [kha ঃ l] অন্য পাশে [xa ঃ l] এরকম বৈপরীত্যের একাধিক নজির জরিপ করে যদি একটার পর একটা ভাষা ভাষা-রেখ টেনে যাওয়া যায় তবেই সেই ভূমির ভাষাগত মানচিত্র রচিত হয়। তখন দেখা যায় যে, ভাষার গতি অবিশ্বাস্য রকম আঁকাবাঁকা। একই ভাষা-রেখ একাধিক অঞ্চলকে ভেঙেচুরে পেঁচিয়ে ধরেছে, একাধিক ভাষা-রেখ এখানে সেখানে পরস্পরকে কেটে বেরিয়ে গেছে। সেখানে ভাষা-রেখ কোন গতিপথ অবলম্বন করবে আগে থেকে তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ করার উপায় নেই। কেবলমাত্র কয়েকটি সাধারণ সম্ভাবনাকে সম্বল করে গবেষক নিজেকে বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সজাগ রাখতে পারেন এই পর্যন্ত। অনেকগুলো সংলগ্ন ভাষা-রেখ সমান্তরাল রেখায় সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যদি কখনও তেমন পাওয়া যায় তখন একরকম জোর করে বলা যায় এইখানে একটা স্পষ্ট ভাষাসীমানা সূচিত হলো। সব ভাষা রেখের যে সমান মূল্য তা নয়। তার কিছু মুখ্য, কিছু গৌণ। কোনটা মুখ্য কোনটা গৌণ সে বিচার অনেকখানি নির্ভর করে সমগ্র অবস্থারও যে সম্ভাব্য চিত্র ভাষাতত্ত্ববিদ বিশেষ কর্মক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে রচনা করেছেন তার ওপর। মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র এই বলা চলে যে একটি ক্ষীণ ভাষা-রেখের চেয়ে একাধিক ভাষা-রেখেব ঘন সন্নিবেশ বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। নিত্য ব্যবহৃত শব্দাবলীর প্রতীক ভাষা-রেখ, কচিৎ ব্যবহৃত পণ্ডিতি শব্দের ভাষা-রেখের চেয়ে দামী। যে ভাষা-রেখ কোনো ভোগোলিক-রাজনৈতিক-সামাজিক সীমানার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বৃহৎ কোনো এলাকাকে গণ্ডিবদ্ধ করে তার মর্যাদা আপাতদৃষ্টিতে বাহ্যকারণহীন কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চল বেষ্টনকারী ভাষা-রেখের চেয়ে অনেক বেশি। কর্মক্ষেত্রে গভীরভাবে প্রবেশ করে অভিজ্ঞ ভাষাবিদ বিশেষ অবস্থা থেকে উদ্ভূত নানা উপলব্ধিকে আশ্রয় করে এ বিষয়ে পরিচ্ছন্নতর দৃষ্টি লাভ করেন।

আঞ্চলিক ভাষাব স্বরূপ নির্ণয়ে নানা ভাষাবিদ নানা দিক থেকে উদ্যোগী হয়েছেন। কেউ কেউ কেবলমাত্র শব্দাবলী সংকলিত করে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। এই রীতিই প্রাচীনতম, তারা সেই সংকলনে অনেক ক্ষেত্রে আবার শুধুমাত্র সেই সমস্ত শব্দ বা পদই সংগ্রহ করেছেন যেগুলো সর্বজনগৃহীত আদর্শরূপ থেকে স্বতন্ত্র। এছাড়াও এ জাতীয় সংকলনেব আরেকটা দুর্বলতা এর বানান পদ্ধতি। প্রায়ই বোঝার উপায় নেই যে সে বানান কতটা ধ্বনিগত, আর কতটা বর্ণগত, কতটা নিছক আদর্শ ভাষারূপের লিখন পদ্ধতির অন্ধ অনুকরণ মাত্র। বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষারূপের কিছু ব্যাকরণও লেখা হয়েছে। তবে সেগুলোও বেশিরভাগ ইতিহাসমূলক। প্রধান লক্ষ্য ছিল বিবর্তনের কোনো ধারা অবলম্বলন করে সেই বিশেষ অঞ্চলের ভাষারূপের কিছু ব্যাকরণও লেখা হয়েছে। তবে সেগুলোও বেশির ভাগ ইতিহাসমূলক। প্রধান লক্ষ্য ছিল বিবর্তনেব কোন ধারা অবলম্বন করে সেই বিশেষ অঞ্চলের ভাষারূপের জন্ম তার রহস্যোদ্ধার করা। আধুনিক ভাষাতত্ত্বের শিক্ষাগুরু ব্লুম ফিল্ড এই বিচারের গলদ কোথায় তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। কোনো ক্ষুদ্র অঞ্চলের ভাষারূপে বিবর্তনের প্রভাব কিভাবে কার্যকরী হয়েছে তা বুঝতে হলে বৃহত্তর অঞ্চলে ক্ষুদ্রবৃহৎ চক্রাকারে প্রসারিত নানা প্রভাবকে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করা দরকার, সে কাজ পরিপাটিরূপে নিষ্পন্ন করা স্বল্প আয়োজনে, অল্প সময়ের মধ্যে সম্ভব নয়। বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্ব সে রকম গবেষণায় উৎসাহিত নয়। বরঞ্চ সরাসরি কোনো আঞ্চলিক

ভাষার চলতি রূপকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করাই সর্বতোভাবে কাম্য। ভাষার নানারূপের মধ্যে কোনো রকম মর্যাদাভেদ বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের চোখে অর্থহীন। বিশেষ অঞ্চলের ভাষাকে বিশ্লেষণ করতে হবে, ঠিক যেমন করে বিশ্লেষণ করব রাজধানীর বা ভদ্রসমাজের সর্বজনী সাধু-চলতিকে অর্থাৎ আঞ্চলিক বুলির নিজস্ব বর্ণমালা, পদগঠন, বাক্যরীতি সব এক এক করে বর্ণনা করতে হবে। আঞ্চলিক ভাষার এ জাতীয় আলোচনা দুর্লভ।

আঞ্চলিক ভাষার যে তৃতীয় বিচার ভাষাতত্ত্বে স্থান পেয়েছে, তাকে বলা যেতে পারে ভাষা-জরিপ, ভাষার মানচিত্র রচনা। এই এলাকায় প্রথম উল্লেখযোগ্য হলো জার্মান ভাষার মানচিত্র। ১৮৭৬ সনে জর্জ ভেঙ্কর এই কাজ শুরু করেন। সকল মানচিত্র সঙ্কলিত হয়ে প্রকাশ হতে হতে তিরিশ বছর পার হয়ে যায়। ভেঙ্কেরের পদ্ধতি দোষে-গুণে মণ্ডিত। তিনি চল্লিশটা বাক্য নিজের জার্মান বুলিতে রচনা করে সেগুলো দেশের সর্বত্র স্কুল-শিক্ষকদের কাছে কিছু নির্দেশনামা-সহ পাঠান। এ ব্যাপারে পুরো সরকারি সাহায্যও লাভ করেছিলেন। ঐ চল্লিশটা বাক্যই বিভিন্ন অঞ্চলের চল্লিশ হাজার মাস্টার সাহেবরা নিজেদের আঞ্চলিক বুলিতে তজমা করে ভেঙ্কেরের কাছে ফেরত পাঠান। মূলের সঙ্গে একটা একটা করে মিলিয়ে তর্জমাকারীর এলাকার সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপন করে গড়ে ওঠে এই বিবাট আঞ্চলিক ভাষার মানচিত্র। প্রতিটি বৈষম্যের প্রতীক চিহ্ন হিসেবে সেই বিশেষ অঞ্চলকে বিভক্ত করে অঙ্কিত হয়েছে এক একটি ভাষা-রেখ। মানচিত্রের সঙ্গে এই ভাষা-রেখগুলো প্রথমবারে সন্নিবেশিতও হয়েছিল প্রশংসনীয় কৌশলের সঙ্গে। ভাষা-রেখগুলো আঁকা হয়েছিল স্বচ্ছ তেল-কাগজে। মানচিত্রগুলো দেয়া হয়েছিল স্বতন্ত্রভাবে। যে-কোনো বৈশিষ্ট্যের ভৌগোলিক বিস্তারকে প্রত্যক্ষ করতে চাইলে মানচিত্রের ওপর সেই বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিতবাহী ভাষা[illegible] স্বচ্ছ কাগজটি চেপে ধরলেই এক নজরে স্পষ্ট দেখা যায় সেই ভাষা-রেখ বিভিন্ন অঞ্চলকে কিভাবে বিভক্ত করেছে। যে পদ্ধতিতে ভেঙ্কর তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার একটি [illegible] স্পষ্ট। যেসব শিক্ষকেরা ভেঙ্কেরের বাক্যাবলী নিজেদের আঞ্চলিক জবানিতে তর্জমা করে পাঠান তারা কেউ ভাষাতত্ত্বে জ্ঞানী ছিলেন না। ধ্বনি ও বর্ণগত পার্থক্য তাদের জানা [illegible] না। ধ্বনির সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের কানে ধরা পড়া স্বাভাবিক ছিল না। হয়ত প্রচলিত লিখন পদ্ধতির কল হয়ে যা প্রকৃত উচ্চারণ নয় তাও লিখে থাকবেন।

ফরাসি ভাষাতত্ত্ববিদ এদঁমোর জরিপনীতি এ শেষোক্ত অনিশ্চয়তা থেকে অপেক্ষাকৃত মুক্ত। নিজে পেশাদার ভাষাতত্ত্ববিদ, নিজের পরিণত কান দিয়ে যে সব তারতম্য ধরতে পেরেছেন কেবলমাত্র সেগুলোকে ভিত্তি করেই মানচিত্রের ওপর ভাষারেখ টেনেছেন। স্বভাবতই একজনের পক্ষে বেশি বড় এলাকা তন্ন তন্ন করে ছেকে পরখ করা সাধ্যের বাইরে। এঁদমো দুহাজার শব্দ এবং বাক্যাংশের এক প্রশ্নপত্র হাতে নিয়ে একজন একজন করে বক্তার বুলি নিজ কানে বাজিয়ে ধ্বনিতত্ত্বের আদর্শ হরফে টুকে নিয়েছেন। পরে সবগুলোর মিল-অমিল অনুযায়ী মানচিত্রের প্রত্যেক বক্তা-পিছু একটিবার বিন্দুচিহ্ন এঁকেছেন। একই বৈশিষ্ট্যের প্রান্তিক বিন্দুমালা যোগ করে তৈরি হয়েছে এক একটি ভাষা-রেখ। বলা বাহুল্য পর্যবেক্ষণাধীন ব্যক্তির প্রতীক বিন্দুচিহ্ন আরো ঘন সন্নিবেশিত হলে এই গবেষণার ফলাফল আরো তাৎপর্যপূর্ণ হতো। যদিও পরীক্ষণীয় বুলির দৃষ্টান্ত ভেঙ্কেরের তুলনায় এখানে অনেক বেশি ছিল, কিন্তু সে বুলির কথক এ ক্ষেত্রে ছিল তুলনায় নগণ্য। তাছাড়া ভেঙ্কর ভেদাভেদ যাচাই করেন সম্পূর্ণ বাক্যের মানদণ্ড আরোপ করে। এঁদমোর পুঁজি খণ্ডিত শব্দ বা বাক্যাংশ। উভয়ের সীমাবদ্ধাতা থেকে মুক্ত মানচিত্র যে আদর্শ স্থানীয় হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পূর্বপাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নমুনা আধুনিককালে সংগৃহীত হয়নি। প্রায় ষাট বছর আগে গ্রেয়ার্সন সাহেব তাঁর লিঙ্গুইস্টিক সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গ্রন্থাবলীতে যে সংকলন রেখে গেছেন, আজও তা সব দিক থেকে অতুলনীয়। বাইবেলের অমিতব্যয়ী সন্তানের গৃহপ্রত্যাবর্তনের একই কাহিনীকে তিনি ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত প্রতি ক্ষুদে অঞ্চলের বক্তার ঘরোয়া বুলিতে তর্জমা করিয়ে নেন। সাধ্যমতো ধ্বনিতত্ত্বমূলক হরফে তার লিখিত রূপকে পরিশোধিত করেন। তারপর প্রতিটি দৃষ্টান্ত খুঁটিয়ে বিচার করে তার ধ্বনিগত ও ব্যাকরণগত সকল উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে প্রকাশ করার চেষ্টা করেন। এই জাতীয় বর্ণনার ফলাফল সামনে রেখে তিনি বাংলা ভাষায় বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ যে সকল প্রধানভাগে বিভক্ত করেন তার পটভূমি ছিল সমগ্র বাংলাদেশ। যদিও আমাদের বিচার্য এলাকা পূর্ববঙ্গ বা পূর্বপাকিস্তান, আমরা গ্রেয়ার্সন সংগৃহীত উপাদানের ওপর নির্ভর করে কয়েকটি উল্লেখযোগ সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি। বলা বাহুল্য, আমাদের বক্তব্য বর্ণনামূলক ভাষাতত্ত্বের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং বিশ্লেষণরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং সেই কারণে গ্রেয়ার্সনের নানা মীমাংসার সঙ্গে অনেক জায়গায় মিলবে না।

গোটা পূর্বপাকিস্তানের বাংলাকে মোটামুটি তিনটি প্রধান এলাকায় ও ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ক. চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, সিলেট। খ. কুমিল্লা, বরিশাল, ঢাকা, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ। গ. বগুড়া, দিনাজপুর, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুর। এই তিনটে প্রধান ভাগের মধ্যে দুটো নিতান্তই ছোট এলাকা আছে—যেখানকার ভাষা আশেপাশের ভাষা থেকে একেবারে আলাদা। এত আলাদা যে অনেকে মনে করতেন, এ দুটোর মধ্যে অন্তত একটা কিছুতে বাংলা বলে বিবেচিত হতে পারে না। একটা হলো ময়মনসিংহের হাজংদের ভাষা, দ্বিতীয়টি পাহাড়িয়া চট্টগ্রামের চাক্‌মাদের ভাষা। চাক্‌মাকে অনেকেই চিন-তিব্বতীয় ভাষার অন্তর্গতক বলে মনে করতেন। এখন অবশ্য ভাষাতত্ত্ববিদেরা সবাই স্বীকার করেন যে হাজং এবং চাকমা উভয়েই বাংলা ভাষার দুটো আঞ্চলিক রূপ মাত্র। হাজং পড়ে/খ/এলাকায়, চাক্‌মা/ক/এলাকায়।

যেভাবে ভাগ করা হয়েছে, তাতে /ক/এলাকা হলো পূর্বপাকিস্তানের পূর্বপ্রান্তীয় এবং /গ/ হলো পশ্চিম প্রান্তীয়, /খ/ মধ্যবর্তী আমরা ভাষারেক টেনেছি, লম্বালম্বিভাবে, উত্তর-দক্ষিণে। পশ্চিম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে নিকটবর্তী। সেই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গীয় (ভারত) বাংলা বা তার আদর্শ চলতি রূপের সঙ্গে এর পার্থক্য ন্যূনতম। বগুড়া, দিনাজপুর যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, পাবনা, রাজশাহী, রংপুরের কথা তুলনামূলকভাবে পূর্বপাকিস্তানের বৃহত্তর অঞ্চলের যত নিকটবর্তী তার চেয়ে তার ঘনিষ্ঠতর আত্মীয়তা পশ্চিবঙ্গের বৃহত্তর এলাকার বাংলার সঙ্গে। পূর্বপাকিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরেকটু বেশি দূরে এবং সেই পরিমাণে আদর্শ কথ্যবুলি থেকে দূরে অবস্থিত। সবচেয়ে দূরে পূর্বপ্রান্তীয় /ক/ এলাকা যেখানকার অনেক ভাষারূপ এত পৃথক যে পশ্চিমবঙ্গের অনেক অঞ্চলে তা বোধগম্য নয়। নিজেদের মধ্যে বোধগম্যতার ভিত্তিতে এই তিন এলাকার পারস্পরিক সম্পর্ক ক্রমিক। /ক/ এলাকার বুলি /খ/ অঞ্চলে যতদূর বোঝা যাবে, /গ/ অঞ্চলে তার চেয়ে কম বোঝার আশঙ্কা, কোনো কোনো /ক/'র বুলি কোনো কোনো /গ/ অঞ্চলে আদৌ বোধগম্য নয়। বিপরীত দিক থেকে এই সম্পর্ক কিছুটা স্বতন্ত্র হতে পারে। অর্থাৎ /গ/'র লোক /খ/'কে, /খ/'র/ক/ কে যতটা বুজতে পারে, তার চেয়ে বেশি সম্ভবত /ক/'র লোক /খ/'কে, /খ/ র লোক /গ/'কে বুঝতে পারবে। পশ্চিমবঙ্গীয় বুলির সর্বজনস্বীকৃত আপেক্ষিক মর্যাদাই হয়তো এই প্রবণতার মূল কারণ।

এই তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত আঞ্চলিক ভাষাসমূহের মধ্যে ধ্বনিরূপগত পার্থক্য লক্ষণীয়। এ যে কেবল বর্ণের পারিবেশিক ধ্বনিরূপের বৈষম্য তা নয়। নিতান্ত সাধারণভাবেও এক অঞ্চলের এক বর্ণের বৃহত্তম সংখ্যক উচ্চারণ, অন্য অঞ্চলের একই বর্ণের বৃহত্তম সংখ্যক উচ্চারণের সঙ্গে তুল্যমূল্য হলেও রীতি ও অবস্থানের দিক থেকে একেবারে এক নয়। তাছাড়া বর্ণ এক হয়েও তার ধ্বনিরূপের বিক্ষেপ নানা অঞ্চলের নানা রকম।

পূর্বপাকিস্তানের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তীয় এলাকা /গ/'র বর্ণমালা আদর্শ চলতি বাংলার সঙ্গে অভিন্ন, কিন্তু আদর্শ চলতি বাংলার সঙ্গে গোটা শব্দ ধরে ধরে তুলনা করলে কতগুলো ধ্বনিগত বৈষম্য বড় হয়ে দেখা দেয়। যেমন—

আদর্শ	/ক/ এলাকায়
/শ ও র ই র এ/	(শ ও র ই ল এ)
/প এ ট/	প এ্যা ট/
/ব অ ড় ও/	/ব অ ড় অ/

ব্যাখ্যা করার সুবিধার জন্য এ জাতীয় পার্থক্যকে আমরা শব্দগত পার্থক্য বলে উল্লেখ করব। /ক/ এলাকা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে আদর্শ চলতিতে যেখানে /র/ /ক/ এ সেখানে /ল/ /এ 'র জায়গায় /এ্যা/ /ও/'র জায়গায় /অ/। দু'অঞ্চলেব দুটো শব্দের ধ্বনি এবং অর্থ উভয় দিক পাশাপাশি বেখে তুলনা করলে যদি কোনো আমূল বৈপরীত্য লক্ষ করা যায় তাহলে আমরা তাকে আর শব্দগত নয় বলে অর্থগত বৈষম্য হিসেবে উল্লেখ কবব। যেমন আদর্শ চলতি বুলিতে যা/ম এ এ/, হাজং (খ)-এ তা /ত ই ম আ ত/, চাক্‌মায় (ক) /ম ই ল আ। এমনও হতে পারে যে দু'অঞ্চলে একই উচ্চারণের দুটো শব্দ দুটো স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত হয় যা তাদের একাধিক দ্যোতনার মধ্যে কেবলমাত্র আংশিক মিল বিদ্যমান। আঞ্চলিক ভাষারূপের তুলনা করতে গিয়ে আমবা এর সবগুলোকেই অর্থগত পার্থক্য বলে উল্লেখ করব। বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে ধ্বনিরূপগত পার্থক্যই ব্যাপক, বর্ণগত পার্থক্য অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ, শব্দগত বৈষম্যের ছড়াছড়ি, কিন্তু অর্থগত বৈষম্য দু-একটা ক্ষুদ্র এলাকা বাদ দিলে সচরাচর দৃষ্ট হয় না। প্রসঙ্গত এইখানে আরো একটা কথা উল্লেখ করে রাখা ভালো। আমরা বারবারই আদর্শ চলতি বুলির দৃষ্টান্ত সামনে রেখে অন্য আঞ্চলিক বুলির তুলনামূলক মিল-অমিল বর্ণনা করছি। এ থেকে এমন সন্দেহ হতে পারে যে আদর্শ চলতি বুলির একটা আত্যন্তিক শ্রেষ্ঠতাকে আমরা স্বীকার করি অথবা মনে করি যে আদর্শ চলতিটা অপরিবর্তনীয় এবং প্রাচীনতর এবং সেজনই সেটাকে কষ্টিপাথর করে আমরা আর সব আঞ্চলিক রূপের বিচার করতে বসেছি। আমরা মোটেই সে-রকম মনে করি না। আদর্শ চলতিকে কেন্দ্র করে আমরা পার্থক্য বর্ণনা করছি কেবলমাত্র তুলনামূলক আলোচনাকে স্পষ্টতা দান করার জন্যে। আদর্শ চলতি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো ভাষারূপকে মানদণ্ড করে অন্যান্য সকল ভাষারূপের বর্ণনা সমপরিমাণেই গ্রহণীয় হতো।

'খ' বা পূর্বপাকিস্তানের মধ্যবর্তী এলাকা নানা কারণে আজ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তারকারী, প্রদেশের রাজধানী ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রবিন্দু ঢাকা এই এলাকায়। লোকসংখ্যার দিক থেকে এই অঞ্চল সংখ্যাগরিষ্ঠ। আদর্শ চলতি বুলির সঙ্গে পার্থক্য এখানে /ক/ এলাকার চেয়ে অনেকগুণ স্পষ্ট অথচ /ক/ এলাকার বুলির মতো নিজ এলাকার বাইরে তুলনীয়রূপে দুর্বোধ্য বা অবোধ্য নয়।

/খ/ এলাকার বর্ণমালা আদর্শ চলতি থেকে স্বতন্ত্র। /চ, ছ, স/, 'র বদলে /খ/ তে পাই কেবল /চ ছ/, /জ/'র বদলে। মহাপ্রাণ বর্ণ /খ/ এলাকায় নেই। হাম্‌জা আছে। মোটামুটি এই বৈশিষ্ট্যগুলো এই অঞ্চলের বেশির ভাগ লোকের জন্য সত্য।

শব্দগত বৈষম্যও কম নয়। আদর্শ চলতির শব্দের /ড় র/ পার্থক্য, /ও অ/ পার্থক্য এবং /এ্যা এ/ পার্থক্য এখানে হরদম ওলট-পালট হচ্ছে।

/ক/ হচ্ছে পূর্বপাকিস্তানের পূর্বপ্রান্তীয় এলাকা। /খ/ অঞ্চলের যে সব বর্ণগত বৈশিষ্ট্য আদর্শ চলতি থেকে তার বৈষম্য ঘোষণা করে, /ক/ অঞ্চলে সেগুলো আরো জাজ্বল্যমানরূপে বহুল প্রচলিত। তার ওপর /ক/'র রূপ এখানে বেশির ভাগ সময় [x] 'র মতো, /ফ/ [f] 'র মতো, /য়/ এবং হয়তো /ব/ এই অঞ্চলে স্বাধীন বর্ণ।

শব্দগত পার্থক্য ব্যাপকতর এবং অর্থগত পার্থক্যও অপেক্ষাকৃত বেশি দৃষ্ট হয়।

পূর্বপাকিস্তানের নানা অঞ্চলের বাংলার মধ্যে শব্দগঠনজান পার্থক্যটাই এক অর্থে সবচেয়ে বড়। তবে একথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে এই বিচ্যুতি রীতির নয়, রূপের। অর্থাৎ বাংলার শব্দগঠনরীতি সর্বাঞ্চলে প্রায় একই রকম। যে কোনো ক্রিয়াপদের গাঠনিক রূপ :

মূল + সাধন প্রত্যয় + কালবাচক বিভক্তি + ব্যক্তিবাচক বিভক্তি + আদেশ অনুরোধমূলক বিভক্তি। এই জাতীয়। এমনিভাবে বিশেষ্যের রূপ—

মূল +... ...

কিন্তু প্রতি প্রত্যয় বা বিভক্তির ধ্বনিগত চেহারা সকল অঞ্চলে এক নয়। পূর্বপাকিস্তানের তিন প্রধান অঞ্চলে এই গাঠনিক রূপের যে রকমফের লক্ষ করা যায় তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত মেলে—১. সর্বনামেব নানা পাদিক রূপে, ২. বিশেষ্যের সকল রকম বিভক্তিতে, ৩. ক্রিয়াপদের বিশেষ করে কালবাচক বিভক্তিতে। যেমন—আমি শব্দটা 'ক'তে মুই, নোয়াখালীতে 'আঁই' চাকমায় 'ময়'; 'আমার' কথাটা 'ক'তে 'মোর', হাজং-এ 'মা-লাগিক', চাকমা 'ম', নোয়াখালীতে 'আঁর'। 'আমাদের'—/গ/তে 'হামার', ময়মনসিংহে 'আমরার', বরিশালে 'মোগো', ঢাকায় 'মোগো', হাজং-এ 'আমালাক বেদে' নোয়াখালীতে/আঁরার/।

বিশেষ্যে—

আদর্শ : চাকরদের

ক'তে : চাওর গুণ

খ'তে : চাহরগো

গ'তে : চাকরদেরকে

ক্রিয়াপদে—

আদর্শ : বোলবো

ক : কৌয়ুম

খ : বোলমু

গ : বোলিম

এই রকম করে সমগ্র পূর্বপাকিস্তানের নানা অঞ্চলের বাংলা বুলির মধ্যে যে পার্থক্য তা স্পষ্ট করে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমাদের বর্ণনা অবশ্য, স্থানাভাবহেতু অতিরিক্ত সরলীকৃত মোটামুটি ভাগ করে বড় বড় ছকে ফেলে যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়া হয়েছে তার পরতে পরতে আবো নানা বিচ্যুতি বর্ণিত হতে পাবত। তাছাড়া, অনেক অঞ্চলেই নিজস্ব আঞ্চলিক রূপের ব্যবহাব ছাড়া আদর্শ চলতির সংশ্লিষ্ট রূপগুলিও ব্যবহৃত হয় বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এ কথাগুলো মনে রেখেই পূর্বপাকিস্তানে বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য ও বিস্তার সম্পর্কে কয়েকটি সাধারণ ধারণা দৃষ্টান্তসহ তুলে হলো।

বাক্যগঠন রীতি

বর্ণ গেঁথে শব্দ তৈরি হয়। যেমন /বঅলও/। অবশ্য যেমন-তেমন কবে বাংলা বর্ণ পরপর জুড়ে গেলেই শব্দ তৈরি হতে থাকবে এমন নয়। কোন বর্ণের পর কোন বর্ণ বসতে পাবে সব ভাষাতেই তার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম আছে। যেমন শব্দের শুরুতে /ং/ এবং শেষে /হ/ বাংলায় অসিদ্ধ। কেউ যদি কেবলমাত্র একটি বর্ণ উচ্চারণ করেই থেমে যায় তাহলেই বাংলা শব্দ ভাণ্ডারের পরিসংখ্যানমূলক বিচারকে ভিত্তি করে অনুমান করা সম্ভব হয়, পববর্তী বর্ণটি কী হতে পারে তা। বলা বাহুল্য, পবিসংখ্যানমূলক বিচার কেবলমাত্র সম্ভাবনার ক্রমকে পরিমাপ করতে পারে, অবশ্যম্ভাবী অনিবার্য এককের সন্ধান দেয় না। অর্থাৎ কোনো একটি বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছের আগে বা পরে কোনো কোনো বর্ণ কতখানি প্রত্যাশিত তা অতি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা যায়। বিশেষ ভাষার বহু সংখ্যক শব্দের বর্ণ সমাবেশ বিশ্লেষণ করে সেই ভাষার শব্দগত বর্ণমালার সংযোগ ধর্মকে জানা যায়। একই পদ্ধতিতে বহুসংখ্যক বাক্যের শব্দাবলী বিচার করে সেই ভাষায় বাক্যের অন্তর্গত শব্দামালার সংযোগ ধর্ম কী সে সম্পর্কে সাধারণ জন্মে। শব্দাবলীর এই সংযোগ ধর্মকেই আমরা বাক্যগঠন রীতি বলে অভিহিত করেছি।

ধ্বনি, বর্ণ ও শব্দেব আলোচনা যতখানি সম্পূর্ণতার সঙ্গে সম্পাদিত হয় বাক্য বিচার আধুনিক ভাষাতত্ত্বে এখনও সেবকম সন্তোষজনক বিশ্লেষণের আয়ত্তাধীন হয়নি। বাক্যগঠন বীতি সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগুলোও সে জন্যে অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট তত্ত্বগত ভিত্তির ওপব প্রতিষ্ঠিত। মোটামুটিভাবে দুটো মূল সূত্রকে আশ্রয় কবে বাক্যবিচার পুষ্টি লাভ করেছে। তাব একটা দিক হালে বাক্যের অন্তর্গত নানা আয়তনের অংশসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সম্পর্কে স্তর নির্ণয় করা। আরেকটা দিক হলো কোনো বাক্যাংশের গঠনকারী শব্দমালা কোনো কোনো ক্ষুদ্রক ক্ষুদ্রতর শব্দমণ্ডল বা একক শব্দ দ্বারা শব্দের সঙ্গে তুল্যমূল্যতার অনুসন্ধান করা। যে-কোনো একটি বাক্যের সকল শব্দ পরস্পরের সঙ্গে সমান গাঢ়ভাবে যুক্ত নয়। কোনোখানে যোগ খুবই নিবিড় আবার কোনোখানে ছেদ খুবই স্পষ্ট। যে বাক্যাংশের শব্দমণ্ডলীর মধ্যে অপেক্ষাকৃত গভীর নৈকট্য সেই বাক্যাংশ সাধারণত ক্ষুদ্রক ক্ষুদ্রতর শব্দমালা বা একক শব্দ দ্বারা তুল্যমূল্য রূপে বিচ্যুত হতে পারে।

শিল্পী-প্রসঙ্গ

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের স্মরণীয় পুরুষদের মধ্যে ইসমাইল হোসেন সিরাজী একজন। বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্যন্ত তাঁর প্রভাব ও খ্যাতি সর্বাধিক পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি জন্মগ্রহণ করেন পাবনার অন্তর্গত সিরাজগঞ্জ শহরে ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দের ১৩ই জুলাই। সিরাজগঞ্জের বাসিন্দা হিসাবেই তিনি নিজের নামের সঙ্গে সিরাজী যোগ করেন। তাঁর সমসাময়িক গুণগ্রাহীরা নানাপ্রকার সম্মানার্থক বিশেষণে ভূষিত না করে কখনই তাঁর নাম উল্লেখ করতেন না। সেকালের মুসলামন পাঠকদের নিকট বিশেষ পরিচিত উপন্যাস 'বঙ্কিম দুহিতা'র রচয়িতা নিজের বইয়ের ভূমিকায় সিরাজী সাহেবের নাম এইভাবে উল্লেখ করেন, 'আমাদের শ্রদ্ধেয় মৌলভী কবি সোলতান বাণীসাগর ও বঙ্গবিখ্যাত, মাননীয় গাজী সৈয়দ আফেন্দী সাহ আবু মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী সাহেব।

মফস্বল শহরে লেখাপড়া করেন। সাধারণভাবে সচ্ছল ভদ্র এবং শিক্ষিত পরিবারের সন্তান হিসাবে স্থানীয় বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করবার মতো অনুকূল পরিবেশ তিনি পুরোপুরি লাভ করেছিলেন। পাঁচ বছর বয়সে পাঠশালায় যান, কৈশোরে বিদ্যালয়ে আরবি-ফারসির চর্চা করেন এবং হয়ত বাড়িতে সংস্কৃতও পড়তেন। কিন্তু সুবোধ বালকের মতো কেবল পড়াশুনোয় মগ্ন থাকার মতো স্থিরচিত্ত তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। স্বদেশের পরাধীনতার জন্য বেদনাবোধ এবং সমগ্র মুসলিম জাহানের দুর্দশার জন্য উৎকণ্ঠা অপরিণত ছাত্রাবস্থাতেই তাঁকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাই যখন মাত্র ষোল বছর বয়স তখন পাঠ্যতালিকার বাইরের সুবৃহৎ কর্মময় জগতের ডাকে সাড়া দেবার জন্য গৃহত্যাগ করে বেরিয়ে পড়েন তুরস্ক যাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। সে যাত্রার মনোবাঞ্ছা চবিতার্থতা লাভ না করলেও কিশোর সিরাজীর এই ভাবাবেগপূর্ণ আদর্শবাদী মানস প্রবণতার প্রকাশ তাৎপর্যহীন নয়। তুরস্ক সিরাজীব বাল্যস্বপ্নের পূণ্যভূমি। তাঁর পরিণত বয়সের এক উল্লেখযোগ্য কর্মক্ষেত্র।

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষাংশে যে দু'জন সমাজ-সংস্কারক ও চিন্তাবিদ এ দেশীয় মুসলিম মানসকে সর্বাপেক্ষা প্রবলভাবে আলোড়িত করেন তার একজন হলেন এ দেশের, অন্যজন বিদেশাগত। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মারা যান ১৮৯৮ সালে। ইসলামি চিন্তাধারার সঙ্গে আধুনিক জীবনবোধের সমন্বয় বিধান করে কিভাবে অনুন্নত ভারতীয় মুসলমান নিজেকে নয়া জামানার উপযুক্ত সংগঠক রূপে তুলতে পারে স্যার সৈয়দ সারা জীবন নিজের বাণী ও কর্মের মধ্য দিয়ে তার পথনির্দেশ করতে প্রয়াস পান। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের বালক-কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ প্রায় সকলেই এই আদর্শের দ্বারা বহুল পরিমাণে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। জামাল উদ্দীন আফগানী স্যার সৈয়দের চেয়ে বয়সে বেশ ছোট ছিলেন, তবে এন্তেকাল করেন ১৮৯৭তে। তুরস্ক-মিশর-আরব অঞ্চলে এই বিপ্লবী চিন্তানায়কের প্রভাব ছিল অপরিসীম। ইসলামকে কতকগুলো প্রথা ও কুসংস্কারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী। স্যার সৈয়দের মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে জীবন্ত ধর্মরূপে ইসলাম অবশ্যই জীবনাচরণে যুগোপযোগী বিবর্তন ও সম্প্রসারণের

পক্ষপাতী। তাঁর নীতিজ্ঞান ও বিবেক স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদকে সহ্য করতে আদৌ প্রস্তুত ছিল না। ১৮৭৯ সালে রাজশক্তি কর্তৃক মিশর থেকে বিতাড়িত হয়ে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অন্তরীণাবদ্ধ হন। জামাল উদ্দীন আফগানীর রচনা ও বক্তৃতা তখনকার দিনের আদর্শবাদী দেশপ্রেমিক মুসলমানকে এক নতুন উন্মাদনায় অধীর করে তোলে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার প্রবল অনুপ্রেরণা সে এখান থেকেই লাভ করে ক্রমশ নিজেকে বিশ্বমুসলিমের ভাগ্য বিপর্যয়ের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ভাবতে শেখে। কিশোর সিরাজীর মানস গঠনে এই পরিবেশ কতদূর সক্রিয় ছিল এবং কী পরিমাণ স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছিল পরিণত বয়সের সিরাজীর যাবতীয় রচনা ও কর্মপ্রচেষ্টা বিশ্লেষণ করলে তা সহজেই অনুভব করা যায়।

১৯০৩ সালে চব্বিশ বছর বয়সে সিরাজী বিয়ে করেন এবং তার মাত্র তিন বছরের মধ্যে স্বদেশী আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়েন। ১৯০৫ সালে ইংরেজ বঙ্গদেশ দু'ভাগে ভাগ করে, উভয় অংশের সঙ্গেই কিছু কিছু সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে দিয়ে নিজেদের শাসনতান্ত্রিক সুবিধার জন্য নতুনভাবে দুটো স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে। পূর্বভাগে পড়ে পুরাতন পূর্ববঙ্গ এবং আসাম। এই নতুন প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু এ ব্যবস্থা সকলের মনঃপূত হয়নি। সমগ্র বঙ্গের আত্মসচেতন শিক্ষিত শ্রেণী তখন প্রায় এককভাবে উচ্চ মধ্যবিত্ত হিন্দুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শিক্ষা-সংস্কৃতি-ব্যবসা-রাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুর আধিপত্য। এই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে হিন্দুকে ছলনার আশ্রয় নিতে হয়নি, তার তৎকালীন স্বদেশপ্রীতিমূলক কর্ম ও চিন্তার বলিষ্ঠতাই তাকে সকল বাঙালির নেতৃত্ব লাভের স্বাভাবিক অধিকার দান করে। স্বাধীনতাকামী প্রগতিবাদী উদারহৃদয় অল্প কিছু সংখ্যক মুসলমানও স্বেচ্ছায় নিজেদেরকে এদের দলভুক্ত করে নেন। নেতারা বঙ্গভঙ্গ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন গড়ে তুলবার আহ্বান জানালে দেশবাসী জনসংখ্যায় সে ডাকে সাড়া দেয়। ইসমাইল হোসেন সিরাজীও এই সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। অনলপ্রবাহের কবিতাবলীর মধ্যে সিরাজীর তৎকালীন বিপ্লবাত্মক উগ্র ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের সর্বত্র পরিস্ফুট। পরাধীনতার হীনতা থেকে তিনি মুক্তি চান, বিদেশী রাজশক্তিকে তিনি সমূলে বিনষ্ট করতে বদ্ধপরিকর এবং সেই সঙ্গে হতভাগ্য ঘুমন্ত মুসলামন জাতিকে জাগিয়ে তুলবার জন্য তার অতীত গৌরবের বাণী একাধিক শোকবহ্নিময় চরণে ব্যক্ত করেন। সরকারি মেজাজ এতটা বরদাস্ত করতে পারেনি। ১৯০৮ সালে অনলপ্রবাহের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯১০-এ সিরাজী রাজদ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ হন। ১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয় এবং সিরাজী কারামুক্ত হন। মুক্তিলাভ করেই তিনি তুরস্ক চলে যান। মেডিকেল মিশনের সদস্যরূপে তাঁর তুরস্ক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তিনি পরে গ্রন্থাগারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর এই পর্বের জীবন বিশেষভাবে বিশ্লেষণযোগ্য। কারণ এই পর্বেই সিরাজী মানসিকতার এক উল্লেখযোগ্য পালাবদল ঘটে। কেবল সিরাজী নয়, সিরাজীর অব্যবহিত পরের এবং পূর্বের একাধিক দেশহিতৈষী মুসলমান লেখক-ভাবুক-কর্মীর জীবনচেতনায় অবিকল এই পর্যায়ের রূপান্তর সাধিত হয়। মীর মশাররফ হোসেনে হয়েছিল, ইসলামইল হোসেন সিরাজীতে হয়, কায়কোবাদেও হয়েছে। সিরাজী বিয়ে করেন চব্বিশ বছর বয়সে, জেলে যান সাতাশ বছর বয়সে। আন্দোলনে আস্থা সুগভীর ছিল বলেই রাজনৈতিক প্রাণোন্মাদনায় নিজেকে এমন

উজাড় করে ঢেলে দিতে পেরেছিলেন। ধর্মীয় ঐতিহ্যে পরিপুষ্ট মুসলিম চেতনা গভীর ও স্বতন্ত্রভাবে স্বজাতির হিতচিন্তায় নিমগ্ন থাকলেও, স্বাধীনতা অর্জনের তীব্র স্পৃহা অপেক্ষাকৃত প্রাগ্রসর হিন্দুশক্তির সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। খণ্ডিত বাংলা এক হোক, হিন্দু-মুসলামনের মিলিত বঙ্গ পরাধীনতার নাগপাশ ছিন্ন করুক, অন্তর থেকে সিবাজীও প্রথম প্রথম এগুলো কামনা করেছিলেন। কিন্তু আন্দোলন যত সাফল্যের দিকে এগিয়ে যেতে লাগল, নিজের অভিজ্ঞতার দর্পণে সিরাজীও যেন ততই নিজেকে এক নবালোকিত পটভূমিতে নতুন রূপে প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। অনুরূপ প্রবণতা পূর্বেও ছিল কিন্তু এখন যেন তা ক্রমশ গাঢ়তর ও তীব্রতর হলো। দেশের চেয়ে মানুষের, মানুষের চেয়ে নিজের সম্প্রদায়ের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা, তার পুরাতন ক্ষমতা ও বৈভবকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্বই যেন প্রধান হয়ে দেখা দিল। কারাগারের ভেতরে ও বাইরে বসে ক্রমে হয়ত [illegible] ও অনুভব করছিলেন যে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত আন্দোলন [illegible] লাভ করলেও কোনোক্রমেই সম্মিলিতভাবে উভয়ের জন্য একই পর্যায়ের সুখশান্তি নেমে আসবে না। দুই শরিকের মধ্যে যার শক্তি ও ঐশ্বর্য বেশি, অনায়াসে সেই প্রভুত্ব স্থাপন করবে এবং বিজয়লবদ্ধ সম্পদের সিংহভাগ দখল করে নেবে। তাই দেখি ভাঙ্গা বাংলা জোড়া লেগে যাবার বৎসরে কারামুক্ত হয়েও সিরাজী স্বদেশের কর্মে আত্মোৎসর্গ না করে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী বল্কান শক্তি কর্তৃক আক্রান্ত তুরস্কের নিপীড়িত মুস[illegible]নকে সাহায্য করবার সেই দূরদেশে ছুটে গেলেন। এই যাত্রা তাৎপর্যপূর্ণ। হিন্দু মুসলিম মিলন কামনার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীক বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগ্রামী কর্মী সিরাজী পরবর্তী পর্বে সম্পূর্ণরূপে ইসলামি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, কেবলমাত্র না হলেও প্রধানত বিশ্বমুসলিমের উন্নতি বিধানের জন্য দৃঢ়সংকল্প হলেন। বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষাকে সিরাজী কখনও অবহেলা করেননি, কিন্তু পরিণত বয়সে বঙ্গদেশীয় মুসলমানের কথা যত ভেবেছেন অন্য সম্প্রদায়ের মঙ্গলচিন্তায় ততটা কাতর হননি, বঙ্গভাষার সাহায্যে মুসলমানি ভাবধারা প্রচারে যতটা উদ্দীপিত বোধ করেছেন, শিল্পসৃষ্টির জন্য ততটা ব্যাকুলতা প্রকাশ করেন নি। বাঙালি নয়, বাঙালি মুসলমানের নিজস্ব সত্তার স্বরূপ আবিষ্কারের সাধনায় জীবনের দ্বিতীয়ার্ধ উৎসর্গ করেছেন। অনলপ্রবাহোত্তর সাহিত্যচর্চার মূল সুরও তাই। পোশাকে পরিচ্ছদে বক্তৃতায় ব্যবহারে প্রবন্ধে উপন্যাসে তিরিশোত্তর বয়স থেকে সিরাজী ঘোরতর রকম স্বাতন্ত্র্যপন্থী।

১৯১৩ সালে তুরস্ক ভ্রমণ প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলানের মিলন কামনা করেছেন বটে তবে তার চেয়ে বেশি জোর দিয়ে প্রচার করেছেন প্যানইসলামের কথা। সারা দুনিয়ায় মুসলমানের ভাষা যে আরবি হওয়া উচিত সে কথাও দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। ১৯১৪ সালে প্রকাশিত 'স্পেন বিজয় কাব্য' সম্ভবত তাঁর সর্বাপেক্ষা উচ্চ লক্ষ্যাভিমুখী কাব্যগ্রন্থ। এর কাহিনীর বিস্তার, চরিত্রসংখ্যার আধিক্য, ঘটনাবর্তের জটিলতা সবই মহাকাব্যের উপযুক্ত বিরাটত্ব ও বিশালত্বের ইঙ্গিত বহনকারী। লেখকের উদ্দেশ্যও ছিল অতীত গৌরবগাথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে মুসলমানকে নবজাগরণের প্রেবণা দেয়া। ভাষায়, চরিত্র-চিত্রণে ও প্রাক্তনের গতি নির্ণয়ে 'স্পেন বিজয় কাব্য' একাধিক স্থলে অর্ধশত বছর পূর্বে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধ কাব্য' সজ্ঞানে অনুসরণ করেছে।

একটা কথা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের মুসলমান লেখকরা ইসলামি চিন্তায় যথেষ্ট

স্বকীয়তা অর্জন ও ধর্মীয় আবেগে তন্ময়তা লাভের পরও প্রকাশরীতির ক্ষেত্রে তাঁরা ব্যতিক্রমহীনভাবে তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনায় বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত পুরাতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। সিরাজীর গদ্যের লক্ষণও সংস্কৃতানুসারিতা, দুরূহ সমাসবদ্ধ পদের দ্বারা তা কণ্টকিত, অতি দীর্ঘ বাক্যসূত্রে প্রলম্বিত। সিরাজীর গদ্যের গুরু বঙ্কিম, পদ্যের শিক্ষক হেম-নবীন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে বৈষ্ণবীয় কবি বা মাইকেল।

সিরাজীর উপন্যাস ঐতিহ্যাসিক উপন্যাস, তবে হিন্দু গ্রন্থকারের বিপরীত মনোভাব নিয়ে রচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সূচনা থেকেই বাঙালির জাতীয়তাবাদের ধারণার সঙ্গে হিন্দু পুনর্জাগরণের আদর্শ মিশ্রিত হতে থাকে। শতাব্দীর শেষ পাদে এসে জাতীয়তাবাদ প্রায় অবিমিশ্ররূপে হিন্দু জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হয়। কবি-সাহিত্যিকদেব সামাজিক সত্তা এই উগ্র মনোভাবের বিকার থেকে নিজেদেব মুক্ত রাখতে পারেনি। হেম-নবীনের কবিতা ও ভূদেব-বঙ্কিমের উপন্যাস এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শিল্পজ্ঞানহীন নিকৃষ্ট অনুসবণকারীর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে স্বভাবতই পথপ্রদর্শকদেব ছাড়িয়ে যান। উপন্যাসে মুসলমান সেনাপতি শাসনকর্তাদের অত্যাচার-অনাচাবেব চিত্র অতিবঞ্জিত কবে অঙ্কিত কবে তাঁবা জনান্তিকে ইংরেজের বিরুদ্ধে আঘাত হানতে চেয়েছেন এ কথা কেবলমাত্র অংশত সত্য। ইসলামধর্ম ও মুসলিম নরনাবীর সর্বপ্রকার লাঞ্ছনায় গ্রন্থকাবগণের ব্যক্তিগত উল্লাস সর্বত্র চাপা থাকেনি। এসব উপন্যাসে প্রায়শই দেখতে পাওয়া যায় মুসলমান চবিত্রগুলো হীনস্বভাব এবং হিন্দুগণ গুণনিধি। মুসলমান আমির-নবাব-বাদশাদেব বেটি-বহিন-বেগমবা সবাই হিন্দু নৃপতি ভূপতি-সেনাপতির শৌর্য-বীর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁদের অঙ্গসহচবী হবাব জন্য ধর্ম-কুল-মান সব বিসর্জন দিয়েছেন। এসব উপন্যাস বরাবরই মুসলান পাঠকদেব কাছে পীড়াদাযক ছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রতিটি উপন্যাস এই প্রতিক্রিযার ফল। তারাবাই উপন্যাসে শিবাজীর কন্যা তারাবাই প্রেমে পড়েছে বীর সেনাপতি আফজল খাঁর, নূরউদ্দীনেব নায়িকা চিতোর রমণী, স্তরদশা প্রাপ্ত হয়েছেন যবন যুবরাজেব জন্য, ফিরোজা বেগমে মুসলমান যুবতীর জন্য লালায়িত হয়ে হিন্দু সদাশিব অসদাচবণে প্রবৃত্ত হলে তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দান করা হয়, রায়নন্দিনীতে প্রতাপাদিত্য শঠের চূড়ামণি, কেদাব রায মুসলমানের দুশমন। উভয়ের কন্যাদ্বয় কিন্তু কুলমানধর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে মুসলমানকে পতিদেবতাব আসনে বসাতে চেয়েছে। রায়নন্দিনীই সিরাজীর সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় উপন্যাস। শিল্পকর্ম হিসেবে এর মূল্য বেশি নয়, তবে গ্রন্থের ভূমিকার ভাষায়, বঙ্কিমচন্দ্রের এক দাঁতভাঙ্গা জবাবের প্রচেষ্টা হিসাবে স্মরণীয়। সিরাজীর উচ্ছ্বসিত ইসলামপ্রীতির ও তাঁর গদ্যের অলঙ্কারপূর্ণ দুর্দমনীয় ওজস্বিতায় নিদর্শন স্বরূপ আমরা তাঁর রায়নন্দিনীর দুপৃষ্ঠা দীর্ঘ বাক্যটি উদ্ধৃত করলাম—

> যখন আসমুদ্র হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতি নগরে, দূর্গে ও শৈলশৃঙ্গে ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্র শোভিনী বিজয় পতাকা গর্ব্বভরে উড্ডীয়মান হইতেছিল, যখন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রখর প্রভায় বিশ্বপূজা মুসলমানের অতুল প্রতাপ ও অমিত প্রভাব দিগদিগন্ত আলোকিত, পুলকিত ও বিশোভিত করিতেছিল, যখন মুসলমানের লোক চমকিত সৌভাগ্য ও সম্পদের বিজয়ভেরী জলদমন্দ্রে নিনাদিত হইয়া সমগ্র ভারতকে ভীত, মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিল যখন মুসলমানের শক্তিমহিমায় অনুদিন বিবৃদ্ধমান শিল্প ও বাণিজ্যে, কৃষি ও কারুকার্য্যে ভারতভূমি ধনধান্যে এবং ঋদ্ধিশ্রীতে বিমণ্ডিত

হইতেছিল, যখন প্রতি প্রভাতের মন্দ সমীরণ কুসুম-সুরভি ও বিহগ কাকলীর সঙ্গে মুসলমানে বীর্য্যশালী বাহুর নববিজয় মহিমার আনন্দসংবাদ বহন করিয়া ফিরিতেছিল, যখন মুসলমানের সমুন্নত শিক্ষা ও সভ্যতায় সুমার্জ্জিত রুচি ও নীতিতে ভারতের হিন্দুগণ শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইয়া কৃতার্থতা ও কৃতজ্ঞতা অনুভব করিতেছিল—কৌমুদী রাশি, কুসংস্কারচ্ছন্ন শতধাবিচ্ছিন্ন তেত্রিশ কোটি দেবোপাসনার তামসী ছায়ায় সমাবৃত ভারতের প্রাচীন অধিবাসীদিগের হৃদয়ে, এক জ্যোতির্ম্ময়, আধ্যাত্মরাজ্যের দ্বার প্রদর্শন করিতেছিল, যখন মুসলমানের তেজঃপুঞ্জ মূর্ত্তি, উদারহৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্য্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্রসূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণ, নির্ম্মল উদারতা, মুসলেমেতর জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করিতেছিল—যখন উভয়ে শ্যাম কাননাম্বর গগনচুম্বী তুষারকিরীটি হিমগিরি তাহার গভীর মেঘনির্ঘোষে ও চপনা বিকাশে এবং দক্ষিণে অনন্ত বিস্তার ভারত সমুদ্র অনন্ত কলকল্লোল ও অনন্ত তরঙ্গবাহুর বিচিত্র ভঙ্গিমায়, মুসলমানের অবদান পরম্পরার বিশুভ্র যশোগাথা কীর্ত্তন করিতেছিল, যখন পৌরাণিক বংশমর্য্যাদাভিমানী চন্দ্র, সূর্য্য, অনল বংশীয় এবং রাঠোর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শত, রাজপুত, জাঠ গোত্রীয় অসংখ্য জাতি, মহিমান্বিত মুসলমানের গিরিশৃঙ্গ বিদলনকারী চরণতলে ভূনত জানু ও বিনত মস্তক হইতে কুণ্ঠার পরিবর্তে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতেছিল, যখন নগরীকুলসম্রাজ্ঞী বিপুল বীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যশালিনী দিল্লীব তখ্‌তে অধ্যাবসায়র অবতার প্রোথিতযশা আকবর শাহ্ উপবেশন করিয়া স্বকীয় প্রভাব বিস্তার করিতেছিল—যখন বীর পুরুষ দায়ুদ খাঁ, সুজলা সুফলা হিন্দুস্তানের রম্য উদ্যান বঙ্গভূমির রাজধানী দিল্লীর গৌস্পর্দ্ধিনী গৌড় নগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময় রক্ষীসহ একখানি পাল্‌কী আসিয়া উপস্থিত হই।

১৯৩১ সালের ১৭ই জুলাই দুরারোগ্য পৃষ্ঠব্রণ রোগে মাত্র বাহান্ন বছর বয়সে সিরাজী এন্তেকাল করেন। প্রায় সারা জীবনই তাঁকে প্রতিকূল অবস্থাব সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত থাকতে হয়। কখনও-কখনও যে হতাশাচ্ছন্ন না হয়েছেন তা নয়। তবে সিরাজীর নিরাশা প্রকাশেব ভঙ্গীও বীরত্বব্যঞ্জক। জীবনী-লেখক জনাব সিরাজুল হককে কোনো এক পত্রে লেখেন, 'অসাধাবণ শক্তি ও প্রতিভা লইয়া কর্দমে পতিত সিংহের ন্যায় জীবনযাপন করিতেছি'। সিরাজীর সমগ্র জীবন তাঁর কোনো একটি বিশিষ্ট এলাকার কীর্তির চেয়ে মহৎ ছিল। ধর্ম ও সমাজের সংস্কার সাধন, ব্যাপকভাবে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন, সংবাদপত্র পরিচালনা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দান, জনসেবায় আত্মনিয়োগ, শিল্পসাহিত্যের চর্চায় একনিষ্ঠ থাকা, মরহুম সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ছিল বিচিত্রমুখী। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গদেশী হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবে শোকাশ্রু বিসর্জন করে।

গোলাম মোস্তফার চিন্তাধারা ও গদ্যরীতি

মরহুম গোলাম মোস্তফার সম্পূর্ণ নাম কবি গোলাম মোস্তফা। লোকের স্মৃতিতে 'কবি' তাঁর নামের অবিচ্ছেদ্য আদ্যাংশ রূপে চিরকাল জাগরূক থাকবে। কিন্তু তাঁর সমগ্র সাহিত্য-কীর্তির বিচারে এই পরিচয় অসম্পূর্ণ, কবির গদ্য রচনার গুণ ও পরিমাণ কোনা অর্থেই সামান্য নয়। এমন কি এই গদ্যের কবিত্বপূর্ণ এক বিশেষ ওজস্বিতার তারিফ করেই যাঁরা ক্ষান্ত হন তাঁরাও সুবিচার করেন এমন বলতে পারি না। কারণ গোলাম মোস্তফার গদ্য যে কেবল কাব্যিক উদ্দামতায় বেগবান তাই নয়, এই গদ্য, পরিণত চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে সরস, শাণিত ও সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে সক্ষম। আমাদের সৌভাগ্যবশত কবির জীবৎকালে প্রকাশিত সর্বশেষ গদ্যগ্রন্থ 'আমার চিন্তাধারা' নামক প্রবন্ধ সংগ্রহে মননশীল গোলাম মোস্তফার ঐশ্বর্যময় চিন্তালোকের এক অন্তরঙ্গ প্রতিকৃতি সংরক্ষিত হয়। ১৯৯৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শিল্প-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে কবি যে সকল মতামত ক্ষুদ্র বৃহৎ নিবন্ধের আকারে প্রকাশ করেন, এই বই তার সুনির্বাচিত সংকলন। কালের প্রবাহের সঙ্গে কবির চিন্তার বিবর্তন যে বিচিত্র পথে বিকাশ লাভ করে, তার আনন্দময় স্বাক্ষর বহন করে গদ্যও বিচিত্র ভঙ্গীতে ক্রীড়াশীল হয়ে ওঠার অধিকার অর্জন করেছে।

কবির গদ্য কোমল হয়, মধুর হয়, ললিত হয়, এই রকমই আমরা প্রত্যাশা করি। তার ওপর কবি গোলাম মোস্তফা ছিলেন আদর্শবাদী কবি; মহৎ ভাবনার বহুল প্রচারের জন্য তিনি বাণীকে ছন্দোবদ্ধ করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্ব একক স্রোতের ধারক হয় না। মানবকল্যাণ সাধনের অভিপ্রায়ের সঙ্গে সৌন্দর্যপ্রীতির মিলন সংগঠিত হয়; ধর্মানুপ্রেরণার সামাজিক কাণ্ডজ্ঞান মিশ্রিত থাকে; কাব্যানুভূতির সঙ্গে সতেজ রঙ্গরসপ্রিয়তার সমাবেশ ঘটে। লঘু-গুরুর এই মনোমুগ্ধকর সংমিশ্রণই পরিণত চরিত্রকে প্রাণপ্রিয় করে তোলে। স্বভাবের এই তারুণ্য মর্যাদাবান চিন্তার প্রকাশকে কতখানি দ্যুতিময় করে তার এক স্মরণীয় দৃষ্টান্ত কবির একটি অতি পুরাতন রচনা 'কবি ও বৈজ্ঞানিক'। প্রবন্ধকারের মতে :

> বৈজ্ঞানিক আসিয়া কবির কল্পনাপথ রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে; তার সমস্ত স্বপ্নসৌধ সে ভাঙ্গিয়া দিতেছে। কবি এতদিন অবাধে আকাশ-ভুবনের সর্বত্র বিহার করিয়া ফিরিত, কিন্তু বৈজ্ঞানিক আসিয়া তাহার সে সাধে বাদ সাধিয়াছে। প্রেয়সীর নয়ন-কোণে বিরহের অশ্রুবিন্দু দেখিয়া কবি মুক্তাবিন্দু জ্ঞানে সেগুলিকে প্রেম-সূত্রে গ্রথিত করিয়া প্রিয়ার কণ্ঠে পরাইয়া দিতে যাইতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেই অশ্রুমালাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়া দিল, উহা মুক্তা নহে—উহা দুই ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেন মাত্র। কবি ফুলবাগানে ফুলের মধ্যে ফুলরাণীকে খুঁজিয়া ফিরিতেছিল, অমনি বৈজ্ঞানিক আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইল এবং শাণিত অস্ত্র দ্বারা ফুলের পাপড়িগুলিকে কাটিয়া উদ্ভিদতত্ত্বের গবেষণা শুরু করিল। নিশীথের অন্ধকারে পূর্ণ চাঁদ ও তরকামণ্ডলী দেখিয়া কবি নন্দনকাননের শোভা দেখিতেছিল, বৈজ্ঞানিক

আসিয়া অমনি সেই চাঁদে গভীর খাত ও কঠিন পাহাড় আবিষ্কার করিল আর তারাগুলোকে এক একটা গ্রহ-উপগ্রহ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া কবিকে একদম বেকুফ বানাইয়া ছাড়িল! ... বৈজ্ঞানিক কলকারখানার বিকট গর্জনে আজ কোকিল-পাপিয়া দেশ ছাড়িয়াছে, আলোর নাচন স্তব্ধ হইয়াছে, সব সুর, সব ইংগিত থামিয়া গিয়াছে। ... কিন্তু প্রকৃতিও সহজ পাত্রী নহে। বৈজ্ঞানিকের ওপর সেও হাড়ে হাড়ে চটিয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে সেও প্লাবন ভূমিকম্প ঝটিকা ঘূর্ণিবাত্যা ইত্যাদি মারণযন্ত্র দ্বারা বৈজ্ঞানিকের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করিয়া দিতেছে। ... তাই আমরা দেখিতে পাই যুগে যুগে একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও এক একজন খ্যাতনামা কবিকে পাঠাইয়া দিয়াছে। টমসনের পাশে পোপ, নিউটনের পাশে মিলটন, জগদীশচন্দ্রের পাশে রবীন্দ্রনাথ এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এমনও ঘটিতেছে যে, কোনো কোনো বৈজ্ঞানিকের মধ্যেই কবির জন্ম হইতেছে। ওমর খৈয়াম তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। প্রকৃতির কী অপরূপ প্রতিশোধ!

এই ভাষা অন্তর্নিহিত ভাবের মতোই সংযত ও পরিচ্ছন্ন। উচ্ছ্বাসে বেসামাল নয়, অতি কাব্যিকতায় বিগলিত হয়ে ওঠেনি। চিন্তার স্তরক্রমকে অনুসরণ কর বাক্য হ্রস্বদীর্ঘ আকার নিয়েছে, কমা-সেমিকোলনে সচেতন প্রয়োগে ভাবের গ্রন্থি বন্ধন সুদৃঢ় হয়েছে। শব্দ চয়ন করেছেন অর্থের চেতনা ও ছন্দের কান একত্রে সজাগ রেখে। কোনো কোনো শব্দ বা বাক্যাংশের কৌশলময় সচেতন প্রয়োগ পূর্বতন ব্যবহারের যে ভাবানুষঙ্গ জাগরিত করে তার প্রভাবে সমগ্র পরিচ্ছেদের বর্তমান আবেদন গাঢ়তর হয়। পরবর্তীকালের যে সকল প্রবন্ধ তুলনামূলকভাবে অধিকতর তত্ত্ব ও তথ্যের সমারোহে সমৃদ্ধ, সেখানেও গোলাম মোস্তফার ভাষা এক সহজ ও স্বচ্ছন্দ গদ্যরীতির কারুকলায় মণ্ডিত।

বিশ্বাস, বিশেষত ধর্মবিশ্বাস, গোলাম মোস্তফার চিন্তার ভিত্তিভূমি। জগৎ ও জীবনের প্রতিটি সত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রগাঢ়, ইসলামি ভাবধারায় সম্পৃক্ত। তাঁর সাহিত্যাদর্শও এই বিশ্বাসের উপফল। এই তত্ত্বাশ্রিত মন্ময় দৃষ্টি তাঁর সাহিত্য বিচারকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তবে গতানুগতিক চিন্তাহীন ধর্মীয় আবেগ প্রকাশের সঙ্গে এর বড় পার্থক্য এই যে, মোস্তফা-মানসের অভিব্যক্তি উদার, জ্ঞানময় এবং সুশৃংখল। তিনি ছিলেন রুচিবান এবং নিজস্ব পরিমণ্ডলের মধ্যে বিদগ্ধ, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-ইকবালের অনিসন্ধিৎসু পাঠক মরহুম গোলাম মোস্তফা আধুনিক যুগচেতনার সংঘটক ইউরোপীয় কবি-সমালোচক-দার্শনিকদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ছিলেন। আমাদের প্রবীণ কবিদের মধ্যে জ্ঞানচর্চার এই স্পৃহা, নিজের ভাবমার্গীয় উপলব্ধিকে বুদ্ধিবৃত্তির সযত্ন অনুশীলনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করার প্রবণতা দুর্লভ। তবে, চেতনা বিশ্বাসে আলোকিত বলে গোলাম মোস্তফার সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক সিদ্ধান্তসমূহ, আমাদের দৃষ্টিতে, কখনও-কখনও অনাবশ্যক রূপে সরল, সংশয়হীন। আত্মপ্রত্যয়ে সমুজ্জ্বল, অন্তঃকরণে তিনি প্রত্যক্ষ করেন : মুসলিম কালচার অর্থে আমরা সেমেটিক কালচারকেই বুঝি, 'বাংলা ভাষা মূলত দ্রাবিড় ভাষা, এবং যেহেতু দ্রাবিড় ভাষা, সেই হেতু সেমেটিক', যে কারণে ইকবাল প্লেটো বা হাফিজকে আমল দেন নাই, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্রকাব্যকেও আমল দিতে পারি না ইত্যাদি। অন্তরের মলিনতামুক্ত স্বজাতি, স্বদেশ ও স্বজিলা প্রীতির আতিশয্যে তিনি কখনও-কখনও একেবারেই আত্মহারা হয়ে পড়েন। যেমন, যশোর বন্দনার তুংগে আরোহণ করে বলেন,

পূর্বপাকিস্তানের অন্যতম প্রিন্টিং প্রেস প্যারামাউন্ট প্রেস যশোরের প্রতিষ্ঠান, একমাত্র বাঙালি মুসলিম চিত্রতারকা বনানী চৌধুরীও যশোরের মেয়ে। অবশ্য বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, সমগ্র প্রবন্ধের পরিপ্রেক্ষিতে এইসব উক্তির সারবত্তা পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, প্রবন্ধকার নিজের মতের সমর্থনে যে সকল যুক্তি ও তথ্যের অবতারণা করেন তা স্বল্প শ্রমের ফল নয়, রবীন্দ্রকাব্যে ইসলামি ভাবনার প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে তিনি মামুলি মত প্রকাশ করেই ক্ষান্ত হন নি, তুলনা দানের জন্য একাধিক সুরা থেকে আয়াতের নির্দেশ দান করেন; ইকবালের দার্শনিকতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের দর্শনসমুদ্র মন্থন করেন। যুক্তিজাল বিস্তারের জাগ্রত মুহূর্তে তিনি নিটোল রসোজ্জ্বল প্রবাচনিক উক্তি প্রস্তুত করতে বিশেষভাবে সমর্থ। যেমন, সত্যিকারের কাব্য হতে হলে তাতে কিন্তু দার্শনিকতা থাকা চাই; শ্রেষ্ঠ কাব্য দুর্বোধ্য হতে পারে, কিন্তু দুর্বোধ্য হলেই শ্রেষ্ঠ কাব্য হয় না; জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তার অর্থ কী, উদ্দেশ্য কী, লক্ষ্য কী হইবে সেই বিষয়ে সর্বাগ্রে আমাদিগকে অবহিত হইতে হইবে। নতুবা রাশি রাশি আরবি-ফারসি শব্দ ঢুকাইলেও, অথবা স-কে-হ্ দিয়া লিখিলেও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না, ইত্যাদি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের তারিফ করতে গিয়ে বলেন, 'তুমি শুধু যশোরের নও—পাকিস্তানের। ... ... কবি হিন্দু না মুসলমান না খ্রিস্টান—সে প্রশ্ন কেউ করে না। সত্য ও সুন্দর এমনি করে ব্যক্তি সমাজ ও দেশের গণ্ডী পেরিয়ে গিয়ে বিশ্বজনীন হয়। তাজমহল আজ আর শাহ্জাহানের নয়—সারা জাহানের। ব্যক্তির চিন্তা ও শিল্প সৃষ্টি এমনি করে বিশ্বমানুষের মনে প্রতিনিধিত্ব করে। সেই জন্যই ত হোমার, ভার্জিল, বাল্মিকী, সাদী, হাফিজ, রুমী, দান্তে, মিলটন্, শেকস্পিয়ার, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল সবাই আজ বিশ্বকবি।'

অত্যাধুনিক বিচারে মোস্তফা-মানস পুরাতন চিন্তাধারার স্ববিরোধিতা ও সীমাবদ্ধতার প্রতীক বলে পরিগণিত হলেও তাকে অনুদার বা সংকীর্ণ বলে চিহ্নিত করা অসংগত হবে। কর্ম ও জ্ঞানের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিপুষ্ট এই চেতনা ব্যাপক সহানুভূতি ও দূরদৃষ্টির অধিকারী ছিল, নিজের কালের রুচি-শিক্ষা-আদর্শের সংগে হালের দুস্তর ব্যবধান সম্পর্কে তিনি খুবই সচেতন ছিলেন। সেই উপলব্ধির পরিণত বেদনা যে উদার আবেগোষ্ণ অন্তরঙ্গতার সঙ্গে তিনি ব্যক্ত করেছেন তা যেন মৃত্যুর পরপার থেকে ভেসে আসা কোনো অমর মহাকবির বাণীর মতোই চিরকাল আমাদের আত্মপরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করবে, সেই বাণী উদ্ধৃত করেই আমরা মরহুম গোলাম মোস্তফার স্মৃতি উদযাপন সম্পূর্ণ করি :

> তরুণ ও পুরাতনের মধ্যে দ্বন্দ্বই বা কোথায় ? কে তরুণ ? কে পুরাণ ? তরুণ ও পুরাতনের ডেফিনিশন কী ? কোথায় উহাদের সীমারেখা ? কোথায় উহাদের লাইন অব ডিমারকেশন ? এই একটানা জীবনস্রোতের কোনখানিকে আধুনিক, আর কোনখানিকে প্রাচীন বলিব ? এই মুহূর্তে যে নূতন, পর মুহূর্তে সে যখন পুরাতন, তখন পুরাতনকে গালাগাল দেওয়া কি নূতনের শোভা পায় ?

ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যরীতি

আমাদের আধুনিক লেখকগণ গ্রামজীবনের কাহিনীতে অনেক গ্রামের কথা ব্যবহার করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও শহীদুল্লা কায়সার নোয়াখালী, শামসুদ্দীন আবুল কালাম বরিশালের, শাহেদ আলী সিলেটের, আবু ইসহাক বিক্রমপুরের, আলাউদ্দীন আল-আজাদ ও শওকত ওসমান চট্টগ্রামের এবং হাসান আজিজুল হক কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা ও ডায়ালেক্ট প্রচুর পরিমাণে তাঁদের রচনায় গ্রহণ করছেন। অধিকাংশ স্থলে পূর্ববঙ্গীয় উপভাষা কেবল সংলাপে বাস্তবতা সম্পাদনের জন্য গৃহীত হয়। এই রীতি বাঙলা ভাষায় শতবর্ষ পুরাতন। তবে এর মধ্যে যা নতুন তা হলো এই যে, কেউ কেউ, অজ্ঞতা বা স্বভাববশত নয়, স্বেচ্ছায় ও সচেতনভাবে, কেবল সংলাপে নয়, কাহিনী বর্ণনার কালেও স্থল বিশেষে পূর্বাঞ্চলিক শব্দ বা শব্দ-সমষ্টি বা বাক্‌ভঙ্গী চমৎকার চমৎকার বিশিষ্টার্থে প্রয়োগ করেছেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র চাঁদের অমাবস্যা (১৯৬৪) ও দুই তীর (১৯৬৫), আলাউদ্দীন আল-আজাদের কর্ণফুলী (১৯৬২) ও ক্ষুধা ও আশা (১৯৬৪), শাহেদ আলীর একই সমতলে (১৯৬৩) এবং শহীদুল্লা কায়সারের সারেং বৌ (১৯৬৩) গ্রন্থাদিতে আমাদের গদ্যরীতি উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে আঞ্চলিকতা এঁদের রচনার মুখ্য আকর্ষণ নয়, গ্রাম্যতাও এঁদের স্বভাবের মুখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দীর্ঘকাল ধরে ইয়োরোপে বসবাস করতেন, পত্নী ফরাসি দেশীয়, মৃত্যুবরণ করেন প্যারিসে। শামসুদ্দীন আবুল কালাম দেশত্যাগ করেন সম্ভবত পনের-ষোল বছর আগে, এখনও ইতালিতেই রয়েছেন। শওকত ওসমান ও আলাউদ্দীন আল-আজাদ উভয়ের পেশাই অধ্যাপনা এবং উভয়ের চিন্তাধারাই আধুনিক বিশ্বভাবনার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শাহেদ আলীও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম ডিগ্রির অধিকারী, অধ্যাপনা করেছেন, সম্পাদক ও গবেষকও বটে। সাংবাদিক শহীদুল্লা বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধার অনুশীলন করেছেন এবং সাংবাদিক হিসাবে বহু দেশ পর্যটন করেছেন। এই সব আধুনিক শিল্পীদের মানস-প্রকৃতি সৃষ্টিধর্মী প্রতিভার সঙ্গে মননশীল নাগরিকতার সমন্বয়ে গঠিত। এ কথা না বুঝলে এঁদের রচনারীতির মূল সূত্রসমূহ সনাক্ত করা সম্ভবপর হবে না।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সংলাপে পূর্বাঞ্চলিক উপভাষা ব্যবহার কবেছেন। লাল সালুতে নোয়াখালী ও ময়মনসিংহ উভয় জিলার গ্রাম্য বুলির নজির মিলবে।

(ক) ও যখন উঠানে হাঁটে তখন মজিদ চেয়ে চেয়ে দেখে। তারপর মধুর হেসে আস্তে আস্তে নেড়ে বলে,—অমন করি হাঁটতে নাই।

থমকে গিয়ে রহিমা তার দিকে তাকায়।

মজিদ বলে,

—অমন করি হাঁটতে নাই বিবি, মাটি—এ পোস্বা করে। এ মাটিতেই ত একদিন ফিরি যাইবা—থেমে আবার বলে, মাটিরে কষ্ট দেওন গুনাহ্।

(খ) — কী গো ধলা মিয়া, বুঝলান নি আমার কথাডা ?

প্রথম সংলাপে ক্রিয়াপদের অসমাপিকায় করি ফিরির ব্যবহার ও ই-স্বরান্ত নামপদের কর্তৃকারকে এ-বিভক্তির প্রয়োগ নোয়াখালী বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক, বুঝলান নি পদের সংগঠন ময়মনসিংহের। আঞ্চলিক বুলির সামান্যতম হেরফের সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কানে কত সুস্পষ্টরূপে ধ্বনিত হত উপরোক্ত প্রয়োগ তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তবে, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, কি কাহিনী গ্রন্থনে, কি চরিত্র সৃজনে, জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত কিম্বা জীবনোপলব্ধির ভাষাগত রূপায়ণে কখনই বাস্তবতা অনুকারী ছিলেন না। তাঁর সংলাপও অঞ্চলবিশেষের মুখের ভাষার হুবহু প্রতিফলন নয়। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বঙ্কিম, উপলব্ধি জটিলতাপূর্ণ। তাঁর ভাষ্য তাঁর চেতনার মতই বহুমাত্রিক। বর্ণনাগুণে তাঁর গল্পের অতি চেনা স্থূল পরিবেশ সূক্ষ্ম সরসতা প্রাপ্ত হয়, সত্য হয়েও কল্পলোকের প্রান্তসীমা স্পর্শ করে। পূর্ববাঙলার গ্রাম, তার মানুষ, তাদের অনুভূতিকে বৃহত্তর দুর্জ্ঞেয় জীবনরহস্যের প্রতীকে পরিণত হয়। ওয়ালীউল্লাহ্‌র ভাষা এই ভাবেরই বাহন। আঞ্চলিক বুলিকে তিনি সরাসরি গ্রহণ করেননি। তাকে ইচ্ছানুযায়ী ভেঙেছেন, গড়েছেন। স্বাধীনতা শিল্পীর। কোনো শব্দ রেখেছেন, কোনো শব্দ বর্জন করেছেন। সংলাপের এক অংশ হয়ত সাধু ও শালীন, অন্য অংশ আঞ্চলিক ও অসংস্কৃত। কিছু রক্ষা করেছেন আবহ সৃষ্টির জন্য, কিছু সংযোজন করেছেন তাকে কলামণ্ডিত করে তোলার উদ্দেশ্যে। বর্ণনায় যেখানে ক্রিয়াপদের চলিত রূপটি শুদ্ধ ও স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হতে পারত সেখানে হয়ত সাধুরূপটি প্রয়োগ করেছেন। যেমন,

> "শীতের উজ্জ্বল জ্যোৎস্না রাত তখনও কুয়াশা নাবে নাই। বাঁশ ঝাড়ে তাই অন্ধকারটা তেমন জমজমাট নয়। সেখানে আলো অন্ধকারের মধ্যে যুবক শিক্ষক একটি অর্ধ-উলঙ্গ মৃতদেহ দেখতে পায়। অবশ্য কথাটা বুঝতে তার একটু দেরী লেগেছে, কারণ তা ঝট্‌ করে বোঝা সহজ নয়। পায়ের ওপর এক ঝলক চাঁদের আলো। শুয়েও শুয়ে নাই। তারপর কোথায় তীব্রভাবে বাঁশি বাজতে শুরু করে। যুবতী নারীর হাত-পা নড়ে না। তারপর বাঁশির আওয়াজ তীব্র হওয়ে ওঠে। অবশ্য বাঁশির আওয়াজ সে শোনে নাই।'

সংলাপ যেখানে মূলত আঞ্চলিক সেখানেও এই কৌশলের প্রয়োগ লক্ষ করা যাবে। আঞ্চলিক ভাষার সাহিত্যিক রূপায়ণের সমস্যা সম্পর্কে ওয়ালীউল্লাহ্‌র চেতনা ছিল অতিশয় সজাগ। এ বিষয়ে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষারও অন্ত ছিল না।

কখনও কোনো বিশিষ্ট পদের অকৃত্রিম আঞ্চলিকতা অটুট রেখেও সমগ্র বাক্যটি গঠন করেছেন পরিমার্জিত সাহিত্যিক গদ্যরীতির আদলে। আবার কখনও হয়ত আদ্যোপান্ত বিশুদ্ধ বাঙলা বাকপ্রবাহের মধ্যে এমন এক ঔপভাষিক ছন্দোস্রোত অলক্ষ্যে সঞ্চালিত করেছেন যা সন্দেহাতীতরূপে পূর্ববঙ্গীয়। এই প্রবণতারই চূড়ান্ত প্রকাশ বহিপীরের মুখ্য চরিত্রের মুখের ভাষায় :

> 'আপনি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, আমি কথাবার্তা বিলকুল বহির ভাষাতেই করিয়া থাকি। ইহার একটি হেতু আছে। দেশের নানা স্থানে আমার মুরিদান। একেক স্থানে একক ঢঙ্গের জবান চালু। এক স্থানের জবান অন্য স্থানে বোধগম্য হয় না, হইলেও হাস্যকর ঠেকে। আমি আর কি করি। আমাকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম সব দিকেই যাইতে হয়, আমি আর কত ভাষা বলিতে পারি। সে সমস্যার সমাধান করিবার জন্যই আমি বহির ভাষা রপ্ত করিয়া সে ভাষাতেই আলাপ-আলোচনা কথাবার্তা করিয়া থাকি। বহির ভাষাই আমার একমাত্র জবান। তাছাড়া কথ্য ভাষা আমার কানে কটু ঠেকে।

মনে হয় তাহাতে পবিত্রতা নাই, গাম্ভীর্য নাই। আমার কর্তব্য মানুষের কাছে খোদার বাণী পৌছাইয়া দেওয়া। উক্ত কার্যের জন্য পুস্তকের ভাষার মতো পবিত্র ও গম্ভীর আর কোনো ভাষা নাই। কথ্য ভাষা হইল মাঠ-ঘাটের ভাষা, খোদার বাণী বহন করার উপযুক্ততা তাহার নাই।"

সংলাপ ছাড়াও সাধারণ বর্ণনার অনেক স্থলে সৈয়দ ওয়ালউল্লাহ্ পূর্বাঞ্চলিক শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গী সচেতনভাবে প্রয়োগ করেন। যেমন, যুক্ত ক্রিয়াপদ 'ঘ্রাণ করে', সমাসবদ্ধ পদ 'ঘরাভিমুখে', তল্ শব্দের সঙ্গে আয়-বিভক্তির পরিবর্তে এ-বিভক্তির সংযোগে, 'ঘরের পিছনে জামগাছ, তারই তলে শারীরিক প্রয়োজন মিটিয়ে সে ঘরে ফিরবে'। না-অব্যয় ক্রিয়ার পূর্বে স্থাপন করে গল্পের নামকরণ হয় 'না কান্দে বুবু'। আখ্যান বর্ণনার ভাষা হয় বিস্ময়করভাবে সহজ সরল, পদে-পদে পূর্ববঙ্গীয় গ্রামজীবনের সহস্র উপকরণের স্মৃতিবাহী ; পরতে পরতে লীলায়িত হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের মুখের ভাষার মোহময় ছন্দ :

"বুবু কাঁদে শুধু, বুবু জানে না। নদীর বাঁকের পর কী আছে বুবু জানে না। বুবু মুরগির খোয়াঁড়ে ঝাঁপ দিতে জানে, গরুর পেটের দাওয়াই জানে, কিন্তু বুবু জানে না শহরের সোনা ভাইয়ের মনের কথা। বুকের মধ্যে বুবুর দুঃখের দরিয়া. বুবু জানে না নদী কতদূর যায়। বাপ বলে ছানি নাই চোখে। বুবু বলে ছানি নাই চোখে।"

"আফতাব মিয়ার পেটে জোর নেই সিদ্ধ ভাত খেয়ে। একটু নুন, একটু মরিচ, একটু মাছ। গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে না। সে রঙ্গে নাই। রনকদার শহরে রঙ্গে নাই।

"বুবু কাঁদে না। বুবু গোয়াল ঘরে কাঁদে না, চুলার আগুনের পাশে কাঁদে না, ঘরে কাঁদে না। তেজ নাই চলনে-বলনে, বুবু কাঁদেও না; সেনা সোনা ভাইটা দেশে ফিরেছে। বুবু কাঁদে না। বুবু নীরবে শাড়ির জমিন দেখে হাত নিচে রেখে, বুবু কাঁদে না।"

এইটেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বর্ণনারীতির বৈশিষ্ট্য, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির তীর্যকতার অভিব্যক্তি। কাহিনীর চেয়ে তাঁর গল্পে মুখ্য হয়ে ওঠে অনুভবের লীলা, চেতনা-প্রবাহের রহস্যময় বিচিত্র গতি। যা প্রত্যক্ষত দৃষ্টিগোচর তাকে অতিক্রম করে তাঁর বর্ণনা বিস্তৃত হয় পরিপার্শ্বের সঙ্গত-অসঙ্গত স্বচ্ছ-অনচ্ছ লঘু-গুরু বহুবিধ সংকেতকে আশ্রয় করে। তাঁর তুলনা-উপমাও উদ্ভাবিত হয় বিষয়ের বস্তুগত পরিচয়কে কেন্দ্র করে নয়, তার অন্তর্নিহিত কোনো অব্যক্ত ভাবাবহের প্রান্ত স্পর্শ করে। যেমন,

"রাস্তার ধারে ধূলোভারাচ্ছন্ন বৈঠকখানায় বসে খান বাহাদুর মোত্তালেব সাহেব ভাবেন। ভাবেন যে সে-কথা তাঁর চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। চোখের নিচে মাংসের থলে। বড় গোছের চোখ দুটো তার মধ্যে ভারী দেখায়। অনেকটা মার্বেলের মতো। তাও ড্রেনের কোণে হারিয়ে যাওয়া নিশ্চল মার্বেল।" —(পাগড়ী)

বর্ণনার মধ্যে স্থানীয় বাক্‌রীতি ও সামাজিক শব্দের কৌশলময় প্রক্ষেপণ শিল্পীর সুগভীর বাস্তব অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত বেদনা ও কৌতুকবোধের মিশ্রিত আবেগকে জাজ্বল্যমান করে তোলে—

"মেয়েরা চোখ মুছতে মুছতে বাইরের ঘরে ছুটে যায়। লজ্জায় তারা কেমন মুষড়ে পড়েছে। তারা বিড়বিড় করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে, ছি, ছি, কী ঘুমই পেয়েছিল। বাদলার দিন কি না। বারবার সে কথাই বলে চলে দোয়াদরুদের মতো। ছেলেরা কিছু না বলে মাথা চুলকায়। মেজো ছেলেটির পাছার কাছে পাঁচড়ার জন্য মারাত্মকভাবে চুলবুল করে। কিন্তু তবু সে তার মাথাই চুলকায়।" —(পাগড়ী)

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র স্বীয় গদ্যরীতির উন্মেষ তার ছোটগল্প, পূর্ণ পরিণতি তাঁর উপন্যাসদ্বয় 'চাঁদের অমাবশ্যা' ও 'কাঁদো নদী কাঁদো'-তে। শেষোক্ত উপন্যাস থেকে দুটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে আমরা ওয়ালীউল্লাহ্‌র গদ্যরীতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ করছি।

(ক) "কারণে অকারণে মুহাম্মদ মুস্তফার মনে ভয় দেখা দিত। একবার গ্রামের হামজা মিঞা নামক মোল্লা-মৌলভী গোছের একটি লোকের কথায় ভীষণ ভয় দেখা দিয়েছিল তার মনে। লোকটি বলত, ঈমান মুফাচ্ছাল বাল্য বয়সেই পাকা হওয়া উচিত। একদিন মোহাম্মদ মুস্তফাকে হাতে পেয়ে নিজের শীর্ণ উরুতে বাঘা থাবা মেরে ব্যাঘ্র কণ্ঠে হুঙ্কার দিয়ে প্রশ্ন করেছিল : খোদা ভিন্ন কী মা'বুদ আছে, তাঁর সমতুল্য কেউ কি আছে, তাঁর কি কোনো শরিক বা প্রতিদ্বন্দ্বী আছে, তাঁর নিদ্রা-তন্দ্রা আছে, ক্ষুধা আছে, তৃষ্ণা আছে, ক্লান্তি-ক্ষয় আছে? সে-সব প্রশ্নে কী ছিল, বা বালক-মনে কী চিত্র জাগিয়ে তুলেছিল কে জানে। কিন্তু হামজা মিঞার প্রশ্নের গোলাগুলি শেষ হবার আগেই মুহাম্মদ মুস্তফা অজানা ভয়ে সমগ্র অন্তরে হিমশীতল হয়ে পড়ে। তার মনে হয় আকাশ অন্ধকার করে কেয়ামতি ঝড়-তুফান আসতে দেরী নাই, শীঘ্র কোথাও সহস্রাধিক হিংস্র ক্রুদ্ধ সিংহও কান বধির করা আওয়াজে গর্জন করা শুরু করবে। চোখ বুজে সে ছুটে পালিয়ে গিয়েছিল। পরে একটি নির্বোধ মেয়েমানুষের কাছে শুনতে পায়, খোদা নাকি দেখতে কলিজার মতো প্রতি মুহূর্তে থরথর করে কাঁপে। কথাটি কী কারণে তাকে আশ্বস্ত করে এবং যদিও তার মনে হয় আকাশে ভাসমান অদৃশ্য সে-কলিজার কাঁপুনিতে গোটা পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে, তার দুর্বোধ্য ভয়টি কিছু প্রশমিত হয়।"

(খ) "অকস্মাৎ একদিন একটি বিচিত্র কান্নার আওয়াজ শোনার পরও সকিনা খাতুনের মধ্যে কোনো পরিবর্তন দেখা দেয় না বা তার নিত্যনৈমিত্তিক কর্মজীবনে কোনো ব্যতিক্রম ঘটে না; পূর্বের মতো সে যথাবিধি স্কুলে যায়, বিবিধ সাংসারিক দায়িত্ব নিপুণ হস্তে নির্বাহ করে চলে, যেন সে-কান্নার ধ্বনি থেকে থেকে শুনতে পায় তা হাওয়ার গোঙানি মাত্র; হাওয়ার গোঙানি মানুষের জীবনধারায় টোল ফেলে না, তার পদক্ষেপ মুহূর্তের জন্যেও শ্লথ করে না। কখনো কখনো নিজেই বুঝতে পারে, বিচিত্র দুর্বোধ্য কান্নাকাটির জন্য সে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মানুষ তারই অজান্তে অলক্ষিতে কত সময়ে কত কিছুর জন্য অপেক্ষা করে, মেঘ-সঞ্চারের জন্য, যে ফিরিওয়ালার কাছে কেনবার নেই সে ফিরিওয়ালারও ডাকের জন্য, অকস্মাৎ কোথাও একটি হাসি বা শুধুমাত্র একটি কণ্ঠস্বর শোনার জন্যে। তারপর আপদ-বিপদের জন্য অপেক্ষা করে : রোগব্যাধি দুঃখ-কষ্টের জন্যে বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারীর জন্যে, সর্বশান্ত করা অগ্নিকাণ্ডের জন্যে, মৃত্যুর জন্যে, কেয়ামতের জন্যে। দুনিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত চক্রে আবর্তিত হয় জেনেও যে-সব ঘটনা ঘটা সম্ভব নয় সে-সব ঘটনার জন্য অপেক্ষা করে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, কবর থেকে মৃতকের পুনরুত্থান, পাখিতে মানুষের রূপান্তর প্রাপ্তি, এমন দিন যেদিন সকালে সূর্য উঠবে না। সচেতন অচেতনভাবে জেনে না জেনে সম্ভব-অসম্ভব কত কিছুর জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে, সকিনা খাতুন কান্নাকাটির জন্য অপেক্ষা করবে তা বিচিত্র কী।"

শিল্পী কামরুল হাসান

কয়েক মাস আগে আর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে কামরুল হাসানের একটি একক চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এতে মোট ছবি ছিল প'য়ত্রিশটি, প্রায় সবই জলরঙ-এর। পরিণত শিল্পীর সর্বশেষ পর্যায়ের সৃষ্টি স্বভাবতই বিপুল সংখ্যক দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করে। লোক ভীড় করে ছবি দেখেছে এবং বিত্তশালী শিল্পানুরাগীরা ভাল ভাল ছবিগুলি তাড়াতাড়ি কিনে নিয়ে গেছেন। ঢাকার অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ সাংস্কৃতিক জীবনে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

এই প্রদর্শনী এতটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল কেন। এক কারণ ছিল ছবিগুলোর আত্যন্তিক উৎকর্ষ। উজ্জ্বল ও সতেজ বর্ণচ্ছটা রেখার অনবদ্য ক্রীড়াময়তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যে আনন্দময় জীবন-চেতনাকে প্রকাশ করেছে তার আবেদনে সাড়া না দিয়েছে কে ! দর্শকের উৎসাহের একটা দ্বিতীয় কারণও ছিল। কামরুল হাসানের বর্তমান পারদর্শিতার সূত্র ধরে তারা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের বিবর্তনের ধারাকে। সজাগ চোখের আনন্দই ছিল অন্তরালের এই অতীতকে প্রত্যক্ষ করার মধ্যে। কামরুল হাসান চেনা মানুষ, পূর্বপাকিস্তানের পটভূমিতে তিনি নবীন নন, পুরাতন। তাঁর কলারীতির বিভিন্ন স্তরক্রম বিচারের দ্বারাই তাঁর শিল্পী-সত্তার পূর্ণ পরিচয় সম্যকরূপে নিরূপিত হতে পারে। এই চিন্তা ও চেষ্টার প্রভাব ছাড়াও আরও একটা কারণে এই প্রদর্শনী কৌতূহলী দর্শককে এক বিশেষ পরিতৃপ্তি দান করে। একাধিক প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ শিল্পীর গুরু কামরুল হাসান বরাবরই মুক্তহৃদয় ছিলেন। নয়া কলারীতির উদ্ভাবকদের তিনি কখনই অবজ্ঞা করেন নি। অত্যাধুনিকদের অঙ্গ ভঙ্গে তিনি উত্তেজিত হননি, রুষ্ট তরুণের প্রতিবাদের মধ্যে আতংকিত হবার মতো কিছুই খুঁজেই পাননি। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত কামরুল হাসান নিজেও রঙরূপ ও মাধ্যমের কোনো সুনির্দিষ্ট একক এলাকায় নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি ; অবশ্য নিছক খেয়ালিপনার দাস তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। সাম্প্রতিক চিত্রকলার রূপ বিভ্রাটের কেন্দ্রস্থলে বাস করেও তিনি স্থিরচিত্ত ও আত্মবিশ্বাসী বস্তুর অবয়ব সংস্কারের শৃংখলাকে তিনিও ভেঙেছেন, কিন্তু ভেঙে একেবারে তছনছ করে ফেলেন নি, তাকে পুনর্গঠিত করেছেন, নবপরিচর্যা দান করেছেন। প্রদর্শিত ছবিতে এই সুষমার ছাপ ষোলআনা বিদ্যামান ছিল।

দুই

প্রথম পর্যায়ে কামরুল হাসান অত্যন্ত সততার সঙ্গে বাস্তব পরিবেশের চিত্র রচনা করতেন। ত্রুটিহীন সূক্ষ্ম সীমারেখায় ফুটিয়ে তুলতেন প্রকৃতি ও সমাজের বিচিত্র দৃশ্য ও ঘটনাকে। সে রেখা বস্তুসীমা রূপায়ণে, যেমন অভ্রান্ত ছিল তেমনি সরস কারুকার্যেও ছিল সমান দক্ষ। রেখা শিল্পীর ভাবনাকে অনুসরণ করে বাস্তব প্রতিকৃতির মধ্যে উর্ণায় বিদ্রূপ কৌতুক দরদ ভালবাসায় লীলায়িত হয়ে উঠত। আমাদের চিত্রকলার ইতিহাসে কামরুল হাসান স্মরণীয়

হয়ে থাকবেন প্রধানত তাঁর সুস্থ সমাজ-সচেতনার জন্য। শিল্পাচার্য জনয়নুল আবেদীনের প্রিয় শিষ্য কামরুল হাসান গুরুর মতোই সমুন্নত দেহ ও সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী, স্বদেশভক্ত এবং মৃত্তিকামুগ্ধ। মাটির কাছাকাছি যারা বাস করে শিল্পী মনেপ্রাণে তাদের কর্মজীবনের ও স্বপ্নকল্পনার রূপকার হতে চেয়েছেন। চিত্র বর্ণমালায় স্বাক্ষরযুক্ত না হলো জীবনরসপুষ্ট চেতনার এই বিশিষ্ট ছাপই তাঁর সৃষ্টিকে অনায়াসে পরিচিত করে দেবে। কামরুল হাসানের অফুরন্ত ও উচ্ছ্বসিত জীবন প্রেমের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর মনোমুগ্ধকর প্রফুল্লতা, রঙ্গকৌতুক মিশ্রিত এক সস্নিগ্ধ উদার সুস্মিত মনোভঙ্গী। তাঁর পুরোনো ছবির মধ্যে 'চতুর্থ দফা' স্মরণীয় কীর্তি। প্রশস্তদেহ লোভী ভোগী বৃদ্ধ চতুর্থ পত্নী গ্রহণের জন্য বিবাহ বাসরে উপবিষ্ট আর সন্ত্রস্ত কিশোরী কন্যাকে ঘিরে পাঁচমিশাল আত্মীয়পরিজনবর্গ সকৌতুকে সবটা দৃশ্য নিরীক্ষণ করছে। 'উঁকি'-তে গৃহরুদ্ধ বধূ মাটির ঘরের জানালার ঝাঁপি তুলে অতি সঙ্গোপনে বাইরের নিষিদ্ধ দুনিয়ার বুকে অবাক বিস্ময়ে চোখজোড়া মেলে রেখেছে। শরীরের বাঁকে, কনুয়ের নির্ভরতায়, কোমরের বিছাহারের বঙ্কিম ভঙ্গিতে সে কী করুণ মধুর বিহ্বলতা! এই হচ্ছে আদি কামরুল হাসান, অকৃত্রিম কামরুল হাসান।

কয়েক বছরের মধ্যে কামরুল হাসানের চিত্ররীতির পরিবর্তন সূচিত হয়। রীতিই মুখ্যত, দৃষ্টি গৌণত, নূতন পথ অনুসন্ধান করে। কর্মরত কামার-কুমোর, চর্মকার, স্নানরতা তন্বী, সন্তানবৎস মাতা অঙ্কিত হলো সূক্ষ্ম সরু রেখার নয়, মোটা তুলির গাঢ় টানে। অকলঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটে তরঙ্গায়িত স্থূল রেখায় মূর্ত হয়ে উঠেছে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত নরনারী, ন্যূনতম আঁচড়ে নির্মিত হয়েছে মহিমান্বিত প্রচারপত্র। তৃতীয় পযায়ে এই কলারীতিই জটিলতর কৌশলমণ্ডিত হয়ে তেলরঙ-এর বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। লালচে ভাঙা প্রাচীরের ওপর উবু হয়ে বসা সোনালি ধূসর বানর রোঁয়া ওঠা ভুরুর নিচ থেকে সংকীর্ণ চোখে পিটপিট করে নিজের গাত্র দর্শন করে, হলদেসবুজ কলাপাতার ঘন অন্তরাল থেকে ত্রিবর্ণের তিন গ্রাম্য বধূ বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে আলোর দিকে তাকায়, নতশির স্নানার্থী নিতম্বিনীর সিক্ত কেশের প্রস্রবণ স্পর্শ করে জনচক্রকে সোপানের ধাপে ধাপে ঢেউয়ের দোলায় ছড়িয়ে পড়ে পরিপূর্ণ নারী দেহের রূপতরঙ্গ। বয়সের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যম ও রীতির প্রয়োগে যেমন নৈপুণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি শিল্পীর জীবনোপলব্ধিও প্রেমপ্রীতির আস্বাদনে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

তিন

কামরুল হাসানের সাম্প্রতিক চিত্রাবলী নূতনতর বৈচিত্র্যের সংবাদবাহী। চেতনার শেকড় বাঙালির দীর্ঘকালীন শিল্পচর্চার ঐতিহ্যের মর্মে প্রবেশ করে সেখান থেকে রস আহরণ করেছে, সে রসে জারিত হয়ে যা সৃষ্টি করতে অনুপ্রাণিত হয়েছে তা যেমন দেশজ তেমনি শিল্পজ। রঙ-এর নির্বাচনে ও ব্যবহারে, রেখার বিশিষ্ট সরলায়ন ও নকশীকরণে কামরুল হাসান সজ্ঞানে বাংলার লোকজীবনের সমৃদ্ধি বর্ধনকারী কামার-কুমার পটুয়ার কারুকর্ম থেকে অবাধে ঋণ গ্রহণ করেছেন। তাই বলে কামরুল হাসান লোকশিল্পী নন, তিনি আধুনিক চিত্রকর, কুশলী এবং বিদগ্ধ, আত্মসচেতন এবং সমাজসচেতন। প্রতিকৃতি রচনায় তাঁর কোনো উৎসাহ নেই, তিনি প্রকৃতির নকলকার হতে চান না। জীবনের তিনি রূপকার,

বস্তুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে নবরূপ দান করেন, পুনঃসৃষ্টি করেন। আদলটা দেশের প্রাচীন অঙ্কন-পদ্ধতির স্মৃতি বহন করে বটে কিন্তু ঐ পর্যন্তই, বাকিটা ওর নিজস্ব, নূতন, মৌলিক। কল্পনা, বক্তব্য, জীবনদৃষ্টি, কলাদর্শ সবই একালের। পটুয়ার সিংহ মহাশয় কামরুল হাসানের তুলির রেখাঘাতে নবরঙ্গে মেতে ওঠে, সিংনাড়া গরুর রোষ নিশ্বাসের ফুলকিতে ফুল হয়ে ঝরে। মৎসশিকারী বালকের সাফল্যের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে রক্তপীত হরিৎ বিচিত্র বর্ণের জলজ লতাগুলো ফুলপত্রে। একদিন ছিল যখন কামরুল হাসান পৃথিবী দেখতেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, অংশত বিশ্লেষণী মনোভাব নিয়ে। চিত্রে তাকে রূপ দিতেন গভীব বেদনা ও দরদে মথিত হৃদয় দিয়ে, কখনও রঙ্গকৌতুক বিদ্রূপের বহ্নি মিশিয়ে। রেখা টানতেন দক্ষ কারিগরের অভ্রান্ত বাস্তব দৃষ্টি সজাগ রেখে, রঙ ঢালতেন পরিমাপ মতো। হালের কামরুল হাসান কল্পনার বিভোর, আঙ্গিক উদ্ভাবনে দুঃসাহসিক, বস্তুশোভার চিত্রণে আদর্শায়ন ও অতিরঞ্জনে বিশ্বাসী, জীবনচেতনায় কবিত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলে দেশের মাটিতে ভুলে যাননি, লোকঐতিহ্যেব ঐশ্বর্যকে অস্বীকার করেননি। কামরুল হাসান শেষ পর্যন্ত পূর্ববাংলারই সন্তান, তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কবি, তার রূপ-সৌন্দর্যের চিত্রকর।

প্রবন্ধ

সূচি

আসুন—চুরি করি!

সাহিত্যে চুরি, চুরি নয়।

ছোটকালে আম্মা ঘুমিয়ে পড়লে, নিঃশব্দে আঁচল খুলে চাবিটা তুলে নিয়ে খাবারের আলমারি খুলে ফেলেছি; তারপর তার চেয়ে সন্তর্পণে মুখের মাংসপেশীর অপূর্ব কৌশলযুক্ত দ্রুত সঞ্চালনে খাদ্য-অখাদ্য সামনে যা পেয়েছি, তাই পাকস্থলীর পথে রওনা করাতে গিয়ে অকস্মাৎ কারও কোমল করাঙ্গুলীর দৃঢ় আকর্ষণ কানের পেছনে বোধ করা মাত্র 'ওঃ গেছি' বলে ছুটে পালিয়েছি। কিন্তু তাই বলে নিজেকে কি চোর বলে আপার সামনে স্বীকার করেছি?

আমরা যারা সাহিত্য-সেবা করার জন্যে উদগ্রীব—জি, মডেস্টি বলে ভুল করবেন না—সবাই সদা এক একজন শিশু। অত্যন্ত সরল, নিষ্পাপ, অবুঝ। আর এই বিরাট বিশ্বসাহিত্যের খাদ্য রূপকটা যতদূরে সম্ভব বাছাই হয়ে ইংরেজি সাহিত্যের মিট্‌সেফে বন্ধ করা আছে। সমালোচকদের অসতর্ক ঝিমুনির ফাঁকে ফাঁকে আমরা যদি কখনো এক-আধ টুকরো মুখে পুরে—কানে আকর্ষণ বোধ করার অপমানটাকে দৈহিক ব্যথার মতোই তুচ্ছ মনে করে—বাংলা ভাষার পাকস্থলীতে রসাল করে চালান করে দি', তবে কি সেটা গুণাহ হলো?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রায় সবাই তা করেছেন। তবে তফাৎ এই যে, কেউ এক সাথে কচি গালে অনেকগুলো পুরে দিতে গিয়া ফুলো-গালে ধরা পড়ে যান মিটসেফের বড্ড কাছে।

কেউ বেশি খেয়ে হজম করতে পারেন না। কেউ আবার ধরা পড়েন বিশ্বাসঘাতকতার ফলে। তখন উত্তর হয়; কখনো সম্পূর্ণ নীরবতা, কখনো—একেবারে অস্বীকার, কখনো নিছক শুকনো হাসি।

এবার এই চুরি-খেলার শিশু-কৌশলের সিঁড়িগুলো দেখা যাক। আমাদের সবার মন যখন শিশু—আর আমার মতো অখ্যাতনামা গোত্রের দলে যারা, তাদেরও যখন এ-পদাঙ্কই অনুসরণ করতে হবে, তখন অভিজ্ঞ খ্যাতনামাদের জ্বলন্ত গৌরবোজ্জ্বল আদর্শ সামনে রেখে পথ চলতে শেখাটাই বোধ হয় সবচেয়ে কম বিপজ্জনক হবে।

বুদ্ধদেব বসু মহাশয় সাহিত্যে এ বিষয়ে অমর উদাহরণ। হাক্‌সলী থেকে কীরকম বে-পরোয়া ও নির্ভুল বাংলায় অনুবাদ করে স্থানে-অস্থানে কঠোর ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছড়িয়ে নিজস্ব বলে চালিয়ে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে 'শনিবারের চিঠি' বলেছে। 'শনিবারের চিঠি'র এই অতি কঠিন ও মর্মান্তিক ব্যাঙ্গের ভঙ্গী সত্যিই আমায় ব্যথা দিয়েছে। এ-শুধু হৃদয়হীনতার প্রকাশ নয়, বরঞ্চ প্রগতিশীল বলে যে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য দাবি করে, তার যুগ-গতির সাথে অগ্রসর-পথে এ-একটা বিরাট কলঙ্ক।

অবশ্য আমরা যারা এখনও বড্ড বেশি কাঁচা, তারা প্রথম ধাপেই এতটা সাহস করতে পারি না। 'আস্তে আস্তে চোটো' তারা মিঞার এই মহাগম্ভীর সত্য-বাণী আমাদের সর্বক্ষণ মনে রেখে পথ এগুতে হবে।

বুদ্ধদেববাবুর মৌলিক পন্থায় একটা সংক্ষিপ্ত ও প্রাথমিক কার্যসূচি তৈরি করেছি, আমাদের কার্যোপযোগী করে। আশা আছে সফলকাম হবই।

আপনি একটা বিদেশী বই পড়ুন—ইংরেজি, উর্দু, পারসি— যেটা আপনার আসে। কোনো একটা বিশেষ রচনা পছন্দ কর নিন। অন্য একটা রচনার টেক্‌নিক টেনে এনে ফিট্ করে দিন এটার। তারপর ঐ বইটা না দেখে নিজের ভাষায় স্বচ্ছন্দ গতিতে লিখে যান ঐ প্লটটা। ব্যাস্ গল্প বা প্রবন্ধ যা কিছু তৈরি হলো সেটা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং আপনার। কপি করে কোনো সম্পাদককে পাঠিয়ে দিন, দেখবেন উচ্চ প্রশংসিত হয়ে সেটা ছাপা হয়ে গেছে।

এ পর্যন্ত গেল আঁচল থেকে চাবি চুরি করে মিটসেফ থেকে খাবার হাত করা। চাই কি মুখে পুরে দেয়া পর্যন্ত!

এরপর আপার আবির্ভাব ও কর্ণমূলে দুর্দান্ত আকর্ষণটা আকস্মিক সংঘাত। দৈব পক্ষে থাকলে অঘটনটা না-ও ঘটতে পারে। আর যদি হয়, তাও এড়াবার নিখুঁত উপায় অচিন্ত্যবাবু ওঁর নিজের অজানতেই আমাদের বাৎলে দিয়েছেন।

বিদেশী বই থেকে প্লট্ আপনার হলো। সেটা মনের পেছনে রেখে সেই বিদেশী চরিত্রের অস্তিত্বকে ভুলে যান। টেনে হিঁচড়ে নিজের চেনা দু'একটা মুখ এনে দাঁড় করিয়ে দিন শূন্য স্থানগুলোতে। বিদেশীতে আলখাল্লা থাকলে, দিশীতে আপনি পাঞ্জাবি করে দিন—সুট্ থাকলে আচকান ইত্যাদি। ইংরেজিতে আপনি যদি অর্গান পেলেন, বাংলায় হার্মোনিয়াম কি কাঁসর ঘণ্টা পর্যন্ত নাবতে পারেন। উর্দুতে যদি রাবড়ি পেলেন তবে ইংরেজিতে চক্‌লেট রাখুন, আবার বাংলায় সময় বুঝে ডালমুট অবধি বসিয়ে দিতে পারেন।

ব্যবসা ক্ষেত্রে সার্বজনীন সুবিধার জন্যে একটা কাটালগ তৈরি করার ইচ্ছে ছিল কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কাগজের অভাব আর ঘরোয়া খোঁচায় সময় করে উঠতে পারি নি। তবুও দু'একটা টুকটাক নির্দেশ-চিহ্ন সাময়িক কাজ চলবার জন্যে উল্লেখ করে যেতে পারি।

অচিন্ত্যবাবুর 'মুখে-দেখা' গল্পটা যে-টা বেরিয়ে ছিল দেড়-দু বছর আগে 'সোনালী ফসল' নামক ছোটদের বার্ষিকী-তে—এই নতুন স্কুলের অনুসরণকারীদের গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ সাহায্য করবে। হ্যামসুনের 'ভ্যাগাবন্ড' [বেদে] বইটার প্রথম দিকের-ই দুটো ভিক্ষুক সংঘটিত একটা ঘণ্ট দু'একবার পড়ুন। তারপর এই বাংলা সংস্করণটাও পড়ুন। আপনার নিজের চোখ-কে নিজেরই বিশ্বেস করতে ইচ্ছে করবে না। দেখবেন এক, তবু মনে হবে দু'। অথবা দেখবেন দু' তবু মনে হবে এক। তারপর যখন অচিন্ত্যবাবুর সাহিত্য-ক্ষেত্রের সুনামটাকে উল্টো করে ধরে নলের মতো করে ঝুলিয়ে তার ভেতর দিয়ে গল্পটা পড়বেন দু'ভাষাতেই—মনে হবে কেলিয়োডোস্কোপের ফাঁক দিয়ে আপনি বুঝি মাত্র দু'টুকরো কাঁচকে নেড়ে-চেড়ে বিচিত্র বর্ণ-বিন্যাস উপলব্ধি করার এক নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগ করছেন।

এর চেয়ে-ও উঁচু স্তরের চুরি আছে।

যেখানে অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরে আপাকে পর্যন্ত হাতে-হাতে ধরার পরও চুপ করে থাকতে হয়। যে রকম ঘরে অনেক সময় ঘটে—যখন কোনো বয়স্থ ভদ্রলোক ঐ লোভের বশবর্তী হয়ে মিটসেফ দ্বারা আর্ষিত হন। তখন আপাকে হয় না দেখার ভান করতে হয় অথবা এমন একটা ভাব দেখাতে হয়, যার অর্থ ভদ্রলোক নিশ্চয় নিজের জন্যে নয়; মহত্তর কোনো পরোপকার করার বৃহত্তর উদ্দেশ্য নিয়ে-ই ও কাজে হাত দিয়েছেন।

এই ধরনের চুরি করার জন্য আমাদের প্রত্যেককে গড়ে তুলতে হবে, নিজেদের মধ্যে বিপুল নৈতিক বল। যার শক্তি দিয়ে আমরা সত্যকে ধরা দিয়েও নিজেদের অসত্যকে ঠুনকো হতে দেবো না।

আসুন, দেরী না করে আমরাও সে চেষ্টাই করি। সামনে আমাদের দিগন্ত-বিস্তৃত সৌভাগ্যের হাতছানি। এ-যুগের মূলমন্ত্র মেনে আমরাও সেই উদারচেতা সাহিত্যিকদের বিদেশী জুতোর অনুসরণ করি : তাঁদের যারা চুরি কোরেও চোর নন। সাহিত্যে এ হচ্ছে অত্যধিক জ্ঞানের ফলে ভিন্ন কোনো বৃহৎ সাহিত্যের প্রভাব-ফল। যদি শিগ্‌গির কোনো দিনে সত্যি এই নতুন ওয়েসিসে সাঁতার কেঁটে চমক্‌প্রদ কোনো সাফল্যের তীরে গিয়ে উঠতে পারি তখন সবার আগে যাঁরা আমাদের এই সফলতার জন্যে মোবারকবাদ করতে পারেন তাঁরা হচ্ছেন : শিবরামবাবু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণবাবু ও কাজি আফসারউদদিন সাহেব।

এই গেল গদ্য-ইতিহাস।

আধুনিক কবিতার ব্যাপারে আরো জমকালো! এখানে সময় নষ্টের ভয় নেই, লেখকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার ন্যায়সংগত যুক্তি নেই, এমন কি পাশে অভিধান খুলে শব্দ বের করে দেবার লোক থাকলে বানান পর্যন্ত ভুল হবার সম্ভাবনা নেই। নির্জ্ঞান মনের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত অজস্র ঘটনা টুকরোকে পাঁচফোড়ন দেয়া অপটু হস্তের নিরামিষ তরকারির মতো, ব্যাকরণবর্জিত একঝাঁক দুর্বোধ্য শব্দেব অসমতল পিণ্ড দ্বারা, কিছুটা ছন্দহীন চিৎকার করে গেলেই হলো!

আপনি হয়ত ভাবছেন যে তাহলে চুরি কবার প্রশ্নই ওঠে না। সবাইত ওবকম ভাবে মৌলিক হতে পারে। কিন্তু একথাটা মনে বাখবেন, যাঁরা চুরি কবেন সাধারণত তাঁরা যাবা চুরি কবে না তাদের চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।

অনেক যখন জ্ঞানগর্ভ, যুক্তপূর্ণ কথা বলে তখন তাদের লোকজনের জাতের সাথে আরেকজনের মতের পার্থক্য খুঁজে বের করা বোধ হয় খুব কষ্টকর নয়। কিন্তু যখন অর্থহীন বকওয়াসে সবাই মুখব তখন দু'জনের মতের মধ্যে তফাৎ বের করা কষ্টকর হয়ে ওঠে। বস্তুতে বস্তুতে তুলনা চলে কিন্তু বস্তুত্বহীনতার মাঝে সে প্রশ্নই ওঠে না। ১০৫ ডিগ্রি জ্বরে রুগীর প্রলাপ আর স্বাস্থ্যবান কোনো পাগল উচ্চারিত উত্তপ্ত মস্তিষ্কের বিবৃতির মাঝে প্রকৃতি বা অর্থগত কোনো ভিন্নতা নেই।

এমনি একটা আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভের পর এক অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান আধুনিক কবির দল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যধারায় বাখার জন্যে এক নতুন রোশনাই জ্বাললেন।

এঁদের-ই আমরা পথপ্রদর্শক বলে মানব।

হাতেখড়ি দেবার আগে আমরা দু'একটা নমুনা ভাল করে বুঝে নি। প্রণালীটা তা হলে অনেকখানি পানি হয়ে আসবে।

ওস্তাদজি বুদ্ধদেব বাবুর-ই একটা কবিতা নেয়া যাক। নাম "Do you remember an inn Miranda ?"

লক্ষ করুন নাম রাখা হোলো ইংরেজিতে। সুরঙ্গমা নামে কোনো নারী নিয়ে একটা অতি সুন্দর আষাঢ়ে কবিতা। ঐ নামেই মূল কবিতাটা ইংরেজিতে হিলেরি বেলকেব লেখা। এখন এই বাংলা কবিতাটা পড়াব সময় যাঁবা মূল কবিতাটা ইংরেজিতে পড়েন নি তাঁবা এর

সৌন্দর্যকে প্রশংসা করবেন উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে। আর মাথা নোয়াবেন নাম রাখার অপরূপ অভিনব ভঙ্গীর মৌলিকতার কাছে। যাঁরা মূল রচনা পড়েছেন ত।রা চুপ থাকতে এই জন্যে বাধ্য সে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত ত ঐ নামের মাঝেই দেয়া আছে।

এরই একটু সহজ ও পরিবর্ধিত কায়দা থেকে আমরা বের করব—ধরা পড়েও আপাকে-চুপ-করানো চুরি। পদ্য আখড়ায় নেমে এই হলো আমাদের প্রথম প্যাঁচ শিক্ষা !

এর চেয়ে আরেকটু উঁচু স্তরের চুরি অপেক্ষাকৃত কলাপূর্ণ ও পাপশূন্য।

সেটা হচ্ছে এই, যেমন আপনি একটা আধুনিক কবিতা লেখার জন্যে বেতাব হয়ে উঠেছেন। তাগিদটা সম্পাদকের হোক কিম্বা প্রিয়ার আবদার-ই হোক! কাগজ, কলম, সম্ভবপর হলে একটা অভিধান আর অবশ্য অবশ্য একটা বিদেশী কবিতা সঙ্কলন—এই জিনিস ক'টা সাথে নিয়ে বসলেন। অদ্ভুত দেখে একটা চমকপ্রদ কবিতা আপনি পছন্দ করে নিলেন ঐ বিদেশী সঙ্কলন থেকে। এখানে অবশ্য আমরা ধরে নিয়েছি যে মোটামুটিভাবে আরো অনেকের মতো একটু-আধটু আধুনিক কবিতা লেখার ক্ষমতা আপনারও আছে। এখন চেষ্টা শুধু কী করে অত্যাধিকভাবে উগ্রমূর্তি ধরা যায়। যাক্ একটা কিম্ভূতকিমাকার কবিতা আপনি বেছে নিয়ে মাত্র একবার পড়লেন। তারপর বইটা বন্ধ করে রেখে আপনি আরম্ভ করলেন একটা কিছু নাড়তে [অভিধানই সবচেয়ে উপকারী!]—মনের পেছনে অর্ধেক বোঝা-না-বোঝা কবিতার বিদেশী কঙ্কালটা তখন বিকৃত উলঙ্গ মূর্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে খাঁটি স্বদেশী প্রেতখানায়। তারপর আচমকা নিয়ে পড়লেন কাগজ আর কলম-কে। তারপব ক'মিনিট মাত্র সময় খরচ করে আপনি যে কবিতাটার উদ্ধার করবেন সেটা হবে কেবল আপনার। এ একেবাবে গ্যারান্টি দেয়া।

কৌশলটা ভাল করে আয়ত্ত করার সবচেয়ে সহজ উপায়ও আমি বেব কবেছি। চেষ্টা করে দেখবেন। অনুপান বাৎলে দিচ্ছি।

বুদ্ধদেব বাবুর 'আফ্রিকা' কবিতাটা তিনবার পড়ুন। তারপব মনটা ক্লেদাক্ত হয়ে উঠলে খুব মনোযোগ দিয়ে এফ ও ম্যানের 'আফ্রিকা' কবিতাটাও একবার পড়ুন। তারপর ফেনাময় সাবান দিয়ে গোছল করে ফেলুন। কৌশলটা আপনার কাছে নিছক বাঁ-হাতেব প্যাঁচ বলে মনে হবে। বাথরুম থেকে বেরুবামাত্র অনুভব করবেন আপনার নতুন জ্ঞানলাভের এক অদ্ভুত রোমাঞ্চকর স্ফূর্তি!

আরেকটু কম বিপজ্জনক ও উন্নত ধরনের একটা টেকনিক্ আমি কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শিখেছি। মানে তাঁর-ই একটা কবিতা পড়তে পড়েত নিছক সুদৃষ্টির কল্যাণেই এই কলাটা আমি আকস্মিকভাবে আয়ত্ত করেছি।

এই ভঙ্গিটাই আমার মতে বোধহয় সবচেয়ে বেশি সুরুচিসম্পন্ন। পূর্ণভাবে এই কৌশলকে হাত করতে হলে আমাদের মনটাকে করে তুলতে হবে স্পঞ্জের মতো স্থিতিস্থাপক। বোধশক্তিটাকে, ফাঁপা দুটুকরো আভরণ মাঝে কারবন টুকরোর মতো সহজে গ্রহণ উপযোগী করে তুলতে হবে। অনাবশ্যকভাবে ইমোশনাল হবার ক্ষমতা অর্জন করতে হবে।

আরেকটু স্থূল ভাষায় বলছি।

ধরুন আপনি একটা বিদেশী ভাষার শিকার নিয়ে আপ্লুত হয়ে পড়লেন—তারপর হতে হতে উপচে ওঠা ভাবের ধাক্কায় এত বেশী আত্মহারা হয়ে পড়লেন যে, যেটা থেকে প্রথম রস গ্রহণ

করেন সেই মূল কল্পনাটাকেই প্রায় ভুলে যান। এই বেমালুম ভুলে যাওয়ার মধ্যেই কৌশলটা লুকোনো।

অথবা এমন হয় যে যখন আপনার স্মরণশক্তির কুবুদ্ধি। বারবার করে অন্যের রচা মূল কল্পনাটা আপনাকে মনে করিয়ে দিয়ে স্ব-আনন্দের রশ্মিটাকে ম্লান করে দিতে চায়, তখন আপনি ঝপ্ করে চটেমটে, অগণন তরঙ্গে নৃত্যময়ী সামরিক জোশে এসে একটা কিছু লিখে ফেলেন।

সত্যি বলতে কি এই যে একটা মানসিক—ঝোড়া পরিস্থিতি প্রসূত রচনা, তার স্থানে-স্থানে হয়ত মূল বিদেশী রচনাটার মুখ ভেংচি থাকবে—তবুও জিনিসটা সম্পূর্ণ আপনার হবে। তার জন্যে আপনি কষ্ট করেছেন। কাজেই স্বচ্ছন্দে আপনি মূল রচয়িতার আংশিক বাহাদুরিটা অত্যন্ত ন্যায্যভাবে চেপে যেতে পারেন।

হয়ত কামাক্ষীবাবু কিছুই জানেন না এ বিষয় সম্বন্ধে। তবু আমরা আমাদের কা.জ হাত পাকাবার জন্যে ও'র কবিতা থেকেই একটা উদাহরণ আদর্শ হিসেবে তৈরি করে নোবো। যে-কবিতাটার কাছে আমি পরোক্ষভাবে ঋণী এই জ্ঞানটুকুর জন্যে।

লুই গেন্ডিং-এর Come Hills বলে কবিতায় প্রথমে পাহাড়কে ডাকা হয়েছে জেগে ওঠার জন্যে। নিথর পাহাড়কে আহ্বান করা হয়েছে রুদ্রনৃত্যে চঞ্চল হয়ে উঠতে। আর কামাক্ষীবাবু সুর তুললেন, "হে মৈনাক, সৈনিক হও।" এখানে রূপ পেল শুধু, অনির্দিষ্ট যে-কোনো-পাহাড়ে নয়। ভাবালুতা ঠমক দিয়ে অলঙ্কার পরল। বলা হোলো, মৈনাক। শুধু রুদ্র নৃত্য নয়, কঙ্কালে কঙ্কালে ঠোকাঠুকি নয়, তাই ইমোশনাল ঝঙ্কার শুনলাম "সৈনিক হও"!

ছোটবেলার একটা কথা আমার মনে পড়ল। আলমারি থেকে খাবার চুরি করার পরও মাঝে মাঝে এমন হতো যে, কোনোক্রমে হয়ত আপার হাত এড়িয়ে বারান্দা পর্যন্ত এসেছি কিন্তু তক্ষুণি হয়ত কোনো আত্মীয় এসে ছোঁ মেরে কিংবা আব্দার অথবা জোর করেই বসাল ভাগ। এমন কি হয়ত বা আমারই অলক্ষ্যে হাত বুলিয়ে নেয়।

এই পথেরই পথিক আমাদেরই একজন চলনসইভাবে খ্যাতনামা আধুনিক কবি। তাঁর দু'একটা কবিতা, কামাক্ষীবাবুর এক ঝাঁক কবিতা থেকে বাছাই করা কতগুলো শব্দ বা একশব্দ অর্থে ব্যবহৃত শব্দসমষ্টির কৌশল সহকারে নতুন সারিতে সাজানো। ব্যাপারটা রসায়নশাস্ত্রে আইসেমেরিজেমের মতো অনেকটা। তবে কবির স্বাভাবিক আড়ষ্টতা এবং দুর্বোধ্যতা তাঁকে অনেকখানি দুশমন-কবল থেকে বাঁচিয়েছে। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেই নামটা উল্লেখ করতে পারলুম না। সে জন্যে মাফ চাইছি। তবে কৌশলটা মৌলিক এবং সহজবোধ্য।

আধুনিক উর্দু কবিতা

বৈচিত্র্য সন্ধানী আধুনিক উর্দূ কবিদের মধ্যে রাজা মেহদে আলী খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গদ্যকবিতায় আচমকা এসে ইনি এমন কতগুলো অভিনব এবং অদ্ভুত বাঁক দিয়ে গেছেন যে, সেটা সমালোচক-মহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই একটা দৃঢ়, সুস্পষ্ট ছাপ এঁকে দিয়েছে।

ব্যঙ্গ রসের পরিবেশনেই যেন এঁর কবিতার প্রধান লক্ষ্য। তবে পন্থাটা একটু আলাদা ধরনের। মানুষের খুব দুর্বল তন্ত্রীতে ইনি আঘাত দেবেন, খুব আস্তে, খুব ধীরে। সে স্পর্শ এত মোলায়েমভাবে এসে আঘাত করে যে, তখন সেটা satire-এর সূক্ষ্ম পীড়াদায়ক অনুভূতির বদলে, জাগিয়ে তুলে একটা প্রাণ-মাতানো সরল হাস্যধ্বনি। সাধারণত রসিকতা জিনিসটা যার ওপর করা হয়, তাকে একটু কষ্ট স্বীকার করতেই হয়— রসটা স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম তার বাছবিচার না করেই। আর যারা দর্শক হয় : তারা উপভোগ করে আনন্দ, চোখে, মুখে প্রকাশ করে [অন্তর-উৎফুল্লতার শারীরিক উচ্ছ্বাস। মেহদে আলী খাঁর কবিতার কথাগুলো এমন একটা শিশুসুলভ সরল যে, কবিতার মাঝে কোনো রুদ্র প্রকৃতির ছোঁয়াচ থাকলেও তাব গাম্ভীর্য স্বীকার করতে মন চায় না। কবিতার শব্দের মাঝখানে যেন শিশু-ভাবুকেব মিটিমিটি চাউনি উঁকি দেয়! ফলে কবিতা পড়ার পরবর্তীকালে যে পরিস্থিতির উদ্রেক হয় সেটা বিশুদ্ধ আনন্দের—ক্ষমাসুন্দর তৃপ্তিব। যাঁদের লক্ষ্য করে কবিতার বিদ্রূপ তাঁদেরও এই মনোভাব, আর যাঁরা হাততালির দর্শক ,তাদেরও।

'নাগ্নীর মেয়ের দোয়া' কবিতায় বলছেন :

> ও আল্লাহ। আজ এ-নিস্তব্ধ অরণ্যে
> যখন কেউ কোনো দিকে নেই,
> তখন তুমি আমার দর্শন দাও,
> দর্শন দাও!
> যদি না দাও,
> তবে এ জেনো
> ছোট্ট একটি মেয়ে
> তোমার ওপর রাগ করবে...

'ছোট্ট একটি মেয়ে' দুহাত ওপরে তুলে ঐকান্তিক নিবিড় সুরে মোনাজাত করছে—ছবিটা যেন চোখের সামনে ফুটে ওঠে। এই কবিতার শিশুর যুক্তিহীন মনের ক্ষুব্ধতা দেখে, একাগ্র চিত্তের নালিশ শুনে—সমস্ত মন ভরে জেগে ওঠে উপচে ওঠা হাসির জোয়ার। সঙ্কীর্ণ সব বাঁধন টুটে বেরিয়ে আসে ক্ষমাসুন্দর স্ফূর্তি।

মেহদে আলী খাঁ ভণ্ড মৌলভিদের বিদ্রূপ করতে ভীষণ ভালবাসেন। সেই সব বক-ধার্মিকদের নিয়ে এঁর কবিতা যাঁরা দিনের আলোয় সদাসর্বদা বিশ্বস্রষ্টার নামে গদ্-গদ্ চিত্ত আর

লোকচক্ষুর অন্তরালে আঁধার ঘনিয়ে এলেই মুখোস খুলে স্ব-স্ব পাপ চেহারায় আত্মপ্রকাশ করেন। এই শ্রেণীর লোক এত হীনভাবে ভীরু যে, নিঃসঙ্কোচ পাপ করতে ভয় পায়!

একটা কল্পিত তুলনামূলক দৃশ্যের সৃষ্টি করে আশ্চর্যজনকভাবে এই ভাবটাকেই প্রাণ দিয়েছেন, মেহদে আলী খাঁ—

খট্ খট্ খট্!
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার।
রাত হয়েছে অনেক
কেউ এখন দেখছে না
মৌলানা,
একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার!...
খট্ খট্ খট্ !
এত রাতে
চুপে চুপে। মৌলানা,
এসেছি টিপে দিতে
তোমার পা,
মৌলানা, একটিবার খুলে দাও না
জান্নাতের এ দ্বার।

অস্বাভাবিক এক দৃশ্যের সৃষ্টি, বলবার ভঙ্গী হাস্যকর! তবু ভাষার সাবলীল গতির পেছনে থেকে থেকে ঝিক্‌মিক্ করে উঠছে সুতীব্র ব্যঙ্গচ্ছটা। জান্নাত, শয়তান ইত্যাদি অতি গম্ভীর কাব্যসামগ্রীর পাশেই কবির স্বাভাবিক রসিক-মনপ্রসূত হালকা ঠাট্টার সুরটা satire-এর প্রকৃত সূক্ষ্ম কলাকে ক্ষুণ্ন করলেও তার গতিকে মন্থর করে নি।

এমনিতর দৃশ্য আঁকতে তিনি সিদ্ধহস্ত। একাঙ্কিকা নাটকে যেমন সম্রাট অষ্টম হেনরি এবং রাজ্ঞী ক্যাথ্‌রিনের শান্-শওকত-প্রবেশ ঘটিয়ে আপনি যদি তারপর অবতারণা করেন একটা সামান্য পারিবারিক ডিম সেদ্ধ নিয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী তুমুল ঝগড়ার দৃশ্য, তবে সেটা যেমন চূড়ান্ত, হাসারসের খোরাক যোগাবে, ঠিক তেমনি বিপরীতমুখে দুটো কল্পনা রেখার আকস্মিক সংঘাত ঘটিয়ে মেহদে আলী খাঁ গড়ে তোলেন তাঁর কবিতার ব্যঙ্গরস। অঘটনীয়, অকল্পনীয় কতগুলো ঘটনা তিনি তাঁর নাছোড়বান্দা কণ্ঠস্বরে এমন করে ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন যে, তখন ব্যাপারটার বাস্তবতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন ওঠার আগেই মন ব্যগ্র হয়ে ওঠে রস পান করতে।

কল্পনার গুরুত্ব বাড়াবার জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই 'আমি' ব্যবহারে বর্ণনা করা হয়েছে। কবিতার নাম—'কেয়ামতে হট্টরোল'। আরম্ভতেই লঘু-গুরু রসের প্রকাশ। তারপর :

প্রায় দশদিন শায়িত আমি বিছানায়,
কেয়ামত এসে গেছে।

ইস্রাফিল জোরে, আরো জোরে
সিঙ্গা ফুঁকছে।
মৃতদেহগুলো আরেকবার
দাঁড়ায় দু'পায়ে,
তারপর যে যেদিকে পারে
লম্বা দেয়—ভাগে দূরে!
আমি আমার ময়লা
ছেঁড়া-ফাঁটা লেপ সরিয়ে
এক চক্ষু বার করি,
আর বলি :
'আরে এই। এত চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?'
তারপরই আবার নিদ্রা।...

নিছক একটা প্রলাপের মতো, বিকারগ্রস্ত মনের বিকৃত স্বীকারোক্তির মতো। তবুও প্রথমে ভদ্রলোকের দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। তারপর তন্ত্রীগুলো একটু নিস্তেজ হয়ে আসতেই কেমন একটা অস্বস্তিময় নির্লিপ্ত অবজ্ঞার হাসি জেগে উঠতে চায় ঠোঁটের কোণায়। এ যেন একটা হিংস্র নখর হাত খামচে দেবে বলে এগোতে থাকে আপনার দিকে, তারপব কাছে এসে হঠাৎ আপনার ভয়-শিহরিত দেহে দিয়ে বসে শুধু কাতুকুতু!

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে তিনি তাঁর এক বৈকালিক ভ্রমণের অতি সাধারণ ঘটনার কথা বলছেন

আমি আর শয়তান
সেদিন সন্ধ্যে বেলায় লুকিয়ে লুকিয়ে
বেহেশতের দেয়ালের ওপর চড়ে বসে
চেয়েছিলাম এক দৃষ্টিতে
বেহেশতের পানে।
দেখি,
শুভ্র দুধের একটা শীর্ণা ঝর্না বইছে
মৃদু বাতাসের সাথে তাল রেখে।
তার পাশে—মস্ত বড় একটা
হজমী-গাছের নিচে
বিশাল একটা হালুয়ার ঢিপির ওপর বসে
এক মৌলানা
(দাড়ি তার বাতাসে
দুলছে),—
ঝিমুচ্ছেন।

কবিতাটার নাম দিয়েছেন : 'বেহেশতে উঁকি'।

দুই

বোধ হয় বছর দুই আগে যখন মেহদে আলী খাঁ সবেমাত্র এই ধরনের অদ্ভুত কবিতা দু-একটা করে রচনা করতে শুরু করেছেন তখন তাঁরও সন্দেহ হয়েছিল, সত্যিই কি সমালোচকরা তার কবিতাকে সহ্য করবেন?

ভয়ে ভয়ে সঙ্কুচিত হয়ে একটা ছদ্মনাম নিলেন, 'মুসাফের'। কোনো রকমে সাহস করে 'গুণ্ডা' নামে একটা কবিতা পাঠিয়ে দিলেন উর্দু আধুনিক সাহিত্যের অন্যতম মাসিক 'আদবে দুনিয়া'র কাছে।

খ্যাতনামা সমালোচক-কবি 'মীরাজী' তখন সম্পাদক। সাহিত্যক্ষেত্রে পাকা জহুরি বলে এঁর নাম আছে। উদীয়মান তরুণ লেখকদের মাঝ থেকে প্রতিভাবান শিল্পীদের খুঁজে বের করাই এর প্রধান বিশেষত্ব। তাঁর লেখার মাঝ দিয়ে সম্পাদনার সাহায্যে এই তরুণদেরই তিনি দিতেন সবচেয়ে বেশি উৎসাহ। মেহদে আলীর কবিতাটা সাগ্রহে 'মীরাজী' লুফে নিলেন। কবিতাটা প্রকাশ হলে ভয়ংকর হুলস্থুল সৃষ্টি করে।

দিনমজুরের কণ্ঠস্বর যেন শুনতে পাওয়া যায় এই 'গুণ্ডা'য় :

আরে আরে ইয়ার
চেহারাটাকে বাগিয়ে ধরে
দেখ না চেয়ে একবার।
আসছে কে ঐ রাস্তা ধরে?
সেই নারী, ল্যাংরা শেঠের সেই সুন্দরী
আসতো-যে রোজ এ রাস্তা ধরে
দিনে দুবার।
আবে ইয়ার, ফেলে দে আজ তাস!...
একবার চেয়ে দেখ
তার কালো আঁখির চঞ্চলতা। ...
তার শাড়ির বাহার।...

প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রকাশভঙ্গিতে সুরুচির পরিচয় কোথা? কিন্তু আমরা বলি, রুচিই কি সব? প্রকাশভঙ্গীই কাব্যের সব কিছু? কিন্তু বাস্তবতাকে কী করে অস্বীকার করা চলে? বস্তুত মনে হয়, কবির বলবার এই বিশেষ ভঙ্গিই শুধু এই কবিতাটাকে দিয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ। না-রঙ-দেয়া কাঁচা ছবিটা ঐ ভাষার জোরেই নানা রঙের নিখুত সমাবেশে চোখের সামনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে চায়। আমরা যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, গ্যাসপোস্টের স্বল্পান্ধকারে গুটি চার-পাঁচেক কুলীশ্রেণীর লোক নগ্ন দেহে নোংরা ধূতি জড়িয়ে অর্ধ-উরু উলঙ্গ করে তামসা খেলছিল। ছিন্ন মলিন তাস সজোরে ভেঁজে কুঁজো হয়ে যেই একাগ্র মনে খেলতে যাবে, ঠিক তেমনি সময় একটু দূরে দেখা দিল একটি নিঃসঙ্গ সুন্দরী তন্বী। সেই নিস্তব্ধ মুহূর্তে সৌন্দর্য দর্শনে যে বিচিত্র অনুভূতি এই মজুর শ্রেণীর লোকদের মনেও মোচড় দিয়ে উঠেছিল, সেই বিক্ষুব্ধ শব্দতরঙ্গে তা মুখর হয়ে উঠল একজনের কথার ভেতর দিয়ে, অন্য সবার মুখ আবেগ নিস্তরঙ্গ আঁধারে যেন মূর্ত হয়ে উঠল প্রতিটি অক্ষরে। মেহদে আলী খাঁ শুধু আমার কবি নন, আপনার কবি নন, মেহদে আলী খাঁ রুদ্র ন্যায়ের জ্যোতি, কুৎসিত বাস্তবের নগ্নরূপ, প্রগতিশীল যুগের গতি।

তিন

কয়েক বছর থেকে কেন জানি তিনি আর কিছু লিখছেন না। দিল্লি রেডিও স্টেশনে থাকেন। মাঝে মাঝে জ্ঞানপূর্ণ প্রবন্ধে উর্দু সাহিত্যের সমালোচনামূলক আলোচনা করেন।

নয়া দিল্লির 'কফি হাউসে'র হল ঘরটার উত্তর কোণে বড় মতো একটা গোল টেবিল আছে। ওপরটা সবুজ কাঁচের। রোজ বিকেলে ছ-টা থেকে রাত ন-টা অবধি জোর একটা আসর বসে ওটা ঘিরে। যে কোনোদিন ঐ সাতটার মধ্যে এখানে গিয়ে উঠলে দেখবেন হয়ত ওরই একটা চেয়ারে বসে বেশ স্বাস্থ্যবান নাতিদীর্ঘ গোলগাল চেহারার গৌরবর্ণের এক ভদ্রলোক বসে। টেবিলের অন্য লোকদের সাথে মাঝে মাঝে কথা বলছেন বিনম্র আড়ষ্ট স্বরে। উনিই রাজা মেহদে আলী খাঁ। ওর পাশেই হয়ত রয়েছেন কবি আখতার-উল-ইমান, ওধারে কফি খাচ্ছেন যার গদ্যকবিতা অতুলনীয় সেই রাশেদ, আর ছন্দ-শব্দ-বিন্যাসের যাদুকর উদীয়মান কবি মোখতার সিদ্দিকী, বিদ্রোহী কবি মঈউন্ হাসান জয়্বি!

এঁরা প্রায় সবাই তরুণ। দ্রুত প্রগতিশীল আধুনিক উর্দু সাহিত্যকে এঁরাই দেবেন অনাগত দিনের উজ্জ্বল রশ্মি। মাঝে মাঝে সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক কৃষণচন্দ্র, শাহাদাৎ হোসেন মিন্টো, বেদী, আশক মেফতীহ্—উদীয়মান কথাশিল্পী মধুসূদন, হাশ্‌মি—এঁরাও আসেন।

রোজ এঁরা এই কফিহাউসে আসেন। একজোট হয়ে বলাবলি কবেন, চব্বিশ ঘণ্টার সাহিত্য জগতে কতটুকু এল, কতখানি গেল। অন্তরীক্ষে নক্‌সার পর নক্‌সা সৃষ্টি হয় উর্দু সাহিত্যেব ভবিষ্যৎ অগ্রগতির কল্পনা নিয়ে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজি সাহিত্যে Coffee House-কে উপলক্ষ কবে যে অগাস্টান যুগ গড়ে উঠেছিল, এও বোধ হয় তারই আভাস। আধুনিক উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসলে—মাত্র পাঁচ বছর—তার চেয়ে বেশি আগে থেকে নিশ্চয়ই শুরু করা চলে না, তবু কী ঐশ্বর্যময় এর শুরু!

কাজের ফাঁকে অবসর পেলে 'মীরাজী'ও এই 'কফি হাউসে' আসেন। ঢিলে একটা পাঞ্জাবি গায়ে আস্তে আস্তে ঢোকেন। অসুস্থ দেহ আর পুরোনো বয়সটাকে একবার মনে মনে বোধ হয় ঠেলে দেন কোঁকড়া বাবড়ী চুলগুলোর সাথে, তারপর অযত্নে রক্ষিত দাড়িভরা মুখটায় একবার হাত বুলিয়ে মদিরাগ্রস্ত চোখগুলোকে সজাগ করে বসে পড়েন ঐ তরুণদের দলে। দু'একটা মাত্র কথা বলেন, তীক্ষ্ণ চোখে এদিক ওদিক কী দেখেন, মনে হয় যেন কিছু খুঁজছেন—কী যেন বলছেন, হয়তো আগামী দিনের কোনো নতুন আর বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি উন্মুখ হয়ে ওঠেন।

"যেখানে মানুষের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগিয়াছে, সেখানে মানুষ বিষয়বস্তুকে গভীর নিকটে না আনিয়াও তাহাকে ভোগ করিতে পারে। ফুলের সৌন্দর্য ভোগ করিবার জন্য ফুলকে গাছ হইতে ছিঁড়িয়া আনিবার কোনো প্রয়োজন কবি অনুভব করে না।"

—ক্লাইভ বেল

সতেরো শতাব্দীর 'হেয়কেয়ি' কবিতা

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ কল্পনারশ্মি জাপানি কবিতার ওপর তখনও পূর্ণ-আভা বিস্তার করে। কবিয়া 'টাঙ্কা' কবিতায় প্রভাব থেকে নিজেদের তখনও সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে উঠতে পারেন নি। ওদিকে যান্ত্রিক-সভ্যতার ভবিষ্যৎ ঝঙ্কার শুরু হয়ে গেছে। চিত্রশিল্প বাহুল্যবর্জিত অলঙ্কারহীন চিত্রকেই রুচির সর্বোচ্চ আদর্শ বলে সমালোচকেরা মেনে নিতে আরম্ভ করেছে। সময়সাপেক্ষ, সংক্ষিপ্ত ভাব প্রকাশই মানুষের সৌন্দর্য-জ্ঞানকে বেশি আকর্ষণ করতে লাগল। একত্রিশ সিলেবেলে লেখা 'টাঙ্কা' কবিতাকে আরো ছোট আকার দেবার জন্যে দু'একজন মতামতও প্রকাশ করলেন। কিন্তু অনুভূতির সামঞ্জস্য রেখে অভিব্যক্তির সংক্ষিপ্ত পূর্ণ-অঙ্গ দেবার তাগিদে তেমন কেউ সাড়া দিল না এবং সেই চললো সতেরো শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

সত্যি বলতে ষোড়শ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি থেকেই ষোল সিলেবেল-এর প্রথম সুন্দর কবিতা রচনা আরম্ভ হয়। ভাব প্রকাশের এই নতুন নামই 'হেয়কেয়ি' কবিতা। একটা সম্পূর্ণ কবিতা বলছি :

মন বর্ষার মাঝেও জেগে ওঠে,
মধ্য রাত্রির ঐ চাঁদ!
কিন্তু ছাতাটা আগে খুলে নাও।

—ইয়ামাথসিসোকাঁ [১৪৪৫-১৫৩৪]

কবির বক্তব্য এই যে, চাঁদটা বৃষ্টি মধ্যেও উঠতে পারে কিন্তু ওর রূপে বিভোর হয়ে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে সৌন্দর্য পান করলেই চলবে না, কারণ সেটা অস্বাস্থ্যকর। তাই মনে করে ছাতাটাও খুলতে হবে। সন্দেহ নেই যে কল্পনার রেখা দুটো হাস্যকরভাবে বিপরীতমুখো। কিন্তু সাথে সাথে এও অস্বীকার করা চলে না যে, সূক্ষ্ম বুদ্ধি-সম্পন্ন রুচির সঙ্গে বাস্তবতার সমন্বয় আশ্চর্যভাবে প্রাণ পেয়েছে।

খেয়ালি কল্পনার এমনিতর সুরের রেশ আরাকিভা মরিটেকের হেয়কেয়িতেও অনুরণিত হয়ে উঠেছে :

আমি ভাবলাম বুঝি ঝরাফুল সে,
ফিরে যায় সে তাদেরি শাখে ;
চেয়ে দেখি—সে যে প্রজাপতি

[১৪৭২-১৫৪৯]

কল্পনায় কোমল, প্রাণে স্পন্দিত। এর হাস্যরস ফরাসি চিত্রকলা। পৌরাণিক ব্যঙ্গচিত্রের মতো নয়,—এ যেন সারদাবাবুর সূক্ষ্ম সীমারেখার অন্তরালে অবনী ঠাকুরের অদ্ভুত কল্পনার বিচিত্র সংমিশ্রণ। এর বিষাদের রূপ পাড়হীন শুভ্র শাড়ি পরা অলঙ্কারশূন্য নিষ্কলঙ্ক বিধবাব প্রতিমূর্তি।

মাটসুনাগা টেইটোকু চাঁদ দেখে বলেছেন :

সবার তরেই
এ শুধু দিবানিদ্রার বীজ
শরতের এই চাঁদ।

[১৫৬২-১৬৪৫]

এখানে অবশ্য কবির রূপমুগ্ধ শিশুমন পৃথিবীর সকল মানুষকেই নিজের অনুপাতে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। তার মতে শরৎ-এর ঐ চাঁদটা দেখতে দেখতে আমরা এত তন্ময় হয়ে থাকব যে, রাতের সাধারণ ঘুমকেও হয়ত ভুলে যাব। ফলে আমাদের সবাইকে ঘুমুতে হবে পরের দিন দিনের বেলায়। আর তাই কবি দোষ দিচ্ছেন চাঁদকে দিবানিদ্রার বীজ বলে। মত প্রকাশের এই স্বপ্নিল ভঙ্গি সত্যিই অপূর্ব। এ যেন প্রিয়তমার মিষ্টি বাঁকা রোষ প্রিয়তমের বিরুদ্ধে। বিলাসী মনের পরিচয় দিলেও কবিতার কথা বাস্তবতার সম্পর্ক হতে আলাদা হয়নি।

এমনিভাবে শ্লথ গতিতে 'হেয়কেয়ি' কবিতার চর্চা কখনো জ্বলে ওঠে, কখনো নিভুনিভু হয়ে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে চলে আসছিল প্রায় সম্পূর্ণ দেড় শতাব্দী অবধি। পাঠকেরা কিন্তু তখনও হেয়-কবিতার প্রশংসা করতে মোটেও রাজি নয়। এমন কি কাগজে একরকম খববও ব্যঙ্গ-সুরে বেরুতে লাগল যে, কোনো অখ্যাতনামা কবি মাতাল হয়ে রাত্রিবেলা রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে এক রাতের মধ্যে দু'হাজার হেয়কেয়ি নাকি রচনা করে ফেলেছেন! সতেরো শতাব্দীর মাঝামাঝিতে এই ধরনের কবিতার ভিত্তি খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। সমালোচক থেকে পাঠক পর্যন্ত সবাই তখন আস্থা হারিয়ে ফেলেছে হেয়কেয়ি কবিতার ভবিষ্যতের ওপর। এমনি সময়ে জন্ম নিলেন মাট্সুরা ব্যাৎশা। এই একেলা ব্যাৎশার দানেই সমস্ত হেয়কেয়ি-কবিতা আজ ধনী। সমস্ত জাপানি কবিতা-সাহিত্য ব্যাৎশার সম্ভাবে নতুন পূর্ণত্ব লাভ কবল। সমালোচকদের স্বীকার করতে হলো হেয়কেয়ির মহত্ত্ব।

ব্যাৎশার জীবনের ঘটনাগুলো অদ্ভুত। তিনি একবাব তার শিষ্যদের নিয়ে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিলেন। সাহিত্য-সমাজে তখন তিনি নামজাদা কবি। তাঁর অভ্যেস ছিল পথ চলতে চলতে হঠাৎ যদি কল্পনার কোনো টুকরো উচ্ছ্বাস মনকে আপ্লুত করে তুলে, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেটা সেখানেই পাথরে খুদে লিখে রাখতেন, যাতে কবিতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রকৃতির নগ্নতাকে অঙ্গে ধরে গড়ে তুলতে পারে একটা পূর্ণতর ছবি। এমনি এক যাত্রাকালে এক পূর্ণিমা রাতে ব্যাৎশা এসে এক নতুন গ্রামে উঠলেন। গ্রামে উঠতেই তিনি দেখেন খোলা মাঠে প্রায় সমস্ত গাঁয়ের লোক জড় হয়ে এক জায়গায় বসে জ্যোৎস্নার আলোতে খুশি হয়ে চাঁদের স্তুতি গান করছে। প্রত্যেকেই অন্তত একটা করে হেয়কেয়ি রচনা করে চলেছে। ব্যাৎশার খুব ভাল লাগল। সবার অলক্ষ্যে তিনিও বসে বসে ওদের কবিতা শুনতে লাগলেন। হঠাৎ অনেকের নজর গিয়ে পড়ল ব্যাৎশার ওপর। তারপর বাই বলল যে, এই অচেনা নতুন লোকটাকেও হেয়কেয়ি রচনা করতে হবে। ব্যাৎশা প্রথমে আপত্তি জানালেন। কিন্তু ওরা নাছোড়বান্দা। বললো চেনা, অচেনা, কবি, অকবি যে কেউ হও না কেন—এখানে যখন তুমি উপস্থিত আছ, তখন তোমাকেও কিছু-না-কিছু রচনা করতে হবে। নিরুপায় হয়ে ব্যাৎশা শেষে আরম্ভ করলেন :

সে ছিল নতুন চাঁদ—

এতটা বলতেই সবাই হেসে উঠল। বলতে লাগল, লোকটা বলে কি, পাগল নাকি? আরে এটা হলো পূর্ণিমার চাঁদ আর ও বলছে কিনা নতুন চাঁদ! সবাই চুপ করলে ব্যাৎশা বলতে লাগলেন :

সে ছিল নতুন চাঁদ,
সেই থেকে আমি পথ চেয়ে;
তুমি চোখ তোল আজ রাতে।
(আমার পুরস্কার পেয়েছি আমি।)

সবাই শুনতে লাগল একটার পর একটা হেয়কেয়ি, ব্যাৎশার মুখ থেকে—জাপানি সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ। শেষ হলে পরে সবাই ধরল যে তিনি নিশ্চয় কোনো সাধারণ লোক নন। তাঁকে তাঁর পরিচয় দিতে হবে। নাম শুনে সবাই চমকে উঠল। ব্যাৎশা! তাদের গ্রামে! বিরাট সম্বর্ধনা করে সবাই মিলে তাঁকে আদর আপ্যায়ন জানাল।

ব্যাৎশার প্রভাবে আমেরিকান-কবি Fzra Pound-এর উপর যথেষ্ট পাওয়া যায়। তবে পাউন্ডের কবিতায় কখনো যৌন সংক্রান্ত, কখনো মনস্তত্ত্বের গাঢ় প্রশ্ন এসে গড়ে তুলেছে ব্যাৎশা হতে ভিন্ন আরেকটা জিনিস, কোমলতার চেয়ে আড়ষ্টতা এসে ভীড় করেছে বেশি। উর্দু-কবি মেহদে আলী খাঁও চেষ্টা করেছেন কিন্তু আধুনিকতার প্রকোপে পড়ে রূপপূজা ছেড়ে সেটা ঝুঁকে পড়েছে satire-এর প্রতি। মাঝে কবিতার আঙ্গিক রূপ প্রায় পূর্ণ হলেও ভাবের দিক থেকে সেটা হেয়কেয়ির আসল রূপ প্রকাশ করে নি।

ব্যাৎশার কবিতা 'more to sketches' শব্দের চেয়ে শব্দের পরিবর্তী কালের আবেষ্টনী দিয়ে তৈরি ছবি তৃপ্তি দেয় আরো। শুনবার সময় কানেতে যতটা মধুর মনে হয়, তার চেয়ে বড় উৎসব জাগে মনের পর্দায়।

কবি নো-শহরের মাঝখান দিয়ে চলছিলেন। সে সময় ছিল বসন্ত। চেরি ফুলের থোকায় সমস্ত শহরটা ঢাকা। ফুলের রূপ কবিকে তুলেছে পাগল করে। এমনি সময় দূরে মন্দির থেকে ঘণ্টা বেজে উঠল। কবি গেয়ে উঠলেন :

'এক মেঘ থোকা ফুল।
কোথায় বাজল ঘণ্টা
—যুনো না আসাকুসায়?

ঘণ্টা শুনে কবি চমকে উঠলেন, কিন্তু ফুলের জন্যে বুঝতে পারলেন না, দেখতে পারলেন না যে, ঘণ্টা বিখ্যাত কোন মন্দির দুটোর একটা হতে বেজে উঠল।

আচমক পড়লে খাপছাড়া মনে হবে। কিন্তু মিলিয়ে দেখলে লোভ হয়। মনে হয় প্রকৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ থেকে এক টুকরো দৃশ্য যেন চুরি করে রেখে দিয়েছে অনন্তকালের জন্যে।

কুঞ্জ থেকে ভেসে এল কুহু রব,
চোখ তুলে দেখি—কোথায় দুঃখ!
এ যে শুধু পূর্ণ শশী!

ক্লান্তিহীন বিষাদের সরীসৃপ গতি ফুটে উঠেছে প্রতিটা ছোট শব্দে। মন্দগামী দুঃখ যেন রয়ে রয়ে ঝরছে।

ব্যাংশার কবিমন কখনও ঝলমলিয়ে উঠেছে—পৃথিবী ডাকছে—ফেনায়িত খুশীর উপচে ওঠা উত্তেজনায়—

এইই কোকিল—

কান পেতে শোনো—

যত দেবতাই তুমি হও না কেন !

ব্যাংশার পরবর্তী হেয়কেয়ি-কবিদের মধ্যে মহিলা-কবি 'শিও' ছাড়া আর কারুর নামই তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। শিওর কবিতার ভঙ্গিটা অভিনব। আর কবির নারীজাতিগত কোমলতাবশত স্বভাবতই তাঁর কবিতায় এসেছে এক উষ্ণ মাদকতা। জাপানি-কবিদের মধ্যে হেয়কেয়ির চর্চা এখন আর নেই বললেই চলে। তবে ব্যাংশার অমর দান চিরদিন জাপানি কবিতাকে মহিমান্বিত করে রাখবে। আজও ব্যাংশার প্রভাব থেকে জাপানি-কবিরা সম্পূর্ণ মুক্ত নয়।

কামাল চৌধুরীর কবিতা

সস্তা-সস্তা-সস্তা!

অচেতন মনের ওপর ইতস্তত ছড়ানো বিক্ষিপ্ত কতকগুলো ঘটনা-টুকরোকে পাঁচফোড়ন-দেওয়া নিরামিষ তরকারির মতো অপটু হস্তে জোর করে ধরে দুর্বোধ্য শব্দের মার প্যাঁচে সাজিয়ে দেওয়াটাই যদি আধুনিক কবিতার মূলমন্ত্র মনে করেন, তাহলে আমি বলব : কামাল চৌধুরী ভুল বুঝেছেন। আমারই একজন খালাম্মা একদিন বলেছিলেন, "দেখ্‌ যদি সুন্দর কোনো জিনিসের রূপ প্রাণভরে উপলব্ধি করতে চাস—বিশেষ করে যে জিনিসের প্রশংসা তুই অনেক দিন ধরে শুনে আসছিস—তাকে তুই দেখবি চোখ বন্ধ করে। তাতেই পূর্ণ তৃপ্তি পাবি।" কামাল চৌধুরীর কবিতা পড়ে কেন অকারণেই যেন আমার সে কথাটা মনে পড়ল। মনে হল, পুরুষ না হয়ে যদি সেই [কবির ?] নিকটগত কোনো আত্মীয়া হতাম, আর কবিতা পড়ার সময়ে অর্থ বা ভাবের দুয়োরে অর্গল দিয়ে শুধু যদি পড়েই যেতাম, তবে বোধ হয় কিছুটা তৃপ্তি পেলেও পেতে পারতাম।

ওঁব প্রায় সবগুলো কবিতাব মধ্যেই যে জিনিসটা সবচেয়ে সুন্দর তা হচ্ছে শব্দ বা বহু শব্দের সংমিশ্রণ করে কোনো অভিব্যক্তির প্রকাশ। এটুক যদি বাদ দেওয়া যায় তাহলে বোধ হয় কবিতার ভাব বা দৃষ্টিভঙ্গির কোনো মৌলিকতায় সৌন্দর্যহীনতা ছাড়া আর কিছুরই উপস্থিতি নেই। তবে দুঃখ এই যে, প্রায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেগুলোও আবার সম্পূর্ণ নিজস্ব জিনিস নয়—কখনো জেনে শুনে বিদেশী কবির লেখা থেকে অনুবাদ কিম্বা বেশির ভাগ সময়ে দেশী কোনো দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহিত্যিক অসাধু লেখকের প্রভাবের ফল। প্রথম দোষটা ঠিক অতটা মারাত্মক নয়, যতটা ঐ দ্বিতীয় দোষটা এসে সস্তা করে দেয় সমস্ত কবিতাটাকে।

ঐ কবিতাটাকে প্রথম লাইন থেকে নেওয়া যাক। আরম্ভে আছে—

> শীতের কাঁচুলী শেষে পড়িয়াছে খসি :
> উটের পায়ের ধ্বনি
> বিদ বিক্ষত

মাঝের লাইনে হঠাৎ উটের উল্লেখ করে শীতের কোনো বাস্তব রূপকে তিনি পাঠকের সামনে উলঙ্গ করতে চাইছেন তা আমি চোখ খুলেও বুঝতে অক্ষম। দুবার আম্‌তা করে, তিনবার হাত কচলে, আমার মনে হয়, যেন এরপর Hcl কিম্বা ফানগাস্‌ অথবা দ্রাঘিমা রেখার উল্লেখ করলেও চলত। আর কিছু না হোক কবির নির্জ্ঞান মনের অন্তত একটা প্রকৃত ছাপ তো পাওয়া যেত। শীতের সাথে কাঁচুলী শব্দের প্রয়োগ লাইনটাকে মন্দ-নয় করে তুলেছিল। কিন্তু সাথে সাথে আরেকটা কথা কবি আমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেটা হচ্ছে এই যে, কিছুদিন আগে প্রেমেন মিত্র বোধ হয় 'বেদেনী' বলে কবিতায় কাঁচুলী শব্দ একটা আধুনিক রুচিসঙ্গত স্থানে ব্যবহার করাতে কবিতাটাকে নিয়ে 'শনিবারের চিঠি'তে বেশ আলোচনা চলেছিল এবং তারপরেই সখের প্রায় অনেকগুলো ব্যক্তিত্বহীন কবিই শব্দটাকে বিনি পয়সার

বাতাসার মতো স্থান-অস্থানে বসিয়ে এসেছেন যেমন করে সর্পিল আর ধূসর শব্দের বংশোদ্ধার করা হয়েছে। যাক সে কথা—এখানে কাঁচুলী শব্দের ব্যবহার সুন্দর হয়েছে।

এরপর আছে :

ফাল্গুনের মদির রাত্রে বর্ণে সমারোহ
অনাগত দিবসের নূপুর-নিক্কন

বিশুদ্ধ দুটো লাইন—আধুনিকতার গন্ধ-বিবর্জিত পরিষ্কার মনের কিছুটা অংশ। কিন্তু তার প্রকাশের কৌশল মরচে ধরা—হ্যাকনিড। বাঙালি কবির স্বভাবগত নাকে-কান্না কোমলতার কিছুটা ছন্দহীন ক্ষীণ চিৎকার। আচমকা হঠাৎ তারপর কবি অস্পষ্ট মনের ধূসর অবস্থা থেকে ছিটকে পড়ে উল্লেখ করে বসলেন রেশমী শাড়ির প্রান্তঘটিত একটা কিছু। অর্থাৎ আমাদের হয়ত এখানেও বুঝতেও হবে কোনো নারী বা দেবীর আগমনকে এবং যেহেতু স্ত্রীলিঙ্গের আবির্ভাব করালেন তাই কোলাহল টেনে আনা নিতান্ত আবশ্যক। লিখলেন :

মুহূর্তের কোলাহলে মরুভূ মুখর
মেয়ে আর মদিরার স্বপ্নভরা ঠোঁটে :

নিজের মনটাকে বোধ হয় মরুভূ বলা হয়েছে। তাহলে প্রথম দিকের উটের উল্লেখটায় কিছু একটা সংগতি এখন হল বোধ হয়। কিন্তু দ্বিতীয় লাইন কার সঙ্গে যাচ্ছে কবির ? হতেও পারে। কিংবা পথ চলতে চলতে এ কবিতারই অন্য কোথাও আর কাবো সাথে সম্পর্ক খুঁজে পেলেও পেতে পারি।

অজগর দৃষ্টিতে কাঁপে হরিণী-নয়ন আপনারা সবাই হাত তুলুন। কবির আত্মার উন্নতির জন্যে একবার প্রার্থনা করে নিই। দেখবেন ভুল করেও যেন এর মধ্যে লৈঙ্গিক তুলনা করে অর্থ টেনে বের করবেন না। শুধু শুধু মনটাকে নোংরা করা স্বাস্থ্য-আইন বিরুদ্ধ।

এরপর থেকে কবি দিব্যদৃষ্টি লাভ করেছেন। আমরা নির্বুদ্ধিমান কি আর বুঝব সম্বুদ্ধের অন্তর্জ্ঞানদৃষ্টি : বোধ হয় আকাশের দিকে মুখ তুলে চোখ বন্ধ করেই তিনি দেখলেন—

আকাশের ওষ্ঠ চুম্বি কারার্ভা চলিছে! আমি এখানে জোর করে অকবির মতো বলছি না যে, এ ছত্রের সঙ্গে কবিতার এ পর্যন্ত লেখার সাথে নিশ্চয় একটা সম্বন্ধ থাকবে। তবে এতটুকু শুধু বলছি যে, কারার্ভা শব্দটা হয়তো বা কবি নতুন শুনেছেন। তাঁর অচেতন মনের ওপর শব্দটা চন্‌মন্ করছিল ঠিক শোনার পর থেকেই। আর তাও শব্দটা হস্তান্তরিত হয়ে এখানে তৃতীয় হস্ত। এই উগ্র আধুনিক হওয়ার ফেনাময় ইচ্ছেটাই কবিকে উঠতে দিচ্ছে না দ্বিতীয় শ্রেণীর ওপরে। এই যে যখন-তখন যার-তার প্রভাবে উথলে ওঠা সেটাই তো মাঝে মাঝে কবিকে করে দিচ্ছে তৃতীয় শ্রেণীর। ব্যক্তিত্বকে তীক্ষ্ণ করে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কামাল চৌধুরী যেখানে আধুনিক নতুন কোনো ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশ করেছেন সেগুলো প্রশংসার যোগ্য। তবে তার সংখ্যা অল্প। তাই যা দুঃখ।

শব্দ-গন্ধে পাহাড়ের বুকে
ময়ূর পাখায় ঝরে রামধনু কাশ—

ধরিতে পারে না তবু
মদনভস্মের বহ্নি শিশুদের চোখে।

শুধু এই লাইন কটাই সমস্ত কবিতার মধ্যে চলনসই বলে উতরে যায়। বারবার পড়লে উষ্ণ পয়োধর নিম্নে শিশুর ছোট হাতের আকাঙ্ক্ষা তারই পাশে কবির নিজ শিশুমনের পূর্ণ কামনার প্রকাশ সুন্দর সমন্বয় রেখে চলেছে। কিন্তু এর পরের ছত্র ক-টাই একেবারে বক্ষ চিরে সমস্ত সৌন্দর্যে রূপ দিতে পেরেছে। রেজিস্ট্রার মার্কা ছাপ-দেওয়া কামাল চৌধুরী সবগুলো কবিতার কমন ফ্যাক্টর :

প্রাচীনা পৃথিবীর ঘোরে
কুমোরের চাকার মতো ঘোরে আর ঘোরে

পৃথিবীর সেই বারবার করে বলা বিশেষণ। 'হাসে আর হাসে', 'আসবে, আসবে, আসবে'—এমনিধারা দুবার তিনবার করে একই শব্দ লিখলেই কবিতার কোমলতা যে বাড়ে, এই ভুল পুরাতন ধারণাটা এসে সমস্ত কবিতার আধুনিক রুচির ভঙ্গিকে ধ্বংস করে মনের মাঝে তেতো ধরিয়ে গেল। পৃথিবীর এমন গুণ আর কাজের পরিচয় কামাল চৌধুরীর কবিতার আরেকটি সাংকেতিক চিহ্ন। বিজ্ঞাপনের মতো হাঁ করে আছে ওঁর অনেকগুলো কবিতার মধ্যে।

উটের মুখের ফেনায় মৃত্যুর ছায়া কাঁপে
ফিন্‌কক্ষের হাসির মতো—
জন্ম-মৃত্যু; স্বর্ণ-প্রেম ; এক-বহু আর

এ তিনটে লাইনে শুধু শব্দের বিকট সংযুক্তি ছাড়া অর্থযুক্ত কোনো ভাব ছেঁকে বের করা সম্ভবপব নয়। আর সে চেষ্টাই নিষ্ফল আক্রোশে উলঙ্গ করে তুলেছে প্রথম লাইনে কিছুটা কদর্য অর্থ। দ্বিতীয় লাইনে হুবহু নকল অন্য কারো লেখা থেকে। তৃতীয় লাইন পুরাতন মৃত যুগের বাজারে ফ্যাশনে গড়া—বিকৃত করে তুলেছে কবিতার এ-যুগের আবহাওয়াকে।

এবপর যে চার-পাঁচটা লাইন লেখা হয়েছে তা কুৎসিত। 'পৃথিবীর তপ্ত লৌহ' আর 'মখমল স্রোতে'র তুলনামূলক ব্যবহারে কবির ক্লেদাক্ত অনুভূতির কিছুটা বিষাক্ত অংশ শব্দ আর প্রতিধ্বনির অন্তরালে লুকোনো। সেই অকথ্য বিবমিষা ভাবটাকে জড়িয়ে দুর্বোধ্য করা হয়েছে খামোখা টেনে-আনা কতকগুলো স্থান অনুপযোগী অর্থহীন শব্দ বসিয়ে। এঁরই আরেকটা যৌন সংক্রান্ত কবিতায় ছিল 'সাগরের বুকে চিড় দিয়ে' এমনি একটা কিছু। ভাবটা বাদ দিয়ে সাগর আর চিড় শব্দ দুটো মনের পেছনে রাখুন।

কারাভাঁর পদধ্বনি চাঁদের পাহাড়ে :
বালুকা পাহাড় হয় গুঁড়ো
উটেরা হোঁচট খায় কভু।
কারাভার শ্বেত অস্থি চিড় ধরে ওঠে।

মেনে নিলুম যে উটটাকে হোঁচট খাইয়ে তিনি কিছুটা আধুনিকতার মশলা যুগিয়েছেন। কিন্তু বাকিটা? অর্থহীন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। দুর্বোধ্য। পুরোনো সুর বারে বারে। কল্পনায় একটুখানি নতুনত্ব থাকা উচিত, তা না হলে শুধু কয়েক হাজার কবিতা লিখলেই বড় কবি হওয়া যায় না। এর পরের লাইন কটাতেও 'অরণ্য' শব্দের ব্যবহার, 'ফাল্গুন রাত্রি' ইত্যাদিতে কামাল চৌধুরীর কবিতা কী সুন্দর রূপ জাগিয়ে তোলে তা অন্তত এর আগের আরো গোটা পঞ্চাশেক কবিতার মাঝে প্রমাণ পেয়েছি। এতটা বেহায়াপনার প্রয়োজন ছিল না।

শেষ স্ট্যাঞ্জাতেই অমিল দেওয়া কবিতা লেখার টেকনিকে তিনি যে বিরাট ছিদ্রের পরিচয় দিলেন তা সত্যিই হাস্যকর। এখানে একটা অবান্তর কথা বলার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। আজিজ ওমর বলে আমার এক বন্ধু আছে। ও তবলা বাজাতে জানে না, তবু তবলা দেখলেই ও খুশি হয়ে ওঠে, আঙুল ঠুকে বাজাতে আরম্ভ করে। যদি জিজ্ঞেস করি যে কী তাল বাজাচ্ছিস রে? উত্তর দেয় গম্ভীর হয়ে, 'মিশ্র সুর; দেখ এই এখন বাজাচ্ছি খাম্বাজ, এখন দাদরা ইত্যাদি।'

এই কবিতাটার ছন্দগতিও ঠিক তেমনি। কোন সময়ে রোমান্টিক হতে গিয়ে গালফোলা শব্দ প্রয়োগে মদিরাভাব [মদিরভাব?] সঞ্চার করবার চেষ্টা করেছেন, আবার কখনো বা হঠাৎ আধুনিক হবার উদ্ভট খেয়ালে উটটাকে দিলেন হোঁচট খাইয়ে। আর তাছাড়া আগাগোড়া একটা ছেঁড়া ভাবের খাপচাড়া আবেষ্টনীতে কবি নিজের কথাগুলোকে তুলনা দিয়ে জড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। নিজেকে দুর্বোধ্য বলে প্রচার করার কী আস্ফালন!

শেষ মুহূর্তে পেঁয়াজের গন্ধের মতো উগ্র সস্তা মনোভাব এসে আপ্লুত করে ফেলেন কবিকে। 'হে' বলে সম্বোধন করে একটা কিছু বিশালতার আভাস দেবার চেষ্টা করেছেন। তাতেও সেই- একই ধরনের একই অর্থে ব্যবহৃত শব্দের সুরহীন প্রলাপ—পেতলে বাঁধানো বেতের ছড়ির মতো সব কবিতায় শেষের এমনি ধারা একটা কিছু কয়েক লাইনের সৃষ্টি কামাল চৌধুরীর কবিতায় আমরা আগেও আরো এত দেখেছি। তবে তার এমন সস্তা উচ্ছ্বাস এখানেই চরমভাবে প্রাণলাভ করেছে।

হে সমুদ্র রাজকন্যা
আনো বন্যা
নীল রক্তস্রোতে
চোখে আনো মৃত্যুর উল্লাস
আকাশের ওষ্ঠ চুম্বি চলিছে কারাভাঁ
জীবনের কোথা অবকাশ?

আন্ডার লাইন করা শব্দগুলো ওঁর কবিতার আরো কতকগুলো বাঁধাধরা গৎ। আর এগুলোই করে তুলেছে ওঁর কবিতাকে—cheap!

নাট্যসাহিত্য

কোনো রকম ভূমিকা না করে সরাসরি বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করা যাক। বিশেষ করে আমার বক্তব্যের সাদামাটা ও মোটা কথাটা কারো কাছেই যখন আর আজ অস্পষ্ট নয়, তখন গোড়াতেই হরেক রকম কঠিন ও জটিল তত্ত্বের অবতারণা করা নিতান্তই অর্থহীন হবে। যে বর্তমান অবস্থার সঙ্গে নাট্যামোদী ব্যক্তি মাত্রেই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত প্রথমে সেই পরিস্থিতির একটা পর্যালোচনা করা যাক। অবস্থার কথা বলতে গেলে সমস্যার কথাও এসে পড়বে। এবং একবার অবস্থা ও সমস্যার স্বরূপ সম্বন্ধে যদি আমাদের সকলের চেতনা সতেজ এবং সজাগ হয়ে ওঠে তা হলে তার শুভ প্রভাব সৃষ্টির বৃহত্তর ক্ষেত্রেও চিহ্ন রেখে যাবে।

১৯৫১ সাল থেকে আমাদের এখানে নাটকের জন্য প্রকৃত হৈচৈ শুরু হয়েছে। সেই হৈচৈ মাঝে মাঝে মন্দীভূত হয়ে এলেও কখনো একেবারে থেমে যায় নি। একটানা চলে এসেছে, ছড়িয়ে পড়েছে। রাজধানী শহরের উন্মাদনা স্পর্শ করেছে গোটা পূর্ববাংলাকে। এ-শহর ও-শহরকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে ন্যাটানুষ্ঠানের সংখ্যাধিক্য, মঞ্চে সজ্জার জাঁকজমকে। এককালের হিন্দুপ্রধান এই সমস্ত শহরে পূজা পার্বণ উৎসবের মৌসুম নাটকে সেরকম সরগরম থাকত, আজকে আবার তারই নতুন জোয়ার সকল রকম প্রতিকূলতার কালো যবনিকা ভেদ করে কলকল করে এগিয়ে আসছে। যে কোনো উছিলায় নাটক করার জন্য উৎসাহী ছেলে-মেয়ে, ছাত্র-মাস্টার, চাকুরে-বেকার, কেরানি-গৃহস্থে দেশটা একেবারে ভরে গেছে। আগে নাট্যামোদী মঞ্চপ্রিয় অভিনয়াভিলাষী ব্যক্তিবর্গের হয়ত খুব অভাব ছিল না। কিন্তু এখন স্কুলে-কলেজে, অফিসে-পাড়ায় এমন সব গোষ্ঠীর সন্ধান পাই যাদের একমাত্র বিশেষণ হলো নাটক-পাগল। তারও পর নাটক করার পেশা আর সাধারণ নাগরিকের দেখবার পেশা সমানে পাল্লা দিয়ে চালায়—একেবারে সোনায় সোহাগা হয়েছে। যে কোনো উপলক্ষে নাটক করার জন্য আজকাল রীতিমতো হুড়োহুড়ি লেগে যায়।

কিন্তু এই হৈ-হল্লার একটা উল্টো পিঠ আছে। সেখানে নাটক করার জন্য যে পরিমাণ হৈচৈ, নাটক না পাওয়ার জন্য অবিকল সেই পরিমাণ হাহাকার বিরাজমান। নৈরাশ্যজড়িত কণ্ঠে নাট্যরস-পিপাসী সেখানে মঞ্চোৎসাহীকে বলছে—নাটক! নাটক! যেদিকে তাকাই কেবলই নাটক, কিন্তু সে নাটক আমাকে নাড়াতে পারে, পোড়াতে পারে, বাড়াতে পারে—সে নাটক কোথায়! সে নাটক কী! এখনও আসে নি! তার কি আসার সময় হয় নি ? কবে আসবে ? কোন পথে আসবে ?

বাস্তব অবস্থায় একেবারে কেন্দ্রস্থলে এই দ্বন্দ্বটি কী জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে আছে! ভাঙছেও না, হিলছেও না। আমার প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য এই দ্বন্দ্বের মর্ম বিশ্লেষণ করা, এর অস্তিত্ব ও সারবত্তার ইতিহাসগত কারণ অনুসন্ধান করা—সর্বাঙ্গীণভাবে এই দ্বন্দ্বস্থলে মূল্য বিচার করা। আতঙ্কিত হবেন না। দীর্ঘ রচনা দ্বারা আপনাদের বিরত করার মতো অনাটকীয় মনোবৃত্তি আমার নেই। গোটা আলোচনা সংক্ষেপে ও ইশারায় সম্পন্ন করতে প্রাণপণ চেষ্টা করব। সে সাহিত্যের কোনো প্রতিষ্ঠিত সুস্পষ্ট ঐতিহ্য নেই সঙ্কটকালে তার অবস্থা কিঞ্চিৎ

অনিশ্চিত ও করুণ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। কিন্তু যে বাঙলা সাহিত্যের একটা উনবিংশ শতাব্দী ছিল, সে বাঙলা সাহিত্যের কোনো শাখা দ্বিখণ্ডিত ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে, সঙ্কট জর্জর অবস্থায় হতাশ ও দিশাহারা হয়ে পড়বে, এমন কথা নিজে জেনে নিতে রাজি হবো না। আমাদের দেশে যাঁরা নাটক নিয়ে অহোরাত্র মেতে থাকেন, ঘরে-বাইরে তাদের বদনামের অন্ত নেই। নাট্যামোদীরা সে জাতীয় বদনামের বড় বেশি পরোয়া কোনো দিনই করে নি। কিন্তু যে বদনামটা সচরাচর প্রকাশ্যত কেউ ঘাটাঘাটি করতে চায় না, শেষটায় নিজেদের ঘাড়ে এসে পড়ে—নাকি সেই ভয়ে সেই অগৌরবের কথা জোর গলায় প্রচার করার দরকার হয়ে পড়েছে। মঞ্চের সংগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মুখে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে, নাট্যসাহিত্যে আমাদের দারিদ্র্য অপরিসীম। অতীতেও এই শাখায় আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারি নি, বর্তমানেও আমরা সেই বন্ধ্যা ঐতিহ্যের জের টেনে চলেছি মাত্র এবং বাঙালির সাহিত্যে, মানসিকতায় এবং জীবনে সর্বত্রই নাটকীয় উপাদানের বিকট অভাব। এই বাঙলা বিভক্ত হওয়ার অভাব আরও উৎকটরূপ ধারণ করেছে মাত্র। কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি যখন এ জাতীয় উক্তি করেন তখন আমারও সন্দেহ হয় হয়ত তিনি অনেক মৌলিক গবেষণা করে থাকবেন এবং তাঁর বিশিষ্ট চিন্তাধারায় সত্য এই আকারেই ধরা দিয়েছে। আর বাদবাকি যাঁরা এ জাতের ঢালা সাফাই গান তাঁদের বিরুদ্ধে আমার ঘোরতর অভিযোগ করেছে। তাঁরা বাঙলা সাহিত্যের স্বকীয় ঐতিহ্যকে গ্রহণ করতে চান নি, জানতে চান নি, বুঝতে চান নি। অপরিচয়ের আদিগত বছরকে ঢাকা দিয়ে দিয়ে রেখেছে অসার শিশুসুলভ থিওরি দিয়ে।

বাঙলা সাহিত্য বেশ প্রবীণ ও পরিণত। তার আধুনিক সাহিত্যও প্রৌঢ়—দেড় শত বৎসরের সাধনায় পরিপুষ্ট। এই আধুনিক সাহিত্যের সোনালি ফসল ফলেছে উনবিংশ শতাব্দীতে। সেই উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান বাঙলা নাটক। এবং বিস্ময়কর রকম অল্প সময়ের মধ্যে মোটামুটিভাবে পঞ্চাশ বৎসর বাঙলা নাটক তাঁর শৈশব-কৈশোর অতিক্রম করে সরস সবল প্রৌঢ়তা লাভ করেছে। অনুপ্রেরণা এসেছিল বিদেশ থেকে, কিন্তু তার রূপায়ণ ঘটেছে দেশজ জীবন ও কল্পনার আঁচ লেগে। মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশ-অমৃতলাল বাঙালি নাট্যকার, পরিচিত পৃথিবীর দৃশ্যকাব্য রচয়িতা, এ দেশের প্রকৃতি কাব্য-শিল্প ঐতিহ্যের ধারক। আজকের আমাদের মতো সে যুগও ছিল এক বিশেষ অর্থে বিশেষ জাতীয় জাগরণের যুগ। যেহেতু নাটক দৃশ্যকাব্য, সাহিত্যের যাবতীয় রূপের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গভীরভাবে প্রত্যক্ষ জীবনের স্বাভাবিকতম রূপায়ণের উপর নির্ভরশীল। সেহেতু নাটকের সার্থকতা ব্যাপকতম প্রচার ও অনেকের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা (একাধিকের) ভিন্ন প্রকাশ লাভ করে না। সেই হেতু সার্থক নাটক মাত্রেই যুগে যুগে সমাজজীবনের কেন্দ্রস্থ ধারাপ্রবাহ থেকে রস-পুষ্টি আহরণ করে থাকে। নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন বিত্তশালী সমাজসেবীর আহ্বানে বল্লাল সেনীয় কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে নাটক রচনা করেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক বারবার দেখতে আসতেন এবং শেষ দৃশ্যে সন্তানসম্ভবা নিরপরাধ বিধবা রমণী সুলোচনার আত্মহত্যা দেখে কোনবারই অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। মাইকেলের প্রহসনে নবীন বঙ্গ, প্রবীণ বঙ্গ উভয়ের যে নগ্ন দৃশ্য চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার বক্তব্যের ক্ষুরধার শ্লেষ আজও নাটকীয়তায় তীক্ষ্ণ ও প্রচণ্ড। নীলদর্পণের নাট্যকার দীনবন্ধু যে প্রহসনে কি নিপুণ সমাজ সচেতনতা মঞ্চানুভূতি ও নাটকীয় রস সৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন তার পূর্ণ স্থান আজ আমাদের মনের মধ্য থেকে অপসৃত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ইতিহাস নিয়ে নাটক লিখতে গিয়ে দেশাত্মবোধের আগুনে তাকে আগে পুড়ে নিয়েছেন, আর, সে

আগুন যখন নিবল তখন মর্মান্তিক আবেগের টানা-পোড়েনে বিক্ষুব্ধ, স্তব্ধ ক্ষতবিক্ষত চরিত্রগুলো সব চিরন্তন মানুষের রূপান্তরিত হয়ে মঞ্চ থেকে উঠে এসে বুকে এসে বাসা বাঁধে। উপেন্দ্রনাথের ভয়ঙ্কর নাটক দেখে ইংরেজ সরকার এত বিচলিত হয়ে উঠেছিল যে, ১৮৭৭-এ তাকে নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করতে হয়েছিল। এরপরই উনবিংশ শতাব্দীর একবারে শেষ প্রান্তে এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুতে আবির্ভূত হলেন গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল, ডি এল রায় ; ক্ষীরোদ প্রসাদ সুস্থ জীবনবোধ ও বিচিত্র সৃষ্টি প্রয়াসে; পরিণত নাট্যকৌশল ও সার্থক মঞ্চ পরিবেশনায় ; ধাবাল এবং গাঢ় সংলাপে, জটিল ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টিতে উনবংশ শতাব্দীর বাঙলা নাটক আশ্চর্য ঐশ্বর্য সম্পদ সম্পন্ন। এমন ঐতিহ্য কি ব্যর্থ যাবে ? ভাল নাটকের অভাবে আমরা যখন বিজ্ঞের মতো শেষ অভিমত প্রকাশ করে হতাশার দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ি তখন একবার কি আমাদের পুরাতন বিচিত্র নাট্যাবলীর পুনরাভিনয়ের কথা মনে পড়তে পারে না ? মাইকেলে 'বুড়ো শালিকে ঘাড়ে রো', দীনবন্ধুর 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাট্যসমূহ যে তাদের আবেদনের তীব্রতা আজও বিন্দুমাত্র হারায় নি, তা আমি সুযোগ পেলে প্রমাণ করব বলে দৃঢ় সংকল্প করেছি। এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত নেই যে আমরা সর্বাগ্রে আমাদের সমাজ নিয়ে আমাদের পরিচিত দুনিয়ার নাটক চাই। কিন্তু যতদিন বা যখনই তার অভাব ঘটছে তখন অর্থহীন পেশাদার রঙ্গমঞ্চের বিকৃত রুচির দুর্বল নাটক মঞ্চে স্থান দেয়ার কী তাৎপর্য থাকতে পারে ? লাভের মধ্যে এই হতে পারে যে পূর্ববাঙলার সুস্থ জাগ্রত নাট্যপিপাসু নাগরিকের চোখ-কানকে স্থুল উত্তেজনাপূর্ণ রস পরিবেশন করে এমন বিকৃত করে দেব সে কিছুকাল পর Sensational drama ছাড়া অন্য কোনরকম স্থুল ও শুভ আবেদনের তার চিত্ত সাড়া দিতে ভুলে যাবে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি যে প্রত্যেক নাট্যাভিনয়েব জন্য পূর্ববঙ্গে আজ বিপুল দর্শক শ্রেণী আগ্রহে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে ভিড় করে অপেক্ষা করে।

তাঁদের বেশির ভাগের অকৃত্রিম কৌতূহল ও আনন্দ পানের সরল চেতনা প্রায় সব নাটকেই করতালি দিয়ে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সুস্থ আনন্দ পরিবেশনের দায়িত্বও সেই কারণে সমপরিমাণে আমাদের জন্য আজ বেড়ে গেছে। সেই সঙ্গে সর্বসাধারণের শিল্পচেতনাকে উন্নত করে সার্থক নাটক সৃষ্টির পথকে সুগম করে দেয়ার দায়িত্বও আমাদের তৈরি করে নিতে হবে। জীবনরস পুষ্ট, শিল্পকৌশল মণ্ডিত, সমাজের মর্মকোষ থেকে উদ্ভূত নাটকের সঙ্গে নাট্যকার দর্শক ও অভিনেতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ ভিন্ন আমাদের নাট্যজগতের অগ্রগতির ভিন্ন পথ নেই। আমাদের বাঙলা নাটক এই গৌরবময় ঐতিহত্যের খনি—অজ্ঞতা ও অন্ধতার জন্য আমরা যদি তাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে থাকি তবে তার পরিণাম আমাদের জন্য অভিশাপপূর্ণ হতে বাধ্য। আজকাল সাধারণত আমরা যে স্তরের নাটক মঞ্চে পরিবেশন করে থাকি, দুটো জাতে তাকে ভাগ করা চলে। এক, পেশাদার রঙ্গমঞ্চের স্থুল আবেদনের অর্থহীন, অশ্লীল, উদ্ভট নাটক—যার মধ্যে কোনরকম জীবনের কোনরকম সত্যভাষণেরই কোনো চিহ্ন নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে আমাদের সমাজ সম্পর্কিত আমাদের কারো লেখা নাটক। এ পথই ঠিক পথ, এই এরাদাই শুভ। কিন্তু এখনও এর শিশুকাল। প্লটের মধ্যে অনুকরণপ্রিয়তা ও অস্বাভাবিকতা দূর হয়নি। ঘটনার চয়নে ও গঠনপ্রণালীতে যেখানে সুস্থ মৌলিকতার ছাপ রয়েছে সেখানেও যান্ত্রিক জ্যামিতিক সরলতা। নাট্যকাহিনীকে বিচিত্র রহস্যময় জীবনকাহিনীতে রূপান্তরিত হতে দেয় নি। চরিত্রগুলো ঘোরতর রকমভাবে এক মাত্রিক ; গাঢ়তা নেই, গভীরতা নেই, জটিলতা নেই। সার্থক নাটকে কঠিন শৃঙ্খলের মধ্যে

সহজ সাবলীল ঘটনাবলীর অন্তরালে প্রতি স্তরে বিভিন্ন চরিত্রের চেতনায়-সত্তায় ফল্গুধারার মতো যে জীবনবোধ বারবার উথলে ওঠে উপচে পড়ে, ঘূর্ণীত আলোড়িত তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে তার চিহ্ন আমাদের নাটকে এখনও জুটে ওঠে নি। নীলদর্পণের তোরাপ, সধবার একাদশীর নিমে দত্ত, বুড়ো শালিকের ভক্ত প্রসাদ, অমৃতলালের মাস্টার সিং (বিবাহ বিভ্রাট), কিম্বা লোভী পুরোহিত (কৃপণের ধন) যখন কথা বলে তখন সে সংলাপ যে কেবল বারবৈদগ্ধ্যের দিক থেকে চিত্তহারী হয় তা নয়। তার অন্তরালে সংঘাতপূর্ণ মানবমনের যে হৃদ্‌স্পন্দন আমাদের চোখের সামনে দেদীপ্যমান হয়ে ওঠে তার গৌরবেই সে সংলাপ প্রকৃত নাটকীয় গুণ ভূষিত, দৃশ্যকাব্য রস সিঞ্চিত।

উপসংহারে আমার বক্তব্যের সার আরেকবার জানিয়ে নিচ্ছি। শিল্প-সাহিত্যের দ্বন্দ্ব বা সঙ্কট নিরসনের প্রকৃষ্ট পথ সে সাহিত্যের নিজস্ব ঐতিহ্যের মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে। সেই ঐতিহ্যের মূলধারার সঙ্গে পরিবর্তনশীল জীবন ও পরিবেশের শিল্পসম্মত পরিপূর্ণ মিলন ব্যতীত সার্থক সৃষ্টি সহজসাধ্য হয় না। নিজের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার সঙ্গে পরিচয়, তার প্রচার ও উপলব্ধি আজ বাঙলা নাট্যসাহিত্যের পুনর্জাগরণের জন্যও অপরিহার্য। সৌভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের ঐতিহ্য দরিদ্র নয়, দুর্বল নয়, সঙ্কীর্ণ নয়। বাঙলা নাটকের স্বর্ণযুগ ঊনবিংশ শতাব্দী। বিগত যুগের ঐশ্বর্যের এই পুঁজি সম্বল করে অগ্রসর হতে পারা কম সৌভাগ্যের কথা নয়। এরপরও যখন আমরা নাটক নেই বলে আক্ষেপ করি তখন সত্যই নিজের মানসিক দৈন্যের রূপকে প্রকট করে তুলি। রামনারায়ণ, মাইকেল, দীনবন্ধু, মনমোহন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রনাথ, রাজকৃষ্ণের পর গিরীশ ঘোষেব অভ্যুদয়। তিনি একবার আক্ষেপ করে বলেছিলেন, "দায়ে পড়ে out of sheer necessity যখন মাইকেল-বঙ্কিম প্রায় Dramatized করা শেষ হলো, স্টেজে আর কোনো অভিনয়োপযোগী নাটক মিলল না তখন বাধ্য হয়ে নাটক রচনা করতে হলো।" আমরা গিরীশ ঘোষ না হয়ে এবং আরম্ভ না করেই যে অভাবের অভিযোগ আজ তুলছি তা কিঞ্চিৎ কৌতুকাবহ ও করুণ।

আর যাঁরা হতাশ হয়ে বলেন নাটক লিখব কী করে, জীবনে নাটক কোথায়, তাঁদের সঙ্গেও আমি একমত নই। ১৯৫৮ সালে ছাত্রদের ওপর লাঠি চালনা থেকে শুরু করে বাহান্ন সালেব গুলি চালনা পর্যন্ত নাটকীয় উপাদান জীবনের কোথাও কি দানা বেঁধে ওঠে নি ? ৫২/৫৩ সালের কোনো এক হাটে এক বোঝা পাটের দাম মাত্র দু'আনা শুনে যে চাষী এক চুল পাটও বিক্রি না করে সবটাতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে গেল সে কি কাউকে নাটকীয় কাহিনীর কোনো সন্ধান দিয়ে যায় নি ? ৫৩/৫৪ তে খবরের কাগজেই নাটকের ছড়াছড়ি কম ছিল না। এক সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের ইশারা বহন করে মাসখানেক আগে যে ভোটাভুটি হয়ে গেল তার মধ্যে নাটকীয় রঙ্গরস ক্রন্দন হাহাকার কিছুই ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি ? জীবনের আরো বাঁকাচোরা গোপন পথে, ব্যক্তিজীবনের রহস্যময় হৃদয়কন্দরে, পরিবারে, হস্টেলে, জেলখানায়, রাস্তায়, কলেজে-ফ্যাক্টরিতে, ক্ষেতে-খামারে নাটক অহরহ পাকা ধানের ছড়ার মতো গুচ্ছে গুচ্ছে দুলছে, আমরা চোখ বুজে আছি তাই দেখছি না। যেখানে মানুষ আছে, মন আছে, দেহ আছে, সমাজ আছে, সেখানেই নাটক আছে। আমাদের পশ্চাতে আছে বিপুল বিচিত্র ঐতিহ্য, চারিপাশে নবজীবনের মর্মরিত জলোচ্ছ্বাস, সামনে স্বপ্নমুখর কল্পনার হাতছানি— আমাদের নাট্যসাহিত্য ব্যর্থ হবে না।

শেক্সপীয়ার

আমাদের মধ্যে একটা ধারণা জন্মে গেছে যে শিল্পী সমাজের আর পাঁচজনের মতো স্বাভাবিক মানুষ নয়। সে বিচরণ করে কল্পনার জগতে, আর আমরা মাটির পৃথিবীতে ; এবং সেই কারণেই আমরা ধরে নেই যে প্রতিভাবান যে কোনো শিল্পীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রণালীও হবে উদ্ভট ও দুর্বোধ্য। এমন কি সাংসারিক বুদ্ধিতে অতিমাত্রায় পরিণত ও ধর্মীয় গোঁড়ামিতে অতিমাত্রায় অন্ধ ব্যক্তিরা পৃথিবীর সর্বত্রই যুগে যুগে একথাও প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন যে, শিল্পীর নীতিবোধ সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর, কবির উপলব্ধ সত্য ধর্মীয় স্বার্থের বিরোধী। এই ধরনের চিন্তাধারা যে কত ভ্রান্তিপূর্ণ ও ভিত্তিহীন, ইংরেজি-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার শেক্সপীয়ারের জীবন ও নাটক তার জলজ্যান্ত প্রমাণ।

গুণীলোককে জীবিত অবস্থায় সম্মান দেখাতে মানুষের একটা স্বাভাবিক কার্পণ্য আছে। এর কারণ অবশ্য যতটা নয় ইচ্ছাকৃত, তার চেয়ে অনেক বেশি তার স্বভাবজাত অক্ষমতা। অতি নিকট আত্মীয়ের অসাধারণ গুণাবলি সম্পর্কে আমরা যেমন স্বভাবতই অচেতন থাকি, ঠিক তেমনি সমসাময়িক যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীর প্রতিভাকেও সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে আমরা সব সময় সমর্থ হই না। একটি যুগের সংকীর্ণ গণ্ডি পেরিয়ে যে সাহিত্যিক সর্বযুগের সত্যকে নিজস্ব মৌলিক ভঙ্গিতে প্রকাশ করতে চায়, সর্বান্তঃকরণ দিয়ে তাকে সহজে গ্রহণ করা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই বেঁচে থাকতে প্রতিভার ভাগ্যে জোটে শ্রদ্ধার বদলে অপমান, পুরস্কারের বদলে লাঞ্ছনা, উপাসকের বদলে নিন্দকের বাহিনী।

শেক্সপীয়ারকে অবশ্য এতখানি অপমানিত, নির্যাতিত জীবন কাটাতে হয়নি। কৈশোরোত্তীর্ণ হবার আগেই গ্রাম ছেড়ে শেক্সপীয়ার শহরে আসেন অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে। লন্ডন শহরের এক নাট্যশালায় শেক্সপীয়ার সেদিন চাকরি নিয়েছিলেন আর্থিক অনটন থেকে বাঁচবার পথ হিসেবে। স্বল্প বেতনের সে চাকরি খুব যে সম্মানজনক ছিল তাও নয়। তাঁর কাজ ছিল মঞ্চের পরিচর্যা করা, দৃশ্যসজ্জায় টুকিটাকি সাহায্য করা, আর অভিনয়ের সময় নেপথ্যে নিচু স্বরে নাটকের পাণ্ডুলিপি থেকে বিভিন্ন অভিনেতার পার্ট পড়ে দেওয়া। মাঝে মাঝে ছোটখাট পার্টও তাঁর ভাগ্যে জুটত।

সেযুগে নাটক শুধু অভিনীত হতো, ছাপা হতো না। নাট্যকারেরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকের পরিবর্তে বিশেষ কোনো নাট্যালয়ের কাছে বেচে ফেলতেন তাঁদের পাণ্ডুলিপি। উপরি আয়ের পথ খুঁজতে খুঁজতে শেক্সপীয়ার একদিন আবিষ্কার করেন যে, আদর্শ নাটকের সংলাপ রচনা করাও তাঁর পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। নাট্য-মঞ্চের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকার ফলে, শেক্সপীয়ারের মঞ্চানুভূতি তখন হয়ে উঠেছে পরিণত, সংলাপের কান হয়ে পড়েছে অতি সজাগ। মঞ্চের উপর কোন দৃশ্য কখন সব চাইতে বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ও শক্তিশালী হবে, সে সম্পর্কে শেক্সপীয়ারের চেতনা তখন ত্রুটিহীন। বেশ মোটা মজুরির পরিবর্তে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেক্সপীয়ার ভার পেলেন, বিভিন্ন নাট্যকারের পাণ্ডুলিপির সংস্কার ও সংশোধন করবার।

শিল্পচর্চা যে লাভজনক অর্থকরী ব্যবসাও বটে, এ উপলব্ধি কিন্তু শেক্সপীয়ারের রুচি ও কল্পনাকে কোনোদিন বিকৃত করে তুলতে সমর্থ হয় নি। এ দরিদ্র নাট্যকারের আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি যে অদম্য কামনা ছিল, তাকে বিদ্রূপ করার মতো সাহস আজ কারো নেই। শুধু পরের নাটক সংশোধন করার বদলে তখনকার সাহিত্যরীতি অনুযায়ী শেক্সপীয়ার অন্যের সহযোগিতায় নিজেও নাটক রচনায় মনোযোগ দিতে আরম্ভ করলেন। প্রতিভার উন্মেষ এখান থেকেই শুরু। কিছুদিন পর লন্ডন শহরের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার হিসেবে চতুর্দিক থেকে প্রশংসা পেতে লাগলেন শেক্সপীয়ার। তখন তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশের মতো। অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে শেক্সপীয়ার সৃষ্টি করে চললেন একটার পর একটা নতুন নাটক। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামের চালচুলোহীন সেদিনের কিশোর আজ লন্ডনের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের একজন। এখন তিনি সে নাটক লেখেন শুধু অর্থের তাগিদে নয়, সৃষ্টি করেন শিল্পীর রসানুভূতিকে চরিতার্থ করবার জন্যও। মাত্র উনপঞ্চাশ বছর বয়সে হঠাৎ শেক্সপীয়ার ঠিক করলেন, রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করবেন। সৃষ্টির বিরামহীন ব্যস্ততা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন শেক্সপীয়ার। স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামের প্রকৃতি হাতছানি দিয়ে ডাকল শিল্পীকে। শেক্সপীয়ার ফিরে গেলেন গ্রামের অতি আদরের কন্যার সঙ্গে জীবনের শেষ ক'টা বছর কাটাবেন বলে। আরো তিন বছর পর স্ট্র্যাট্‌ফোর্ড গ্রামে ২৩ এপ্রিল (১৬১৬) শেক্সপীয়ার মৃত্যুবরণ করেন।

শেক্সপীয়ার তাঁর যুগে বহুলভাবে আদৃত হলেও, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব তখনও সম্যকরূপে স্বীকৃত হয়নি। একটা অত্যন্ত ছোট অথচ লক্ষ করবার মতো ঘটনা থেকে শেক্সপীয়ারের প্রতি তাঁর সমসাময়িক যুগের শ্রদ্ধার স্বরূপটা আমরা আঁচ করতে পারি। এলিজাবেথান কাব্যের একটা লক্ষণ হচ্ছে তার বিষাদময় মৃত্যু-কামনার সুর। মরণানুভূতিকে গৌরবমণ্ডিত করে কাব্যে রূপান্তরিত করা ছিল বেশির ভাগ কবিরই একটা বৈশিষ্ট্য। সে যুগের যে-কোনো স্বল্পপরিচিত শিল্পী কিংবা রুচিবান ধনী লর্ডের মৃত্যুই কাব্যরচনার জন্য কবিদের একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা দিত। অথচ শেক্সপীয়ারের মৃত্যুকে উপলক্ষ করে এক ছত্র অশ্রুমিশ্রিত করুণ কাব্য রচিত হয়েছিল কিনা সন্দেহ। অনেকের মধ্যে একজন সার্থক নাট্যকার—শেক্সপীয়ার সম্বন্ধে সেযুগের বেশির ভাগ সমালোচক এর চেয়ে বেশি কোনো উচ্চ ধারণা পোষণ করত না। এমনকি শেক্সপীয়ারের মৃত্যুর একশ' বছর পর পর্যন্ত তাঁর জীবনী রচনায় উৎসাহী কোনো সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয় নি। তাঁর জীবনী লিপিবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে সত্যিকারের প্রচেষ্টা যখন থেকে শুরু হলো তখন শেক্সপীয়ারের জীবন সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য দুঃখজনকভাবে সীমাবদ্ধ। আজও আমরা তাঁর জীবন সম্পর্কে যেটুকু সুনিশ্চিত বলে জানি, তার সীমানা মাত্র পাঁচটি তারিখের বিচ্ছিন্ন সংখ্যার মধ্যে পর্যবসিত। এক জানি তাঁর জন্ম তারিখ, আর জানি যে উনিশ বছর বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, তাঁর চেয়ে সাত বছরের বড় এক তরুণীর সাথে। তাঁর প্রথম কন্যা ও দু'টি যমজ সন্তানের জন্ম তারিখ ও তাঁর মৃত্যু দিবস ছাড়া ইতিহাস শেক্সপীয়ারের জীবনের উপর অন্য কোনো আলোকপাত করে না। আজ সাড়ে তিনশ' বছর পর, আমাদের পুস্তকাগারে অসীম পরিশ্রমশীল পণ্ডিতদের কল্যাণে হয়তো কিছু বা বিপুলাকৃতির শেক্সপীয়ার-জীবনী আশ্রয় লাভ করেছে। যে জীবন সেখানে বর্ণিত হয়েছে তাতে সত্যের অপলাপ হয়তো করা হয় নি, কিন্তু কল্পনার সহায়তা নেওয়া হয়েছে পুরোপুরি। সত্যিকারের ঘটনার চেয়ে সেখানে স্থান পেয়েছে সম্ভাব্য কাহিনী। এ জাতীয় জীবনীগ্রন্থ গবেষণামূলক নয়, কল্পনামূলক। এতে অবশ্য হতাশ হবার কিছু নেই;

শেক্সপীয়ারের জীবনী সম্পর্কে এ অজ্ঞতা শেক্সপীয়ারকে উপলব্ধির পথে এমন কিছু অনতিক্রমনীয় প্রতিবন্ধক নয়। কারণ শিল্পীর সত্যিকারের পরিচয় তার সৃষ্টিতে, জীবনীতে নয়।

শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে গিয়ে সবার আগে আমাদের যা স্তম্ভিত করে দেয়, তা হচ্ছে, তাঁর চিন্তাজগতের অবিশ্বাস্য রকম বিপুল পরিধি। ছত্রিশটা নাটক তিনি রচনা করেছেন বিশ বছরের মধ্যে। এক একটা নাটক যেন এক একটা স্বতন্ত্র পৃথিবী। হাসি-কান্নায় মেশানো আবেষ্টনী প্রতিটি নাটককে করে তুলেছে জীবনের ছন্দে স্পন্দমান। এক নাটক থেকে অন্য নাটকে প্রবেশ করে প্রতিবারেই বিস্ময় আরও বেড়ে চলে। প্রত্যেকবারেই যেন নব নব পৃথিবীর উন্মেষবৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে প্রভাময় শেক্সপীয়ারের সৃষ্টি।

"টুয়েলফ্‌থ্ নাইট"-এর আবেষ্টনীতে আছে স্বপ্নপুরীর মায়া ; কাব্যক্ষরা প্রেম-গুঞ্জন যেন আড়াল করে রেখেছে আকাশ-পরীদের লঘু পদক্ষেপকে। অশরীরী এই স্বপ্নাচ্ছন্ন পৃথিবী আবার অকস্মাৎ "মাচ্ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং"-এ আলোড়িত হয়ে উঠেছে দুই প্রেমিক-প্রেমিকার চিত্তবিভ্রান্তকারী বুদ্ধিদীপ্ত রহস্যালাপের সংঘাতে। রোমিও-জুলিয়েটের প্রথম পরিচয় যে উচ্ছল ছন্দিত কবিতার চরণের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, নিয়তির কোনো নিষ্ঠুর আঘাতই আমাদের মনে সে সুর স্তব্ধ করে দিতে পারে না। সন্তানের প্রতি স্নেহে অন্ধ, বার্ধক্যের প্রভাবে অসহিষ্ণু, মুকুটহীন হয়েও ক্ষমতা প্রয়োগে প্রচেষ্ট রাজা লিয়ার যখন রাজকীয় সিংহাসনের স্মৃতিতে তার আদরের কন্যার কল্পিত পিতৃদ্রোহিতার শোকে মুহ্যমান, তখন কেবল শেক্সপীয়ারের লেখনী তাকে বাস্তব ও জীবন্ত করে তুলতে পারে কয়েকটি সহজ শব্দের আড়ম্বরহীন সমাবেশে। প্রকৃতির প্রমত্ত ঝড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তখন গর্জন করে ওঠে লিয়ারের অভিশাপ আর অনুশোচনা ও কাতরোক্তি। সৌন্দর্যের পূজারী কল্পনাপ্রবণ উচ্চাভিলাষী ম্যাক্‌বেথের মতো আদর্শ সেনানায়কের চরিত্রের 'ট্র্যাজিক' নাটকের আদর্শ অনুভূতির আবেদন। আততায়ীর হাতে নিরপরাধ শিশুর হত্যাদৃশ্য, অসহায় বৃদ্ধ অতিথির বিশ্বাসঘাতক গৃহস্বামীর ছুরিকাঘাতে প্রাণদান, চরম বিপদ্গ্রস্ত নিরুপায় পতিপ্রাণা স্ত্রীর ভয়াবহ আর্তনাদ, নৃত্যরত বীভৎস প্রেত-প্রেতিনীর পদধ্বনি— সব মিলে হয়তো শুধু গভীর ভীতিই আমাদের মনে জাগিয়ে দিত, কিন্তু নাটক তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারত না। গভীর ভীতি, সেই সঙ্গে গভীর অনুকম্পা— যে কোনো মহৎ চরিত্রের যুক্তিসঙ্গত অনিবার্য পতনের দৃশ্য দর্শনে যে অনুভূতি আমাদের মনে জাগে— এ দু'য়ের সংমিশ্রণেই জন্ম নেয় সার্থক বিয়োগান্ত নাটক।

শেক্সপীয়ারের কল্পনার শিকড় প্রবেশ করেছে জীবনের গভীর থেকে গভীরতম স্তরে। তাই তো তাঁর নাটক পড়ে আমরা এত যুগ পরেও এত সহজে, এত গভীরভাবে মুগ্ধ হই। তাঁর নাটকের পৃথিবী আমাদেরই বৃহত্তর অস্তিত্বের অংশ। শেক্সপীয়ারের নাটকের চরিত্র যেন আমাদের মতোই রক্তমাংশের পূর্ণাঙ্গ জীব ; আলাদা আলাদা ধমনীপুষ্ট স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ওদের প্রত্যেকেরই আছে। তাই তিনশ' বছরের মধ্যে কাগজের মৃত কালো অক্ষরের বন্ধন ছিন্ন করে ওরা সব সার বেঁধে দুনিয়ার সত্যিকারের মানুষের ইতিহাসে দখল করে বসেছে স্থায়ী আসন। মেদবহুল ফলস্টাফ, মিথ্যাবাদী ফলস্টাফ, কাপুরুষ ফল্‌স্টাফ, ব্যাধিগ্রস্ত, পানাসক্ত, দুশ্চরিত্র ফলস্টাফ— তবু অতি প্রিয়, অতি কাম্য, অতি অন্তরঙ্গ। ফলস্টাফ কেবল শেক্সপীয়ারের নাটকের একটা কল্পিত চরিত্র নয় আমাদের কাছে সে একজন রীতিমতো

মানুষ। যে ঔষধ-বিক্রেতা একবার মাত্র সমস্ত নাটকের মধ্যে পদক্ষেপ করল, রোমিওর কাছে বিষ বিক্রি করার সময় উচ্চারণ করবার সুযোগ পেল কয়েকটা অক্ষর মাত্র, সেও আমাদের কল্পনায় তার অস্তিত্বের ছাপ রেখে গেছে সুস্পষ্ট সীমারেখায়। যাদু আছে শেক্সপীয়ারের শব্দে—কয়েকটা অক্ষরের সমষ্টি তাই অত অল্প পরিসরের মধ্যেও সৃষ্টি করতে পারে একটা বিশেষ দেহের, বিশেষ মনের, বিশেষ ব্যক্তিত্বের মানুষকে। শেক্সপীয়ার-সৃষ্ট বিরাট সংখ্যক চরিত্রের বাস্তবতায়, সততায়, বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে মুগ্ধ হয়ে ফরাসি ঔপন্যাসিক ডুমা একটা খুব মূল্যবান কথা হালকা কণ্ঠে উচ্চারণ করেন। তিনি বলেছিলেন, সৃষ্টিকর্তার পর শেক্সপীয়ারই নাকি পৃথিবীর জন্য সবচেয়ে বেশি সংখ্যক মানুষ সৃষ্টি করে গেছেন।

শেক্সপীয়ারের নাটকে স্থিতিশীল জড় চরিত্রের কোনো স্থান নেই। নাটকের কৌশলপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সাথে সংগতি রেখে চরিত্র যদি ক্রমবিকাশের পথে পূর্ণত্ব লাভ না করে, তবে সে চরিত্র হয়ে দাঁড়ায় মৃত, অবাস্তব। পাঠকের মনে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস উৎপাদনের পরিবর্তে সে সৃষ্টি করে ক্লান্তি ও অনাস্থা। ইতিহাসের পাতায় যে চরিত্রের স্বাক্ষর আছে, শেক্সপীয়ারের ঐতিহাসিক নাটকে সে-ও নতুন করে জন্ম নেয়, বাঁচতে শুরু করে বাড়তে থাকে একেবারে নাটকের শেষ পরিণতির দৃশ্য অবধি। ক্রমে পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় সে। কিন্তু, তাই বলে কখনও স্ববিরোধী গুণ অর্জন কিংবা সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তির রূপ ধারণ করে না। চরিত্রসৃষ্টিতে শেক্সপীয়ারের কৃতিত্ব এইখানেই যে অন্য নাট্যকারেরা যেখানে ঐতিহাসিক চরিত্রকে পর্যন্ত যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য সততার সঙ্গে বর্ণনা করতে সমর্থ হন নি, শেক্সপীয়ার সে স্থলে নিছক রূপকথার কাহিনীকেও দান করেছেন বলিষ্ঠ বাস্তব পৃথিবীর শক্তি।

কবিতার কবিতায় আর নাটকের কবিতায় বড় রকম একটা পার্থক্য আছে। ঠিক যেমন খুব মার্জিত ও অলঙ্কৃত ভাষায় লেখা কথোপকথন মাত্রেই আদর্শ সংলাপ বলে বিবেচিত হয় না, তেমনি সে সংলাপ কবিতায় গীতময় হয়ে উঠলেই তাকে নাটকীয় মর্যাদা দেওয়া চলে না। শেক্সপীয়ারের সংলাপ হচ্ছে নাটকে আদর্শ কবিতার নিদর্শন; এই কবিতার শব্দচয়নে ব্যাকরণ কী ছন্দের কঠিন নিয়মাবলিকে সব সময়ে অনুসরণ করা চলে না। এর প্রধান দায়িত্ব নাটকীয় মুহূর্তটিকে দর্শকের মনে তীব্রভাবে তড়িৎবেগে প্রতিফলিত করা। কখনও অসম্পূর্ণ ব্যাকরণবিরোধী দু'লাইন অসংলগ্ন উক্তি কিংবা অত্যন্ত কর্কশ ছন্দহীন একই শব্দের কয়েকবার পুনরাবৃত্তিও শেক্সপীয়ারের রচনায় বহু নাটকের চরম-মুহূর্তকে করে তুলেছে আলোকোজ্জ্বল ও হৃদয়গ্রাহী।

কোনো নাটক রসোত্তীর্ণ হলো কিনা তা নির্ভর করে সে নাটকের মঞ্চোত্তীর্ণ হবার ক্ষমতার উপর। অবশ্য আদর্শ নাটক রঙ্গমঞ্চে যেমন সাফল্য লাভ করবে, পাঠককেও তেমনি আনন্দ দান করবে। কিন্তু, নাটক পড়বার সময় যদি আমরা প্রতিমুহূর্তে তাকে রঙ্গমঞ্চে অভিনীত অবস্থায় কল্পনা না করতে পারি, তবে তার বাঞ্ছিত রস হতে বহু পরিমাণে বঞ্চিত হব। শেক্সপীয়ারের নাটকের রস পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে হলে তাই প্রয়োজন আমাদের মঞ্চানুভূতিকে পরিণত করে তোলা। এই অনুভূতিকে জাগ্রত করে তোলবার পথে অপরিহার্য একটি সোপান হচ্ছে মঞ্চের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতর পরিচয়। যতদিন রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে আমাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নিবিড় না হবে, ততদিন অবধি বাংলায়

নাট্যসাহিত্যেরও উৎকর্ষ সাধন সম্ভব হবে না।

আমাদের সমাজজীবনে রঙ্গমঞ্চ আজও খুব গর্হিত স্থান না হলেও অপ্রয়োজনীয় বিলাসের স্থান বলে নিশ্চয়ই পরিগণিত ও অবহেলিত। ধর্মপ্রাণ মুরব্বিদের সামনে রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা আজও সাহস পাই নে। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, নাটকের জন্ম ধর্মানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে অথচ নাটকের পূর্ণ বিকাশের পথে বারবার আঘাত হেনেছে গির্জার প্রতিনিধিরাই। মঞ্চ ও গির্জার দ্বন্দ্ব ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে এক কৌতূহলোদ্দীপক অধ্যায়। গির্জার জুলুমে নির্যাতিত বা রাজরোষে পতিত হয়নি এমন নাট্যকার বা নাট্যালয়ের সংখ্যা ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে খুব বেশি নয়।

শেক্সপীয়ারের অবশ্য এ দুর্ভোগ ভুগতে হয় নি। তার প্রধান কারণ তিনি যেমন অসাধারণ প্রতিভাবান শিল্পী ছিলেন, তেমনি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগধর্মের কাছে নতি স্বীকার করে চলবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অদ্ভুত। সবাই যা সহজে গ্রহণ করবে, সকলের তুষ্টির জন্য তা তিনি সব সময়েই তাঁর নাটকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের যা বিশেষ করে দেয়, তাও তিনি সবাইকে দিয়ে আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করিয়ে নিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সহস্র বৎসর পুরাতন। এই ভাষায় রচিত সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আমার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অংশ। যাঁর গল্প-নাটক, কবিতা-গান, প্রবন্ধ-উপন্যাস বাংলা ভাষার সর্বোত্তম বিকাশের ধারক ও বাহক সেই রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমার সত্তার সামগ্রিকতা ও পরিপূর্ণতা আজ কল্পনীয় নয়। আমার নিভৃততম চিন্তার গুঞ্জরণ, গভীরতম ভাবনার আলোড়ন, তীব্রতম উপলব্ধির জাগরণ সহস্র সূত্রে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অনুপ্রাণিত, রবীন্দ্রকাব্যের ভাষার ছন্দে স্পন্দিত, রবীন্দ্রকল্পনার আলোকে পরিপ্লাবিত।

অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও স্বীকার্য যে রবীন্দ্রকাব্যের পাঠকের শ্রেণীভেদ আছে। সে কাব্যের রসাস্বাদনের প্রবণতা দেশ কাল ও পরিবেশভেদে বিচিত্র পথে আবর্তিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সমকালীন পাশ্চাত্য জগৎ 'গীতাঞ্জলি'র যে আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত শান্তরসে মুগ্ধ হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রকাব্যের বিদগ্ধ বাঙালি পাঠক সে বিহ্বলতা থেকে মুক্তি লাভ করে। সমকালে রবীন্দ্রনাথেব কাব্যের চেয়ে সম্ভবত তাঁর ছোটগল্প বেশি আদৃত ও পঠিত হয়েছে, রবীন্দ্রচিত্র জীবনের যে অতৃপ্ত ও অশান্ত বিক্ষোভ প্রতিফলিত তার আবেদন নবমর্যাদা লাভ করেছে।

উনিশ 'শ সাতষট্টির পূর্ব-পাকিস্তানি পাঠক হিসেবে আমরাও রবীন্দ্রসাহিত্যের নব মূল্যায়নে ব্যাপৃত। যত কাল অতিবাহিত হচ্ছে ততই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের একাত্মবোধের কিছু বন্ধন দৃঢ়তর হচ্ছে, কিছু ছিন্নও হচ্ছে। পঞ্চাশ বৎসর ব্যবধানের দুই রবীন্দ্রভক্তের মধ্যে প্রকৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। রবীন্দ্রদ্রোহীদের মধ্যেও। রবীন্দ্রনাথেব অশ্লীলতা আজ কারো শিরঃপীড়ার কারণ নয়, তাঁর দুর্বোধ্যতা নিয়েও কেউ চিন্তিত হয় না। বরঞ্চ সমালোচনার পাঠ্যপুস্তকে আজো তাঁর যে জীবনদেবতার উপাখ্যান, নিরুদ্দেশলোকের সৌন্দর্যারাধনা ও সসীম-অসীমের মিলনতত্ত্ব ক্লান্তিহীন উদ্যমের সঙ্গে অসংখ্যবার পুনরাবৃত্ত হয়, যুগচেতনাস্পৃষ্ট নবীন পাঠক তাকে উপেক্ষা করে না হলেও, অতিক্রম করেই রবীন্দ্রকাব্য-পিপাসা নিবৃত্ত করে।

একটা সহজ দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। 'মুক্তধারা' নাকটটি। এই নাটকেব মুখ্য প্রতিনিধি ধনঞ্জয়। তিনি বিপ্লবী নন, বৈরাগী মাত্র। তাঁর মধ্যে বিদ্রোহের ভাবের চেয়ে ভক্তির প্রবণতাই বেশি। তাঁর সত্যভাষণের নির্ভীকতা কখনো কখনো ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থা পরিবর্তনের উদ্দীপনা সঞ্চার করলেও তাঁর আসল প্রয়াস ভক্তিমার্গে জীবের মুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই উৎকণ্ঠা যুগধর্মের দ্যোতক নয়। সমকালীন পাঠক দর্শক শ্রোতা হয়তো 'মুক্তধারা'র মন্ত্রীর গানের চেয়ে যন্ত্রীর গানেই বেশি মুগ্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টির আগোচরে যুগের মূল্যবোধের পালাবদল ঘটেছে, অন্তত তাঁর জীবনাবসানের কালে তো বটেই। প্রকৃতি ও যন্ত্রের মধ্যে সত্য-মিথ্যা, পাপ-পুণ্যের যে দ্বন্দ্ব 'মুক্তধারা'য় ও রবীন্দ্রকাব্যের অন্যত্র পরিকল্পিত হয়েছে তা বর্তমানে অহেতুক এবং অকিঞ্চিৎকর বিবেচিত হতে বাধ্য। যন্ত্রের মর্যাদা এখন সংশয়ের বস্তু নয়, যেমন নগরও আর ধিকৃত হয় না গ্রামের বিরোধী শক্তিরূপে।

উভয়ই মানবসমাজের ক্রমবিকাশের স্তর ও প্রকৃতিকে সূচিত করে মাত্র। যন্ত্রশক্তিকে বিভীষিকাময় করে তোলে মানবসমাজের এক বিশিষ্ট শ্রেণীর স্বার্থবুদ্ধি, গ্রাম ও নগর উভয়ের অগ্রগতি প্রতিহত করে শ্রেণীবিশেষের একই পাপবুদ্ধি। যুগচেতনার এই মৌল পরিবর্তনের ফলে 'মুক্তধারা'য় রবীন্দ্রকল্পিত মূল্যবোধের যে সংঘাত প্রদর্শিত হয়েছে আজ তার আবেদন দুর্বল ও গুরুত্বহীন বলে প্রতীয়মান হয়। তার ওপর যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে মন্ত্রশক্তির যে মহিমা নাটকে কীর্তিত হয়েছে তার ভিত্তি মূর্তিপূজার ঐতিহ্যাশ্রয়ী হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানি মুসলমান পাঠকের চিত্তে তার প্রতিষ্ঠা দুরূহতর। যা প্রশংসিত হয় তা হলো নাটকীয় সংলাপের সূক্ষ্মতা ও সরসতা, সর্বাঙ্গীণ কলারীতির বৈদগ্ধ্য ও শালীনতা এবং কোনো কোনো তত্ত্বাংশের সামাজিক ও ইহলৌকিক প্রজ্বলন্ত স্পষ্টভাষিতা।

যেমন, কঙ্কর চরিত্রের উক্তি : 'ওরে নরসিংহ, লোকটা তর্ক করে যে। দেশের পক্ষে ওর বাড়া আপদ নেই'। অথবা সেই সম্পূর্ণ কৌতুকাবহ দৃশ্যটি যেখানে উত্তরকূটের গুরুমহাশয় উচ্চারণে অপটু জ্ঞানহীন ছাত্রদের সংগঠিত করছেন বিশেষ কোনো উৎসবে মহারাজের 'জয়ধ্বনি' চিৎকারের জন্য।

(একদল ছাত্র লইয়া অদূরে গাছের তলায় উত্তরকূটের গুরুমশায় প্রবেশ করিল।)

গুরু। খেলে, খেলে, বেত খেলে দেখছি। খুব গলা ছেড়ে বল, জয় রাজরাজেশ্বর।

ছাত্রগণ। জয় রাজরা—

গুরু। (হাতের কাছের দুই একটা ছেলেকে থাবড়া মারিয়া)—জেশ্বর।

ছাত্রগণ। জেশ্বর।

গুরু। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। (ঠেলা মারিয়া) পাঁচবার।

ছাত্রগণ। পাঁচবার।

গুরু। লক্ষ্মীছাড়া বাঁদর। বল্ শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

ছাত্রগণ। শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী শ্রী—

গুরু। উত্তরকূটাধিপতির জয়—

ছাত্রগণ। উত্তরকূটা—

গুরু। —ধিপতিব

ছাত্রগণ। —ধিপতির

গুরু। —জয়

ছাত্রগণ। —জয়।

রণজিৎ। তোমরা কোথায় যাচ্ছ?

গুরু। আমাদের যন্ত্রবাজ বিভূতিকে মহারাজ শিরোপা দেবেন তাই ছেলেদের নিয়ে যাচ্ছি আনন্দ করতে। যাতে উত্তরকূটের গৌরবে এরা শিশুকাল

হতেই গৌরব করতে শেখে তার কোনো উপলক্ষই বাদ দিতে চাই নে।

রণজিৎ। বিভূতি কি করেছে এরা সব জানে তো?

ছেলেরা। (লাফাইয়া হাত তালি দিয়া) জানি, শিবতারাইয়ের খাবার জল বন্ধ করে দিয়েছে।

রণজিৎ। কেন দিয়েছে?

ছেলেরা। (উৎসাহে) ওদের জব্দ করবার জন্যে।

রণজিৎ। কেন জব্দ করা?

ছেলেরা। ওরা যে খারাপ লোক।

রণজিৎ। কেন খারাপ তা জান না।

গুরু। জানে বই কি মহারাজ। কিরে তোরা পড়িস নি—বইয়ে পড়িস নি—ওদের ধর্ম খুব খারাপ—

ছেলেরা। হাঁ, হাঁ, ওদের ধর্ম খুব খারাপ।

গুরু। আর ওরা আমাদের মতো—কী বল না—(নাক দেখাইয়া)

ছেলেরা। নাক উঁচু নয়।

গুরু। আচ্ছা, আমাদের গণাচার্য কী প্রমাণ করে দিয়েছেন—নাক উঁচ[illegible] কী হয়?

ছেলেরা। খুব বড় জাত হয়।

গুরু। তারা কী করে? বল্ না পৃথিবীতে—বল্—তারাই সকলের উ[illegible] না?

ছেলেরা। হ্যাঁ, জয়ী হয়।

গুরু। উত্তরকূটের মানুষ কোনোদিন যুদ্ধে হেরেছে জানিস?

ছেলেরা। কোনোদিনই না?

গুরু। আমাদের পিতামহ—মহারাজ প্রাগজিৎ দু-শ তিরেনব্বই জন সৈন্য নিয়ে একত্রিশ হাজার সাড়ে সাত-শ দক্ষিণী বর্বরদের হটিয়ে দিয়েছিলেন না?

ছেলেরা। হাঁ, দিয়েছিলেন।

গুরু। নিশ্চয়ই জানবেন মহারাজ, উত্তরকূটের বাইরে যে হতভাগ্যরা মাতৃগর্ভে জন্মায়, একদিন এইসব ছেলেরাই তাদের বিভীষিকা হয়ে উঠবে। এ যদি না হয় তবে আমি মিথ্যে গুরু। কত বড়ো দায়িত্ব যে আমাদের সে আমি এক দণ্ডও ভুলি নে। আমরাই তো মানুষ তৈরি করে দিই, আপনার অমাত্যরা তাঁদের নিয়ে ব্যবহার করেন। অথচ তাঁরাই বা কি পান আর আমরাই কি পাই তুলনা করে দেখবেন।

মন্ত্রী। কিন্তু ওই ছাত্ররাই যে তোমাদের পুরস্কার।

গুরু। বড়ো সুন্দর বলেছেন মন্ত্রীমশায়, ছাত্ররাই আমাদের পুরস্কার। আহা, কিন্তু খাদ্যসামগ্রী বড়ো দুর্মূল্য—এই দেখেন না কেন, গব্যঘৃত, যেটা ছিল—

মন্ত্রী। আচ্ছা বেশ, তোমার এই গব্যঘৃতের কথাটা চিন্তা করব। এখন যাও, পূজার সময় নিকট হল।

(জয়ধ্বনি করাইয়া ছাত্রদের লইয়া গুরু মশায় প্রস্থান করিল।)

এসব দৃশ্যের আবেদন দেশকালের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বহু দেশের বহু চিত্তকে স্পর্শ করে। কৌতুকময় তির্যক বাক্‌ভঙ্গি বক্তব্যকে এমন একটা স্থিতিস্থাপকতা দান করেছে যে তার তাৎপর্য, পরিবেশ ও কালের ব্যবধান সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ বলে অনুভূত হয়। শিল্পীর বিদ্রূপের লক্ষ্য যেমন উত্তরকূট, তেমনি উত্তরকালের সমগোত্রীয় সকল রাষ্ট্রশক্তিব কূটবুদ্ধিও বটে।

নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ

কোনো কবির পরিচয়কে বিশেষণের দ্বারা খণ্ডিত করে বিচার করতে বসায় কিছু বিপদ আছে। কিছু সার্থকতাও আছে। বিপদ এই জায়গায় যে কবির শিল্প-সত্তা একক এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ, অবিভাজ্য এবং নিরবচ্ছিন্ন। একটা বিশেষণের দ্বারা তাঁকে চিহ্নিত করতে গেলেই অন্য একটি বিপরীত বিশেষণ দশ দিক থেকে ছুটে এসে অনর্থ বাধিয়ে দিতে চায়। তবুও আমরা সম্পূর্ণকে বর্জন করে অংশকে বড় করে দেখাই। কবির সমগ্র প্রকাশকে নানা খণ্ডে ভাগ করে তার একেক দিক নিয়ে আলোচনা করি। এভাবে অগ্রসর হওয়ার সার্থকতা এই জায়গায় যে, কবিতার নানা স্তরের বিচ্ছিন্ন উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আমরা তাঁর সামগ্রিক স্বরূপকে সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে পারি। নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের কবি, বিপ্লবের কবি, শান্তির কবি, সাম্যের কবি। তিনি প্রেম ও অপ্রেমের, হিংসা ও ভালোবাসার, মিলন ও সংঘাতের কবি। আস্তিকতা ও নাস্তিকতা, ধার্মিকতা ও অধার্মিকতা, ইসলাম ও অনৈসলাম সবই নজরুল-কাব্যে পাশাপাশি আবিষ্কারযোগ্য। সব কিছু মিলিয়েই নজরুল ইসলাম কবি। আমাদের বর্তমান আলোচনার বিশিষ্ট লক্ষ্য নজরুল কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ বর্ণনা করা, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা, তার মূল্য বিচার করা।

ভাব ও বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে সমগ্র নজরুল কাব্যকে দুটো প্রধান ভাগে ভাগ কবা যেতে পারে। এক শ্রেণীতে পড়বে 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা', 'ফণি মনসা', 'জিঞ্জীর', 'সন্ধ্যা' ও 'প্রলয়-শিখা'। 'দোলন চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পুবের হাওয়া', 'সিন্ধু-হিন্দোল', 'চক্রবাক' এগুলোর কাব্যধর্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পর্যায়ের। নিজের দেশ-জাতি-ধর্ম সম্পর্কে কবি তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা, ক্ষোভ-হতাশা, রোষ-উল্লাসকে প্রকাশ করেছেন প্রথম পর্যায়ের রচনাবলিতে। এখানে আবেগের প্রখরতার সঙ্গে মত বা বক্তব্য প্রচাবের তাগাদা প্রায় সমপরিমাণে মিশ্রিত। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্যগহনে প্রেমাশ্রিত অন্তরঙ্গ ব্যক্তিগত হৃদয়াবেগই সার্বভৌম। নজরুলের উত্তরকাব্য 'নতুন চাঁদ' ও 'শেষ সওগাতে' উভয় ধর্মের কবিতাই সংকলিত হয়েছে। স্বভাবতই আমাদের আলোচনার প্রধান অবলম্বন হবে প্রথম ধারার কাব্যগ্রন্থসমূহ। এগুলোর মধ্যে 'অগ্নি-বীণা'ই প্রধান। বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুলের কৃতিত্ব এই গ্রন্থেই সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক কবিতায় সর্বাপেক্ষা অধিক উজ্জ্বলতার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত। 'কামাল পাশা', 'আনোয়ার', 'শাত-ইল আরব', 'খেয়া-পারের তরণী', 'কোরবাণী', 'মোহর্‌রম' সবই অগ্নি-বীণার কবিতা। নজরুল-কাব্যে ইসলামী অনুপ্রেরণার স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা আরো একটি তৃতীয় ধারার সীমানা নির্দেশ করতে পারি যার সবটাই সরাসরি ইসলাম প্রীতিমূলক। যেমন 'কাব্যে আমপরা' (অনুবাদ), 'মরু-ভাস্কর' এবং তাঁর অজস্র ইসলামী গান। কবির ধর্মপ্রাণ সামাজিক সত্তা এই রচনাগুলোর মধ্যে আন্তরিক বিশ্বাসের প্রেরণায় বিকাশ লাভ করেছে। শিল্পমূল্য বিচারের কঠিন মানদণ্ড আরোপ করলে হয়তো এর সবটা চিরকালের জন্য উত্তীর্ণ হতে পারবে না, কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, মুসলিম গণমানসের ওপর

এগুলোর প্রভাবই সর্বাপেক্ষা ব্যাপক এবং গভীব। বাঙালি মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয় বোধ এগুলোকে আশ্রয় করেই আত্মসচেতন হয়েছে।

'অগ্নি-বীণা'র কথায় ফিরে আসা যাক। এখানে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণ উৎকৃষ্ট কাব্যমূল্যের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতিভার যে বিশিষ্ট চেতনা ও প্রক্রিয়ার ফলে বাংলা কাব্যে এই নতুন শক্তি সঞ্চারিত হলো তার মর্মবাণী আজও আমাদের জন্য এক গভীর তাৎপর্য বহন করে।

কাব্যের বহিরাঙ্গে নজরুলের কৃতিত্ব আরবি ফরাসি শব্দের অবাধ এবং অকুণ্ঠ সংযোজনায়। এগুলোর ভাবানুষঙ্গ মুসলিম ঐতিহ্যের স্মৃতি বিজড়িত। তার কিছু বাঙালি মুসলমানের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সম্পদ থেকে আহরিত, কিছু তাঁব জ্ঞানার্জিত শব্দ ভাণ্ডার থেকে চয়ন করা। কবির একমাত্র লক্ষ্য ছিল সেগুলোর প্রয়োগ যেন যথাযথ হয়, ললিত হয়, ইঙ্গিতে, ব্যঞ্জনায় যেন পাঠকের মন কেড়ে নিতে পারে। শব্দের বিস্ময়কর ধ্বনিগত সমারোহ কোনো কোনো ক্ষেত্রে অর্থ-নিরপেক্ষ মোহবিস্তারে পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে—"ছন্দকে রক্ষা করিয়া তাহার মধ্যে একটি অবলীলা, স্বাধীন স্ফূর্তি, অবাধ আবেগ, কবি কোথাও তাহাকে হারাইয়া বসেন নাই, ছন্দ যেন ভাবেব দাসত্ব করিতেছে। কোনোখানে অধিকারের সীমানা লংঘন করে নাই— এই প্রকৃত কবিশক্তিই পাঠককে মুগ্ধ করে। কবিতাটি আবৃত্তি করিলেই বোঝা যায় যে, শব্দ ও অর্থগত ভাবের সুর কোনখানে ছন্দেব বাঁধনে ব্যাহত হয় নাই। বিস্ময়, ভয়, ভক্তি, সাহস, অটল বিশ্বাস এবং সর্বোপরি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত একটি ভীষণ গম্ভীর অতিপ্রাকৃত কল্পনার সুব, শব্দবিন্যাস ও ছন্দ ঝংকারে মূর্তি ধরিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব।

যখন পড়ি—

উবজ য়্যামেন নজদ হেজাজ তাহামা ইরাক শাম
মেসের ওমান তিহরান স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।
চলে আঞ্জাম্
দোলে তাঞ্জাম্
খোলে হুরপরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসব-ভর,
হাতে আব-জম-জম-জাম্।
শোন দামাম কামান্ সামান্
নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম'।

তখন প্রতি চরণের অর্থোদ্ধারের জন্য মোটেই চিন্তান্বিত হই না।" 'খেয়া-পারের তরণী' পড়ে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার অভিভূত হন। তাঁর নিজের ভাষায় "আমি কেবল একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব,

আবুবকর ওসমান ওমর আলী হায়দার
দাঁড়ী যে এ তরণীর নাই ওরে নাই ডর।

কাণ্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি-মাল্লা,

দাঁড়ীমুখে সারি গান— লা শরীক আল্লাহ্।

এই শ্লোকে মিল, ভাবানুযায়ী শব্দবিন্যাস এবং গভীর গম্ভীর ধ্বনি, আকাশে ঘনায়মান মেঘপুঞ্জের প্রলয়-ডম্বরু-ধ্বনিকে পরাভূত করিয়াছে—বিশেষ, এ শেষ ছত্রের শেষ বাক্য "লা শরীক আল্লাহ"— যেমন মিল তেমনি আশ্চর্য প্রয়োগ। ছন্দের অধীন হইয়া এবং চমৎকার মিলের সৃষ্টি করিয়া এই আরবি বাক্য যোজনা বাঙ্গালা কবিতায় কি অভিনব ধ্বনি-গাম্ভীর্য লাভ করিয়াছে।"

নজরুলের ঐতিহ্য-প্রীতি সামান্য সামাজিকের অতীতের প্রতি অন্ধ মোহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। নজরুল অতীতকে স্মরণ করেছেন বর্তমানকে পুনর্নির্মাণের হাতিয়ার রূপে। তাঁর কবি-দৃষ্টিতে ইতিহাস চিরজীবন্ত। মহররম কী কোরবাণীর কাব্য রচনা করতে গিয়ে তাঁর উদ্‌গত অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে সমকালীন মানুষের তৃষাতপ্ত জীবনের ওপর। কামালের কীর্তি ও তাঁর অনুসরণকারীদের আত্মদানের মহিমা ঘোষণা করতে গিয়ে স্বদেশের শহীদদের জন্যই তাঁর বাণী উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে—

মৃত্যু এরা জয় কবেছে, কান্না কিসেব

আব্ জম্‌জম আনলে এরা, আপনি পিয়ে কলসি বিষেব।

কে মরেছে ? কান্না কিসের ?

বেশ করেছে !

দেশ বাঁচাতে আপনারি জান্ শেষ করেছে।

বেশ করেছে !!

শহীদ ওরাই শহীদ !

বীরের মতন প্রাণ দিয়েছে, খুন ওদেরই লোহিত।

শহীদ ওরাই শহীদ !!

বাংলা কাব্যে মুসলিম ঐতিহ্যের রূপায়ণে নজরুল ইসলাম সার্থকতা লাভের মূলে কাজ করেছে এই দুই কাব্যসূত্র। এক, নতুন হোক পুরাতন হোক, দেশী হোক বিদেশী হোক শব্দের ধ্বনিগত ব্যবহারে তিনি ছিলেন অসাধারণ কুশলী কারিগর; দুই, তাঁর ঐতিহ্যবোধ ছিল জীবন-সম্পৃক্ত। অতীতকে তিনি নকল করেননি, ঐতিহ্যকে আউড়ে যাননি, তাকে নবরূপ দান করেছেন, বর্তমানের সঙ্গে তার সেতুবন্ধন ঘটিয়েছেন অনাগত দিনের স্বপ্নসম্ভাবনায় তাকে ঐশ্বর্যশালী করে তুলেছেন।

আধুনিক নাটক

আধুনিকতার ধারণা মূলত আপেক্ষিক। সমকালীন নাট্যধারায় একাধিক বিপ্লবাত্মক অভিনবত্বের প্রবর্তকরূপে ইউরিপিদিস বিস্তর নিন্দা ও স্তুতির ভাগীদার হন। পূর্ববর্তী নাটকসমূহের তুলনায় তাঁর নাটকে বাস্তবতার অনুবর্তন ছিল দুঃসাহসিকরূপে সাধারণ জীবনের অঙ্গীভূত, তাঁর সংলাপের ভাষা ছিল অতিরিক্ত অলংকরণের প্রতিষ্ঠিত কাব্যরীতির বিরোধী, তাঁর মতবাদের মধ্যে ছিল গণতন্ত্র ও মানবিকতার অনুমোদন, নারীর নিজস্ব অধিকার ও মর্যাদাবোধের স্বীকৃতি। ইউরিপিদিস ছিলেন দু'হাজার বছর পূর্বেকার গ্রিস দেশের একজন রুষ্ট তরুণ। এই অর্থে শেক্সপিয়রও তাঁর কালে নব নাটকের জন্মদাতা। নাটকের যে ক্লাসিক্যাল ঐতিহ্য গ্রিস থেকে রোম, রোম থেকে প্যারিস, প্যারিস থেকে লন্ডনে তর্কাতীতভাবে পূজিত হয়ে আসছিল শেক্সপিয়র তার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করেন। তিনি স্থান, কাল ও ঘটনার ত্রৈরাশিক ক্লাসিক্যাল ঐক্যবিধির অবহেলা করে নতুন রোমান্টিক নাটকেব জন্ম দিলেন। কল্পনার অবাধে ঐশ্বর্যে পরিমণ্ডিত হয়ে আদর্শায়িত মানব-মানবী রঙ্গমঞ্চের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে এই প্রথম আনুভূতিক সত্তার দুর্জ্ঞেয় রহস্য অনাবৃত করার সুযোগ লাভ কবল।

বাংলা নাটকেব উন্মেষপর্বেও একপ্রকার আধুনিকতার সচেতন অনুশীলন লক্ষণীয়। দেবতাকে বিসর্জন দিয়ে মঞ্চে মানুষের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা, পুরাতন সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য নাটকের শক্তিকে নিয়োজিত করা সংস্কৃত নাট্যশাস্ত্রের অনুশাসনকে সজ্ঞানে উপক্ষো করা, যাত্রাব গীতাশ্রু মণ্ডিত ভক্তিরসের পরিবর্তে মানবীয় হৃদয়াবেগের আবর্তকে আশ্রয়, সবই ছিল উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা নাট্যকলার ক্ষেত্রে আধুনিকতার প্রাথমিক পদক্ষেপ। এই চেতনা ক্রমশ বিকশিত হয়ে বাংলা নাটককে বিভিন্ন প্রকার পরিণতি দান করে।

একটা কথা। বাংলা নাটকের ক্রমপরিণতি উদ্দেশ্যের সংশোধনে এবং পরীক্ষিত আঙ্গিকের পরিমর্জনায় যতটা সজাগ এবং সফল, নবনাট্যকলার উদ্ভাবনে তা সমপরিমাণে উদাসীন ও বন্ধ্যা। এক রবীন্দ্রনাথের পরীক্ষা বাদ দিলে বাংলা নাটকের শতাব্দীভেদ নেই, সবই উনিশ শতকী। সংলাপ গ্রন্থনে, কাহিনী নির্মাণে, চরিত্র পরিকল্পনায়, শিল্পগত উৎকর্ষ-অপকর্ষের অর্থে নয়, শুধুমাত্র রীতির বিচারে, মাইকের মধুসূদন ও নুরুল মোমেনের ব্যবধান শতাব্দীগত নয়। মৌখিক বুলির পরিভাষায় একে বড় জোর বলা যায় উনিশ-বিশ। শতবর্ষব্যাপী আমরা আমাদের নাটকীয় ভাবনার মধ্যে জীবনের মাত্র কয়েকটি সরলীকৃত ধারণা স্থান দিতে পেরেছি। সেগুলোর মঞ্চগত রূপায়ণের সাধনা একবার পরিচিত প্রণালীতে সিদ্ধিলাভের পর নতুন কোনো প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনায় মেতে ওঠেনি। মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরীশ, দ্বিজেন্দ্রলাল জ্যোতিরিন্দ্র, অমৃতলাল, রাজকৃষ্ণ, ক্ষিরোদপ্রসাদ এবং আরও পরবর্তীকালের কলিকাতার পেশাদার রঙ্গমঞ্চের জনপ্রিয় নাট্যকারও সকলেই অঙ্গে অঙ্গে এক। এরা চবিত্রে পূর্ণাবয়বতা ও গাঢ়তা আনয়নের জন্য ঘটনা যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বাক্য ও পদ

গঠনের যে কৌশলে ভাষাকে ঝংকৃত মন্দ্রিত করে তোলেন তার মধ্যে পুনরাবৃত্তিমূলক সাদৃশ্য সহজেই নজরে পড়ে। রূপে সকলেই সনাতনপন্থী। এসব নাটকের বাণীও সরল সমাজের সংস্কার সাধন, দেশাত্মবোধের জাগরণ বা মধ্যবিত্তের ভূস্বর্গ পরিবারের পরিবারে ভাবালুতাপূর্ণ সুনীতির উদ্বোধন। দীনবন্ধু কি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে বিশেষ করে তাদের নাটকীয় সংলাপের মধ্যে কখনও কখনও মানুষ্য জীবনের অন্তর্লোকের অনাস্বাদিত জটিলতা ও সূক্ষ্মতার ক্ষণস্পর্শ দ্যুতিময় হয়ে উঠলেও বাংলা নাটকে মাইকেলের কবিতা কি বঙ্কিমের উপন্যাসের জীবনোপলব্ধির বর্ণাঢ্য ইঙ্গিতময়তা অনুপস্থিত।

রাসিন, কর্নিল কি শেক্‌সপিয়রের আদর্শ আমাদের জন্য কোনোদিনই যথেষ্টরূপে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি। আমরা কেবল বড় বড় চিন্তার আবশ্যকীয় সার সবলতম আঙ্গিককে রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে দি— এখনও দিচ্ছি। এই ঐতিহ্যের অপূর্ণতার বিরুদ্ধে আমাদের অসন্তোষের অভাবই নবনাটক সৃজনে আমাদের প্রধানতম অন্তরায়। জীবনের ভোল বদলে গেলেও আমাদের জীবনবোধ পাল্টায় না, পাল্টালেও আমাদের শিল্পচেতনা তার উপযুক্ত আঙ্গিক উদ্ভাবনের আবশ্যকতা অনুভব করে না, সেজন্য তৎপর হযে ওঠে না। অথচ পাশ্চাত্য নাট্যকলার ক্রমবিকাশের প্রতি পর্বে পুরাতনের বিরুদ্ধাচরণ স্বাভাবিক ঘটনা। এই আধুনিক কালেও তার পালাবাদলের একাধিক মহড়া অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। ইবসেনে তার এক মোড়: সুসন্‌জস হৃদয়াবেগের স্বপ্নাচ্ছন্নতা থেকে আধুনিক সামাজিক সত্তার সুতীক্ষ্ণ চিন্তাব প্রশ্নময় জগতে উত্তবণ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংরেজ নাট্যকার বার্নার্ডশ এই প্রবণতাকেওই চূড়ান্ত পরিণতি দান কবেন তাঁর তর্কপ্রধান নাটকে। নির্মম বাক্যবাণে ধূলিসাৎ করে দিতে চাইলেন জগতের পূর্ববর্তী সকল নাট্যকারকে তাঁদের ধ্যান ধাবণাকে, তাঁদের কলারীতিকে। চিন্তাতাড়িত প্রখর সংলাপ বিভিন্নমুখী তত্ত্ব ও সিদ্ধান্তের প্রবল উত্তেজনাপূর্ণ সংঘাত সৃষ্টি করে নবনাটকের সূত্রপাত করল। সকল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানকারী, সুগ্রথিত আদি-মধ্য-অন্ত সমন্বিত সর্বাংশে সুগঠিত নাটকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সূচনা এইখান থেকে। ইটালির পিরান্ডেলো, জার্মান ভাষার ব্রেখট, স্বকীয় জীবনবোধের উপলব্ধিকে সততার সঙ্গে ব্যক্ত করবার জন্য আরও নতুন নতুন আঙ্গিকের জন্ম দিলেন। পিরান্ডেলোর লক্ষ্য প্রেম-প্রীতি-হিংসা-দ্বেষ নয়, লক্ষ্য সত্যানুসন্ধান। বাস্তবতানুভূতির বিভ্রম যে সত্য-মিথ্যার প্রকৃত বিদারণ রেখা সুস্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করে না এই অস্বস্তিকর সিদ্ধান্তই তার প্রতিটি নাটকের প্রতিপাদ্য। এর নাটকের চরিত্রের আদল আলাদা, ঘটনার পরিচর্যা অভিনব। ব্রেখটের অত্যুগ্র উৎকণ্ঠা জীবনের নীতিগত উপলব্ধির অভিসারী, তাঁর প্রয়োগ-রীতি অদ্ভুত ও প্রতীকধর্মী হয়েও ষোলআনা রঙ্গমঞ্চীয়, গুরুগম্ভীর হয়েও রঙ্গময়। ফরাসি দেশের আনুই পিরান্ডেলোর স্বগোত্রীয়, ককতো নব নব রঙ্গমঞ্চীয় কলাকৌশলের আবিষ্কাবের মোহে বিভোর।

অস্বস্তি ও অসন্তোষের তবু শেষ নেই। পিরান্ডেলো, আনুই রেখটও নবতর আধুনিক নাট্যচেতনার পিপাসা পুরোপুরি মেটাতে পারে নি। এমন নতুন নাট্যকারের আবির্ভাব হল যাঁরা প্রত্যেকেই পূর্বতন রীতি ঐতিহ্যের আপোষহীন ধ্বংসকারী। মুরুব্বি সমালোচকরা এইসব সর্বপ্রথা ভঙ্গকারী নাট্যকারদের কাণ্ডকারখানায় বিচলিত হয়ে— এদের অদৃষ্ট অশ্রুত ও অভাবিত প্রয়াসকে অসম্ভব নাটক নামে অভিহিত করে থাকেন। ফরাসি ভাষার আইনস্কো ও ইংরেজি ভাষার বেকেটই এই নবতম নাট্যধারার পুরোহিত। হ্যারল্ড পাইন্টার, এডওয়ার্ড এ্যালবি, জন আর্ডেন প্রমুখ সমকালের বহুসংখ্যক প্রখ্যাত নাট্যকার স্বকীয় শিল্পধর্ম পালনের

তাগাদায় একই পথের পথিক হয়েছেন। এঁদের নাটকে চরিত্র সৃষ্টির গতানুগতিক শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রয়াস অনুপস্থিত, কাহিনীর ধারাবাহিকতা অস্বীকৃত, পরিবেশের স্থানকালের পরিচর্যা অনিয়ন্ত্রিত, সংলাপ অসংবদ্ধ। অন্তত পুরাতন মানদণ্ডে এই রকমই মনে হওয়া স্বাভাবিক। অথচ এই নাটকই বর্তমানে বিশ্বজয় করেছেন। হ্যারাল্ড প্রিন্টারের দি লাভার নাটক আকারে অপ্রত্যাশিত রকম ছোট তিনটি চরিত্র মিলে এক পর্ব ব্যালের মতো এক একটি নৃত্যছন্দ সৃষ্টি করে। স্বামী, পত্নী, প্রেমিকা— এই হোলো তিন সত্তা। মঞ্চের কারসাজির দৌলতে নেচে ওঠে আলো, নাচে কথা, খেলা করে অব্যস্ত কামনার ছায়াবাজি। নিজের আবেগানুভূতির মতোই হাতের ছাতাটা ভাল করে মুচড়ে বন্ধ করে রাখা। ইংরেজ স্বামী শান্তকণ্ঠে নিজের বৌকে মামুলি প্রশ্ন করে তোমার প্রেমিক কি আজ আসছেন ? সংযত-পোশাক, নির্বিকার-আচরণ পত্নী সম্মতির উত্তরে শব্দ করে উম্‌ম। সদ্বিবেচক স্বামীও জানিয়ে দেয় যে সেও সন্ধ্যার আগে বাড়িমুখো হবে না। অবশ্য যাবার আগে প্রকাশ করে যায় যে কিছু সময় তাকেও এক বেশ্যার সঙ্গে কাটাতে হবে। বেশ্যারাই জানে কামনা জানাতে, কামনা জাগাতে। যে কামনা চতুরালি ভরা। দর্শকের কাছে সবটাই একটা পূর্বানুমোদিত পরিমার্জিত ভয়াবহ লেনদেনের মতো মনে হতে থাকে। এমনকি মনে হতে থাকে যেন চতুষ্পার্শ্বের ভদ্রভব্য সুসভ্য পরিবেশই নাটকের কেন্দ্রীয় দুর্বৃত্ত। পরের দৃশ্যে প্রেমিকের প্রবেশ ঘটে। সে অন্য কেউ নয়, স্বামীই। তবে এখন সে সম্পূর্ণ ভিন্ন মানুষ। সে প্রেমিক। ঠোঁটের কোণে সিগ্রেট আলগোছে চেপে ধরে আছে, কোনো দুর্ধর্ষ নায়কের মতো। বনিতাও রূপান্তরিত হয়েছে বারবনিতায়। কামনা জাগানো শরীর সাপটানো ঘন কালো পোশাক অঙ্গে। দুজনেই মেতে ওঠে যৌনস্বপ্নময় নানা রঙ্গেবিভঙ্গে। আসন্ন সন্ধ্যায় মঞ্চ পরিণত হয় দুটি অনুরুক্ত জীবনের ক্রীড়াভূমিতে। নাটকের শেষে পালাবদল করে আবার যে যার প্রতিদিনের বর্ণহীন প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তন করে।

বেকেটের নাটকের নামই 'দি প্লে'। এখানেও চরিত্র তিনটি— পতি, পত্নী ও প্রেমিকা। তিন জনেরই সারা শরীর তিনটি সংকীর্ণ মুখভাণ্ডের মধ্যে ঢোকানো, কেবল মাথা তিনটে বেরিয়ে রয়েছে। বোধ হয় তিনজনেই মৃত বলে কল্পিত। তিনজনই একটানা স্বগতোক্তি ও খণ্ডিত কথোপকথনের মধ্য দিয়ে পরস্পরের পূর্বতন সম্পর্কের জটিলতার বেদনা, কৌতুক ও দাহ বর্ণনা করে, আলোচনা করে, বিশ্লেষণ করে। অন্ধকার থেকে উদগত এক ফালি আলো এক মুখ থেকে অন্য মুখের ওপর ক্ষিপ্র গতিতে প্রতিফলিত হতে থাকে। সেই আলোকচ্ছটায় লাফালাফি কখনও প্রায় কৌতুকের পর্যায়ে পড়ে। একজন মুখের বাক্য শেষ না হতেই ছিটকে পড়ে যায় অন্য আরেকজনের দিকে, অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দেয় তৃতীয় ব্যক্তির গুঞ্জরণকে। সন্দেহ থাকে না যে সর্বদ্রষ্টার নেতৃত্ব থেকে এই রশ্মিফলকের উদ্ভব, যা অনবরত বিদ্ধ করে তিন শবকে। তখন তাদের জীবনের মতোই মরণও আধা-নারকীয় অস্বস্তিতে ভরে ওঠে।

আইনেস্কোর 'রাইনোসেরাস'-এ মানুষ গণ্ডারের দ্রুত গমন দেখে সন্ত্রস্ত হয়, কৌতূহল অনুভব করে এবং ক্রমশ মুগ্ধ হতে থাকে। গণ্ডারের প্রচণ্ড এবং প্রকাণ্ড অস্তিত্ব, তার সর্বসম্পদ লণ্ডভণ্ডকারী প্রমত্ত শক্তিমত্তার বিকাশ তার গগনবিদারী হুংকার এবং তার উদ্যত খড়গের বীভৎস পরাক্রম ক্রমে সবই নাটকের বিভিন্ন চরিত্রকে সম্মোহিত করে। গণ্ডার প্রেমে মগ্ন মানুষ আত্মবিবর্তনের স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণ করে ক্রমশ পুরু ত্বকের অধিকারী হয়, পশুশক্তির উদগমে চঞ্চল হয়ে উঠে, চতুষ্পদের ব্যবহারে তার আগ্রহ জন্মে, কণ্ঠস্বরে জান্তব

কর্কশতা প্রবেশ করে, কপালের বর্তুলাকার মাংসপিণ্ড প্রলম্বিত ও অস্থিযুক্ত হতে থাকে— অফিসে, রাস্তায়, হোটেলে প্রান্তরে দলে দলে মানুষ অপ্রতিরোধ্য বেগে পুরোপুরি গণ্ডারে পরিণত হয়। নাটকের শেষ দৃশ্যে মঞ্চ ভবে যায় গণ্ডারে, কেবল স্নানাগারে আটক শেষ মানুষ বেরেঞ্জাব আত্মরক্ষার নিস্ফল চেষ্টায় আর্তনাদ করে, প্রতিবাদ জানায়; সে গণ্ডার হতে চায় না, সে গণ্ডার জীবনে মুক্তিলাভের অভিলাষী নয়। কিন্তু ক্রমশ তার চিৎকারের ভাষা কণ্ঠ বদলে যেতে থাকে। রুদ্ধ দুয়াবে সে প্রচণ্ড বেগে গুতো মারতে থাকে গণ্ডারের মতো, বিকৃত কণ্ঠস্বর গণ্ডারের গর্জনের মতো গমগম করতে থাকে। এইখানেই নাটক শেষ।

আইনেস্কোর আরেকটি নাটক 'দি পেডেস্ট্রিয়ান অব দি এয়ার'। এই নাটকেও কাহিনীব অনিয়ন্ত্রিত পল্লবায়ন আইনেস্কোর পরিচিত বেরেঞ্জারকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পিত। এক শুভ প্রভাতে বেরেঞ্জার আবিষ্কার করল যে, সে বাতাসে ভর করে উড়তে পারে এবং সে উড়ে চলেও গেল আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তব সীমান্ত অতিক্রম কবে। পর্যটন শেষ করে যখন ফিরে এল তখন ওর অপ্রত্যাশিত প্রতিক্রিয়ার বর্ণনা শুনে সকলেই স্তম্ভিত হয়ে যায়। অতিক্রান্ত জগতের বন্ধকদের সে সহ্য করতে পারে নি, পালিয়ে এসেছে গগণচুম্বী গঙ্গাফড়িংদের আস্ফালন দেখে। এর চেয়ে তাব মতে বাস্তব দুনিয়ার কদর্যতা অনেক ভালো।

'দি কিলার' নাটকেও বেবেঞ্জার সব পেয়েছির দেশ থেকে পালিয়ে আসে কাবণ সে দেশেব নগব-নির্মাতা হৃদয়হীন এবং ঘাতকের কাণ্ডকাবখানা সেখানেও অপ্রতিহত। নিজেব পরিচিত নিরানন্দ নিঃসঙ্গ পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কবেও বেরেঞ্জাবের নিষ্কৃতি নেই। সে আবিষ্কার কবে যে অনুতাপ আচরণে অভ্যস্ত তার শান্ত-স্বভাব অসুস্থ শরীর পুরাতন বন্ধুটিই আসলে ঘাতক। এই ঘাতক আর তার শিকারেব পারস্পরিক অনুধাবনের অর্থযুক্ত ও অর্থহীন উন্মাদনাপূর্ণ দৃশ্য সম্পূর্ণ অপ্রাসংগিক পরিবেশের কোলাহলের পটভূমিতে জীবনের যে বহুবর্ণময় চলমান প্রতিকৃতি রচনা করে তার আবেদন কোনোক্রমেই উপেক্ষা করা যায় না।

এই হচ্ছে আইনস্কো। চেতন নয় অবচেতনই যাঁর মঞ্চে স্বচ্ছ ও সজীব অবয়বে রূপান্তরিত হয়। আধুনিক চিত্রকলায় যে সত্য অনেক দিন আগে থেকেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল রঙ্গমঞ্চে তার অনুপ্রবেশ এতদিনে স্বীকৃতি লাভ করল। স্বাভাবিক ভাবনাব যুক্তিবশ্যতার নিয়ম এখানে অপসারিত। শুধু আছে নাট্যকারের আন্তরিক উপলব্ধির প্রচণ্ডতা, তাঁর প্রদীপ্ত অনুভবের উত্তাপ, তাঁর বিদ্রুপাত্মক দৃষ্টিপাতের বর্ণচ্ছটা। আর সবটাকে জুড়ে আছে একটা অতিকায় অবিশ্বাস্য অসঙ্গত কৌতুকমণ্ডিত শিশুসুলভ সরলতা।

এডোয়ার্ড এ্যালবিব নাটকও একপ্রকার তাই। 'হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ' নাটকে প্লট কাহিনী চরিত্র ঘটনা প্রায় কিছু নেই। এক প্রৌঢ় দম্পতি তাদের কল্পিত সন্তানের জীবনকাহিনী নিয়ে অনর্থক কলহ করে, পরস্পরকে অশ্লীল ভাষায় খামচে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলে, তরুণ বয়সের অতিথি দম্পতির সঙ্গে অশোভন যৌনাচারে লিপ্ত হয়, অবিশ্রান্ত মদ্যপান করে এবং বারবার কেবল উচ্চকণ্ঠে গান গেয়ে ওঠে : হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ, হুইজ এ্যাফরেড অব ভার্জিনিয়া উল্‌ফ! দুশ বিয়াল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী লক্ষ্যহীন সংলাপ আধুনিক জীবনের সর্বাত্মক অর্থহীনতা, মত্ততা ও শূন্যতাকে এক করুণামণ্ডিত ভয়াবহ দৃশ্যরূপের মঞ্চে উদ্ভাসিত করে তোলে।

বেকেটের 'হ্যাপি ডেজ' নাটকের পটোন্মোচনে দেখতে পাই সুপুষ্ট বক্ষ এক মধ্যবয়সী রমণীকে তার কটিদেশ পর্যন্ত মাটির স্তূপের মধ্যে প্রোথিত। হয়ত ঘাসে ঢাকা উচ্চ ভূমিকার

কোটরে লুকোনো কোনো চোরা পাকে পড়ে গিয়ে ক্রমশ তলদেশে চলে যাচ্ছেন। স্তূপের অপর পাশে, দর্শকদের পেছন দিয়ে নির্বিকার চিত্তে স্বামী খবরের কাগজ পড়েন, রোদ বাড়তে থাকলে টুপি দিয়ে চোখ ঢাকেন, ক্লান্তিবোধ করলে অদৃশ্য হয়ে যান। স্ত্রী দাঁত মাজেন, ঠোঁটে রঙ মাখেন, চোখে চশমা এটে ঘাসের ফাঁকে গমনরত পিপীলিকা দেখেন, একটি সুখের দিনের স্মরণে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন। কেবল কথা বলেন এবং কথা বলেন। যুক্তিহীন, লক্ষ্যহীন সূত্রহীন। দ্বিতীয় দৃশ্যেও তাই। কেবল দেহ এবার পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। আর অন্য কোনো বিকার কোথাও লক্ষ করা যায় না। সব শান্ত, সমাহিত, মন্থরগতি, মহিলা কথা বলেন, হাতের ব্যাগ খুলে ভিতরের জিনিসপত্র এলোমেলো চারধারে ছড়িয়ে ফেলে দিয়ে আবার সেগুলো গুছিয়ে তুলে রাখেন এবং কথা বলতেই থাকেন। স্বামীর কোনো সাড়া নেই। এখানেই নাটক শেষ।

এই আধুনিক নাটকের সঙ্গে আমাদের ব্যবধান দুস্তর। তবু পৃথিবী প্রতিদিন সঙ্কুচিত হয়ে আসছে, সংস্কৃতির দুনিয়াত বটেই। পশ্চিমী নাটকের এই নবরূপের আস্বাদন কি আমাদের চেতনায়ও বিবর্তন ঘটাবে? সে বিবর্তন কি আমাদের জন্য সত্য হয়ে উঠতে পারবে, পারলে কি তা কাম্য বলে পরিগণিত হবে? কেবল প্রশ্নই করা যায়, সৃষ্টি প্রত্যক্ষ না করা অবধি উত্তর অনিশ্চিত হতে বাধ্য।

কেন লিখি নি

[ওজুহাত]

এখনও বয়স অল্প। পাণ্ডিত্য অর্জন করবার শক্তি কতখানি আছে গর্জন করে তা জাহির করার স্পৃহা তার চেয়ে অনেক বেশি। অইত যে কোনো সাংস্কৃতিক আসরের কথা শুনলে মন লালায়িত হয়ে ওঠে তাতে অংশগ্রহণের জন্যে। অনুপস্থিত সমালোচকের বাসি বিশ্লেষণের চেয়ে— স্বদেহে, স্বকর্ণে, স্বচক্ষে উপস্থিত সমঝদারদের বলা-না-বলা, আধবলা, হাসি, হাততালি, অভিমত প্রায় প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই পরম উপভোগ্য। যদিও আমি এখনও লিখতে শিখি নি, এমনকি শেখার প্রাথমিক সাধনার শক্তিও আয়ত্ত কবতে পারি নি, তবু সব লেখককে ভুয়ো আত্মস্তুতির ঐ মন্ত্রটাকে সুযোগ পেলেই জপতে শুরু করি। গতকাল তাই যখন অমিয়বাবু এই আসবেব খবব দিলেন তখনই ঠিক করলাম নাটক একটা লিখে ফেলব। মানে অনেক দিন থেকেই ভেতর থেকে একটা লেখার জ্বালা অনুভব করছিলাম। একটা খসড়াও মাথার ভেতর ঘুরঘুর করছিল। অথচ বাইরে থেকে তেমন একটা জোরালো তাগিদ পাচ্ছিলাম না। অমিয়বাবুর আন্তরিক সন্দেহ আমন্ত্রণ আর আমার গোপন আমিত্বের লোভ— দুয়ে মিলে কলম ধরতে বাধ্য করল। প্রায় ঘণ্টা ছয়েক চেষ্টা কবে দেড় পৃষ্ঠা লিখলাম। প্রথম দৃশ্যের প্রথম চরিত্রের প্রথম কথা অবধি তারপর সবটা ছিঁড়ে ফেললাম। কলকাতার বীভৎস হত্যকাণ্ড নিয়ে নাটক লিখতে বসে আমি যা রচনা করেছি সেটা হয়েছে, নাট্যকলাব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নিষ্প্রাণ, পঙ্গু, বিকলাংগ।

কেন হল ? অবশ্য এক্ষেত্রে উত্তর খুব সোজা। আমি লিখতে অক্ষম, হাত কাঁচা, রুচি অপরিণিত তাই, কিন্তু এ অক্ষমতাকে আমি যদি অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ শক্তিমান লেখকদের ওপরও আবোপ করি এবং সমস্ত প্রশ্নটা যদি আমাদেব গত কয়েক বছরের প্রগতিশীল গণসাহিত্যের সামনে দাঁড় করাই তাহলে কতকগুলো খুব জটিল অস্বস্তিকর শিল্পগত মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাব উদ্ভব হয়।

প্রশ্নটাকে আবো ধারালো এবং ঝকঝকে করে তুললেই সমস্যাগুলোর ধরন আঁচ করতে আমাদের খুব অসুবিধা হবে না। দেশের সুস্থ জনগণের প্রতিটা বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে অল্প সময়ের মধ্যে গড়ে উঠেছে গল্প উপন্যাস নাটক। ১৯৪৩-এ সাহিত্যে আমাদের সাহিত্যিকরা চেষ্টা করেছেন মন্বন্তরের ছবি আঁকতে। তারাশংকরের উপন্যাস থেকে আরম্ভ করে পরিমল গোস্বামীব মহামন্বন্তরের ছোটগল্প সংগ্রহ বেরুল মাসিক পত্রিকায়, বিশেষ সংখ্যায় এমন আরও বেরিয়েছে অনেক রচনা। কিন্তু সত্যি কি এর বেশির ভাগ সাহিত্য হিসেবে মেকি এবং দুর্বল নয় ? মন্বন্তর তারাশংকরের সার্থক সৃষ্টি নয়। এর ঘটনা জীবনের সাথে তাল রেখে কোথাও দানা বেঁধে ওঠে নি। এর শেষ শিল্পগত অসম্পূর্ণতায়। ১৯৪৩ কিম্বা ৪৫ বস্ত্রসংকট নিয়ে মানিকবাবুও কোনো জায়গায় তাঁর নিজের ক্ষমতাব পূর্ণ ছাপ একে যেতে পারেন নি। তারাশংকরের 'তিনশূন্যে' মহামারীর যে ছবি আছে, মানিকবাবুর 'হাসিকে' অন্নহীন বিকলাঙ্গ

ভিক্ষুকের লেলিহান ক্ষুধার যে জ্বালা আছে তা দশবছরের সত্যিকারের বীভৎস মন্তরের সময় লেখা রচনায় কোথায়? জীবনের ঐ ক্রূর সত্য রূপটি যখন বাস্তব জীবনে অত প্রকট হয়ে ফুটে উঠল, তখনকার সাহিত্যে তার কোনো শক্তি যুক্ত প্রতিফলন কেন খুঁজে পাই না?

এ প্রশ্নটার গোড়াতেই যদি কোনো গলদ না থেকে থাকে তবে আমি এর উত্তর দাঁড় করাতে পারি—যেটা নিতান্ত আমারি মনগড়া—যেটার ভিত্তি সত্যি সাহিত্যের ওপর স্থাপিত তা নিজের আমি ঠিক বুঝি না। টমাস ম্যান তার Deth in Jenice গল্পের এক জায়গায় একটা কথা বলেছেন, সেটা আমার প্রস্তাবিত উত্তরের পক্ষে সহায়ক হবে বলে মনে করি। তিনি যা বলেছিলেন তার অর্থ অনেকটা এই রকম— শিল্পীকে যদি অন্যের দুঃখের কাহিনীর কথা রচনা করতে হয় তবে তাঁকে এক অর্থে অনভিজ্ঞ নিরপেক্ষ, নির্দয় হতে হবে। অন্যের দুঃখে যদি শিল্পী কেদেই ফেলেন তবে লেখার বুদ্ধির যোগান দেবে কে? কাঁদতে কাঁদতে লেখা যায় না। মনের মধ্যে যদি লেখকের কোনো ব্যথা— আর সে ব্যথা যদি সৃষ্টির ব্যথা ছাড়া অন্য কোনো ব্যথা হয় তাহলে লেখা প্রাণ পাবে না। লিখবার সময় বাস্তব পৃথিবীর সত্যিকারের দরিদ্রটি সম্বন্ধে লেখকের মন যদি সমবেদনায় আপ্লুত থাকে তা হলে সেটা হবে ঐ চরিত্রাংকনের পথে একটু অলংঘনীয় অন্তরায়। লেখকের সহানুভূতি থাকা চাই শুধু তার কল্পনাব মানবটির সঙ্গে (তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক কী সে প্রশ্নের এখন প্রয়োজন নেই)। যত দুঃখজনকই হোক না কেন স্রষ্টার মনে তখন বিরাজ করছে একচ্ছত্র আনন্দ— সেই আনন্দের পথেই পূর্বায়বয়ব চরিত্রটি সত্যিকারের রূপ নিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে।

এই সত্যকেই ভিত্তি করে আমি এগুতে চাই। কোনো কোনো সময় বাস্তব এত শক্তিশালী এবং প্রভাবময়ী হয়ে ওঠে যে স্বাভাবিক অবস্থাতেও তার বেড়াজালে শিল্পীও আর সবার সাথে জড়িয়ে যায়। জীবনের এই বন্ধন থেকে মুক্তি না পেলে চিন্তা বলে আলোকিত করে শিল্পী কী করে জীবনসত্যকে আবিষ্কার করবে? কল্পনার এখানে ডানা কাটা, বাস্তব এখানে নৃশংস এবং নির্দয়। দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবর্তে তলিয়ে যাচ্ছে শিল্পীর সুবেদী সহনশীল অনুভূতি। চিন্তার মান মনের জোর সব চরিত্রের জন্য কোনো অনুভূতিই আর উদ্ধৃত থাকে না। সবটা গ্রাস করে ফেলে রোজকার স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিক। সাধারণের চেয়ে বেশি গ্রহণশীল শিল্পীর যে মন তা এখানে নিষ্ক্রিয়। তাইত তাঁর রচনা বাস্তবের চেয়ে দুর্বল এবং অবাস্তব।

কোলকাতার দাঙ্গা সম্বন্ধে আজই কোনো ভালো সাহিত্য রচনা হতে পারে এ কারণেই আমি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করছি। কোলকাতার নরহত্যার জীবন ১৯৪৩-র মতোই শিল্পী-অশিল্পী সবাইকেই একভাবে প্রভাবিত করেছে। ডাস্টবিনের সামনে মানুষের কুকুরে ঝগড়া, ফ্যান নিয়ে ভাঙা হাড়ির ওপর মায়ে মেয়ে চুলোচুলি— এ নিয়ে ১৯৪৩ কি তার আশেপাশেও যতই চেষ্টাই চলুক না কেন মহৎ সাহিত্য তৈরি হতে পারে সন্দেহজনক। এখনও এগুলো প্রত্যেকের প্রত্যক্ষ দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা যে কোনো ভোতা অনুভূতিও এ দৃশ্যে শিহরণ অনুভব করছে— এর মধ্য দিয়ে জীবনের সারসত্য উদঘাটন খুব বড় শিল্পী ছাড়া এখন সম্ভব নয়। তাইতো আমাদের পাকিস্তান লেখকরা এগুলো এড়িয়ে গেছেন বেশি— আর বাকি বেশির ভাগ লেখকের লেখায় এগুলো এসেছে সাময়িক গতানুগতিকায়ত দুষ্ট বদ অভ্যাস হিসেবে এবং পরে নতুনত্বের লোভে প্রাথমিক উত্তেজনার এ হয়েছে সাহিত্যের বাস্তব জীবনের কল্পনাহীন অনুকরণের বিকৃত ফল। সাহিত্যে বাস্তবতার বিকৃত ব্যাখ্যা এ হয়েছে একটি রূপ। কলকাতা দাঙ্গা আমাদের সবার মনে এখনও রক্ত আখরে লেখা। এ নিয়ে আজই কাব্য রচনা

করা যায় না। কল্পনায় এ দৃশ্যকে গড়ে তুলবার আগেই বাস্তব ঘটনা হুড়মুড় করে ওর ওপর পড়ে সমস্ত সৌধ তছনছ করে দিচ্ছে। শিল্পীর নৈর্ব্যক্তিক হবার কোনো উপায় নেই। তার সামাজিক সত্তা আজ এ বিষয়ে তার শিল্পীর মনের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে অপারগ।

বাস্তব পৃথিবীর হুবহু অনুকরণটা সাহিত্যে বাস্তবতা নয়। বাস্তব পৃথিবীকে কল্পনায় রূপায়িত করে নতুন অনুভূতিতে পুনর্জীবিত করে খণ্ডজীবনের মধ্যে সৃষ্টিরহস্যের সত্যটি ধরে দেয়াই শিল্পীর ক্ষমতার পরিচয়। Ben Jonson-এর alchemist সমসাময়িক লন্ডনের খুটিনাটিতে ভরা। তবু তার বাস্তবতা Shakespeare কে স্পর্শ করার ক্ষমতা রাখে না।

সাময়িকতাটা গুণ না হয়ে দোষ হয়ে দাঁড়ায় বলেই এটা এত নিন্দিত। সাময়িকতাটাকে গুণে পরিণত করতে হলে তাই চাই একটা অপরিহার্য নূতনতম সময়ের ব্যবধান। আজ থেকে আরও পাঁচ বছর হয়ত ১৯৫৩ শের মন্বন্তর নিয়ে সার্থক রচনা সৃষ্টি হলে।[১] বাস্তবতা তখন কল্পনার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে উন্মুখ হয়ে থাকবে। সকলের দৈনন্দিন স্বাভাবিক উদ্যম থেকে নিজেকে ইচ্ছামতন বিচ্ছিন্ন করে শিল্পী জীবনসত্য উদঘাটনের অনাবিষ্কৃত পথটি খুঁজে পাবেন, আবশ্যকীয় অনুভূতি দিয়ে সাজিয়ে জীবনকে শক্তিশালী করে তুলতে পারবেন। সার্বিক সাহিত্য জীবনেরই কিংবা জীবনের চেয়ে শক্তিশালী রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে।

---

১. Great Calcutta Killing day নিয়ে ভালো সাহিত্য রচনা হবার সময় আসতে আসতে হয়তো সাম্রাজ্যবাদীর আরো কয়েকটা নরহত্যার মিশন বিমানযোগে এদেশে এসে ফিরে যেতে পারবে। এ্যানা মেগার্সের Seventh cross, Ellenbarg-এর Fall of Paris, Rainbow এগুলো আকস্মিক আবির্ভাব।

চোর

চোরে না শোনে ধর্মের কাহিনী। ভাবে ও ব্যকারণে একটি সাধারণ বাক্য। প্রথমে ভাব বিচার করা যাক।

চোর অলস নয়। তার জীবন কর্মময়। আমাদের সারা দিন কত কাজ থাকে, মন দিয়ে করি না। চোরের দিনরাত সমান। সে সদা জাগ্রত।

গৃহস্থ ঘুমায়, চোর জেগে থাকে। রাত যত বেশি গভীর হয়, চোর তত বেশি সজাগ হয়। চোর ডাকাত নয়। সে নরহত্যা করে না। তার নীতি আর রাজার নীতি আলাদা। চোর ঢাকী নয়, সে নীরব কর্মী। আমরা অনবরতই ঢাক-ঢোল পেটাই। নিজেরত বটেই, অন্যেরও। প্রতি পদক্ষেপে চোরকে চিন্তা করতে হয়, বুদ্ধি খাটাতে হয়। আমাদের মাসকাবারি বেতরের চাকরিতে অত খাটুনি কেউ করে না। চোরের কদর না করে উপায় কী?

কথা ও কাহিনীর মধ্যে কথার মূল্য বেশি। কাহিনীতে রস বেশি। চোর যে কাহিনীর কাঙাল নয় এটা ওর ধার্মিকতার লক্ষণ। তাছাড়া একা চোরকে দোষ দেব কোন অধিকারে? কে কার কথা শোনে? প্রেমে অনেক জ্বালা, সে কথা কি প্রেমিক শোনে? বিশ্বের কথা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা শোনে? এখন সকলেই জানে যে, কথা মাত্রেই শোনা কথা। শোনা কথা সোনার দরে বিকোয় না।

প্রবাদে উল্লেখিত চোরের বিশিষ্ট স্বভাব যে কেবল ধার্মিকতার লক্ষণযুক্ত তাই নয়, দার্শনিকতামণ্ডিতও বটে। কথা শোনার, বিশেষ করে সৎকথা শোনার নিষ্ফলতা সম্পর্কে তার মনে কোনো দ্বিধা নেই। সে জানে যে তুচ্ছ ধন-দৌলত বিতরণে মানুষ্য মাত্রেরই হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অথচ প্রত্যেকেই নিজের অমূল্য চিন্তাধারা অকাতরে বিলিয়ে দিতে চায়। এ জন্যে চোরের অনেক মাথাব্যথা। কে না জানে যে কথায়, মানুষের মন দূরে থাক, চিড়ে পর্যন্ত ভেজে না। অথচ উপদেশ দান যার ব্যবসা তিনি ধরে নিয়েছেন যে, তাব বাণী শ্রবণ ক'রে সকলের হৃদয় পবিত্র ভাব ধারণ করবে এবং তার ফলে সকল কর্মই পুণ্যময় হবে। এরকম হতে চোর কখনও দেখে নি। শোনেও নি।

ভালো কথার ভক্ত আমরা সকলেই, কিন্তু কাজ করি যে যার মতলব মতো। করি, যে তার কারণ এই নয় যে আমরা জ্ঞানহীন। ধর্মের কথা কখনই দুর্বোধ্য নয়। করণীয় কর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্য গবেষক হতে হয় না; গণ্ডগোলের পীঠস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী না হলেও চলে! তার নির্দেশ পথে-ঘাটে বিবেকে, থাকলে, অষ্টপ্রহর গুতো মারে। অবশ্য তাতে কেউ চিৎপাৎ হয়ে পড়ে যায় না। মিথ্যে কথা বললে পরকালে বহুতর এনাম মিলবে এমন কাহিনী কোনো ধর্মেই নেই, কিন্তু তাই বলে কি মিথ্যা কথার মহিমা মনুষ্যলোকে বিন্দুমাত্র দীপ্তিহীন হয়েছে, প্রণয়ে প্রবঞ্চনা শাস্ত্রানুমোদিত নয় তাই বলে কি মানব-মানবী তার অন্যথা করে? স্কুটারের মিটারে ত ভাড়া ছাপার হরফে লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে, তাই বলে কি তা কখনও মান্য হয়? কোনো চাকরিতেই এমন শর্ত বেঁধে দেয়া নেই যে, ফাইলে ফাইলে

ফিতের গেরো দিয়ে গেলেই কার্যসিদ্ধি হবে, অথচ আমরা কি তার অতিরিক্ত কিছু করতে তৈরি থাকি ? চোরের বিজ্ঞতার বেশি প্রমাণ জড় করা অনাবশ্যক। জ্ঞানের অভাবের জন্য আমরা পাপচারণ করি একথা সত্য নয়। আসলে আমাদের জ্ঞানের প্রকৃতিই ভিন্ন! যে বস্তুর আমাদের অভাব নেই, উপদেশদাতৃগণ সে বস্তুই আমাদের আরও বেশি করে দান করতে চান। এটা ঠিক নয়। তেলে মাথায় তেল ঢালা হোক চোর, তা চায় না। চোরের কর্ণপাত না করার এইটিই হল মূল কারণ।

বাংলা ভাষার এই ভাবপূর্ণ প্রবাদের ব্যাকরণও অনন্যসাধারণ। বাংলা শব্দার্থ, পদগঠন ও পদক্রমের মামুলি সূত্রসমূহ এখানে দুঃসাহসিকতার সঙ্গে লংঘিত হয়েছে। প্রথমেই দেখুন চোর পদটি। চোর বিশেষ্য এবং বাক্যের কর্তা। বাংলায় কর্তৃত্ব সাধারণ চিহ্নহীন বা বিভক্তিশূন্য। কিন্তু এখানে যুক্ত হয়েছে এ বিভক্তি। ভাষাতত্ত্বের ঐতিহাসিক বিচারে এই লাংগুলের উদ্ভব সংস্কৃতের ভাববাচ্য নির্দেশক এন থেকে। চোরবংশ যে কত প্রাচীন ও অভিজাত এ তার এক পরোক্ষ প্রমাণ। পাঠভেদে চোরের পরিবর্তে কখনও কখনও চোরা বা চোরায় পর্যন্ত পাই। ঐ অন্ত্য আকারও স্নেহ বা প্রশ্রয়সূচক। তারপর পদক্রম বিচার করুন। শিষ্ট বাংলায় না-বাচক অব্যয় ক্রিয়ার পরে ব্যবহৃত হয়। এখানে পূর্ববর্তী উপস্থাপনার দ্বারা ভাবে প্রবলতা সঞ্চারিত করা হয়েছে। শোনা এবং পালন করা একই অর্থে ব্যবহার করি। এটা আমাদের মানসিক অসতর্কতা এবং অসাধুতার লক্ষণ। চোর তার চেয়ে অনেক বেশি সৎ ও সতর্ক। গ্রহণ করা দূরে থাক, সে শুনতে পর্যন্ত রাজি নয়। এই মনোভাবই আমাদের সকলের অন্তরকে বিশেষ সততার সঙ্গে প্রতিফলিত করে। প্রকৃতই চোর আমাদের মর্মের সহোদর।

সমকালীন সাহিত্য

সূচি

আবুল ফজল : রেখাচিত্র

রেখাচিত্র আবুল ফজলের আত্মজীবনীমূলক রচনা। এই বই লেখা তিনি যখন শেষ করেন তখন তাঁর বয়স তেষট্টির ওপর। দীর্ঘ কর্মময় জীবনে তিনি অনেক স্মরণীয় ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন, অনেক আন্দোলন ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হন, পারিবারিক জীবনে প্রগাঢ় আনন্দ ও সুগভীর বেদনার আস্বাদন লাভ করেন। বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপুষ্ট এই জীবনের কথাই রেখাচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। এই বই বর্ণিতব্য কালের পূর্ণাঙ্গ সামাজিক ইতিহাস নয়। এমন কি একক জীবনের প্রতিদিনের প্রতিটি ঘটনাব পুঙ্খানুপুঙ্খ খতিয়ানও এটা নয়। এ শুধু রেখাচিত্র। স্মৃতির আঁচড়ে আঁকা। কিছু ভুলে যাওয়া, কিছু মনের মণিকোঠায় জমে থাকা। আত্মজীবনের পূর্ণ বলয়িত কালানুক্রমিক কাহিনী বলা লেখকের মূল উদ্দেশ্য নয়। যে জীবন আজ অতিক্রান্ত তার কোনো কথা কোনো উপলব্ধি কোনো অনুভূতি অকস্মাৎ মনের মধ্যে দ্যুতিময হযে ওঠে, বহু পুরাতন স্মৃতি উন্মথিত হয়, বর্তমান ও অতীত কোনো অদৃশ্য সূত্রে গ্রথিত হয়ে অর্থপূর্ণতা লাভ করে, ভাষা মুখর হয় চিত্রাঙ্কনে। সে ছবিও বহুবর্ণারোপের নয়। নেই এতে কাব্যময় বাক্যবিস্তার বা আত্মদর্শনমূলক তত্ত্বচিন্তা। আছে শুধু সরল ঋজু রেখার আনাগোনা। নিতান্তই সোজাসুজি করে বলা, অতি সহজ কবে বলা। ছোট ছোট কথায় অতি অনায়াসে গেঁথে তোলা।

যে সকল গুণের জন্য আত্মজীবনীমূলক বর্ণনা মূল্যবান হয, গ্রন্থকারের জীবন ও চরিত্রের মধ্যে সেগুলো ষোল আনা বিদ্যমান। বর্ণনার সততা, অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য, প্রকাশের নৈপুণ্য সবই ছিল গ্রন্থকারের স্বভাবজ। আমাদের কালের তিনি একজন খ্যাতিমান পুরুষ। সাহিত্যিক ও শিক্ষক হিসেবে তিনি সমাজেব এক সুবৃহৎ অংশের অতিশয় শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য এবং চরিত্রগৌরব সর্বজনবিদিত। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছব ধবে বাঙালি মুসলমানের শিক্ষিত সমাজে যে ক্রমবিবর্তন সূচিত হয়, তার বিভিন্ন পর্ব প্রয়াস বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আবুল ফজল সাহেবের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। সে বিবর্তনের ধাবা যেমন তাঁকে গড়ে তুলেছে তেমনি আবুল ফজলের চিন্তা ও রচনা বহু স্থলে তাঁব গতিপথকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে, কোনও বিশিষ্ট পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতাই ছিল যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই আবুল ফজলের ব্যক্তিগত জীবনেব সামান্য কথনও বাবে বাবে সমাকালীন সমাজ ও জীবনচেতনার স্বরূপকে উদঘাটিত কবে। গ্রন্থশেষে তাঁব বিনীত নিবেদন 'এ শুধু এক সাধারণ জীবনের রেখাচিত্র, এতে অসাধারণত্বের কোনও চমক নেই।' আমরা গ্রাহ্য করি না। চমক থাকবে কেন ? এতে আলো, অমলিন, অকম্পিত এবং পরিব্যাপ্ত। ওঁর শেষ-উক্তিটিকেই একটু পাল্টে বলতে পারি, সামান্য শিশিরবিন্দুতে যেমন সূর্যালোক প্রতিফলিত হয়, তেমনি তাঁর জীবন-পাত্রেও যুগ-চিত্তের অতি উজ্জ্বল প্রতিফলন ঘটেছে।

রেখাচিত্র চরিত্রচিত্রশালাও বটে। সম্ভবত এই গুণের জন্যই বৃহত্তম সংখ্যক পাঠক এই বইয়ের প্রতি আকৃষ্ট হবে। আবুল ফজল সাহেবের জীবনেব এক বৃহৎ সৌভাগ্য এই যে তিনি মানুষের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার হৃদয়-ঐশ্বর্যের অধিকারী ছিলেন। সকলের এ ক্ষমতা

থাকে না। স্মরণীয় পুরুষের নিকটতম সান্নিধ্য লাভ করেও কেউ কেউ সে বিষয়ে সারা জীবন অচেতন থাকতে পাবে। আবার কারও হৃদয়ের ঐশ্বর্য এত অপাব আব জীবনপিপাসা এত সুতীক্ষ্ণ যে স্বল্প পরিচয়েও সে অন্যকে আপন করে নেয়, নিজের হৃদয়ের অভ্যন্তরে তাকে আসন পেতে দেয়, তার গুণের কদর করে নিজের মনের মহিমায় সামান্য মহিমান্বিত কবে তোলে। সমগ্র বইয়ে চার শতাধিক ব্যক্তিব নামোল্লেখ রয়েছে। এদের মধ্যে অনেকের চরিত্র বর্ণনা অতি বিস্তৃত। কারও কারও বা খুবই সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সকল বর্ণনাই অতিশয় তাৎপর্যপূর্ণ, সরস এবং যুগ পরিবেশ-নির্দেশক। সঙ্গে সঙ্গে তা আত্মজীবনীকারেরও অন্তরঙ্গ সত্তার সংবাদবাহী। শেষোক্ত কারণেই এগুলোর আবেদন এত গভীর।

আবুল ফজল সাহেবের জীবনসাধনার মূলমন্ত্র সততা। কোনো তন্ত্রমন্ত্র বা যোগসাধনার অলৌকিক প্রক্রিয়ার দ্বারা তিনি সত্যোপলব্ধি বা সত্যলাভে প্রয়াসী হন নি, প্রতিদিনের সাধারণ ক্রিয়াকর্মের মধ্যেই তিনি সত্যকে খুঁজেছেন। জীবনযাত্রাব প্রাত্যহিক দায়িত্বেব মধ্যেই বিবেকের মুখোমুখি হয়েছেন এবং সহজ উদার বুদ্ধিতে সত্যকে চিনে নিয়েছেন। ইসলামকে ভালোবেসেছেন অন্তর থেকে, ধার্মিকতাকে মেনে নিয়েছেন স্বাভাবিক আচরণরূপে, সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে কখনই ধর্মাচবণ বলে স্বীকাব করেন নি। সারা জীবনসাধনা করেছেন জ্ঞানের, জেনেছেন তিনি নিযত জ্ঞানান্বেষণেব নিববচ্ছিন্ন শ্রমেব দ্বারাই ধর্ম ও সত্য লভ্য হয, অন্ধতা ও অজ্ঞানতাব দ্বারা নয়। স্বভাবতই এই সকল গুণের চবিত্রশীলবাই সর্বাধিক মর্যাদা লাভ কবেছে বেখাচিত্রে। যেমন তৎকালীন চট্টগ্রাম মাদ্রাসাব অধ্যক্ষ শামসুল উলেমা কামালউদ্দীন সাহেবের চবিত্রচিত্রটি অথবা জনসেবক মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদীব অন্যতম কীর্তি চট্টগ্রামের কদম মোবাবক এতিমখানাব কথা।

একালের অনেক প্রবীণ পরিচিত ব্যক্তি সম্পর্কেও বইয়ে বহু কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা আছে। লঘু ভঙ্গীতে বড় সবস করে সেগুলো বলা হয়েছে। অপেক্ষাকৃত তরুণ পাঠকরা অনেক বয়োবৃদ্ধ সম্পর্কে যেসব জ্ঞান লাভ করবেন, যা তাদেব নিজের আধুনিকত্ব ও সজীবতাব অহমিকাবোধকে প্রশমিত করতে সাহায্য করবে। যেমন আজকের রাশভারি প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুল হক ফরিদী সাহেবের তরুণ বয়সেব চিত্রটি :

> সব ব্যাপারে আবদুল হক ছিল উদ্যোগী। তার শরীরে আর মনে আলসেমি কি জড়তা যেন কোনো পাত্তাই পেত না। আমরা একটা Swimming Club বা সাঁতার সঙ্ঘও করেছিলাম। আর আবদুল হকই ছিল সে ক্লাবের দেহ আর প্রাণ দুইই। বর্ষকালে যখন বুড়িগঙ্গা কানায় কানায় ভরে উঠতো তখন কি আনন্দেই না আমরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়তাম। আর লাগাতাম এপার-ওপার সাঁতবাবার প্রতিযোগিতা। ... কোনো চাঁদনি রাতে ... (পৃ. ১১৩)

অথবা একটি ক্ষুদ্র উল্লেখ :

> এরপর নজরুলের গজল দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা কবা হয়। নজরুল ছাড়া এ সভায় মুসলিম হলের তখনকার ছাত্র আব্বাস আলী খাঁও (বর্তমানে অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ) গান করেছিলেন আর সেতার বাজিয়েছিলেন ঢাকা ইন্টাবমেডিয়েট কলেজের তখনকার ছাত্র কাজী আনোয়ারুল হক (পূর্বপাকিস্তানের প্রাক্তন আই-জি ও চিফ সেক্রেটারি, বর্তমানে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী)।

মোট কথা এই বিচিত্র চরিত্রচিত্রের সম্ভারই রেখাচিত্রের প্রবলতম আকর্ষণ। আমরাও তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থের সর্বাধিক প্রশংসা করলাম।

শহীদুল্লা কায়সার : রাজবন্দীর রোজনামচা

লেখকের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। প্রথম বটে কিন্তু প্রাথমিক রচনার কোনো প্রকার অস্থিরতা, আড়ষ্টতা বা অনবধানতার চিহ্নমাত্র এতে নেই। না থাকাব কারণ এই যে লেখক পরিণত বয়স ও মনের অধিকারী 'আগে অকারণে লেখেন নি, হালে নিজের কারাজীবনের গ্লানি হরণের জন্য অকস্মাৎ গ্রন্থ রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় কারাগার। 'পৃথিবীর মাঝেই আরেক পৃথিবী। এ দেশের মাঝেই আরেটি দেশ। নাম তার অচলায়তন।' অনির্দিষ্টকালের জন্য আটক এই অচলায়তনের বাসিন্দাদের চিন্তাভাবনা ও চালচলন গভীর সমবেদনার সঙ্গে এই বইয়ে চিত্রিত করা হয়েছে। বর্ণনার সহজতম আঙ্গিক হিসেবে লেখক দিনপঞ্জীর সরলগতিকে বেছে নিয়েছেন। আট বছরের কারাজীবনের বেদনার ভার অবশ্যই বিপুল বোঝা হয়ে মনের ওপর চেপে বসেছিল, এই আঙ্গিকের সুবর্ণ সুযোগে সদ্ব্যবহার করে লেখক সেই মানসযন্ত্রণাকে অতি তীব্র গীতিকাব্যিক ভাষায় মনোহররূপে প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো জায়গায় এই গীতিকাব্যধর্মিতা কিঞ্চিৎ নিবারিত হলেও ক্ষতি ছিল না।

একটা ব্যাপাবে লেখক খুবই সতর্ক ছিলেন। রাজনৈতিক মতবাদকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলেছেন এবং আবেগপ্রবণতাকে কখনই এমন কোনো তত্ত্বস্রোতে প্রবাহিত হতে দেন নি যা অরাজনৈতিক বা বিরুদ্ধ রাজনীতির পাঠককে বিরূপ করে তুলতে পারে। লেখকের অপর প্রধান কৃতিত্ব, রোজনামচার আত্মভাব-প্রধান কাব্যিক আঙ্গিকের মধ্যেও তিনি প্রশংসীয় পরিমাণে গল্পনাটকের সচল ঘটনাময় জীবনবৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন।

রাজবন্দীর ভাবনাচিন্তা বর্ণনার প্রধান আশ্রয় হামেদ ভাইয়ের আত্মবিক্ষোভ, কালাম, খলিল, অতীশের অন্তর্জীবন এবং কারাগৃহের সভাসমিতির তর্কবিতর্ক। হামেদের জবানীতে রোজনামচা রচিত হয়েছে। কারাগারের রুদ্ধশ্বাস জীবন সহ্য করার শেষ সীমায় উপনীত হয়ে হামেদ কোনো অগ্নিময় বিস্ফোরণে ফেটে পড়েনি, কেবল আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে নিজের হৃদয় ও অনুভূতি প্রাণহীন প্রতিক্রিয়াহীন নিরুত্তাপ অবক্ষয়কে প্রত্যক্ষ করে। 'কিছুই ভাল লাগে না। বই না। পুস্তক না। মেলা না। গল্প না।... তুই কি বুঝতে পারছিস না কোথায় চলেছি আমি; কান্না ভুলতে ভুলতে এমন করে একদিন আমি যে হাসতেও ভুলে যাব। দুঃখশোকযন্ত্রণা প্রেমপ্রীতি ভালোবাসা এ সব মানবীয় অনুভূতিগুলো হারিয়ে আমার কিছু কি আর অবশিষ্ট থাকবে ?' কালাম রাজনৈতিক কর্মীর মানসিক প্রস্তুতির অসম্পূর্ণতা প্রসঙ্গে তত্ত্বালোচনার অবতারণা করে। যেমন লেখক বা হামেদও জেলখানায় অনুষ্ঠিত নানা সাহিত্যিক দিবসের মিটিংকে উপলক্ষ করে সবিস্তারে নজরুল-রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নিজের ধারণাদি ব্যক্ত করেন। এসব অংশের তত্ত্বগত বা ব্যক্তিগত সামাজিক আন্তরিকতার মুল্য যাই থাক না কেন, গ্রন্থের এগুলো সর্বাপেক্ষা মূল্যবান সাহিত্যাংশ নয়। যেখানে লেখক চরিত্র সৃষ্টিতে মনোযোগী হয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের চিত্ত স্পর্শ করেছেন, মথিত করেছেন। এ রোজনামচা আসলে চরিত্রচিত্রশালা।

সমাজজীবনে ব্যক্তি নানা রকম পেশা বা চাকরির পরিচয়চিহ্ন বহন করে। কারাগারের লৌহকপাট রাজবন্দীর জীবনে সেই পরিচয়ের স্বাতন্ত্র্যকে একাকার করে দেয়। সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবনে ছোট ছোট আচরণই তখন তাকে নতুন বৈশিষ্ট্য দান করে। শহীদুল্লা কায়সার অস্বাভাবিক পরিবেশে নিপীড়িত মানুষের ক্ষুদ্র আচরণ ও খণ্ডোক্তির কুশলী শিল্পী। একটা সামান্য ঘটনার বর্ণনা, কারো আকস্মিক উক্তিব উল্লেখ, কোনো প্রচ্ছন্ন অভিলাষের উদ্‌ঘাটন নিমেষে রাজবন্দীর জীবনের তলদেশ পর্যন্ত আলোকিত করে তোলে, যে জীবন-চেতনাকে লেখক প্রকাশ করতে চান তাব অভিঘাত প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে ওঠে। পরীক্ষার্থী মন্টু প্লেটে করে কারাকক্ষের পায়রাকে নিয়মিত বুট খেতে দেয়; গদা পুত্রস্নেহে বিড়ালকে আদব কবেন, সিগাবেটের অভাবে রশীদ আত্মহাবা হয়, তুমি ক্লাবের মিটিংএ হাসির হুল্লোড় ওঠে, যমুনাতীরে আড্ডা জমে, সংস্কৃত সাহিত্যে উইটেব নমুনা খুঁজে না পেয়ে অতীশের অশান্তির শেষ নেই। খলিল চিৎকার করে ওঠে, 'এ্যা, একি টোস্ট, না জুতোর সুকতল্লি; মানুষের খাবার না ঘোড়ার ফডার ?' ইত্যাদি। সবাই গবমে ঘেমে অস্থিব, কিন্তু ফকীর ভাই, যিনি রাজনীতি কবেন কেবল মন্ত্রিত্বেব অভিলাষে, জেলে এসেই কেবল মাত্র নিজের জন্য একটা বিজলী পাখার ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছেন। এখন তিনি প্রায় নিতম্ব অবধি লুঙ্গিটাকে গুটিয়ে এনে শুয়ে রয়েছেন, শো শো করে পাখাটা ঘুবছে মাথাব ওপব।

পূর্ণতর চরিত্র সেলিম ভাই, খলিল এবং খলিলেব পত্রলেখিকা পত্নী তাহমিনা। বন্দী খলিলের জীবন দুর্বিসহ হয় পত্নীর পত্রাঘাতে। কারাগাবের বাইরে নবজাতক শিশুকে একাকী বুকে জড়িয়ে ধরে এই সাধারণ স্বাভাবিক রমণী বিচ্ছেদের বেদনা ও গ্লা[illegible] করতে না পেবে খলিলকে ক্রমাগত পত্র লিখে চলে :

> কোন্ লজ্জার মাথা খেয়ে তুমি পড়ে থাক জেলে; তোমার বৌ তোমাব ছেলে অপরের আশ্রয়ে অপরের অন্নে কোনও বকমে জীবন ধারণ করে চলছে। এতে কি তোমার পুরুষ মর্যাদা খুব বাড়ছে মনে কর, বলতে পার আপন ভাই আপন বোন ওরা কেন পর হয়ে যাবেন ? মানলাম। কিন্তু লজ্জা সরম তো আমার লোপ পায় নি এখনো। একদিন নয়, দু'দিন নয়, বছরের পর বছর কেমন করে আমি হাত পাতি ওদের কাছে ?... ওরা শুধায় স্বামী কী করেন, কতো মাইনে ? এর জবাবে কী বলব আমি ? আমি কি বলব, স্বামী রাজবন্দী, আহার-বাসস্থান ফ্রি, মাইনে ? রাজবন্দী স্বামীর পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করবে, দুঃখী হয়েও সুখ পাবে, অনাহারী থেকেও তৃপ্তি পাবে তেমন মেয়ে বিয়ে করনি তুমি।...

সেলিমভাইয়ের মনের ওপর আঘাত এত গুরুতের হয়েছে যে, তিনি সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে যান। নিজের বৌ যে নিঃসন্দেহে একটি ছিনাল এ কথা মধ্যরাতে অন্য রাজবন্দীকে ঘুম থেকে তুলে মশারি উল্টে ফিসফিস করে বলতে থাকেন। একদিন :

> ঘরের ভিতরে সেই একই দৃশ্য : এ মাথা ও মাথা দ্রুত হেঁটে চলেছেন সেলিমভাই। হঠাৎ দেখলে মনে হয় হাঁটছেন না, কী যেন জরুরি কাজে দৌড়াচ্ছেন।... সেলিমভাই হাঁটছেন আর ডান হাতের তালু দিয়ে ক্রমাগত ঘষে চলেছেন মাথার টাকটা।...মন্টু...চেঁচিয়ে উঠল, সবে ত বেলা নয়টা, গোসল করবেন সেই বারটায়, এক্ষুনি মাথায় তেল ঘষতে শুরু করেছেন সেলিমভাই ? থক করে দাঁড়িয়ে পড়লেন সেলিমভাই। সাপের চোখের মতো ভয়ংকর দুটো চোখ কী এক জান্তব হিংস্রতায় ধরে

রাখলেন মন্টুর ওপর। চমকে উঠলাম। সেলিমভাইর চোখের ক্ষেত জুড়ে চারাগাছের শিকড়ের মতো সরু সরু অজস্র বক্তাক্ত শিরা। সেই রক্তাক্ত শিরাগুলো ছিঁড়ে যেন বিষের অনল ঝরছে। এক পা-দু-পা করে মন্টুর সিটের দিকে এলেন সেলিমভাই। কাছে এসেই ফেটে পড়লেন, কী বললে? আমি তেল মাখছি। ডু আই অয়েল দ্যাট সন অব এ বিচ? নো নেভার। কোনো শালার তেল মাখিনে আমি। কোনো ব্যাটার তোয়াক্কা করিনে আমি। সেলিমভাই ততক্ষণে অদূরে পুষিদের পরিচর্যারত গদাকে নিয়ে পড়েছেন। ... ল্যাক এ্যাট দ্যাট ম্যান। বয়স পয়ষট্টি বছর। এর মাঝে তিরিশ বছর জেলেই খেটেছে। সেই ইংরেজ আমল থেকে জেল খাটছেন। সো হি থিংকস হি ইজ এ ভ্যালিয়েন্ট প্যাট্রিয়ট। ভাবখানা, এত জেল খেটেছে, আমার দেশপ্রেমে কার সন্দেহ?— কিন্তু গদা লেট আস বি ফ্রাংক, আই কান্ট অয়েল ইউ এনি মোর। দ্যাট ইজ ফাইনাল।... গদা আমি বলছি— গেট ইওরসেলফ রেডি। তৈরি হোন। মোমেন্ট অব ট্রুথ, আপনার আমার জীবনে পরম সত্যের লগ্ন আজ সমুপস্থিত। তৈরি হোন, চূড়ান্ত মুহূর্তের জন্য। আমি রেডি গদা, আপনি তৈরি?

বই ক্রটিহীন নয়। লেখক নিজেও হয়তো দ্বিতীয় চিন্তায় তাঁর অনেকগুলো অনুভব করতে পারবেন। আমরাও কিছু কিছু আভাস দিয়েছি। কোনো কোনো স্থান ভাবলুতায় আচ্ছন্ন, কোনো কোনো ঘটনা অতিনাটকীয়তায় দুষ্ট (যেমন হিমার প্রসঙ্গ) রাজবন্দীর জীবনালেখ্য রাজনীতি বিবর্জিত হওয়াতে আবেদন স্বদেশে অবাধ এবং দূরবিস্তারী হয়েছে বটে কিন্তু বর্ণিত মানুষ সকল সময় শক্ত জমিনে শিকড় গেড়ে সতর্ক পাঠকের বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। তা হোক। পূর্বপাকিস্তানি কারাগার এই প্রথম এক শিল্পীর জন্ম দিয়েছেন, আমরা তাঁর ক্রম প্রকাশ আগ্রহের সঙ্গে অনুসরণ করব। ইতোমধ্যেই লেখকের দ্বিতীয় গ্রন্থ, উপন্যাস 'সারেং বৌ' আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আগামীতে তার গুণাগুণ বিচার করবার সদিচ্ছা রইল।

শহীদুল্লা কায়সার : সংশপ্তক

সংশপ্তক শহীদুল্লা কায়সারের দ্বিতীয় উপন্যাস। আয়তনের তুলনায় এর ঘটনাকাল বা ঘটনাক্রম অসাধারণ রূপে পরিব্যাপ্ত বা অতিজটিল নয়। মোটামুটি দশ-বারো বছরের ঘটনাধারা এতে চিত্রিত হয়েছে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার বছর দশেক পূর্ব থেকে শুরু শেষে পাকিস্তান লাভের দু'এক বছর পর। প্রথম থেকে আরম্ভ করে গ্রন্থের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাহিনীর পট গ্রাম, বাকুলিয়া তালতলি। বাকি অংশে, প্রথমে কোলকাতা, পরে ঢাকা।

মূলত বাকুলিয়ার সৈয়দ সন্তানরাই কাহিনীর ধারক ও বাহক। সৈয়দদের বনেদি গ্রামীণ মুসলিম পরিবার। প্রাচীন প্রথাবদ্ধ সংস্কারানুসরণ এবং ধর্মানুশীলনের ধারার সঙ্গে নবীন ইংরেজি শিক্ষার ও সরকারি চাকরির সমন্বয় সাধনের প্রয়াস সবে এক পুরুষ থেকে শুরু হয়েছে। লেখকের ভাষায় : 'দীনে আর দুনিয়ায়, আখেরাত আব াস্তবের পৃথিবী এ দুয়ের মাঝে প্রত্যক্ষ সমন্বয় সৈয়দ-বাড়ি। চল্লিশের ওপরের মহিলারা সবাই হজ্ব সেরে এসেছেন। কর্তা সৈয়দ দু'দুবার হজ করেছেন। নিজের ইংরেজি ডিগ্রি আর ইংরেজের আপিসে বড় চাকরিটার সাথে লম্বা দাড়ি, লম্বা কোর্তা আর মদিনা শরিফের গোলটুপির লেবাসটটোক অতি সহজে মানিয়ে নিয়েছেন তিনি।' কর্তা সৈয়দ সাহেব থাকেন শহরে, কর্মস্থলে; সৈয়দ-গিন্নি এবং কন্যা আরিফা থাকেন গ্রামের বাড়িতে। ছেলে জাহেদ কলেজে পড়ে, রাজনীতি করে, কালেভদ্রে গ্রামে আসে। কর্তা সৈয়দের ছোটভাই কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। দেশী বিদেশী, ইংরেজি, আরবি, ফারসি, কত বিদ্যে তার। সেই মানুষ, হঠাৎ কী যেন কী হয়ে গেল, তাজা বউ আর তিন মাসের মেয়েটিকে ছেড়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।... কোথায় কোথায় ভেসে বেড়াচ্ছে লোকটা, আজ যদি খবর আসে নোঙব ফেলেছে বেরেলীতে তবে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, চলে গেছে দেওবন্দে। হঠাৎ হয়তো খবর পাওয়া গেল বড় পির সাহেবের মাজার জিয়ারতে গেছে বোগদাদে, সেখান থেকে কারবালায়। শেষপর্যন্ত পুরোপুরি সংসারত্যাগী দরবেশ বনে আস্তানা নেন মাইজ ভাণ্ডারীদের ডেরায়। স্ত্রী মরে গেছে, কন্যা রাবু মিশে গেছে চাচির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। কিশোর মালু এই বাড়িরই এক আশ্রিত ছেলে। বাপ মুন্সিগিরি করে, মা সংসারের ফুটফরমাস খাটে। মালু রাবুকে বলে রাবু আপা, আরিফাকে বড় আপা। আপারা বারো চোদ্দয় পড়ে, পর্দার কড়াকড়িতে গৃহাবদ্ধ হয়। মালু তাদের সাহায্য করে নিয়ম ভাঙতে, মুরব্বিদের চোখে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যায় এ-বাড়ি ও-বাড়ি। মালুর শৈশব থেকে ঝোঁক পালাগান শোনার, নিজের গলায় গান তোলার।

জাহেদ ভাই গ্রামে আসে, অল্পসল্প আদর্শবাদী সেকান্দর মাস্টারকে সঙ্গে নিয়ে, মুসলমান জনসাধারণকে আজাদি লাভের জন্য উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে নানা অঞ্চলে সভাসমিতি করে বেড়ায়। মালুও সঙ্গ নেয়, সে গান গেয়ে শোনায়। তার অনুপ্রেরণার এক উৎস সেকান্দর মাস্টারের ছোট বোন বালিকা রাশু, অন্যজন পার্শ্ববর্তী হিন্দুপ্রধান গ্রামের মেয়ে রাণুদি। গ্রামজীবনের পরিবেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের আনাগোনায়।

এরা হলো, আভিজাত্যাভিমানী হৃতবিত্ত ফেলু মিঞা, তার কুকর্মের দোসর কানকাটা রমজান, বলবান রূপবতী যুবতী ব্যভিচারিণী হুরমতি।

সৈয়দ পরিবারের অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ পরিবেশের মধ্যে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হয় যেদিন দরবেশ চাচা অকস্মাৎ তার সাধনভজন-মগ্ন কম্বলধারী ভাণ্ডারী মোর্শিদদের নিয়ে বাড়ি চড়াও হলেন এবং রাতারাতি এক প্রকার জবরদস্তি নিজের একমাত্র কন্যা লজ্জানম্র ভীত-সন্ত্রস্ত কিশোরী রাবুর সঙ্গে এক দীর্ঘ শ্মশ্রুমণ্ডিত বিশালদেহী বুজর্গের সঙ্গে শাদি দিয়ে দিলেন। সকাল বেলা বাড়ি ফিরে সাধনভজনরত দরবেশদের কাণ্ডকারখানা দেখে জাহেদ অবাক হয়ে যায়। কিন্তু সব কিছু জানার পর নিজের কর্তব্য স্থির করতে বিলম্ব করে না। ডাক দিতেই লাঠিসোটাসহ লেকু দলবল নিয়ে এগিয়ে আসে এবং জাহেদের নির্দেশে বলপ্রয়োগে দরবেশ চাচা, বুজর্গ জামাতা এবং তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের গ্রামছাড়া করে। ধস্তাধস্তিতে জাহেদও সামান্য আহত হয়। জাহেদের এই বাড়াবাড়িতে বাড়ির এবং পাড়ার অন্যান্য মুরব্বিরা তার চেয়ে বেশি আহত হন মনে। মনে এমন কি রাবু পর্যন্ত জাহেদকে অপরাধী মনে করে এইজন্য যে সে তার পিতাকে অপমান করেছে। রাবুর মতে তার ললাট লিখন ধর্মানুমোদিত হলে তা পরিবর্তিত করার চেষ্টা করা জাহেদের পক্ষে অন্যায়, তার নিজের জন্য অমঙ্গলকর।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হয়। আরিফা-জাহেদদের সঙ্গে রাবুও শহরে চলে আসে। নিরন্ন জনতা গ্রাম ত্যাগ করে অন্নের সন্ধানে। মালুও নানা ঘাটে শিক্ষালাভ করে শেষে গিয়ে হাজির হয় কোলকাতায়। প্রথমে, সঙ্গীতানুরাগী আশোকদার মেসে; পরে, আশ্রয় নেয় পল্লীগীতি সম্রাট রকিব সাহেবের ঘরে। দাঙ্গায় বিধ্বস্তা মহানগরীতে সে গিয়ে আবার মিলিত হয় সৈয়দ পরিবারের সঙ্গে, আরিফার তখন বিয়ে হয়ে গেছে পয়সাওয়ালা এক ইনজিনিয়ারের সঙ্গে। রাবু পড়ে কলেজে, যোগ দেয় মিছিলে, মেতে থাকে জনসেবায় জাহেদের কর্মসহচরী রূপে। রাবুর নিজের মুক্তি নিজের কাছে স্পষ্ট হল, যেদিন সে প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বুজর্গ আলহাজ শাহসুফি গোলাম হায়দার মোজাদ্দেদিকে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, অকল্পনীয় দুঃসাহসিকতার সঙ্গে পতিত্বের অধিকার দান করতে সরাসরি অস্বীকার করল। রাবু উপলব্ধি করল যে দেশসেবায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ জাহেদ ভাই হয়তো পতিরূপে প্রাপনীয় নয়, হয়তো কাম্যও নয়, তবুও সেই প্রেমেই আজীবন মগ্ন থেকে তাকে জীবনের ঋণ শোধ করতে হবে। রাবু ফিরে যায় গ্রামে, ঘরে ফিরে আসা দরবেশ পিতার সেবা করতে এবং গ্রাম্য বালিকাবিদ্যালয় গড়ে তুলতে। এদিকে মালু ক্রমে গভীরভাবে মহানগরীর মোহাবিষ্ট হয়। বেতার গায়ক রূপে খ্যাতি অর্জন করে রূপসী রিহানাকে বিয়ে করে অসুখী হয়।

কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে তালতলিতে, যেখানে আবার সবাই একত্রিত হয়েছে। মহামারীতে আক্রান্ত গ্রামবাসীর সেবা করতে গিয়ে রাবুও বসন্তের কবলে পড়ে। মালু জাহেদ এবং হুরমতির সেবায় যখন সে আরোগ্য লাভ করল তখন পুলিস এসে পড়েছে, আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী জাহেদকে গ্রেপ্তার করবে বলে। এইখানেই কাহিনীর শেষ।

এতবড় বিস্তৃত সাম্প্রতিক পটভূমিতে এরূপ একটি পরিপূর্ণ কাহিনী এ যাবত পূর্বপাকিস্তানি কোনো উপন্যাসে এতটা সার্থকতার সঙ্গে রচিত হয়নি। আজকের যে উচ্চশিক্ষিত মুসলিম মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিনিধিবর্গ পূর্বপাকিস্তানি জীবনের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অংশ

অধিকার করে আছে, যাদের আকাঙক্ষা বাসনা প্রত্যহ অন্তহীন সম্ভাবনার নব নব দিগন্ত উন্মোচনে ব্যস্ত, তাদের চেতনা তলদেশ কোন্ অলক্ষ্য সূত্রে, স্থূলতা, কার্যত দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কারে জর্জরিত গ্রামজীবনে বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে, সহস্র শিরা-উপশিরার নিকটতম আত্মীয়তার বন্ধনে সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত সেই সত্যই যেন লেখক সংশপ্তকে উদঘাটিত করতে তৎপর হয়েছেন। নাগরিক জীবনে সাফল্য অর্জনে উদ্যোগী আজকের কর্মলিপ্ত মধ্যবিত্তের উন্মেষ তার উত্থান-পতনের লীলা এবং অবশেষে তার এক বিশিষ্ট পরিণাম সবই যেন লেখক জ্বলন্ত অভিজ্ঞতারূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। এবং তাকে এক সুদীর্ঘ কিন্তু মনোজ্ঞ গল্পাকারে সুসজ্জিত করে আমাদের উপহার দিয়েছেন। প্রচলিত পূর্বপাকিস্তানি উপন্যাসের ধারায় তাঁর এই শিক্ষাগত সাফল্য সর্বোচ্চ প্রশংসার দাবিদার।

উপন্যাসটি যে সর্বাংশে ত্রুটিহীন তা নয়। অতি দীর্ঘ রচনায় সর্বত্র উৎকর্ষের সম্মান রক্ষা করা যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই দুরূহ কর্ম। সংশপ্তকের প্রথমার্ধ শেষার্ধের তুলনায় অনেক বেশি জীবন্ত ও মর্মস্পর্শী। গর্ভবতী হুরমতি শাস্তি স্বরূপ তার কপালে অগ্নিদগ্ধ তামার পয়সা ছ্যাকা দেয়ার দৃশ্য, ধর্ষিতা হবার পূর্বমুহূর্তে সেই বিবস্ত্রা রমণী কর্তৃক রমজানের কর্ণ কর্তন, মুগুরাঘাতে জাহেদ কর্তৃক কম্বলধারী ভজনাকারীদের বিতাড়ন ইত্যাদি দৃশ্য গ্রন্থে যতটা প্রভাময়, নগরজীবনের প্রেমোপাখ্যান বা রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড, এমন কি দাংগার মর্মন্তুদ ঘটনাদি পর্যন্ত তুলনামূলকভাবে তেমন কোনো বিশিষ্ট জীবনদৃষ্টির আলোকে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে নি। তবে, এ সব কিছু গৌণ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা শহীদুল্লা কায়সারকে, তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাসে নিষ্পন্ন অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের জন্য অন্তর থেকে অভিনন্দন জানাই।

গ্রন্থের ভাষা সম্পর্কে দু-একটা কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। হালে পূর্বপাকিস্তানি সাহিত্যে বাংলা গদ্যরীতির যে পরিবর্তন ধারা সুচিত হয়েছে তার এক কোটিতে রয়েছে বর্তমান মুসলমান সমাজে প্রচলিত বা অতীতের পুঁথিসাহিত্যে ব্যবহৃত আরবি ফারসি শব্দ গ্রহণের প্রতি প্রবণতা, অন্য কোটিতে রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক বুলির ঐশ্বর্যকে সাহিত্যিক গদ্যের অন্তর্ভূক্ত করে নেওয়ার প্রয়াস। ভাষার শিল্পগত মূল্যায়নের দান উভয় পর্যায়ের নির্দেশনই শহীদুল্লার গদ্যে বিদ্যমান। তবে ভাষার শিল্পগতমূল্যায়নে এ সবই বাহ্য লক্ষণের পর্যায়ে পড়ে। কারণ, এমন কোনও বিশেষ আরবি-ফারসি শব্দ বা আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গী নেই যা আত্যন্তিকভাবে সুন্দর বা কুৎসিত। ব্যবহারে যখন তা বিশিষ্টতা অর্জন করে, দ্যোতনায় যখন তা অমোঘ বলে প্রতীয়মান হয় তখনই আমরা তা সার্থকতা স্বীকার করে নেই। সে শব্দ বা বুলির উৎসগত জাতবিচার তখন অহেতুক মনে হয়। শহীদুল্লাব রচনার নানা প্রকার নতুন শব্দ, শব্দগঠন ও বাক্যাংশের তাৎপর্যপূর্ণ নির্বাচন আমাদের মনে সাড়া জাগায়। পূর্ববংগের যে বিশেষ অঞ্চল তাঁর কাহিনীর পটভূমি, সেখানকার মুখের বুলিতে এক প্রকার বেগবান প্রবলতা ও প্রচণ্ডতা আছে। আরবি-ফারসি শব্দের মিশালও প্রচুর। তা সত্ত্বেও বিশুদ্ধবাদীদের কাছে মনে হতে পারে যে, সে সব ভাষার অনেক কথাই, কলমে তোলা দূরে থাক, কানে পর্যন্ত দেয়া যায় না। শহীদুল্লাহ কায়সার বাস্তববাদী শিল্পী, বিশুদ্ধাত্মা নন। আমার বর্ণনা থেকেও অনুমেয় যে সংশপ্তকে এমন অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা আছে যা সলজ্জ হৃদয়ে পাঠ্য নয়। যেমন বিষয়ের রূপায়ণে, তেমনি ভাষার গঠনকর্মেও শহীদুল্লা কুণ্ঠাহীন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম তিন চরণই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। পরিবেশ অনুযায়ী আঞ্চলিক বা আরবি-ফারসি শব্দ নির্বাচনে তার লেখনী বড়ই তৎপর।

আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের কিছু নমুনা উদ্ধৃত করে আমাদের আলোচনা শেষ করছি :

> 'পথে পথে চেয়ে মেংগে খান। দিলে তার সদমা এল। পেট ত রীতিমতো কুলহুয়াল্লা পড়ছিল। ওরা তখন বেদিশা। হার্মাদি শুরু করে। কহর দেয়। বেধে গেল তুল কালাম বহস। বয়স আর সুখের ভারে বেশ ওজনী হয়েছেন সৈয়দ গিন্নি। রোয়াব নেই। সোর মচিয়ে। হয়রান মানে। গাঁটরি লয়ে। ছুট দেয়। পুলক পায়। মাছের খোড়ল, করই ভাজি, ঘরের কেবাড়, কসবি, জারবা, কাউয়ের কোয়া, দাদাপিজার দিনে।'

আহসান হাবীব : সারা দুপুর

'সারা দুপুর' আহসান হাবীবের নতুন কবিতার বই এবং চলতি বৎসরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসাবে আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত। এতদসত্ত্বেও একথা বলার অবকাশ হয়তো আছে যে আলোচ্য গ্রন্থটি আহসান হাবীবের কবিকীর্তির শ্রেষ্ঠ নির্দশন নাও হতে পারে। না হোক। তবু 'সারা দুপুরে'র যা মূল্য তা অকিঞ্চিৎকর নয়। একাধিক কবিতায় আহসান হাবিবের বিশিষ্ট কবিমানসের পরিচয় এত অন্তরঙ্গরূপে উন্মোচিত যে তার সংস্পর্শে আমাদের চেতনাও ক্ষণকালের জন্য বেদনায়, অস্থিরতায়, উৎকণ্ঠায় ভরে ওঠে। আহসান হাবীবের কবিতার সারও এই অনুভূতির লীলা। তত্ত্ব নয়, প্রজ্ঞা নয়, উচ্চমার্গীয় সূক্ষ্ম চিন্তার উর্ণা নয়, আহসান হাবীবের কবিতার প্রাণ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনোপলব্ধির এক মৃদু মধুর বিষণ্ন মন্থর প্রবাহ। আহসান হাবীবের কবিতার ভাষারও এই রকম ঐশ্বর্য। আপাতসরল শব্দ ও বাক্যের সম্মোহনে ভাবন চরণে-চরণে দোল খায়, আনুষঙ্গিক অর্থের তীর্যক দ্যোতনায় তার রূপ বদলায়, একই আবেশ শতচক্রে আবর্তিত হয়। উপলব্ধির মর্মকোষে প্রবেশ করার ঐকান্তিক চেষ্টায় তিনি, রাবীন্দ্রিক সমালোচনার পবিভাষায়, অবিরত রূপ থেকে ভাবে, ভাব থেকে রূপে আসা-যাওয়া করেন। এই বলেন পুতুল, একটু পরেই তাকে ডাকেন রানী বলে,

> পুতুল যদিও
> তবু
> হেমন্তের বিকেলের রোদে
> মুখ মুছে
>   নিজ হাত তুলে নেয়
> সোনামাখা ধানের মঞ্জরী দু'চারটি
> যদিও পুতুল।...
> পুতুল।
>   এখন তার সম্রাজ্ঞীর মতন মহিমা!
> শৈশব কৈশোর আর যৌবনের সারা পথ হেঁটে
>   অবশেষে
> সে এখন একযুগ সভ্যতার উজ্জ্বল আকাশ!
> পুতুল বলি না তাকে
> যদিও সে আদিম পুতুল।
> রানী বলি
>   কেননা সে প্রাণের পুতুল।

আহসান হাবীব যতটা জীবন বা সমাজের তার চেয়ে অনেক বেশি মনের কবি, মানসিকতার কবি, মানসাভিসারের কবি। মধ্যবিত্ত নাগরিক জীবনের বহু ব্যর্থতা ও পরাজয়, আকাঙক্ষা ও স্বপ্ন আহসান হাবীবের কাব্যের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু তার প্রকাশ প্রায়শ স্থূল মৃত্তিকার গণ্ডি অতিক্রান্ত, রূঢ় বাস্তবতার সম্পর্ক বর্জিত। সবটাই আভাসেরূপকে, ইংগিতেরহস্যে,

ক্কচিৎ কখনো মৃদু বিদ্রূপেকটাক্ষে লীলায়িত। যেমন,

সামান্য সঞ্চয় ঘর থেকে যা এনে
দিয়েছি বিলিয়ে
তার পায়ে—
নতুন যৌবন বিলিয়ে তৃষ্ণার তীব্র
আগুন জ্বালিয়ে
যে নাগরী নারীয় সম্পান
ঘাটে ঘাটে
নুপুরের ধ্বনি তোলে।...
মনে পড়ে
আর জানে মন,
এই অবারিত দ্বার
প্রেক্ষাগারে
একদা অক্ষম কোনো নায়কের ভুল অভিনয়
নতুন জলের ঢেউয়ে মরা নদী জাগবে; এবং
আঁধার নির্জন ঘাটে আলো দেবে।

ভালো লাগে যখন কবির এই নির্জন নিঃসঙ্গ আত্মবিলাপ দেশজ প্রকৃতির কোনও গুঢ়তম সত্যকে আশ্রয় করে, তার শক্তিকে শব্দের নিবিড় বন্ধনে নিপীড়িত করে যেমন,

আমার
সব গেছে, ঘাটের ময়ূরপক্ষী গেছে আর
পুকুরের মাছ, গোলাভরা ধান নেই, দুধমাখা
ভাতে বসে না কাক,...
মনে হয়, শেষ শিখা সর্বশেষ ঝড়ে
নিভে যাবে, আমি নিভে যাবো। আমার
সমস্ত বুক জুড়ে
যত প্রাণ বেচে আছে আর যত সুরের প্রলেপ
এখনো জারুল আর জামরুলের পাতায় মর্মর
তোলে কিছু
সব যাবে নিঃশেষে ফুরিয়ে।
এ নদী তখন কোনো সরীসৃপ শরীরে মৃত্যুর
অন্ধকার হয়ে রবে।

সারা দুপুরের মধ্যে এই বেদনার উদ্বেলতাই মুখ্য। এই বেদনা কখনও নিদাঘের দ্বিপ্রহরের অতলান্ত শব্দহীন গভীরতাকে স্পর্শ করে, কখনও তার উত্তাল হাওয়ায় মর্মরিত পত্রের হাহাকারকে মূর্ত করে তোলে। কবির এই বিষণ্ণতা যদি আরও কারণিক হত, স্থূলতর সামাজিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যদি কোনো অদৃশ্য সূত্র গ্রথিত থাকতে পারত, অন্তত সেই পটের স্মৃতি পাঠকের মনে জাগরিত রাখবার তাৎপর্যপূর্ণ কাব্যোপায় উদ্ভাবন করতে পারত, তাহলে 'সারা দুপুর' মহত্তর কাব্যে পরিণত হত।

'সারা দুপুরে'র সূক্ষ্মস্নিগ্ধ কবিকল্পনার মর্যাদা, প্রকাশনার মনোমুগ্ধকর পারিপাট্য ও সৌন্দর্য সর্বাংশে রক্ষা করছে।

সানাউল হক : বন্দর থেকে বন্দরে

ভাল ভ্রমণকাহিনী লেখা ক্রমশ কঠিন হয়ে আসছে। আগে যত সহজে বিদেশ দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে অবিমিশ্র হর্ষ ও বিস্ময় উৎপাদন করা সম্ভব ছিল এখন আর তা করা যায় না। গোটা দুনিয়া এখন বহুলোকের ধরাছোঁয়ার মধ্যে। চেনা মানুষরাও হিল্লি দিল্লি পেছন ফেলে বিলাত আমেরিকা, চিন জাপান, ইরান তুরান, রুশ তুরস্ক, মালব আফ্রিকা ঘুরে স্বদেশে ফিরে এসে নিরিবিলি ঘর-সংসার করছেন। অবশ্য সকলের স্বাভাব এক রকম নয়। অনেকেই প্রত্যাবর্তন করেই গ্রন্থ রচনায় মেতে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে পূর্বপাকিস্তানে ভ্রমণকাহিনীমূলক গ্রন্থের সংখ্যা সাম্প্রতিককালে অত্যধিক বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে মনে করেন যে, সামনে বিদেশযাত্রার সম্ভাবনা আমাদের যে অনুপাতে বেড়ে চলেছে এবং ভ্রমণান্তিক ক্লান্তি অগ্রাহ্য করে আমবা যে নিয়মে গ্রন্থ রচনায় মেতে উঠেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে, পুস্তক প্রকাশনার ক্ষেত্রে ট্রাভেলগের জন্মসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এখনি পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত।

একদিক থেকে বিচার করলে ট্রাভেলগ রচনা করা খুব সহজ। নিজেব মাথা থেকে কোনো কাহিনী বা চরিত্র উদ্ভাবন করতে হয় না, উপন্যাসের বাঁধা সড়ক দিয়ে চলতে হয় না, কল্পনা অনুপ্রেরণার বশ্যতা স্বীকার করতে হয় না। কেবল স্বচক্ষে যা দেখেছি, স্বকর্ণে যা শুনেছি এবং আপন মনে যা ভেবেছি তা বিরামহীনভাবে লিখে গেলেই হল। বেশি ভেবে-চিন্তে লেখা হয় না বলে সাধারণ পাঠকরাও এগুলো নির্ভাবনায় পড়তে পারেন, অনায়াসে দূর দেশের সান্নিধ্য লাভ করতে পারলেন মনে করে পুলকিত হন এবং সেই প্রসঙ্গে সমমানের চিন্তার মুদ্রিত প্রকাশ লক্ষ করে গভীর আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। সজাগ প্রকাশকরা যখন আরও লক্ষ করেন যে, আইএ বিএ ক্লাসের অবশ্য পাঠ্যগ্রন্থের তালিকায় একটি করে ভ্রমণকাহিনী পাঠের স্থায়ী ব্যবস্থা করে বাখা হয়েছে তখন তারাও এগুলো তাড়াতাড়ি ছেপে দিতে দ্বিধা বোধ করেন না। লেখাপড়া জানা যে-কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে এরকম অবস্থায় দেশভ্রমণ সমাপনের পর গ্রন্থ রচনার লোভ ও প্রবৃত্তি দমন করা সত্যি কঠিন।

অবশ্য সকল ভ্রমণ কাহিনীই যে এই শ্রেণীতে পড়ে তা নয়। এর মধ্যে তিন-চারখানা এমনও রযেছে যা শিল্পকর্ম হিসেবে উৎকৃষ্ট। ভাল ভ্রমণকাহিনী হবেও তাই। ভ্রমণকাহিনী সাহিত্যেরই একটা বিশিষ্ট শিল্পরূপ, কেবল জাহাজ হাওয়াই জাহাজের সময় তালিকা এবং ভূ-পৃষ্ঠেব মানচিত্রের সংকলন নয়। বহুল পরিমাণ নতুন সংবাদ এতে অবশ্যই প্রত্যাশিত কিন্তু তা পরিবেশিত হবে বিশিষ্ট ব্যক্তিমানসের সরস উপলব্ধির দ্বারা পরিশোধিত হয়ে। কিছু কথা বলা হবে, কিছু বলা হবে না। উক্ত অনুক্তের কৌশলের পরিচর্যার ফলে পাঠকের অন্তবে বিদেশ স্বদেশে পরিণত হবে, স্বদেশ ব্যাপ্ত হবে চরাচরে। হয়তো সব কিছু লুপ্ত করে ভাস্বর হয়ে থাকবে শুধু ভ্রমণকারীর চিত্ত যা একক এবং নিঃসঙ্গ হয়েও বিশ্বের মুকুর। আধুনিক ভ্রমণকাহিনীতে আমরা এই রসেরই অনুসন্ধান করি। গুরুভার তথ্য নয়, তথ্যের

ইশারা; অক্ষ-দ্রাঘিমার নির্দেশ নয়, ঠিকানার নিশানা থাকলেই চলে। ভূগোল নয় খুঁজি মানুষকে, ব্যক্তিকে। বৃত্তান্ত যখন ব্যক্তির অন্তরঙ্গ হয় তখন মনে সাড়া জাগায়। বর্ণনাকারীর চিন্তা ও চরিত্রের ঐশ্বর্য, তার অনুভূতি ও উপলব্ধির সম্ভার রচনার অদৃশ্য কলাকৌশলের সাহায্যে নিজেকে যতটা উন্মোচিত করতে সমর্থ হয় ঠিক ততখানিই সেই ভ্রমণকাহিনী পাঠ্য।

বন্দর থেকে বন্দরে বহুলাংশে সুপাঠ্য একটি মূল্যবান ভ্রমণকাহিনী। লেখক কয়েকজন সহকর্মী-সহ কয়েক মাস ধরে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন শহর-বন্দর পরিদর্শন করেন। দলের সকলেই বিদ্বান, বুদ্ধিমান এবং বিদগ্ধচিত্ত। সকলেই নাগরিক চেতনাপুষ্ট এবং রসিক। বর্ণনার নানা পর্বে এদের আবির্ভাব লেখকের চেতনাকে উদ্দীপিত করে রচনার রস সম্পাদনে সহায়তা করেছে। লেখক নিজে ভাষার সুদক্ষ কারিগর, তাঁর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বিচক্ষণ সমাজবিজ্ঞানীর, তাঁর মানস প্রকৃতি কবি ও ভাবুকের। তিনি যা যা দেখেছেন তার সব কিছু বর্ণনা করা আবশ্যক বোধ করেননি, কেবল যা তাঁর মনকে স্পর্শ করেছে মনের মণিকোঠায় তাকেই ধরে বাখতে চেষ্টা করেছেন। অনেক সময় ভাবনার আলোড়নই রচনায় এত বড় হয়ে ওঠে যে তার উদয়ের ভ্রমণ-বৃত্তান্তমূলক কারণটা নিতান্ত গৌণ এবং তুচ্ছ বলে মনে হতে থাকে। এই বই ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশ হওয়ার যোগ্য নয়। পরবর্তী কোনো বিদেশযাত্রীর জন্য এতে কার্যকর পথনিদেশ বা পরামর্শ লিপিবদ্ধ করা হয় নি। এখানে ভৌগোলিক অস্ট্রেলিয়া যতখানি উদ্‌ঘাটিত তার চেয়ে অনেক বেশি উন্মোচিত গ্রন্থকারের ব্যক্তিসত্তা, যিনি একাধারে কবি, বিদ্বান, রসিক এবং উচ্চপদস্থ রাজকর্মচাবী। নাম যাই হোক না কেন, বন্দর নয় নাবিকই এই গ্রন্থের প্রাণ।

সানাউল হক যে একেবারেই ট্যুরিস্ট নন তা নয়। টুওয়োম্বা ক্যানেবেরা সিডনি মেলবোর্ন শহর-বন্দর, পারমাট্টা কি সোয়ান নদী, ওয়াটল ফুল কিম্বা ব্লু মাউন্টিনের তিনি যথেষ্ট রূপে বিস্তৃত ও যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। তবে মুক্ত মন বেশিক্ষণ তথ্যের তালিকায় আবদ্ধ থাকতে রাজি হয় না। এমন লোকের দেশভ্রমণের ধারণাও আলাদা। 'ভ্রমণ আর ট্যুরিজম ঠিক এক নয়। ভ্রমণের মধ্যে গমনেব স্বাদ, ঘর ছেড়ে মাঠে বেড়ানোর যেমন অন্যতর আনন্দ। ট্যুরিজম, যে কোনো ইজমের মতো অস্থির হাঁস-ফাঁস, অতি দেখার আগ্রহ বিলাস।' তাই মন ছুটে যায় পারমাট্টা নদীতে দমকা বাতাসে উড়ে যাওয়া বন্ধুর বিলাতি টুপি খোঁজে, ধিক্কার দেয় মেলবোর্নের স্যাঁতস্যাঁতে বিলাতি আবহাওয়াকে, রঙ্গ করে নব বিবাহিতের প্রবাস জীবন নিয়ে, উৎকণ্ঠিত হয় কোনো বিরহিণী বিদেশীর জন্য। 'বন্দরে বন্দরে এমনি কত মুখের দর্শন, কত মানস তর্পণ এবং কত না মনের স্পর্শন।' ক্রমাগতই ভ্রাম্যমাণ মানস বিষয়ের সামান্যতমসূত্র আশ্রয় করে প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে ভেসে বেড়ায়। হয়তো কোনো সহযাত্রীর প্রবল রসোল্লাস দেখে লেখক বিমর্ষ হন। মন্তব্য করেন—

> এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা সূক্ষ্ম রসানুভূতিও নিঃশব্দে উপভোগ করতে পারেন না। কাব্যে ও গানের আসেরও তারা দাঁত বার করে হাসেন, গলা ফাটিয়ে বাহবা দেন। আপনি যদি চুপ থাকেন, হয়তো কাঁধে এমনি ঝাকুনি দেবেন যার অর্থ, সাড়া দিচ্ছ না যে, নেশা করেছে না কি?

আত্মগত চিন্তার অনুরূপ প্রকাশ সমগ্র বইয়ে অজস্র ছড়ানো রয়েছে। বন্দর থেকে বন্দরে যে

এত সুপাঠ্যতার মুখ্য কারণও এগুলোই। নমুনা স্বরূপ আরও কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করছি :

জাহাজের লেখকের চিন্তা আপন মনে দোল খায় :

সমুদ্রযাত্রা আসলে যাত্রাই নয়, গতিশীল গৃহবাস। দেহ-মন এলিয়ে দেবার রম্য পরিবেশ। কাস্টমস আওতা-বহির্ভূত ভাসমান সমুদ্রবক্ষে সিগ্রেট (এবং সুরা) জলের দরে বিকোয়।

চোখ খোলা রেখে ঘুরে বেড়ালে পদে পদে স্বদেশের সঙ্গে নানা প্রতিতুলনা মনের মধ্যে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য খাদ্যতালিকার একঘেঁয়েমি অসহ্য মনের হবার কারণ,

ঋতুতে ঋতুতে নতুন মাছ, নিত্য নতুন তরিতরকারির সঙ্গে বদলায় আমাদের খাদ্যতালিকা। বর্ষায় যা ঘটা করে খাই, শীতে তা পাতে নেই না। সংসার দরিদ্র হলেও সম্ভ্রান্ত আমাদের খাদ্যরুচি।

বিদেশে বৃদ্ধদের উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ জীবন লক্ষ করে মনে ভাবনা জাগে,

এখানে ভোগপ্রমত্ত জীবনে ঝামেলার দুর্ভোগ পোয়াতে কেউ রাজি নয়। প্রতি রাত্রে যাদের রয়েছে ক্লাব ডিনার বা সিনেমা, শনি-রবিতে যাদের ছুটতে হয় সি-বিচে, পর্বত শিখরে বা পিকনিকে, বুড়ো বাবা-মা-দাদা-দাদির দিকে পিছন করে তাকানোর তাদের সময় কই। যৌবন আনন্দ মুখের দৈনন্দিনকে এরা কখনো জড়তার সংস্পর্শে ব্যথাতুব করতে চায় না।... সম্মুখাভিসার পথে গুরুজনদের আশীর্বাদ ছাড়া আমাদের চলে না। সামনে আমরা যতই এগোই পেছনের বন্ধন হয়তো শিথিল হয়, কিন্তু আলগা হয় না। যোগসূত্রের দূরতম সম্পর্কটুকু টিকে থাকে। আমাদের চলার পথে তাই প্রচুর মানা নিষেধ, অনেক বন্ধন ক্রন্দন। আমরা গুণে গুণে পা ফেলি, ধীরে সুস্থে এগোই। যুবা বৃদ্ধ আমরা যৌথ কারবারে বিশ্বাস। যৌবনের প্রোপ্রাইটারশিপের চেয়ে আমরা বার্ধ্যক্য ও যৌবনের পার্টনারশিপেই বিশ্বাসী। ফসকে যেতে পারিনি বলে আমরা টকে এগোতে পারিনি।

আবার পশ্চিম দেশের মানুষকে যখন অকাজে মাতোয়ারা হতে দেখেন তখন লেখক তার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হন :

কর্মবিমুখতা নেই বলে রোনোদের মর্মব্যথা কম। কাজের বিরাগ নেই তাই অকাজে এদের এতো অনুরাগ। হালাল রুজি করে বলেই ছুটির পুঁজি এরা এমন বেহিসাবীভাবে খরচ করতে পারে। অফিসে ঢুকলে যেমন এদের বাইরের খেয়াল তাকে না, ছাড়া পেলে তেমনি কেউ আর পিছন ফিরে চায় না।

আমাদের ব্যাপার অবশ্য আলাদা। আমাদের কাজের দিনে ছুটি, ছুটির দিনে কাজ। অফিসে বসে আড্ডা দিতে আমরা যেমন ওস্তাদ ছুটি দিনে ফাইল চষতেও আমরা তেমনি কর্তব্যনিষ্ঠ। আসল কথা, আমাদের জীবনে উপভোগ নেই, কেবলি দুর্ভোগ। আমরা না পাই কাজের আনন্দ, না ছুটির আমেজ। সোমবার আমাদের কাছে আপদ, অথচ রবিবার নয় কোন সম্পদ। আমাদের কী যে বিপদ।

এক ব্যাপারে ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না। ওরা কমঠ এবং উদ্যমশীল, বিরামহীন প্রয়াসের দ্বারা প্রকৃতির দান শতগুণ বর্ধিত করে নিজেদের উন্নতির বুনিয়াদ গড়ে

তোলে। আমরা স্বতন্ত্র প্রকৃতির।

> আল্লার সৃষ্টির পর স্বদেশে মানুষ কদাচ হাত লাগায়। আমাদের দিঘিতে যত পদ্ম ফুটুক, ঘাটের শ্যাওলায় পা পিছলানোর ঝক্কি কিন্তু চিরদিনের। ... আমরা তোয়াকুল্লাহ, আল্লাহ ভরসা, ওরা বাহু বিশ্বাসী।

দৃষ্টান্ত অধিক উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। বিপরীতার্থক ভাবের দ্বন্দ্বে স্পন্দিত সরস বাক্য রচনায় সানাউল হক সিদ্ধহস্ত। বাংলা গদ্যের অনবদ্য কারিগর প্রমথ চৌধুরী হয়তো সানাউল হকেরও প্রিয় লেখক হবেন। তবে কেবল বিচ্ছিন্ন উক্তির প্রখর দ্যুতির মধ্যেই গ্রন্থের আবেদন সীমাবদ্ধ নয়। সানাউল হক কবিও বটে। গ্রন্থে ছড়া ও কবিতার ছড়াছড়ি। সবই স্বরচিত। টুওয়োম্বো নগর দর্শন সমাপ্ত হলে লেখেন :

> কোথায় আমার দেশ, কোথায় টুওয়োম্বো
> এখানে বাছুর তবু ডাকে কেন হাম্বা।
> এখানে যুবতী মেয়েদের সাথে
> চোখাচোখি ঘটে যদি সিঁড়ির গোড়াতে
> কেন সেই অতিচেনা লজ্জার লাল
> নিমেষে রাঙিয়ে দেয় জোড়া জোড়া গাল
> এখানেও ঘুঘু আর ঘুঘুনীর এক সাথে ঘোরা
> নিজ কীর্তি উচ্চারণে এরা কেউ নয় মুখ চোরা।
> কোথায় আমাদের দেশ কোথায় টুওয়োম্বা
> ফলের দোকান জুড়ে এখানেও ঝুলে কেন রম্ভা।

বইয়ে কিছু শব্দের বানান আঞ্চলিকতা দোষদুষ্ট। পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করবার সময় সাবধান হলে এগুলো সহজেই এড়ানো সম্ভব হত। গ্রন্থকারের কোনো কোনো চিন্তা একটু উপদেশাত্মক বা সদ্ভাবমূলক। সব সময় তা রচনার রম্যতার অনুকূল হয় নি।

গ্রন্থের প্রচ্ছপট ও শিরোনাম অংকনে উৎকৃষ্ট রুচি ও মৌলিকতার পরিচয় রয়েছে। ছাপা ও বাঁধাই অতি উত্তম। ভাল বই সুন্দর পরিপাটিরূপে প্রকাশিত হতে দেখে সবাই আনন্দিত হবেন।

রণেশ দাশগুপ্ত : শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে

গ্রন্থে চারটি প্রবন্ধ আছে। সাহিত্য, শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে, আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ এবং আকর্ষিত শিল্পীচিত্ত। দ্বিতীয় আলোচনাই গ্রন্থের মুখ্য বিষয়, আয়তনেও এটি সবচেয়ে বড়। প্রথম প্রবন্ধ তার তত্ত্বমূলক ভূমিকা, শেষের দুটি মূল তত্ত্বের বিশিষ্ট প্রয়োগের ব্যাখ্যা। এই কারণে বিভিন্ন সময়ে স্বতন্ত্রভাবে রচিত ও প্রকাশিত হলেও প্রবন্ধগুলি একত্রে একটি সুসঙ্গত পূর্ণাঙ্গ তত্ত্বালোচনার অবয়ব প্রাপ্ত হয়েছে।

পূর্বপাকিস্তানে সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্রন্থ বেশি প্রকাশিত হয় নি। হলেও তার অধিকাংশই ইতিবৃত্ত জাতীয় বা বর্ণনাভিত্তিক। তাতে বিভিন্ন লেখকের নির্বাচিত রচনাসমূহের শিল্পগত বিশ্লেষণ ও মূল্যায়নই লভ্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতিব বৃহত্তর পটভূমিতে শিল্প ও সাহিত্যের মৌল প্রকৃতি সম্পর্কে তত্ত্ববিচারে পণ্ডিত গ্রন্থকারগণ উদ্যোগী হন নি। যে স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ সাম্প্রতিককালে রসতত্ত্বের আলোচনায় প্রয়াসী হয়েছেন তাঁদেব মধ্যে প্রায় সকলেই অধ্যাপক। যেমন সৈয়দ আলী আহসান, সৈয়দ আলী আশবাফ এবং আলাউদ্দিন আল আজাদ। তাঁদের রচনাও আয়তনে ক্ষীণ এবং মূলত বিধিবদ্ধ গবেষণার রীতি অনুসারী। কেবল আলাউদ্দিন আল আজাদই অনেক স্থলে সমাজ-সচেতন শিল্পানুরাগীর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সাহিত্যের তত্ত্বাশ্রয়ী মূল্য বিচারে প্রবৃত্ত হযেছেন।

রণেশ দাশগুপ্ত অধ্যাপক নন। তিনি সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও সাহিত্য-রসিক। এই কারণে তাঁর রচনার স্বাদও স্বতন্ত্র। তাব ওপর তিনি বিশিষ্ট মতবাদে আস্থাবান। তাঁর সমগ্র জীবনদর্শন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের সুনির্ধারিত প্রত্যয়েব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাঁব সাহিত্যচিন্তা তাঁর সমাজচিন্তারই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। শিল্পকর্মের সকল প্রশ্নের মীমাংসা তিনি সমাজতন্ত্রের মূল সূত্রসমূহের সাহায্যেই নিষ্পন্ন করেছেন। এই হিসেবে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। গতানুগতিক সাহিত্যালোচনার পরিমণ্ডলে এই বই এই গুণের জন্য স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকাবী।

এই কাজ সহজ ছিল না। প্রথমত তত্ত্বালোচনা মাত্রেই দুরূহ কর্ম। সহজ সত্যেরও আন্তরমূল্য উদঘাটনের চেষ্টা দুর্বোধ্যতায় পর্যবসিত হওয়াব আশংকা থাকে। বিশেষ করে সেই প্রসঙ্গের পরিভাষা যদি বহু ব্যবহাবের দ্বারা একটা স্বাভাবিক অর্থবোধকতাকে প্রতিষ্ঠিত করে না থাকে। রণেশ দাশগুপ্তের রচনার এইটেই হল কঠিনতম পরীক্ষা স্থল। তাঁর বিশিষ্ট চিন্তার স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁকে নিজস্ব প্রকাশভঙ্গী আয়ত্ত করতে হয়েছে। অপেক্ষাকৃত অপরিচিত পারিভাষিক শব্দ ও বাক্যাংশের গুরুভার পরিহার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। অনেক দীর্ঘ এবং জটিল বাক্যের ব্যূহ ভেদ করে অর্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা বহু পাঠকেব জন্যই শ্রমসাধ্য বিবেচিত হবে। তবে একবার প্রবেশ করতে পাবলে এর আবেদন তীব্রভাবে অনুভব হবে। কারণ রণেশ দাশগুপ্ত কোনো যান্ত্রিক চিন্তার দাস নন। তাঁব সাহিত্যপ্রীতি যেমন গভীব তাঁব বসাস্বাদনেব প্রবণতাও উদার ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত। যে

সমাজদৃষ্টি ও সাহিত্যপিপাসার মধ্যে তিনি সমন্বয় অনুসন্ধান করেছেন তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি নিজেই বলেছেন।

> 'সাহিত্যের নাড়ির বন্ধন রয়েছে অন্যান্য শিল্পকলার সঙ্গে। শুধু তাই নয়। নাড়িতে নাড়িতে বাঁধা সে সাধারণভাবে সংস্কৃতির সঙ্গে, মানবতার সঙ্গে, সমগ্র মানব-সমাজের গতি বিস্তারের সঙ্গে। সাহিত্যকে বুঝবার জন্য তাই সমগ্র মানব সমাজের বিকাশ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন সংস্কৃতির জন্য বৃদ্ধির ইতিবৃত্ত জানার। সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে জানতে হয়, মানবীয় প্রবৃত্তি আবেগ ও অনুভূতিকে, মানবদেহকে। জানতে হয় মনন বা চেনতার স্বরূপকে। সঙ্গে এদের সবাইকে নিয়ে প্রকৃতিকে।
>
> আলোচনার মাঝখানে এদের মাত্রাধিক্য হলে সাহিত্যবিচার চাপা পড়ে সমাজতত্ত্ব ভারী হয়ে যেতে পারে। অথচ মানবসমাজ, সংস্কৃতি, মনন বা চেতনা এবং মানবদেহ সমেত পরিবেশের ইতিহাসসম্মত ও পরস্পর নির্ভর গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করতে না পারলে আমরা কোনো জিজ্ঞাসার কিনারা করতে পারবো না। আমাদের সাহিত্য চিন্তায় মোটামুটি একটা সর্বাত্মক পটভূমি আনতেই হবে। কারণ ফতোয়া দিয়ে আজকালকার সমৃদ্ধমনা মানুষকে প্রবোধ দেয়া সম্ভব নয়। নতুন সমাজের নতুন মানুষ সমগ্রভাবে জীবনকে গড়ে তুলবার জন্য এগিয়ে আসছে।'

এই জন্যেই তিনি বিশ্বাস করেন যে সাহিত্যের সামগ্রিক সংজ্ঞার নাম সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদ। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি শিল্পীর স্বাধীনতাকেও বিচার করেছেন। তার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজে ব্যক্তিস্বাধীনতা পদে পদে খণ্ডিত। কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রই শিল্পীচিত্তকে স্বাধীনতার অভাবিতপূর্ব নব নব দিগন্তে পৌছে দিতে সমর্থ। কারণ কেবল সেই নতুন ব্যবস্থাতেই 'চেতনাতে এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার সর্বজন সম অংশীদার।' সমাজতন্ত্রে যখন সকলের যৌথ সত্তা মুক্তধারায় বহু ব্যক্তিকতাকে পূর্ণ বিকশিত করে তুলবে শিল্পীর একক বিকাশও তখন হবে যথার্থভাবে স্বাধীন, সম্ভাবনাময় এবং পূর্ণ বলয়িত। এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বর্তমান সমাজের শিল্পীর আত্মদ্বন্দ্বকে লেখক নানা দিক থেকে বিচার করেছেন এবং নিজের সিদ্ধান্তকে পরিপুষ্টতা দানের জন্য অস্কার ওয়াইল্ড, উইলিয়ম মরিস, টমাস হার্ডি, রোমা রলা ও রবীন্দ্রনাথের মানস প্রকৃতিকে একাধিক সংক্ষিপ্ত ও সুতীক্ষ্ণ বাক্যের দ্বারা পরিস্ফুট করে তুলেছেন। সমগ্র বইয়ের ঐশ্বর্যও এইখানে। লেখক যে কেবল সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের প্রধান লেখকদের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেই নিজের মতো প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট হয়েছেন তা নয়, ইংরেজ, আমেরিকান, ফরাসি ও জার্মানি সাহিত্যকদের প্রতিও ঘনঘন দৃষ্টিপাত করেছেন।

আধুনিক চিত্রকলা ও জনগণ প্রবন্ধটি আকারে খুব ছোট হলেও এর মূল প্রশ্নটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সাম্প্রতিক চিত্রকলার বিমূর্ত ধারা সম্পর্কে আমাদের সংশয়কে একটা সুনিয়ন্ত্রিত সুসমঞ্জস উপলব্ধিতে পরিণত করতে সাহায্য করে।

যদিও লেখক বিমূর্ত চিত্ররীতির ভক্ত নন এবং বিশ্বাস করেন যে শিল্পকর্ম দুর্বোধ্য হলে এবং *তার আবেদন বৃহত্তর মানব সমাজকে আলোড়িত করতে না পারলে ব্যর্থ সৃষ্টি বলেই* বিবেচিত হবে তথাপি রণেশ দাশগুপ্তের শিল্পোপলব্ধি অনুদার বা সংকীর্ণ নয়। কারণ তিনি

জানেন যে আধুনিক চিত্রকলার প্রখ্যাত শিল্পীরা বিমূর্ত ছবির পাশাপাশি দিয়ে এসেছেন অবিকৃত মূর্তি ও প্রতিরূপকেও। তাঁবা এঁকেছেন অসংখ্য ও অজস্র প্রতিরূপ, যেগুলো উদ্ভট কিংবা কিম্ভূতকিমাকার তো নয়ই, বরং সুষমার সুমিত ও আনন্দঘন ভঙ্গিমার অভিব্যক্তি। কুশ্রী ও কদাকারের প্রতিচ্ছবিও শিল্পীর দরদী মনের সংস্পর্শে স্বাভাবিক ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আঙ্গিকের প্রতিরূপলংঘী অদ্ভুতত্ব সত্ত্বে সমাজের মানুষ প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে নাড়ির যোগসূত্র রক্ষা করে বলেই ভ্যানগগ ও পিকাসোর সৃষ্টির জগৎজোড়া এত কদর। আধুনিক চিত্রকলা সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাবের ভোল বদলের কৌতূহলোদ্দীপক কারণ প্রদর্শন করে রণেশ দাশগুপ্ত বলেন, আধুনিক চিত্রকলাকে ধনিকতন্ত্রের তাত্ত্বিকরা শুরুতেই নেতিবাচক মনোভাব নিয়ে দেখে নাকচ করে দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে সমাজতন্ত্রী বাস্তববাদের সংশ্লেষিত গণশিল্পরূপের বিরুদ্ধে তাঁরা এই বিমূর্ত চিত্রকলাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করাতে গিয়ে নিজেদের বক্তব্যকে ঢেলে সেজেছেন। এঁদের মধ্যে যাঁরা সেবা শিল্পী তাঁদের সম্পর্কে গ্রন্থকারের শ্রদ্ধা অপরিসীম। কারণ তিনি মনে কবেন, 'আধুনিক চিত্রকলার নানান, মিশ্রিত উপকরণের মধ্যে বিভিন্ন ধারার যে পারম্পরিক রীতি-লঙ্ঘন প্রবণতা কাজ করে চলেছে, তার মূল গতিটা হচ্ছে ব্যাপকতম জনগণের অনিরুদ্ধ বিকাশ ও মুক্তিরই গতি।'

আমরা ইচ্ছে করেই এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় গ্রন্থ থেকে বহুল পরিমাণে উদ্ধৃতি ব্যবহার করলাম। কারণ রণেশ দাশগুপ্তের শিল্পবিচার পদ্ধতির পূর্ণ পরিচয় লাভ করতে হলে বারবাব তাঁর রচনা পড়তে হবে। এবং একবার আলোচ্য বিষয়ের দুরূহতা আয়ত্তাধীন করতে পালে নিজের চিন্তায়ও এক নতুন পরিমার্জনা ও প্রগাঢ়তা সম্পাদিত হয়। তখন গ্রন্থাকারেব শিল্পবিষয়ক সকল সমীকরণের সঙ্গে একমত হতে না পারলেও তাঁর পাণ্ডিত্য, রসবোধ, বিশ্লেষণশক্তি এবং সততায় মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ :
নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা

পূর্বপাকিস্তানে গুরুগম্ভীর সাহিত্যসমালোচনা অধ্যাপকরাই বেশি করেন। রচনা হিসেবে সেগুলো বেশ ওজনদার হয়। বিতর্কমূলক অজস্র সন-তারিখের উল্লেখ এবং অসংখ্য পাদটীকার নির্দেশে এগুলোর সর্বাঙ্গ কণ্টকিত। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহর বই এই শ্রেণীর নয়। আকারে বা প্রকারে কোনো অর্থেই নয়। একশ বিশ পৃষ্ঠার পরিমিত আয়তনের মধ্যে, আধুনিক বাংলা কবিতার একজন সচেতন এবং সমজদার পাঠক হিসাবে গ্রন্থকার নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তার কয়েকটি বিশ্বাস এবং ধারণাকে হৃদয়গ্রাহী ওজস্বিতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। গবেষকের অনুসন্ধান বৃত্তির দ্বারা তাড়িত হয়ে সর্ববিধ প্রমাণপঞ্জি আহরণ করবার জন্য ব্যস্ত হন নি, বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সম্ভাব্য সকল স্তর-বৈচিত্র্য পরীক্ষা করার আবশ্যকতাবোধ করেন নি। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে লেখক একটা সংকীর্ণ উদ্দেশ্যের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন এবং সেই অনুসারে সকল যুক্তি সিদ্ধান্ত শৃঙ্খলিত করেছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহর 'নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা' বিদ্রোহী কবির জীবন কাব্য বা মানসের ওপর কোনো সামগ্রিক পূর্ণাঙ্গ আলোচনা গ্রন্থ নয়। লেখক সে-রকম দাবিও করেন নি। তিনি ভূমিকায় বলেছেন :

> ইদানীং পশ্চিমবঙ্গের কোনো কোনো সাহিত্য সমালোচকের রচনায় নজরুল প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অস্বীকারের প্রয়াস লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। রবীন্দ্রেতর আধুনিক বাংলাকাব্যের নতুন ধারা সৃষ্টিতে নজরুলের ভূমিকা যে পথিকৃৎ এর এ সত্যও তাঁরা অস্বীকার করছেন। উল্লিখিত সাহিত্য সমালোচকদের বক্তব্য যে মূলত ভ্রান্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত বর্তমান গ্রন্থে সে সম্পর্কে আলোকপাতের চেষ্টা হয়েছে। আধুনিক বাংলাকাব্যের পটভূমিতে নজরুলকাব্যের বৈশিষ্ট্য এবং নজরুলের সমসাময়িক ও উত্তরসুরি কবিগোষ্ঠীর ওপর তাঁর প্রভাব সম্পর্কে বর্তমান গ্রন্থে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় যে, আধুনিক মুসলিম কবিদের ওপরই নজরুল কাব্যের প্রভাব সমধিক— সে প্রভাব বর্তেছে বিষয়বস্তুগত ও ঐতিহ্যের সূত্রে ... ইত্যাদি।

গোটা বইটাই এই ভ্রান্ত প্রতিপক্ষের এক জোরাল জবাবের ঢঙে লেখা। সে কাজ লেখক বেশ দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করেছেন। মাহ্‌ফুজউল্লাহর বক্তব্য সর্বত্রই স্পষ্ট এবং অনেক স্থলেই কেবল যে জোরাল তাই নয়, ধারালও বটে।

সূচিপত্র নেই বটে তবে বইয়ে তিনটে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ আছে। তাদের আলাদা আলাদা শিরোনামও মুদ্রিত হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধ, পটভূমি। দশ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধে সমগ্র বাংলাকাব্যের ক্রমবিকাশ বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে 'সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা, মুসলিম পুনর্জাগরণের প্রেরণা এবং সর্বোপরি নির্যাতিত

মানবতার উদ্বোধন নজরুলের কবিচিত্তে' যে অর্থে যে বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল তেমন আর কখনো অন্য কবির ক্ষেত্রে ঘটেনি। দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম : নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা। এইটেই মূল প্রবন্ধ। সত্তর পৃষ্ঠার এই আলোচনায় লেখক বলেছেন যে রাবীন্দ্রিক ললিতগীত কল্লোলের বিরুদ্ধে প্রথম সবল ও সার্থক বিদ্রোহ ঘোষণা করেন নজরুল ইসলাম। যাঁরা নজরুলের পরিবর্তে এই বিদ্রোহের গৌরব সত্যেন্দ্রনাথ বা মোহিতলাল বা যতীন্দ্রনাথ সেনের উপর আরোপ করতে চান তাঁদের মতামত কী পরিমাণ ভিত্তিহীন তা ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলাকাব্যে মুসলিম সাধনা। এই অংশে নতুন পুরাতন, পূর্বপাকিস্তানের প্রায় সকল কবি সম্পর্কেই কোনো না কোনো রকম মন্তব্য করা হয়েছে। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্ কেবল সমালোচক নন, তিনি কবিও বটে। সমসাময়িক কবিদের সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত স্বভাবতই অনেক পাঠক মনোযোগের সঙ্গে পড়তে আগ্রহ অনুভব করবেন। এই বইয়ের সীমাবদ্ধতা এই জায়গায় যে লেখক নিজের বক্তব্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন কবির রচনারীতি ও মানসপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করেছেন অত্যধিক পরিমাণে সাধারণীকৃত বা জেনারেলাইজড বৈশিষ্ট্যের ঢালাও বর্ণনার দ্বারা। মূল বক্তব্য সংকীর্ণ হবার জন্য মুখ্য মন্তব্যগুলোর কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মাহ্‌ফুজউল্লাহর বইয়ের আকর্ষণীয় গুণ এর রচনাপ্রণালীর বেগবান ও অনর্গল প্রবহমনাতা। তার ওপর নজরুলের পূর্বপাকিস্তানি ভক্ত পাঠকমাত্রই গ্রন্থে নিজের মনের প্রতিধ্বনি আবিষ্কার করে আনন্দিত হবেন।

মোহাম্মদ মোর্তজা : প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক

মোহাম্মদ মোর্তজার 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক' বইটির রঙিন প্রচ্ছদপট, খর্ব আকৃতি এবং সরস শিরোনাম একাধিক অর্থে ভ্রান্তি-উৎপাদক। জনপ্রিয় অর্থে বইটি আদৌ রসাল নয়। বইটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, বহুবিধ তত্ত্বচিন্তায় সমৃদ্ধ এবং সাহিত্যানুপ্রাণিত হৃদয়ের দরদ দিয়ে লিখিত। বইয়ে দুটো প্রবন্ধ আছে। প্রায় সমান আয়তনের। প্রথম প্রবন্ধে লেখক বিবাহের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। দেশ-বিদেশের সামাজিক রীতিনীতি এবং আচার-ব্যবহার ক্রমবিবর্তন বর্ণনা করে সমাজতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিসমূহ একত্রিত করে এই সত্য প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেছেন যে বিবাহের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো দাম্পত্য বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সংবাদটি প্রকাশ্যে প্রচার করা। সংসারধর্ম পালনের, বংশরক্ষা করার, মানবজীবনের ধারা নিরবচ্ছিন্ন রাখার, আত্মসুখ ও প্রতিষ্ঠা অনুসন্ধানের এই সমাজ সংগঠনের সংকল্প প্রকাশ্যে ঘোষণা করার নামই বিবাহ। বিবাহের প্রকৃতিই এমন যে এ বস্তু গুপ্ত থাকলে সত্য হয় না, কেবলমাত্র ঘোষিত হলেই স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। স্বীকৃতি দানকারী শক্তি অবস্থাভেদে সমাজ ও সমাজপতি, ধর্ম ও ধর্মনেতা অথবা রাষ্ট্র ও তার আওতাভুক্ত অফিস। সমাজে নারীর হীনাবস্থা এবং পুরুষের স্বার্থপরতা কী অর্থে আমাদের বৈবাহিক সম্পর্কেব মধ্যে নানা প্রকার আবিলতা সৃষ্টি করেছে লেখক তা নির্মম স্পষ্টভাষিতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। আপাতদৃষ্টিতে কেউ নিজেকে সুখী বলে বিবেচনা করলেই সে সুখ ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নিতে লেখক রাজি নন। এ ব্যাপারে তাঁর অতি প্রখর ও অকুণ্ঠ অভিমত হলো এই যে :

> এই ধরনের অবস্থায় যাহা আপত্তিকর তাহা তাহারা অসুখী বলিয়া নহে, আপত্তিকর কেননা সেমত অবস্থায় মানুষের জীবনপরিধি ক্ষুদ্রতর হইয়া আসে, অনেক সময় অপমানকর অবস্থায় নামিয়া যায়। বেশ্যাবৃত্তি আপত্তিকর, তাহারা অসুখী বলিয়া নহে, তাহারা মানবীয় বিচারে অপমানিত, তাহাদের জীবনপদ্ধতি জঘন্য বলিয়া। ভিক্ষাবৃত্তি অন্যায়, ভিক্ষুকগণ অসুখী বলিয়া নহে, তাহারা মানবতার কলঙ্কস্বরূপ বলিয়া। দারিদ্র্যকে উৎখাত করার প্রচেষ্টা মানবীয়, কারণ দারিদ্র্য মানুষকে পদাঘাত করিয়া ধুলায় মিশাইয়া দেয়, দরিদ্ররা অসুখী বলিয়া নহে। সেইভাবে, বিবাহে মানসিকতার অস্বীকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, ব্যবহারিক সমাজ এবং তৃতীয় পক্ষের অযথা চাপ প্রয়োগের রীতি নিন্দনীয়, ইহার ফলে দম্পতিগণ অসুখী হইয়া পড়ে বলিয়া নহে, নিন্দনীয়, কারণ ইহাতে জীবনের উপলব্ধি ব্যাপক ও প্রকৃত হইয়া উঠিবার সুযোগ পায় না। ইহার ফলে জীবন সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার পরিধি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে।

এই শাণিত যুক্তিবাদের পরিচ্ছন্ন প্রকাশ গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষণীয়। লেখকের জীবনানুভূতির সরলতা এবং প্রকাশভঙ্গীর পারিপাট্যের অতি প্রীতিকর পরিচয় পাওয়া যায় বইয়েব দ্বিতীয় ভাগে। পাণ্ডিত্যের চেয়ে কৌতুকমণ্ডিত পর্যবেক্ষণশক্তির তীর্যক প্রয়োগ বিভিন্ন সিদ্ধান্তকে একটা সাহিত্যিক মর্যাদা দান করেছে। একটা লঘু অনাসক্তি এবং নৈর্ব্যক্তিকতাব প্রলেপ

লেখকের মনের খেয়ালিপনাকে গোপন রাখতে পারে নি। বিজ্ঞাপনপ্রবুদ্ধ সত্যান্বেষী লেখক আমাদের এ প্রশংসায় খুশী না হতে পারেন, পাঠক হিসাবে আমরা লাভবান হয়েছি। কী কী পরিস্থিতিতে প্রেমের উদগম সচরাচর লক্ষ করা যায় লেখক তার তালিকা প্রস্তুত করেছেন। যেমন,

> রোগ বা দুর্ঘটনাজনিত বৈকল্যের সময় সেবা বা সাহায্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রেমভাব জাগিয়া থাকে, কেবলমাত্র প্রচারের জোরে দুইজনের মধ্যে প্রেমভাবের সৃষ্টি করা যাইতে পারে, অনেক সময় লাগিয়া থাকিলে হৃদয় জয় করা যায়, অনেক তরুণ-তরুণী প্রেমে পড়িতে না পারিলে মনে মনে দুঃখানুভব করিয়া থাকে ইত্যাদি। সাহিত্য জগৎ থেকে দৃষ্টান্ত আহবণে লেখক বিশেষ পটু। যেমন বলেছেন যে, অনেক পুরুষ আছে যাহারা প্রভুত্বকারিণী স্ত্রীলোক পছন্দ করে। বাঙালি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন এই ধরনের পুরুষ। তাঁহার বিখ্যাত নারীচরিত্রগুলিব অধিকাংশ এই পর্যায়ের।

অন্যত্র উল্লেখ করেছেন—

> সকলের ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতা প্রেম সম্পর্ক স্থাপনের যোগ্য নহে। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল-এ গোবিন্দলাল প্রেমিক। সে তাহার স্ত্রী ভ্রমবকে ভালবাসিয়া ছিল। সে রোহিনীকেও ভালবাসিয়াছিল। উভয়ই তাহার পক্ষে সম্ভব এবং তাহার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সহিত সঙ্গতিশীল। কিন্তু হরলাল সম্পূর্ণ বিপরীত পুরুষ। সে কার্যোদ্ধারের জন্য রোহিনীকে ধোঁকা দিয়েছিল। সে যে কেবল রোহিনীকেই ভালবাসে নাই বা বাসিতে পারে নাই তাহা নহে, সে কাহাকেও ভালবাসিতে অসমর্থ। তাহার মানসিক গঠন ও প্রকৃতি তাহার অনুকূল নহে। সেইজন্য যাহা গোবিন্দলালের পক্ষে বারবার করা চলে হরলালের পক্ষে তাহা একবারও করা চলে না।

এই সকল উদ্ধৃতি, দৃষ্টান্ত ও বিশ্লেষণের দ্বারা যে উপলব্ধি লেখক আমাদের মধ্যে জাগ্রত করতে প্রয়াস পেয়েছেন সে হলো এই যে, নরনারীর প্রেমভাব জাগ্রত হওয়া না হওয়া অনেক পারিপার্শিক অবস্থাবলী ও তাহাদের মানসিক গঠনের একটা বিশেষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল এই প্রকৃতি সেই বিশিষ্ট ক্ষণের জন্য ধরিতে হইবে। ঠিক এইজন্য প্রেম ক্ষণস্থায়ী হইতে বাধ্য। অবশ্য এটাই লেখকের শেষকথা নয়। পরিবর্তনশীল প্রেমাবস্থার পরমরমণীয় পরিণতির সম্ভাবনার সুসংবাদও তিনি পরিবেশন করেছেন। গ্রন্থকারের নিজের ভাষায় :

> জীবনের ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধতা অথবা ঘটনা পরিক্রমার সংঘাতে নরনারীর যে ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে তাহা প্রেম অপেক্ষা আরও নিবিড় ও দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। উহাই আমাদের কাম্য। হইতে পারে যে এই পরিপক্ব নিবিড়তার সূত্রপাত হইয়াছিল প্রেমের মধ্য দিয়া কিন্তু ইহা প্রেম নহে। প্রেম এই সাধনালব্ধ ঘনিষ্ঠতার গভীরতা পরিমাপ করিতে পারে না।

মোহাম্মদ মোর্তজা : জনসংখ্যা ও সম্পদ

মোহাম্মদ মোর্তজার 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত। লেখকের এই ধরনের আরেকটি বই নিয়ে কিছুকাল আগে আমরা আলোচনা করেছি। তার নাম 'প্রেম ও বিবাহের সম্পর্ক'। তথ্যবহুল তত্ত্বচিন্তাপূর্ণ পাণ্ডিত্যমণ্ডিত গ্রন্থ রচনায় মোহাম্মদ মোর্তজা সিদ্ধহস্ত। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও চেতনা যেমন তেজোময় তেমনি ক্ষুরধার, যেমন, সুদূরপ্রসারী, তেমনি ক্ষিপ্র গতিসম্পন্ন। তাঁর বইয়ের নাম যাই থাক না কেন, আসলে তাঁর সকল রচনারই মুখ্য বিষয় সমকালের স্বীয় সমাজ, তাঁর জরা-ব্যাধি-বিকার। মোর্তজার বই যে এত প্রকার সংখ্যানকসা পাদটীকায় কণ্টকিত হয়েও চিত্তাকর্ষক হয় তার কারণও এই অবলীলাক্রমে তিনি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে প্রবেশ করেন, সমাজজীবনেব যাবতীয় সমস্যা সম্পর্কে নিজের প্রিয় সিদ্ধান্তসমূহ প্রবল ওজস্বিতা এবং মনোহর বক্রতার সঙ্গে ব্যক্ত কবতে থাকেন, এবং অনেকক্ষণ বিষয়বস্তুর অতিবিস্তারের মধ্যে অবাধে বিচরণ করার পবও এত স্বচ্ছেন্দে মূল প্রসঙ্গের আওতার মধ্যে ফিরে আসতে জানেন যে তখন প্রসঙ্গচ্যুতিব অপবাদ তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারে না। লেখাও বড় সরস। মোহাম্মদ মোর্তজার খোলসটাই কেবল বৈজ্ঞানিকের, আপাতদৃষ্টিতে যা অপক্ষপাতমূলক আবেগহীন নৈর্ব্যক্তিকতায় অটুট। মোর্তজার রচনারীতি যে অন্তরকে প্রকাশ করে তার স্বরূপ সম্পূর্ণ আলাদা। লেখক মোর্তজা কল্পনাপ্রবণ, রাগে-রোষে উদ্দীপ্ত, সংস্কারে-বিশ্বাসে সমভাবে আন্দোলিত। তাই মোর্তজার 'জনসংখ্যা ও সম্পদ' বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের বই নয়। সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, গণতন্ত্র, একনায়কত্ব, শিল্পায়ন, নারীস্বাধীনতা, ধর্ম, মোক্ষকাম সর্বপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থকার পরিবার পরিকল্পনার সারবত্তা বিচার করেছেন। সেজন্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন প্রচুর। একাধিক ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত এই পাণ্ডিত্যের তারিফ করবেন। কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে আমাদের পাওনাটা উপরতি, সেটা এর সর্বাঙ্গীণ সরসতা। লেখকের মূল বক্তব্যটি খুব স্পষ্ট। 'পরিবার পরিকল্পনার কোনো পৃথক সত্তা নেই। এটা সামগ্রিক জীবনদর্শন ও পদ্ধতির সঙ্গে একাঙ্গীভাবে জড়ীভূত। সেইজন্যই এই পরিকল্পনা নিয়ে এককভাবে এগোতে গেলে ফললাভ অসম্ভব।' তাঁর মতে পরিবার পরিকল্পনার সমস্যা একটা সামাজিক সমস্যা, যান্ত্রিক সমস্যা নয়। অনেকের ধারণা জন্মনিরোধে ব্যবহৃত জিনিসপত্র সস্তায় ও সহজে সাপ্লাই করতে পারলেই সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। এ ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। পরিবার পরিকল্পনার স্তরে পৌছুতে হলে সমগ্র সমাজ তথা গোষ্ঠীকে একযোগে পরিবর্তিত হতে হবে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে, দেশের শিল্পায়ন ত্বরান্বিত করতে হবে, একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও জোর প্রচারণা চালাতে হবে। একযোগে সকল দিকে অগ্রসরলাভের আয়োজন না করে শুধু জনসংখ্যা বৃদ্ধির পথ বন্ধ করে দিলেই আপনা থেঁকে দেশের উন্নতি সাধিত হবে না। এ যুগে মানুষের আত্মশ্রেষ্ঠতা সম্পর্কে বিশ্বাস টলে গিয়েছে। সজ্ঞানে সচেতন হয়ে সচেষ্ট না হলে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। লেখকের ভাষায়, মানুষ বিশ্বাস করতে বাধ্য

হয়েছে যে, তার জন্মগত শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তার দম্ভ অযৌক্তিক। কপার্নিকাস, ফ্রয়েড, ডারউইন, ম্যালথাস এবং আরো অনেক মনীষী বারেবাবে আমাদের গতানুতিক বিশ্বাসের মূলে নাড়া দিযে আমাদেব বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে বিশ্বে মানুষের অবস্থা ও অবস্থান জন্মগত অধিকারেব বলে প্রতিষ্ঠিত হয় না, এটা তাকে সুপরিকল্পিত কঠোর পরিশ্রমেব দ্বারা অর্জন করতে হয। মানুষকে উৎকর্ষ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে হবে জীবনেব সর্বক্ষেত্রে একই সঙ্গে এবং একই কঠোবতায়। 'সংখ্যাবৃদ্ধির অনিয়ন্ত্রিত হার কখনো কখনো এই উৎকর্ষ অর্জনেব একটা বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় বলে তাকে একটা সীমা ও সময়সাপেক্ষে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। এটা সৃষ্টির মূলনীতিব সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল।'

মোহাম্মদ মোর্তজা : চরিত্রহানির অধিকার

গ্রন্থশেষে ঔপন্যাসিক গল্পের পটভূমি সম্পর্কে এক দীর্ঘ সমাজতত্ত্বমূলক প্রবন্ধ সংযোজিত করেছেন। সেই অজুহাতে আমিও গ্রন্থালোলোচনার পূর্বসূত্র স্বরূপ গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে উন্মোচিত করতে চাই। মোহাম্মদ মোর্তজার পেশা ডাক্তারি। রোগেব কারণ নিরূপণ এবং তার নিরাময়ের নির্দেশদানের মধ্য দিয়ে তিনি বিচিত্র নরনারীর ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেছেন, ব্যক্তি ও সমাজকে এক বিশিষ্ট দৃষ্টিতে পরীক্ষা করবার ক্ষমতা অর্জন করেছেন। তা ছাড়া মোহাম্মদ মোর্তজা সমাজতত্ত্ববিদও বটে। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজের গতি ও প্রকৃতি উপলব্ধির প্রয়াসে তিনি ক্লান্তিহীন। তাঁর সমাজতত্ত্ববিষয়ক বচনা তথ্যসমৃদ্ধ, যুক্তি-নির্ভব এবং সিদ্ধান্ত-পরিপুষ্ট। মোহাম্মদ মোর্তজা একই সঙ্গে চিকিৎসক ও সমাজতত্ত্ববিদ। উপন্যাস-রচনার শিল্পকর্মে উদ্যোগী হয়েও তিনি তাঁব মানসিকতাব এই দুই মৌল প্রবণতাকে পরিত্যাগ করেন নি। কাহিনীর বিষয় নির্বাচনে, গ্রন্থনবীতিতে এবং পরিণাম নির্দেশে তাঁর স্বাক্ষর সুস্পষ্ট।

চবিত্রহানির অধিকাবের নায়ক মালেক। জমিদার-বংশে জন্মলাভ করেছিল বটে তবে পবিবাবগত ঐশ্বর্যেব কণামাত্র তার ভাগ্যে জোটেনি। অভিশপ্ত পিতৃগৃহে সে জন্মকাল থেকেই উপেক্ষিত এবং অবহেলিত। বাল্য বয়সে পিতার মৃত্যুর পর লাঞ্ছনা ও নির্যাতন যখন আরও বৃদ্ধি পায় তখন সে গৃহত্যাগ করে। পিতৃবন্ধু বিত্তবান ডাক্তার রফিক তাকে আশ্রয়দান করতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু অভিজাত বংশীয়া পত্নীর বিরূপতা আশংকা করে অনাথের হিত সাধনে বেশি আগ্রহ প্রকাশ না করাই নিরাপদ বিবেচনা করেন। তবুও খোরাকির বিনিময়ে কিশোর মালেক ড. রফিকের বালিকা কন্যার গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়। ইংরেজি স্কুলে পড়া মেয়ে মালেককে সমীহ করে বলার কোনো কারণ দেখে না। কন্যার মাতা এই এতিম বালককে গৃহভৃত্যের অধিক মর্যাদা দানের আবশ্যকতা বোধ করে না। মালেকের মনে স্পষ্ট গেঁথে গিয়েছিল, প্রথম দিন তার নাস্তা দেয়া হয়েছিল একটা বাসনে করে মুড়ি, এক পাশে একটু গুড় আর একগ্লাস জল।... কিছুদিন পর মুড়ির পরিবর্তে এল চালভাজা... আরও কিছুদিন খাওয়ার পর একদিন সে দেখল তার নাস্তার বাসনে কিছু চাল ও একটুখানি গুড়।... খাওয়ার সময় তাকে যে পরিমাণ ভাত দেওয়া হতো তাতে কখনো একজন লোকের খাওয়া চলতে পারে না। যে তরকারি দেওয়া হতো তাতে সেই অল্প পরিমাণ ভাতও খাওয়া চলে না। কখনো তরকারি একেবারেই থাকত না শেষে অন্নজলের এই ব্যবস্থাটিও লোপ পেল। একদিন সকালে পড়াতে এসে মালেক দেখল ড. রফিকদের বাড়িতে তালা ঝুলছে। ড. রফিক বদলি হয়ে অন্য জেলায় চলে গেছেন এবং যাবার আগের দিন পর্যন্ত মালেককে সে সম্পর্কে কোনোরকম সংবাদ দেন নি। মালেকের কিশোরজীবনের এই পটভূমি উপন্যাসের প্রথম বিশ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিবেশ মালেকের চরিত্র গঠনে কী প্রভাব বিস্তার করেছিল তার ইঙ্গিত দান করে লেখক বলেছেন—

'সে স্পষ্ট দেখতে পেল এই পৃথিবীতে তাকে টিকে থাকতে হলে তার এতদিনের

অপরিচিত বৃহত্তম পৃথিবীর সীমাহীন বৈচিত্র্যের মধ্যে তাকে মিশে যেতে হবে। আর মিশে গিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য তিলে তিলে গড়ে তুলতে হবে। ঘটনাচক্রের সে নির্মূল সেকথা সত্য কিন্তু টিকে থাকবার দুর্দমনীয় কামনার হাতছানি যাতে তাকে মরীচীকার মতো ঘুরিয়ে নিয়ে ধ্বংস করে ফেলতে না পারে তার জন্য তাকে যথাসম্ভব মাথা উঁচু কবে রাখবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করতে হবে। এই প্রচেষ্টায় কোনো রকম অসাবধানতা ও শৈথিল্য যেন তার পক্ষ থেকে প্রশ্রয় না পায় সেদিকে তাকে নিরবচ্ছিন্ন তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হবে। আঘাত মালেককে নষ্ট করতে পারে নি, বরঞ্চ তাব চরিত্রকে শক্ত এবং সবল করে তুলতে সাহায্য করেছে।'

এরপরই মালেকর সঙ্গে যখন আমাদের সাক্ষাৎ হল তখন সে পূর্ণ পবিণত যুবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জনপ্রিয় কৃতী ছাত্র। যেমন সুন্দর বক্তৃতা দেয় তেমনি সুলেখক হিসেবেও উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান অর্জন করেছে। অন্যান্য অনেক মেয়ের মতোই প্রথম বর্ষের ছাত্রী ড. রফিকের কন্যা রোকেয়া ইসলামও মালেকের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু বোকেয়ার রূপে প্রীত হওয়া মালেকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ সে ছিল চলনে বলনে উগ্র আধুনিকা। সাজগোজের প্রণালী লজ্জাহীন এবং যখন বাংলা বলতে চেষ্টা করত তখন উচ্চারণ হত বাঁকা বাঁকা, ভাষা হয়ে উঠত দোআঁশলা। কিছু নমুনা উদ্ধৃত কবছি :

yesterday Daddy আব Muaray আপনার কোতা Discuss কোবছিল। আমি before that আপনার কোতা ছনেচি। এ্যাপনি যদি আমাদেব residence এ আসেন তো Daddy and Muaray very খুছি হবেন। Surely.

মালেকের উপেক্ষা রোকেয়া গায়ে মাখল না। ভাল করে বাংলা বলতে শিখল, প্রসাধনেব আতিশয্য বর্জন করল, নিজেকে মালেকের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হল কিন্তু মালেকের মন পেল না। মালেকের মতে এটা ভালবাসা নয়, মোহ বা বৈক্লব্য মাত্র। রোকেয়া বিশ্বাস করে 'তোমাকে ভালবাসি সে আমার মোহ নয়'। এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরেই রোকেয়া অপেক্ষা করল যতদিন না মালেক বিদেশ থেকে ফিরে আসে। এতদিন পরও মালেকের মত পরিবর্তিত হল না। রোকেয়ার প্রেমানুভূতির আন্তবিকতাকে অস্বীকার করবার মতো মানসিক অবস্থা মালেকেরও আর নেই; তবু সে রোকেয়াকে গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করল। এতদিন পরে সে রোকেয়াকে জানতে দিল যে তারা দুজন সমাজের দুই বিপরীত কোটির প্রতিনিধি। যাদের দ্বারা মালেকের জীবন বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত রোকেয়া তাদেরই একজন। রোকেয়াদের বাড়িতেই মালেকের বাল্যজীবন কী দুঃসহ অপমান ও উৎপীড়নের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে সে কথাও মালেক গোপন করল না। বাড়ি ফিরে রোকেয়া তার পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে মালেকের সকল অভিযোগ সত্য। যে পিতামাতাকে সে অন্তর থেকে ভালবাসত, হয়তো শ্রদ্ধাও করত, তাদের সান্নিধ্য এর পর থেকে তার কাছে অসহ্য মনে হতে লাগল। সান্ত্বনা লাভের জন্য ছুটে গেল মালেকের কাছে, কিন্তু মালেক এবারও তাকে প্রত্যাখ্যান করল। আত্মরক্ষা করার মতো আর কোনো অবলম্বনই রোকেয়ার থাকল না। উপন্যাসের মধ্যস্থলের এই হলো তুঙ্গতম মুহূর্ত। প্রেমের স্পর্শে তার যে নবজীবন লাভ ঘটে তার ফলে পূর্বতন পরিবেশের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে প্রত্যাবর্তন করা তার পক্ষে আর সম্ভব ছিল না, অপরদিকে ব্যর্থ প্রেমের বেদনাকে জয় করার মতো চিত্তবল সে সম্পূর্ণ খুইয়ে বসেছে। সে অপ্রকৃতিস্থ হল হল,

নিজেকে নষ্ট করবার নেশায় মত্ত হল। উপন্যাসের দ্বিতীয়ার্ধে গ্রন্থকার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রোকেয়ার অনিবার্য এবং অপ্রতিরোধ্য অধঃপতনের প্রতিটি স্তর বিবৃত করেছেন। নির্বিচাবে বহু পুরুষকে দেহদানের পরিণাম স্বরূপ রোকেয়া সিফিলিস রোগে আক্রান্ত হল এবং মালেককে সে কথা জানিয়ে দিয়ে কাহিনী থেকে বিদায় নিল। সংক্ষেপে এই হল চরিত্রহানির অধিকার। মালেক নয়, রোকেয়াই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র। লেখক তার রূপ ও বৈদগ্ধ্য, তাব চরিত্রগত উচ্ছলতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা, তার প্রাণশক্তি ও বিকার প্রশংসনীয় নৈপুণ্য ও অন্তরদৃষ্টির সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। রোকেয়া যে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ তার নীতিজ্ঞানহীন ভোগলালসাপূর্ণ জীবনকেও নির্মম সততার সঙ্গে উদঘাটিত করেছেন। রোকেয়ার তুলনায় মালেকের চরিত্র অনেক নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ এবং কর্মশক্তিহীন। মালেকের আদর্শবাদের মূল্য শেষপর্যন্ত ঋণাত্মক এবং সে বহুলাংশে শূন্যতারই প্রতিমূর্তি। এবং এই কারণেই হয়তো কাহিনী যে উৎকণ্ঠা আমাদের মনে সৃষ্টি করে তার পূর্ণাবযব পবিতৃপ্তি ঘটাতে সমর্থন হয় না। গ্রন্থশেষে সংযোজিত প্রবন্ধে লেখক মালেকের জীবনাচরণ ব্যাখ্যা করতে গিয়েও বলেছেন, গল্পে লক্ষ করা গিয়েছে মালেক চৌধুবী মোটামুটিভাবে কেবলমাত্র অস্বীকৃতি"ত পর্যবসিত। সে অস্পষ্টভাবে জানে কোথায় তাকে না কবতে হবে, ভাসা-ভাসা-উপলব্ধি করে কোথায় পদসঞ্চারণ তার নিষিদ্ধ অন্তরের গভীরে অনুভব কবে অভিসারের কোনো বৈঠকখানায় সে যেতে পারে না; কিন্তু সে জানে না এই না করার পরিণতিতে কোন হ্যাঁ-কে তাব জীবনে মূর্ত করে তুলতে হবে। সে জানে না কোথায় তার কর্মপ্রচেষ্টাকে উড্ডীয়মান পাখিব মতো সাবলীল স্বচ্ছন্দ, সুষম ও স্বাভাবিক করে তুলতে হবে। সে জানে না তাব অভিসাবের বাঁশি তাকে আহ্বান করে কোনো গাছতলায়, কোনো মাঠের প্রান্তে, কোনো নদীর কিনারে। তাই মালেক চৌধুরী কী নয় সেটা আমরা যতটা বুঝি, সে যে আসলে কী তা আমরা ধরতে গেলে মোটেই বুঝিনে।

কিন্তু এসব হল সমাজতত্ত্ববিদ প্রবন্ধকারের কথা। প্রবন্ধটি মূল্যবান তাতেও সন্দেহ নেই; কিন্তু যত ব্যাখ্যা তত্ত্বাকারে সেখানে উপস্থিত হয়েছে আমরা সন্দেহ করি তার সকল সত্য কাহিনীর মধ্যে যথার্থ শিল্পরূপে পরিগ্রহ করে নি। অনেক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, বিশ্লেষিত হয়েছে কিন্তু জীবন-ভাষ্যরূপে উপন্যাসে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে নি। যে জটিল ও বহুমাত্রিক উপলব্ধি কাহিনীর পরিকল্পনার লক্ষণীয় কার্যত তার রূপায়ণ অত মর্মস্পর্শী ও প্রত্যক্ষ নয়। একদিকে মালেক অন্যদিকে রোকেয়া উভয়ের জীবনই দুটো স্বতন্ত্র ও সরল খাতে পরিচিত ও প্রত্যাশিত পথ ধরেই প্রবাহিত হয়েছে। তবুও আমরা স্বীকার করি যে 'চরিত্রহানিব অধিকার' আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনার ধারায় এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। গ্রন্থকারের জীবনবোধ সমাজসচেতন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিশক্তির দ্বারা উজ্জীবিত। ব্যক্তিজীবনের দৈন্য ও ঐশ্বর্যকে সমষ্টিগত সামাজিক অস্তিত্বের দর্পণ রূপে উপলব্ধি করার এই প্রয়াস মোহাম্মদ মোর্তজার শিল্পপ্রবণতার বৈশিষ্ট্যকেই মর্যাদাবান করে তোলে। এই প্রবণতা কলামণ্ডিত হলে রচনা যে আমাদের রস-পিপাসাকে আরও অধিক মাত্রায় পরিতৃপ্ত করতে সমর্থ হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

নুরুল ইসলাম খান : মেহের জুলেখা

মেহের জুলেখা উপন্যাসে লেখক একটি ভূমিকা সংযুক্ত করেছেন। তাতে বলেছেন, মেহের জুলেখা আঙ্গিকের দিক থেকে এক বিচিত্র পরীক্ষা। এ উপন্যাসে আটটি ছোটগল্প আছে আর এগুলো মিলিয়েই সম্পূর্ণ উপন্যাসটি। বিচিত্রতর এদের পটভূমিকা, রোমান্টিক এবং সংঘাতময় মনে হলো কাহিনীটি। উপন্যাস হিসেবেই কাহিনীট জমকালো ঠেকবে— কিন্তু প্রত্যেকটি গল্পে ছোটগল্পের শুরু, পরিবর্ধন ও ক্লাইমেক্স রয়েছে বলেই আমার বিশ্বাস। বাংলাসাহিত্যে এ ধরনের টেকনিক নতুন বলেই আমার ধারণা। এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য বলতে পারবেন পাঠক ও সমালোচক। নিজের রচনার টেকনিক নিজে ব্যাখ্যা করার কোনো দোষ নেই, তবে সে টেকনিকের অভিনবত্বের মূল্য সম্পর্কে পাঠকের ধারণা অবশ্যই একটু এদিক-ওদিক হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে লেখক নিজে মিতবাক এবং সুবিনয়ী হলে পাঠকের সহানুভূতি লাভ সহজতর হয়। ভূমিকার দাবি একাধিক কারণে দুর্বল। এক, টেকনিক এমন কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নয় যা রচনা থেকে আলাদা করে বিচার করা সম্ভবপর। দুই, যদি তা সম্ভবও হয়, বর্তমান রচনায়, লেখক নিরূপিত বৈশিষ্ট্যসমূহ গ্রন্থের সর্বত্র লক্ষণীয় নয়।

মেহের জুলেখা উপন্যাস কতগুলো ঘটনার সমষ্টি হলেও, কতগুলো স্বতন্ত্র বসপুষ্ট ছোটগল্পের সমাহার নয়। কাহিনীর একটা পূর্বাপর ধাবা এব মধ্যে প্রবহমান; যে-কোনো পর্বের একটি ঘটনা অবশ্যই তাব পূর্ব ও পরবর্তী ঘটনার আভাস পরিণামেব পবিপ্রেক্ষিতে বিচার্য। জুলেখার সঙ্গে জহুরের, মেহেরের, এনায়েতের, মেহেরাবের, ইসাব, দিলারের সম্পর্ক বিভিন্ন পরিচ্ছেদে খণ্ডে খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে বলেই তারা ছোট ছোট গল্পে পবিণত হয়নি। জুলেখার চরিত্রই উপন্যাসের আধার। তাকে কেন্দ্র করে যে সকল ঘটনার আবর্ত সৃষ্টি করা হয়েছে সেগুলো সম্মিলিতভাবে জুলেখার স্বভাবের প্রবণতা ও তার জীবনের পরিণামকে একটা সামগ্রিকতা দান করতে সাহায্য করেছে।

সাহিত্যের অধ্যাপিকা জুলেখা পরিপূর্ণ যৌবন এবং অসামান্য রূপের অধিকারী। বুদ্ধি পরিণত, হৃদয় অস্থির। এই বাসনা কামনার প্রদীপ্ত শিখায় আকৃষ্ট হয়ে ছুটে আসে বিলাত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার জহুর। জুলেখা তাকে অন্তরঙ্গ হতে বাধা দেয় না, কিন্তু জহুরের প্রত্যাশা যখন বন্ধুত্বের অতিরিক্ত আরো কিছু দাবি করে তখন জুলেখা তাকে প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়। তারপর জুলেখা আকৃষ্ট হয় ইঞ্জিনিয়ার মেহেরের প্রতি, মেহের অবাঙালি। স্বাস্থ্যে সৌন্দর্য প্রতিভায় অসামান্য। তার সঙ্গে চূড়ান্ত অন্তরঙ্গতার ফলে জুলেখা অন্তঃসত্ত্বা হয় এবং আশংকা করে যে মেহের হয়তো বিয়ে না করেই তাকে ছেড়ে দূরে চলে যেতে পারে। জুলেখার কাছে এ চিন্তা দুঃসহ মনে হয় এবং অবশেষে মেহেরের ঢাকা ত্যাগের পূর্বরাতে জুলেখার কারণেই তার মৃত্যু ঘটে। তারপর শিশু ইসার মা জুলেখার নতুন প্রেমিক রূপে আবির্ভূত হয় নতুন ইঞ্জিনিয়ার এনায়েত। দুজনে বিদেশ ঘুরে এসে সুখের সংসার আরম্ভ করে লাহোরে। কিন্তু এনায়েতের কর্মনিমগ্নতা তাকেও জুলেখার প্রতি সাময়িকভাবে

উদাসীন করে তোলে এবং সেই অবসরে জুলেখার হৃদয়ে নতুন প্রেমে প্রবেশাধিকার চায় পতি-বন্ধু মেহেরাব। এনায়েতের পিস্তলের গুলিতে আহত হয়ে মেহেরাব বিদায় নেয়; জুলেখা-এনায়েত নতুন করে নীড় বাঁধে ঢাকায়। এই সময়ে উদিত হল দিলার খাঁ, নিহত মেহেরের ছোটভাই। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে মেহের ছোটভাইয়ের কাছে যে পত্র লেখে তা পড়ে এতদিনের জুলেখা জানতে পারল যে মেহের জুলেখাকে অবশ্যই বিয়ে করত; দূরে চলে যাবার আয়োজন ছিল নিছক ছলনা, জুলেখাকে পরীক্ষা করে দেখার এক অহেতুক প্রকাশ মাত্র। আবার জুলেখার প্রাণে মেহেরই প্রধান হল। তবে জাগরণে নয় সুপ্তিতে। জীবনে নয় মরণে। একদিন অতিরিক্ত ঘুমের ওষুধ সেবন করে জুলেখা মেহেরের প্রতীক্ষায় চিরদিনের জন্য ঘুমিয়ে পড়ল।

গ্রন্থের রচনাকৌশলে অদৃষ্টপূর্ব মৌলিকতা সম্পর্কে লেখকের নিজের দাবির মূল্য যাই হোক না কেন, রচনাটি মূল্যহীন নয়। তার প্রথম উপন্যাস রাজধানীর ইতিকথার তুলনায় এটি অনেক পরিণত ও প্রীতিকর রচনা। বর্ণনা অনেক বেশী প্রাণবন্ত, অনেক স্থলেই প্রকাশভঙ্গী সূক্ষ্ম ও সুন্দর। জুলেখার অসামান্য রূপ, তার অনুভূতি ও উপলব্ধির বহুবর্ণময় ঐশ্বর্য, তার অতৃপ্ত প্রেম-পিপাসা ও মর্মান্তিক পরিণাম লেখক প্রশংসনীয় দক্ষতার সঙ্গে এই উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন।

হুমায়ুন কাদির : নির্জন মেঘ

নির্জন মেঘের রজনী নিবাস লেন একটি অন্ধকার গলি। কাঠির মতো লিকলিলে কিন্তু স্বামীব অর্থের জৌলুষে ঝকমকে রোকেয়া বেগমের গাড়ি এ গলিতে ঢোকে না। এই গলিতে থাকে এক দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবার। বড় মেয়ের নাম ফরিদা বানু। বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। ডাগর ডাগর চোখ। যদি কালো ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজটা পরে কিংবা মাইসোর সিল্কের শাড়িটা, চুল শ্যাম্পু করে চুলের ফাঁসে খোঁপা বাঁধে, ঠোঁটে লাল রঙ মাখে কি-না-মাখে, তাহলে এখনও ফরিদা বানু মামাত বোন রোকেয়া বেগমের ভাষায়, রূপের আলোকে পৃথিবী জয় করতে পারত। কিন্তু তা সে করেনি। তার বদলে চোখে পুরু চশমা পরে, স্যান্ডেল পায়ে, রোজ ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ করে। প্রাইভেট বিএ পাস করে চাকরি নিয়েছে মোহামেডান গার্লস স্কুলে। বাবা কোনো সামান্য চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন অনেক দিন। এখন সংসাব সম্পর্কে উদাসীন এবং সামর্থ্যহীন। মা-ও দুর্বল এবং অক্ষম। ছোটবোন কচি কৈশোব অতিক্রম করেছে, পড়াশুনো হল না বলে ঘরের সব কাজ ওকেই করতে হয়। ছোটভাই মন্টু ক্লাস টেনে পড়ে, সারাদিন এবং অনেক রাত পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘোরে। যে দলের রাজনীতি কবে, বাত জেগে তাদের জন্য পোস্টার আঁকে।

প্রতিবেশী ইলু খুকির অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, বাচ্চা কোলে করে ফরিদাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে এবং সংসারের সুখকর ঝামেলা সম্পর্কে নানারকম মুন্সিয়ানাপূর্ণ মন্তব্য করে। একদিন কচিরও বিয়ে হয়। অবশ্য ক্রমে প্রকাশ পায় যে বড়লোক হলেও চরিত্রবান নয়। হয়তো এমন দুরারোগ্য রোগে ভোগে যার সংক্রামকতা থেকে কচিও মুক্ত থাকতে পারে না।

ফরিদারও একজন প্রেমিক ছিল। নাম আনোয়ার। উস্কখুস্ক চুল, পোশাক আধ ময়লা। পায়ের স্যান্ডেলের গোড়া খয়ে গেছে। প্রায়ই দাড়ি কামাতে খেয়াল থাকে না। দরিদ্র পরিবারের ছেলে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র। এই আকর্ষণীয় স্যাডো ইনটেলেকচুয়াল ছিল ফরিদা বানুর প্রেমিক ও প্রণয়ের পাত্র। আনোয়ার কিন্তু শুধু প্রেমের অমৃত সুধা পান করেই জীবন কাটাতে রাজি নয়। সে প্রেমের সকল পরিণামকে বিত্ত ও প্রতিপত্তির সঙ্গে যুক্ত করে পরিতৃপ্ত হতে চায়। ফরিদা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যে উচ্চাদর্শের কোনো চিহ্ন খুঁজে না পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে। কিন্তু আনোয়ার তার লক্ষ্য পরিত্যাগ করে না। সিএসপি হয় এবং হয়েই এক কাব্যময় নাটকীয় পত্র প্রেরণ করে ফরিদার সঙ্গে প্রেম সম্পর্ক চিরতরে ছিন্ন করে ফেলে।

মন্টু পরীক্ষায় ফেল করে। কচি জীবনে অসুখী হয়। বাবা ও মা মারা যান। ফরিদা বানু বিটি পাস করে স্কুলের হেডমিস্ট্রেস বনে নিজের চেতনা থেকে প্রেমানুভূতির শেষচিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলে। ঘটনাচক্রে ঐ এলাকার এসডিও হয়ে আসে আর কেউ নয় আনোয়ার, যে এখন দিনে অফিস এবং রাতে ক্লাবেই সময় কাটায় বেশি। অন্তরের দুঃখ লাভ করার জন্য এসডিও

সাহেবের পত্নী নিজেই এসব কথা ফরিদাকে বলেছেন। তবু ফরিদা অতীত স্মৃতির তাড়ানায় অস্থির হয়ে গভীর রাতে ছুটে যায় এসডিও সাহেবের বাংলোতে; অন্ধকারে আত্মগোপন করে জানালার পাশে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। এসডিও সাহেবের দাম্পত্য জীবনের স্বরূপ ফরিদা বানু স্বচক্ষে দেখতে চায়।

এই হল নির্জন মেঘ। একটি শ্রান্ত ক্লান্ত দুঃখময় দরিদ্র মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী। এ জীবন অর্থহীন আলোহীন প্রেমহীন। হুমায়ুন কাদির দরদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন। লেখার ধরনটি সুন্দর। সর্বত্র একটা সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ লক্ষণীয়। চরিত্রগুলো প্রাণময়, উজ্জ্বল, স্বতন্ত্র।

আবদুর রহমান : খোলা মন

আবদুর রহমানের 'খোলা মন' ব্যক্তিগত প্রবন্ধের বই। মজলিসি মেজাজ, বিদগ্ধ মানস এবং পরিণত রচনারীতি একত্রে মিলিত হয়ে প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে একটা বিশিষ্ট শিল্পমূল্য দান করেছে। প্রতিদিনের পবিচিত নানা বিষযেব স্পর্শ লেখককে নানারকম লঘুগুরুভাবে উদ্বুদ্ধ করে, তার এক-একটা ইশারাকে আশ্রয় কবে লেখক আপন মনেব ভাবনাকে দশদিকে ছড়িয়ে দেন। কোনোবকম কঠিন যুক্তিব শৃঙ্খলা নয়, বিশেষ মুহূর্তের ভাবের বিশিষ্ট পরিমণ্ডলই বিচিত্র কথার মালাকে সূত্রাকারে গেঁথে তোলে, ব্যক্তিত্বেব নিজস্ব সৌবভে তাকে সরস কবে তোলে। 'খোলা মনের' এটাই সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় দিক। চিন্তা কবে বড় কথা গুছিয়ে বলতে কোনো জায়গায় লেখক চেষ্টা কবেন নি। কিন্তু আবদুব রহমানের স্বভাবের ঐশ্বর্যই এমন যে তাব অনায়াস প্রকাশও মধুব ও প্রীতিকর বলে মনে হয়। সামান্য প্রসঙ্গ থেকেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গভীর সত্য উৎক্ষিপ্ত হযেছে। ববঞ্চ বলা চলে রচয়িতা যেখানে বড় কথা বলাব জন্য বেশি কবে চেষ্টা কবেছেন সেখানেই কৃত্রিম বাণী প্রচাবেব লোভের শিকাবে পবিণত হয়েছেন, উচ্চচিন্তা প্রকাশেব মোহে আবিষ্ট হযে অন্তবঙ্গ আত্মপ্রকাশের পবিবশ মাটি কবে দিযেছেন। এই বইযেব দুর্বলতাও এইখানে। একাধিক প্রবন্ধে চিন্তাপূর্ণ সবস সিদ্ধান্ত এত বেশি ভিড় করে সমবেত হযেছে তাব ব্যূহ ভেদ কবে অন্তরালের মনেব মানুষটিকে সবসময় প্রাণের কাছাকাছি অনুভব করা যায না। সবটা কেমন বেশি জটিল ও ঘোবালি মনে হতে থাকে। তবে উৎকৃষ্ট পবিচ্ছেদেব সংখ্যাও কম নয। যেমন আয়নায় আছে, 'প্রতিটি মাটিব দেহ এক একটি পৃথক জগৎ অতল রহস্য এবং অফুবন্ত আলোর নদী। এইখানে কাঁচেব আয়নাব সঙ্গে আমাব মনমুকুবে তফাত।' কিংবা চরিত্র প্রবন্ধে যখন লঘু কথাব ঢেউ ঠেলে গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যতত্ত্বে প্রবেশ কবে বলেন, 'সংসারের মানুষ আর সাহিত্যব চবিত্র ঠিক এক নয। দুটোব প্রকাশ আলাদা। সমাজে ব্যক্তির বিচার হয় কাজের ভালোমন্দে। সাহিত্যে চবিত্রের বিচাব প্রকাশেব সঙ্গতিতে। প্রকৃত জীবনে দু'দশটা বেখাপ্পা ব্যবহাব চলে যেতে পাবে। কিন্তু একটি মাত্র অসঙ্গতি হলেও চরিত্র টেকে না। স্ত্রীকে সন্দেহ কবে ওথেলো শ্বাসবোধ কবে মাবতে পাবে, কিন্তু কখনই ফ্রেইলটি দাই নেইম ইয ওযোমান' বলে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে পাবে না। সেটা ওথেলো চরিত্রেব ধর্ম নয়।'

হামেদ আহমদ : প্রবাহ

হামেদ আহমদের উপন্যাস 'প্রবাহে'র প্রকাশক পূর্বপাকিস্তান লেখক সংঘ। উপন্যাসটি আয়তনে ছোট, বেশি ছোট, মাত্র নব্বই পৃষ্ঠা। তবে আয়তনে ছোট হলেও যে জীবনপট এতে উন্মোচিত হয়েছে তাতে উপন্যাসে প্রত্যাশিত ব্যাপ্তি ও গভীরতার ইঙ্গিত দুর্লক্ষ্য নয়। একটা প্রাচীন ও বনেদি পরিবারের সঙ্গে একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও শিক্ষিত পরিবার সাধারণ সামাজিক প্রবোহের টানে আত্মীয়তার সূত্রে বাঁধা পড়ে। বৃহৎ একান্ত পরিবারের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব অভিজাত মদ্যপ তরুণের সঙ্গে বিয়ে হয় উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর মার্জিত রুচি ও পরিশীলিত চেতনাসম্পন্ন সুন্দরী কন্যা খালেদার। এখান থেকেই কাহিনীর সূত্রপাত। কী করে বৈষম্য বিরোধে পরিণত হয়, বিরোধ মর্মান্তিক আত্মাহুতি ডেকে আনে, একটা অর্থহীন করুণ নিষ্ফল ব্যর্থতা সমগ্র জীবন গ্রাস করে ফেলে গ্রন্থকার দরদ দিয়ে তারই এক শোকচিত্র রচনা করেছেন। কাহিনী নির্বাচন বা উদ্ভাবনের মধ্যে বড় রকমের-কোনো মৌলিকতা নেই। সম্ভবত গ্রন্থকারও তেমন দাবি করেন না। তবে কাহিনীর নির্মাণে এবং প্রকাশে লেখক যে পরিমিতি বোধ, যে পরিচ্ছন্নতা ও মৃদুভাষিতার পরিচয় দিয়েছেন, তাব অকুণ্ঠ তারিফ করি। উচ্চকণ্ঠে সমস্যা প্রচার বা উল্লাসের সঙ্গে দেহসম্পর্ক-বিবাহের একটা পারিবাবিক আলোড়নকে কেন্দ্র করে লেখক যে গল্প রচনা করেছেন তা প্রকারান্তবে আধুনিক মধ্যবিত্ত মুসলমান সমাজের এক মূলগত সংকট ও বিরোধকে জীবন্ত প্রতিমূর্তি দান করেছে।

ঘটনা যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে সেখানে খালেদা নেই। তার কিশোরী কন্যা জাহানাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকাবি কর্মচারী মাতামহ ইদরিস সাহেবের তত্ত্বাবধানে বড় হচ্ছে, ক্লাস নাইনে পড়ে, ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছে। খালেদার ছোটবোন অর্থাৎ জাহানারার খালা নিলুফার পড়ে ক্লাস টেনে বয়সে বেশ কয়েক বছর বড়। নিলুফাব হাসিখুশি মেয়ে, সাজগোজ করতে ভালোবাসে, অনুচ্চারিত নতুন প্রেমের প্রাথমিক রোমাঞ্চের শিহরিত হতে জানে। জাহানারা তার বিপরীত। সারা চেতনায় তার বিষণ্নতা, সে কেবল ভাবে, কেবল মনে মনে প্রশ্ন কবে যার উত্তর কেউ তাকে দিতে চায় না। সে প্রশ্ন করে তাব মৃত পিতা সম্পর্কে, তার মৃত মাতা সম্পর্কে। মা মারা গেলে কেন, মা মারা গেল কী করে; মায়ের মৃত্যুর রহস্য যেদিন উন্মোচিত হলো সেদিন জাহানারা নিজের জীবনের' তার খালা নিলুফারেরর জীবনের সকল স্বপ্ন চুর্ণবিচুর্ণ। উপন্যাসের শেষপ্রান্তে এসে জানতে পারি যে খালেদা নিজের অভিমানকে আঁকড়ে ধরে নিজে দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ গ্লানি নীরবে সহ্য করে, যেদিন অসহ্য মনে হল সেদিন আত্মহত্যা করল। কী পরিবেশে মা আত্মহত্যা করে জাহানারা পিত্রালয়ে এসে বহুকাল পরেও তার অবিকল পুনরাভিনয় দেখল। কারণ, পুরাতন প্রবাহ সে বাড়িতে তখনও অব্যাহত। হালের পালা মেঝ চাচার ঘরে। চাচার কিশোরী মেয়ে লুৎফা ভালবাসে অন্য চাচাত ভাই মুরাদকে। এই বাড়িতে প্রেম, সুন্দর ও বীভৎসের মিলিত স্পর্শে এক বিচিত্র রূপ ধরে। লেখকের বর্ণনাও স্মরণীয় রূপে সার্থক।

মুরাদ আর কোনো কথা না বলেই নিচে নেমে গেল। সিঁড়ির ওপবেব ধাপে দাঁড়িয়েই লুৎফা পরিষ্কার শুনলো মুরাদের নিচে নেমে যাবাব শব্দ! আর শুনলো ও পাশের ঘর থেকে দোতলায় উদ্গারের পর উদ্গারে ঘরখানা তার আব্বা ভরে দিচ্ছেন। বাইরের জগতের সঙ্গে তাঁর দেখা সাক্ষাৎ নেই। নিজের জগৎ তৈরি করে নিয়েছেন।

লুৎফার মা-ও সারাজীবন সহ্য করে এসে একদিন অকস্মাৎ ক্ষণিকেব উত্তেজনায় বিরুদ্ধাচরণ করে এবং জনমের মতো অভাগী স্বামীকে হারায়। আরও পরে জাহানারা আবার যখন তার নানার বাড়িতে এল তখন জানতে পারল যে নিলুফারও তার স্বামী নিয়ে সুখী হতে পারে নি এবং সেও তার বোনের মতো আত্মহত্যা করেছে। তার রক্তেও যে ছিল একই অনুভূতির প্রবাহ; উপন্যাসের এই দিকটা, বিশেষ জীবনের বেদনা ও ব্যর্থতার দিকটা যতটা কলামণ্ডিত রূপ লাভ করেছে অন্যান্য অংশ ততটা সার্থক হয়নি। যেসব মেয়েদের আত্মোৎসর্গের দ্বারা এই বেদনা গাঢ়তা লাভ করে তারা নিজেরাই যথেষ্ট মুল্যবান রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি। তাদের অনুভূতির কমনীয়তা ও সূক্ষ্মতা কখনও কখনও মধুর বলে মনে হলেও তাদের প্রণয় সম্পর্কের বিভিন্ন বিকাশের মধ্যে যে ঐশ্বর্য নেই যা তাদের জীবনের বিপর্যয়কে মহিমান্বিত করে তুলতে পারে। নিলুফার আসাদ কিম্বা লুৎফা মুরাদ জাহানারার দ্বিমাত্রিক ত্রিমাত্রিক প্রেমময় ভাবালুতার মধ্যে স্বাভাবিকতা হয়তো আছে, কিন্তু তাতে কোনো মহিমা নেই। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিন্দনীয় অসঙ্গতি পর্যন্ত আছে।

দিল আরা হাশেম : ঘর-মন-জানালা

'ঘর-মন-জানালা' লেখিকার প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস। তবে, গ্রন্থের কোথাও প্রথম রচনার আড়ষ্টতা, ইতস্তত বা ভারসাম্যহীনতার চিহ্নমাত্র নেই। অভিজ্ঞতাপুষ্ট পর্যবক্ষেণের দক্ষ, পরিণত মানসের অধিকারিণী লেখিকা কুশলী শিল্পীর মতো এই সুদীর্ঘ কাহিনীর ঘটনাক্রম ও পরিবেশ বিভিন্ন চরিত্রের কর্ম ও অন্তর্লোকের সঙ্গে নানারকম সূক্ষ্ম ও জটিল সূত্রে গেঁথে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। কোথাও কোনো ত্রুটি বা অসঙ্গতি নেই, এমন নয়। তবে তার বিচারও রচনার পরিণতি ও সুনির্দিষ্ট সর্বাঙ্গীণ পরিপাট্যের পরিপ্রেক্ষিতেই পরীক্ষাযোগ্য, অন্য মানদণ্ডে নয়।

'ঘর-মন-জানালা' একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের বেদনা ভারাক্রান্ত চিত্র। এই জীবন মূলত বৈচিত্রহীন, নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ। এখানে সুখের সীমানা আদিঅন্ত বিস্তৃত নয়। দুঃখের আলোড়নও প্রবল ও প্রচণ্ড ঘটনার অভিঘাতে উৎপাদিত নয়। এই জীবন গৃহে আবদ্ধ, মনে গুঞ্জরিত, জানালায় সংস্থাপিত। এই সংকীর্ণ পরিধির মধ্যেই লেখিকার সূক্ষ্ম কারুকার্যের প্রয়োগ। উপন্যাসের শেষার্ধের দু-একটি ঘটনাখণ্ডের অতিমধুর অতিনাটকীয়তা ছাড়া সমগ্র গ্রন্থ সুরুচি ও পরিমিতিবোধের প্রীতিকর প্রকাশে সমুজ্জ্বল। কল্পনা কোথাও উচ্চকণ্ঠ না হয়েও নির্মম ও নিরবচ্ছিন্নরূপে বাস্তবতাসংলগ্ন। বর্ণিত জীবন গভীরভাবে সত্য ও মর্মান্তিকরূপে সত্য। এই জীবনের অন্তর্নিহিত বেদনাবোধকে লেখিকা যে সুতীব্র মমতা দিয়ে রূপায়িত করেছেন তার দাহ ও জ্বালা সংবেদনশীল পাঠক হৃদয়কেও স্পর্শ করবে।

> নাজমাদের পরিবার দারিদ্র্যের অসুস্থতার, অশান্তির। আব্বা অল্প বেতনের চাকরি করতেন, এখন সম্বলহীন। রোগা শীর্ণ দেহ। হাঁপানীতে ভোগেন।
>
> নাজমা জবাব দেবার আগেই রান্না ঘরের দরজায় একটা ছায়া পড়ল। রোগাটে, দীর্ঘ।
>
> অশান্তি সকলেরই হয় সালেহা। সকলেরই হয়। আব্বার গলাটা ফিসফিসানির মতো শোনাল, আর নাজমার মনে হল, পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেছে।
>
> নাজমা এক এক করে সকলের মুখের দিকে চাইল। ওর মনে হল, যাদুর স্পর্শে এদের সবাই পাথর হয়ে গেছে, এদের কারো প্রাণ নেই। আব্বার পেছনে অন্ধকারে সালমা মালিশের তেলের বাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। যেন কোনো মাজারে প্রদীপ জ্বালাতে এসেছে সে। (পৃ. ৪১)

নাজমার আম্মার নাম সালেহা। তিনি সারাদিন খাটেন, কাঁদেন, কথা খুবই কম বলেন।

> দরজাটা আর একটু ফাঁক হলে মার মুখখানা দেখা গেল হাতে লণ্ঠন নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। লাটভাঙা ময়লা কাপড় জড়ানো মার শরীর রুক্ষ চুল। বহু ক্লান্তি আর ব্যর্থ আশার স্পর্শ লাগা, অল্প বয়সে বুড়িয়ে যাওয়া মুখখানা মার। রাতের অন্ধকারে অশরীরী প্রেতাত্মার মতো মা ঢুকলেন।... লণ্ঠন কমাতে কমাতে মা একটা অবাস্তব ছায়ার মতোই আবার মিলিয়ে গেলেন দরজার অন্তরালে। (পৃ. ২০)

নাজমা আইএ পাস করে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে চাকরি নিয়েছে কুটিরশিল্পের দোকানে, মহিলা-বিক্রেতার। সেই সামান্য আয়েই গোটা সংসার চলে। ছোটবোন আসমা ক্লাস টেনে পড়ে, তার ছোটটি আরও নিচে।

প্রতিবেশী তরুণ মালেকই আপদে-বিপদে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করে। সাহায্য করা মালেকের স্বভাব। নীরবে কাজ করে যায়। ঘরে মাকে সাহায্য করে বাসন-মাজা মাছকোটা থেকে শুরু করে যাবতীয় গৃহকর্মে। ওর ঘর-পর নেই। নাজমাদেরও ও সব কাজ না ডাকতে করে দেয়। সময় মতো নাজমার আব্বার জন্য ওষুধ কিনে আনে, প্রয়োজন হলে বাজার করে দেয়। এসব সত্ত্বেও নাজমার মা কিন্তু মালেককে বেশি আপন করে নিতে চান না। হয়তো তিনি টের পান মালেক নিশ্চয়ই মনে মনে নাজমাকে ভালবাসে।

মালেক যে নাজমাকে ভালবাসে, সেও মালেককে গভীরভাবে ভালবাসে। কিন্তু মালেক বড় চাপা স্বভাবের।

রাত জেগে নানা রকম বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে যা রোজগার করে তাতে মা আর ছেলের সংসার একরকমে চলে যায়; কিন্তু কেবলমাত্র এই আয়ের ভরসাতে বিয়ে করে ঘবে বৌ আনতে ভয় পায়। তার ওপব সে অমানুষ নয়, নাজমাদের গোটা পরিবারকেও সে ফেলে দিতে পারবে না। নাজমাই বা তা সহ্য করবে কন ? মালেক তাই কেবল ভাবে, মনে মনে। ঘর ভরে ফেলে হাজার রকম ফুলের টবে। ছবি আঁকে। কিন্তু ভালোবাসাব কথা প্রাণভরে প্রকাশ করার কোনো সার্থকতা খুঁজে পায় না। নাজমা উন্মুখ হয়ে তাব জন্য অপেক্ষা করছে জেনেও পারে না।

দোকানেই নাজমার সঙ্গে জব্বার সাহেবের প্রথম পরিচয় হয়। রুচিসম্পন্ন, শিক্ষিত, প্রতিপত্তিশালী, মধ্যবয়সী বড়লোক জব্বার সাহেব। স্ত্রী নিশাত তাকে কঠিনতম আঘাত হেনে আজ বহু বছর হল অন্যের সঙ্গে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র ছেলেকে বোর্ডিং স্কুলে দিয়েছেন। নিজের নিঃসঙ্গ নিরানন্দ জীবনে কোথাও সুখ ও শান্তির চিহ্নমাত্র খুঁজে পান না। হঠাৎ নাজমার মধ্যে এক নতুন নারীব সন্ধান পেলেন। সাধারণ শাড়িতে ঘেরা, শ্যামল, সুশ্রী, শান্ত, স্নিগ্ধ নাজমা। ওর দেহের রূপের চেয়ে ওর সত্তার নিরাবিল পবিপূর্ণতা জব্বাব সাহেবকে মুগ্ধ করে। তিনি নাজমাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে এলেন। নিঃস্বার্থ নির্লোভ দরদ দিয়ে। প্রথমে স্টেনো টাইপিং-এর স্কুলে পড়বার ব্যবস্থা কবে দিলেন, পরে পাস করলে, একটা বেশি বেতনের ভদ্র চাকরি পেতে পর্যন্ত সাহায্য করলেন। নাজমাও একটু একটু করে জব্বার সাহেবের অন্তরঙ্গ হল। মালেকের ভালোবাসাকে নাজমা কখনই আপনার করতে চায়নি, নিজের হৃদয়ে সে ভালোবাসার গভীরতাও কখনও কমে নি। বরঞ্চ দিনে দিনে আরও বেড়েছে। তবুও মালেকের স্ববাবের প্রকৃতির জনই এই প্রেম ছিল অন্তঃশীলা, মন্থরবেগ, উত্তাপহীন। জব্বার সাহেবের প্রবল ব্যক্তিত্ব তাই কখনও কখনও অতি সূক্ষ্ম ও প্রচ্ছন্ন লুব্ধতা যা অভাবের সংসারের কোনো অভাগিনী মেয়ে সর্বক্ষণ স্ববশে রাখতে পারে না।

দুঃখ ছিল আসমার জীবনেও। ও সারাদিন একটানা ঘরের কাজ করে। কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিয়েছে। তার রূপ অনেক, দেহ পুষ্পিত, সুন্দর। কেবল জীবন নিরানন্দ, রোমাঞ্চহীন। যদিও বাইরে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় না, অন্তরে তার আগুন জ্বলে; অন্তরে সে অশান্ত হয়, অস্থির হয়। সে মুক্তি খোঁজে, সে বাঁচতে চায়। নাসরীনের ভাই আখতার

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া সুদর্শন, আকর্ষণীয় তরুণ। প্রলুব্ধ করার কৌশলও জানে, দুঃসাহসী এবং কামুকও বটে। তার সান্নিধ্যের শিহরণে আসমা বিবশ হয়, ক্ষণকালের জন্য হলেও চেনাজগতের চেতনা লুপ্ত হয় বলে এর সম্মোহনকে সে অস্বীকার করতে চায় না।

> কী ঘটছে বোঝবার আগেই আখতার হঠাৎ তাকে দুহাতে শিশুর মতো পাঁজা কোলা করে উঠিয়ে নিল, তারপর দরজা বন্ধ করল পিঠ দিয়ে চেপে। আসমা এক গোছা ফুলের মতো শিথিলতায় অলস হল আখতারের আলিঙ্গনে একটুও প্রতিবাদ না করে। তার ক্রোধ, আক্রোশ, অভিমান, সব অনুভূতি, স্নায়ুর উত্তেজনা এক নিমেষে ভাসিয়ে দিল পরিপূর্ণ শিথিলতায়। আখতার তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে অজস্র চুমো দিচ্ছে গলায়, ঘাড়ে, মুখে। অনেক কথা বলছে চুমোর ফাঁকে ফাঁকে ফিসফিস করে। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না, বুঝতেও পারছে না। উগ্র পানীয়ের মতো জ্বালা ধরাচ্ছে আখতারের স্পর্শ তার সমস্ত শরীরে আর এক মোহময় বিস্মৃতির ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ছে তার সমগ্র চেতনা।
>
> হ্যাঁ আজ তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন এই বিস্মৃতির। এই অতলান্ত বিস্মৃতির সাগরে ও সমস্ত তিক্ত অনুভূতিকে বিলীন করে দিতে চায়। (পৃ. ১৪২)
>
> জানে আসমা, ভালো করে জানে। এর নাম ভালোবাসা নয়। হতাশায় তিক্ততায় আখতারেব সঙ্গ মদের নেশার মতো প্রয়োজনীয়, কিন্তু নেশা ছুটে গেলে প্রত্যেক মাতালের মতো আসমাও নিজেকে ঘৃণা করে, নেশাকে ঘৃণা করে। এর নাম ভালোবাসা নয়, সে জানে। অথচ সে নেশা না থাকলে সে বাঁচবে না, তাও সে জানে। আখতারের কথায় সে বুঝতে পারল, তাকে সে প্রতারণা করছে। ঈশ্বর তার অন্তরে এ কি জটিলতার জাল বুনে দিয়েছেন, ভালোবাসতে চেয়েও সে কেন ব্যর্থ হয়? (পৃ. ১৪৫)

বদ্ধ ঘরের পরিবেশ যখন প্রত্যোহের অভাব-অনটনে শ্বাসরোধকারী হয়ে ওঠে, আসমার মন তখন খোলা জানালা দিয়ে যে-কোনো মোহকরী অনিশ্চিত দূরত্বে হারিয়ে যেতে চায়। যাকে খুঁজে পায় সে আখতার। যাকে ভালোবাসা যায় না জেনেও দেহদান করে। যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে অন্তঃসত্ত্বা। এবার যখন ভালোবাসার সংকল্প নিয়ে সে আখতারকে চিরকালের জন্য আঁকড়ে ধরতে চায় তখন আখতার তাকে উপেক্ষা করে নতুন কোনো সহপাঠিনীসহ মিছিলের জনপ্রবাহে মিলিয়ে যায়। তারপর একদিন সামান্য একটি পত্রে বিদায় নিয়ে চলে যায় বিদেশে।

ততদিনে আব্বার মৃত্যু হয়েছে। সেই শোকাচ্ছন্ন পরিবেশে একজনের অসহায়ত্ব আরেক জনের সহানুভূতিকে প্রগাঢ় করে তুলেছে; নাজমা-মালেক আরও অকপটে পরস্পরের নিকটে এসেছে। মালেকের মা মালেককে বলে বিয়ে করতে। ঘরে বৌ আনতে। মালেক বিষণ্ন হৃদয়ে সমস্যার পরিধি পরিমাপ করে এবং কখনও-কখনও দেখে নাজমা জব্বার সাহেবের গাড়িতে চড়ে যাওয়া-আসা করে। এমন সময় নাজমা জানতে পারে কুমারী ছোটবোন আসমার সন্তানবতী হওয়ার কথা। নাজমা দিশাহারা হয় এবং দিশাহারা হলে সব সময় যার কাছ থেকে মুক্তির সন্ধান লাভ করেছে তাকেই স্মরণ করে। মালেক যাতে আসমাকে রক্ষা করতে অধিকতর মনোবল লাভ করে সে জন্য নাজমা এক বড় রকমের প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেয়। আসমাকে বিপদমুক্ত করার ব্যগ্রতায় নাজমা মালেককে অনুরোধ

করে, সে যেন আসমাকে বিয়ে করে। নিজের সম্পর্কে বলে যে, মালেক আঘাত পাবে বলে এতদিন সে একটা কথা প্রকাশ করে নি। নাজমা নাকি অনেক দিন থেকেই জব্বার সাহেবকে গভীরভাবে ভালোবাসে এবং তাকেই বিয়ে করবে বলে মনে মনে স্থির করে রেখেছে।

মালেক আসমাকে বিয়ে করল এবং বিয়ের রাতেই নিরুদ্দেশ হয়ে চলে যায় একেবারে প্রত্যন্ত প্রদেশের পাহাড়ি এলাকায় এবং আশ্রয় নেয় পার্বত্য রমণী স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী তুঙ্গার গৃহে। পরে এই তুঙ্গারই দুই বিরোধী রূপের চিত্র অঙ্কিত করে মালেক একদিন দেশের সেরা শিল্প হিসেবে প্রেসিডেন্ট পদক লাভ করে। ছবি দুটোর ক্যাপশন ছিল।

> ট্যু ফেসেস অব ইভ। শান্তি স্নিগ্ধতা আর পবিত্রতার প্রতীক একটি অপার্থিব নাবীব অবয়ব। আরেকটি কামনা, বাসনা, লালসার এক উগ্র প্রতিচ্ছবি। (পৃ. ৩৩৯)

প্রবাস জীবনে মালেক যে তুঙ্গার সম্মোহন থেকে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল তার মূলেও হয়তো তুঙ্গা-চরিত্রের এই রূপদ্বৈত সক্রিয় ছিল।

যথাসময়ে আসমার ছেলে হয় এবং মালেকের মা সরল বিশ্বাসে পুত্রবধূ ও তাঁব সন্তান রাতুলকে বুকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। কিন্তু ততদিনে নাজমার আত্মদহনেব পালাও তীব্র আকার ধারণ করেছে। সে জব্বার সাহেবকে গ্রহণ করতে প্রাণপণ চেষ্টা কবে এবং মালেকের জীবন ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য অন্তরে অবিবত পুড়ে মরে। প্রতি পলে পলে উপলব্ধি করে মালেককে সে কত গভীরভাবে ভালবাসত। তাকে বাদ দিয়ে নিজের জীবন কত অর্থহীন, রক্তহীন। নাজমা একআধদিন মদ খেল, জব্বার সাহেবের মোটবে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াল। অসংলগ্ন উক্তির আঘাতে জব্বার সাহেবকে ব্যথিত ও বিভ্রান্ত করে তোলে। জব্বার সাহেবও বুঝলেন যে নাজমার অতলান্ত হৃদয়ে এমন কোনো তৃষ্ণার আগুন অনির্বাণ·জ্বলছে, যা নির্বাপিত করা তাব অসাধ্য। এ দাহ থেকে মুক্তি নেই কারও। না জব্বার সাহেবের, না নাজমার। এই সময়ে একদিন, আকস্মিকভাবে দৈনিক কাগজে প্রকাশিত শিল্পী মালেকের সাফল্যের সংবাদ পাঠ করে সুতীক্ষ্ণ অনুশোচনায় দগ্ধ হল এবং ক্রমে সম্পূর্ণরূপে অপ্রকৃতিস্থ হল। অভিভূত ও মুহ্যমান জব্বার সাহেবও অন্য কোনো পথ খুঁজে না পেয়ে বিবাহের নির্ধারিত দিবসের মাত্র দুদিন আগে নাজমাকে মুক্ত করে দিয়ে কাউকে কিছু না বলে দূরে কোথাও চলে গেলেন।

মালেক গৃহে প্রত্যাবর্তন করল বড় দুঃসময়ে। একদিকে নাজমা উন্মাদিনী, অন্যদিকে আসমা, সন্তানজন্মের পর থেকে রোগে ভুগে রক্তহীনতার শেষ অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই কাঁদতে থাকে, যে কান্না এখন হয়তো এক সুস্থ এবং অকৃত্রিম দুঃসহ বেদনাবোধেরই প্রকাশ।

আমরা ইচ্ছে করেই এই দীর্ঘ উপন্যাসের কাহিনীভাগ একটু বিস্তৃতভাবে পরিবেশন করলাম। এতে করে রচনার বর্ণনা-রীতি, চরিত্র সৃজন, ঘটনা-গ্রন্থনের দোষ-গুণগুলোও প্রকারান্তরে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা গেল। শুধু সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য দ্বারা সকলের নিকট গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের ধারণা স্পষ্ট করে তোলা যেত না। সংকলিত সার থেকে যা সহজে অনুমেয় তা হল এই যে লেখিকা অকারণে উপন্যাসের আয়তন দীর্ঘ করেন নি, ঘটনার যে জটা-জাল তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন তার বহু বর্ণময় পরিস্ফুটনের জন্য পরিব্যাপ্ত অবকাশ আবশ্যকীয় ছিল।

যে দু'একটি ঘটনা আমাদেব পরিপূর্ণ সন্তোষ বিধান করে নি, তাব মধ্যে প্রধান হল তুঙ্গাপর্ব। সমগ্র প্রসঙ্গই যেন একটু বেশি কাল্পনিকতা-মণ্ডিত এবং রুপালি পর্দাব প্রভাবজাত। মালেকের প্রেসিডেন্ট পদক লাভও এই একই অর্থে মাত্রাতিবিক্তেবকম শিহরণমূলক। নাজমার অনুরোধে মালেকেব আসমাকে বিয়ে করা এবং পরিণামে নাজমাব উন্মাদিনী হওয়ার দৃশ্যগুলোও বাহ্যত অতি প্রবল ও মর্মভেদী বলে প্রতীয়মান হলেও কাহিনীর পূর্বাপর পরিচর্যাব পরিপ্রেক্ষিতে এগুলো একটু বেশি আকস্মিক এবং বেশি উচ্ছ্বাসপূর্ণ বলে মনে হয়। সামগ্রিকভাবে আমাদেব বিচারে এই উপন্যাসেব প্রথমার্ধ দ্বিতীয়ার্ধের তুলনায় অধিকতব সার্থক।

তবে এসব কথা গৌণ ত্রুটি-বিচ্যুতি সংক্রান্ত। আমাদেব যে সিদ্ধান্তটি মুখ্য সে হল এই যে, 'ঘর-মন-জানালা' একটি অতি উৎকৃষ্ট উপন্যাস। গত তিন-চাব বছরেব মধ্যে যে মাত্র দু-তিনটি উপন্যাস পাঠ করে প্রভূত পরিমাণে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেছি, 'ঘব-মন-জানালা' নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে একটি।

হাবীবুর রহমান : পুতুলের মিউজিয়াম

পুতুলেব মিউজিয়ামের রচয়িতা হাবীবুর রহমান। পূর্বপাকিস্তানে সরস এবং শোভন শিশুসাহিত্যের অভাব সকলেই অনুভব করেন। যে দু'একজন সাহিত্যিক এ ব্যাপারে এ অভাব মোচনে উদ্যোগী হয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সুরুচিপূর্ণ উৎকৃষ্ট সাহিত্যসৃষ্টির সাধনা করে আসছেন, শিশু ও কিশোরদের একই সঙ্গে অনাবিল আনন্দ এবং প্রীতিকর জ্ঞান পরিবেমনের সচেষ্ট হয়েছেন তাদের মধ্যে হাবীবুর রহমান অনস্বীকার্যভাবে একজন। অল্প বয়সেব ছেলেমেয়েরা পড়বে বলেই তিনি অবহেলাক্রমে গল্প বানিয়ে যান না। অনেক পরিশ্রম করে তাদের জন্য অনেক কাজের কথা সংগ্রহ করেন, অনেক দরদ দিয়ে সেগুলোকে বসায়িত করেন এবং অতি মধুর ঘরোয়া অন্তরঙ্গ ভাষায় তাকে প্রকাশ কবেন। পুতুলেব মিউজিয়ামেও এসব গুণ আছে, এবং আছে বলেই তাব আবেদন কেবল শিশুদেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য নয। বড়রাও পড়ে আনন্দ পাবেন, হয়তো কিছু শিখবেনও। ভূমিকায লেখক বলেছেন, 'পুতুলেব মিউজিয়াম', কিশোরদের জন্য লেখা। পুতুলেব মিউজিযাম, সবার জন্যে মিউজিয়াম, যাকে বলে ডাইনোসোর, হাতিব পরদাদা ও সবুজ বরণ চা-এই পাঁচটি পর্যায একটি মাত্র কাহিনী সূক্ষ্ম সূত্রে গ্রথিত। সেদিক দিয়ে এটিকে অখণ্ড একটি উপাখ্যান বলা যেতে পারে। প্রত্যেকটি পর্যায়েব কাহিনীর ভিত্তি নির্মাণ করা হয়েছে বিজ্ঞানেব প্রতিষ্ঠিত সত্যেব মালমশলায়।

একটা নমুনা পড়ে শোনাই। বড় ভাইয়ের জবানিতে লেখক গল্প বানিয়েছেন কৌতূহলী ছোট বোনের জন্য। কথা হচ্ছিল নানা জাতের ডাইনোসোর নিয়ে। স্টেগোসরাসেব প্রসঙ্গ এসে পড়লে কথা এইভাবে এগিযে চলে :

> স্টেগোসরাসবা নাকি সব কিছু নিয়েই ভালমন্দ দু'মুখো চিন্তা করতে পারতো আর শেষ পর্যন্ত কিছুই ঠিক কবতে পাবতো না।
>
> সে আবার কী ?
>
> এই ধরো, হয়তো মনে হলো এখন সামনে যাওয়াই ভালো, তক্ষুনি আবার মনে হলো, না বরং পেছনে যাওযাই ভালো আব শেষ পর্যন্ত এই দোমনামনি করতে করতে সামনে পেছনে কোনো দিকেই যাওয়া হলো না। ফল হলো এই, বেচারাকে না খেয়ে না দেয়ে ঐ এক জায়গাতেই হয়তো কয়েকটা দিন কাটিয়ে দিতে হলো।
>
> ভারি মজা তো ?
>
> ... আসলে স্টেগোসরাসদের একটার জায়গায় দু'দুটো মগজ ছিল। একটা ওর মাথার আব একটা ওর লেজের গোড়ায়।... বিজ্ঞানীরা বলেন, একটা মগজ দিয়ে অমন জাঁদরেল দেহখানাকে ঠিকমতো চালানো যায় না বলেই ওদের দুটো মগজ ছিল। কথাটা ঠিকই তাই। অমন একখানা হাজারমণী দেহ— লেজ থেকে মাথার ডগা পর্যন্ত

প্রায় হাত চল্লিশেক লম্বা— তাতে এই এতোটুকু একটা মাথা, যাব মগজের খোলটা বড়
জোর তার ঐ একটা মুঠোর সমান। এতটুকুন মগজ নিয়ে কী আর কাজ চলে? তাই
দেহের উপরের দিকটা চালানোর ভার ঐ মগজটুকুর ওপর ছেড়ে দিয়ে লেজের
গোড়াটায খানিকটা বাড়তি মগজ দিয়ে দিয়েছিলেন সৃষ্টিকর্তা! নইলে অমন চো-
লেজটা বোধ হয় নড়তোই না কখনো।

বাযাজীদ খান পন্নী : বাঘ-বন-বন্দুক

বাঘ-বন-বন্দুক পড়ে বড়ই প্রীত হযেছি। শিকাবকাহিনী বাংলায খুব কমই বচিত হযেছে। পূর্বপাকিস্তানে হয নি বললেই চলে। নাটক, নভেল, কবিতা, উপন্যাসেব বাইরে হালে বম্যবচনা জাতীয বইযেব প্রচাব কিছু বেড়েছে। তবে এগুলোও বেশিব ভাগ হয বহির্জীবনেব ভ্রমণোপাখ্যান, নয অন্তর্লোকেব ব্যক্তিগত প্রবন্ধেব পর্যাযে পড়ে। এব মধ্যে অকস্মাৎ সবসরূপে উপস্থিত কবেছে যে পঞ্চমুখে আমি তাব তাবিফ কবতে কুণ্ঠিত নই।

কেবল যে প্রচলিত ধাবাব ব্যতিক্রম বলেই বইটি প্রশংসাব যোগ্য তা নয। বইটি সুলিখিত। লেখক নিজে পাকা শিকাবী এবং অতি সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তিব অধিকাবী। লেখক নিজেব বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিব তাৎপর্যকে তিনি প্রকাশ কবতে সক্ষম। শিকাবেব উপকবণ ও আযোজন, অবণ্যেব সৌন্দর্য ও বহস্য, জন্তুব ভাষা ও আচবণ, বন্দুকেব ব্যবহাব ও প্রকবণ, শিকাবীব শিক্ষা ও সাধনা প্রতিটি বিষযে লেখক বিস্তৃত তথ্য পবিবেশন কবেছেন। শিকাবকাহিনীব শিহবণমূলক আবেদনকে ক্ষুণ্ন না কবেও বাঘ-বন-বন্দুক ও মানুষ সম্পর্কে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক সত্য উদঘাটিত কবেছেন।

মযহারুল ইসলাম : কবি পাগলা কানাই

পূর্বপাকিস্তানে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে মৌলিক গবেষণা সম্ভব কিনা, সম্ভব হলেও সে দায়িত্ব গ্রহণ করার মতো উদ্যোগ, অন্তর্দৃষ্টি ও শ্রমনিষ্ঠা আমাদের চরিত্রায়ত্ত কিনা—এ পর্যায়ের প্রশ্ন বর্তমানে আর উত্থাপনযোগ্য নয়। মাত্র কয়েক বছরেব মধ্যে বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ গবেষণামূলক পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রকাশ করে দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে তাঁদের অনুসন্ধানের ফলেই ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের অনেক বিস্মৃত বা অনাদৃত অংশ সকল সাহিত্যপাঠকের গোচরাধীন হচ্ছে, অনেক পরিচিত অংশ সম্পর্কেও গতানুগতিক ধারণাদির বিকারমুক্তি ঘটছে। সম্প্রতি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ তাঁদের 'সাহিত্যিকী' মুদ্রিত করে এই অনুসন্ধানমূলক অভিযানের প্রকাশ্য শরিক হলেন।

'কবি পাগলা কানাই' রাজশাহীর গবেষণামূলক পত্রিকা 'সাহিত্যিকী'র প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধরূপে ছাপা হয়। বর্তমানে তার গ্রন্থাকৃতিও শোভমানতায় বিশেষ প্রীতিকর হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা মোট ২৪০। আলোচনামূলক ভূমিকাটি ৪৭ পৃষ্ঠা দীর্ঘ। ৪৮ পৃষ্ঠা থেকে ২৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত কানাইয়ের ২৪০টি গানের সংকলন। এর পরের তিন পৃষ্ঠা পাগলা কানাই সম্পর্কে কয়েকটি কিংবদন্তী উদ্ধৃত করা হয়েছে। শেষ দেড় পৃষ্ঠা গ্রন্থপঞ্জী।

পাগলা কানাইয়ের এতগুলো গান এক জায়গায় দেখবার সুযোগ করে দিয়ে ডক্টর মযহারুল ইসলাম আমাদেব সকলের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। পূর্ববাংলার লোকসংস্কৃতির স্বরূপ নিরূপণে যাঁরা এ যাবৎ নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রমস্বীকার করে আসছেন তাঁদের জন্যে এই গ্রন্থের তাৎপর্য আরো গভীর। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের (১৮১০-৯৫) একজন কৃতকর্ম বিষয়ক এরকম ব্যাপক পরিচয় তার রচনাবলীর মধ্য দিয়ে পূর্বপাকিস্তানে ইতোপূর্বে অন্য কেউ প্রচাব করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দু'একটি খণ্ডিত উদ্ধৃতিব টীকাভাষ্য হিসেবে কিছু বিচ্ছিন্ন আলোচনা বা সাধারণ তত্ত্বেব ব্যাখ্যা হয়তো আমরা লাভ করেছি, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ বিচার ও উপলব্ধির জন্য যে জাতীয় সংখ্যাসমৃদ্ধ সঞ্চয়ন আবশ্যক হয়, ড. ইসলামের 'কবি পাগলা কানাই' সেরূপ একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ। এই বিরাট কর্ম সম্পাদনের জন্য আমবা তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করি।

পাগলা কানাইয়ের গানসমূহ ড. ইসলাম নানা শ্রেণীতে বিভক্ত করে প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন প্রধান গীতগুচ্ছের শিবোনাম রেখেছেন—বন্দনা বা হাম্‌দ ও নাত, মনকে, দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব, হেয়ালী, প্রেমের মহিমা, ইসলামধর্ম, অনিত্যতা ও মৃত্যু, ব্যক্তিজীবনের বর্ণনা ইত্যাদি। এর মধ্যে দেহতত্ত্বের গানই সংখ্যায় সর্বাধিক, ২৯ থেকে ১০৫ সংখ্যক গান সবই দেহতত্ত্বমূলক। এ সকল গানে নানা রূপকে দেহের কথা বলা হয়েছে এবং দেহের রূপকে নানা গুহ্য-সাধনপ্রণালীর কথাও ব্যক্ত হয়েছে। যেমন :

> চারটি আঙ্গুল দেহের মাঝে বেয়াল্লিশ হাজাব দ্বার
> এক হাজাব মেরুদণ্ড রয়
> কোন্ দবজায় কেবা থাকে সেই কথা কও আমায়
> না বলিলে বয়াতীর ছাও ছাড়বো না তোমায়

নাভির নিচে কোন্ জনা আছে
বাহাত্তর সেজদা তোমার দেহের মাঝে কোন্ জায়গায়। (৬৪ নং গান)

পাগলা কানাই পল্লীকবি এবং সাধক কবি। হৃদয়ের বাণী রূপক আকারে গীতময় করে বলাই তাঁর কবিস্বভাব। তাঁর কবিভাষা কোনো কোনো সার্থক চরণে বা স্তবকে তাঁর নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হলেও সেগুলোর সাধারণ উৎস কোনো বিশেষ সম্প্রদায় বা সাধন প্রণালীর বিধিবদ্ধ পরিভাষা। ভাবচিত্র বা রূপকল্পের যে বৈচিত্র্যের সন্ধান সেখানে পাই তার বৈশিষ্ট্য কাব্যিক নয় বাহ্যিক, তত্ত্বস্পর্শিত এবং বহুলাংশে গতানুগতিক। কোনো জনপ্রিয় স্বভাবকবির রচনা যখন সংখ্যাধিক্যে বিশালত্ব অর্জন করে তখন তার পক্ষে প্রথানুবৃত্তি বর্জন করা সম্ভব হয় না। কবি পাগলা কানাইয়ের গৌরব এই জায়গায় যে তাঁর অশিক্ষিত পটুত্ব একাধিক গানে এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করেছে। প্রাণমনের সজীব স্পন্দন সেসব গানকে গ্রামোত্তর ও লোকোত্তর মহিমা দান করেছে। বিশেষ সাধন প্রক্রিয়ায় কেবল আন্তরিক প্রত্যয়বোধ নয়, তাকে স্থলবিশেষে রহস্যময় তীর্যক রূপক উপমার স্পর্শে মোহনীয় করে তুলতেও কবি প্রয়াস পেয়েছেন। 'কবি পাগলা কানাই'য়ের বিপুল সম্ভারের মধ্যে তার দৃষ্টান্ত বহু না হলেও বিরল নয়। ড. মযহারুল ইসলামের দীর্ঘ ভূমিকাটি পাগলা কানাইয়ের এই কবিসত্তা ও সাধকসত্তার কোনো পূর্ণ ও সাংলগ্নিক বিবরণ হিসেবে পাঠ্য নয়। কাব্যমূল্য বিচারে ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের অনুচিত ও অস্থির ধারণাদিই এর জন্যে দায়ী। ড. ইসলামের আলোচনা-রীতিও গবেষণামূলক বর্ণনার সাধারণ শৃঙ্খলা, মিতভাষিতা ও তথ্যানুগতির পরিপোষক নয়।

আমরা পাগলা কানাই সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও গ্রন্থলেখক যে সকল দৃষ্টিকোণ থেকে স্তবস্তুতি নিবেদন করতে চান, তার সারবত্তা স্বীকারে অক্ষম। পাগলা কানাই ভাব-সাধক গ্রাম্য কবি, অশিক্ষিত কবি। এ সকল কথা লেখক নিজেই বলেছেন। স্বীকারও করেছেন যে, "রবীন্দ্রনাথের সাথে পাগলা কানাইয়ের তুলনা একেবারে বাতুলতা।" (পৃ. ৩১) কিন্তু এজন্যে ড. ইসলামের যে সংকীর্ণ ও মারাত্মক ক্ষোভ তা তিনি প্রচ্ছন্ন রাখেননি। একাধিক জায়গায় মধুসূদন, বঙ্কিম, হেম, নবীন, বিহারীলাল, অক্ষয় বড়াল, রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রতিতুলনার আহ্বান জানিয়েছেন। 'যথার্থ মূল্য বিচার' করে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, 'গ্রাম্য কবি হয়েও এবং উচ্চশিক্ষার আলো না পেয়েও কবি পাগলা কানাই যা সৃষ্টি করে গেছেন— তার মূল্য বাংলা সাহিত্যের অনেক উচ্চশিক্ষিত কবির সাথে তুলনা করলে মৌলিক চিন্তা, শিল্প-সৃষ্টি ও ভাব-গাম্ভীর্যের দিক থেকে উৎকর্ষ বলে বিবেচিত হইতে পারে।' (পৃ. ২৬) এরপর হেম-কায়কোবাদের নিকৃষ্ট চরণ উদ্ধৃত করে পাগলা কানাইয়ের 'কাব্যব্যঞ্জনারস্থ তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব নিস্পন্ন করেছেন। (পৃ. ২৯) প্রসঙ্গত আধুনিক কাব্য এবং আধুনিক নারী সম্পর্কে তাঁর যে ব্যক্তিগত অননুরাগ তাও লিপিবদ্ধ করেছেন। (পৃ. ৩২, পৃ. ৩৫) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পাগলা কানাইয়ের ভাবগত ঐক্য লক্ষ করেছেন। (পৃ. ২৯) বলা বাহুল্য যে, বস্তুজগত ও ভাবজগতের শিল্পরীতি ও জীবনচেতনার দুই সম্পূর্ণ বিপরীত পরিমণ্ডলের কবিবর্গের মধ্যে এ জাতীয় তুলনা অহেতুক এবং ঔচিত্যবোধহীন।

ড. ইসলামের এই পর্যায়ের কোনো কোনো অভিমত পরস্পরবিরোধী ভাবের দ্বারা গুরুতরভাবে পীড়িত। যেমন, 'মধ্যযুগের সাহিত্যের যে রীতি তারই রেশ পাগলা কানাই তাঁর গানে টেনে ফিরেছেন এ কথা ঠিক—মধ্যযুগের সাহিত্যের সাথে কবির প্রাণের যোগ ছিল না।' (পৃঃ ৩১) অনাবশ্যক মুগ্ধবোধ নিয়ে তিনি যখন আরো এক-শেষ বিচারের অবতারণা করে বলেন, 'বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার লক্ষণ' যে 'ঘোরতর মানবমুখীনতা' পাগলা

কানাই তার অংশীদার, "তাঁর সারা জীবনের সঙ্গীতসাধনায় শুধু মানুষের কথাই বলে গেছেন। তাঁর গানেব মূল বিষয়বস্তু প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ছিল মানুষ" (পৃ. ৩৩) ইত্যাদি, তখন আমরা বিভ্রান্ত অনুভব করি।

ব্যক্তিগত ধ্যান-ধারণার আদলে অসংলগ্ন প্রশংসা আরোপের প্রবণতা পাগলা কানাই সম্পর্কে একাধিক অপ্রমাণিত সিদ্ধান্তের জন্ম দিয়েছে। যেমন "তাঁর গানের মধ্যে এই নামাজ-রোজার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ এবং শরিয়ত মোতাবেক জীবনকে গড়ে তুলবার প্রেরণা ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়।" (২১)- এই উক্তিটি। পাগলা কানাইয়েব দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব, প্রেম, গুরুবাদ এবং সর্বোপরি হেয়ালী শ্রেণীতে গানগুলো পাঠ করে তাঁকে যতটা বাউলপন্থী কোনো বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীতে আস্থাবান এক স্বতন্ত্র ভাব-সাধক কবি বলে প্রতীতি জন্মে ততটা কোনো সুনির্দিষ্ট সমাজগ্রাহ্য অস্থিতিস্থাপক ধর্মপ্রথার অনুসারী বলে মনে হয় না। ড. ইসলাম কর্তৃক ইসলামি গান বলে সম্মানিত একটি রচনায় আছে :

> আমি সভাস্থলে যাই প্রকাশ করে
> নব্বই হাজার পারা ছিল গো নূরনবী খোদার দিদারে ॥
> পঞ্চাশ হাজার গুপ্ত রল, বাকি চল্লিশ কোরআন হলো
> নব্বই পারা ছিল কোরআন, হাদিসে পাওয়া গেল
> ও তার দশ সেপারা কোন জায়গায় ছিল
> পাক পঞ্জাতন হক নিরঞ্জন মিনকুল্লে
> কোরআন কোন বস্তু হোল (১৫৩ নং গান) ॥

১৪৩ নং ও ১৪৫ নং গানদ্বয়ও এই প্রসঙ্গে পরীক্ষাযোগ্য। অন্যত্র সাধনতত্ত্বের একটি গানে আছে :

> ওরে তোর কালি মা তার গুণপনা ভাল
> সে স্বামীর বুকে পা দিল
> সেও কথাটি সভাতে বল।
> আমার মা বরকত যিনি আলীর বুকে কি পাও দিছিল!
> এমন বেজাইতা মা তোর কোন্ দেশে ছিল ॥ (১২০ নং গান)

এসব পড়ে একথাই মনে হয়েছে যে, পাগলা কানাইয়ের শিল্পচাতুর্যের কল্পিত জটিলতা উন্মোচনেব পরিবর্তে প্রয়োজন ছিল তাঁর ধর্ম-সাধনার তত্ত্বকে তন্ন তন্ন কবে পরীক্ষা করা, তাঁর মধ্যে গুহ্য-সাধন প্রক্রিয়ার যে সকল সংকেত রয়েছে—তার মর্মোদ্ধার করা এবং অপরাপর বাউলপন্থী জীবনচেতনার সঙ্গে কানাইয়ের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও তৎকালীন সামাজিক ধর্মীয় চেতনার সম্পর্ক কী ছিল তার পুনর্বিচার করা। এ ব্যাপারে ড. ইসলাম উৎসাহহীন।

পাগলা কানাইয়ের কাব্যমূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে একবার মাত্র ড. মযহারুল ইসলাম একটি প্রাসঙ্গিক তুলনার উল্লেখ করেন। সে মন্তব্যটি হলো—'পাগলা কানাইয়েব সমসাময়িক কবিদেব কাব্যে ছন্দ সৃষ্টিতে বা কথার গাঁথুনি নির্মাণে এমন অপরিসীম কৃতিত্ব এক লালন ছাড়া আব কারো মধ্যেই ছিল না।' দুর্ভাগ্যবশত এই বিচার যথাযথ সম্প্রসারণ [illegible] না অন্যান্য বাউল কবিদের সুনির্দিষ্ট পরিচযও তথ্যসমৃদ্ধরূপে [illegible] হলে [illegible] শুনেছি যে—"বাউল-গানের মূল বিষযবস্তু একটি ধর্ম[illegible] [illegible]ক্রিয়াকলাপ। ইহার পরিধি সংকীর্ণ ও বৈচিত্র্যহীন। ব্যক্তিগত [illegible]

বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণের সম্ভাবনা ইহার মধ্যে নাই। ..... গুরুবন্দনার পদ, শরণগতির পদ, দেহতত্ত্বের পদ, মনের মানুষের পদ প্রভৃতি ভাব ও তত্ত্বের দিক হইতে মূলত প্রায় সবই সমান— ভিন্নভিন্ন কবির রচনা হইলেও ভাবকল্পনার পার্থক্য নূতনত্ব বা দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিকত্ব বিশেষ বিশেষ কিছুই নাই।" (উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বাংলার বাউল, কলিকাতা, ১৩৪৬, পৃঃ ১০৯ ও ১১১) কিন্তু যেটুকু মৌলিকত্ব ও পার্থক্য আছে একজন কবির পরিচয় প্রদানকালে তা অবশ্যচিহ্নিত করে দেয়া প্রয়োজন ছিল। ভাবে ভাষায় ভঙ্গিতে পাগলা কানাই ঠিক কোথায় কতখানি লালন শাহ, শেখ মদন, ভানু শাহ, আলীমুদ্দিন, ভেলা শাহ, হাসান, ইলাল শাহ, মুন্সী বেলায়েত হোসেন প্রভৃতি সমধর্মী কবিবৃন্দ থেকে স্বতন্ত্র সেই জরুরি সংবাদটি ড. মযহারুল ইসলাম পরিবেশন করেন নি, হয়তো অনুসন্ধানও করেন নি। এই জ্ঞানাভাব যে কতটা বর্তমান সংগ্রহের শুদ্ধপাঠ বিচারকেও দুঃখজনকভাবে প্রভাবান্বিত করেছে সে কথা আমরা গ্রন্থের সম্পাদনা-রীতি আলোচনাকালে পরে উল্লেখ করব। 'বিষয়বস্তুর সীমাবদ্ধতা, ধর্মতত্ত্ব ও সাধন প্রণালীর র্বনার শুষ্কতা সত্ত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ কবিত্ব শক্তি ও সাহিত্য রসের' (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১) যে সকল দৃষ্টান্ত লক্ষ করা যায় তার সম্যক উপলব্ধির জন্যেও প্রয়োজন ছিল পাগলা কানাইকে অন্যান্য বাউল সাধক কবিদের পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তাঁব কবি-কীর্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ জরিপ করা।

নিছক তথ্য পরিবেশনের দিক থেকে পাগলা কানাইয়ের কাল নির্ণয়ের অধ্যায়টি সতর্ক অনুসন্ধান নিষ্ঠার সাক্ষ্য দেয়। এই নয়া বিচারের ফলে পূর্বতন ধাবণার মাত্র দশবিশ বছরের হেরফেব হলেও, নির্ধারণ প্রণালীটি নিপুণ ও যুক্তিগ্রাহ্য বলে প্রশংসার্হ। তবে পাগলা কানাইয়ের কাল, তাঁর সঠিক নাম, তাঁর জীবন-কথা ইত্যাদি প্রসঙ্গকে বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করার ফলে সমগ্র বক্তব্যে কিছু পরিহার্য শৈথিল্য, পুনরুক্তি ও অতিকথন প্রবেশলাভ করেছে। কবিজীবনীর বর্ণনা ও গান সংগ্রহরীতির ব্যাখ্যায় অবিজ্ঞানসুলভ অনেক আলাপচাবিতা এই ভূমিকায় প্রশ্রয় পেয়েছে। গানের তিল পরিমাণ উক্তিকে আশ্রয় কবে পাগলা কানাইয়ের শৈশব ও কবিজীবনের উন্মেষকালের যে বিশদ চিত্র আঁকা হয়েছে পরিণত মানসের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য তা অনাবশ্যক ছিল। স্বরচিত গানের সংকেতকে অগ্রাহ্য না করেও কানাই কেন পাগলা হলো তার অপরাপর সংগত কারণ ভাবা যেতে পারে। যেমন উপেন্দ্রনাথের মতে "বাউলবা নানা কারণে সমাজের লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিতে অনিচ্ছুক। তাহাদের সাধনা ও আচার-ব্যবহার সাধারণ লোকের নিকট অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, তাই তাহারা সর্বদাই আত্মগোপন করিয়া থাকে। সাধারণের জীবন-যাত্রার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া লোকে তাহাদিগকে পাগল বা ক্ষেপা বলে। ইহা হইতেই এই ধর্ম সম্প্রদায়ের লোককে বাউল (পাগল বা ক্ষেপা) বলিয়া অভিহিত করা হয়।" (উপেন্দ্রনাথ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭। 'কবি পাগলা কানাইতে উদ্ধৃত আবদুল কাদির সাহেবের মন্তব্যটিও এই প্রসঙ্গে পাঠ্য। (পৃ ৪৫) গান সংগ্রহেব ব্যাপারে ড. ইসলাম নিজের বৈজ্ঞানিকতা প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বলেছেন "গানগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে অশিক্ষিত মানুষের মুখ থেকে। সুতরাং মাঝে মাঝে শব্দবিকৃতি যে ঘটেছে তাতে সন্দেহ নেই। তবু যতদূর সম্ভব আমি এই বিকৃতি থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা কবেছি— যাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করে যথার্থ শব্দ আবিষ্কাব করতে প্রয়াস পেয়েছি।' কী প্রশ্নফলকে তিনি সত্য শব্দ গেঁথে তুলেছেন তার স্বরূপ ব্যক্ত না কবা পর্যন্ত আমরা নির্ভুল পাঠ সম্পর্কে উচ্চাশা পোষণ করতে অক্ষম।

পাগলা কানাইযেব গান সম্পাদনায় এই অবৈজ্ঞানিকতা, অনুমাননির্ভরতা ও অতিপ্রত্যয়ের

ঘোষণা আলোচ্য সংগ্রহের গৌরবকে গবেষণামূলক অনুসন্ধানের মর্যাদা লাভ করতে অংশত বাধা দিয়েছে। এক, সমগ্র সংগ্রহ সম্পাদনায় কোনো সযত্ন পরিচর্যার ছাপ নেই। ২৪০টি গানের মধ্যে মাত্র প্রথম ৩০টি গান টীকা সংবলিত, বাদবাকি দুশো বেটীকা। যে পর্যন্ত টীকা যুক্ত হয়েছে সেখানেও লক্ষ করা যায় যে টীকার আয়তন ক্রমশ শীর্ণকায় হয়ে এসেছে। দুই, বেশীর ভাগ টীকায় কেবলমাত্র সারমর্ম লেখা আছে। তাও গূঢ় অর্থে নয়, মামুলি অর্থে। যেমন ১৭ নং সংখ্যক গানের টীকার দুই বাক্যের এক বাক্য হোলো "মনকে সঠিক পথে চলার জন্য আবেদন জানিয়েছেন কবি।" ২১নং গানের টীকা হোলো "গুরুর চরণকে অমূল্য ধন মনে করে সাধনা করতে উপদেশ দিয়েছেন কবি।" ইত্যাদি। অর্থাৎ গানের যে তাৎপর্য অনামনস্ক শ্রোতার কাছেও বোধ্য তাকেই টীকায় ব্যক্ত করা হয়েছে, যে অংশ অবোধ্য বা দুর্বোধ্য টীকাকার তাকে নজরের মধ্যেই আনতে চাননি। যেমন ১৮নং গানের টীকা হোলো "কবি জীবননদীর ঘাটে কুম্ভীরের কথা বলেছেন— সে ঘাটে নামতে হলে গুরুভজনা করে কুম্ভীরকে বশ করতে হবে এবং তারপর নামতে হবে।" কবি যে কুম্ভীরের কথা বলেছেন তা হরফজ্ঞানী মাত্রেই লক্ষ করে থাকবেন কিন্তু সেই জ্ঞানালোকে কি ঐ গানের—

ঘাটে নামলে মরা মানুষ— কুম্ভীর হয় বেহুঁস
ও সেই কুম্ভীর ধাইয়া কুম্ভীর খাইছে-ও তার কি
জরা মৃত্যু আছে?
তাই পাগল কানাই কয় সেই ঘাটে কুম্ভীর রয়
তাজা দেখলে ধইরা খায় মরা দেখলে দৌড়িয়া পলায়
পাগল কানাই কয় ও মন সাধু
আজ কেন হলি বুধু। (১৮ নং গান)

—এই স্তবকটির অর্থোপলব্ধি ঘটে? টীকায় যে সাহায্য প্রত্যাশিত ছিল তা অনুপস্থিত। তিন, কোনো কোনো টীকায় নির্দেশিত অর্থ মূল গানের অপব্যাখ্যাও বটে। ১৬ নং গান দ্রষ্টব্য। চার, টীকায় শব্দার্থ-নির্দেশও সুশৃঙ্খল ও সামগ্রিক নয়। যেমন ১৯ নং গানের টীকায় 'বাকসা' শব্দের অর্থ দেয়া আছে। কিন্তু চিনা বুরুজ কুমপুনী কিম্বা ১৯ নং গানের বুধু শব্দের অর্থ কী তা বলে দেয়া নেই। হন্তে যে হইতে, সকুতলে যে সকৌতূহলে তা উল্লেখ না করলেও ততো ক্ষতি ছিল না, কারণ চরণের মধ্যে এগুলোর অর্থ আধুনিক পাঠকের কাছেও একেবারে অকল্পনীয় নয়। বিভিন্ন গানের 'মনরে রসনাম্ব, 'অধর চাঁদ', 'আগরাত খাগরাত', 'চানকা কাটা' ইত্যাদি বাক্যাংশের ভাষাগত ও তত্ত্বগত রূপ কী কারণে টীকায় আলোচনার অযোগ্য বোঝা গেল না। পাঁচ, টীকার দ্বিতীয় বাক্যটি অনেক সময়েই সংগৃহীত গানের শুদ্ধপাঠ সম্পর্কে লেখকের অপ্রতিষ্ঠিত প্রত্যয়ের ঘোণা মাত্র। যেমন— "আমার সংগৃহীত এ গানের সাথে মনসুরউদ্দিন সাহেবের সংগৃহীত গানে পার্থক্য রয়েছে প্রচুর– তাঁর গান মাঝে মাঝে অর্থহীন বলে মনে হয়।" (১৭ নং গান), "এ গানও মনসুরউদ্দিন সাহেব সংগ্রহ করেছেন— কিন্তু আমার গানের সাথে তাঁর গানের পার্থক্য আছে। নিঃসন্দেহে আমার সংগ্রহকে আমি যথার্থ মনে করি।ঃ (১৫নং গান)। আমরা কী করে নিঃসন্ধিগ্ধ হতে পারি সে পরামর্শদানে টীকাকার সম্পূর্ণ উদাসীন। ক্বচিৎ এক-আধ স্থলে পাঠ নির্ণয়ে অনুসৃত নীতির যে উল্লেখ করেছেন তা দোষণীয় নয়। ভূমিকায় তার একটি দৃষ্টান্ত ছিল। আরেকটি উদাহরণ— "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করেছেন— কিন্তু আমার এ সংগ্রহের সাথে সে গানের পার্থক্য প্রচুর। শব্দ চয়নের দিক থেকে এখানে উদ্ধৃত গানটাই অধিক সঙ্গত।" শব্দ চয়নের কী বৈশিষ্ট্য কানাইকে চিনিয়ে দিল সে কথা ড. ইসলাম গোপন রাখলেন কেন? ছয়, কোনো

কোনো গানের টীকায় কানাই সম্পর্কে এমন মন্তব্য আছে যা সহজেই অন্য গানের উদ্ধৃতির দ্বারা নাকচ করা চলে। ৩ নং গানের টীকা "গানটা জনাব মনসুরউদ্দিন সাহেবও সংগ্রহ করে ১৩৬৩ সনের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক মোহাম্মদীতে (পৃ. ৮০২) প্রকাশ করেন। কিন্তু আশ্চর্য সেখানে সর্বত্র খেজুর স্থান কালা (কৃষ্ণ) শব্দ রয়েছে। পাগলা কানাইয়েব গানে কোথাও এমন কৃষ্ণ প্রশস্তি নেই। বিশেষ কবে কোরানে আল্লাহ কৃষ্ণেব প্রশস্তি কবেছেন, পাগলা কানাইকে যতটুকু বুঝেছি, এ কথা কিছুতেই তিনি বলতে পারেন না। সুতরাং মুসলমানি গানও কিভাবে হিন্দু আদর্শে রূপ বদলায় এ তারই এক নিদর্শন। এখানে আমার সংগৃহীত গানই যে আসল তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।" বর্তমান গানের অপর পাঠের মতো না হলেও পাগলা কানাই যে কোনো কোনো গানে গভীর কৃষ্ণপ্রীতি ব্যক্ত করেছেন তা ড. ইসলামেব সংগ্রহ থেকেও প্রমাণ করা যায়। যেমন,

> পাগলা কানাই বলে ভাই সকলরে
> প্রেম কেউ ছাড়ো না
> কৃষ্ণ-প্রেমের পদ বিনে কিছু হবে না
> এই সংসার থাকতে মর্ম
> এই সংসার থাকতে ধর্ম
> প্রেম ছাড়া সাধন ভজন কিছুই হবে না। (১৩৫ নং গান)

সাত, গানেব বিষয়ভিত্তিক শ্রেণীকরণ একাধিক ক্ষেত্রে অসম। ইসলামধর্ম সম্বন্ধীয় বলে চিহ্নিত করা ১৪৩ নং, ১৪৫ নং, ১৪৬ নং, ১৪৭ নং, ১৫০ নং, ১৫১ নং ১৫৩ নং গান এত স্পষ্টতই অনৈসলামিক যে শিরোনামে মুদ্রণ প্রমাদ ঘটেছে বলে ভ্রম হয়। দেহতত্ত্ব, সাধনতত্ত্ব ও হেয়ালী পর্যায়ের অনেক গানের শ্রেণীকরণে যে পার্থক্য রক্ষা করা হয়েছে তার কার্যকাবণ গানগুলো পাঠের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে না। আট, ভূমিকাব কিছু কথা কিংবদন্তীব পবিচ্ছেদে যুক্ত হতে পারতো। নয়, সমগ্র গ্রন্থে তত্ত্ব ও তথ্যেব আশানুযায়ী সমৃদ্ধি লক্ষ করা যায় না। অধিকন্তু যেটুকু আছে তাব উৎস নির্দেশ নিতান্তই নিয়মবিবহিত। গ্রন্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য। অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ সে তালিকায় অনুপস্থিত! গ্রন্থোল্লেখ থাকলেও একাধিক ক্ষেত্রে তাদের সম্পাদক বা লেখকেব নাম প্রকাশের স্থান ও কাল বাদ পড়েছে। দশ, গ্রন্থের মুদ্রণ পারিপাট্যে চমৎকাবিত্ব থাকলেও আমরা বলতে বাধ্য যে এর আন্তরসজ্জা আবো সুশৃঙ্খল ও পরিচ্ছন্ন হলে পাঠসুখ বৃদ্ধি পেতো। কোনো কোনো পংক্তি যে কেবল অনাবশ্যক রকম বড় হবফে ছাপানো হয়েছে তাই নয়, সঙ্গে নিম্নবেখও যুক্ত কবা হযেছে। যেমন—"যে গানগুলোব নিচে কোনো নাম নেই সে সব আমার সংগৃহীত।" (পৃ. ৪৭) বিভিন্ন শ্রেণীর গানেব শিরোনাম কখনো পৃষ্ঠাব উপবে কখনো নিচে এমন বেনিযমে ছাপা হযেছে যে তার সংকেত থেকে পাঠ্যকালে ফয়দা ওঠানো কঠিন।

ত্রুটি-বিচ্যুতির তালিকা হযতো কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হলো। কিন্তু তাই বলে গ্রন্থটিকে মূল্যহীন প্রমাণিত কবা মোটেই আমাদেব অভিপ্রায় নয়। লেখক সুপণ্ডিত এবং বহুজনমান্য। এজন্যে তাঁর সামান্য বিচ্যুতিও আমবা নজবেব বাইরে ফেলে বাখতে রাজি হইনি। নতুবা বইটি যে তিশয় মূল্যবান, এব সংগ্রহের অংশ যে কেবল পল্লীসাহিত্য রসিকেব জন্য নয়, ীসাহিত্যের প্রকৃত গবেষকদেব জন্যে রত্নখনিস্বরূপ সেকথা আমবা আলোচনার সূচনাতেই ব কবেছি।

আত্মকথা

সূচি

কেন পড়ি

"আমি যত পড় য়াকে জানি তাঁদের মধ্যে এমন ব্যক্তি কমই আছেন যাঁর পড়ার নেশা জন্মগত প্রবণতার অংশ বলে বিবেচিত হতে পারে। বেশির ভাগ ব্যক্তিই এই অভ্যাস দীর্ঘকাল ধরে সচেতন শ্রম ও চেষ্টাব দ্বারা আয়ত্ত করেন। পরিবেশ ও সুযোগ কাউকে সাহায্য কবে, কাউকে করে না। আমাবও শৈশবে পড়তে আদৌ ভাল লাগত না। কিন্তু ভাল লাগাতে হবে এই সঙ্কল্প মনের মধ্যে ছিল। প্রথম বয়সে বড়াই করার উদ্দেশ্য নিয়েই বইপড়ার কঠিন শ্রমে আত্মনিয়োগ করি এবং একটা কবে বই শেষ কজকরেছি আর সদর্পে সেকথা জাহির করে বেড়িয়েছি। ক্রমে পাঠ-শ্রম স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয় এবং সৎ-গ্রন্থ পাঠে যে বিশিষ্ট আনন্দ তা আস্বাদন করার ক্ষমতা অর্জন করি। এখন জানি যে এ আনন্দ অক্ষয় এবং অনন্ত। এখন প্রতিদিনের বরাদ্দ আহার্য গ্রহণের মতোই নিয়মিত মূল্যবান কিছু পাঠ করতে না পারলে মন একপ্রকার অনুশোচনা ও অস্বস্তিতে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় যেন সময় বয়ে গেল অথচ আমি এগিয়ে যেতে পারলাম না। তখন আমার গৃহকর্মের আনন্দও নষ্ট হয়। ক্ষতিপূরণের জন্য দৃঢ়তর সঙ্কল্প নিয়ে, দীর্ঘতর সময়ের জন্য, বহুতর বইপড়ার আয়োজনে মেতে উঠি।

যত ধনী পরিবারই হোক, চৌদ্দ বছরের ছেলেকে সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দেওয়ার কথা বড় একটা শোনা যায় না। আর যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন মুসলিম পরিবারে লেখাপড়া ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি; যে কয়েকটি পরিবারে ছিল, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থাও লেখাপড়ার বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়নি। অথচ যাদের অর্থ ছিল, তারা লেখাপড়ার প্রতি ছিল আগ্রহহীন এবং স্বভাবতই সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া কেনার মতো মানসিকতা তাদের জন্মাবে না।

মুনীর চৌধুরী সাহেবের বাবা জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী ব্রিটিশ আমলে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু তাই বলে এক ছেলেকে এনসাইক্লোপিডিয়া দেবার মতো অর্থ প্রাচুর্য তার ছিল না। মুনীর চৌধুরী সাহেব বলেন :

> বাবা শত অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের লেখাপড়ার দিকে সর্বপ্রকার যত্ন নিতেন। সরকারী কাজে অন্য জায়গায় থাকতে হয়েছে তাঁকে বহুবার এবং বাইরে থেকে তিনি যখনই মাকে লিখতেন, আমাদের লেখাপড়ার কথা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী জোর দিয়ে উল্লেখ করা থাকতো।

অর্থাৎ মুনীর চৌধুরী সাহেবের প্রথম শ্রেণীর পাঠক হওয়ার পিছনে তাঁর বাবার অনুপ্রেরণাই সর্বাধিক। বাড়িতে ইংরেজি, উর্দু, আরবি বই মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ; সমস্ত ভাইবোনের যখন যে বই খুশি, টান দিয়ে পড়ার অবাধ সুযোগ ও অধিকার ছিল। হালিম চৌধুরী সাহেব বলতেন :

> তোমাদের জন্যে আমার আর কিছুই দিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই, এই বইগুলো ছাড়া। যদি পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে পড়ো।

বাবার এই অনুপ্রেরণা ছাড়া মুনীর চৌধুরী সাহেব আর একটি কারণে পড়াশোনায় আগ্রহী হয়েছিলেন। সেটি হচ্ছে :

> স্কুলের হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে লেখাপড়ায় পারতাম না। ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র ছিলাম না। কিন্তু তাদের সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে বাইরের বই পড়া একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে আমি মনে করতাম। হাতে সব সময় বই থাকত, যখনই সময় পেতাম পড়ে ফেলতাম। সব সময় হাতে বই থাকার জন্যে স্কুলে আমি চালিয়াত নামে পরিচিত হয়েছিলাম। হিন্দু বন্ধুরা বলত,
>
> মুনীর তুই সত্যিই পড়িস, না লোক দেখাস ?
>
> এই বইটার কোন্ চ্যাপ্টারে কী আছে, ধর আমাকে, বলে দেব।
>
> আসলে আমি স্থির করেছিলাম, চালিয়াতি যদি করতেই হয়, বই পড়েই করব।

পারিবারিক ঐতিহ্যের জন্যে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী পাঠক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন। বাসায় গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, ড্রইং রুমের অধিকাংশ জায়গায় দখল করে আছে বইয়ের শেলফ, তাতে দেশী-বিদেশী বইয়ের সমারোহ। শুধু তাই নয়, তাঁব ভেতরের ঘরেও বই ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।

সবকিছুই তাঁর পড়া চাই। আধুনিক জীবন ও জগতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে গেলে পড়াশোনা যে অপরিহার্য, সেটা তিনি বুঝেছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াব সময়। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়টি এমন, যার সঙ্গে শহবের যোগাযোগ ছিল না। শহবে যেতে হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হতো। শহবে এমন কিছু আকর্ষণ ছিল না, যাতে প্রত্যেক দিন যাওয়ার জন্যে মন টানে। তাই বাধ্য হয়ে পড়াশোনাতেই দিন কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। '

'আমি তখন কম হলেও আট ঘণ্টা পড়াশোনা কবতাম। দুপুরে ক্লাস শেষে খেয়ে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়তাম। আসলে তখনই থেকেই আমার পড়ার অভ্যেসটা গড়ে উঠেছে।'

মুনীর চৌধুরী সাহেব এখন নানাবিধ কাজে কর্মে ব্যস্ত থাকেন বলে, আগেব মতো পড়াশোনায় সময় কাটাতে পারেন না। দুপুরে বাসায় ফিরে, কিছুটা বিশ্রাম করে তিনি পড়তে বসেন। রাত বারোটা সাড়েবারোটার আগে ঘুমোন না। আর লিখতে শুরু করলে, রাত দুটো তিনটে এমনকি সারা রাতও তিনি জেগে থাকেন। পড়াশোনার দৈনন্দিন নিয়মের ব্যাঘাত হয় বলে, তিনি বলেছেন :

> আমাকে যেন বিকেলে অথবা সন্ধ্যায় কোনো অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো না হয়। আমার পড়ার সময় অনুষ্ঠানগুলো পড়ে বলে, আমার যথেষ্ট ক্ষতি হয়।

আগেই উল্লেখ করেছি, পারিবারিক ঐতিহ্যই মুনীর চৌধুরী সাহেবকে পাঠক হতে সাহায্য করেছে। বাবা স্কলার, বড়ভাই অধ্যাপক কবীর চৌধুরী স্কলার। সেজন্য তাঁর পক্ষে পনব বছর বয়সেই শেকসপিয়ার, শ, ডিকেন্স, হুগো পড়া শেষ হয়েছিলো। পরবর্তীকালে নাট্যকার হওয়ার বাসনা তাঁকে অধিকতর নাটক পাঠে উৎসাহিত করল। তিনি স্বীকার করেন,

> আমার পাঠ-সীমার মধ্যে নাটকই বেশী।

সাক্ষাৎকার (এক)

মুনীর চৌধুরী সমকালের সাহিত্য, শিল্পকলা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি সদাশ্রুত নাম। আমাদের পরিচিত পরিমণ্ডলের অঙ্গন জুড়ে তাঁর স্থান। মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা সহজ এবং তা আমরা হয়েছিও, কখনও অতিরিক্ত স্তুতিবাদে, কখনও অহেতুক নিন্দায়। তার প্রধান কারণ, আমরা রয়েছি তাঁর অতি কাছাকাছি। তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব সমকালের উপর এত অসামান্য যে, এখনও তিনি আমাদের রক্তে আলোড়ন সৃষ্টি করেন, কল্পনায় রোমাঞ্চ এনে দেন।

তিনি শিল্পী, তিনি সাহিত্যিক, আবার তিনি পণ্ডিত, তিনি অধ্যাপক। আমাদের এই 'গ্রেট মাইনর' বা খণ্ড প্রতিভার যুগে তিনি অবশ্যই একজন প্রতিভাধর।

অধ্যাপক মুনীর গভীর আন্তরিকতায় উদ্বুদ্ধ। মহৎ মানবিক বেদনায় পরিমার্জিত তার শিল্পীকণ্ঠ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি যখন প্রতিবাদ কবেন তখনও নিজে তিনি বেদনায় আপ্লুত, তখনও তাঁর হৃদয় রক্তাক্ত। তিনি বিদ্রোহী কিন্তু তাঁর ঘৃণা ও ক্রোধ অসীম করুণায় পরিমার্জিত, পরিশুদ্ধ ও ধৌত। এমন কি অনেক সময় হৃদয়াবেগের প্রাবল্যে তা আপোষধর্মী !

নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর বিচিত্র জীবনী বিভিন্ন অঙ্কে বিভক্ত একখানা নাটক। তাঁর জীবন-নাট্যের কত না বিচিত্রি বর্ণলীলা, কত সুদূর প্রসারী কল্পনা ও কর্মের উন্মাদনা। আবার ওতেই আশ্চর্যরকমভাবে মিশেছে কতনা ভাল-মন্দ, সংস্কার ও আবেগের প্রেরণা। তাঁর অত্যন্ত সংবেদনশীল এক বিরাট হৃদয় রয়েছে ; কিন্তু সেই বিরাট হৃদয়ের আড়ালে তাঁর যুক্তিনির্ভর যে মনটি রয়েছে তা অক্লান্তভাবে বৈচিত্র্যের সন্ধানী। তাই তিনি হয়েছেন সম্পূর্ণরূপে পরিবেশের দাস— চারিদিকের আবেষ্টনীর শিকার। তার এই বৈচিত্র্য-পিয়াসী মনের সাথে যুক্ত হয়েছে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার ঐকান্তিক অভিলাষ। নিজেকে নিয়ে সুখী থাকার একটা প্রবণতা তাঁর সকল কর্মের আড়ালে।

তিনি বিচিত্রভাবে বাঁচতে জানেন। জীবনের একাধিক বিষয়ে তিনি উৎসাহী ও পারদর্শী। তিনি ভাল ছবি আঁকেন, শিকার করেন, ভাল অভিনয় করেন। ঝোলা হাতে তাঁকে বাজার করতে দেখা যায়, তাঁর মোটরের পিছনে মাছ ধরার সরঞ্জাম সব সময় মজুত। মজার কথা, তিনি বাঁশি ও বেহালা বাজাতে পারেন।

অন্তরঙ্গ আলোকে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনার সাথে পরিচিত হতে আমার তিনটা বৈঠকী দিতে হয়েছে। তাও কি শুধু ঘরে বসে ! কখনও মোটরে, কখনও ফোনে। একঠায় বসে থাকা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।

জীবনকথার শুরুতেই তিনি বলেন, "প্রবল প্রাচুর্য আর গভীর আন্তরিকতার মধ্যে আমি লালিত। ১৯২৫ সালের ২৭শে নভেম্বর আমার জন্ম। সেদিন ছিল শুক্রবার। আমাদের

বাড়ি নোয়াখালী। মামার বাড়ি কুমিল্লা অথচ আমি জন্ম নিলাম মুন্সীগঞ্জে। বাবা জনাব আবদুল হালিম চৌধুরী তখন সেখানে এসডিও।

"আমার জ্ঞানের উন্মেষ ঘটে বগুড়ায়। সেখানকার সব স্মৃতি আমার কাছে ঝাপসা-অস্পষ্ট। যখন আমি সব কিছু বুঝতে শিখলাম তখন আমরা পিরোজপুরে। বিদ্যা ও বিত্তে একটি সম্ভ্রান্তশালী পরিবারে আমি মানুষ। সমাজে কেতাদুরস্তভাবে বাঁচতে হলে তার জন্য যেসব কায়দা রপ্ত করতে হয় তা ছিল আমাদের পবিবারের মজ্জাগত। বাবা ছিলেন ইংরেজি ও আরবিতে পণ্ডিত। মনে আছে 'রওয়ানে গুল' তেল, 'পিয়ারসন' সাবান আর কিউটি করা পাউডার সে সময় আমাদের বাড়িতে গড়াগড়ি দিত। খাওয়া আর পড়ার প্রবল প্রাচুর্য ছিল আমাদের পরিবারে। রাশিরাশি বই আর খাবারে মধ্যে ডুবে থাকতাম।

"আমাদের নাস্তার জন্য কলকাতা থেকে রুটি আব পলমলের মাখনের টিন আসতো। ম্যাট্রিক থেকে এমএ ক্লাস পর্যন্ত আমার নাস্তা ছিল কমপক্ষে ১২ স্লাইজ প্রচুব মাখন দেয়া রুটি, ৩টা ডিম, কিছু মিষ্টি, একবাটি দুধ আর পরে দু'কাপ চা। এখন কর্মজীবনে ২/৩ স্লাইজ রুটি। যেদিন মাখন দেয়া থাকবে, সেদিন ডিম নেই। বলছি না, এর বেশি খাবাব সামর্থ্য নেই, সমাজ অবস্থার বিবর্তনের কথা বলছি। ছোটবেলায় খাওয়াব ব্যাপারে কোন 'না' ছিল না। তবে বিলাসিতা পেস্ট্রি, কেক্—এসব আমাদেব বাসায় উঠত না। আমাদের বড় হওয়ারও অনেক পরে পর্যন্ত আমাদের বাসায় ড্রইং রুম ছিল না।

পড়াশোনার ব্যাপারে বাবা ছিলেন অত্যন্ত কড়া। আমবা ১৪ ভাই বোন। বাবা সবাইকে বাড়িতে নিজে পড়াতেন। বিশেষ ইংরেজি আর আরবি। ছেলেপেলেদের পড়ানোর প্রতি তার একটা ঝোঁক আগাগোড়া দেখেছি। এখন একটা কথা বাবা প্রায় সাবধান করে দেন, 'কোনো ইংরেজি বা বাংলা পাঠ্যপুস্তক আমি সংশোধন না করে দিলে পড়া শুরু করবি না।' বাবার শাসনের বেড়াজালে আমি মানুষ। বাবার হাতে বহুবার বেত খেয়েছি।

দেয়ালভর্তি বইয়ের মধ্যে আমার জন্ম। আমার বয়স যখন ১৪ বছর, তখন বাবা সাতাশ খণ্ড এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা উপহার দিয়েছেন। মার প্রতি বাবার ঢালাই নির্দেশ ছিল, বই কেনার জন্য যখন পয়সা চাইবে দেবে। তিনি আমাদের ছোটবেলাতেই শিখিয়ে দিয়েছিলেন, সম্মান অর্জনের উপায় একমাত্র জ্ঞানার্জনেব পথে। তিনি বলতেন, 'তোমাদের জন্যে আমার আর কিছুই দিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই, এই বইগুলো ছাড়া। যদি পৃথিবীতে মানুষের মতো বেঁচে থাকতে চাও, তা হলে পড়।' বাড়িতে ইংরেজি, উর্দু, আববি, বাংলা বই ছিল মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত।

১৯৩৫ সালে বাবা ঢাকায় বদলি হয়ে আসেন। আমি ভর্তি হই ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে। আমবা থাকতাম আর্মানিটোলায় জোবেদামহলে। স্কুলে আমি কোনো সময় ভাল ছাত্র ছিলাম না। ক্লাসের হিন্দু ছাত্রদের সাথে লেখাপড়ায় পারতাম না। কিন্তু তাদেব সাথে পাল্লা দিতে হলে বাইরের বই পড়া একমাত্র শ্রেষ্ঠ অবলম্বন বলে আমি মনে করতাম। সব সময় হাতে বই থাকতো বলে স্কুলে আমি 'চালিয়াত' নামে পরিচিত হয়েছিলাম। বন্ধুরা বলতো, 'মুনীর তুই সত্যিই পড়িস, না লোক দেখাস'? আমি বলতাম— 'এই বইটাব কোন্ চ্যাপ্টারে কী আছে, ধর আমাকে, বলে দেব।'

আসলে আমি স্থির করেছিলাম চালিয়াতি যদি করতেই হয়, বই পড়েই করব।

"১৯৪১ সালে আমি ম্যাট্রিক পাস করি। এরপর কী পড়ব ? বাবা চাইলেন আমি ডাক্তার হই। ঠিক হল. আইএসসি পড়া। গেলাম আলিগড়ে। প্রথম বাড়ির বাইরে গেলাম। আমার মধ্যে নিয়ম না মানার একটা অবাধ্যতা ছোটবেলা থেকে ছিল। তাই ভাই-বোনদের মধ্যে আমি ছিলাম একটু বেয়াড়া। এবার বিহঙ্গ মুক্ত হোল।

আলীগড় আমায় মোহিত করতে পারে নি। তবে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের যা আমাকে আকর্ষিত করেছিল, তা হচ্ছে এর বিশাল পাঠাগার। বিশ্বের সকল লেখকের রচনার সাথে আমার ঘনিষ্ঠ যোগ হয় এই পাঠাগারে।

বিজ্ঞানের প্রতি আমার খুব ঝোঁক ছিল না। ক্লাসের পড়ার চাইতে বাইরের পড়াতেই আমার সময় কাটত বেশি। শেষ পর্যন্ত দু'পেপার পরীক্ষা সম্পূর্ণ রূপে না দিয়েই পালিয়ে এলাম।

বাড়িতে বাবা-মা শুনে ভীষণ রাগ করলেন। বড়ভাই কবীর চৌধুরীকে জানালাম, আমি আইএ পড়ব। আরেকটা সুযোগ আমায় দাও। বড়ভাই আমাকে গভীর অন্তরঙ্গতাব সাথে বিচার করলেন। আমার প্রতি তাঁর ছিল ভীষণ আস্থা। তিনি বাবাকে বোঝালেন। তাঁর প্রেরণার ফলেই আমার মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়ের সঞ্চার হয়। বাবা তখন বরিশালে। আমি সেখানে কলেজে ভর্তি হওয়ার কথা ভাবছি। একদিন হাঁটছি। পথে আমার বন্ধু গওছুল আনম খাঁর সাথে দেখা। সে বলল, 'মুনীর তুই রেজাল্ট জানিস' ? সম্পূর্ণ পরীক্ষা দেইনি, তাই রেজাল্টের খোঁজ করিনি। সে বলল, 'তুই সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিস'। আমি তো আকাশ থেকে পড়েছি। ছুটলাম ব'বার কাছে। ট্রাঙ্কল করলাম। পরে জানলাম ঠিকই। মার্কশিট নিয়ে দেখলাম কোনো কোনো বিষয়ে এত বেশি পেয়েছি যে ও দুটো বিষয় ভালভাবে দিলে ফার্স্ট ক্লাস পেয়ে যেতাম।

এরপর ভর্তি হলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজিতে অনার্স। আলিগড় থেকে সৌখিনতার যে কটা দিক ছিল ষোলআনা শিখে এসেছিলাম। হাতে সিগারেটের টিন, পায়ে নাগরা, ধবধবে আচকান, পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম-যেন একটা সাক্ষাৎ বাদশাহজাদা। বিশ্ববিদ্যালয়ে রীতিমতো দর্শনীয় বস্তু হয়ে উঠলাম। আড্ডা দেওয়াব অভ্যাসটা আমি রীতিমতো রপ্ত করে এসেছিলাম। কিন্তু ক'দিন পরেই দেখলাম সে সব বেসামাল। একটা প্রথম অতৃপ্তি-পূর্ণাঙ্গতার অভাব তখন আমার কাঁচা মনে।"

মুনীর চৌধুরী তখন এক সংবেদনশীল ও হৃদয়বান তরুণ। অতৃপ্ত মুনীর এর আগেই ওয়াগনার ও টলস্টয়ের শিক্ষা— ইতালি ও জার্মানির মানবতাবাদের সাথে পরিচিত হয়েছেন। সেক্সপিয়ার, 'শ, ডিকেন্স, হুগো তখন তাঁর পড়া শেষ। এমন সময় তিনি এলেন একদল তরুণের সংস্পর্শে। শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্নে যারা বিভোর, মুক্তির সংগ্রামে যারা অকুণ্ঠ। তাঁর ভাষায়—

> সেই প্রতিভাদীপ্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধি ছেলেগুলি আমায় আকর্ষণ করল। তাদের নিষ্ঠা, মেধা, আর প্রজ্ঞা আমায় মুগ্ধ করল। সেই রবি গুহ, দেবপ্রসাদ, মদন বসাক, সরদার ফজলুল করিম, প্রত্যেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক একটি উজ্জ্বল রত্ন। তাদের সংস্পর্শে এসে দেখলাম আমার এতদিনের আভিজাত্য, চাকচিকাময় সৌখিনতা আব

চালিয়তি দম্ভ সব অন্তঃসারশূন্য, সব ফাঁকি। সে সময় পড়ুয়া ছাত্র হিসেবে আমার নাম হয়েছে। এদের চোখে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করলাম।

কোনো সুলভ আপ্তবাক্য আর এই সংবেদনশীল ও হৃদয়বান তরুণকে সন্তুষ্ট রাখতে পারল না। মানবতার জন্য সংগ্রামের যখন ডাক এল, তখন সাড়া দিতে তার খুব বেশি বিলম্ব ঘটল না। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি স্বচ্ছতর এবং সহানুভূতি আরও সমৃদ্ধ হয়েছে। সাহিত্যের পূর্বেকার ঝোঁক এবার তাঁকে রীতিমতো লিখিয়ে করে তুলেছে। এমন কি শিল্পকর্মে সৌখিনতার প্রলোভন তিনি অতিক্রম করেছেন। যে সুপ্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁকে এতকাল ধরে পীড়িত করেছে, তাকে তিনি জয় করলেন। 'শিল্পীর জ্ঞান-বিজ্ঞানও নয়, বোধিও নয়— এ জ্ঞানের ভিত্তি হচ্ছে আবেগময় অভিজ্ঞতা।' ধীরে ধীরে বহুবৎসর ধরে জীবন-জিজ্ঞাসার রহস্য তাঁর কাছে উন্মোচিত হয়েছে, হঠাৎ আলোর ঝলকানির আশায় ঊর্ধ্বমুখে বসে থাকেন নি তিনি, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই দুঃখের স্বরূপ চিনেছেন। চরম বামপন্থী আন্দোলনের সাথে তিনি জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ছিল অনলবর্ষী এবং মার্জিত রুচিসম্পন্ন। তখন এ দেশে মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার। যুগের সন্তান মুনীর একজন নিষ্ঠাবান মুক্তিসেনা ছিলেন। তাঁর ভাষায়—

> লিখব এ চেতনাটা দানা বাঁধল। এ সময়ে রাজনীতি জীবনকে নূতন অর্থ দিল। আমার চরিত্র গঠনে এর দান অপরিসীম। সে সময়টাও ছিল জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত। আমার মতো সমাজ-সচেতন ছেলে তা আন্দোলিত না কবে পারে নি। পড়াশুনা, বিতর্ক, আন্দোলন, সভা-সমাবেশ নিয়ে জীবনটা তখন অত্যন্ত কর্মমুখর। বিশেষ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কার সে দিনগুলোতে আমরা ছিলাম জাগ্রত প্রহরী। মনে আছে একদিন–রাত তখন একটা। শুনলাম এক ভদ্রলোক আটকা পড়েছেন বক্সীবাজারে। মাত্র দুজন সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে ছুটলাম তাঁকে উদ্ধার করতে। দেখলাম গুণ্ডারা অবরোধ করে আছে বাড়ি। তাবই মধ্যে মোটরে করে নিয়ে ফিরলাম তাঁকে। সে কী রোমাঞ্চ, সে কী উত্তেজনা। আমাব 'মানুষ' নাটকখানিতে এ জীবনের ছবিই এঁকেছি।

মুনীর চৌধুরী রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত হয়ে ঠিক করলেন ল' পড়বেন। কিন্তু পরিবেশের দাস মুনীর চৌধুরীর রাজনীতির প্রতি একনিষ্ঠ শ্রদ্ধা টিকল না। বৈচিত্র্যের সন্ধানী তিনি। বুঝলেন, যে রাজনীতিতে তিনি পা দিয়েছেন, তা চালিয়ে যাওয়া তাঁর মতো চঞ্চলচিত্ত তরুণের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতার জন্যই বামপন্থী বাজনীতি ছাড়লেন। তিনি বলেন :

> এ রাজনীতির প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই। এর দীর্ঘসূত্রিতা আমার দ্বারা সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণ রূপে জীবনকে চিনিয়ে দিতে পারলে আমি ধন্য হতাম, কিন্তু সে ত্যাগের ক্ষমতার অভাব ছিল আমার মধ্যে। তাই রাজনীতি ছেড়ে দিলাম একেবারে।

ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে তিনি বলেন :

> আমি ছাত্র দলাদলির চূড়ান্ত পর্যায়ে অংশ নিয়েছিলাম। হাতাহাতি পর্যন্ত করেছি, কিন্তু আমাদের সময় কখনও খুনাখুনি হয়নি। আমায় ছাত্ররা নাস্তিক বলত–বলত সাম্যবাদী। কথায় কথায় হুঙ্কার উঠত 'বাত্তি নেবাও'। বহু মার খেয়েছি— মাব

দিয়েছি, কিন্তু মারামারি খুনোখুনি পর্যন্ত পৌঁছায়নি। তাছাড়া আমরা বা আমাদের বিপক্ষ দল দুটো কাজ কখনও করেনি। তা হচ্ছে কখনও পুলিশের আশ্রয় নিইনি আর কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিকার দাবি করিনি। আমার মনে হয়, প্রতিক্রিয়াশীল চক্র এখন ক্রমশ ক্ষয়ে আসছে, তাই তারা এত মারমুখী হয়ে উঠছে।

রাজনীতি থেকে সরে এসে মুনীর চৌধুরী পুরোপুরিভাবে সাহিত্য সেবায় মনোযোগ দিলেন। তবে, সাহিত্য সাধনায় নিজেকে ব্যবসায়ীর হাটে নামিয়ে আনেন নি। শিল্পকে অবসর বিনোদনের পণ্য করবার কথা তিনি ভাবতেও পাবেন না। সে সময় তিনি ইংরেজিতে এমএ পাস করলেন (১৯৪৮)। চাকরি নিলেন দৌলতপুর কলেজে। বিয়ে করলেন। লিলি মীর্জার সাথে তাব পরিচয়, প্রণয় ও প্রেম অল্প দিনের নয়। তাকে বিয়ে করে সংসারি হওয়াব চিন্তা তখন তাঁর সম্পূর্ণ চেতনা জুড়ে। '৪৯ সনের মার্চ মাসে তিনি কারাগাবে নিক্ষিপ্ত হলেন। তখন প্রদেশব্যাপী বেল ধর্মঘট। তিনি রাজনীতি ছাড়লেও কর্তৃপক্ষ তাঁকে ছাড়লেন না। ছাড়া পেয়ে আবাব সে কলেজে গেলেন। তখন ঢাকায় ঢোকা তাঁর প্রতি একপ্রকার নিষেধ ছিল। '৫০ সালে জগন্নাথ কলেজ কর্তৃপক্ষ বিশেষ অনুমতি নিয়ে ঢাকায় আনলেন ইংরেজির অধ্যাপক করে। সেই বৎসরই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হলাম। এরপর দু'বছব নিরবচ্ছিন্ন অধ্যাপক জীবন। '৫২ সনেব মহান ভাষা আন্দোলনের সময় আমায় আবাব কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হোল। এ আন্দোলনের সাথে আমি সক্রিয়ভাবে আদৌ জড়িত ছিলাম না। শুধু গুলির খবর শুনে আমি পাগলেব মতো রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিলাম। প্রায় আড়াই বছর কাবাগাবে থাকলাম। কারাগারের শ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে– আমার বাংলায় এমএ ডিগ্রি, 'কবব' নাটক, 'শ'-এব অনুবাদ। কেউ কিছু বলতে পারে না, গলসওর্দীব অনুবাদ– রুপার কৌটা।

'কবর' রচনার কাহিনী মনে আছে। রণেশ দা'রা বললেন, একুশে ফেব্রুয়াবিতে অভিনয় করা যায় এ ধরনের নাটক লিখবে। মনে রাখবে, রাত ১০টার পর জেলাব বাতি নিভিয়ে দেবে। লণ্ঠনের আলোতে যেন নাটকটি করা চলে আর মেয়ে চরিত্র এমনভাবে থাকে, যেন পুরুষদের দ্বারা তা অভিনয় করা চলে। কবরের পাঠক জানেন 'কবর' নাটকে আমি তাদের দাবি পূরণ করেছি।

বাংলায় এমএ পরীক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে কারাগারে অজিত গুহ আমায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। মনে আছে ভাইভা পরীক্ষার দিনের কথা। আই-বি-আর পুলিশ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকলাম। মধুতে সবাই আমায় ঘিরে বসল। তাদেব কত জিজ্ঞাসা, কত আলাপ। হঠাৎ দূর থেকে আমাব বোন আমায় দেখতে পেয়ে ছুটে এল। জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল ও। ইংরেজি ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রীরা এসে কুশল জিজ্ঞাসা করল। যখন ভাইভা দিতে 'হেড'-এর ঘরে ঢুকলাম দেখি সব কয়েকজন পরীক্ষক খানিকক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। সে কী আবেগাপ্লুত মুহূর্ত ! ড. এনামুল হককে ডক্টর শহিদুল্লাহ বললেন, ওনাকে কী আর প্রশ্ন করব ? রেজাল্টটা জানিয়ে দিই। তখন রেজাল্ট ভাইভার আগেই ঠিক হয়ে থাকত। তারা আমায় জানালেন– ভাল করেছি। এ আমার জীবনের প্রথম পরীক্ষায় সর্বোচ্চ কৃতিত্ব।

"আমি প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছিলাম।"

"জেল থেকে ছাড়া পেলাম '৫৪ সনে। তার পর কিছুদিন ইংরেজিতে ফুলটাইম আর বাংলায় পার্টটাইম অধ্যাপক হিসাবে কাজ করেছি। পরে বাংলায় পুরোপুরি অধ্যাপক হয়ে গেলাম। এ ব্যাপারে অধ্যাপক মুহম্মদ হাইয়ের সাহায্য আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সমকালে আরেকজনের ব্যক্তিত্বের প্রভাব আমার উপর রয়েছে। তিনি আমার সংশোধক ও পরীক্ষক এবং গবেষক ডক্টর ·এনামুল হক।

"১৯৫৬ সালে আমি ভাষাতত্ত্বে এমএ. পড়ার জন্য হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যায়ে গেলাম স্ত্রী-পুত্রসহ এক বিশেষ বৃত্তি নিয়ে। সেখানে পড়াশুনা ছাড়াও বিদেশ ভ্রমণের যে আনন্দ তা আমি উপভোগ করেছি। বিশেষ করে আমার প্রিয় নাটক দেখার সুযোগ আমি ছাড়তাম না। বোস্টন ছিল নাটকের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে বিশ্বের বিভিন্ন নাটক ও অভিনেতার সৃষ্টির সাথে পরিচিত হওয়া অবকাশ ঘটল আমার। '৫৮ সালে ভাষাতত্ত্বে এমএ পাস করে স্বদেশে ফিরলাম।"

তিন বিষয়ে এমএ. পাস করে অধ্যাপক মুনীর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের জীবনযাপন শুরু করলেন। ১৯৬৩ সালে তিনি রিডার হলেন। এতদিন তিনি সাহিত্য পড়াতেন। বিশেষ করে নাটক। ইদানীং ভাষাতত্ত্ব পড়ানোর ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে আগ্রহী। সাহিত্য পড়াতে পড়াতে একঘেয়ে হয়ে গেছে তার কাছে। তিনি বলেন— I do not want to repeat myself, ছোটবেলা থেকে তিনি সাহিত্যচর্চা করতেন। ১৯৪২ সালে তাঁর প্রথম ব্যঙ্গ-বিদ্রূপপূর্ণ রচনা 'আসুন চুরি করি' ছাপানো হয়। তবে ১৯৪৬ থেকে ৪৮ সন পর্যন্ত রাজনীতিতে দীক্ষার সময় তাঁর সাহিত্য প্রকৃত জীবনদৃষ্টি খুঁজে পায়। তিনি শিখেন জীবনের বহু বিচিত্র নিরন্তর ধারাকে বুঝতে না পারলে শিল্পী আর শিল্পী থাকে না, তার অপমৃত্যু ঘটে। রাজনীতি ছাড়লেও সাহিত্যের জীবনদৃষ্টি তিনি এখনও হারান নি। সাহিত্যিক জীবনে তাঁকে যাঁরা প্রেরণা যুগিয়েছেন, তন্মধ্যে রণেশ দাশগুপ্ত, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদার প্রধান।

মুনীর প্রতিভার অবিসংবাদিত নিদর্শন হোল তাঁর নাটক। হয়ত অনেকের মতো তাঁর নাটকে কাহিনী দুর্বল, ঘটনার সংঘাত নেই। অভিযোগ গ্রাহ্য হলেও সম্পূর্ণ সত্য নয়। সমস্যামূলক চিন্তাশ্রয়ী নাটক রচনায় তিনি সমকালীন সব নাট্যকারকে অতিক্রম করেছেন। তাঁর এক বৃহৎ উদ্ভাবনী ক্ষমতা এবং তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। তিনি যেসব কাহিনী সৃষ্টি করেছেন, শ'-এর ভাবশিষ্য বলে হয়তো, কখনও তা অদ্ভুত, অবাস্তব ও অত্যন্ত সাময়িক কোনো সমস্যার সাথে জড়িত তবুও তাঁর রচনায় ধনতান্ত্রিক সভ্যতার বিরোধ, অসঙ্গতি, প্রতারণা ও আদর্শপ্রীতি ছলনার বিরুদ্ধে পরোক্ষ ও অন্তঃসলীলা আঘাত আছে। অনন্যসাধারণ হচ্ছে তাঁর সত্যভাষণের পদ্ধতি, তাঁর চতুর হাস্যরসামৃত বাচনভঙ্গি ও নানা বিপরীত কথন, এ পোগ্রামের মাধ্যমে অভ্যস্ত চিন্তা আর সংস্কারের জড়ত্বকে আঘাত করার কৌশল। তাঁর অপূর্ব বাক্যবিন্যাস, বুদ্ধিদীপ্ত ব্যঙ্গ এবং অতিশয়োক্তি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে আনন্দ দিয়েছে। তাঁর নাটকের মধ্যে কবর, চিঠি, রক্তাক্ত প্রান্তর, দণ্ডকারণ্য, রুপার কৌটা, কেউ কিছু বলতে পারে না প্রধান।

তাঁর সাহিত্য জগতে প্রবেশ ছোটগল্পকার হিসেবেই। মানুষের জন্য, ঋড়ম, ন্যাংটার দেশ, একটি তালাকের কাহিনী তাঁর বিখ্যাত গল্প। তার 'গ্ন পা' গল্প উর্দু ভাষায় অনূদিত হলে সুধীমহলে প্রশংসিত হয়।

গবেষণাতেও তিনি নিজেকে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর 'মীর মানস' মীর মোশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের উপর রচিত একখানি সারগর্ভ সমালোচনা।

সাহিত্য-গবেষণার জন্য তিনি দাউদ পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর 'তুলনামূলক সমালোচনা' বাংলাসাহিত্যের একখানি মূল্যবান সংযোজন হবে। সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যের নিরিখে তিনি বাংলা সাহিত্যকে পরীক্ষা ও বিচার করেছেন এ গ্রন্থে। তিনি সাহিত্যে বিশ্বনাগরিকতায় বিশ্বাসী। তাই সমকালীন তরুণ লেখকরা তাঁর প্রিয়পাত্র। অত্যাধুনিক সাহিত্যরীতি সম্পর্কে তিনি বলেন "অত্যাধুনিক পূর্বপাকিস্তানি গদ্য লেখকরা পূর্ববর্তী লেখকদের চোখে অনেক বেশি বিশ্বনাগরিকতা প্রাপ্ত ও স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী। চতুঃপার্শ্বে দেশভক্তির নামে গ্রাম্যতা, ধার্মিকতার নামে কূপমণ্ডুকতা এবং নীতিপরায়ণতার নামে অমানবিকতার প্রতাপ প্রত্যক্ষ করে এরা কুপিত। এরা সাহিত্যে সর্বপ্রকার মধ্যযুগীয়তা বিরোধী, লোকসংস্কৃতির স্থূল সরলতার পরিপন্থী।"

অধ্যাপক মুনীর জীবনে পরিপূর্ণ কিন্তু পরিতুষ্ট নন। তিনি প্রতিভাবান আর সে প্রতিভার স্বীকৃতি দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র তাঁকে দিয়েছে। এদিক থেকে তিনি ষোলকলায় পূর্ণ। কিন্তু কী একটা অভাববোধ— কী একটা না দিতে পারার বেদনা তাঁকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে। জীবনকে উৎসর্গ করতে না পারার বেদনা তাঁর জীবনে গভীর। প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ আর প্রাচুর্যের মধ্যে এখন বাস করা সত্ত্বেও আমি শিল্পীর চোখে মুখে মর্মপীড়ার স্বাক্ষর দেখেছি।

অত্যন্ত উর্বর মাটিতে একটি বীজ বিশাল মহীরূহের সম্ভাবনা নিয়ে অংকুরিত হয়েছিল। অনুকূল আবহাওয়ায় লালিত হয়ে তা একদিন বৃক্ষে পরিণত ও ফুলফলে ভরে উঠেছে. কিন্তু সে বৃক্ষের পাতায় পাতায় গায় সবুজের প্রশান্তি কই ?

সাক্ষাৎকার (দুই)

নির্মলেন্দু গুণ : স্বাধীনোত্তর যুগে আপনার কাছে বাঙালি জাতীয় জীবনের কোন তারিখটিকে সবচাইতে প্রিয়, উল্লেখযোগ্য এবং সংগ্রামী প্রেরণায় সবচাইতে উদ্দীপনামূলক বলে মনে হয় ?

মুনীব চৌধুরী : (গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তিনি উচ্চারণ করলেন) একুশে ফেব্রুয়ারি।

নির্মলেন্দু গুণ : ২১শে ফেব্রুয়ারি কি সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষার সংগ্রাম ছিল, না পুনরুদ্ধারের ?

মুনীর চৌধুরী : কেবল রক্ষা নয়, পুনরুদ্ধারেরও বটে।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি কি মনে করেন, এই সংগ্রাম শুধুমাত্র ভাষা এবং সংস্কৃতির প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ ছিল, না রাজনৈতিক তথা বাঙালির অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিও এর সাথে জড়িত ছিল ?

মুনীব চৌধুবী : এ আন্দোলন প্রকৃত অবস্থায় এমন ছিল, বরং বলা চলে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল, যা পরবর্তীকালে সংস্কৃতির প্রশ্নটিকে ভিত্তি করেই আমাদের রাজনৈতিক অধিকার তথা অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নটিই স্পষ্ট করে তুলেছিল। আর তাছাড়া রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক মুক্তি এবং সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা এ তিনটা প্রশ্ন এত বেশি একসঙ্গে মিশে যায় যে, কোনোটাকেই বিচ্ছিন্ন বা আলাদা কবে দেখাটা সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

নির্মলেন্দু গুণ : কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনে শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ থেকে কি আপনার কখনও মনে হয়েছে যে, এর পেছনে ভাষার চাইতে অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিটিই বেশি সোচ্চার ?

মুনীর চৌধুরী একটু চিন্তা করলেন, কপালে, মুখে তাঁর ডান হাতের আঙুলগুলো এলোমেলো খেলা করল কিছুক্ষণ— তারপর খুবই দৃঢ়স্বরে তিনি বললেন, —হ্যাঁ। আমার সব সময়ই মনে হয়েছে ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২-র ২১শে ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত মুহূর্ত পর্যন্ত আন্দোলনের এই যে বিস্তৃতি তার মধ্যে দরিদ্র-মধ্যবিত্ত ক্ষয়িষ্ণু পরিবারের ছেলেমেয়েদের অংশগ্রহণের এই যে উন্মাদনা, এর পেছনে অর্থনৈতিক অব্যবস্থা অনেকাংশে দায়ী। তিনি 'অনেকাংশে' শব্দটা পাল্টে নিয়ে পুনর্বার আরো জোর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন— বলা চলে মূল কারণ। তিনি উল্লেখ করেন, এই ভাষা আন্দোলনে মূলত মধ্যবিত্তেব অংশগ্রহণ তাই নানা কারণে উল্লেখযোগ্য।

হুমায়ুন কবিব তাহলে, ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্মসূচিতে অর্থনৈতিক মুক্তি প্রশ্নটিকেই আমবা পুরোধা ধরে নিতে পারি।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনাকে কবে কোথায় গ্রেফতার করা হয় ?

মুনীর চৌধুরী : আমার তারিখটা মনে নেই— খুব সম্ভব ২৪শে ফেব্রুয়াবি ভোবে ২৭নং নীলক্ষেতের বাসা থেকে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে।

হুমায়ুন কবির : এই কি আপনি প্রথম গ্রেফতার হলেন ?

মুনীর চৌধুরী : (হাসলেন তিনি, আমার মনে হলো এই মুহূর্তে তিনি অতীতেব অনেক কিছু ভাবছেন) না, ১৯৪৯ সালের ৩রা জুন আমি প্রথম গ্রেফতার হই।

নির্মলেন্দু গুণ : অপরাধ ?

মুনীর চৌধুরী : আমি তখন রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। রেল শ্রমিকরা তখন তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য হরতালের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। হয়ত সে কারণেই আমাকে গ্রেফতার করা হয়।

রেলওয়ে শ্রমিক প্রসঙ্গে আমরা তাঁর কাছ থেকে সোমেন চন্দেব কথা শুনলাম– সোমেন চন্দও একসময় রেলওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নে জড়িত ছিলেন। তখন অবশ্য সোমেন চন্দ বেঁচে নেই। সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিস্টদের হাতে ঢাকাব এই তরুণ সাহিত্যকর্মী নিহত হন।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি এক সময়ে মার্কসবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন। কারাগারে বসে আপনি 'কবর' নাটিকা যখন রচনা করেন, তখন কি বাইরের আন্দোলনকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ার দিকে প্রবাহিত করার কথা ভাবতেন ?

মুনীর চৌধুরী : প্রকৃতপক্ষে তখন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ১৯৪৮-এর পর থেকেই আমার আত্মোপলব্ধি হয়েছিল যে, প্রত্যক্ষ বাজনীতি আমার ক্ষেত্র নয়।

নির্মলেন্দু গুণ : অর্থাৎ একজন শিক্ষাবিদ ও লেখক হিসেবে আপনার কার্যক্রম সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন।

মুনীর চৌধুরী : প্রধানত তাই।

নির্মলেন্দু গুণ : আপনি তখন ছাত্র, ১৯৪৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয প্রাঙ্গণে ভাষা ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রথম ছাত্রসভা হয় তাতে আপনি বক্তৃতা দিয়েছিলেন– আপনার কি মনে আছে, আপনি কী বলেছিলেন সেখানে ?

মুনীর চৌধুরী : আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ঘটনাটা। বদরউদ্দীন উমরের 'পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি' পড়ে আমি সেটা জানলাম– কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি ঠিক মনে করতে পারছি না, আমি হুবহু কিভাবে কী বলেছিলাম, তবে বক্তব্য নিশ্চয়ই 'ভাষা ও সংস্কৃতির স্বাধিকার দিতে হবে'— 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই'— এই সবই ছিল। আমাদের বক্তব্য ছিল বাংলার পক্ষে লড়াই কবা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রের জন্যই লড়াই।

নির্মলেন্দু গুণ : এমন কোনো ঘটনার কথা কি আপনার মনে পড়ে যা একুশের স্মৃতি মনে এলেই— হোক আপনার খুবই ব্যক্তিগত তবুও— যা একটি নতুন তাৎপর্য বহন করে, যা কোথায় আলোচিত হয় নি, খুব ব্যক্তিগত হয়েও যা ব্যক্তিকে অতিক্রম করে যায় ?

মুনীর চৌধুরী : (কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন তিনি) তেমন কিছু মনে পড়ছে না ; শুধু মনে

পড়ছে, আমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র শিক্ষকতায় ঢুকেছি— সাইকেলে চড়ে ক্লাস করতে যেতাম। এগারটার সময় ক্লাস করে বাসায় ফিরছি। সাইকেলে থাকা অবস্থাতেই টিয়ার গ্যাস-এর শব্দ আমার কানে আসছিল— আমি বাসায় না গিয়ে আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকেই ফিরে যেতে চাইলাম। কিন্তু পথে গিয়েই দেখলাম, সারা পথ ফাঁকা, থমথমে, ইপিআর-এর গাড়িগুলো যাচ্ছে-আসছে— বিশ্ববিদ্যালয় ভবন থেকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে ছেলেরা। একেবারে গুলি চালানোর পূর্ব অবস্থা। একজন পুলিশ সার্জেন্ট আমাকে সাইকেল সমেত থামাল— 'ভাগো হিয়াসে'। আমি রেগে গিয়ে বলতে চাইলাম— আই এম এ 'ভার্সিটি টিচার। মূর্খ পুলিশের কানে সেটা অর্থহীন শোনাল। পেছন থেকে লাঠি দিয়ে আঘাত করল একজন পুলিশ— আমি মাটিতে পড়ে গিয়েছিলাম। আজকে সেই দিনের কথা মনে করেই আমার ড. জোহার কথা মনে পড়ছে। জোহা সেটা সহ্য করতে পারেননি— আর পারে নি বলেই জীবন দিয়ে তাঁকে চলে যেতে হলো। সাইকেলে উঠিয়ে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল— আমি ভিসির কাছে গিয়ে নালিশ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু যাবার পথেই শুনলাম গুলির শব্দ। তার পর মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়লো ছাত্র-হত্যার সংবাদ, যার কাছে আমার নিজের সংবাদ মনে হচ্ছিল অর্থহীন।

[পুলিশের অত্যাচারের কথা শুনেই একটু উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল হুমায়ুন, সে সঙ্গে সঙ্গেই ড. জোহার হত্যাকারীদের সমুচিত শাস্তি বিধানের দাবি জানানোর জন্যে মুনিব চৌধুরীর প্রতি আহ্বান জানাল এবং আমাকে এ তথ্যটি ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করার অনুরোধ জানাল।]

নির্মলেন্দু গুণ : একুশের শহীদদের প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেও বলছি— আমার মনে হয়, আমাদের দেশে আসাদই প্রথম রাজনীতি সচেতন শহীদ। একুশে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন তাঁদের কেউই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন না— আপনি কি স্বীকার করেন, কিম্বা এঁদের মধ্যে কেউ রাজনীতি সচেতন ছিলেন বলে আপনার মনে পড়ে ?

মুনীব চৌধুরী : আমার তেমন মনে পড়ে না— তবে রাজনীতি সচেতন শহীদ বলতে আসাদকেই বোঝায়। এই প্রসঙ্গে তিনি শহীদ আবদুল মালেকের নামও উল্লেখ করেন এবং আক্ষেপ করে বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারিতে আরো অনেক বেশি লোক শহীদ হয়েছে বলে আমার ধারণা। শহীদদের একটা প্রামাণিক দলিল তৈরি করা উচিত।

নির্মলেন্দু গুণ : যারা একুশের ভাষা আন্দোলনে হিন্দুদের হস্তক্ষেপ ও স্বার্থ আবিষ্কার করে আপনাদের বিরোধিতা করেছিলেন, আপনার কি ধারণা তারা আজও ধর্মের নামে বাংলা সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে বিকৃতি করার কাজে লিপ্ত রয়েছে ? এদের বিরুদ্ধে কি আপনি সচেতন ?

মুনীর চৌধুরী : নিশ্চয়ই আছে এবং আমি অনেকের মতো এদের বিরুদ্ধে সচেতন। যদিও আগের চেয়ে এদের কণ্ঠ খুবই ক্ষীণ তবুও সরকারি পর্যায়ে এরা অনেক বড় বড় পদ অলঙ্কৃত করে রয়েছে। সুতরাং এদের বিরুদ্ধে সচেতন থাকাটা সবারই উচিত।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা একাডেমী তার সাহিত্য পুরস্কারের নাম 'একুশে ফেব্রুয়াবি সাহিত্য পুরস্কার' রাখা ঠিক করেছেন। আপনি কি এটাকে একটা শুভ পদক্ষেপ বলে

মনে করেন এবং আদমজী, দাউদ প্রভৃতি শিল্পপতিগোষ্ঠী পরিচালিত প্রদত্ত পুরস্কারের নাম পরিবর্তন করার বা এসব পুরস্কার বর্জন করার যে দাবি উচ্চারিত হচ্ছে, আপনি কি তা সমর্থন করেন ?

মুনীর চৌধুরী : হতে পারে এটা একটা শুভ পদক্ষেপ— কিন্তু বিরাট পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি না। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বাংলা উন্নয়ন বোর্ড গণসমর্থন অর্জন করার জন্য একুশের সংকলনকে পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে— রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক-গায়িকাদের ডেকে নিয়ে পুরস্কার দিয়েছেন।

নির্মলেন্দু গুণ : অর্থাৎ অনেক সময়ের সাথে সুর মিলিয়ে রঙ বদলাচ্ছে বলে আপনার ধারণা ?

মুনীর চৌধুরী : সে জন্যেই বলছিলাম— যে পর্যন্ত আমাদের সমাজজীবনে প্রচলিত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করতে না পারছি, সে পর্যন্ত কোনো ব্যাপারেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে যাওয়া যায় না।

আদমজী, দাউদ পুরস্কার সম্পর্কে তিনি বলেন, সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ছাড়া এগুলো বর্জন করার খুব বেশি অর্থ হয় না। কেননা, নাম পরিবর্তনই বড় কথা নয়। তিনি স্বীকার করেন, আদমজী পুরস্কারে কোনো সময়ই সাহিত্যমূল্য রক্ষিত হয় নি— এতে লেখকের আর্থিক লাভ ছাড়া অন্য কিছুই হয় না।

এই পুরস্কার লাভে কোনোই গৌরব নেই। কোনো লেখক যদি পুরস্কার বর্জন করেন তিনি তাঁকে শ্রদ্ধা করবেন। এটা লেখকের জীবন-চেতনার উপর নির্ভর করে। রাজনৈতিক কর্মী না হলে যে-কোনো লেখকের যে-কোনো দেশীয় পুরস্কার গ্রহণেও তার আপত্তি নেই। তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেন, আদমজী পুবস্কার চালু হবার প্রথম বৎসর আলাউদ্দীন আল-আজাদকে কবিতার জন্য পুবস্কার দেবার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আলাউদ্দিন আল-আজাদ তখন জেলে—পুলিশ রিপোর্ট আজাদের বিরুদ্ধে থাকার জন্যে রাইটার্স গিল্ডের তৎকালীন কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত রশীদ করীমের মতো সাম্প্রদায়িক লেখককে আদমজী পুরস্কার দিয়ে দেন। রাজনৈতিক গোলমালের ভয়ে আমার 'কবরকে'ও আদমজী পুরস্কার দেয়া হয় নি। সুতরাং বলা চলে, আদমজী ইত্যাদি পুরস্কার গ্রহণে আর্থিক লাভ ছাড়া অন্য কোনো সম্মান নেই।

নির্মলেন্দু গুণ : প্রেস ট্রাস্টের অবলুপ্তির দাবিকে আপনি সমর্থন কবেন ?

মুনীর চৌধুরী : কোনো প্রতিষ্ঠানকেই প্রতিষ্ঠানগত দিক থেকে বিচার করা কঠিন- এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যাকে সম্পূর্ণভাবে ত্রুটিমুক্ত বলা চলে। এখানে পরিচালনার ভার নিয়ে প্রশ্ন। প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা বলেই আমি 'দৈনিক পাকিস্তানে'র নিন্দায় বিশ্বাসী নই।

নির্মলেন্দু গুণ : ট্রাস্টের কোনো কোনো পত্রিকা কি বাঙালি স্বার্থ ও সংস্কৃতি বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িক ভূমিকা গ্রহণ করে নি ?

মুনীর চৌধুরী : স্বীকার করি— কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জনগণের মুখোশ পরিহিত অন্যান্য পত্রিকার কথাও ভাবতে হবে— এসব ভাবলে প্রেস ট্রাস্টকে কেবল একা দায়ী করা চলে না। ট্রাস্টভুক্ত নয় এমন একটা ইংরাজি দৈনিকের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই

পত্রিকা বরাবর গণবিরোধী ভূমিকা নিয়েছে এবং এখনও গণবিরোধী কাজ করে যাচ্ছে।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা ছাড়াই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চালু করার নিন্দে করে ড. এনামুল হক যে বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতো আপনিও কি মনে করেন যে, এটা রূপান্তরিত সাম্প্রদায়িক ও সংস্কৃতি-বিরোধী একটি ষড়যন্ত্রের নামান্তর মাত্র ?

মুনীর চৌধুরী : আমি ড. এনামুল হকের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত এবং আমি জানি, এটা পূর্বপরিকল্পিত। এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মুসলিম শব্দটিও খসবে এবং বাংলাও পূর্ণ উদ্যমে চালু হবে।

নির্মলেন্দু গুণ : সম্প্রতি কবি জসীমউদ্দিন সাহেব পত্রিকায় একটি বিবৃতির মাধ্যমে বিএনআর-কে সমর্থন করেছেন— অথচ জনমত এর অবলুপ্তির দাবি করছেন আপনার বক্তব্য কী ?

মুনীর চৌধুরী : এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক যে, জসীমউদ্‌দীন সাহেব অনেকদিন যাবত (হয়ত বার্ধক্যও একটা কারণ হতে পারে) এমন অনেক কাজ কবছেন যাকে কোনোক্রমেই শুভ ও স্বাস্থ্যকর বলা যায় না। এই বিবৃতিটি শুধু এই প্রমাণ করে যে, জসীমউদ্‌দীন সাহেব বিএনআর পরিচালককের স্তাবক দলভুক্ত। তাঁর বিবৃতিতে দেশের জনশ্রদ্ধ লেখকদেব হেয় প্রতিপন্ন করার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তা নিন্দনীয়।

নির্মলেন্দু গুণ : এতো হলো জসীমউদ্‌দীন সাহেবের বিবৃতি সম্পর্কে অনেকের মতোই আপনারও বক্তব্য— কিন্তু বিএন আর সম্পর্কে আপনাব মতামত জানতে চাই।

মুনীর চৌধুরী : কোনো সংগঠনের প্রতিই আমার কোনো সংগঠনগত বিক্ষোভ নেই, যদি না সে সংগঠন গণবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল কার্যকলাপ চালিয়ে যায়। বিএনআর-এর বিরুদ্ধে অমার যা বক্তব্য তা হলো এর পবিচালনার ভার অধিকাংশ সময়ই অসৎ লোকদের হাতে ন্যস্ত ছিল—

নির্মলেন্দু গুণ : এবং এখনও আছে।

মুনীর চৌধুরী : হ্যাঁ, আমি বিএনআর-এর অবলুপ্তির কথাও বলি না— তাঁর পরিচালকের অপসারণের কথাও বলি না। আমার দাবি বিএনআর সরকারি অর্থ নিয়ে যে অপচয় এবং উদ্দেশ্যমূলক পক্ষপাতিত্বপূর্ণ কার্যকলাপ এতদিন চালিয়ে গেছে, তার একটা সুষ্ঠু হিসাব-নিকাশ ও বিহিত হওয়া প্রয়োজন।

নির্মলেন্দু গুণ : সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে বিএনআর সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা এবং সাহিত্য পদবাচ্য নয় এমন অনেক লেখকের পুস্তক প্রকাশের নামে যে অযাচিত অর্থ বরাদ্ধ করেছে— আপনি তার সম্পর্কে অবহিত আছে নিশ্চয়ই ?

মুনীর চৌধুরী : আমি জানি এবং জানি বলেই এর একটা তদন্ত অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি জানি এমন অখ্যাত অজ্ঞাত-লেখক আছেন যাদের রচনা বাজারে বিক্রি হয় না অথচ বিএনআর. সেসব পুস্তকের মধ্যে হঠাৎ করে ইসলামের আলো দেখতে পেয়ে বহু অর্থের বিনিময়ে পুনঃপ্রকাশে লেখককে সম্মানিত করেছে। তাই এর পরিকল্পিত গণবিরোধী ভূমিকা সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

নির্মলেন্দু গুণ : বাংলা একাডেমীব প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের কথা আপনার মনে আছে কি ?

মুনীর চৌধুরী : হ্যাঁ, তখন যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে দেশে। আমি জেল থেকে সবেমাত্র বের হয়েছি অথচ আমি আমন্ত্রিত হইনি। আমি বাংলা একাডেমীর গেট পর্যন্ত গিয়েছিলাম, আশা ছিল, কেউ নিশ্চয়ই এগিয়ে এসে নিয়ে যাবে, কিন্তু কেউ আসে নি. আমি ফিরে এসেছিলাম।

আমরা সবাই তখন হেসে উঠেছিলাম, তিনিও যোগ দিলেন।

হুমায়ুন কবির : এটার পেছনে কোনো হীন উদ্দেশ্য ছিল বলে আপনি মনে করেন— কিম্বা আপনি ছাড়াও আরো কেউ কেউ কি এরকম আমন্ত্রণ পাননি ?

মুনীর চৌধুরী : আমি সবার কথা জানি না। তবে আমি ছাড়াও শ্রীরণেশ দাশগুপ্ত এবং সরদার ফজলুল করিমও নিমন্ত্রণ পান নি বলে আমার মনে পড়ে।

আমাদের আলোচনা অনেক দীর্ঘায়িত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি আমাকে অন্য আর একদিন আসার কথা বলছিলেন— তখন রাত অনেক হয়ে গেছে। আরো কিছু প্রশ্ন কবাব থাকলেও অগত্যা আমি শেষ প্রশ্ন করলাম তাঁকে।

নির্মলেন্দু গুণ : দেশে আকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলশ্রুতিতে প্রতিবেশী পশ্চিম বাংলার সঙ্গে যদি সৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাহলে মিলিতভাবে কোনো সাহিত্য সম্মেলন আহ্বানেব উগ্যোগ নেবার কথা চিন্তা করছেন কি ?

মুনীর চৌধুরী : এ ব্যাপারে এখন কোনো মন্তব্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ হিসেবে— এই ভাষার উল্লেখযোগ্য লেখকদের প্রতি আমার সঙ্গত কারণেই শ্রদ্ধা অপরিসীম। তবে এ ধরনের কোনো সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগ কেবলমাত্র রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরেই সম্ভব। পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থার জন্যেই নয়—এর আগ থেকেও আমি যে দাবিটা জানিয়ে আসছিলাম, তা হলো দুই বঙ্গের রাজনৈতিক সম্পর্ক যাই থাকুক না কেন, তা যেন আমাদেব সাহিত্য সংস্কৃতিব বিকাশের অন্তরায় না হয়। বাংলাভাষায় লিখিত পুস্তক, চলচ্চিত্র, গান সবই আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশে অপরিহার্য শব্দের আদান-প্রদানে রাজনীতি যেন আমাদেব অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। আর আমার মনে হয়, সৎ সম্পর্ক গড়ে ওঠলে উদ্যোক্তার অভাব হবে না

সাক্ষাৎকার (তিন)

প্রথমেই তিনি জানিয়ে দিলেন ভয়ানক ব্যস্ততার মাঝে তাঁর সময় কাটছে, ফলে খুব বেশি বলাটা তার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। সম্প্রতি কী একটা জরুরি কাজে হাতে দিয়েছেন, যার ফলে প্রায়ই রাত তিনটে-চারটে এলোমেলো কাগজের ভীড়। তবু যখন বললাম, আপনার বহুল আলোচিত কবর নাটিকাটির রচনার পটভূমি জানতে এসেছি, তখন তাঁকে একটু উজ্জ্বল মনে হলো।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন তিনি। তারপর ধীরে ধীরে স্মৃতি উদ্বেলিত হয়ে উঠলেন। পেছনের ফেলে আসা দিনগুলোর মাঝে নীলক্ষেতের এই নিয়নজ্বলা বাড়িটা থেকে হারিয়ে যেতে চাইছিলেন তিনি। ১৯৫৩ সালেব ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে সেই উত্তপ্ত দিনগুলোতে ডিসেম্বর আর জানুয়ারিব শীতার্ত বাতগুলোতে যখন জেলের একটি কামবায বসে দারুণ এক অস্থিরতার শিকার হয়ে সমস্ত মন ঢেলে একটি ছোট খাতায় লিখছিলেন কবর নাটিকাটি। পরবর্তীকালে যা আলোড়ন তুলেছিল তুমুলভাবে। আজো যা সমানভাবে আলোচিত। বিষয়বস্তুর নির্বাচনে, আঙ্গিকের নতুনত্বে, দৃশ্যকল্প নির্মাণে, সব দিক থেকেই যা অভিনবত্বের স্বাক্ষর বহন করছে।

মুনীর চৌধুরী তখন জেলে। ভাষা আন্দোলনে গ্রেফতার হয়েছেন তিনি আরো অনেকেব সাথে। একসাথে পনেরো বিশজন রাজবন্দীর সাথে একটি কক্ষে থাকতেন। অপব একটি কক্ষে থাকতেন প্রায় ষাট-সত্তর জনের মতো বাজবন্দী। তাদের মাঝে বণেশ দাশগুপ্তও ছিলেন।

রণেশদাই গোপনে চিঠি লিখেছিলেন আমাকে। সামনে একুশে ফেব্রুয়াবি। একটা নাটক লিখে দিতে হবে। জেলখানাতে অভিনীত হবে। রণেশদার হুকুম। আমাকে লিখতেই হলো নাটক। সেটি কবর।

'জেলখানায় আপনার সাথে আর কারা ছিল?'

'অনেকেই ছিল। আবুল হাশিম, মোজাফফর আহমদ, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোযাহা, অজিত গুহ, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, শেখ মুজিবুব রহমান।' মুনীর চৌধুরী জানালেন জেলখানাতেই শেখ মুজিবুর রহমানেব সঙ্গে তাঁব অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে।

'জেলখানায় নাটক মঞ্চস্থ করার অসুবিধে ছিল না?'

'ছিল, অবশ্যই ছিল। আর ঐ অসুবিধেটুকু সামনে ছিল বলেই তো কবর নাটকটিব আঙ্গিকে নতুনত্ব আনতে হয়েছে। সত্যি করে বলতে কি কবর নাটকটি একটি বিশেষ অবস্থার শিল্পগত রূপায়ণ।'

'কথাটা একটু ব্যাখ্যা করুন।'

'যেমন ধরো নাকটটিতে হ্যারিকেনেব ব্যবহাব রয়েছে যার আলো কবরখানার

নির্জনতাকে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। রণেশদা জনিয়ে দিয়েছিলেন রাত দশটার পর জেলখানার সমস্ত আলো নিভে যাবার পর তাঁদের কক্ষে নাকটটি মঞ্চস্থ করবেন তাঁরা। যেসব ছাত্রবন্দীরা রাতে হ্যারিকেন জ্বালিয়ে লেখাপড়া করত, তাদের ৮/১০টি হ্যারিকেন দিয়ে মঞ্চ সাজাতে হবে, সে কারণে অনেকটা বাধ্য হয়েই 'কবর' নাটকটিতে আলো-আঁধারির রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়েছে।'

'নিশ্চয়ই। তা না হলে সেদিন এমন স্বার্থকভাবে জেলখানায় একটি কক্ষের আবছা আলোতে নাটকটা পরিবেশিত হতে পারত না। আর সে কারণেই আমি জেল থেকে এসে মঞ্চের অভাবের কথা বলি না।'

'আপনি কি বিদেশেও ছোট স্থানে নাটক হতে দেখেছেন?'

'আলবত। শুনে অবাক হবে, বিদেশের অধিকাংশ নিরীক্ষাধর্মী নাটক ছোট ছোট ঘরে, অত্যন্ত সীমাবদ্ধ পরিবেশেব মাঝে, নিতান্তই ঘরোয়াভাবে দেখানো হয়। এতোটা ঘনিষ্ঠভাবে সেসব নাটক দেখার সুযোগ ঘটে যে অভিনয় চলাকালীন দর্শকদের সাথে অভিনেতা, অভিনেত্রীর মাঝে কোনোরকম ব্যবধান থাকে না বললেই চলে।'

এ ধরনের কোনো কোনো নাটকের কথা আপনার মনে আছে কি?'

'আমি বছরখানেক আগে যখন পশ্চিম জার্মানিতে গিয়েছিলাম, তখন অনেক বাড়িতে এ ধরনের নাটক উপভোগ করেছি। 'দি রিহার্সাল' আর 'দি মেল ট্রেন স্টপস হেয়ার' নামের দুটি নাটক আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছিল। আমার তো মনে হয় সত্যিকার জীবনধর্মী নাটকগুলো ওদেশে এখন বড় বড় থিয়েটারে নয়, ছোট ছোট ঘরের মাঝেই হচ্ছে। উত্তপ্ত তারুণ্যের সান্নিধ্যে হচ্ছে।'

'জেলে নাটকটি দেখতে পারিনি। কারণ আমি ছিলাম অন্য কক্ষে। শুনেছিলাম খুব ভালো হয়েছে। আমিও ব্যক্তিগতভাবে ওটাকে আমার এখন পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রচনা, আবার সেই সাথে বিতর্কিত লেখাও বলতে পারি।'

'জেলখানাতে যখন আপনার কিছু দূরের একটা কক্ষে নাটকটি প্রথম অভিনীত হচ্ছিল, তখন আপনার মনে কোন্ ধরনের অনুভূতি হচ্ছিল?'

'আমি নির্লিপ্ত ছিলাম। কেননা জেল এমন জায়গা যেখানে সমস্ত রকমের মানসিক উৎকণ্ঠাকে আয়ত্তে আনতে হয়। আর আমার নিজের লেখা সম্বন্ধে উৎকণ্ঠামূলক মনোভাব কখনো ছিল না।'

'কবর নাটকটি সম্পর্কে আপনার অভিমত কী?'

'নিঃসন্দেহে এটি আমার দৃষ্টি উন্মোচনকারী শ্রেষ্ঠ লেখা।'

'প্রথম কোথায় নাটকটি ছাপা হয়?'

'প্রায় সে সময়ই সেটা কপি হয়ে জেলের বাইরে চলে যায়। প্রথমে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত হয়। তারপর হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের সংকলনে স্থান পায়। তবে এ নাটকটি সম্পর্কে পরবর্তীকালে একটি বিশেষ ধারণার জন্ম হয়েছে আমার। তা হলো আমার অবচেতন মন থেকেই বোধ করি একটি বিদেশী নাটকের প্রভাব ওতে পড়েছিল। অবশ্য এটা আমার অনেক পরে মনে হয়েছে।'

আবার স্মৃতিচারণায় ডুব দিলেন তিনি। খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে রাখলেন। কপালের ওপরে তার কাঁচাপাকা চুলগুলো লুটিয়ে পড়েছে। একটা হাত কপালের কাছে ধরা।

'সে ৪৩, ৪৪ সালের কথা। আমেরিকার বেশ কিছু বামপন্থী, প্রগতিশীল সৈনিকের সাথে আমার আলাপ হয়েছিল। তারা তখন কুর্মিটোলায় থাকতো। সে সময় তাদের কাছে থেকে বেশ কিছু বই পড়ার সুযোগ পাই। আর, আমেরিকার সাহিত্যের প্রতি, বিশেষ করে নাটকের প্রতি আমার কৌতূহল বাড়ে, ব্যাপক পঠনে তার সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয়ও গড়ে ওঠে। যে সমস্ত সৈনিকেরা ছিল, তাদের প্রগতিশীল মন আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। কয়েকজনের সাথে রীতিমতো সখ্যতা জমে যায়। তাদের একজন এখন বিখ্যাত— ড. নরমান সিপ্রংগার।'

'আপনি বলছিলেন কবর নাটকে কোনো এক বিদেশী নাটকের প্রভাব রয়েছে।'

'ও হ্যাঁ, বেরী দ্য ডেড। সে সময়েই নাটকটি পড়ি আমি। তাতে মৃত ব্যক্তির প্রতিবাদ ছিল, সে যে কবরস্থ হতে চায় না, তার চিৎকার ছিল। এটুকই যা ভাবগত সাদৃশ্য কিছু থাকতে পারে। কিন্তু কবর যখন লিখি তখন এসব কথা আমার বিন্দুমাত্র মনে আসে নি। বেশ ক-বছর পা আমি অনেকটা অদ্ভুতভাবেই এই প্রভাবটি আবিষ্কাব করি। বোধ কবি সে সময় অবচেতন মনের প্রভাবটিই কাজ করবে।'

'আপনার কবর নাটকটি কি কোনো সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল ?'

'যথেষ্ট। অনেকেই বলেছিল এমন একটা ছমছমে রহস্যময় পবিবেশেব মাঝে মাঝে এমন কৌতুকময়তার আবহ কেন সৃষ্টি কবলাম। এ সম্পর্কে আমাব বক্তব্য হচ্ছে ভয়াবহতাব মাঝে আমি সব সময় কোনো না কোনো উৎকট তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি। কোনো বিষাদময় ঘটনা হলে তার উৎকট দিকটাকেই আমি বড় করে দেখেছি বা বলতে পার দেখতে চেয়েছি। এটি আমার আজীবনের বোধ। যেমন কবর নাটকে নেতার অঙ্গভঙ্গি যথেষ্ট কৌতুকময়, তার পেছনেও সেই একই ধারণা কাজ করছে।'

'শুধুমাত্র কি তাই ? আর কোনো বিশ্বাস দ্বারা আপনি চালিত হননি ?'

'দ্যাখো, আমি মুসলিম নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত কাছ থেকে দেখাব আব জানার সুযোগ হয়েছে আমার। ফলে তাঁদের ঘনিষ্ঠ আলোকে দেখে বিচার করে তাঁদের চরিত্রের অসারতার দিকটাই আমার কাছে বড় হয়ে দেখা গিয়েছে। তাঁদের বিভিন্ন কার্যাবলীর হাস্যময় দিকগুলো আমার সামনে প্রকট হয়ে উঠেছে। ফলে তার প্রভাবও পড়েছে হয়তো আমার লেখায়। নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের রোষ যেমন অনাবিল, ক্রোধও তেমনি সুতীব্র। কিন্তু অন্যভাবে তাঁদের দেখার দরুন নেতৃবৃন্দের চরিত্রের ঠুনকো দিকটাই আমার কাছে প্রাধান্য পেয়েছে।'

মুনীর চৌধুরী জানালেন, এ পর্যন্ত তাঁর কবব নাটকের কোনো ভালো দৃশ্যরূপ দেখেন নি তিনি। তার কারণ এদেশের নাট্যশিল্পের অপরিচ্ছন্ন প্রোডাকশন তাঁকে যথেষ্ট পীড়িত করে।

'জানো, সে কারণে আমি আমার নিজের নাটকও দেখতে খুব একটা উৎসাহবোধ করি না, বলতে গেলে যাই-ই না। এই তো কিছুদিন আগে আমাব নাটক করল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা। একটি দোষ দেখলাম, পার্ট কেউ ভালো মুখস্থ করে নি

সত্যি, এসব আমাকে খুব ক্ষুব্ধ করে তোলে।'

আমি মুনীর চৌধুরীকে কোনদিন উত্তেজিত হতে দেখিনি। এবারও দেখলাম না। কেমন নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তাঁর সেই বিশেষ ঢঙটিতে তিনি কথা বলে গেলেন। কিন্তু তাঁর একটি মৃদু অভিযোগ ছিল।

'শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশি কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি। আরো বেশি কিছু।' একটু থেমে বললেন মুনীব চৌধুরী।

'আপনার কবর নাটক সম্পর্কে তো অনেক মন্তব্যই করা হয়েছে। তার মাঝে কোনটি আপনার মনে সবচেয়ে বেশি দাগ করেছে?'

'তা বটে। প্রচুর মন্তব্য কানে এসেছে। অনেক সমালোচনাও তার পড়েছি। কিন্তু যে খাতায় আমি প্রথম কবর নাটকটি লিখেছিলুম। সেটি ফেরত পাঠাবার সময় রণেশদা একটি মন্তব্য লিখেছিলেন, আজো তা আমার মনে জ্বলজ্বল করছে।

রণেশদা বলতে চেয়েছিলেন আমার মাঝে যদি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক প্রত্যয় থাকতো বা কোনরকম সংশয় বা দ্বন্দ্বের মাঝে আমি না থাকতাম তবে হয়তো আমার নাটকটির শেষ অন্যরকম হতো।'

'আপনার মনে কি রণেশ দাশগুপ্তের মন্তব্যটি আলোড়ন তুলেছিল?'

'অনেকটা। রণেশদা আমার সম্পর্কে লিখেছিলেন লেখক কি বরাবরই এই অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকবেন? সত্য কি সামনে নেই? এভাবে নাটক শেষ হতো না যদি তিনি সংশয়ী না থাকতেন। এখন আমার সম্পর্কে অনেকে বলে থাকেন, আমি যদি পুরোপুরিভাবে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকতাম, তবে আমারও মঙ্গল হতো, সেই সাথে দেশেরও।'

'গণনাটক সম্পর্কে আপনার ধারণা কী?'

'যতক্ষণ সমাজ শ্রেণীবিভক্ত আছে লেখার আবেদনও বিভিন্ন ধরনের হবে। সর্বস্তবেব লোক একই সাথে কোনো শিল্পরস সাধারণত উপভোগ করতে পারে না।'

'আপনার নাটক বুদ্ধিদীপ্ত, আপনার সংলাপ কৌশলী ভাষণ, সাধাবণ লোক নিশ্চয়ই তা ঠিক বুঝে উঠতে পারবে না?'

'আমি নগরবাসী, উচ্চশিক্ষিত লোকদের ছাড়া আর কারো জন্য লিখতে পারছি না। কেননা নিচু জীবনের আত্মত্যাগ সম্পর্কে আমার তেমন স্বচ্ছ ধারণা নেই। আসলে লেখাতে তাদের মর্মগত শিল্পবেদনা ফুটিয়ে তুলতে হবে। শ্রমিকদের স্বেদ মেটাতে হবে। জীবনের মহিমা আর বেঁচে থাকার মহিমা বুঝতে হবে। কৃত্রিমতাব আশ্রয়ে ওসব লেখা যায় না। যেতে পারে না।'

সাক্ষাৎকার (চার)

দেশেব সবখানে যেমন বাংলা ভাষা অবহেলিত তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েব বাংলা বিভাগ সবচেযে অবহেলিত বিভাগ। বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েব প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত।

১৯৫৪ সালে ভাষা আন্দোলনে কাবাভোগী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক প্রফেসর মুনীর চৌধুরী এক বিশেষ সাক্ষাৎকাবে এ মন্তব্য কবেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়েব সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ হচ্ছে বাংলা বিভাগ। অন্যান্য বিভাগ যে সব সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে বাংলা বিভাগ তাব প্রাপ্য অনেক সুবিধা থেকে বঞ্চিত। বিভাগের ছাত্রের তুলনায় এখনও নয়জন শিক্ষকেব অভাব বযেছে।

বর্তমান পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলা ভাষার সার্বিক প্রসাবে কী করণীয হতে পাবে এই সম্পর্কে তাঁর মত জানতে চাইলে অধ্যাপক মুনীব চৌধুবী বলেন, আমি মনে কবি বাংলা ভাষা প্রচলনের যে সমস্যা তা বাংলা ভাষা উন্নযনেব সাথে সম্পর্কিত নয। এটা প্রধানত দেশেব বাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সম্পর্কেব উপর নির্ভর কবে। তিনি বলেন, যারাই বাংলা ভাষাব প্রসার ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছে তাবাই আবাব বাংলা ভাষাব সর্বস্তরে প্রচলন উচ্চকণ্ঠে দেখা গিয়েছে। এই ধরনের কাজ বহুকাল ধরে চলেছে এবং চলবে। বাংলা ভাষার সরকারি স্বীকৃতি এসেছে ছাত্র তথা আপামর জনসাধারণের চাপে পড়ে। স্বীকৃতিই শুধু পাওয়া গেছে। কার্যকালে এর ব্যবহাব আব কেউ কবেনি। তিনি বলেন বাংলা ভাষাব শত্রু বাইবের কেউ নয়, বাংলা ভাষাব শত্রু বাঙালি আমলা ও পণ্ডিতরা। মুনীর চৌধুরী বলেন, শত্রু দুই ধরনের বযেছে। এক, বাজনৈতিক বিরোধী শক্তি। দুই, সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতরা। অধ্যাপক মুনীর চৌধুবীর মতে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা প্রচলনের ক্ষেত্রে বাধা বিশ্ববিদ্যালয়েব পণ্ডিতবাই। তিনি বলেন— বাংলা ভাষা বিরোধিতার অন্যতম দুর্গ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। পণ্ডিতবর্গ বাংলা ভাষার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন না বটে তবে টেকনিক্যাল কুযুক্তি দেখান। মুনীর চৌধুরী বলেন বাংলার প্রচলনটাকে বিলম্বিত করার জন্যেই যত প্রকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রয়াস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, কয়েকদিন আগে শেখ মুজিবের ঘোষণার পরে বাংলার প্রচলনটা অনেকাংশে সহজ হয়ে আসতে পারে। তাঁর মতে রাষ্ট্রশক্তি যদি মনে করে জনমতকে শ্রদ্ধা করতে হবে তাহলে একটা সমস্যা চুকে যায়। তবে মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তিনি বলেন এ্যাদ্দিন পর্যন্ত বাংলা ভাষার উন্নয়নের শুধু কথাই প্রচার করা হয়েছে।

দেশে নতুন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা হলে সর্বস্তরে বাংলা প্রচলনে কী সুবিধা আশা করা যায়— এই প্রশ্নের উত্তরে মুনীর চৌধুরী বলেন : গণতান্ত্রিক সরকার হুকুম দিলেই কাজটা অনেকাংশে সহজ হয়ে পড়ে। হুকুম পেলে বাকিটা করা অসুবিধাজনক হবে না বলে তিনি মনে করেন।

সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের আদেশ জারি হলে একাডেমিক পর্যায়ে কী করা যাবে জানতে চাইলে তিনি বলেন, উচ্চপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রচলনের উদ্যোগ হলে বাংলা বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি বিএ পাস কোর্সে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০০ নম্বর বাধ্যতামূলক করার উপর পুনর্বার জোর দেন। উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএ পাস কোর্সে তিনশো নম্বর বাংলায় বাধ্যতামূলক। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বলেন, এই পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র বাংলা ভাষায় হতে হবে এবং তিনি বলেন, যদি আমরা সবাই মনে করি, বাংলা আমাব সকল কাজের বাহন তাহলে সকল অনার্স কোর্সে একশো নম্বর বাংলা বাধ্যতামূলক করা উচিত। কারণ দেখা গেছে অন্যান্য বিষয়ে খুবই ভালো রেজাল্ট করে জীবনক্ষেত্রে আসেন যাদের অনেকেই ভালো বাংলা বলতে পর্যন্ত পারেন না। জানা তো দূরের কথা। বাংলাতেই যেহেতু আমাদের জীবনের সবকিছু নিয়ন্ত্রিত সেহেতু অনার্স বিষয়ের সাথে একশো নম্বর বাংলা ভাষাটা আয়ত্ত করা অসুবিধের কিছু নয়। বিদেশের প্রত্যেক জায়গাতেই মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞান দান করা হয়। একমাত্র আমাদের দেশেই বোধ হয় নিয়ম আছে যে মাতৃভাষাচর্চা ছাড়াও বিরাট পণ্ডিত হয়ে যেতে পারেন। অন্যান্য বিষয়ে যাঁরা অনার্স পড়েন তাঁদেব অনেকের দেখা যায় ইন্টারমেডিয়েট পর্যায়ের পরে বাংলা ভাষা তাঁদের আয়ত্তের বাইরে। এটা হওয়া উচিত নয়। সকলেরই মাতৃভাষার প্রতি অনুগত থাকা উচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা একশ' নম্বর বাধ্যতামূলক করা প্রসঙ্গে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী বললেন, জানি, বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহল এটা সহজে হতে দেবে না। এটা ইতিমধ্যেই পদে পদে আমি টের পেয়েছি। বাংলা ভাষা সকলের কমবেশি জানতে হবে এটা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতমহল বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, তাঁরা এই ব্যাপারে অনবরত কুযুক্তি তোলেন। বলা হয়ে থাকে, বাংলা বাধ্যতামূলক করা হলে একটা বিষয় কম পড়ে যাবে। আরো বলা হয়, বিদেশে ইংরেজি বাধ্যতামূলক নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে ইংরেজি বলার উপর মৌখিক পরীক্ষা হতো। এখন আর বাংলায় বলতে পারাটা দেখা হয় না।

মুনীর চৌধুরী বিষয় নির্বিশেষে বাংলাকে সকলের আয়ত্ত করতে হবে বলে দৃঢ় মত প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন করা হলো, শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষা চালু হয়ে গেলে যারা বাংলায় পড়াতে অভ্যস্ত তাদের কি অসুবিধা হবে না? মুনীর চৌধুরী এই প্রশ্নের জবাবে বললেন, বিষয় সম্পর্কে যাঁর উপলব্ধি পরিণত হয়েছে তার বাংলায় বক্তৃতা দিতে না পারার কোনো কারণ নেই। তিনি মনে করেন, বিষয়কে যিনি আত্মস্থ করতে পেরেছেন তাঁর পক্ষে মাতৃভাষায় সেটা প্রকাশ করাটাইতো সবচেয়ে সহজ কাজ। তিনি বলেন, আর যাঁরা তার পরেও পারবেন না তাঁদের জন্যে সংক্ষিপ্ত বাংলা শিক্ষাকোর্সের ব্যবস্থা যাবে।

শিক্ষার মাধ্যম যদি বাংলা হয় তাহলে আমাদের যে রূপান্তরিত পাঠ্যপুস্তকের সমস্যাকে সামলাতে হবে এর পরিপ্রেক্ষিতে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বলেন, পাঠ্যপুস্তক বা পরিভাষা যাই বলি না কেন এর পেছনে প্রথম প্রয়োজন সদিচ্ছা এবং উদ্যোগ। তিনি বলেন, যদি আমাদের দেশের সরকার বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ

আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাষায় পাঠ্যবইয়ের প্রয়োজন তাহলে পাঠ্যবই এ্যাদ্দিনে প্রচুর বেরিয়ে যেত। তিনি বলেন, আমাদের দেশে প্রকাশক আছে প্রচুর। তারা পর্যাপ্ত পাঠক পেলে বই বের করবে না কেন ? যখন বাংলা ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হয়ে যাবে, তখন বাংলা ভাষায় পাঠ্যবই কেনার লোকও বেড়ে যাবে। তখন বাংলায় বই বেরুবে। পাঠ্যপুস্তকটা কোনো সমস্যাই নয়। সমস্যা অন্যখানে। সমস্যা হলো আমাদের চরিত্রের। বাংলার মাধ্যমে পড়বার এবং পড়াবার মনোভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে আমাদের সর্বাগ্রে।

মুনীর চৌধুরীর মতে পাঠ্যপুস্তক লিখবার জন্যে পণ্ডিত ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। তিনি বলেন সাধারণত দেখা যায় বড় বড় সরকারি প্রতিষ্ঠান পদাধিকাব বলে পণ্ডিতদের বই রচনা করতে দেন। সেই বই আর শেষ পর্যন্ত বেরোয় না। মুনীর চৌধুরী বলেন পাঠ্যবই রচনার জন্যে মাঝারি প্রতিভার ছাত্ররাই যথেষ্ট। পাঠ্যবই যে মানেব হয়ে থাকে তা কোনো বিশেষ মৌলিক প্রতিভার প্রয়োজন হয় না। তিনি পাঠ্যবই সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই অনুবাদ সংস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ কবেন। তিনি বলেন, অনুবাদ সংস্থাব মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের ভাষান্তর অনেক সময় সহজ ও দ্রুত হয়ে যাবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মুনীব চৌধুরী বললেন, শুধু বাংলার ছাত্ররাই নয়, প্রায় সব বিভাগের ছাত্ররাই আজ শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরির নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত। তবুও যাবা বাংলায় এমএ পাস করে বেরোয় তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর মত জানতে চাইলে তিনি বললেন, বাংলা ভাষা যদি জীবনের সর্বস্তরে প্রচলিত হয়ে যায় তখন বাংলার বহু লোকের কাজের প্রয়োজন হবে। তখন কাজের অন্ত থাকবে না। অনুবাদ বিভাগে বাংলা বিভাগের ছাত্রছাত্রীরাই জায়গা করে নেবে। তিনি বলেন, এসবে পণ্ডিতের ভাষার দরকার হয় না।

সাক্ষাৎকাবের শেষ পর্যায়ে যখন উঠে আসছিলাম, তখন এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সবচেয়ে অবহেলিত বিভাগ। এই বিভাগ তাব ন্যায্য প্রাপ্য থেকে পর্যন্ত বঞ্চিত। এখনো এই বিভাগেব নয়জন শিক্ষকের অভাব রয়েছে।

বাংলা ভাষা প্রসারে ও শিক্ষাদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ভূমিকা কারো অজানা নয়। আগামী জুন মাসে বাংলা বিভাগ অর্ধশত বার্ষিকী পালন করতে যাচ্ছে। পঞ্চাশ বছর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরেও বাংলা ভাষা আন্দোলনের উনিশ বছর পরে আজ একাত্তরের শহীদ স্মরণের বেদীমূলে দাঁড়িয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ মুনীর চৌধুরী সখেদে যে কথা বলেছেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেব ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত ছাত্রছাত্রীরা জানতে ইচ্ছুক।

অধ্যাপক চৌধুরী বিএ পাস কোর্সে বাধ্যতামূলক ইংরেজি তুলে দেয়ার দাবি জানান।

তিনি বাংলা সাহিত্যের ও ভাষার গবেষণার জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের দাবি জানান।

তিনি পূর্ববাংলার ভাষা জরিপ প্রকল্প চালুর জন্যেও দাবি জানান।

কথিকা : ওয়াশিংটন থেকে

আমেরিকার কর্মপটুতা ও ঐশ্বর্যের মহানগরীর প্রতীক নিউইয়র্ক। কিন্তু তাব আন্তরশক্তির শৃঙ্খলা, সুষমা ও পরিণতি অনায়াসে উপলব্ধি করতে হলে ডিস্‌ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার ওয়াশিংটন শহরে, সংক্ষেপে ওয়াশিংটন ডিসি বেড়াতে যেতে হবে। এ শহব নিউইয়র্কের মতো জমকালো নয়। নিউইয়র্কের অবিশ্রান্ত কোলাহল, অপরিমেয় জনবহুলতা, উচ্ছ্বসিত নৈশজীবনের বর্ণাঢ্য রোমাঞ্চকরতা, কোনো অর্থেই ওয়াশিংটন ডিসির কর্মরত কিন্তু মর্যাদাবান, প্রশান্ত জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয় নয়। এই এলাকায় কলকারখানা স্থাপন পর্যন্ত আইনত নিষিদ্ধ। তাই ওয়াশিংটন ডিসিব আকাশ বাতাস কয়লাব ধোঁয়া কি চিম্‌নির কালিতে কলুষিত নয়। ওয়াশিংটন ডিসিতে আছে মহানগরের মহিমা, তার আধুনিক উপকরণের সমারোহ, নাই তার অপরিচ্ছন্নতা, তার ব্যস্তরুষ্ট শ্বাসরোধকারী আবহাওয়া।

ওয়াশিংটন ডিসির মানুষও অন্য কোনো শহরের মতো নয়। স্থায়ীর চেয়ে অস্থায়ী বাসিন্দার সংখ্যাই বেশি। আমেবিকার সকল অঞ্চল থেকে মানুষ এসে এখানে জড় হয়, নানা সরকারি দফ্‌তরের কর্মচারী হয়ে। দেশ-বিদেশের কেতাদুরস্ত নবনারীতে পরিপূর্ণ এই শহর, সব দূতাবাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে নগরশোভা বর্ধন করে। আর সেই সঙ্গে বিশেষ বিশেষ মৌসুমে নিজেদের গোটা মুল্লুকের এবং সাবা বিশ্বের ভ্রমণকারীরা আচ্ছন্ন কবে ফেলে ওয়াশিংটন ডিসি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীবা আসে গাড়ি গাড়ি, দেশের ইতিহাসেব স্মরণচিহ্নসমূহ স্বচক্ষে দেখে যেতে, বাষ্ট্রীয় পবিচালনার কেন্দ্রীয় শক্তির কর্মপ্রণালী সরজমিনে তদারক করে বুঝে নিতে। এক একটা শহরের চরিত্র তার পথঘাটের জনস্রোতের প্রকৃতিতে ধরা পড়ে। কোন বয়সেব কারা কোন্ পোশাকে কখন কোথায় কী কারণে ভীড় করে, তাব মধ্যেই রয়েছে শহবেব আত্মপরিচয়ের স্বাক্ষব। ওয়াশিংটনের ভীড় দুপুরে আর সকালে। যখন অফিস শুরু হয় এবং যখন শেষ হয়। ভোরবেলাকার ওয়াশিংটন অর্ধঘুমন্ত, সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত। যারা ভিড় পরিপুষ্ট করে তারা অন্যান্য অনেক শিল্পোন্নত মহানগরের পোশাক-পরিচ্ছদে উদাসীন এলোমেলো জনতার মতো নয়। পুরুষদের পবনে তিন প্রস্থের স্যুট, জুতোয় আয়নার পালিশ। আব অগণিত মহিলা। কিশোরী, তন্বী, প্রৌঢ়া। সুঠাম, সুবেশী, সুস্মিতা। আফিসে আফিসে চাকরি করে। সেখানে সুপ্রসন্ন সৌজন্য নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রদর্শনের ক্ষমতাই কর্মদক্ষতা প্রকাশের অন্যতম অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়। প্রাক-দুপুবে এই মিছিল প্রবেশ করে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দফ্‌তরের অতিকায় অট্টালিকাসমূহে, স্তব্ধতা নামে নগরে। অপরাহ্নে চঞ্চলতা জাগে আবার যখন এই জনতাই গৃহমুখী হয়। গোটান নগরের প্রায় অর্ধেক অধিবাসী এই শ্রেণীর, বাকি অর্ধেক নিযুক্ত রয়েছে এদের জীবনযাত্রার উপকরণ সরবরাহ করার কাছে। ওয়াশিংটন সাদা-কালোর বিরোধ থেকে মুক্ত। অফিসের কর্মচারীদের মধ্যে এক-

চতুর্থাংশ নিগ্রো. স্কুলে ছাত্রশিক্ষক উভয়েব মধ্যেই তাঁরা সাংখ্যায় অধিক।

আর আছে ওয়াশিংটনের ট্যুরিস্ট। আমরাও যাঁদেব চোখে এই নগর দর্শনেব অভিলাষী। পৃথিবীর প্রায় সব বড় বড় শহরের প্রাণ তার বক্ষস্থিত নদী। লন্ডনের টেইমস, প্যারিসের সিন, মস্কোব মস্কোয়া, ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক। এই নদীব তীরে, পোটাম্যাকের অন্যান্য শাখা ও ঝিল বেষ্টিত ভূখণ্ডে ওয়াশিংটন মহানগর প্রতিষ্ঠিত। এ শহব আপনা-আপনি গড়ে ওঠে নি। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী একে তৈরি করা হয়েছে। কৃত্রিমভাবে গঠিত বলেই এ শহর এত সুগঠিত। বাষ্ট্রপ্রধানেব প্রাসাদ, বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় দফতর, লাইব্রেরি. যাদুঘর, নানা ধর্মমাতার উপাসনাগার, স্মৃতিসৌধ, তাদের পরিবেষ্টিত করে রাজপথের বায়ুমণ্ডলী, সবই সুপরিকল্পিত আদর্শ অনুযায়ী বিপুল শ্রম ও অর্থব্যয়ে নির্মিত। জগদ্বিখ্যাত স্থপতিরা এর পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পৃথিবী ঢুঁড়ে সেরা মালমসলা জড় করে দক্ষ কারিগররা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করেন। বিদেশীব কাছে ওয়াশিংটন ডিসির আসল আকর্ষণ তাব নগর-পবিকল্পনাব সৌকর্য, তাব অজস্র প্রশস্ত বীথি। তাব গগন ঢাকা স্মৃতিসৌধসমূহ।

সবটা ওয়াশিংটন যদি এক নজরে জবিপ কবাব ইচ্ছে থাকে তবে হেলিকপটারে চড়ে আকাশে উড়তে হবে। যদি চার নজবে দেখলে চলে তবে নগবকেন্দ্রের উচ্চতম স্মৃতিমিনার ওয়াশিংটন মনুমেন্টের চূড়ায় উঠতে হবে। কারুকার্যহীন শুভ্র মসৃণ চৌকো স্মৃতিস্তম্ভটি বাঁশফলকের মতো খাড়া আকাশমুখী উড়ে গেছে, মলের ওপব পাঁচশ পঞ্চান্ন ফুট। পাঁচশ ফুট পর্যন্ত সিঁড়ি আছে, তাব আটশ আটানব্বইটি ধাপ। যদি শারীরিক কারণে অত সিঁড়ি ভাঙ্গার অভিজ্ঞতা লাভের লোভ সংববণ করতে হয়, তাহলে লিফট ত রয়েছেই। শূন্যে উঠে-যেতে যেতে যন্ত্রে প্রচারিত স্তম্ভেব ইতিহাস আগাগোড়া শুনে নিতে পারবেন। উপরে উঠে এলে দেখবেন, চাবপাশেব চার দেয়ালে দুটো কবে মোট আটটা জানালা। একেক জানালা দিয়ে একেক দিকে উঁকি দিলে চোখ প্রসারিত করে দিতে হয় এক একটি দিগন্তস্পর্শী পথ ধবে, যার শেষ প্রান্তে পৌছে দৃষ্টি বিদ্ধ হয় কোনো ঐতিহাসিক ইমারতে বা স্মৃতিসৌধে।

সবুজ ঘাসেব গালিচা বিছানো এক মাইল দীর্ঘ সুবক্ষিত ভূখণ্ডেব অপর প্রান্তে ক্যাপিটল বা রাষ্ট্রীয় আইন পরিষদ ভবন। প্রাচীন স্থাপত্যবীতিতে গঠিত, প্রকাণ্ড গম্বুজ শোভিত প্রাসাদোপম শুভ্র অট্টালিকা। গম্বুজেব চূড়ায়, ব্রোঞ্জেব তৈরি স্বাধীনতার প্রতীক মূর্তিটিও সামান্য নয়, সাড়ে ঊনিশ ফুট দীর্ঘ। তৈবি কবা শেষ হয় এক শত বৎসরেবও পূর্বে। অন্য জানালা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলে নজরে পড়বে, যার নামই হোয়াইট হাউস, রাষ্ট্রপতির ভবন। বর্ণ শুভ্র। এইখানেই ওয়াশিংটন ডিসির বিশিষ্ট আভিজাত্য। তার অভ্যাস প্রাচীন, রুচি বনেদি। স্থাপত্যরীতিতে সে সর্বত্র আধুনিক উপকারিতামূলক লঘুতাকে, সরলীকরণকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছে। প্রয়োজন হলে ইমারতেব অভ্যন্তরে হালের প্রয়োজন অনুযায়ী আধুনিক সুবিধাদির ব্যবস্থাদি প্রবর্তিত করেছে অধিক। হোয়াইট হাউসে নির্দিষ্ট সময়ে ছাত্রছাত্রী এবং পর্যটকরা এসে, প্রাসাদের অভ্যন্তরে ঘুরে ফিরে দেখে রাষ্ট্রের বর্তমান ও অতীত প্রেসিডেন্ট কোন্ গৃহে বাস করেছেন, কোন টেবিলে বসে কাজ করেছেন, কোন অলিন্দে চিন্তামগ্ন চিত্তে পায়চারি করেছেন। অন্য জানালায় এসে দাঁড়ালে

দূরে দেখা যায় জেফারসনের স্মৃতিসৌধ। সম্ভবত ওয়াশিংটন শহরের এটাই সর্বাপেক্ষা মর্মস্পর্শী রূপময় দর্শনীয় স্থান। সামনে ঝিল, সেতু বেয়ে পার হলে স্মৃতিসৌধে পৌছান যায়। সম্মুখের জলবিস্তারের প্রান্ত ঘিরে সারি সারি গোলাপি চেরি ফুলের হিল্লোলিত শাখা। অশ্রুর বুদবুদ-এর মতো স্তম্ভোপরি শ্বেতমর্মরের গম্বুজে গঠিত স্মৃতিসৌধ আমাদেরও অশ্রুভারাক্রান্ত করে তোলে। ভেতরে জেফারসনের বিরাট ব্রোঞ্জের মূর্তি। চারপাশের দেয়ালের গায়ে খোদাই করা জেফারসনের অমর বাণী : I have sworn upon the altar of God eternal hostility to every form of tyranny over the mind of man.

কিম্বা স্বাধীনতা সনদের ঘোষণা : We hold these truths to be self evident that all men ae created equal, that they are endowed by their creator certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the persuit of happiness.

ওয়াশিংটন মনুমেন্টের একদিকে ক্যাপিটেল, অন্যদিকে লিংকনের স্মৃতিসৌধ, জানালা দিয়ে দূরে দেখা যায়। গ্রিক স্থাপত্যরীতির জটিলতাহীন গঠন, স্তম্ভের ওপর কৌণিক মর্মরের আচ্ছাদন। ভেতরে শ্বেতমর্মরেরই উপবিষ্ট লিংকনের চিন্তামগ্ন বিষণ্ণ মূর্তি। দেয়ালে খোদাই করা তাঁরই অবিস্মরণীয় বাণী : মানুষের মুক্তির, সাম্যের স্বাধীনতার।

সব দেখা শেষ হলে একবার ম্যাসাচুসেটস এভিনিউতে আসবেন। রক ক্রিক পার্কের সঙ্গেই যেখানে এমব্যাসি রো ঝলমল করছে। ১৯৫৭ সালে এখানে এক অপরূপ মসজিদ নির্মিত হয়েছে, মিশরীয় গোলাপি মর্মরে। পনেরটি মুসলিম রাষ্ট্র এর নির্মাণে সহযোগিতা করেছে। যেমন শোভায় তেমনি গুরুত্বে, এই মসজিদ মার্কিন মুলুকে বিশ্ব মুসলিম সংস্কৃতির এক মর্যাদাবান প্রতীক।